ভারতী।

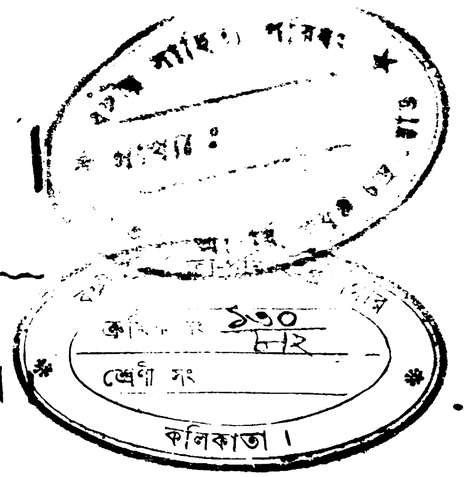

মাসিক পত্রিকা।

শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অষ্টম খণ্ড

১৮০৬ শক

ভারতী
বৈশাখ ১২৯১ — চৈত্র ১২৯১

১২৯১

কলিকাত

আদি ব্রাহ্মসমাজ

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

কলিকাতা।
শ্রেণী সং
১৩০
৮৮২
আ. প. গ্র

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
অতিথি আগমন	১৪৯
অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাস ভূমি কি না	৬২
আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার পরিণাম	২৬৫
আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস	৩৫৫, ৪১৩, ৪৪০, ৪৭৬
ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্রের বিষয় দুই একটি কথা	১৪৩
উত্তর	১৮৪
উপকথা	৫০৪
একটি পুরাতন কথা	৩৪০
এম্ বর্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত	৬৮
কথা বার্ত্তা	১৩৭
কারে ডাক জলধর	১২০
কেচো	৩০৯
কৈফিয়াৎ	৪০০
কোথায়	৪০৮
ক্রমোত্থান পুষ্প	৫২৩
খাদ্য	২৪১
গোলাপ	৭৫
গৌড় গীত	৪৩৩, ৪৭৩
ঘাটের কথা	৩০০
চন্দ্রাবলী	৪৭০
চারুতার জয়	১২৫
জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল	১৯৮, ২৮৯, ৩৩৫
ডুব দেওয়া	১৮
তারা	৪২৩
তোমাকে	২০৭
দূরে ঘড়ির শব্দ শ্রবণে	৩২৭
নীরব নিশীথে	২০৬
ন্যাশনল ফণ্ড	৫৪
পদার্থের চতুর্থ অবস্থা	১৬০
পারমাণবিক সিদ্ধান্ত	৮৯, ১৭৫
প্রবাস পত্র	৫৫৩
বর্ত্তমান শিক্ষা	২৮১
বর্ষ	৯
বাঙ্গার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস	৫৩৮
বাল্য বিবাহ	৪৮০
বাল্য বিবাহ (প্রতিবাদ)	৫৪৫
বিজন চিন্তা	২৯৫
বিদায়	৫৪৪
বিদেশী ফুলের গুচ্ছ	১৬৭
বিলাতের ছাত্র জীবন	৮১, ১৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা।
বিদ্যাশিক্ষা ও ভারতের সাধারণ ভাষা	১০৯
বিষ্ণুপুরের রাজ বংশের ইতিহাস	২৫২
ভক্ষ্য দ্রব্য কয় প্রকার	৩১৫, ৩৫০
ভাউসাহেবের বখর	১২, ১২৩, ১৫০, ২৭১
ভালবাসা	৫১১
ভূমিকা	/০
মনের কথা জানা	৪০৯, ৪৩৬, ৫১৫
মূল্য	২৯
মেহেদি	৫৬০
যুদ্ধ ধর্ম্ম	১০৪
যোগিয়া	৩২১
রাজ তরঙ্গিনী	৩২৩
রামমোহন রায়	৪৫৮
লীলা	৩৬, ১৩০
শঙ্কর মণ্ডন সংবাদ	১৭০, ২৭০, ৩১৮
শরতের শুকতারা	৩৫৪
সন্ন্যাসীর জীবন	২১৮, ২৯৬
সমস্যা	৪৯৩
সরনী জলে শশী (শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী) ...	৫১
সভ্যতার উন্নতি সহকারে নরজাতির শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না	২৬১
সরোজিনী প্রয়ান	১৫৩, ১৮৫, ৩৬৮
সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা	৪৩৫, ৫০০
সিন্ধু কাহিনী	৫০৫
সুখ দুঃখ	৫৬৬
সেন রাজগণ	৩৭৭, ৪২৫
সৌন্দর্য্য ও প্রেম	৯৬
স্ত্রী আচার	২০৮
স্থান মান	১
স্বজাতির প্রতি অনুরাগ	৩২৯, ৩৯৩
স্বপ্ন রাজ্য	৩৬০
সংযম	১৯২
সংস্কার রহস্য	২২৩
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ...	১৭৯, ২৭৮, ৩২৭, ৩৭৪, ৪২৪, ৪৭২, ৫২৭,
হাতে কলমে	২২৮
হায়	১৯১
হিমালয়ে প্রকৃতি দর্শন	২৪৮
হুগলির ইমাম্ বাড়ী	৪১৭, ৪৫০, ৫১৯, ৫৩২

ভূমিকা।

শ্রেণী সং
কলিকাতা।

এই পত্রিকায় এবার ভূমিকা শীর্ষক রচনাটি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—ভারতীর আবার ভূমিকায় প্রয়োজন কি। ভারতী বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন সত্য বটে, কিন্তু ভারতীর জীবনে যে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা পাঠকমণ্ডলীকে আমাদিগের জ্ঞাত করাইতে হইতেছে।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা মহাশয় বর্ত্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম।

ভারতী এত দিন যেরূপ উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত হইয়া আসিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট রূপে ইহা সম্পাদন করা দুর্ঘট, সে আশা দূরে থাক্, ভারতীর পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট, কিন্তু কেবল এই আশার বশবর্ত্তী হইয়া যে আমরা ভারতী গ্রহণ করিয়াছি এমন নহে, কিম্বা এতদিন এই পত্রিকার সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ থাকায় ইহার প্রতি যে মমতা জন্মিয়াছে—সেই মমতাও আমাদের এ গুরু-ভার গ্রহণ করার প্রধান কারণ নহে। আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন সুন্দর রূপে চালাইয়া আসিয়াছেন, অন্য কার্য্য বশতঃ এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সে [illegible] তিনি যখন [illegible]পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল, আমাদের দেশের এবং বাঙ্গলা ভাষায় বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় কোন একখানি পত্রিকার অকাল মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এইরূপ অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি। পূজনীয় ভারতীর পূর্ব্বতন সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রতিভাকে স্বদেশের উপকার সাধন ব্রতে ব্রতী করিয়া ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকা সংস্থাপন করেন এবং গত সাত বৎসর ধরিয়া ভারতীকে বহু-যত্নে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, অঙ্ক প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, পিতার ন্যায় সস্নেহে লালন পালন করিয়া, এখন তিনি ভারতীকে হস্তান্তরে সমর্পণ করিলেন।

মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় কন্যা গভীর দুঃখে অশ্রুজল ফেলিতে থাকেন, তাঁহার পিতামাতা স্বজনবর্গও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সাধের প্রতিমা পরের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল—তাঁহাদের মত যত্ন আদর তাহাকে আর কে করিবে। কিন্তু শ্বশুরালয়ে আসিয়া কন্যা যখন দেখিতে পায়—এখানেও তাহাকে আদর করিবার, এখানেও তাহাকে যত্ন করিবার লোক আছে, এখানেও তাহার মলিন মুখ দেখিলে

প্রাণে ব্যথা পাইবার লোক আছে, এখানেও তাহাকে সুখী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবার লোক আছে, তখন সেই যত্নে সেই আদরে কন্যা ক্রমে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া উঠে এবং কন্যাকে সুখী দেখিয়া কন্যার পিতা মাতা আত্মীয়বর্গও তখন সুখী হইয়া থাকেন। ভারতীর সম্বন্ধেও আমরা পাঠকদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি যে ভারতী আমাদের হইয়া অযত্নে পড়িবেন না—ভারতীর পূর্ব্বতন বন্ধুগণ তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত যেরূপ শ্রম স্বীকার করিতেন আমরাও ভারতীর জন্য সেইরূপ শ্রম স্বীকার করিতে চেষ্টা করিব। আর এক কথা, কন্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, পিতা মাতা তাহার পর হইয়া যান না, তাঁহারা পূর্ব্বেও যেমন আপনার ছিলেন এখনও তেমনি থাকেন, পূর্ব্বেও যেমন স্নেহ করিতেন এখনও তেমনি স্নেহ করেন—সেইরূপ ভারতী হস্তান্তরিত হইল বলিয়া পূর্ব্বতন বন্ধুদিগের সহিত ইহার সম্বন্ধ রহিত হইল না. তাঁহারা পূর্ব্বেও ইহাঁকে যেরূপ যত্ন করিতেন এখনও ইহাঁকে সেইরূপ যত্ন করিবেন। সুতরাং অন্য গৃহে আসিয়াও পাঠকদিগের নিকট ইনি সেই পূর্ব্বের ভারতীই রহিলেন। সেইজন্য নূতন করিয়া এই পত্রিকার উদ্দেশ্যাদি এখানে বর্ণনা করা যে তেমন আবশ্যক তাহা নহে। তবে ভারতী নূতন সম্পাদকের হাতে আসিয়াছেন, আবশ্যক থাক্ আর নাই থাক্, কি প্রণালীতে নূতন সম্পাদক এই পত্রিকা চালাইতে চাহেন তাহা একবার বলা একটি চিরন্তন প্রথা।

সেই জন্য ভারতীর ন্যায় জনসাধারণের পাঠোপযোগী মাসিক পত্রিকার কি কি উদ্দেশ্য, আর আমরা কি কি প্রকারে সেই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাই, তাহা সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রত্যেক দ্রব্য দেখিয়াই আমরা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি—ইহার প্রয়োজন কি, সুতরাং মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন লোকের মনে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে আজ কাল এত মাসিক পত্রিকা দেখা যায়, যে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন কি অর্থাৎ ইহা হইতে আমাদের কি কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে—তাহা অবগত আছেন। ইহা সত্ত্বেও এবিষয়ে আমরা দু একটি কথা বলিতে চাই মাসিক পত্রিকা হইতে আমাদিগের কি উপকার হইতে পারে? আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত, অধিকাংশ লোকই অন্ন বস্ত্রের আয়োজনে নিযুক্ত; এই সকল লোকের যে কিছু অবকাশ থাকে তাহা বিশ্রাম করিতেই বোধ হয় নিঃশেষিত হইবা যায়, ইহাঁদিগের নিঃস্বার্থ ভাবে চিন্তা করার সময় হইয়া উঠে না। আমরা কতবার আগুণ জ্বলিতে দেখিয়াছি, কতবার ঐ আগুণে কাষ্ঠ ভস্ম হইতে দেখিয়াছি, কতবার ঐ আগুণ হইতে ধূম উঠিতে দেখিয়াছি। কিন্তু কাষ্ঠ পুড়িয়া যখন আগুণ হয়, তখন কাষ্ঠের কি পরিবর্ত্তন হয়, কাষ্ঠের মধ্যে কোন অংশই বা ধূম হয় আর কোন অংশই বা ভস্ম হয় ইহা

আমাদিগের মধ্যে কয় জন লোকে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা না করার কারণ এই যে আমরা সাধারণতঃ সাংসারিক কার্য্যে এত ব্যস্ত যে যাহাতে আমরা অব্যবহিত ভাবে কোন উপকার দেখিতে পাই না, তাহাতে আমরা সময় দিতে প্রস্তুত নহি। যে কার্য্য করিলে আমরা দুই মণ চাউলের সুবিধা করিতে পারিব কি দুই খান বস্ত্রের সুবিধা করিতে পারিব, আমরা সে কার্য্যে সময় দিতে প্রস্তুত থাকি, কিন্তু কাষ্ঠের কোন্ অংশ ভস্ম হয় তাহা জানিয়া আমরা ঐ রূপ কোন উপকারের সম্ভাবনা অব্যবহিত ভাবে দেখিতে পাই না. সুতরাং আমরা ও বিষয় জানিতেও তত উৎসুক নহি। আবার এদিকে ইহাও দেখিতে হইবে যে আমরা যদি মনের বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি আকাঙ্খা করি, তাহা হইলে আমাদিগের নিঃস্বার্থ ভাবে চিন্তা করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হইবে ভাবিয়া যে সকল কার্য্যে আমরা ব্যাপৃত থাকি সে সকল কার্য্য করিবার সময় হয়ত অন্যের হিতাহিতের উপর আমাদের যথোপযুক্ত মনোযোগ না থাকিতেও পারে, তখন আমাদিগের নিজের সামান্য সামান্য বৈষয়িক চিন্তাকেই আমরা প্রাধান্য দিতে পারি, এবং এইরূপ ভাবে চিন্তা করিয়া আমাদিগের মন চুম্বক শলাকার ন্যায় একদিকেই নামিয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সত্য নিরূপণ ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যাইতে পারে আর তাহা হইলে সমাজের উন্নতি পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। সমাজের এই ক্ষতি সম্ভাবনা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, সমাজস্থ সাধারণ ব্যক্তিদিগকে নিঃস্বার্থ ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়ার বাসনায়. সাধারণের মনের যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব বিধান করিবার উদ্দেশ্যে সমাজের মধ্যে কেহ কেহ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন্। এই প্রকার মাসিক পত্রিকায় সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়া থাকে আর লোকে অবকাশ মতে ঐ পত্রিকা পাঠ করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বৈষয়িক চিন্তা হইতে দূরে থাকিয়া স্ব স্ব মানসিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। জন সাধারণের মানসিক সৌষ্ঠব বিধানই মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য; এখন দেখা যাউক মনের কি কি বিভাগ আর কি কি প্রকারে ঐ সকল বিভাগের উৎকর্ষ সংসাধিত হইতে পারে। আমাদিগের মনে তিন শ্রেণীর ঘটনা দেখা যায়; অনুভূতি, উদ্যম, আর জ্ঞান। আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারি, এই অনুভব কার্য্যকে অনুভূতি বলা যাইতে পারে; আমরা সুখ প্রাপ্তির কি দুঃখ নিবারণের অভিপ্রায়ে শক্তি প্রয়োগ করিতে উদ্যত হই, এই উদ্যত হওয়াকে উদ্যমন্ বলা যাইতে পারে; আর আমরা যে সকল বিষয় আমাদিগের মনে উপস্থিত হইতে দেখি, তাহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী কি এই যে উপলব্ধি.তাহার নাম জ্ঞান।

মনুষ্যের মনের অবস্থা সকল দিকে উন্নত করিতে হইলে, জ্ঞান, অনুভূতি ও উদ্যমন এই তিন প্রকার মানসিক ঘটনার

নিমিত্ত মনে যে তিনটী বৃত্তি আছে, সে তিনটী বৃত্তিরই উন্নতি হওয়া আবশ্যক। এখন দেখা যাউক জ্ঞান বৃত্তির কি প্রকৃতি আর কি প্রকারে ইহার উৎকর্ষ জন্মিতে পারে। কোন বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ঐ বিষয় আমাদিগের প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ আমাদিগের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ বিষয় আমাদিগের মনে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, তাহার পর এই বিষয়টি ইহার পূর্ব্বের প্রত্যক্ষীভূত কোন বিষয়ের সদৃশ কি না—ইহা নির্ণয় করার উদ্দেশে পূর্ব্বে যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ হইয়াছে কল্পনা দ্বারা তাহা মনে করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। যদি পূর্ব্বের কোন একটি বিষয় এইরূপে আপাততঃ প্রত্যক্ষমান বিষয়ের সদৃশ দেখিতে পাই—তবে এই সদৃশ বিষয়টি কল্পনার সাহায্যে ও অপর বিষয় ইন্দ্রিয় কিম্বা কল্পনার সাহায্যে মনের মধ্যে দাঁড় করাইয়া তখন এই দুই বিষয়ের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য আছে তাহা দেখিতে হয়, যদি কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ঐ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া উহাদিগকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে পারা যায়। এইরূপে অবভাস-জগতে (phenomenon) কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেমন আমি একটী বস্তু দেখিলাম, তাহার চারিটি পা, একটী লেজ, গায়ে লোম, ঘাড়ে কেশর আর তাহার আকৃতি বিশেষ এক প্রকারের, ইহা প্রত্যক্ষ করার পর আমি পূর্ব্বে ঐ প্রকার আর কোন বস্তু দেখিয়াছি কি না ইহা কল্পনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলাম, আমি মনে দেখিতে পাইলাম যে ঐ প্রকার অনেক বস্তু দেখিয়াছি, সুতরাং ঐ বস্তুটী এই সকল বস্তুর সহিত এক শ্রেণীর ইহা স্থির করিয়া আমি ইহাকে একটী ঘোড়া বলিয়া জানিলাম। এখন দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের তিনটী সোপান, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, কাল্পনিক-জ্ঞান, আর সামান্য-জ্ঞান; (যেরূপ জ্ঞান দ্বারা আমরা দ্রব্যদিগের সামান্য অর্থাৎ সাধারণ গুণ গুলি উপলব্ধি করি তাহার নাম সামান্য-জ্ঞান)। জ্ঞানবৃত্তির উন্নতি করিতে হইলে উহার এই তিন সোপানের উন্নতি হওয়া আবশ্যক; আর একত্রে এই তিন প্রকার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত (বাহ্যিক ও আন্তরিক) বিজ্ঞান চর্চ্চা যত কার্য্যকারী তত বোধ হয় আর কিছুই নহে। বিজ্ঞানে প্রকৃতির ঘটনাগুলি যত্নের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, পরে কল্পনাদ্বারা ঐ সকল ঘটনাগুলি মনের মধ্যে একত্র করিতে হয় আর অবশেষে উহাদিগের মধ্যে কোন সাধারণ গুণ আছে কি না তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। এইরূপে বিজ্ঞানে প্রকৃতির নিয়মগুলি অর্থাৎ প্রকৃতির ঘটনাগুলির মধ্যে যে সকল সাধারণ সম্বন্ধ সকল স্থানে সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হয়। বিজ্ঞানে ঘটনাগুলি যত্নের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, অর্থাৎ যাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের ইন্দ্রিয়-গোচর হইয়াছে তাহাই আমরা দেখিয়াছি বলি; আর যে বিষয় দেখিতে হইতেছে তাহার সমুদয় অবস্থাটী দেখিতে চেষ্টা

করি। আমরা যখন কোন পদার্থ লক্ষ্য করি তখন তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় আমরা প্রকৃত পক্ষে দেখি আর কতকগুলি বিষয় আমরা প্রকৃতপক্ষে না দেখিলেও বোধ হয় যেন দেখিতেছি। যেমন যখন আমরা দূরে একটী গোলাপ দেখি, তখন যাহা দেখিতে পাই তাহা একপ্রকার বর্ণ ও আকৃতি মাত্র, অন্য যেসব দেখি বলিয়া বোধ হয়, যেমন গোলাপের দলের কোমলতা, তাহা কল্পনা দ্বারা দেখি, প্রত্যক্ষ দেখি না; আমরা পূর্ব্বে যখন একটি গোলাপ হাতে করিয়া দেখিয়াছি তখন গোলাপের বর্ণ ও আকৃতি দর্শন দ্বারা আর কোমলতা স্পর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এখন আবার দূর হইতে যখন গোলাপের বর্ণ ও আকৃতি মাত্র দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি তখন কোমলতাও প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়।* এইরূপে দেখা যাইতেছে যে অনেক সময় আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি মনে করি তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকিতেও পারি। বিজ্ঞানে কোন বিষয় দেখার সময় ঐ বিষয় সম্বন্ধে কি কি প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ করা হয় তাহা সত্বের সহিত নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণতঃ কোন বিষয় দেখার সময় আমরা উহার অবস্থার কতক অংশ বা দেখি আর কতক অংশ বা দেখি না। বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে কোন বিষয় লক্ষ্য করিতে হইলে সে বিষয়ের অবস্থা যতদূর সম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে বিজ্ঞান আলোচনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান শক্তির উন্নতি হয়। বিজ্ঞানে কাল্পনিক জ্ঞানশক্তির অর্থাৎ কল্পনাশক্তিরও উন্নতি হয়; দ্রব্যাদিগের শ্রেণী নির্ব্বাচন করার উদ্দেশ্যে ঐ সকল দ্রব্য কল্পনাদ্বারা মনের মধ্যে উপস্থিত করিতে হয়, পরে উহাদিগের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হয়; এক এক শ্রেণীর কতকগুলি সামান্য বা সাধারণ গুণ থাকে। পরে আমরা কল্পনা-দ্বারা ঐ সকল শ্রেণীগুলি মনের মধ্যে আনয়ন করি অর্থাৎ এই সকল শ্রেণীর সামান্য গুণ সমষ্টিগুলিকে মনের মধ্যে উপস্থিত করি; আর তখন দেখি এই সকল শ্রেণীগুলির মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি না অর্থাৎ এই সকল সামান্যগুণ সমষ্টিগুলির মধ্যে কোন সামান্য গুণ আছে কি না, এইরূপে আমরা প্রথমতঃ যে সকল শ্রেণী নির্দ্দেশ করি তাহাদিগকে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করি, পরে তাহাদিগকে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করি। এই প্রকারে অবশেষে উচ্চতম শ্রেণীগুলি নির্দ্দেশ করা হয়। যেমন গো, অশ্ব, বানর ইত্যাদি শ্রেণীদিগকে স্তন্যপায়ী; সারস, হংস, বক ইত্যাদি শ্রেণীদিগকে পক্ষী; ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভেকদিগকে উভচর; শফরী, রোহিত ইত্যাদি শ্রেণীদিগকে মৎস্য; ফড়িং, আর্সুলা ইত্যাদি

* গোলাপের কি অন্য কোন দ্রব্যের আকৃতি আমরা দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করি একথা কতদূর সত্য তাহা সুবিধা হইলে আর এক প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রেণীদিগকে পতঙ্গ, এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীদিগকে আবার উচ্চতর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পরে স্তন্যপায়ী, পক্ষী, উভচর ও মৎস্য এই কয় শ্রেণীর পৃষ্ঠ দণ্ড আছে দেখিয়া ইহাদিগকে পৃষ্ঠদণ্ডী আর পতঙ্গ ও অন্যান্য যে সকল শ্রেণীর জন্তুর পৃষ্ঠদণ্ড নাই তাহাদিগকে অ-পৃষ্ঠদণ্ডী বলা যাইতে পারে। আবার শেষে এই দুই উচ্চশ্রেণীকে জন্তু এই উচ্চতম শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে বিজ্ঞান আলোচনায় পদে পদে কল্পনা-শক্তির কার্য্য আছে। সুতরাং বিজ্ঞান আলোচনায় কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ উন্নতি সম্ভাবনা; বিজ্ঞান আলোচনায় যে সামান্য-জ্ঞান শক্তির উন্নতি হয়, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না, কারণ বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্যই দ্রব্য সকলের সামান্য অর্থাৎ সাধারণ গুণ গুলি লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা ও উহাদিগের সাধারণ নিয়ম গুলি আবিষ্কার করা। পাঠকদিগকে আমরা এই স্থলে বলিতেছি যে বিজ্ঞান শব্দে এই প্রবন্ধে কি প্রাকৃতিক কি মানসিক কি সামাজিক সকল প্রকার বিজ্ঞানই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান বৃত্তির উন্নতি করার নিমিত্ত যেমন বিজ্ঞান-আলোচনার আবশ্যক, অনুভূতি-বৃত্তি ও উদ্‌যমন-বৃত্তির উন্নতির নিমিত্ত আবার সেই রূপ কবিতা, ইতিহাস, উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করা আবশ্যক। প্রকৃত সৌন্দর্য্য, প্রকৃত মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয় কাহাকে বলে তাহা উদাহরণে দেখানই কবিতা ও উপন্যাসের উদ্দেশ্য।

কবিতা ও উপন্যাসে এক প্রভেদ এই যে পদ্যে যে গুণের বর্ণনা করা হইতেছে সেই গুণই প্রকাশ্যতঃ মুখ্য বিষয় করা হয়, উপন্যাসে কোন একটী গুণ মুখ্য করার অভিপ্রায় থাকিলেও তাহা অন্যান্য কয়েকটী গুণের পার্শ্বস্থ একটী গুণ বলিয়া প্রকাশ করা হয়। এই স্থলে ইহার ভিন্ন ভিন্ন দুইটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। সীতা কাব্যের নায়িকা—শকুন্তলা—(কাব্যাকার) উপন্যাসের নায়িকা। সীতার পতিপরায়ণতা দেখানই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য, সীতার প্রতি কার্য্যে প্রতিবাক্যে ঐ এক ভাবই আঁকিতে কবি প্রাণপণে প্রয়াস করিয়াছেন, ইহার আনুষঙ্গিক মানুষ হৃদয়ের অন্য কোন ভাব যেন কবি সীতাতে প্রকাশ করিতে চাহেন না। যখন রাম বনে গমন করিতেছেন তখনও সীতা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছেন, স্বর্ণলঙ্কা পুরীতে শত শত দাসী বেষ্টিত হইয়াও সীতা রামবিহনে শূন্যপ্রাণে তাঁহারি ধ্যান করিতে মগ্ন আছেন আবার সেই পতি প্রাণা সতী রাম কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে বনবাসে প্রেরিত হইয়াও স্বামীর মঙ্গল কামনা করিয়া অশ্রু ফেলিতেছেন জন্মে জন্মে তাঁহার মত স্বামী পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। সীতাকে কবি মানুষ করিয়া আঁকেন নাই রাম ছাড়া সীতার মনে আর যেন কোন চিন্তা নাই আর যেন কোন ভাব নাই, একমাত্র পতিপরায়ণতা ভাবই সীতাতে মুর্ত্তিমতী। আর শকুন্তলা? শকুন্তলার প্রেম কি সীতার মতই গভীর, নিঃস্বার্থ—দুষ্মন্তময় নহে? তথাপি শকুন্তলা মানুষ। শকুন্তলার প্রেম গভীর—কিন্তু তথাপি শকুন্তলার অন্য হৃদয় ভাব একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কালিদাস শকুন্তলার প্রেমকে মুখ্য পদবীতে দাঁড় করাইয়া অন্য সকল আনুষঙ্গিক ভাবও গৌণরূপে আঁকিয়াছেন। তাই পতিপ্রাণা দুষ্মন্তময় জীবনা শকুন্তলা স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া অপমানিত হৃদয়ে সরোষে বলিতেছেন "অনার্য্য আত্মনো হৃদয়ানুমানেন প্রেক্ষসে। ক ইদানীম অন্যো ধর্ম্মকঞ্চুকপ্রবেশিনস্ তৃণচ্ছন্ন কূপোপমস্য তব অনুকৃতং প্রতিপৎস্যতে।" 'হে অনার্য্য তুমি আপনার হৃদয়ের দৃষ্টান্তে অন্যের হৃদয় দেখিতেছ, তৃনাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ধর্ম্ম-বেশধারী যে তুমি-তোমার অনুকরণ আর কে করিবে।" ইহাতে শকুন্তলার পতিপরায়ণতার অভাব প্রকাশ পাইতেছে না। শকুন্তলা ভাবিতেছেন বনবাসিনী, মুনিকন্যার প্রাণ মন হৃদয় দুষ্মন্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এখন তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন; দেবতার মত বিশ্বাস করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়া শকুন্তলা যাহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে আজ সে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার অনিচ্ছায় চিনিতে না পারার ভাণ করিয়া রমণীয় সারধন যে সতীত্ব তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, সব সহ্য করা যায় কিন্তু প্রণয়ীর নিকট হইতে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য, প্রতারণাময়-এরূপ বৃথা সন্দেহ রমণীর অসহ্য। দুষ্মন্তের এই আচরণে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইয়া শকুন্তলা আত্ম হারা হইয়াছেন। এইখানে কবি প্রেমকে মুখ্য করিয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ উহার আনুষঙ্গিক বিরোধী ভাবও পূর্ণরূপে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন।

পদ্যে কল্পনা শক্তির বিলক্ষণ প্রয়োগ হইয়া থাকে তবে পদ্য প্রভৃতির কল্পনা আর বিজ্ঞানের কল্পনা এই দুয়ে একটী প্রধান প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানে সাধারণতঃ দ্রব্যগণের সামান্য-গুণ গুলি অর্থাৎ যে সকল গুণ কতকগুলি দ্রব্যের মধ্যে সাধারণ সেই সকল গুণ ঐ দ্রব্যগুলি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কল্পনা করিতে হয়, আর কবিতা প্রভৃতিতে (সত্য, ন্যায়, বীরত্ব, ইত্যাদি কোন বিশেষের চিত্র অঙ্কিত করার অভিপ্রায় থাকিলেও) তাহা উদাহরণে দেখাইবার নিমিত্ত আমরা রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি সর্ব্ব গুণ-বিশিষ্ট কোন বিশেষ দ্রব্যের কল্পনা করি। যেমন, বিজ্ঞানে আমরা পদার্থ সমূহ পরীক্ষা করিয়া এই অনুমান করি যে সকল পদার্থই পরমাণু হইতে প্রস্তুত আর তখন আমাদিগের ঐ সকল পরমাণুর কতক গুলি সাধারণ গুণ কল্পনা করিতে হয়। পরমাণুগণ কিরূপে নড়ে কিরূপে পরস্পরকে আকর্ষণ করে—ইত্যাদি সমুদয় বিষয় আমরা কল্পনা করিয়া থাকি—অথচ আমরা কখনও এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করি না। আর কবিতায় আমরা যখন রাবণের ন্যায় দশ মস্তক বিশিষ্ট অদ্ভূত মানুষও কল্পনা করি তখনও সে কল্পনা আমাদের প্রত্যক্ষ পদার্থের রূপান্তর মাত্র। রাবণের মত দশ মুণ্ড একটি বীর পুরুষ আমরা প্রত্যক্ষ করি না বটে, কিন্তু আমরা এক মুণ্ড বীর পুরুষ দেখিতে পাই,—একমুণ্ড হইতে ক্রমে সেইরূপ দশ মুণ্ড কল্পনার দ্বারা একমুণ্ড বীর পুরুষে বসাইতে পারি—এবং এক মুণ্ড বীরের যে বীরত্ব দেখিয়াছি—তাহা হইতে শত শত গুণ অধিক বীরত্ব তাহাতে আরোপ করিয়া রাবণের ন্যায় এক জন বীর পুরুষ কল্পনা করিতে পারি। এইরূপে আমরা কাব্যে যাহা কল্পনা করি না কেন তাহা রূপরসগন্ধস্পর্শাদি গুণ যুক্ত একটি বিশেষ পদার্থ মাত্র। সুতরাং এক অর্থে বিজ্ঞানের কল্পনা কাব্যের কল্পনা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর কেন না বিজ্ঞানের উচ্চতর কল্পনায় প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে পৃথকীকৃত সামান্য গুণ সমষ্টি মনের মধ্যে উপস্থিত করার চেষ্টা করিতে হয় আর কাব্যের কল্পনায় সমুদায় গুণ যুক্ত বিশেষ কোন একটী দ্রব্য উপলব্ধি করিতে হয়; যাঁহারা উভয় প্রকার কল্পনার সহিতই বিশেষ পরিচিত আছেন, তাঁহারা বোধ হয় বলিবেন যে সামান্য-গুণ সমষ্টি কল্পনা করা বিশেষ কোন একটী দ্রব্য কল্পনা করা অপেক্ষা অধিক আয়াসসাধ্য। কবিতা, উপন্যাস, ও ইতিহাসপাঠে আমাদিগের উদযমন্ বৃত্তির উন্নতি সাধন পক্ষে বহুল উপকার সম্ভাবনা। ইতি-

হাসে আমরা দেখিতে পাই মনুষ্য প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কোথায় কিরূপ ব্যবহার করিয়া কিরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছে, কবিতা ও উপন্যাসে ঐ বিষয়গুলি কল্পনা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া চাকচিক্য শালী হয় এবং ইহাতে উহার মনোহারিত্ব আরো বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি মনের যে কয়টী বৃত্তি আছে তাহাদিগের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মানসিক শিক্ষা আবশ্যক। বিজ্ঞানে জ্ঞানবৃত্তির আর কবিতা, উপন্যাস, ইতিহাসে অনুভূতি ও উদ্যমন বৃত্তির বিশেষ উন্নতি সম্ভাবনা। আমরা যদি আবার প্রকৃতির মধ্যে আমাদিগের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিতে চাই, আমরা যদি প্রকৃতির বাহ্য অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে না চাই, আমরা যদি দৃশ্যমান প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিতে চাই, তবে আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। যদি আমাদিগের মন তাহার সীমা কোথায় জানিতে চাহে— তবে আমাদিগের দর্শনশাস্ত্র অবহেলা করা উচিত নহে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে—অঙ্ক, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন,জীবন বিজ্ঞান,মনোবিজ্ঞান রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি বিজ্ঞান, দর্শন কবিতা আর উপন্যাসাদি এই সকল গুলিই মাসিক পত্রিকার সাধারণ আলোচ্য-বিষয় এবং এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীতে এই সকল বিষয়ই (অধিকই হউক কি অল্পই হউক) আলোচনা হইয়া আসিয়াছে আমরাও এখন এ সকল বিষয়ে ভারতীর প্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি— আমাদের মতে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা আছে এবং আজ কাল এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার কতক অনুরাগও দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ আজ কাল বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ইয়োরপীয় কোন ভাষার সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকায় তাঁহারা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে অপারক তাহা ছাড়া ইংরাজি জানিয়াও অনেক স্ত্রীপুরুষ অধিক সময় বা অর্থ দিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিতে পারেন না সেই জন্য ভারতীতে সহজ ভাষায় বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার বিশেষরূপে ইচ্ছা রহিল। পরিশেষে সম্মান-পুরঃসর বক্তব্য এই যে বঙ্গীয় পাঠক ও সমালোচক মণ্ডলী এই পত্রিকার প্রতি এতদিন যে সমাদর দেখাইয়া আসিয়াছেন, এখন যেন তাঁহারা সেই সমাদরের হ্রাস না দেখান। ভারতী এইবার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে ইহাঁর এই সময়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষানুযায়ী প্রতিপত্তি হইয়াছে; কিন্তু তথাপি স্বদেশানুরাগী ও মাতৃভাষানুরাগী বঙ্গীয় পাঠকগণের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ভারতীর এখনও তরুণ বয়স, সুতরাং ইহাঁর প্রতি এক্ষণে শিথিলযত্ন হইলে ইহাঁর সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

ভারতী।

স্থান-মান।

(গত বারের অনুবৃত্তি)

অণুর মধ্য-দিয়া প্রসারিত ঋজুতনু। ঋজুতনুর বর্দ্ধিত এবং দ্বিধা-বর্দ্ধিত তনু। বর্দ্ধিত তনুর বর্দ্ধিতাংশ। করের প্রবর্দ্ধিত এবং অপবর্দ্ধিত তনু। ভিন্নাকর কর-দ্বয়। সমদিক্‌বর্ত্তী ভিন্নাকর কর-দ্বয়। এক ঋজুতনু-দ্বারা আর এক ঋজুতনুর কর্ত্তন এবং উভয়ের ছেদ-স্থান। এক ঋজুতনু-দ্বারা আর এক ঋজুতনুর সমসূত্র-কর্ত্তন। ঋজুতনু-দ্বয়ের মিলন-স্থান এবং সম্মিলিত ঋজুতনু-দ্বয়। ঋজুতনুর সমপৃষ্ঠবর্ত্তী এবং বিপরীত-পৃষ্ঠবর্ত্তী অণুদ্বয় ॥১৭॥

১৭/০ ॥ যে-কোন অণু যে-কোন ঋজুতনুর প্রান্তেতর আণব অংশ, সেই ঋজুতনু সেই অণুর মধ্য দিয়া প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয়।

১৭৵০ ॥ কোন একটি ঋজুতনুর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের মধ্য-দিয়া যে-কোন কর প্রসারিত হউক্ না কেন সেই করই সেই ঋজুতনুর বর্দ্ধিত তনু বলিয়া উক্ত হয়; ও সেই করের মূল-প্রান্ত হইতে যদি তাহার বিপরীত-দিক্‌বর্ত্তী আর-একটি কর প্রসারিত হয়, তবে উভয় করের সমষ্টি প্রথমোক্ত ঋজুতনুর দ্বিধা-বর্দ্ধিত তনু বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭৶০ ॥ কোন-একটি ঋজু-তনুর বর্দ্ধিত তনু হইতে পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু বর্জ্জিত হইলে সেই বর্দ্ধিত-তনুর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেই টুকু সেই বর্দ্ধিত তনুর বর্দ্ধিতাংশ বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭।০ ॥ কোন-একটি করের বর্দ্ধিত তনু যদি সেই করের মূল-প্রান্ত হইতে বহি-প্রান্তের মধ্য দিয়া প্রসারিত হয়, তবে সেই বর্দ্ধিত তনু সেই করের প্রবর্দ্ধিত তনু বলিয়া উক্ত হয়; আর, কোন একটি করের বর্দ্ধিত তনু যদি উহার বহি-প্রান্ত হইতে মূল প্রান্তের মধ্যদিয়া প্রসারিত হয়, তবে সেই

বর্দ্ধিত তনু সেই করের অপবর্দ্ধিত তনু বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৭।৵০ ॥ দুই বিভিন্ন আকর-হইতে যদি দুইটি কর প্রসারিত হয়, তবে উভয়ে ভিন্নাকর করদ্বয় বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৭।৶০ ॥ ভিন্নাকর করদ্বয়ের কোনটি বা কোনটির কোন প্রবর্দ্ধিত তনু বা কোনটির কোন অংশ যদি অন্যটির মূল-প্রান্তের মধ্য-দিয়া শেষোক্তের বহিপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে উক্ত ভিন্নাকর করদ্বয় পরস্পরের সমদিক্‌বর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৭।৷০ ॥ দুই ভিন্নাকর কর-দ্বয় যদি এরূপ হয় যে, উভয়ে পরস্পরের সমসূত্র-বর্ত্তী কিন্তু সমদিক্‌বর্ত্তী নহে, তবে উভয়ে পরস্পরের বিপরীত-দিক্‌বর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৭ ॥০ ॥ অসমসূত্রবর্ত্তী ঋজুতনুদ্বয়ের একটির কোন প্রান্তেতর আণব-অংশ যদি আর-একটিরও প্রান্তেতর আণব-অংশ হয়, তবে একটি আর-একটি-দ্বারা কর্ত্তিত বলিয়া উক্ত হয়, এবং উভয়ে সংকর্ত্তক ঋজুতনুদ্বয় বলিয়া উক্ত হয়; আর, উক্ত প্রান্তেতর আণব অংশ উভয়ের ছেদ-স্থান বলিয়া উক্ত হয়, ও সেই সঙ্কর্ত্তক ঋজুতনু-দ্বয় সেই ছেদ-স্থানে কাটাকাটি করে বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৭॥/০ ॥ অসমসূত্র-বর্ত্তী ঋজুতনুদ্বয়ের একটির কোন-একটি প্রান্তেতর আণব-অংশ যদি আর-একটির সমসূত্রের কোন একটি আণব-অংশ হয়, তবে শেষোক্ত ঋজুতনুর সমসূত্র পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু-দ্বারা কর্ত্তিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

মন্তব্য ॥ বর্ত্তমান সংজ্ঞানুসারে দাঁড়াইতেছে বটে যে, ঋজুতনুদ্বয় কাটাকাটি করিলেই তাহারা পরস্পরের সমসূত্র কর্ত্তন করে, কিন্তু এরূপ দাঁড়াইতেছে না যে, উভয়ে পরস্পরের সমসূত্র কর্ত্তন করিলেই উভয়ে কাটাকাটি করে; এরূপ হইলেও হইতে পারে যে, একটি আর একটিকে কর্ত্তন করে নাই অথচ একটি আর একটির সমসূত্র কর্ত্তন করিয়াছে। দুই ঋজুতনু কাটাকাটি করিলে উভয়ে ত পরস্পরের সমসূত্র কর্ত্তন করেই,অধিকন্তু উভয়ে কাটাকাটি না করিয়া পরস্পরের সমসূত্র কর্ত্তন করিলেও করিতে পারে ॥

১৭॥৵০ ॥ কোন-একটি অণু যদি দুইটি ঋজুতনুর উভয়েরই সমসূত্রবর্ত্তী হয়, তবে সেই অণু সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের মিলন স্থান বলিয়া উক্ত হয়; আর, সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের সমসূত্রবর্ত্তী কোন দুইটি ঋজুতনুর একটি সেই অণু-পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে তাহা আর একটির সহিত সেই অণু-স্থানে মিলিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৭॥৶০ ॥ যে-কোন অণুদ্বয়ের যোজক যে-কোন ঋজু-তনুর সমসূত্র কর্ত্তন করে, সেই অণুদ্বয়ই সেই ঋজুতনুর বিপরীত-পৃষ্ঠবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৭৷৷০ ॥ কোন একটি ঋজুতনুর সহতলবর্ত্তী অণু-দ্বয় যদি সেই ঋজুতনুর বিপরীত পৃষ্ঠবর্ত্তী না হয় তবে উভয়ে সেই ঋজু তনুর সমপৃষ্ঠবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয় ॥

অণু-স্থিত কোণ। ঋজুতনু-স্থিত কোণ। ঋজুতনুর সমদিক্‌-

বর্ত্তী এবং বিপরীত-দিক্‌বর্ত্তী কোণ-দ্বয়। ঋজুতনুর সমপৃষ্ঠবর্ত্তী এবং বিপরীত-পৃষ্ঠবর্ত্তী কোণ-দ্বয়। আনুবর্ত্তিক এবং বৈবর্ত্তিক কোণ-দ্বয়। এক ঋজুতনুর কোণে প্রসারিত আর-এক ঋজুতনু। অপরিহার্য্য রেখা-স্থিত শলাকা। দৃঢ়-কোণের একটি কর-কে আর একটি করের একপৃষ্ঠ হইতে আর-এক পৃষ্ঠে ঘুরাইয়া রাখা ॥ ১৮ ॥

১৮/০ ॥ যে-অণু যে-কোণের চঞ্চু সেই কোণ সেই অণুতে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হয়।

১৮৵০ ॥ যে-কোন ঋজুতনু যে-কোন কোণের একটি কর, সেই কোণই সেই ঋজুতনুতে কিম্বা সেই ঋজুতনুর বর্দ্ধিত তনুতে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮৶০ ॥ একটি ঋজুতনুস্থিত কোণের কোন একটি কর যদি সেই ঋজুতনুস্থিত আর একটি কোণের কোন-একটি করের সমদিক্‌বর্ত্তী হয়, তবে সেই ঋজুতনু-স্থিত কোণ-দ্বয় সেই ঋজুতনুর সমদিক্‌বর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়; আর উক্ত করদ্বয় যদি পরস্পরের বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী হয় তবে সেই কোণ-দ্বয় উক্ত ঋজুতনুর বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮।০ ॥ একই ঋজু তনুস্থিত দুইটি সহজ কোণের—একটির কোন-একটি বহিপ্রান্ত এবং আর-একটির কোন-একটি বহিপ্রান্ত—দুইটি বহিপ্রান্ত যদি উক্ত ঋজুতনুর সমপৃষ্ঠবর্ত্তী হয়, তবে সেই কোণ-দ্বয়ও উক্ত ঋজুতনুর সমপৃষ্ঠবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়; আর, যদি উক্ত বহিপ্রান্ত-দ্বয় উক্ত ঋজুতনুর বিপরীত-পৃষ্ঠবর্ত্তী হয়, তবে উক্ত কোণ-দ্বয়ও উক্ত ঋজুতনুর বিপরীত-পৃষ্ঠবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮।/০ ॥ একই ঋজুতনুস্থিত দুইটি সহজ কোণ যদি সেই ঋজুতনুর সমদিকবর্ত্তী এবং সমপৃষ্ঠবর্ত্তী হয়, তবে সেই কোণ-দ্বয় আনু-বর্ত্তিক কোণ-দ্বয় বলিয়া উক্ত হয়; আর একই ঋজুতনুস্থিত দুইটি সহজ কোণ যদি সেই ঋজুতনুর বিপরীত-পৃষ্ঠ-বর্ত্তী এবং বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী হয় তবে সেই কোণ-দ্বয় বৈবর্ত্তিক কোণদ্বয় বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮।৵০ ॥ যে-দুইটি ঋজুতনু যে-সহজ-কোণের কর-দ্বয়, সেই দুইটি ঋজুতনুর একটি আর-একটির সেই কোণে প্রসারিত, এবং সেই কোণে অবস্থিত,বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮।৶০ ॥ যে-কোন শলাকা এরূপে নিয়ন্ত্রিত যে, তাহা স্বস্থান অতিক্রমণ করিয়া অন্য কোন স্থানে গমন করিতে সমর্থ নহে, সে শলাকা অপরিহার্য্য-রেখা-স্থিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮৷৷০ ॥ কোন একটি দৃঢ় কোণের কোন একটি কর যদি অপরিহার্য্য রেখা-স্থিত হয় এবং তাহার আর একটি কর-কে যদি এরূপ একটি স্থানে ঘুরাইয়া রাখা যায় যে, তাহাকে সেই স্থানে ঘুরাইয়া-রাখা প্রযুক্ত তাহার বহিপ্রান্তের প্রয়াণ-স্থান এবং গম্যস্থান পূর্ব্বোক্ত করের বিপরীত পৃষ্ঠবর্ত্তী হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই বলা

যাইতে পারে যে, শেষোক্ত কর-কে পূর্ব্বোক্ত করের এক-পৃষ্ঠ হইতে আর এক-পৃষ্ঠে ঘুরাইয়া রাখা হইল ॥

সঙ্কর্ত্তক তনু-দ্বয়ের কোণ-চতুষ্টয়। পার্শ্ব-লগ্ন কোণ-দ্বয়। অসমসূত্রে প্রসারিত ঋজুতনু-দ্বয়। কর্ত্তক তনু এবং কর্ত্তিত তনু-দ্বয়। ঋজুতনু-দ্বয়ের কোণাষ্টক। ঋজুতনু-দ্বয়ের অন্তষ্কোণ এবং বহিষ্কোণ। সহবর্ত্তী অন্তষ্কোণ-দ্বয় ॥ ১৯ ॥

১৯/০ ॥ দুই ঋজুতনু কাটাকাটি করিলে উভয়ের ছেদস্থানে যে চারিটি সহজ-কোণ ফলিত হয়, সেই চারিটি কোণ উক্ত ঋজুতনু দ্বয়ের কোণ-চতুষ্টয় বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৯৵০ ॥ সঙ্কর্ত্তক ঋজুতনু-দ্বয়ের কোণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত যে-কোন কোণ-দ্বয় উক্ত ঋজুতনু-দ্বয়ের একটির সমপার্শ্ববর্ত্তী এবং আর-একটির বিপরীত-পার্শ্ব-বর্ত্তী সেই দুইটি কোণই পরস্পরের পার্শ্ব-লগ্ন বলিয়া উক্ত হয় ॥

মন্তব্য ॥ কোণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেরই দুইটি করিয়া পার্শ্ব-লগ্ন কোণ এবং একটি করিয়া বৈবর্ত্তিক কোণ বর্ত্তমান আছে ॥

১৯৶০ ॥ অসমসূত্রবর্ত্তী ঋজুতনু-দ্বয় যে খান-হইতে যেখানে প্রসারিত হউক্ না কেন, উভয়ে পরস্পরের অসমসূত্রে প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৯।০ ॥ দুইটি ঋজুতনু যদি তৃতীয় একটি ঋজুতনু দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তবে শেষোক্ত ঋজুতনু কর্ত্তক-তনু এবং পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু-দ্বয় কর্ত্তিত তনু-দ্বয় বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৯।/০ ॥ কোন একটি ঋজুতনুর দুই প্রান্তের মধ্য-দিয়া দুইটি সহতলবর্ত্তী ঋজুতনু পরস্পরের অসমসূত্রে প্রসারিত হইলে সেই দুইটি প্রান্ত-স্থানে যে চারিটি সহজ-কোণ ফলিত হয়, সেই চারিটি কোণ উক্ত ঋজুতনু-দ্বয়ের অন্তষ্কোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৯।৵০ ॥ দুইটি সহতল-বর্ত্তী ঋজুতনু তৃতীয় একটি ঋজুতনু-দ্বারা কর্ত্তিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু-দ্বয়ের দুইটি ছেদস্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া যে আটটি সহজ-কোণ ফলিত হয়, সেই আটটি সহজ-কোণ সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের কোণাষ্টক বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৯।৴০ ॥ কোন-দুইটি ঋজুতনুর কোণাষ্টকের মধ্য-হইতে সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের চারিটি অন্তষ্কোণ বর্জ্জিত হইলে যে চারিটি কোণ অবশিষ্ট থাকে, সেই চারিটি কোণ সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের বহিষ্কোণ বলিয়া উক্ত হয়। আর ঋজুতনু-দ্বয়ের অন্তষ্কোণ-দ্বয় বা বহিষ্কোণ-দ্বয়—ঋজুতনু-দ্বয়ের কোণাষ্টকের মধ্যস্থিত অন্তষ্কোণ-দ্বয় বা বহিষ্কোণ-দ্বয় বলিয়া উক্ত হয়।

১৯॥০ ॥ ঋজুতনু-দ্বয়ের অন্তষ্কোণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যে-কোন কোণ-দ্বয় কর্ত্তক-তনুর সমপৃষ্ঠ-বর্ত্তী, সেই দুইটিই সহবর্ত্তী অন্তষ্কোণ-দ্বয় বলিয়া উক্ত হয় ॥

ঋজুতনুর পার-দ্বয় এবং পার-দ্বয়ের প্রস্থ। পার-স্থিত ঋজুতনু। সহস্তর-দ্বয়, সহস্তীর্ণ ঋজুতনু-দ্বয়

এবং উভয়ের প্রস্থ। স্তরদ্বয় এবং স্তরাবলী ॥ ২০ ॥

২০/০ ॥ কোন-একটি ঋজুতনুর দুই প্রান্ত হইতে যদি আর দুইটি ঋজুতনু উহার ঋজুকোণে প্রসারিত হয়, তবে শেষোক্ত ঋজু-তনু-দ্বয়ের দুইটি সমসূত্র—পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনুর দুইটি পার বলিয়া উক্ত হয়; এবং পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু সেই পার-দ্বয়ের প্রস্থ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২০/০ ॥ কোন-একটি ঋজুতনুর দুইটি পারের যে-কোনটির যে-কোন তানব অংশ হউক্ না কেন, সেই তানব অংশ, বা সেই তানব অংশের অধিবস্তু, সেই পারে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হয়, এবং তাহা সেই পারের ঋজুতনু বলিয়া উক্ত হয় ॥

২০/০ ॥ যে-কোন ঋজুতনু হউক না কেন তাহার এক পারের ঋজুতনুমাত্রই তাহার অপর-পারের ঋজুতনুর সহস্তর বলিয়া উক্ত হয়; এবং সহস্তর-দ্বয়-মাত্রই পরস্পরের সহিত সহস্তীর্ণ বলিয়া উক্ত হয়; আর সেই পার-দ্বয়ের প্রস্থ সেই সহস্তর-দ্বয়েরও প্রস্থ বলিয়া উক্ত হয়।

২০৵০ ॥ দুইটি ঋজুতনুর একটি যদি আর একটির সহস্তর হয় তবে উভয়ে স্তরদ্বয় বলিয়া উক্ত হয়; আর, যদি দুয়ের অধিক ঋজুতনু এরূপ হয়, যে তাহাদের মধ্যেকার ঋজুতনু-দ্বয় মাত্রই পরস্পরের সহিত সহস্তীর্ণ, তবে সেই ঋজুতনুগুলি স্তরাবলী বলিয়া উক্ত হয় ॥

ঋজুধার ফলক ও তাহার ধার। ঋজুধার-ফলকের সন্নিহিত ধার-দ্বয়, সন্নিহিত ধার-ত্রয়, এবং সন্নিহিত কোণ-দ্বয়। ঋজুধার ফলকের অন্তষ্কোণ এবং বহিষ্কোণ ॥ ২১ ॥

২১/০ ॥ যে-কোন ফলক ঋজুতনু-পরম্পরা-দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা ঋজুধার ফলক বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১৵০ ॥ যে-কোন ঋজুধার ফলক যতগুলি ঋজুতনু দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহাদের এক একটি ঋজুতনু সেই ফলকের এক-একটি ধার বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১।০ ॥ কোন-একটি ঋজুধার ফলকের যে-কোন ধার-দ্বয় একই-কোন কোণের দুইটি কর, তাহার সেই ধারদ্বয়ই পরস্পরের সন্নিহিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১।০ ॥ ঋজুধার ফলকের যে-কোন ধার-ত্রয়ের কোনটি অবশিষ্ট দুইটির প্রত্যেকেরই সন্নিহিত, সেই ধারত্রয়ই সন্নিহিত ধারত্রয় বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১।/০ ॥ ঋজুধার ফলকের কোন সন্নিহিত ধার-ত্রয়ের মাঝেরটি অবশিষ্ট দুইটির যে-দুই কোণে প্রসারিত, সেই দুই-কোণ পরস্পরের সন্নিহিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১।৵০ ॥ ঋজুধার ফলকের সন্নিহিত কোণ-দ্বয়ের কোন-টি যদি সহজ কোণ হয়, আর, সেই কোণ-দ্বয় যদি সেই ফলকের কোন-একটি ধারের সমপৃষ্ঠবর্ত্তী হয়, তবে সেই কোণ-দ্বয়ের প্রত্যেকেই সেই ফলকের অন্তষ্কোণ, সংক্ষেপে কোণ, বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১।৶০ ॥ কোন-একটি ঋজুধার ফলকের অন্তকোণের করদ্বয়ের একটির অপবর্দ্ধিত তনুর বর্দ্ধিতাংশ আর-একটির যে-কোণে প্রসারিত হয়, সেই কোণ সেই ফলকের বহিঃকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

ত্রিকোণ। সমধার ত্রিকোণ। সমপার্শ্ব ত্রিকোণ। ঋজু ত্রিকোণ। তির্য্যক্ ত্রিকোণ। স্থূল ত্রিকোণ। তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ। ধারের সম্মুখবর্ত্তী কোণ এবং কোণের পার্শ্ববর্ত্তী এবং সম্মুখবর্ত্তী ধার। কোণ-কর্ত্তৃক উপহিত ধার, এবং ধার-কর্ত্তৃক উপহিত কোণ। ঋজু-ত্রিকোণের কর্ণ ॥ ২২ ॥

২২।০ ॥ যে ফলকের কোণ তিনটি মাত্র তাহা ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২৵০ ॥ যে ত্রিকোণের ধার-ত্রয় সমদীর্ঘ তাহা সমধার ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২৶০ ॥ যে ত্রিকোণের দুইটি মাত্র ধার সমদীর্ঘ তাহা সমপার্শ্ব ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২।০ ॥ কোন-একটি ত্রিকোণ যদি এরূপ হয়, যে তাহার একটি কোণ ঋজু-কোণ, তবে তাহা ঋজু ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয়; নচেৎ তাহা তির্য্যক্ ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২।৶০ ॥ কোন-একটি তির্য্যক্ ত্রিকোণ যদি এরূপ হয় যে, তাহার একটি কোণ স্থূল কোণ, তবে তাহা স্থূল ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয়, নচেৎ তাহা তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২।৶০ ॥ কোন একটি ত্রিকোণের যে দুইটি ধার সেই ত্রিকোণের যে-কোণ-টির কর দ্বয়, সেই দুইটি ধার সেই কোণের পার্শ্ববর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়, এবং অবশিষ্ট ধার সেই কোণের সম্মুখবর্ত্তী, ও সেই কোণ শেষোক্ত ধারের সম্মুখবর্ত্তী, বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২৶০ ॥ ত্রিকোণের কোণ-মাত্রই তাহার সম্মুখবর্ত্তী ধার-দ্বারা উপহিত বলিয়া উক্ত হয়, ও ত্রিকোণের ধার-মাত্রই তাহার সম্মুখবর্ত্তী কোণ-দ্বারা উপহিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২॥০ ॥ কোন-একটি ঋজু-ত্রিকোণের ঋজু কোণের সম্মুখবর্ত্তী ধার সেই ঋজু-ত্রিকোণের কর্ণ-বলিয়া উক্ত হয়।

চতুষ্কোণ। সংস্তর। সংস্তরের সম্মুখবর্ত্তী ধার-দ্বয় এবং সম্মুখবর্ত্তী কোণ-দ্বয়। সংস্তরের কোণাকোণি প্রসারিত ঋজুতনু। সংস্তরের কর্ণ। ঋজুসংস্তর। তির্য্যক্ সংস্তর। চতুরক, চৌকা ফলক কিংবা চক ॥ ২৩ ॥

২৩।০ ॥ যে ঋজুধার ফলকের কোণ চারিটি মাত্র তাহা চতুষ্কোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৩৵০ ॥ চতুষ্কোণের ধার-মাত্রই যদি উহার আর-একটি ধারের সহিত সহস্তীর্ণ হয়, তবে তাহা সংস্তর বলিয়া উক্ত হয় ॥

মন্তব্য ॥ স্তর, বিস্তার, আস্তরণ, সংস্তরণ প্রভৃতি শব্দ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বিস্তার শব্দে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এই দুই প্রকার আয়তনের সংঘাত বুঝায়। একটি শলাকার পৃষ্ঠে দ্বিতীয় একটি সমদীর্ঘ শলাকা, তাহার পৃষ্ঠে তৃতীয় একটি সমদীর্ঘ শলাকা ইত্যাদি ক্রমে যদি সমদীর্ঘ শলাকা-পরম্পরা স্তরে স্তরে সাজানো হয়, তাহা হইলে কুশাস্তরণের ন্যায় একটি আস্তরণ বিস্তারিত হয়,—তাহাই সংস্তর-শব্দের বাচ্য; এক স্থান হইতে আর-এক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তারিত এই অর্থে আস্তরণ,—কিন্তু যদি—ডাহিন হইতে বামে বিস্তৃত কিংবা বাম হইতে ডাহিনে বিস্তৃত—পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত বা উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত—ইহার প্রতি লক্ষ না করিয়া কেবল-মাত্র "বিস্তৃত" এই ভাবটির প্রতি লক্ষ করা যায়, তাহা হইলে সে অর্থে আস্তরণ শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্তরণ-শব্দের ব্যবহার সবিশেষ উপযোগী ॥

২৩৵০ ॥ সংস্তরের সহস্তীর্ণ ধার-দ্বয়-মাত্রই পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়; এবং সংস্তরের যে যে-কোণ যে-যে-কোণের সন্নিহিত নহে সেই-সেই-কোণ সেই-সেই-কোণের সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়; আর সংস্তরের দুইটি সম্মুখবর্ত্তী কোণের একটির চঞ্চু হইতে আর-একটির চঞ্চু পর্য্যন্ত প্রসারিত ঋজুতনু সেই সংস্তরের কোণাকোণি প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৩।০ ॥ কোন একটি সংস্তরের কোণাকোণি প্রসারিত ঋজুতনু, সেই সংস্তরের কর্ণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৩।৶০ ॥ কোন-একটি সংস্তর যদি ঋজু-কোণ-বিশিষ্ট হয় তবে তাহা ঋজু সংস্তর বলিয়া উক্ত হয়, নচেৎ তাহা তির্য্যক্ সংস্তর বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৩।৶০ ॥ যে-কোন ঋজু-সংস্তরের সন্নিহিত ধার-দ্বয় সমদীর্ঘ সেই ঋজু সংস্তর চতুরক, চৌকা-ফলক, বা চক বলিয়া উক্ত হয় ॥

চক্র। কেন্দ্র। পরিধি। ব্যাস। অর। ধনু। জ্যা ॥২৪॥

২৪।০ ॥ অর-শলাকার ঘূর্ণন-পরিসর চক্র বলিয়া উক্ত হয়; তাহার ঘূর্ণন-কেন্দ্র সেই চক্রের কেন্দ্র বলিয়া উক্ত হয়; তাহার বহিঃপ্রান্তের ঘূর্ণন পরিসর সেই চক্রের পরিধি বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৪৵০ ॥ কোন-একটি চক্রের পরিধির কোন-একটি আণব অংশ হইতে উক্ত চক্রের কেন্দ্রের মধ্য-দিয়া উক্ত পরিধির অন্য-একটি আণব-অংশ-পর্য্যন্ত যে-কোন ঋজুতনু প্রসারিত হয়, তাহা উক্ত চক্রের ব্যাস বলিয়া উক্ত হয়, এবং সেই ব্যাসের অর্দ্ধাংশ উক্ত চক্রের অর বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৪৶০ ॥ চক্রের পরিধির খণ্ডাংশ মাত্রই ধনু বলিয়া উক্ত হয়, এবং ধনুর প্রান্তদ্বয়ের যোজক—ধনুর জ্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥

সামতলিক বিষয়ের সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ। সজাতীয় এবং বিজাতীয় একমাত্রা। তানব

এবং বিস্তৃত এক মাত্রা। বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ের বিভিন্ন জাতীয় এক মাত্রা ॥ ২৫ ॥

২৫/০ ॥ যে-কোন তনুদ্বয় হউক্ না কেন, উভয়ে পরস্পরের সজাতীয় বলিয়া উক্ত হয, তেমনি আবার, যে কোন ফলকদ্বয় হউক্ না কেন উভয়ে পরস্পরের সজাতীয় বলিয়া উক্ত হয ; কিন্তু তনু এবং ফলক—উভয়ে পরস্পরের বিজাতীয় বলিয়া উক্ত হয ॥

২৫৵০ ॥ যে-কোন ঋজুতনুকে এক বলিয়া ধার্য্য করা যায়. তাহা তনুমাত্রেরই সজাতীয় একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয়, এবং তাহা ফলক মাত্রেরই বিজাতীয় একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয ; আর, তনুর একমাত্রা তানব একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয ॥

২৫৶০ ॥ যে-কোন চতুরকের প্রত্যেক ধার তানব একমাত্রা সেই চতুরক—ফলক মাত্রেরই সজাতীয় একমাত্রা এবং তনুমাত্রেরই বিজাতীয় একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয ; আর ফলকের সজাতীয় একমাত্রা বিস্তৃত একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয ॥

মন্তব্য ॥ আধিষ্ঠানিক (অর্থাৎ স্থান মান-ঘটিত) একমাত্রা তিন জাতীয়—তানব বিস্তৃত এবং সংহত। সংহত একমাত্রা বর্ত্তমান প্রস্তারের অধিকার-বহির্ভূত ॥

২৫০ ॥ যে-কোন বিষয় হউক্ না কেন তাহার সজাতীয় একমাত্রাই তাহার একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয ॥

মন্তব্য ॥ যেখানে ফলকের কথা হইতেছে সেখানে "'এক" বলিলে বিস্তৃত একমাত্রা বুঝাইবে, যেখানে তনুর কথা হইতেছে সেখানে "এক" বলিলে তানব একমাত্রা বুঝাইবে ; যেখানে দুয়েরই কথা হইতেছে সেখানে দুইই বুঝাইবে, কিন্তু সেখানেও তনুরই সম্বন্ধে কেবল তানব একমাত্রা বুঝাইবে ও ফলকেরই সম্বন্ধে কেবল বিস্তৃত একমাত্রা বুঝাইবে ॥ ইতি সংজ্ঞা সমাপ্ত ॥

ক্রমশঃ।

বর্ষ।

বর্ষ সন্ধ্যা।

(১)

রাত আসে দিন যায়
মধুময় সন্ধ্যায়
মরুভূমি মাঝে শ্রান্ত পথিক যেমন
দেখে তার চারিধারে
দিগন্তের সীমা পারে
তারকা-কুসুম-পুরী হতেছে সৃজন
অমনি আকুল প্রাণে
চেয়ে থাকে তার পানে
মনেতে বড়ই সাধ কাছে তার যায়,
তপ্ত বালি বাজে পায়,
দূরে ছুটে যেতে চায়,
ফিরে দেখে সেই স্থান নাহি যে ছাড়ায়।
সংসার মরুতে বসে মানব পথিক
বরষের সন্ধ্যাকালে দেখে চারিদিক,
ভূত ভবিষ্যৎ কোলে
সুখ আশা দলে দলে
ফুটিয়া রয়েছে চেয়ে দেখে অনিমিখ।
ফুলের বিছানা যদি পাতে বর্ত্তমান,
তবু তাহে সুখ নাহি, ব্যথিত পরাণ।
কণ্টকে বিঁধিছে দেহ
সে ফুল চাহে না কেহ
কেমনে খুলিবে কাঁটা জানে না সন্ধান।
বর্ত্তমান ছাড়াইয়া যে দিকেই চাও।
কত ফুল আছে ফুটে দেখিবারে পাও।

কণ্টক নাহি সে ফুলে না পড়ে টুটিয়া।
চিরকাল নব হয়ে থাকে যে ফুটিয়া।
তাইরে আকুল প্রাণে
চাহি গতবর্ষ পানে,
নব-বরষেরে ডাকি অধীর হইয়া।
অশ্রু ফেলি এক তরে,
অন্যে ডাকি সমাদরে
একেতে পুরাণ সুখ আর একে আশ,
ঢালিছে হৃদয়ে স্মৃতি
দুঃখময় সুখ অতি,
ভবিষ্য ভাবিয়ে হৃদি হাসে সুখ হাস।

(২)

গত বর্ষ।

এই ছিল নাই হেথা
পরাণে বাজিল ব্যথা
দেখিতে না পাই আর চোদিক চাহিয়া
চোখের উপর দিয়া
ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া
অনন্তের কোলে বর্ষ গেল মিলাইয়া।
কুসুম শুখালে পরে
কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে
ভাসিয়া বেড়ায় তার সৌরভ যেমন।
যায় যায় তবু হায়
পাছু পানে ফিরে চায়
মায়া ডোর আছে তার বেড়িয়া চরণ।

গতবর্ষ উপছায়া
না পারি ত্যজিতে মায়া
বর্ষের সমাধি পরে বেড়ায় ঘুরিয়া,
এক কায় এক মন
দোঁহে ছিল একজন
ছায়ারে ফেলিয়া কোথা গেল সে সরিয়া ?

* * * *

চেয়ে থাকি আনমনে
অতীত জীবন পানে
অতীতের ছবিগুলি পড়ে সব মনে,
সেই অশ্রু সেই হাস
কত কি কত কি আশ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত কথা আসেরে স্মরণে।
সেই সে পুরাণ গান
সেই মান অভিমান
স্বপ্নমত ছায়ামত জাগেরে হৃদয়ে।
হায় কোথা গেল তারা
কোথায় হ'লরে হারা
অনন্তের কোন রাজ্যে গেলরে মিশায়ে।
বরষের আগমনে
কত আশা ছিল মনে
কতই নূতন শিক্ষা শিখিব জীবনে !
নীরব ভাষাতে বর্ষ
ঢালিছ যে জ্ঞানজ্যোতি,
ভেবেছিনু এইবার লভিব যতনে।
তুমি হে বরষবিন্দু,
কাল সে অনন্ত সিন্ধু,
অনন্তের সাথে তোর হৃদয় বন্ধন,
ক্ষুদ্র পরাণটী দিয়া
ব্যাপিলি অনন্ত হিয়া
অনন্তের সাথে হলো অনন্ত মিলন।

ভেবেছিনু এই শিক্ষা
নরনারী লবে ভিক্ষা—
জগতের প্রাণে প্রাণে হবে এক প্রাণ,
রহিবে না হিংসা দ্বেষ,
যাবে সব দুঃখ ক্লেশ,
ক্ষুদ্র যত মিলে গিয়ে হইবে মহান।
কই সে পুরিল আশা!
বিশ্বব্যাপী ভালবাসা
কই চারিদিক করে পরিমলময় !
তেমনি যে স্বার্থভরে
বসুন্ধরা হাহা করে,
নয়নের জল তার অবিরত বয়।
বরষের আগমনে
কত আশা ছিল মনে,
বরষ গেলরে তবু মিটিল না হায় !
শুধু আশা-ক্ষণপ্রভা
ক্ষণ তরে দিল দেখা
ম্লান হৃদে হাসিরাশি ফুটাইল তায়।
বর্ষ অবসান হ'ল
সে স্বপন মিলাইল,
আবছায়া শুধু তার অঙ্কিত পরাণে।
মরুমাঝে মরীচিকা,
শ্মশানে আলেয়া আলো,
স্বপনেই সুখ শুধু দুর্ব্বল জীবনে।
শুন তবে বর্ষ অয়ি,
অতীতের স্মৃতিময়ী,
সুখময় স্বপ্নগুলি রেখে যাও মনে,
অতীতের পানে চেয়ে
সুখেতে হাসিবে হিয়ে
মনেতে আঁকিব ছবি উজ্জ্বল বরণে—
অতীতের মোহমায়া
পড়িবেক ছায়া ছায়া
দুঃখময় কষ্টময় জীবনে আমার
আর কি কহিব তবে,
বিদায় লইতে হবে,
মাঝে মাঝে এস এই আবাসে তোমার !

(৩)

নববর্ষ।

ওই যে রে হেসে হেসে
নববর্ষ নব বেশে
বর্ষ চক্রে আর বার আসিল ফিরিয়া,
নয়নে সুখাশ্রু রাশি
অধরে সুখের হাসি
ফুলময় আশা-ডালা করেতে ধরিয়া।
কি জানি কি জানে ভাষা,
(ও) নীরবে কি দেয় আশা,
আদর করিতে তারে সবে আসে ছুটি,
কচি কচি ফুলগুলি
বাতাসেতে হেলি দুলি
তারে দেখে অত কেন হেসে কুটি কুটি,
পাখীগুলি গাহে গান
আনন্দে খুলিয়া প্রাণ,
তারি অভ্যর্থনা গীত গাহেরে হরষে,
আশে পাশে বায়ুগুলি
করে সবে কোলাকুলি,
আদরে ডাকেরে তারা নূতন বরষে,
ধরাসনে ধরাবাসী
সুখের সাগরে ভাসি
নব বর্ষে নব আশে হরষে অধীর,
জেগেছে নূতন প্রাণ
জেগেছে নূতন গান
চারিদিক হ'তে বহে উচ্ছ্বাস সমীর।

সহসা একি এ হায়,
কোথায় মিশায়ে যায়
কোথায় মিশাল সবে কোথায়—কোথায় !
হাসি আশা হর্ষ যত
অশ্রুজলে পরিণত
দেখিতে দেখিতে সবি অঙ্কুরে শুখায়।
সেই শোক সেই তাপ সেই অশ্রুধার
বরষের আরম্ভেই কেন রে আবার ?
কি শিক্ষা কঠোর অতি
দাও বর্ষ মহামতি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোক তাপ মুছিয়া ফেলিয়া,
মহান উদ্দেশ্য ধরি
বাধা অতিক্রম করি
সবলে চলিতে হবে মানব হইয়া ?
অনন্ত প্রেমের নীরে
হৃদি প্রেম বিন্দুটীরে
মিশালে, ঘুচিয়া যাবে দুখ-অশ্রু-জল
মানব জীবন সত্য হইবে সফল ?

শ্রীহিরন্ময়ী দেবী।

ভাউ সাহেবের বখর।

এই প্রকারে ক্ষেত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। গোকুলের নিকটবর্ত্তী গোঘাট (শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইয়া গরুদের এই ঘাটে জলপান করাইতে আনিতেন এই নিমিত্ত গোঘাট নাম) বলিয়া একটি স্থান আছে, সেইখানে যমুনা তীরে দুরাণীরা শিবির সংস্থাপন করিল। বন্দী গাজুদীখানের তাঁবু নদীর তীরেতেই ছিল; চারিদিকে রোহিলা-প্রহরী নিযুক্ত ছিল, নদীর জল গভীর বলিয়া নদীর দিকের প্রহরীরা ততটা সতর্ক-ভাবে থাকিত না। গাজুদীখান বিলক্ষণ সন্তরণ-নিপুণ ছিলেন। তিনি একদিন সুযোগ পাইয়া নদীতে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে আগ্রার কিল্লা ৭ ক্রোশ। নদীর মধ্যস্থান দিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ সাঁতার, কিছুক্ষণ বিশ্রাম এইরূপে আগ্রার কিল্লার নিকটে আসিলেন। তখন রাত্রির চারি ঘটিকা অবশিষ্ট, গাজুদীখান অনাবৃত দেহে, অনাবৃত মস্তকে দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। শত্রুর ভয়ে দুর্গও সতর্ক ছিল। দ্বাররক্ষককে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি গাজুদীখান, শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তোমাদের শরণাপন্ন হইতেছি, আজিকার দিন আমাকে দুর্গ মধ্যে গ্রহণ করিয়া আমায় প্রাণদান দাও, এই কথা কেল্লাদারকে গিয়া বল।" কিল্লাদার এই সংবাদ পাইবা-মাত্র দ্বারের খিড়কী উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মশাল-হস্তে বাহিরে আসিলেন।

আগ্রার কেল্লা যমুনার তীরে। এক দিকে যমুনার প্রবাহ, অপরদিকে নির্ম্মিত পয়োপ্রবাহ। নির্ম্মিত পয়োপ্রবাহের দুই মুখ যমুনার সহিত মিলিত, এই নিমিত্ত তাহাতে অতল জল। দ্বারের সম্মুখ ভাগ হইতে পয়োপ্রবাহের উপর তক্তা ফেলিয়া দিলে যাতায়াত করা যায়, তক্তা উঠাইয়া লইলে কেল্লা প্রবেশ-চেষ্টা বৃথা। কেল্লা প্রবেশ অসাধ্য। একের পর এক এই প্রকার পাঁচটি পরিঘা, প্রতি পরিঘায় দুই শত তোপ এবং তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্র, সর্ব্বসমেত বার শত তোপ। এ কেল্লা অতীব দুর্গম। ভূমিস্থ কেল্লা আগ্রার তুল্য আর কোথাও নাই। আকবরশাহ পাতশাহ এই কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া তৎকালে যে কেল্লাদার যন্ত্রধারী গোলন্দাজ প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদেরই বংশপরম্পরা কেল্লাতে বাস করিয়া আসিতেছে। তৎপরে মহাবীর ওরঙ্গজেব আদি অনেক পাতশাহ হইয়াছেন, মরাঠাদেরও প্রবলতা হইয়াছে, আটক পর্য্যন্ত দেশ জয় করা হইয়াছে। কিন্তু কেল্লা কেহই প্রাপ্ত হন নাই। যিনি আগ্রার স্বামীত্ব করিবেন দুর্গমধ্য স্থিত লোক

দিগের ভরণপোষণের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত। আকবরশাহ পৃথ্বী দিগ্বিজয় পূর্ব্বক ধনরাশি সংগ্রহ করিয়া যে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এমন নহে। তিনি এক অওলিয়া ফকিরের নিকট হইতে এক প্রকার রসায়ন বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। সেই রসায়ন বিদ্যা সম্ভূত দ্রব্য দ্বারা এই অসাধ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বারুদ-গোলা-যন্ত্রের সাহিত্য ইহার মত আর কোন কেল্লাতে নাই।

কিল্লাদার আসিয়া গাজুদীখানের পরিচয় লইলেন। দেখিলেন সত্যই গাজুদীখান। প্রাণদান প্রার্থনা করিলে কিল্লাদার বলিলেন, "আমি কিল্লাদারী পাইয়া অবধি কোন পরকীয় ব্যক্তিকে আসিতে দিই নাই।" গাজুদীখান উত্তর দিলেন "তোমার উপর নির্ভর করিয়া পথে বাহির হইয়াছি। এক্ষণে হয় তুমি আমাকে স্বহস্তে বধ কর নতুবা দুর্গ মধ্যে স্থানদান কর।" কিল্লাদার ভাবিলেন, "একজন পুরুষকে দুর্গমধ্যে লইলে কি আর হইবে? এ সময়ে ইহাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত।" কেল্লার মধ্যে লইলেন ও বস্ত্রাদি দিয়া সান্ত্বনা করিলেন। এদিকে গাজুদীখান পলায়ন করিয়াছে বলিয়া গোলযোগ উঠিল। নজীবখান প্রহরীদিগের শিরচ্ছেদ করিলেন। অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। গাজুদীখান আগ্রার কেল্লায় আশ্রয় লইয়াছে শুনিয়া অবদুলঅল্লী কুচ করিয়া যমুনা পার হইলেন। দুর্গ সন্নিকটে শিবির সংস্থাপিত হইল। পাঁচজন গিলচ্যা কিল্লাদারের নিকটে পাঠাইলেন আর লিখিয়া দিলেন, "গাজুদীখানকে আমার হস্তে সমর্পণ কর এবং কেল্লা খালি করিয়া দেও। নতুবা আমি কান্দাহারের পাতশাহ অবদুল অল্লী, আমি কেল্লা খুঁড়িয়া যমুনায় ফেলিব, তোমার শিরচ্ছেদ করিয়া তোমার স্ত্রীপুত্র হাঁড়ি মুচিকে বিলাইয়া দিব।" কিল্লাদার পত্র পাঠ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "শুনিতে পাই অবদুল অল্লী পাতশাহ অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তবে তিনি কেন এই প্রকার লিখিলেন। ইহাঁর প্রভু নাদিরশাহা আসিয়া কি করিয়াছিলেন? ইনি আবার কি করিবেন? তথাপি সাবধান হওয়া আবশ্যক।" কিল্লাদার সন্ধান লইয়া জানিলেন নগর একেবারে জনশূন্য, লোকেরা স্বস্বধন সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু বস্তীতে লোক আছে। মনে মনে বিবেচনা করিলেন গিলচ্যাদের যদি তাড়াইয়া দিই তাহা হইলে দিল্লি ও মথুরার যে দশা ঘটিয়াছে আগ্রারও তাহাই হইবে।" দুই জন গিলচ্যাকে দ্বারে রাখিয়া অপর তিনজনকে পাঠাইলেন আর লিখিয়া দিলেন, "পাতশাহ চারি দিবস কৃপা করুন, চতুর্থ দিবসে কেল্লা খালি করিয়া দিব, গাজুদীখান উজীরকেও হাজির করিব।"

এদিকে কিল্লাদারের অনুরোধে চারিদিনের মধ্যে সমস্ত শহর, বস্তী একেবারে দীপশূন্য হইল। আগ্রাতে একটি কুকুর পর্য্যন্ত রহিল না, মনুষ্য কি প্রকারে থাকিবে? কিল্লার যে ভাগ গিলচ্যাশিবিরের সম্মুখীন সেই দিকে চারি শত তোপ,

বারুদ, গোলা প্রভৃতি সজ্জিত হইল। তখন কিল্লাদার অবদুল অল্লীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আজ আমাদের আনন্দের দিন, শীঘ্র কুচ করুন নতুবা তোপ অগ্নি সংযুক্ত হইবে।" দ্বারস্থ এক গিলচ্যাকে পত্র সহিত পাঠাইলেন, অপরকে তোপের মুখে দিয়া উড়াইলেন। অবদুল অল্লী ও নজিবখান এই সংবাদ পাইয়া মণিবন্ধ চিবাইয়া কেল্লা আক্রমণার্থ সৈন্য সজ্জিত করিলেন। কিল্লাদার চারি শত তোপে একেবারে অগ্নি সংযোগ করিলেন। সৈন্য মধ্যে একেবারে চারি শত গোলা পড়াতে মহা প্রলয় উপস্থিত হইল। সমস্ত সৈন্য পলাইতে লাগিল, দুই তিন ক্রোশ যাইয়া তবে হাঁপ ছাড়িল, কিন্তু পলাতক, গোলার আঘাতে সেখানেও তিষ্ঠিতে পারিল না, পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিল। অবদুলঅল্লী নজীবখানের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন. নজীবখান উত্তর দিলেন "আগ্রার কিল্লা বৃহৎ, এখানে কোন চেষ্টা সফল হয় না। এদিকে শুনা যাইতেছে যে রঘুনাথ রাও ও মলহার রাও সসৈন্যে নর্ম্মদার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এ সময়ে এখানে যুদ্ধে জড়িত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।

অবদুল অল্লী কুচ করিয়া কুঞ্জেরী অভিমুখে চলিলেন। সুরজমল্ল জাটকে লিখিলেন "ক্রোর টাকা কর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে।" সুরজমল্ল রূপরাম কটাকীকে ডাকিয়া বলিলেন "কন্দাহারের পাতশাহ অবদুল অল্লী আসিতেছেন, তিনি সামান্য লোক নহেন। তাঁহাকে কি উত্তর দেওয়া যাইবে?" রূপরাম কটাকী বড়ই রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বলিলেন, "মরাঠী সেনা নর্ম্মদা পার হইয়াছে, এসময়ে ইহাঁরা যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন না। মেজবালী বলিয়া দশ লক্ষ টাকা দিলে গ্রহণ করে তো উত্তম, নহিলে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হওয়া যাউক। সম্ভবতঃ মরাঠী সেনা তত দিনে আসিয়া পৌঁছিবে।" এই পরামর্শ সুরজমল্ল জাটের মনোনীত হইল। অবদুল অল্লীকে লিখিলেন, "দশ লক্ষ টাকা মেজবালী দিতেছি, ইহা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রসন্নভাবে চলিয়া যাউন। নতুবা আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছি।" অবদুল অল্লী পত্র পাইয়া মরাঠীদের ভয়ে দশ লক্ষ টাকা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন, এবং পত্র দ্বারা সদ্ভাব বিনিময় করিয়া দিল্লি চলিয়া গেলেন।

সুজাউদ্দৌলাকে উজিরী পদ দেওয়া ও তৈমুরসাহকে সিংহাসনে স্থাপন করা আপাততঃ স্থগিত রহিল। অবদুল অল্লী ভাবিলেন, "নজীবখান তো কুলাঙ্গার। যাহার দ্বারা প্রতিপালিত তাহারই এই দশা করিল। ইহার ভরসায় আমার পুত্রকে এখানে রাখিয়া যাওয়া উচিত হয় না।" ইহা মনে মনে স্থির করিয়া নজীবখানকে এইরূপে বুঝাইলেন, "আপাততঃ আমি কন্দাহারে যাইতেছি। আগামী বৎসরে আসিয়া সমস্ত বন্দবস্ত করিব। তোমার ইচ্ছা হয় তো দিল্লির কেল্লা রক্ষা কর।" এই বলিয়া নজীবখানের সহিত পাঁচহাজার

সৈন্য রাখিলেন। মনকা জমানী, চন্দা জমানী ও তৈমুর সাহকে সরহিন্দেতে রাখিয়া তাঁহাদের নিকটে সৈমুদখান কতলরাজের সহিত বিশহাজার সৈন্য দিয়া অবদুল অল্লী কন্দাহারে গেলেন।

রাজশ্রী রঘুনাথ দাদা ও মলহাররাও আস্তে আস্তে আসিতেছিলেন, তাঁহারা এই সংবাদ পাইয়া মজল, দর মজল চলিয়া চমেলী পার হইয়া আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইলেন। এ দিকে অন্তাজী মানকেশ্বর শিন্দেকে এইভাবে পত্রের পর পত্র পাঠাইতে লাগিলেন, "হিন্দুস্থান হস্তচ্যুত হইল শীঘ্র ফৌজ-বন্দী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হউন।" এই হেতু তখন লালবন্দীর কাল না হইলেও শিন্দে চল্লিশ হাজার ফৌজকে লালবন্দী দিলেন। প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিতেছেন এমন সময়ে দিল্লির উকীলের পত্র আসিল যে, "দুরাণী সসৈন্যে দেশ বহির্ভূত হইয়াছে। রাজশ্রী রঘুনাথ দাদার ফৌজ চমেলী পার হইয়াছে। তুমি আসিবার জন্য ব্যস্ত হইও না।" পত্র পাইয়া শিন্দে চতুর্মাস বর্ষাকাল বিশ্রাম করিলেন। এ দিকে রাজশ্রী দাদা সাহেব আগ্রার নিকটে আসিয়া সুরজমল্ল জাটের নিকট হইতে কর গ্রহণ পূর্ব্বক আগ্রা হইতে গাজুদীখানকে বাহির করিয়া আপনার নিকটে আনিলেন। তথা হইতে মজলদর মজল কুচ করিয়া দিল্লি পৌঁছিলেন। সহরের বিনাশ কাল উপস্থিত। যিনিই হউন আসিয়াই প্রথমে বস্ত্রাপহরণ করিয়া পরে অন্য যে কোন কাজ থাকে করেন। সহরের সত্য নাশ করিয়া কেল্লা বেষ্টন করিলেন। নজীবখান দুর্গ মধ্য হইতে পোনের দিন যুদ্ধ করিলেন। বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, "মরাঠীরা ছাড়িয়া যাইবে না আর এখন অবদুল অল্লীর বলও নাই। এখন কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতে হইবে।" উকীল দিয়া গোপনে মলহার রাওকে বলিয়া পাঠাইলেন "আমি তোর ধর্ম্ম পুত্র, আমাকে বাঁচাও। শরণাগতের মরণ চিন্তা করিবেক না। ইহাই সমর্থদিগের উচিত।" মলহাররাও বড়ই সাভিমানী। তাঁর জেদ হইল যে, "নজীব খান ধর্ম্ম পুত্র হইল তখন তাহাকে বাঁচাইতে হইবে।" তিনি রাজশ্রী দাদা সাহেবের নিকটে যাইয়া, নানা প্রকারে তাঁহাকে লওয়াইয়া অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। দাদাসাহেবের মনে হইল যে, নজীবখান বিশ্বাসঘাতক কুলাঙ্গার, ইহার প্রাণ রক্ষা করা উচিত নহে, কিন্তু তিনি মলহররাওয়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। মলহাররাও নজীবখানকে কিল্লা হইতে বাহির করিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন। পরে অলম শাহকে সিংহাসন, গাজুদীখানকে উজীরী, অন্তাজী মানকেশ্বরকে নগর দুর্গ রক্ষণ কার্য্য দিয়া, পূর্ব্ববৎ বন্দবস্ত করিয়া কুরুক্ষেত্রে গিয়া পৌঁছিলেন।

তথায় যথা পদ্ধতিতে তীর্থবিধি করিয়া, তুলাদান দিয়া সরহিন্দে উপনীত হইলেন। শ্রীমন্তের উৎকর্ষ কাল। সৈমুদখান কতলরাজ মুখ না দেখাইয়াই লাহোরাভিমুখে পলায়ন করিল, পথে পেল্‌টারীতে লুটিয়া

লইল। মরাঠী সেনা মজলদর মজল শতদ্রু, ব্যাসগঙ্গা ও চিনাব উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরে উপনীত হইলেন। তথায় সুভা সন্দীপবেগ ছিলেন, দুরাণী তাঁহাকে মারিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্র কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সন্দীপবেগের পুত্রকে কারামুক্ত করিয়া পাঁচহাজার ফৌজের সহিত তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সন্দীপবেগের লক্ষ্মী নারায়ণ নামক এক দেওয়ান ছিলেন তিনি জাতিতে কায়স্থ, অতীব কৃতি লোক,—লাহোর তাঁহার অধীন করিয়াদিলেন। পরে পঞ্জাব, মুলতান, অটক পর্য্যন্ত দেশ জয় করিয়া ঢাল পশ্চাতে ফিরাইলেন। লুটেতে পেল্‌টারী ও লস্কর কুবের হইল। রঘুনাথরাও ও মলহাররাও মহান যশ সম্পাদন করিলেন। সে বৎসর গৃহেতেই বাস করিলেন।

রাজশ্রী নানা সাহেবের বন্দেগান অল্লী নিজাম উলমুলুখের সহিত কোন কারণে মনান্তর ঘটিল। সে সময়ে রাজশ্রী নানা সাহেব রাজশ্রী শিন্দেকে গিয়া বলিলেন, "হিন্দুস্থানে তুমি অনেক বীরত্ব করিয়াছ। মারয়াড়ি রাঠৌড়ের মত লোকের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছ। ইহা আমি কানে শুনিয়া মাত্র তৃপ্ত হইয়াছি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখি নাই। এক্ষণে মোগলেতে আমাতে মনান্তর ঘটিয়াছে। আমার অধিকাংশ সৈন্য দাদাসাহেবের সহিত গিয়াছে। তুমি অবদুলঅল্লীর গুজব শুনিয়া সৈন্য প্রস্তুত রাখিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার ভরসায় নিশ্চিন্ত আছি। এ বৎসরের মন্ত্রণার ভার তোমার উপরে।" শিন্দে শূর ও জিষ্ণু, নানা সাহেব এইরূপ বলিবা মাত্র তিনি সেনা-সহ দশহরা করিয়া ঔরঙ্গাবাদে যাইয়া নবাবের সম্মুখীন হইলেন। নবাবের সৈন্য সেনাপতি সকলিই মরাঠী, ব্যাঙ্কট্‌রাও নিম্বাল কর, জানবা নিম্বালকর, গোপাল সিং রাজা খন্দার কর, ইব্রাম খান গারদী প্রভৃতি। এক যাধব রাওয়ের অধীনেই ত্রিশ সহস্র ফৌজ ছিল। শিন্দের সেনা সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু মোগল বাহির হইলেন না। তাঁহার ভয় হইল যে তাঁহার মরাঠী সেনা পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মরাঠী সেনা তাহা বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেক আমাদের প্রতি নবাবের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ভাল নহে। যুদ্ধ করিতেই হইবে" এই বলিয়া সজ্জিত হইয়া নগরের বাহিরে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইলেক। দত্তাজী শিন্দে, জনকোজী শিন্দে, নানা সাহেবের পুত্র বিশ্বাসরাও ইহাঁরাও অগ্রসর হইলেন। নবাব নিজাম অল্লীও প্রস্তুত হইলেন কিন্তু তিনি ইহাতে না মিশিয়া দূরে থাকিয়া তামাশা দেখিতে লাগিলেন। তিন দিকে যুদ্ধ বাধিল, দত্তাজী শিন্দের সহিত জানবা নিম্বাল কর, জনকোজী শিন্দের সহিত ব্যাঙ্কট্‌রাও নিম্বালকর, অপর ওমরাওদের বিশ্বাস রাও আক্রমণ করিলেন। ব্যাঙ্কট্‌-নিম্বালকরের ভগিনীর সহিত জন-কোজীর বিবাহ হইয়াছিল। স্বসম্পর্কীয়দিগের সহিত সর্ব্ব প্রকারে আত্মীয়তা রক্ষা করিবে কিন্তু তজ্জন্য ক্ষত্র-ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে

না, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া উভয় পক্ষীয় মরাঠীরা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ব্যাঙ্কট্‌রাওয়ের ভগিনীপতি ও জনকোজীর ভায়রাভাই রাজশ্রী নাগোজীমানে ক্ষসবড়কর সমস্ত সৈন্য অতিক্রম করত জনকোজীকে আসিয়া আক্রমণ করিলেন। জনকোজীর নিকটে বন্দুকধারী অশ্বারোহী সৈন্য অনেক ছিল, তিনি তাহাদের চালাইয়া দিলেন। নাগোজী গোলার ঘায়ে ঠায় মারা গেলেন। এ গৈবী-মার হইল। ঈশ্বর তাঁহার মনে যথেষ্ট সাহস দেন নাই। অস্তু। ইহলোকে কীর্ত্তি করিয়া পরলোক সাধন করিলেন। নাগোজীমানের মৃত দেহ বাহির করিয়া লইল। সন্ধ্যাকাল হইল। ভগিনীপতির নিমিত্ত ব্যাঙ্কট্‌রাও পরম দুঃখিত হইলেন। স্ত্রী পুত্রেরাও সঙ্গে ছিলেন, মায়াজালে সকলেরই অত্যন্ত দুঃখ হইল। তাঁহার দেহ সৎকার করা হইল। নবাব বন্দেগান অল্লী শিবিরে আসিয়া দত্তাজী মানেকে সান্ত্বনা করিলেন। তখন নবাবের মনের সন্দেহ দূর হইল।

রাজশ্রী রামচন্দ্র মাধবরাও পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহ নবাবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত দ্রুত আসিতেছেন, দত্তাজী শিন্দে এই সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহার প্রতি দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উভয় সৈন্য সাক্ষাৎ হইতে না হইতেই রামচন্দ্র মাধবরাও শিন্দখেড়াকে আশ্রয় স্বরূপ করিয়া সেই খানেই রহিলেন। নিত্য নিত্য যুদ্ধ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। জলাভাবে মাধবরাও দিন দিন কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। নিজাম উলমুলুক ইহা জানিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে তোপচক্র রচনা করিয়া বাহির হইলেন। অনেক মোগল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ইহাঁর মত যোদ্ধা কেহই হয় নাই। এ দিকে নানা সাহেবের পক্ষীয় গোপালরাও রাস্তে ও পঁবার এবং অন্যান্য সেনা আসিয়া শিন্দের সহিত একত্রিত হইল। মধ্যে মোঁগল, মরাঠী সেনা তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ কলহ করিতে করিতে দুই ক্রোশ চলিয়া শিন্দখেড়ায় উপস্থিত হইল। স্বয়ং নানা ও ভাউও তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সে দিবস দত্তাজী শিন্দে জেদভরে নিজে রণ ভূমির মধ্যস্থলে থাকিয়া জেলালা, সুতারনালা, হস্তনালা ও তোপ মারিতে আরম্ভ করিলেন। মোঁগল সৈন্যের ঘোড়া, মনুষ্য পলাইতে লাগিল। নবাব বন্দেগান অল্লী তাহাতে বিষাদিত হইয়া রণ মধ্যস্থলে হাওদা চালাইলেন। তৎকালে উভয় পক্ষীয় যন্ত্র ধ্বনি এই প্রকার হইল যে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। ধূলির অন্ধকারে কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। দত্তাজী শিন্দে রাগোন্মত্ত বন বরাহের মত হইয়া উঠিলেন। ভাউসাহেবের নেত্র সন্তোষ পাইল। প্রশংসা করিয়া বলিলেন "দত্তাজী শিন্দের পৌরুষ অসীম। যেমন কর্ণে শুনিয়াছিলাম তদনুরূপ কার্য্যে দেখাইল।" ইহা বলিয়া বিষম সঙ্কটে দত্তাজী শিন্দেকে বাহির করিয়া লইলেন। প্রায় দুই শত প্রধান প্রধান ব্যক্তি ঠায় মারা গেলেন। নানা সাহেবের এইরূপ মনে হইল যে, মরাঠীদের দ্বারা যুদ্ধ অনেক হইয়াছে কিন্তু এমন যোদ্ধা মরাঠী-

দের মধ্যে আর কেহই নাই। তিনিও শিন্দের অনেক স্তুতি করিলেন। মানী লোকদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সেই স্থানে শিবির সংস্থাপিত হইল। পরে সন্ধির সূত্র আরম্ভ হইল। আট দিনে মোঁগল ও মরাঠীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল।

অনন্তর জনকোজী শিন্দেকে হিন্দু স্থানে যাত্রার আজ্ঞা দিলেন। দত্তাজি শিন্দে বিবাহার্থে ছান্দার গোন্দিয়াতে গেলেন। জনকোজী শিন্দে চল্লিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মজল-দর-মজন হিন্দু স্থানে চলিলেন। জনকোজী বয়সে বালক, পরাক্রমে বৃদ্ধ সমান, স্বধর্ম্মশীল ও ভক্তিপরায়ণ। নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া উজ্জয়িনীতে উপনীত হইলেন। তথা হইতে বুন্দি বাড়য়্যাতে বেড়াতে গেলেন। সেই রাজ্যে হরগড় বলিয়া এক কেল্লা ছিল, তাহাতে সুমানসিং নামক এক গিরাষা (পাহাড়ে লুট করনেওয়ালা) থাকিত, সে সমস্ত মারোয়াড় ভয়-বশীভূত করিয়া গুপ্তরূপে কর গ্রহণ করিত। জনকোজী একেবারে গড়ের উপরে গিয়া পড়িলেন। গড় এক অতি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত, কিন্তু চতুর্দ্দিক দুর্গম জঙ্গলে আবৃত। গড়ের উপর কাহাকেই ধরিতে পারিলেন না। গিরাষারা স্ত্রী পরিবার সঙ্গে লইয়া রাত্রেতেই পলায়ন করিয়াছিল।

তথা হইতে অগ্রসর হইয়া খেটীয়াড়া, রাজগড়, পাটল, বুন্দী ও কোট রাজ্যে কর গ্রহণ পূর্ব্বক জয়নগর প্রান্তে উপনীত হইলেন। তথাকার মাধব সিং রাজা সাহস পূর্ব্বক চারিদিবস রহিলেন। কিন্তু যুদ্ধ করিতে অক্ষম জানিয়া বিস লক্ষ টাকা কর দিলেন।

ডুব দেওয়া।

ছোট বড়।

ডুবিয়া যাওয়া কথাটা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ডুবিয়া মরিবার ক্ষমতা ও অধিকার কয়জন লোকেরই বা আছে! কথাটার প্রকৃত ভাবই বা কে জানে! কবিরা, ভাবুকেরা, ভক্তেরা কেবল বলেন ডুবিয়া যাও, ইতর লোকেরা চারিদিকে চাহিয়া কঠিন মাটিতে পা দিয়া অবাক হইয়া বলে, ডুবিব কোন্ খানে, ডুবিবার স্থান কোথায়!

জলাশয় ছাড়া যখন্ আর কিছুতে মগ্ন হইবার কথা হয়, তখন লোকে সেটাকে অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করে—সেই জন্য

সে কথা শুনিয়াও শোনে না, মুখে উচ্চারণ করিয়াও বোঝে না, এবং ও-বিষয়ের স্পষ্ট একটা ভাব মনে আনা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করে। কিন্তু আমি বলিতেছি কি, ও শব্দটাকে অলঙ্কার বলিয়া নাই মনে করিলাম; মনে করা যাক্ না কেন, যাহা বলা হইতেছে ঠিক তাহাই বুঝাইতেছে? সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতেছেন, "আমরা ত আর জলে পড়ি নাই" কিন্তু যখন কাপড় ভিজিবার বা আশু বিপদের কোন আশঙ্কা নাই তখন একবার মনেই করা যাকৃনা কেন যে "হাঁ, আমরা জলেই পড়িয়াছি" দেখি না, কোথায় যাওয়া যায়!

এ জগতের সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল আয়তনের অতীত আর-এক প্রকার আয়তন তাহাদের আছে, তাহাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহা অসীমায়তনতা, বা আয়তনের অসীম অভাব।

একটি বালুকণাকে আমরা যদি জড়ভাবে দেখি তবে দেখিতে পাই, তাহা কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই! তাহাকে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি বলিলেই কি তাহার সমস্ত নিঃশেষে বলা হইল, তাহার আর কিছুই বাকী রহিল না! তাহা কি অনন্ত জ্ঞানের সমষ্টি নহে, অনন্ত ইতিহাস অর্থাৎ অনন্ত সময়ের সমষ্টি নহে! তাহার মধ্যে যতই প্রবেশ কর ততই প্রবেশ করা যায় না কি! তাহার বিষয় জানিয়া শেষ করিবার যো নাই—যতই জান ততই আরো জানার আবশ্যক হয়—জানিয়া জানিয়া অবশেষে যখন শ্রান্ত হইয়া সমুদয় জ্ঞান-শৃঙ্খলকে অতি বৃহৎ স্তূপাকৃতি করিয়া তুলা গেল তখনও দেখা গেল বালির বিষয়ে কিছুই জানা গেল না। অতএব নিতান্ত জড়ভাবে না দেখিয়া মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকণার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় যে তাহা অসীম।

আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতা শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতার ত আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্ব্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে ছোট বড় আর কোথায় রহিল! একটি পর্ব্বতও যা, পর্ব্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই, কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্যেয়তায় অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে অনন্ত ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে। তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া

যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ অসীম কাল অসীম শক্তি সুতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকা মাত্র। চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিষ সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়ত ছোট বড়র উপর অসীমতা কিছু মাত্র নির্ভর করে না। হয়ত ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে। হয়ত অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

"যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ।"

যাহা বলিলাম তাহা কিছুই বুঝা গেল না, কেবল কতকগুলা কথা কহা গেল মাত্র। কিন্তু কোন্ কথাটাই বা সত্য! বালুকা সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়া থাকে, তাহাতেও বালুকার যথার্থ স্বরূপ কিছুই বুঝা যায় না, একটা কথা মুখস্থ করিয়া রাখা যায়। ইহাতেও কিছু ভাল বুঝা গেল না, কেবল একটা বুঝিবার প্রয়াস প্রকাশ পাইল মাত্র।

বিজ্ঞ লোকেরা তিরস্কার করিয়া বলিবেন, যাহা বুঝা যায় না, তাহার জন্য এত প্রয়াসই বা কেন! কিন্তু তাঁহারা কোথাকার কে! তাঁহাদের কথা শোনে কে! তাঁহারা কোন্ দিন ঝরণাকে তিরস্কার করিতে যাইবেন, সে উপর হইতে নীচে পড়ে কেন! কোন্ দিন ধোঁয়ার প্রতি আইনজারি করিবেন সে যেন নীচে হইতে আর উপরে না ওঠে!

ডুবিবার ক্ষমতা।

যাহা হউক্ আর কিছু বুঝি না বুঝি এটা বোঝা যায় জগতের সর্ব্বত্রই অতল সমুদ্র। মহিষের মত পাঁকে গা ডুবাইয়া নাকটুকু জলের উপরে বাহির করিয়া জগতের তলা পাইয়াছি বলিয়া যে নিশ্চিন্ত ভাবে জড়ের মত নিদ্রা দিব তাহার যো নাই। এক এক জন লোক আছেন তাঁহাদের কিছুই যথেষ্ট মনে হয় না—খানিকটা গিয়াই সমস্ত শেষ হইয়া যায় ও বলিয়া উঠেন, এই বইত নয়! এই ক্ষুদ্রেরা মনে করেন, জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের হাঁটুজল, ডুবজল কোন খানেই নাই। জগতের সকলের উপরেই ইহাঁরা মাথা তুলিয়া আছেন, ঐ অভিমানী মাথাটা সমেত ডুবাইয়া দিতে পারেন, এমন স্থান পাইতেছেন না! অস্থির হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাঁরা যে জগতের অসম্পূর্ণতা ও নিজের মহত্ত্ব লইয়া গর্ব্ব করিতেছেন ইহাঁদের গর্ব্ব ঘুচিয়া যায় যদি জানিতে পারেন ডুব দিবার ক্ষমতা ও অধিকার সকলের নাই। বিশেষ গৌরব থাকা চাই তবে মগ্ন হইতে পারিবে। সোলা যখন জলের চারদিকে অসন্তুষ্ট ভাবে ভাসিয়া বেড়ায় তখন কি মনে করিতে হইবে কোথাও তাহার ডুব দিবার উপযোগী স্থান নাই! সে তাই মনে করুক্ কিন্তু জলের গভীরতা তাহাতে কমিবে না।

"আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া,
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!"

ডুবিবার স্থান।

যখন একটা কুকুর একটি গোলাপ ফুল দেখে, তখন তাহার দেখা অতি শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়—কারণ ফুলটি কিছু বড় নহে। কিন্তু এক জন ভাবুক যখন সেই ফুলটি দেখেন তখন তাঁহার দেখা শীঘ্র ফুরায় না, যদিও সে ফুলটি দেড় ইঞ্চি অপেক্ষা আয়ত নহে। কারণ সে গোলাপ ফুলের গভীরতা নিতান্ত সামান্য নহে। যদিও তাহাতে দুই ফোঁটার বেশী শিশির ধরে না, তথাপি হৃদয়ের প্রেম তাহাকে যতই দাও না কেন, তাহার ধারণ করিবার স্থান আছে। সে ক্ষুদ্রকায় বলিয়া যে তোমার হৃদয়কে তাহার বক্ষস্থিত কীটের মত গোটাকতক পাপড়ির মধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে তাহা নহে, সে আরো তোমাকে এমন এক নূতন বিচরণের স্থানে লইয়া যায়, যেখানে এত বেশী স্বাধীনতা যে একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে হারা হইয়া যাইতে হয়। তখন এক প্রকার অস্ফুট দৈববাণীর মত হৃদয়ের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, যে, সকলেরই মধ্যে অসীম আছে; যাহাকেই তুমি ভাল বাসিবে সেই তোমাকে তাহার অসীমের মধ্যে লইয়া যাইবে, সেই তোমাকে তাহার অসীম দান করিবে। কে না জানেন, যাহাকে যত ভাল বাসা যায় সে ততই বেশী হইয়া উঠে—নহিলে প্রেমিক কেন বলিবেন, "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল!" একটা মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশীক্ষণ লাগে না—কিন্তু আজন্ম দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না জানি কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক এক জন মানুষের মধ্যস্থিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না; হৃদয় যতই দাও ততই সে গ্রহণ করে, যত দেখ ততই নতুন দেখা যায়, যত তোমার ক্ষমতা আছে ততই তুমি নিমগ্ন হইতে পার। এই জন্যই যথার্থ অনুরাগের মধ্যে একপ্রকার ব্যাকুলতা আছে। সে এতখানি পায় যে তাহা প্রাণ ভরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না—তাহার এত বেশী তৃপ্তি বর্ত্তমান, যে, সে তৃপ্তিকে সে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে পারে না ও তাহা সুমধুর অতৃপ্তিরূপে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। যেখানে অনুরাগ নাই সেই খানেই সীমা, সেই খানেই মহা-অসীমের দ্বার রুদ্ধ, সেইখানেই, চারিদিকে লৌহের ভিত্তি, কারাগার। জগৎকে যে ভালবাসিতে শিখে নাই, সে ব্যক্তি অন্ধকূপের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়াছে। সে মনে করিতেও পারে না এই টুকুর বাহিরেও কিছু থাকিতে পারে। তাহার নিজের পায়ের শিক্‌লিটার ঝম্ ঝম্ শব্দই তাহার জগতের একমাত্র সঙ্গীত। সে কল্পনাও করিতে পারে না কোথাও পাখী ডাকে, কোথাও সূর্য্যের কিরণ বিকীরিত হয়।

অনুরাগেই যে যথার্থ স্বাধীনতা তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ নূতন লোকের মধ্যে গিয়া পড়িলে আমরা যেন নিশ্বাস লইতে পারি না, হাত পা ছড়াইতে সঙ্কোচ হয়, যে কেহ লোক থাকে সকলেই যেন বাধার মত বিরাজ করিতে থাকে, তাহারা সদয় ব্যবহার করিলেও সকল সময়ে মনের সঙ্কোচ দূর হয় না। তাহার কারণ, এক মাত্র অনুরাগের অভাব বশতঃ আমরা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই না, যেখানে স্বাধীনতার যথার্থ বিচরণ-ভূমি সে স্থান আমাদের নিকটে রুদ্ধ। আমরা কেবলি তাহাদের নাকে চোখে মুখে, আচারে ব্যবহারে, নূতন ধরণের কথায় বার্ত্তায় হুঁচট ঠোকর ধাক্কা খাইতে থাকি।

পুরাতনের নূতনত্ব।

অতএব দেখা যাইতেছে জগতের সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে অনন্ত অদৃশ্য বর্ত্তমান। নিত্য-নূতন নামক যে শব্দটা কবিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন সেটা কি নিতান্ত একটা কথার কথা, একটা আলঙ্কারিক উক্তি মাত্র! তাহার মধ্যে গভীর সত্য আছে। অসীম যতই পুরাতন হউক্ না কেন তাহার নূতনত্ব কিছুতেই ঘুচে না! সে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই বেশী নূতন হইতে থাকে, সে দেখিতে যতই ক্ষুদ্র হউক্ না কেন, প্রত্যহই তাহাকে অত্যন্ত অধিক করিয়া পাইতে থাকি। এই নিমিত্ত যথার্থ যে প্রেমিক সে আর নূতনের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হে, শুদ্ধ তাহাই নয়, পুরাতন ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। কারণ নূতন অতি ক্ষুদ্র, পুরাতন অতি বৃহৎ। পুরাতন যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহার অসীম বিস্তার প্রেমিকের নিকট অবারিত হইতে থাকে, হৃদয় ততই তাহার মর্ম্মস্থানের অভিমুখে ক্রমাগত ধাবমান হইতে থাকে, ততই জানিতে পারা যায় হৃদয়ের বিচরণক্ষেত্র অতি বৃহৎ, হৃদয়ের স্বাধীনতার কোথাও বাধা নাই। যে ব্যক্তি একবার এই পুরাতনের গভীরতার মধ্যে মগ্ন হইতে পারিয়াছে, এই সাগরের হৃদয়ে সন্তরণ করিতে পারিয়াছে সে কি আর ছোট ছোট ব্যাংগুলার আনন্দ-কল্লোল শুনিয়া প্রতারিত হইয়া নূতন নামক সঙ্কীর্ণ কূপটার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিতে পারে!

সাম্য।

এ জগতে সকলি যে সমান, কেহ যে ছোট বড় নহে, তাহা প্রেমের চক্ষে ধরা পড়িল। এই নিমিত্ত যখন দেখা যায়, যে, একজন লোক কুৎসিৎ মুখের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে, তখন আর আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই—আর একজনকে দেখিতেছি সে সুন্দর মুখের দিকে ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া আছে, ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই। অনুরাগের প্রভাবে উভয়ে মানুষের এমন স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে সকল মানুষই সমান, যেখানে কাহারও সহিত কাহারো

একচুল ছোট বড় নাই, যেখানে সুন্দর কুৎসিৎ প্রভৃতি তুলনা আর খাটেই না। সীমা এবং তুলনীয়তা কেবল উপরে, একবার যদি ইহা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার ত দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত। এতবড় প্রাণ কাহার আছে সেখানে প্রবেশ করিতে পাবে, বিশ্বচরাচরের মহাসমুদ্রে অসীম ডুব ডুবিতে পারে। প্রেমে সেই সমুদ্রে সন্তরণ করিতে শিখায়—যাহাকেই ভালবাস না কেন তাহাতেই সেই মহা স্বাধীনতার ন্যূনাধিক আস্বাদ পাওয়া যায়! এই যে শূন্য অনন্ত আকাশ ইহাও আমাদের কাছে সীমা বদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন একটি-অচল কঠিন সুগোল নীল মণ্ডপ আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে; যেন খানিক দূর উঠিলেই আকাশের ছাতে আমাদের মাথা ঠেকিবে। কিন্তু ডানা থাকিলে দেখিতাম ঐ নীলিমা আমাদিগকে বাধা দেয় না, ঐ সীমা আমাদের চোখেরই সীমা; যদিও মণ্ডপের ঊর্দ্ধে আরও মণ্ডপ দেখিতাম, তদূর্দ্ধে উঠিলে আবার আর-একটা মণ্ডপ দেখিতাম, তথাপি জানিতে পারিতাম যে, উহারা আমাদিগকে মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে, উহারা কেবল ফাঁকি মাত্র। আমাদের স্বাধীনতার বাধা আমাদের চক্ষু, কিন্তু বাস্তবিক বাধা কোথাও নাই!

স্বদেশ।

আমার একজন বন্ধু দার্জ্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন—বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিবেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায়, দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাঙ্গলা দেশ দেখিতে ভাল নয়! এমন মায়ের মত দেশ আছে! এত কোল-ভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথী-প্রাণা কোমল হৃদয়, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্ব্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়! একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্মকাল ইহাঁর কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইহাঁর সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না! সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাঙ্গলা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাংলা দেশ সে দেখেই নি—বাঙ্গলা দেশে সে কখনো যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি এত নদী দেখিয়াছি কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু কেন? অমুক দেশে একটা নদী আছে সেটা গঙ্গার চেয়ে চওড়া—অমুক সাগরে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘ—অমুক স্থানে একটা নদী বহিতেছে, গঙ্গার চেয়ে তাহার তরঙ্গ বেশী। ইত্যাদি।

কেন।

এই কেন লইয়াইত যত মারামারী। যে ভালবাসে সে কেনর উত্তর দিতে পারে না। তুমি তর্ক করিলে বাঙ্গালার চেয়ে কাশ্মীর ভাল দেশ হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু তবু আমার কাছে কেন বাংলাই ভাল দেশ। তার্কিক বলেন, বাল্যাবধি বাঙ্গলা দেশটা তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই ভাল লাগিতেছে। ঠিক কথা। কিন্তু অভ্যাস হইয়া যাওয়ার দরুণ ভাল লাগিবার কি কারণ হইতে পারে! তাঁহাদের কথার ভাবটা এই যে বাঙ্গলা দেশে আসলে যাহা নাই, আমি তাহাই যেন নিজের তহবিল হইতে দেশকে অর্পণ করি। এ কথা কোন কাজের নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। ভাল বাসিয়া আজন্ম প্রত্যহ দেশের পানে চাহিয়া দেখিলে দেশ সদয় হইয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান—কারণ সকলেরই প্রাণ আছে। ভাল বাসিলে সকলেই তাহার প্রাণে ডাকিয়া লয়। বাহ্য আকার-আয়তনের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তাহা বাধা-বিপত্তিময়—আকার আয়তনের অতীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা—সেখানে পায়ে কিছু ঠেকেনা, চোখে কিছু পড়ে না, শরীরে কিছুই বাধে না—কেবল এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতার আনন্দ। ইহার কাছে কি আর "কেন" ঘেঁসিতে পারে! স্বদেশে আমাদের হৃদয়ের কি স্বাধীনতা! স্বদেশে আমাদের কতখানি জায়গা! কারণ স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না. আমরা একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব তাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য ভূগোল বিবরণ পড়িয়া রেলোয়ের টিকিট কিনিয়া দূরদূরান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

এক কাঠা জমি।

একদল লোক আছেন তাঁহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন, সেই খানে ততই অনুরাগসূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন, আর একদল লোক আছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাস-সূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে তেমনি। লোকে হয়ত বলিবে তিনিই যথার্থ দূরদর্শী, অপক্ষপাতী, কেবল মাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুণ তাঁহার নিকট কোন জিনিষের একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে। ঠিক উল্টো কথা। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে না। বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্ত্তমান। একদিনে তাহা আয়ত্ত হয় না। প্রত্যহ অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশবৎসরে এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না তিনি বিশ্বকে অধিকার করিবেন কি করিয়া! বিশ্ব সর্ব্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভালবাসিতে গেলে বিশ্ব-জনীনতা থাকা চাই।

জগৎ মিথ্যা।

যাঁহারা বলেন জগৎ মিথ্যা, তাঁহাদের কথা একহিসাবে সত্য এক হিসাবে সত্য নয়। বাহির হইতে জগৎকে যেরূপ দেখা যায় তাহা মিথ্যা। তাহার উপরে ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

ঈথর কাঁপিতেছে, আমি দেখিতেছি আলো; বাতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে আমি শুনিতেছি শব্দ, ব্যবচ্ছেদবিশিষ্ট অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ চলিতেছে আমি দেখিতেছি বৃহৎ দৃঢ় ব্যবচ্ছেদহীন বস্তু। বস্তুবিশেষ কেনই যে বস্তুবিশেষ রূপে প্রতিভাত হয় আর-কিছু রূপে হয় না, তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য কিছুই নাই, আমাদের নিকটে যাহা বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছে, আর একদল নূতন জীবের নিকটে তাহা কেবল শব্দরূপে প্রতীত হইতেছে। আমাদের কাছে বস্তু দেখা ও তাহাদের কাছে শব্দ শোনা একই। এমনও আশ্চর্য্য নহে, আর এক নূতন জীব দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ স্বাদ স্পর্শ ব্যতীত আর এক নূতন ইন্দ্রিয়-শক্তি দ্বারা বস্তুকে অনুভব করে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। বস্তুকে ক্রমাগত বিশ্লেষ করিতে গেলে তাহাকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত করা যায়—অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়ায়

আমাদের ভাষায় যাহার নাম নাই, আমাদের মনে যাহার ভাব নাই। মুখে বলি তাহা অসংখ্য শক্তির খেলা, কিন্তু শক্তি বলিতে আমরা কিছুই বুঝিনা। অতএব আমরা যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি, তাহার উপরে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। কাজের সুবিধার জন্য রফা করিয়া কিছু দিনের মত তাহাকে এই আকারে বিশ্বাস করিবার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে মাত্র; আবার অবস্থা পরিবর্ত্তনে এ চুক্তি ভাঙ্গিলে তাহার জন্য আমরা কিছুমাত্র দায়িক হইব না।

তুলনায় অরুচি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই বেলা সেই কথাটা বলিয়া লই, পুনশ্চ পূর্ব্বকথা উত্থাপন করা যাইবে। অনেক লোক আছেন তাঁহারা কথা বার্ত্তাতেই কি, আর কবিতাতেই কি তুলনা বর্দাস্ত করিতে পারেন না। তুলনাকে তাঁহারা নিতান্ত একটা ঘরগড়া মিথ্যা রূপে দেখেন; নিতান্ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক ওটাকে তাঁহারা মানিয়া লন মাত্র। তাঁহারা বলেন যেটা যাহা সেটাকে তাহাই বল, সেটাকে আবার আর-একটা বলিলে তাহাকে একটা অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা। ইহাঁরা কঠিন নৈয়ায়িক লোক, ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সকল কথা বাজাইয়া লন, কবিতার তুলনা উপমা প্রভৃতি ন্যায় শাস্ত্রের নিকট যাচাই করিয়া

তবে গ্রহণ করেন। অতএব ইহাঁদের কাছে শাস্ত্র অনুসারেই কথা কহা যাক। জগৎসংসারে কোন্ জিনিষটা একেবারে স্বতন্ত্র, কোন জিনিষটা এতবড় প্রতাপান্বিত যে কোন কিছুর সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না? জড় বুদ্ধিরা সকল জিনিষকেই পৃথক করিয়া দেখে, তাহাদের কাছে সবই স্বস্ব-প্রধান। বুদ্ধির যতই উন্নতি হয় ততই সে ঐক্য দেখিতে পায়। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল ক্রমাগত একের প্রতি ধাবমান হইতেছে সহজ চক্ষে যাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল, তাহারাও অভেদাত্মা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ বিশ্বরাজ্যে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ঐক্য, দর্শন দার্শনিক ঐক্য দেখাইতেছে, কবিতা কি অপরাধ করিল! তাহার কাজ জগতের সৌন্দর্য্যগত ভাবগত ঐক্য বাহির করা। তুলনার সাহায্যে কবিতা তাহাই করে; তাহাকে যদি তুমি সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য না কর, কল্পনার ছেলেখেলা মাত্র মনে কর তাহা হইলে কবিতাকে অন্যায় অপমান করা হয়। কবিতা যখন বলে, তারাগুলি আকাশে চলিতে চলিতে গান গাহিতেছে—

যথা There's not the smallest orb
which thou beholdst
But in his motion like an angel
sings.)

তখন তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুনিয়া গিয়া কবিকে নিতান্তই বাধিত কর। মনে মনে বলিতে থাক, তারা চলিতেছে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু কোথায় চলা আর কোথায় গান গাওয়া! চলাটা চোখে দেখিবার বিষয় আর গান গাওয়াটা কানে শুনিবার—তবে অলঙ্কারের হিসাবে মন্দ হয় নাই। কিন্তু হে তর্কবাচস্পতি, বিজ্ঞান যখন বলে, বাতাসের তরঙ্গ লীলাই ধ্বনি, তখন তুমি কেন বিনা বাক্যব্যয়ে অম্লান বদনে কথাটাকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেল। কোথায় বাতাসের বিশেষ একরূপ কম্পন নামক গতি, আর কোথায় আমাদের শব্দ শুনিতে পাওয়া! সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের স্পর্শের বিষয় কিন্তু শব্দে ও স্পর্শে যে ভাই ভাই সম্পর্ক ইহা কে জানিত! বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া করিয়া জানিয়াছেন, কবিরা হৃদয়ের ভিতর হইতে জানিতেন। কবিরা জানিতেন, হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ সমস্ত একাকার হইয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ স্বতন্ত্র। তাহারা নানা দিক হইতে নানা দ্রব্য স্বতন্ত্র ভাবে উপার্জ্জন করিয়া আনে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃপুরের মধ্যে সমস্তই একত্রে জমা করিয়া রাখে, এবং এমনি গলাগলি করিয়া থাকে যে কোনটি যে কে চেনা যায় না। সেখানে গন্ধকে স্পৃশ্য বলিতে আপত্তি নাই, রূপকে গান বলিতে বাধে না। পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, যেখানে গভীর সেখানে সমস্তই একাকার। সেখানে হাসিও যা কান্নাও তা, সেখানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।

জ্ঞানে যাহারা বর্ব্বর তাহারা যেমন-জগতে বৈজ্ঞানিক ঐক্য দার্শনিক ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না,

তেমনি ভাবে যাহারা বর্ব্বর তাহারা কবিতা-গত ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না। ইংরাজি সাহিত্য পড়িয়া আমার মনে হয় কবিতায় তুলনা ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে, যাহাদের মধ্যে ঐক্য সহজে দেখা যায় না, তাহাদের ঐক্যও বাহির হইয়া পড়িতেছে। কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে ও আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না।

জগৎ সত্য।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে, সবই একাকার হইয়া পড়ে, জগৎটা না থাকিবার মতই হইয়া আসে। যাহা দেখিতেছি তাহা যে তাহাই নহে ইহাই ক্রমাগত মনে হয়। এই জন্যই জগৎকে কেহ কেহ মিথ্যা বলেন। কিন্তু আর এক রকম করিয়া জগৎকে হয়ত সত্য বলা যাইতে পারে।

সত্য যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা একটা ভাব মাত্র। কিন্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে প্রকাশ পায়, ভাষা আকারে, অক্ষর আকারে, বিবিধ বস্তুর বিচিত্র বিন্যাস আকারে। তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কেবল একটি ভাব মাত্র, সেই ভাবটি আমাদের চোখে বহির্জগত রূপে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন, যাহা পদার্থ নহে যাহা একটি শক্তি মাত্র তাহাকেই আমরা বিচিত্র বর্ণরূপে আলোকরূপে দেখিতেছি ও উত্তাপ রূপে অনুভব করিতেছি, তেমনি যাহা একটি সত্যমাত্র তাহাকে আমরা বহির্জগত রূপে দেখিতেছি। একজন দেবতার কাছে হয়ত এ জগৎ একেবারেই অদৃশ্য, তাঁহার কাছে আকার নাই আয়তন নাই, গন্ধ নাই শব্দ নাই স্পর্শ নাই, তাঁহার কাছে কেবল একটা জানা আছে মাত্র। একটা তুলনা দিই। তুলনাটা ঠিক না হউক একটুখানি কাছাকাছি আসে। আমার যখন বর্ণপরিচয় হয় নাই, তখন যদি আমার নিকটে একখানা বই আনিয়া দেওয়া হয়—তবে সে বইয়ের প্রত্যেক আঁচড় আমার চক্ষে পড়ে, প্রত্যেক বর্ণ আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে পাই ও সমস্তটা অনর্থক ছেলেখেলা মনে করি। কিন্তু যখন পড়িতে শিখি, তখন আর অক্ষর দেখিতে পাই না। তখন বস্তুতঃ বইটা আমার নিকটে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু তখনি বইটা যথার্থতঃ আমার নিকটে বিরাজ করিতে থাকে। তখন আমি যাহা দেখি তাহা দেখিতে পাই না, আর একটা দেখিতে পাই। তখন আমি বস্তুতঃ দেখিলাম, গ-য়ে আকার ছ, (গাছ) কিন্তু তাহা না দেখিয়া দেখিলাম একটা ডালপালা-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ পদার্থ। কোথায় একটা কালো আঁচড় আর কোথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ! কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা বুঝিয়া পড়িতে পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ আঁচড়গুলা কি সমস্তই মিথ্যা নহে! যে ব্যক্তি শাদা কাগজের উপরে হিজিবিজি কাটে তাহাকে কি আমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিব না! কারণ অক্ষর মিথ্যা। আমার

একরূপ অক্ষর আর-একজনের আর-এক-রূপ অক্ষর। ভাষা মিথ্যা। আমার ভাষা এক তোমার ভাষা আর-এক। আজিকার ভাষা এক কালিকার ভাষা আর-এক। এ ভাষায় বলিলেও হয় ও-ভাষায় বলিলেও হয়। গাছ বলিয়া একটা আওয়াজ শুনিলে আমি মনের মধ্যে যে জিনিষটা দেখিতে পাইব, আর-একজন ব্যক্তি ট্রী বলিয়া একটা আওয়াজ না শুনিলে ঠিক সে জিনিষটা মনে আনিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে অক্ষর ও ভাষা তুমি ঘরে গড়িয়া বন্দোবস্ত করিয়া বদল করিতে পার, কিন্তু তাহারি আশ্রিত ভাবটিকে খেয়াল অনুসারে বদল করা যায় না, তাহা ধ্রুব।

জগৎকে যে আমাদের মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে,তাহার কারণ কি এমন হইতে পারে না যে, জগতের বর্ণপরিচয় আমাদের কিছুই হয় নাই! জগতের প্রত্যেক অক্ষর আঁচড়ের আকারে সুতরাং মিথ্যা আকারে আমাদের চোখে পড়িতেছে। যখন আমরা বাস্তবিক জগৎকে পড়িতে পাইব তখন ইহাকে আর দেখিতেই পাইব না। এ পড়া কি এক দিনে শেষ হইবে! এ বর্ণমালা কি সামান্য!

এজগৎ মিথ্যা নয় বুঝি সত্য হবে,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমা রূপ ধরি!

প্রেমের শিক্ষা।

কিন্তু কে পড়াইবে! কে বুঝাইয়া দিবে যে জগৎ কেবল স্তূপাকৃতি কতকগুলো বস্তু নহে, উহার মধ্যে ভাব বিরাজমান। আর কেহ নহে প্রেম। জগৎকে যে যথার্থ ভালবাসে সে কখন মনে করিতেও পারে না, জগৎ একটা নিরর্থক জড়পিণ্ড। সে ইহারই মধ্যে অসীমের ও চিরজীবনের আভাস দেখিতে পায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রেমেই যথার্থ স্বাধীনতা। কারণ যতটা দেখা যায় প্রেমে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখাইয়া দেয়!

জগৎকে কখন্ মিথ্যা মনে করিতে পারি না, যখন জগৎকে ভাল বাসি! একজন যে সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোক্‌টা একেবারে ধ্বংশ হইয়া গেল, কারণ সে আমার নিকট এত ক্ষুদ্র! কিন্তু একজন প্রিয় ব্যক্তির মরণে আমাদের মনে হয় এ কখনো মরিতে পারে না। কারণ তাহার মধ্যে আমরা অসীমতা দেখিতে পাইয়াছি। যাহাকে এত বেশী ভাল বাসিয়াছি সে কি একেবারে "নাই" হইয়া যাইতে পারে! সে ত কম লোক নয়! তাহাকে যতখানি হৃদয় দিয়াছি ততখানিই সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপরে যতই আশা স্থাপন করিয়াছি ততই আশা ফুরায় নি, রজ্জুবদ্ধ লৌহখণ্ডের মত আমার সমস্তটা তাহার মধ্যে ফেলিয়া মাপিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার তল পাই নাই। যাহার নিকট হইতে সীমা যতদূরে মৃত্যুও ততদূরে। অতএব এতখানি বিশালতার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ধান এ কখনো সম্ভবপর নহে। প্রেম আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে, তর্ক যাহা বলে বলুক। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রেম আসিয়াই আমাদের শিক্ষা দেয় এ জগৎ সত্য এবং প্রেমই বলে সত্য উপরে ভাসিতেছে না, সত্য ইহার গভীর অভ্যন্তরে নিহিত আছে। যাহা হউক পথ দেখিতে পাইলাম, আশা জন্মিতেছে ক্রমে তাহাকে পাইতেও পারি। ইহাকে অবিশ্বাস করিয়া মরণকে বিশ্বাস করিয়া কি সুখ! হৃদয়ের সভ্যতার যতই উন্নতি হইবে এই মরণের প্রতি বিশ্বাস ততই চলিয়া যাইবে জীবনের প্রতি বিশ্বাস ততই বাড়িবে।

ভাল করে পড়িব এ জগতের লেখা।
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার!
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ।
ভাল বেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে ত দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য।

চাউল, কাপড়, গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি ব্যবহার্য্য সামগ্রী ক্রয় করিবার সময় আমরা ঐ সকল সামগ্রীর মূল্য দিতে স্বীকৃত হই; কোন সামগ্রীর মূল্য কি নিয়মে নির্দ্ধারিত হয়, তাহা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। মনে কর বাজারে চাউলের মূল্য কি নিয়মে নির্দ্ধারিত হইবে তাহা আমরা জানিতে চাহি; যে মূল্যে চাউলের চাহিদা উহার আমদানির সমান হইবে সেই মূল্যে চাউল বিক্রয় হইবে। চাউলের চাহিদা বলিতে খরিদ দারেরা কত চাউল কিনিতে চায় তাহা বুঝায়, আর চাউলের আমদানি শব্দে কত চাউল বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আনা হইয়াছে তাহা বুঝায়। চাউলের আমদানি সম্বন্ধে আমরা এখানে অধিক কথা বলিতে চাহি না; সকলেই প্রায় জানেন যে যে স্থান হইতে অন্যান্য স্থানে গতায়াতের সুবিধা অধিক সে স্থানে চাউল ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর আমদানির সম্ভাবনাও অধিক, আর যেস্থানে ও রূপ গতায়াতের সুবিধা কম সে স্থানে ওরূপ আমদানির সম্ভাবনাও কম। চাউলের চাহিদা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে তাহা আমরা এখন বিবেচনা করিয়া দেখি। কোন সামগ্রীর সাধকত্বের বৃদ্ধির সহিত তাহার মূল্যও বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর সেই সঙ্গে

তাহার চাহিদা হ্রাস পাইতে থাকে। কোন সামগ্রীর সাধকত্ব বলিতে যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য উহার ব্যবহার হয় তাহার কতখানি পূরণ সাধন উহা দ্বারা হইতে পারে তাহা বুঝায়। মনে কর একজন দরিদ্র লোকের এক সপ্তাহের নিমিত্ত পাঁচ সের চাউলের দরকার, এক আনা করিয়া যদি সে চাউলের সের কিনিতে পায়, তবে সে ঐ পাঁচ সের চাউল কিনিতে পারে; কিন্তু চাউল মহার্ঘ হইয়াছে, চাউলের সের চারি আনা করিয়া বিক্রয় হইতেছে। দরিদ্র লোকটীর এত সঙ্গতি নাই যে সে চারি আনা করিয়া সের কিনিয়া এক সপ্তাহের নিমিত্ত পাঁচ সের চাউল লইতে পারে, অথচ তাহার নিকট চাউল এত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে যে সে ঐরূপ উচ্চ মূল্যেও এক সপ্তাহের নিমিত্ত একসের চাউল কিনিল; আর বাকী চারিসের চাউলের স্থলে সে শাক কি অন্য কোন সুলভ দ্রব্য ব্যবহার করিল। অতএব এই ব্যক্তি প্রথম একসের চাউলের নিমিত্ত চারি আনা মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার পর দ্বিতীয় আর একসের চাউলের নিমিত্ত সে চারি আনা দিতে প্রস্তুত নহে কিন্তু তিন আনা দিতে পারে, অর্থাৎ তিন আনা করিয়া সের হইলে সে এক সপ্তাহের নিমিত্ত ছয় আনা দিয়া দুইসের চাউল কিনিতে পারে। এখানে দেখা যাইতেছে ঐ ব্যক্তির পক্ষে প্রথম এক সেরের যত সাধকত্ব, দ্বিতীয় এক সেরের তত নহে অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে মোটে একসের চাউল পাইলে তাহা পাইতে তাহার যত স্পৃহা হইবে, দ্বিতীয় আর একসের পাইতে তত হইবে না। এখানে দেখা যাইতেছে দ্বিতীয় একসের চাউল অপেক্ষা প্রথম এক সের চাউলের সাধকত্ব অধিক সুতরাং উহার অপেক্ষা ইহার মূল্যও অধিক, আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে উক্ত দরিদ্র ব্যক্তি তিন আনা করিয়া সের হইলে দুইসের চাউল লইতে পারে অর চারি আনা করিয়া সের হইলে কেবল মাত্র এক সের চাউল লইবে, অর্থাৎ মূল্যের বৃদ্ধির সহিত চাহিদার হ্রাস হইতেছে। এখন মনে কর চাউলের দর আড়াই আনা করিয়া সের হইল, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তৃতীয় আর একসের চাউল লইতে পারে অর্থাৎ সাড়ে সাত আনা দিয়া তিন সের চাউল কিনিতে পারে; চতুর্থ একসেরের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তি দুই আনা দিতে প্রস্তুত আছে অর্থাৎ দুই আনা করিয়া সের হইলে সে এক সপ্তাহের নিমিত্ত আট আনা দিয়া চারিসের চাউল লইতে পারে; আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এক আনা করিয়া সের পাইলে সে পাঁচসের চাউল কিনিতে পারে অর্থাৎ পঞ্চমসেরের নিমিত্ত সে এক আনা দিতে প্রস্তুত আছে। এইরূপে চাউলের সাধকত্বের বৃদ্ধির সহিত তাহার মূল্য বৃদ্ধি পায় আর মূল্যের বৃদ্ধির সহিত চাউলের চাহিদার হ্রাস পায়। ফলতঃ সাধকত্বের বৃদ্ধি বলিলে চাহিদার হ্রাস বুঝায়; কোন সামগ্রী যখন অধিক পাওয়া যায় তাহার তখন সাধকত্ব কম হইয়া পড়ে, সুতরাং অন্যান্য বিষয় সমান থাকিলে সে সামগ্রীর সাধকত্ব অধিক বলিলে যে মাত্রায় তাহা

পাওয়া যাইতেছে তাহা অল্প বলিয়া বুঝিতে হইবে; কিন্তু যে সামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করা হইয়া থাকে তাহার পক্ষে এই সামগ্রী অল্প পাওয়া যাইতেছে ইহা বলাও যে কথা এই সামগ্রী অল্প কেনা হইতেছে অর্থাৎ এই সামগ্রীর চাহিদা কম ইহা বলাও প্রকৃত পক্ষে সেই কথা। এখন আমরা আবার সেই দরিদ্র ব্যক্তির উদাহরণ সম্বন্ধে আমাদিগের আর যাহা বলিবার আছে তাহা বলিতেছি; এক সপ্তাহে পাঁচ সের চাউল যদি ঐ ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে সে চাউলের সের এক আনার নীচে হইলে আর অধিক চাউল না লইলেও পারে অথবা চাউল সুলভ দেখিয়া সে কতক ভবিষ্যতে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত পাঁচ সেরের অধিক কিনিলেও পারে। এখন দেখা যাইতেছে যে চাউলের মূল্য যত কম হইবে এই ব্যক্তি তত অধিক চাউল কিনিবে।

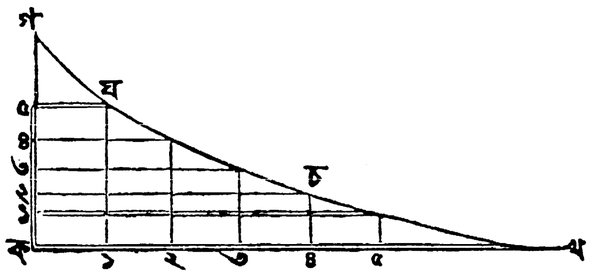

* এই ব্যক্তি যে মূল্যে যত চাউল চাহে তাহা একটী রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে, মনে কর খ গ সেইরেখা; ক খ চাউলের চাহিদার মাত্রা, আর কগ মূল্যের মাত্রা প্রকাশ করিতেছে। ক গ রেখায় ১, ২, ৩, ৪ এই সংখ্যাগুলি এক আনা, দুই আনা, তিন আনা, চারি আনা এই কয়টী মূল্যের মাত্রা আর ক খ রেখায় ১, ২, ৩, ৪ এক, দুই, তিন, চারিসের এই কয়টী চাহিদার মাত্রা প্রকাশ করিতেছে। চারি আনা মূল্যে এই ব্যক্তি একসের মাত্র চাউল চায়, ইহা উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে, ক গ রেখায় ৪ র বিন্দু হইতে ক খয়ের সমান্তরাল রেখা টান, এই রেখা যেখানে খগকে ভেদ করিবে সেখান (ঘ বিন্দু) হইতে কগয়ের সমান্তরাল একটী রেখা টান, এই রেখা কখকে যেখানে ভেদ করিবে সেখান হইতে ক পর্য্যন্ত যত দূর তাহা চাউলের চাহিদার মাত্রা প্রকাশ করিবে। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে এই দূরত্ব এক সংখ্যা মাত্র, অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তি চারি আনা দামে কেবল একসের মাত্র চাউল লইতে প্রস্তুত! আবার যদি এই ব্যক্তি চারিসের চাউল কেনে, তবে প্রত্যেক সেরের মূল্য দুই আনা হওয়া চাই তাহাও চিত্রে দেখা যাইতেছে। কখ রেখায় ৪ র দাগ হইতে কগখের সমান্তরাল রেখা টান, এই রেখা যেখানে খগকে স্পর্শ করিবে সেখান (চ বিন্দু) হইতে ক খয়ের সমান্তরাল রেখা টান এই রেখা ক গয়ের যে বিন্দু স্পর্শ করিবে ক বিন্দু হইতে তাহার

* এই চিত্রে ক গ রেখায় ভ্রমক্রমে ৩ র স্থানে ৪, আর ৪ র স্থানে ৫ বসান হইয়াছে; পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা সংশোধন করিয়া লইবেন। চিত্রে ক গ রেখায় যেখানে ৩ আছে সেখানে ২½ পড়িতে হইবে।

যত দূরত্ব চাউলের মূল্যের মাত্রাও তত হইবে, চিত্রে দেখা যাইতেছে যে এই দূরত্ব দুই অর্থাৎপ্রত্যেক সেরের মূল্য দুই আনা। এইরূপে কত মূলে কত চাউল এই ব্যক্তি কিনিবে তাহা খ গ রেখা হইতে জানা যাইতে পারে। খ গ রেখা ক গ ও কথ দুই রেখাকেই স্পর্শ করিয়াছে—ক গকে স্পর্শ করার অর্থ এই যে মূল্য এত অধিক হইতে পারে যে ঐ ব্যক্তি চাউল একেবারেই কিনিতে সমর্থ হইবে না, কথকে স্পর্শ করার অর্থ এই যে মূল্য যখন একেবারে কিছুই হইবে না তখন ঐ ব্যক্তি চাউল যাহা দরকার তাহা বায়ুর ন্যায় অনায়াসে কি জলের ন্যায় অল্প আয়াসে পাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই মূল্য ও মাত্রা সূচক (খ গয়ের ন্যায়) একটী রেখা অঙ্কিত করা যাইতে পারে; (কগ ও কথয়ের ন্যায়) অন্য দুই রেখা হইতে এই রেখার বিন্দুগুলির দূরত্ব দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার মূল্যের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার চাহিদা নির্ণয় করিতে হইবে। পূর্ব্বের উদাহরণে আমরা বলিয়াছি যে একজন দরিদ্র লোক প্রথম একসের চাউলের নিমিত্ত চারি আনা, দ্বিতীয় একসের চাউলের নিমিত্ত তিন আনা, তৃতীয় একসের চাউলের নিমিত্ত আড়াই আনা, চতুর্থ একসের চাউলের নিমিত্ত দুই আনা ইত্যাদি প্রকারে মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে। উহার অপেক্ষা অধিক ধনী একজন ব্যক্তি হয়ত প্রথম একসের চাউলের নিমিত্ত আট আনা, দ্বিতীয় একসের চাউলের নিমিত্ত সাত আনা, তৃতীয় একসেরের নিমিত্ত ছয় আনা, চতুর্থ একসের চাউলের নিমিত্ত পাঁচ আনা, ইত্যাদি প্রকার মূল্যে চাউল কিনিতে প্রস্তুত আছে। এই ব্যক্তি অপেক্ষা আরও অধিক ধনী এক ব্যক্তি হয়ত প্রথম একসের চাউলের নিমিত্ত দশ আনা, দ্বিতীয় একসেরের নিমিত্ত নয় আনা, তৃতীয় একসেরের নিমিত্ত আট আনা, চতুর্থ একসেরের নিমিত্ত সাতআনা ইত্যাদি প্রকারে মূল্য দিয়া চাউল লইতে প্রস্তুত আছে।

প্রথম ব্যক্তি	মূল্য——	৪,	৩,	২॥০,	২,	ইত্যাদি	
	×	×	×	×	×		
	চাহিদা—	১,	২,	৩,	৪,	ইত্যাদি	
সমুদয় মূল্য—		৪,	৬,	৭॥০,	৮,	ইত্যাদি	
দ্বিতীয় ব্যক্তি	মূল্য——	৮,	৭,	৬,	৫,	৪,	৩, ইত্যাদি
	×	×	×	×	×	×	
	চাহিদা—	১,	২,	৩,	৪,	৫,	৬, ইত্যাদি
সমুদয় মূল্য—		৮,	১৪,	১৮,	২০,	২০,	১৮, ইত্যাদি
তৃতীয় ব্যক্তি	মূল্য——	১০,	৯,	৮,	৭,	৬,	৫, ৪, ৩, ইত্যাদি
	×	×	×	×	×	×	× ×
	চাহিদা—	১,	২,	৩,	৪,	৫,	৬, ৭, ৮, ইত্যাদি
সমুদয় মূল্য—		১০,	১৮,	২৪,	২৮,	৩০,	৩০, ২৮, ২৪, ইত্যাদি

মনেকর চাউলের সের দশ আনা করিয়া হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি চাউল কিনিতে পারে না, তাহা হইলে উল্লিখিত তিন ব্যক্তির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিই কেবল ঐ দরে চাউল কিনিবে আর সে ব্যক্তিও কেবল একসের চাউল কিনিবে; সুতরাং এই তিন ব্যক্তিকেই যদি আমরা ক্রেতৃবর্গ বলিয়া গণ্য করি অর্থাৎ এই তিন ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ ক্রেতা নাই এইরূপ যদি আমরা মনে করি, তবে চাউল বিক্রয় করিয়া কেবল মাত্র দশ আনা হইবে। আবার মনে কর আট আনা করিয়া সের হইলে প্রথম ব্যক্তি চাউল কিনিতে পারে না, তাহা হইলে ঐ দরে কেবল অন্য দুই ব্যক্তি চাউল কিনিবে। তৃতীয় ব্যক্তি ৮ আনা করিয়া ৩ সের, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ৮ আনা করিয়া ১ সের কিনিবে, সুতরাং চাউল বিক্রয় করিয়া সমুদয়ে ২৪+৮=৩২ আনা হইবে। চাউলের দর যদি চার আনা সের হয় তবে তৃতীয় ব্যক্তি ৭ সের, দ্বিতীয় ব্যক্তি ৫ সের, আর প্রথম ব্যক্তি ১ সের কিনিবে; সমুদয়ে ২৮+২০+৪=৫২ আনা হইবে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দরে ভিন্ন মাত্রায় চাউল বিক্রয় হইবে আর সমুদয় মূল্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার হইবে। এই উদাহরণে চাউলের চাহিদা যেমন এক সংখ্যা দ্বারা ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে, চাউলের মূল্যও তেমন ২য় ও ৩য় ব্যক্তির পক্ষে এক সংখ্যা দ্বারা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে আমরা এইরূপ অনুমান করিয়াছি কিন্তু ইহা একটী উদাহরণ মাত্র। চাউলের চাহিদার ঐ রূপে হ্রাস হইলে, চাউলের মূল্য অন্য কোন প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহা বলা বাহুল্য। এখন দেখা যাউক চাউলের মূল্য কি নিয়মে নির্দ্ধারিত হইবে। মনে কর কোন দেশে এক জন লোক সমুদয় চাউল উৎপন্ন ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা 'একচেটিয়া' করিয়া লইয়াছে; এরূপ অবস্থায় এই ব্যক্তি প্রথমে বিবেচনা করিবে যে প্রত্যেক সের চাউল উৎপন্ন করিতে ও বিক্রয় করিতে তাহার কত খরচ পড়িবে; সে যত কম খরচে উহা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে, সে এমন দেখিতে পাইতে পারে যে অধিক চাউল প্রস্তুত করিলে (অপেক্ষাকৃত) অল্প খরচ পড়িবার সম্ভাবনা আর তাহা হইলে সে অধিক মাত্রায় চাউল প্রস্তুত করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিক্রয়ার্থে চাউল প্রস্তুত করিতে প্রত্যেক সের চাউলে কত কত খরচ পড়িবে আর ভিন্ন ভিন্ন দরে কত কত চাউল বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা সে এই দুই বিষয় বিবেচনা করিবে; তাহার পর কোন্ দরে চাউল বিক্রয় করিলে সমুদয়ে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকলাভ হইবে তাহা স্থির করিয়া সেই দরে যত চাউল বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা তত চাউল প্রস্তুত করিবে। এক সের চাউলের মূল্য হইতে উহা প্রস্তুত করার খরচ বিয়োগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, ঐ একসের চাউল বিক্রয়ে তাহাই লাভ ইহা প্রায় সকলেই জানেন; কিন্তু সমুদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকলাভ এই যে কথাটী ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার অর্থ

স্পষ্ট করিয়া বলিলে বোধ হয় বাক্যবাহুল্য হইবে না। চাউলের মূল্য অতিশয় অধিক হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলে যে মাত্রায় চাউল বিক্রয় হইবে তাহা অল্প হওয়ার সম্ভাবনা আর চাউল অল্প মাত্রায় প্রস্তুত করিতে অধিক মাত্রায় প্রস্তুত করার অপেক্ষা প্রত্যেক সেরে অধিক খরচ পড়িতে পারে; সুতরাং এদিকে প্রত্যেক সেরের অধিক মূল্য হইতে অধিক খরচ বিয়োগ দিতে হইবে আবার ওদিকে চাউলের চাহিদা অল্প হওয়ায় সমুদয় লাভ অর্থাৎ (প্রত্যেক সেরের মূল্য—প্রত্যেক সের প্রস্তুত করার খরচ) চাহিদার মাত্রা অধিক না হইতেও পারে। কিন্তু চাউলের মূল্য যদি অল্প হয়, তবে চাউলের চাহিদা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা আর চাউলের খয়চও অপেক্ষাকৃত অল্প হইতে পারে, সুতরাং অল্প মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়া যে সমুদয় লাভ হইবে তাহা অধিক মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়া সমুদয় লাভের অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির চাউল প্রস্তুত ও বিক্রয় করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি দেখিবে কোন্ মূল্যে চাউল বিক্রয় করিলে তাহার সমুদয় লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে আর ঐ মূল্যে যে মাত্রায় চাউল বিক্রয় হইতে পারে সেই মাত্রায় চাউল প্রস্তুত করিবে; সুতরাং কাহারও একচেটিয়া ক্ষমতা থাকিলে সে ব্যক্তি কোন বিশেষ মূল্য স্থির করিয়া তাহার উপযোগী আমদানির রাশির সমান রাশিতে সামগ্রী আমদানি করিবে। কিন্তু চাউল প্রস্তুত ও বিক্রয় করার ক্ষমতা কাহারও যদি একচেটিয়া না থাকে, তবে বাজারে চাউলের যত আমদানি হইয়াছে তাহা হইতে মূল্য স্থির হইবে; যে মূল্যে বিক্রয় করিলে চাউলের আমদানি ক্রেতৃবর্গের চাউলের চাহিদার সমান হইবে অর্থাৎ যে মূল্যে বিক্রয় করিলে চাউলের যত ক্রেতা আছে তাহারা সকলেই ঐ মূল্যে যত যত চাউল চাহে তত তত চাউল পাইবে আর যত চাউল বিক্রয়ার্থে আমদানি হইয়াছে তাহার সমুদয়ই বিক্রয় হইবে সেই মূল্যেই চাউল বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা। উহার অপেক্ষা অধিক মূল্য হইলে হয়ত সমুদয় চাউল বিক্রয় হইবে না, উহার অপেক্ষা কম মূল্য হইলে এই কম মূল্যের উপযোগী চাহিদা চাউলের আমদানির অপেক্ষা অধিক হইতে পারে আর বিক্রেতাগণ তখন চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিবে। সুতরাং এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে চাউলের মূল্য উহার আমদানি ও চাহিদার উপর নির্ভর করে, যে মূল্যে চাউলের চাহিদা উহার আমদানির সমান হইবে সেই মূল্যেই চাউল বিক্রয় হইবে।

চাউলের মূল্য যে নিয়মে নির্দ্ধারিত হয়, অন্যান্য সামগ্রীর মূল্যও সেই নিয়মে নির্দ্ধারিত হয়, অর্থাৎ যে মূল্যে কোন সামগ্রীর চাহিদা উহার আমদানির সমান হইবে সেই মূল্যে সে সামগ্রী বিক্রয় হইবে। তবে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রীগুলির মধ্যে আমদানির সুবিধাসাপেক্ষত্ব পক্ষে বিভেদ আছে, কোন কোন সামগ্রী (যেমন হীরা, মণি, ইত্যাদি) অনেক দিন ঘরে রাখা যাইতে পারে আর যত দিন বিক্রেতাগণ উহাদিগের নিমিত্ত তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী চাহিদা দেখিতে না পায় তত দিন ঐ সকল সামগ্রী তাহারা একেবারেই বিক্রয় না করিতে পারে অথবা অল্প মাত্রায় বিক্রয় করিতে পারে। আবার কোন কোন সামগ্রী (যেমন চাউল, ডাউল, লবণ, ঘোড়া, ইত্যাদি) প্রথমোক্ত সামগ্রীগুলির ন্যায় অতি অধিক কাল রাখা না যাইতে পারিলেও কিছু কাল মজুদ্ রাখা যাইতে পারে, বিক্রেতাগণ তাহাদিগের সুবিধানুযায়ী চাহিদা দেখিয়া ঐ সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর সামগ্রী আছে (যেমন মাছ, দই, লুচি ইত্যাদি)—এই সকল সামগ্রী কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িতে পারে; বিক্রেতাগণ ইচ্ছানুযায়ী চাহিদা দেখিতে না পাইলেও এই সকল সামগ্রী বিক্রয় করিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চাউল যত অধিক প্রস্তুত করা যায় প্রত্যেক সের চাউলে তত অল্প খরচ পড়িবার সম্ভাবনা; এই কথাটী চাউলের পক্ষে কি অন্য কোন কৃষিজাত কি খনি কিম্বা জল হইতে সংগৃহীত সামগ্রীর পক্ষে যত প্রয়োগ হইতে পারে শিল্প জাত সামগ্রীর পক্ষে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রয়োগ হইতে পারে। শিল্প কার্য্যে শ্রমবিভাগের অধিক সম্ভাবনা, আর সেই নিমিত্ত শিল্প কার্য্যে যন্ত্র দ্বারা কার্য্য করারও অধিক সুবিধা, আর তাহা হইলে সামগ্রী প্রস্তুত করার খরচ ও কমিবার সম্ভাবনা।

আমরা ব্যাঙ্কিং নামক প্রবন্ধে আর এই প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি আর এইরূপ প্রকৃতির অন্য কোন প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিতে পারি, সে সকল কথা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে হয়ত স্থলে স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। বিজ্ঞানে কোন বিষয় আলোচনা করিতে হইলে তাহার আনুষঙ্গিক কতকগুলি ব্যাপার ছাড়িয়া দিতে হয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় এই গুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেমন আমরা উপরে বলিয়াছি যে কাহারও একচেটিয়া ক্ষমতা থাকিলে মূল্য হইতে আমদানি স্থির হয়. ইহাতে এমনও হয়ত মনে করা যাইতে পারে যে এই ব্যক্তি যত উচ্চ লাভ পাওয়া সম্ভব মনে করে তত উচ্চ লাভ পাইতে চেষ্টা করিবে; বস্তুতঃ এই ব্যক্তি অতি উচ্চ লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার অপেক্ষা কম লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কারণ সে ব্যক্তি দেখিতে পাইতে পারে যে অত্যন্ত অধিক লাভ করিলে তাহার আপাততঃ লাভ হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে সমাজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিএস্‌সি।

লীলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনেক রকম।

স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা বাঙ্গালীর ঘরে যেমন এমন আর কোথাও হয় কি, বালক আর বালিকা, দুই জনের হৃদয় কেমন একটু একটু করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হঠাৎ চক্ষু মিলন হইলেই দুজনেই মহা লজ্জায় পড়ে। দুয়ারের আড়ালে, থামর আড়ালে দাঁড়াইয়া বালিকা স্ত্রী বালক স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকে। জানালার একটি পাখী তুলিয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণ-নয়নে স্বামীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে। আবার পশ্চাতে স্বামীর পদশব্দ শুনিলে লজ্জিত হইয়া পলাইয়া যায়। সেইটুক মেয়ের কোথা হইতে এত লজ্জা আসে কেন যে এত লজ্জা তা জানি না। মনে মনে দুজনে কত কি ভাবে তাহারাই জানে। একবার কবে নিদ্রিতাবস্থায় করে কর স্পর্শ হইয়াছিল দুজনে তাহাই মনে করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আর একদিন কেশে কেশে মিশিয়াছিল কপোলে উষ্ণ নিশ্বাস লাগিয়াছিল কেবল তাহাই মনে পড়ে। আর একদিন নিদ্রাভঙ্গের পর চারিচক্ষে মিলন হইয়াছিল। সে লজ্জার কথা মনে করিলেই কপোল রক্তবর্ণ হইয়া ওঠে। সখীদিগের সঙ্গে খেলার মধ্যে সেই অনিন্দিত মুখখানি মনে পড়ে। কাণের কাছে রাজ্যের লোকে দিবানিশি বলিতেছে, তোর বরের মুখ তেমন ধারাল নয়। চোক দুটী ছোট ছোট, নাক একটু চাপা, ঠোঁট পুরু। বালিকা ভাবিয়া দেখে, কোথাও দোষ দেখিতে পায় না। সব সুন্দর; যতই সে মুখ আর সেমূর্ত্তি মানসচক্ষে দেখে ততই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর যতরূপ সব যেন স্বামীর শরীরে। আর সে স্বামী বই পড়িতে গিয়া কেবল সেই মুখখানি দেখিতে পায়। পাতায় পাতায় যেন সেই মুখের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পায়। শয়ন করিয়া ভাবে সে তাহার পাশে শুইয়া আছে। ভাবে তেমন রূপ ত্রিজগতে আর নাই। সেই রূপের ছবি ভাবিতে সে আর কোথাও রূপ দেখিতে পায় না।

কিরণের দিন দিন কত নূতন নূতন সুখ দুঃখ হইতে আরম্ভ হইল, তাহা গণিয়া উঠিতে পারা যায় না। সমবয়সী মেয়েরা কেবল শ্বশুরবাড়ীর, নিজের নিজের বরের আর কিরণের বরের গল্প করে। যে দিন সুরেশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে যান, সে দিন কিরণের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। সমবয়সীরা মিলিয়া তাহাকে ঝালাপালা করিয়া তোলে। সুরেশচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিলেই তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া ওঠে। ঠাকুর দেবতাদের মানায়, না এলেই ভাল। তাহা হইলে কেহ তাহাকে এমন করিয়া বিরক্ত করে না। আবার ভাবে আজ রাত্রে কি বলিব, কি বলিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিব? এই ভাবিতে সেই মুখখানি, সে মুখের কথাগুলি মনে পড়ে, আর—আর কি মনে পড়ে? আর ত কেহ নাই, তবু কিরণের এত লজ্জা কেন? কিরণ মনে করিতেছে,—মনে করিতে মুখ লাল হইয়া উঠিল,—মনে করিতেছে, তিনি আগে কথা কহিবেন না হাত দুটি ধরিয়া মুখের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া থাকিবেন? যদি আগে কথা না কন, তাহা হইলে কিরণ যাহা মনে করিয়াছে, তাহা আর কিছুই বলিতে পারিবে না। শেষ কিরণ রাগ করিয়া ভাবিত, "মানুষের বিয়ে হয় তাই জানি। আবার এ আসাযাওয়া কেন? তিনি কেন সেখানে থাকুন না আমি মার কাছে থাকি।" অমনি সেই মুখ, আর সেই মুখের কথা, আর সেই মধুর দৃষ্টি, একেকটী করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিত।

এখন কিরণ দিন দিন ডাগর হইয়া উঠিতেছে। বিয়ের জল পড়িলে মেয়েরা দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া ওঠে। যাহাকে এক বৎসর পূর্ব্বে কোলে করিয়াছ, এখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে লজ্জা করে। কিরণের কাজে কাজেই বাহির বাড়ীতে যাওয়া হয় না। কালে ভদ্রে কখন পূজার দালানে বাহির হইয়া একবার উঁকি মারিয়াই আবার বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া পালায়। কখন কখন ঝিকে সঙ্গে করিয়া দালানের থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া ফেরিওয়ালার জিনিস পত্র দেখিয়া পসন্দ করে। সাবানটা, চিরুণীটা, হ'ল একটা খোঁপার জাল, একগজ মাথার ফিতা, কাঁটা, হয়ত দুট কাঁচের পুতুল কিনিল। একদিন ধরিল বড় বড় বিলাতী মুক্তার একছড়া মালা কিনিবে। ফেরিওয়ালা চাচা দেখিলেন, সুবিধা মন্দ নয়। এমন দাঁও কদাচ মেলে। তিনি হাঁকিলেন, এক টাকার এক পয়সাও কম হইবে না।

ঝি বলিল, "মর্ মিন্সে। বাঙ্গাল পেলি না কি? অমন এক ছড়া মালা ছ গণ্ডা পয়সা ফেল্‌লে যেখানে সেখানে মেলে।"

চাচা রাগিয়া বলিল, "দর জান না, দর কর কেন? ছ গণ্ডায় এমন মালা পাওয়া যায় ত আমি দুশো ছড়া এখনি কিনি।"

ঝি বলিল, "ও কথা সবাই বলে। যা, তোর মালা চাইনে। একছড়া বিলিতি মুক্তার মালা বই ত নয়, দিদিমণি, আমায় তুমি পয়সা দিও আমি আজই তোমায় কিনে এনে দেব এখন।"

এবার চাচা কিরণকে ধরিল। কহিল, "দেখ দিদিমণি, এমন মালা যদি তোমার ঝি আন্‌তে পারে ত আমি যত বলি সব মিথ্যা। এমন জিনিসের এখন আর আমদানী নেই। আমার কাছে বিশ ছড়া ছিল, তার উনিশ ছড়া বেচেছি আর এই এক

ছড়া আছে। তা না নেও, ত আমি যাই। এখনি আর এক বাড়ীতে নেবে এখন।"

কিরণ কহিল, "না, তুমি যেওনা। আমি ঐ মালা ছড়াটা নেব। তুমি ঠিক দাম বল।"

ঝি বড় রাগিয়া বলিল, "দরওয়ানকে বলি মিন্সেরে তাড়িয়া দিতে! ছেলে মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিচ্চে। আ গেল যা দেড়ে মিন্সে!"

চাচা দাসীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "তা দিদিমণি, তোমার যখন এত ইচ্ছে, তখন আমি কেনা দামেই তোমাকে মালা ছড়া ছাড়িয়া দিব। দেখ, দশ আনা দিও। আমার এক পয়সাও লাভ হবে না। তা হোক, তুমি ছেলে মানুষ তুমি নাও। কোন পাজি তোমায় ঠকাচ্চে। যে মিথ্যা চলে সে হারাম খায়।"

কিরণ 'পাজি' কথাটা বুঝিল, 'হারাম' বুঝিতে পারিল না। ভাবিল একটা ভারি দিব্য হবে।

চাচা হারছড়া কিরণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কিরণ হাত বাড়াইয়া মালা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল। দাসী বকিতে বকিতে তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

কিরণ মাকে মালাছড়া দেখাইয়া কহিল, "মা আমি এইটে নেব।'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দাম বলে?"

কিরণ। দশ আনা। তার কম সে দেবে না। সে কত দিব্য কর্‌লে।

মা। দশ আনায় যে ভারি ঠকা হবে, মা।

কিরণ। তা হোক্। আমি ওটা নেব। তুমি মা তাকে ফিরে দিও না।

মা ভাবিলেন, আর কদিনই বা বাছা আমার কাছে আছে। আহা ওর যদি নিতে এত ইচ্ছে গিয়েচে, ত কিনিয়া দিই। মুখে বলিলেন,

"এস মা, আমি দাম দিইগে। কিন্তু এমন করে দাম না জেনে আর কিছু সামগ্রী কিনো না। এখন তুমি বড় হচ্চ, এখন থেকে পয়সা কড়িতে মায়া না হলে কি আর এর পর হবে?"

এই বলিয়া দশ আনা পয়সা ঝির হাতে গণিয়া দিলেন।

আমি দেখিতেছি আমার একটা মস্ত দোষ ঘটিতেছে। বলিতেছি বেশ একটা কথা, আবার তখনি আর একটা কথা পাড়িয়া বসি। কিরণ এখন আর বাহির বাড়ীতে যাইতে পায় না, সেই কথা বলিতেছিলাম। সুতরাং কিরণ সন্ধ্যার সময় অপর মেয়ে ছেলের সঙ্গে ছাদে বেড়ায়। সেই সময় পাড়ার দু চারিটী সমবয়সী আসিয়া জোটে। হয়ত এক দিন কিরণ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় সম্বাদ আসিল, কিরণের বর এয়েচে। অমনি একজন কিরণের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, "কিরণ, আয় তোর বরকে দেখ্‌বি আয়।"

কিরণ হাত ছাড়াইয়া কহিল, "পোড়াদশা আর কি! আমি কেন দেখ্‌তে গে-

ম? তোর এত সাধ হয়ে থাকে তুই খ্‌গে যা।"

আর একজন ধরিল, "কিরণ তোর র তোকে ডাক্‌চে ভাই।"

কিরণ। দূর, তোকে ডাক্‌চে। ওই নেচিস্, কার নাম ধরে ডাক্‌চে। যা, যা, টে যা!

যে কিরণের হাত ধরিয়াছিল, সে লিল, "ওলো, তোর বর যে তোকে কি মেরে দেখ্‌চে।"

কিরণ। আমায় বৈ কি! আমিত আর তোর মত সুন্দরী নই, যে আমাকে দেখ্‌বে। যা, তুই একবার তোর রূপ দেখিয়ে আয়।

"অত ঠাট্টা কেন? তুই না হয় সুন্দরী আছিস্। তা, বিধাতা ত সবাইকে সমান গড়ে না। তা বলে অমন করে বল্‌তে নেই।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "রাগিস্ কেন ভাই। আপনার বেলা বুঝি আঁটিসুটি। আমায় সকলে মিলে পাগল করে তুল্লেন, আর যাই আমি একটি কথা বলেচি অমনি মেয়ের রাগ হল। তা এমনি কলি বটে।"

তখন আর একজন আসিয়া কিরণের কাণে কাণে বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই কিরণ, তুই না কি সে দিন তোর বরের গলা জড়িয়ে ধরেছিলি?"

কিরণ ঘোর রোষে তাহাকে এক মর্ম্মান্তিক চিম্‌টি কাটিল। কহিল, "মর্ তুই। যত সব বিট্‌কেল কথা। মরণ তোমার।"

কিরণকে ছাড়িয়া তাহারা জামাইবাবুকে ধরিল। বৈঠকখানায় থাকিলে তেমন সুবিধা হয় না, এজন্য জামাইবাবু আর এক ঘরে নীত হইলেন। সেখানে চারি পাঁচজন সুন্দরী মিলিয়া তাঁহার উপর বচন বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরেশচন্দ্র সেই খরতর শরজালে আচ্ছন্ন হইলেন। অভিমন্যু সপ্তরথী মধ্যে পড়িলেন।

প্রথম সুন্দরী কহিলেন, "কি গো সুরেশবাবু ভাল আছ ত?"

দ্বিতীয় কহিলেন, "এখন যে আর বড় একটা এদিকে দেখ্‌তে পাইনে। ডুমুর ফুলটী হয়েচ না কি?"

তৃতীয়। তুমি না কি বড় সুন্দর ছড়া বাঁধ্‌তে পার? একটী ছড়া বল না, শুনি।

চতুর্থ। বলি, কিরণকে তোমার পচন্দ হয় ত?

সুরেশচন্দ্র নির্ভীক চিত্ত। এইরূপ বিবিধ প্রহরণেও কাতর হইলেন না, স্থির রহিলেন। কহিলেন, "কার কথায় উত্তর দিই?"

প্রথম সুন্দরী। সকলের কথার উত্তর দাও।

সুরেশচন্দ্র। আমার একটী বই দুটী মুখ নয়। তা, সে মুখটীও তোমাদের রূপে আর তোমাদের কথায় বোবা হয়ে যাবার মত হয়েচে। আমি চার কথার উত্তর একেবারে কেমন করিয়া দিব?

প্রথম সুন্দরী। তা না পার্‌লে ত এত ইংরেজি পড়ে, পাস করে কি হল? আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমাদের কথার আর উত্তর দিতে পার্‌বে না?

দ্বিতীয়। বাঃ তবে নাকি জামাই তামাসা জানে না?

তৃতীয়। কিরণের যে বেশ বর হয়েচে। আচ্ছা, বল দেখি কিরণ কেমন মেয়ে?

চতুর্থ। হ্যাঁ গা, সুরেশবাবু, তুমি না কি বড় কুঁদুলে?

সুরেশচন্দ্র এতক্ষণ অস্ত্রপ্রহার সহ্য করিতেছিলেন। এইবার তিনি প্রতিপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, "তোমরা অনেক কথা বল্‌লে। এইবার আমার গোটাকতক কথা শোন। আমি জ্যোতিষ শিখিয়াছি। বল ত তোমাদের মনের কথা বলি।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বল দেখি।"

সুরেশচন্দ্র প্রথম সুন্দরীকে কহিলেন, "তুমি কাল রাত্রে তোমার বরের সঙ্গে কোঁদল করিয়াছ। সত্য বল।"

সুন্দরী অমনি বলিলেন, "ও কি কথা! অমন করলে আমি এখানে থাক্‌ব না, আমি তবে উঠে যাই।"

সুরেশচন্দ্র আর একজনকে বলিলেন, "তোমার বর তোমায় বলেচে এক সিসি অটো ডি রোজ কিনে দেবে।"

তিনি বড় ফাঁপরে পড়িয়া কহিলেন, "মিথ্যা কথা! আমায় যে দিব্য কর্‌তে বল, আমি কর্‌চি। সব মিথ্যা।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তাও কি কখন হয়? আমার গণনায় ভুল হইবার যো নাই। তুমি ঠিক বল।"

বেগতিক দেখিয়া সুন্দরীরা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমরা যাই। অমনতর কথা বল্‌লে আমরা এখনি চলে যাব।"

সুরেশচন্দ্রেরই জিত। তিনি সহাস্যে কহিলেন, "না কাহারও যাইবার আবশ্যক নাই। এস, আমরা এখন তামাসা ছেড়ে অন্য কথা কই।

তখন শান্তি হইল।

আহারাদির পর সুরেশচন্দ্র শয়নাগারে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মেঘ।

সহরের ভিতর থাকিলে স্বভাবের শোভা তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় বড় বাড়ী, বড় বড় গাড়ী, বড় রাস্তা এ সব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মাঠ, দীঘি, গাছ পালা, বন জঙ্গল দেখা যায় না। সহরের সম্মুখে হরিপাদপদ্মবাহিনী পুণ্য সলিলা গঙ্গা দেবীর বিচিত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য কিছু মাত্র নাই। যে স্রোতের মুখে বলদর্পিত ঐরাবত তৃণ তুল্য ভাসিয়া গিয়াছিল, সে স্রোত আজ বাঁধা পড়িয়াছে। গঙ্গার বুকের উপর সেতু ভাসিতেছে, কূল ইঁটের গাঁথনিতে বাঁধা রহিয়াছে। বর্ষার সময় দুই কূল উদ্বেলিত করিয়া, পাড় ভাঙ্গিয়া, গ্রাম ডুবাইয়া, ঘোর জল ভঙ্গ রবে, রাজধানীর সম্মুখে ছুটিবার সাধ্য নাই। ইংরাজের দ্বারে অগ্নি বরুণ বাঁধা, কোন দিন চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু লৌহ শৃঙ্খলে রাজদ্বারে বদ্ধ হইবেন।

কলিকাতার বড় মানুষ মাত্রেই সহরের

বাহিরে একটী করিয়া বাগানবাড়ী রাখেন। বাগানের শোভা দেখাই যে উদ্দেশ্য, তা নয়। বাগান বাড়ী কেন ... তাহা সকলেই জানে।

আমাদের বাগানে ... কি কাজ, তা আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। পাহাড় পর্ব্বত, বন উপবন, নদ নদী, হ্রদ সরোবর এ সকলের বর্ণনা ভাল ভাল পুস্তকে পড়িতে বেশ লাগে। কিন্তু দেখিয়া যে কি সুখ, তা আমি কোন মতেই বুঝিতে পারি না। দশ বিশ টাকা রোজগার করিলাম, সংসার পাতিলাম, সময় সময় থিয়েটার, ঘোড়ার নাচ দেখিলাম, ইহাতেই কি মন ওঠে না? আবার অন্য দেশ দেখিতে যাওয়া, গাছ পালা দেখিতে যাওয়া কেন? এই কলিকাতার নিকটেই আলিপুরের চিড়িয়াখানা আর শিবপুরের কোম্পানীর বাগান রহিয়াছে। এ দুটীর মধ্যে কোনটী দেখিতে ভাল? চিড়িয়াখানায় কত রকম জানোয়ার, একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। আর কোম্পানীর বাগান— আছে কেবল গাছ, গাছ গাছ। তাও যদি দুট ... ফলের গাছ থাকে তা হলেও বুঝি। বাগান করিতে হয়, আম, লিচু, গোলাপজাম, আনারসের বাগান কর, যাহাতে কাজ দেখিবে। শিবপুরের বাগানে লোকে গিয়া ভারি ঠকে। আমি একবার দেখিতে গিয়াই নাকে খত দিয়া আসিয়াছি। যে দিকে তাকাও সারি সারি গাছ। সাগু গাছের সারি এমন এক পোয়া পথ। আবার এক দিকে দোথার তাল গা ... জায়গায় বড় বড় ঝোপ, এক দিকে গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় মিশিয়া অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে। এ সকল দেখিয়া কি হইবে?

তুমি যেন বুঝিলে, আমিও যেন বুঝিলাম। কিন্তু সকলে তা বুঝে কই, এমন লোক আছে যাহারা গাছ পালা দেখিবার তরে পাগল, যাহারা আকাশের দিকে চাহিয়া কত সুখ পায়। সারাবেলা চাহিয়া চাহিয়া মেঘ দেখে। আমি জানি মেঘ কেবল ছোট ছোট ছেলেরাই দেখে। বুঝি তাই বলে যে ছোট ছেলেদের মত আর কবি নাই। সুরেশচন্দ্র কাহারও কথা না শুনিয়া হয়ত মেঘের দিকে চাহিয়াই আছেন। অন্যমনস্ক হইয়া অনিমেষ চক্ষে মেঘ দেখিতে দেখিতে হয়ত সে দিন আর পড়া হইল না। সুরেশচন্দ্র বন্ধুদিগকে বলিতেন, "তোমরা আর কিছু না দেখ, আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও। মেঘের অনন্ত চিত্রপট দেখিও। রাত্রিকালে নক্ষত্র দেখিও। তাহা হইলে মন ভাল থাকিবে। যে আকাশের দিকে চায় না, সে মানুষ নয়, সে পশু।"

গণেশচন্দ্র একথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বলেছ ভাল, কবিকঙ্কণ। তবে তোমার যে কল্পনাশক্তি, তাহাতে কিছু বেশি উপরে উঠিয়াছ। আকাশ দেখিতে হইলে কি মেঘ পর্য্যন্ত চোক তুলিতে হইবে, না দোতালার বারাণ্ডা পর্য্যন্ত তুলিলেই হইবে?"

সুরেশচন্দ্র বিদ্রূপ শুনিলে হাসিতেন,

আবার মেঘ দেখিতে বসিতেন। এক দিন এই রকম একটা মেঘের বর্ণনা লিখিয়াছিলেন :—

"প্রভাত সূর্য্যের কিরণে সুবর্ণময় মেঘের ছটা, কোথাও মেঘমালা ভেদ করিয়া কিরণ কিরীটী দেখা যাইতেছে। পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে একে একে মেঘ খণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছে। সে স্বর্ণজ্যোতি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্ন হইলে আবার কত রকম চিত্র অঙ্কিত হয়। কৃষ্ণ মেঘখণ্ড, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অতি শুভ্র রজত রেখা। কখনও আকাশ নির্ম্মল, কোথাও কিছু নাই, কেবল অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ শুভ্র মেঘখণ্ড দিশাহারা তরণীর মত ঘুরিতেছে। আবার প্রকাণ্ড তুষারশুভ্র পর্ব্বত চূড়া, হিমালয়ের নীহারমণ্ডিত শৃঙ্গ নিচয়কে ব্যঙ্গ করিতেছে। আশুমুক্ত খনিজ রজতরাশির তুল্য স্থানে স্থানে রজতের স্তূপ। স্তূপের উপর স্তূপ। কখনও মেঘমধ্যে অতি ভয়ানক অরুণসঙ্কাশ যোগীমূর্ত্তি। মস্তকে ভীষণ জটাজূট, ললাটে ত্রিবলী অঙ্কিত, রক্তবস্ত্র পরিহিত, হস্তে কমণ্ডলু শোভিতেছে। কোথাও তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, কল্লোলিত সমুদ্রতুল্য তরঙ্গায়িত; তরঙ্গ-মুখে শুভ্র ফেণকুসুম ফুটিতেছে। পশ্চিমে অতি মনোহর সৌধ শ্রেণী, দ্বিতল, ত্রিতল, ষষ্ঠতল প্রাসাদরাজি। নানাবর্ণে রঞ্জিত, দীপমালায় পরিশোভিত। পূর্ব্বদিকে বিশাল বনস্পতি ভূষিত নিবিড় অরণ্য। শাখা হইতে শাখান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ভয়ঙ্কর অজগর সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া ফিরিতেছে। উত্তরে রজত প্রাচীর পরিবৃত অন্ধকার কূপ। কোথাও মেঘ নির্ম্মুক্ত শত শত সূর্য্য ঝলসিতেছে। সধূম সপ্তশিখ-বহ্নি জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক আকাশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আবার দেখ, অতি বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। তাহাতে বালুকার তরঙ্গ উঠিয়াছে! ঝটিকাবসানে নদীর বালুকাসৈকতে যেরূপ সোপান চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, কোথাও বা সেইরূপ রহিয়াছে। তরঙ্গ সোপানের পর সোপান, এইরূপ দীর্ঘ সোপানাবলী বিস্তৃত রহিয়াছে। এদিকে শুভ্র কুজ্ঝটিকা, অপর দিকে জলপূর্ণ, ধূমময়, ধীরগতি জলদরাশি। গোধূলীকালে পশ্চিমাকাশে স্বর্ণস্রোত ছুটিতেছে। আর তাহার নীচে হইতে অন্ধকার বদন ব্যাদান করিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে সেই রূপরাশি গ্রাস করিবার জন্য ধীরে অগ্রসর হইতেছে। চকিতের মধ্যে সব ফুরাইল। কালমেঘে সব ঢাকিল। স্বর্ণ রজতবর্ণ, ইন্দ্রচাপধারী মেঘের হাস্যময় মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। সেই মনোহর, নয়নরঞ্জনকারী ইন্দ্রধনু হইতে শর ছুটিল—বিদ্যুৎ! সে ধনুকের টঙ্কার বজ্র নির্ঘোষে হৃদয় কম্পিত করিয়া শব্দিত, প্রতিশব্দিত, পুনঃ শব্দিত হইতে লাগিল।"

গণেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে সুরেশচন্দ্রের কবিতা অধিকাংশই অপহৃত। আমি তাঁহার কথায় কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। আর নীরদা একদিন চুরী ধরিয়া দিয়াছিল। সুরেশচন্দ্র তাহার কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন। অপরের সাক্ষাতে অস্বীকার

করিতেন। যে চুরী করে সে সহজে তাহা স্বীকার করে না।

কিন্তু আমার এক একবার সন্দেহ হয় যে তিনি মেঘ হইতেই অধিকাংশ কবিতা চুরী করিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আড়িপাতা—প্রাচীনা ও নবীনা।

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে নবীনা ও প্রাচীনা। এ দুইজনকে লইয়া সর্ব্বদা তুলনায় সমালোচন চলিয়া থাকে। নবীনাদের অখ্যাতি এবং প্রাচীনাদের সুখ্যাতি করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমার বিস্তর আপত্তি আছে। পুরুষে স্ত্রী চরিত্র মীমাংসা করিবার কে? পুরুষ রমণীর কবে কি বুঝিয়াছে যে তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে? আর প্রাচীনার সুখ্যাতি করিলে কি লাভ? ঠাকুরুণদিদির ডাল্‌নার, অম্বলের সুখ্যাতি কর, তাঁহার তৈয়ারি করা আমের আচারের সুখ্যাতি কর, তিনি বেশ বুঝিতে পারিবেন। অন্য রকম সুখ্যাতি করিয়া দুই দিস্তা কাগজ পুরাইলে তিনি কি বুঝিবেন? তুমি সাদা কাগজের উপর কালো কালো মাথামুণ্ড কি আঁচড় কাট, তাহা কি তিনি কখন পড়িবেন, না বুঝিবেন? আর এখনকার শিক্ষিতা, নভেলপড়া নবীনার কোন সাহসে নিন্দা কর? সে দিন কোন কাগজে নবীনার নিন্দা করিয়াছিল, অমনি একজন নবীনা এমনি এক উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, যে নবীন মহাশয়েরা পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হইলেন। বাহিরের গালি খাইয়া কি পেট পূরে না, যে আবার ঘরের লোককে ঘাঁটাইয়া গালি খাও। আমি প্রাণান্তেও কখন নবীনাদের নিন্দা করি না! হয়ত এইমাত্র বলি যে ঠাকরুণদিদি মরিলে সরিষা ফোড়ন দিয়া এমন সুন্দর অম্বল, আর এই উপাদেয় মোচার ঘণ্ট কে রাঁধিবে? কোন্ কোন নবীনা মাছ মাংস খুব ভাল রাঁধিতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু, হায়, এমন সুক্ত প্রাচীনা ছাড়া আর কে রাঁধিতে জানে?

অন্য দিকে যতই অসাদৃশ্য হউক, আড়ি পাতিতে দুইজনেই সমান। সুরেশচন্দ্র শ্বশুরবাড়ী গেলে, বুড়ী যুবতী সকলেই আড়ি পাতিতেন। নবীনা ও প্রাচীনা উভয়েই আড়ি পাতিতে ভাল বাসেন; সত্য বলিলে ধর্ম্ম তুষ্ট হন,—বোধ করি যুবতীরা আড়ি পাতিতে আরও অধিক ভাল বাসেন। আড়ি পাতাকে কেহই ভাল বলে না, কিন্তু আড়ি পাতিতে কেহ ছাড়েও না। আড়ি পাতা পদ্ধতি কেমন করিয়া আরম্ভ হইল? আমি এ বিষয়ে একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছি।

আড়ি পাতা বালবিবাহের একটী ফল। আমার বোধ হয় আড়ি পাতা প্রথমে তেমন দোষের ছিল না। প্রেম যেমন স্বার্থপর, এমন আর কেহ নয়। স্বামীতে স্ত্রীতে প্রেম,—আর কেহ তাহার কিছুই জানিতে পারে না। দুজনে যা কথাবার্ত্তা কয়, অপর লোকে তার একটা কথাও শুনিতে পায় না। ভালবাসার একটা গুণ আছে, যে দেখে তারও মনে একটু আহ্লাদ হয়,

কিন্তু যুবক যুবতীর ভালবাসা আর কাহারও চোক সহিতে পারে না। দুজনে আপনাকে লইয়া এমনি মজিয়া থাকে যে তাহারা আর কাহারও দিকে ফিরিয়া চায় না, আর কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় না। কিন্তু বালক বালিকার তা হয় না। তাহারা প্রণয়ের স্বার্থপরতা জানে না, কোমলতা মাত্র জানে। তাহাদের ভালবাসায় অন্য লোকে ভাগ বসাইলে কিছু ক্ষতি হয় না। যাহারা আড়ি পাতে তাহারা মনে করে আমরাও এককালে এমনি সরল ছিলাম। বুড়ীরা কত পুরাতন কথা মনে করে, যুবতীরাও নিশ্বাস ফেলিয়া মনে করে যে আমাদের আর সে দিন নাই। কিন্তু এখন আর তেমন বাল্যবিবাহ হয় না। আড়িপাতাও যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ছল ধরে।

কিরণ বাড়িতে লাগিল। বার বছর উত্তরাইয়া তেরোয় পড়িল। সুরেশচন্দ্র খুব ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ী আসেন না বটে, কিন্তু প্রেমের আঁটাআঁটি হইতে কতক্ষণ? প্রেমের কল্পতরু পল্লবিত, মুকুলিত, কুসুমিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের মূল দুই জনের হৃদয় মধ্যে।

এ দম্পতীর প্রণয় যে খুব নূতন রকম হইল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে সব অর্থহীন আদরের কোটি কোটি কথা, সে অনেক ক্ষণ ধরিয়া চোখোচোখি, সে হাত ধরাধরি করিয়া মুখ চাওয়াচায়ি, সে অভিমান, সে মধুর লাঞ্ছনা, সে সব ঠিক সেই রকম আর কখন হয় নাই, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিরণ প্রথম প্রথম ভারি গোলে পড়িয়াছিল। পাড়ার সব যুবতীরা মিলিয়া তাহাকে প্রণয়ের পাঠশালায় অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন। "তোর বরের সঙ্গে এমনি করিয়া কথা কহিবি, এমনি করিয়া বরের মন রাখিবি, এমনি করিয়া মান করিবি, আবার একটু, একটু, একটু করিয়া, এমনি করিয়া, এমনি করিয়া সে মান ভাঙ্গিবে।" যদি কিরণ এই শিক্ষামত কাজ করিত, তাহা হইলে আমি বিনা ওজরে স্বীকার করিতাম যে সে নূতনতর কিছুই করে নাই। কিন্তু গোড়াগুড়িই বড় বিভ্রাট হইয়াছিল। কিরণ যাহা শিখিয়াছিল, সব উলট পালট গোলমাল হইয়া গেল। শিক্ষার সঙ্গে কিছুই মেলে না। না তেমন কথা কহা হয়, না তেমন মন রাখা হয়, না তেমন অভিমান করা হয়। সব নূতন। কিরণ পাঠাভ্যাস ছাড়িয়া দিয়া আপনি যেমন পারিল, তেমনি ভাল বাসিতে শিখিল। কাজেই তাহাদের ভালবাসা বড় নূতন রকম হইল।

কিরণ আর তত চঞ্চল নাই। সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রায় কোন কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে না, না পারিলে হাসিয়া ফেলে। ঠাকুরমা রাগ করিতেন, কখন কিরণকে, কখন কিরণের মাকে বকিতেন। কিরণের মা কিরণের কোন অকর্ম্ম দেখিয়া হাসিলে,

ঠাকুরমা বলিতেন, "ও কি বউমা, ছেলেলেকে অত আদর দেওয়া ভাল নয়। অকর্ম্ম কোর্‌লে কোথায় তুমি শাসাবে, না তুমি আরও হাস্‌চ? কিরণ যদি ছেলে হত তা হলে অমন আদর সাজত। মেয়ের কি অমন আদর কোর্‌তে আছে? আদুরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যখন গৃহস্থের কাজ কোর্‌তে পারবে না, তখন নিন্দা হবে কার, তোমার না আমার?" কিন্তু ঠাকুরমা যাই বলুন, কিরণের উপর আমার কিছুতে রাগ হয় না। এমন হাসি হাসি সোনার মুখখানি দেখিয়া কি তার উপর রাগ করা যায়? না যে মেয়ে দুদিন পরে পরের ঘরে যাবে তাকে মন্দ কথা বলা যায়?

তোমরা কিরণকে সুন্দরী বল আর নাই বল, আমি তাহাকে সুন্দর দেখি। আর সুরেশচন্দ্র যে তাহাকে কত সুন্দর দেখিতেন তা বলা যায় না। কিরণ আগের চেয়ে শান্ত হইয়াছে। রূপ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ থক্‌থকে গড়ন, রং আগের চেয়েও সুন্দর। চোখের চাহনি স্থির, শান্ত, একটুখানি আলস্য মাখা। সুরেশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন চক্ষের তারা কটা নয়।

আমার মনে মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে কিরণের বিদ্যাশিক্ষার ও সূচী শিল্পের প্রশংসা করিব। কিন্তু কিরণ, অসেয়ানা মেয়ে, আমার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। কিরণ যে বই পড়িতে একেবারে নারাজ, তা নয়। গল্পের বই পাইলে পড়িতে ভাল বাসে, কিন্তু আর কোন কেতাব হাতে করিলেই তাহার হাই ওঠে, চোক যেন বুজিয়া আসে। সূচের কাজ চলনসই এক রকম শিখিয়াছিল, কার্পেট, জুতা, গলাবন্দ বুনিতে পারিত বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম কাজে তেমন পাকা হইয়া উঠিতে পারে নাই। একবার একখানা ছাঁটা ফুলের আসন বুনিতে গিয়া কাঁচি দিয়া পশম কাটিবার সময় বড় হাসাইয়াছিল। দুটা ফুল সমান কাটিতে পারে নাই। একটা উঁচু, একটা নীচু করিয়া ফেলিল,—দেখিলে বোধ হয় যেন কাকে ঠোকরাইয়া রাখিয়াছে। সে আসনখানা সেই অবধি কিরণ যে কোথায় একটা কাপড়ের সিন্দুকের কোণে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

একদিন রাত্রে সুরেশচন্দ্র দুই হাতে কিরণের মুখ ধরিয়া, অনেকক্ষণ তাহার মুখ দেখিয়া কহিলেন, "কিরণ, তুমি যে আরও সুন্দর হচ্চ।"

কিরণ কহিল, 'যাও, তামাসা কোর্‌তে হবে না,' এই বলিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

একটু পরে সুরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে কহিলেন, 'কিরণ, আমি কি ভাবি জান?"

কিরণ মুখ তুলিয়া, স্বামীর মুখে চোক রাখিয়া কহিল, "কি?"

সুরেশচন্দ্র। আমি ভাবি যে আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে তুমি সুখে থাক্‌তে পার্‌তে। আমি কি কখনো তোমায় তেমন আদর যত্ন কোর্‌তে পার্‌ব?

কিরণ রাগ করিয়া সরিয়া বসিল। বলিল, "কি কথাই শিখেছেন! রাগ ধরে।

আমি তোমার ছাই ছাই কথা শুন্‌তে চাইনে।"

সুরেশচন্দ্র একটী ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তুমি যদি রাগ কর তা হলে না হয় আর বল্‌ব না। আর আমার কাছে আস্‌বে না?"

নিশ্বাসটী পড়িল, কিরণ শুনিতে পাইল। দেখিল স্বামীর মুখে বিষাদের চিহ্ন। আর কি রাগ থাকে? কিরণ আস্তে আস্তে স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া, স্বামীর একটী হাত তুলিয়া লইয়া আপনার গালের উপর রাখিল। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বড় কোমল স্বরে কহিল, "তুমি কি ভাব্‌চ, আমায় বল না।"

কিরণ ত এই টুকু মেয়ে কিন্তু সে ইহারই মধ্যে স্বামীর দুঃখের ভাগ চায়। যে দুঃখের ভাগী নয় সে কেন সুখের ভাগী হইতে চায়?

সুরেশচন্দ্র কিরণকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন। কহিলেন, "আমি কোন দুঃখের কথা মনে করি নি। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার এখানে ভাল লাগে না, পাড়া গাঁয়ে ভাল লাগে?"

কিরণ স্বামীর মুখে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া কহিল, "রক্ষা কর! পাড়াগাঁয়ের আর নাম কোরো না। এইখানে বেশ। পাড়াগাঁয়ে না কি আবার মানুষ থাকে! মাঠের মাঝখানে একলাটি,—মাগো!"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "মাঠের মাঝখানে ভয় কিসের? এখানে কেবল গলি ঘুঁজি, ভাল কোরে নিশ্বাস ফেল্‌বার যো নেই। পাড়াগাঁয়ে বেশ ফাঁকা কোন বালাই নেই। পাড়াগাঁ মন্দ হল কিসে?"

কিরণ। না, বড় ভাল। কেবল চারিদিকে গাছ আর অন্ধকার আর শেয়াল। সন্ধের সময় পুকুরে কাপড় কাচ্‌তে যাও, পথে কেবল বাঁশ ঝাড়। ঘোরঘোরের সময় বাড়ী ফিরে আস্‌তে হয়ত একটা বাঁশ নুঁয়ে ঘাড়ে পড়ল,—সে কথায় কাজ নেইক মনে কর্‌লে কেমন গা শিউরে ওঠে!

সুরেশচন্দ্র। আমি যদি তোমায় পাড়াগাঁয়ে নিয়ে যাই।

কিরণ। তা হলে যাব। আর কোন দিন ভূতে ঘাড় মুচ্‌ড়ে খোবে। তোমার ত তা হলে বেশ হয়, আর একটী সুন্দর দেখে বিয়ে কর্‌বে।

সুরেশচন্দ্র। আমি বুঝি রাগ কর্‌তে জানিনে? এখন থেকেই বুঝি মন্দ কথা বল্‌তে শিখ্‌চ?

কিরণ হাসিতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণ, তুমি কি ভূত আছে, বিশ্বাস কর?"

কিরণ বলিল, "তা করি আর না করি, লোকে ত বলে।"

তারপর খানিকক্ষণ আর কোন কথা হইল না। কিছু পরে সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "বড় গরম বোধ হচ্চে, জানালার একটা পাকি খুলে দাও ত।"

কিরণ ছল ধরিয়া ভারি হাসিয়া উঠিল। কহিল, "জানালা আবার কোন দেশী কথা? আমাদের কেউ জানালা বলে না।"

সুরেশচন্দ্র। তবে কি বলে?

কিরণ। জান্‌লা বলে।

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমাদের দেশী সব কথা জানে এমন একটী বর তোমার জুটিলে বেশ হইত। আমি একটী খুঁজ্‌ব না কি?"

কিরণ কোন কথা না কহিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যায় দেখিয়া, সুরেশচন্দ্র তাহার হাত ধরিলেন। কহিলেন, "আগে ঠাট্টা কর কেন?"

এ রকম যে কতবার হইত তা আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও গণিয়া উঠিতে পারি নাই। কিরণ কথায় কথায় ছল ধরিত। ছল ধরাধরি, রাগারাগির পালা পড়িয়াছিল। খুব ভালবাসা না হইলে ধাঁ করিয়া ছল ধরা যায় না। ছোট ছোট মেয়েগুলি কিছু বেশি ছল ধরে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভালবাসার কিছু বেশি ছড়াছড়ি। একটু বড় হইলে আর তত সহজে ছল ধরে না। যে তোমার কথায় ছল ধরে, সে তোমায় ভাল বাসে।

দশম পরিচ্ছেদ।

নূতন মানুষ।

এই সময় কিরণের একটী নূতন সঙ্গিনী জুটিল। মেয়েটীর নাম লীলাবতী। কিরণের বয়স তের বছর, লীলাবতীর সতের। কিন্তু এমন দু চার বছরের ছোট বড় হইলে কিছু আসিয়া যায় না। এ দুই জনে খুব ভাব হইল।

অলৌকিক রূপের বর্ণন, অনেক পড়িতে পাওয়া যায়। সুন্দরী রমণীর এমন ছবি দেখিতে পাওয়া যায় যে মনে হয় এমন রূপ পৃথিবীতে নাই। কিন্তু কোন সময় স্বচক্ষে এমন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে রূপের কল্পিত আদর্শ অপেক্ষা অধিক সুন্দর বোধ হয়। সে রূপ একবার দেখিলে আর ভোলা যায় না। যখন তখন, চলিতে ফিরিতে, সুখের সময়, দুঃখের সময় কেবল সেই রূপের ছবি মনে পড়ে।

বোধ করি লীলাবতীর রূপ সেই রকম।

এমন রূপ ত আমি কোথাও দেখি নাই। কিন্তু এ রূপ না দেখিলে আমি ভাল থাকিতাম। রূপ ত আনন্দের জন্য হইয়াছিল, তবে এ রূপ দেখিয়া চক্ষে জল আসে কেন? এমন চন্দন কাঠের পুত্তলিতে কোথায় ঘুণ ধরিয়াছে? এত রূপে এত বড় খুঁত কোথায়? এ রূপ ত পূর্ণ নয়, একটা কিছু গুরুতর অভাব আছে। এমন রূপ পূর্ণ নয় কেন?

লীলাবতী বিধবা।

লীলাবতীর বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন সে বিধবা হয়। এখন তাহার বয়স সতের বছর। সে এই তিন বছর বিধবা হইয়াছে।

দেখ, তোমরা একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখ! সে দিন সে রূপে আলো করিয়া, অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া কত আহ্লাদে বেড়াইত। যখন এক ঘর বড় মানুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল, তখন তাহার রূপের প্রশংসা কাহারও মুখে ধরে না। যাহারা কোথাও নির্দ্দোষ সুন্দরী দেখিতে পায় না, তাহারা সে রূপে মুগ্ধ

হইয়া বলিয়াছিল, "ঢের ঢের সুন্দরী দেখেছি বাপু, এমন রূপ কখনো দেখি নি" কেহ বলিয়াছিল, "ইটি কাদের বউ গা? এত রূপ ত কোথাও দেখি নি! ঠিক যেন ছবি খানি! যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরুণ!" সে কথা এখনো লীলার কাণে লাগিয়া আছে। এ সব যেন কালিকার কথা। আহা দেখ, দু হাতে দু গাছি বালা পরিত, আজও যেন হাতে তাহার দাগ রহিয়াছে! মাথায় যেখানে চিরুণী দিয়া সিঁতে কাটিয়া সিঁদুর পরিত, সে খানে দু চার গাছি চুল এখনো ওঠে নাই। ছোট পা দুখানিতে এখনো মলের কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। তিন বছর আগে সে সুন্দরী ছিল, এখন কি আর তেমন সুন্দরী নাই? হাত দুখানি শুধু, তবু যেন কত গহনা পরাইয়া রাখিয়াছে। এমন হাতে যদি সোনা দানা না উঠিল, এমন অঙ্গে যদি মণি মুক্তা না উঠিল ত গহনা কেন হইয়াছিল? আহা, লীলা এমন শান্ত মেয়ে, সে কখন কাহাকে ভুলিয়াও মন্দ বলে নাই, ঝি চাকরদের কখন তুমি বই তুই বলে নাই। কি অপরাধে, কোন পাপে, এই বয়সে তাহার কপাল পুড়িল? তাহার কোন সাধ মেটে নাই, কোন আশা পূরে নাই, কোন দুঃখ ঘুচে নাই, তবে সে কেন এই বয়সে চিরবিধবা হইল? বিধাতা কেন তাহাকে এত রূপ দিয়া গড়িল, কেনই বা তাহার ললাটে অনন্ত যন্ত্রণাময় চিরবৈধব্য লিখিল? লীলা অশান্ত নয়, দেখিয়া শুনিয়া সব মাটী মাড়াইয়া হাঁটে, সে কেন এমন অন্ধকূপে পতিত হইল? সে দিন হাঁটিবার সময় পায়ে ঝম্ ঝম্ করিয়া মল বাজিত, আজও সে এক এক সময় চমকিয়া উঠিয়া ভাবে, আমার পায় মল নাই কেন? অমনি সব মনে পড়ে। আগে সে যেখানে যাইত, পাড়া শুদ্ধ স্ত্রীলোকে তাহাকে দেখিতে আসিত, এখন তাহাকে দেখিয়া তাহারা সরিয়া যায়। কেহ একবার আহা বলে, কেহ একটী নিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার পর অন্যদিকে চলিয়া যায়। দু দিন আগে সে যেন চন্দন মাখিয়া বসিয়াছিল, সেই সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া লোক জড় হইত, এখন যেন সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছে, এজন্য কেহ তাহার নিকটে আসে না। আগে পাড়ায় কোথাও বিবাহ হইলে, তাহাকে এয়ো বলিয়া সকলের আগে ডাকিতে আসিত। এখন সধবাদের সঙ্গে থাকিলে লোকে ভাবে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। যে শাশুড়ী বউমা বলিতে অজ্ঞান, তিনি এখন ডাইনি, পোড়াকপালী, সর্ব্বনাশী, আরও কত কথা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন। বল দেখি, লীলার কি অপরাধ? কপালে যাহা ছিল তাহা ত হইয়াছে, তাহার উপর আবার এ গঞ্জনা কেন? নূতন নূতন একাদশী করিতে যে কি কষ্ট, তাহা বলিবার নয়। সকাল বেলা লীলা মুখ না ধুইতে শাশুড়ী খাবার হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেন,—"বউ মা, জল খাবে এস।" আর যখন বৈশাখ মাসের রৌদ্রের সময় অনাহারে, পিপাসায় পাগল হইয়া সেই সোনার পুত্তলি মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তখন কেহ তাহার গায়ে একবার হাত বুলা

ভারতী
৮ম খণ্ড
১২৯১
ব-সা-পরিষৎ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ইয়া দিল না, কেহ একবার সেই ধূলিধূসরিত অশ্রুবিগলিত করুণ মুখখানি আপনার আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিল না। লীলা যখন মাটী হইতে মুখ তুলিয়া, ভাঙ্গা গলায় বলিল, "আমার প্রাণ যায়। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেল। এক ফোঁটা জল খেতে না ও, আমার হাতে মুখে একটু জল দাও। গো, তোমাদের সকলের পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও," সে সময় কেহ একবার তাহার ঘরে উঁকি মারিল না। কেবল একটা দাসী তাহার দুঃখে কাতর হইয়া কাছে বসিয়া দুটা সান্ত্বনা বাক্য বলিয়াছিল। তাহার পর নির্জ্জলা একাদশীর কষ্টও ক্রমে সহিয়া গেল। প্রথম প্রথম লীলা লুকাইয়া লুকাইয়া কত কাঁদিত। রাত্রি হইলে তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিত না, চক্ষের জলে কাপড়, বালিশ সব ভাসিয়া যাইত। যুবতীরা যেখানে জড় হইয়া চুপি চুপি গান করিত, লীলা সেখানে যাইত না। সে কখনো কাহারও কাছে দুঃখ করিত না, কাহারও কাছে আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিত না। সে যে বড় বুদ্ধিমতী, সে একেবারেই বুঝিল যে তাহার দুঃখ আর কেহ বুঝিবে না, আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। পরের কাছে কাঁদিলে কি হইবে? তাহার দুঃখ ত এ জন্মে আর ঘুচিবে না। সংসারে যত সুখ আছে সব সুখের দুয়ারে কাঁটা পড়িয়াছে।

বিধবা হইয়া লীলা শ্বশুর বাড়ীই রহিল। সে আগে ঘরের লক্ষ্মী ছিল, এখন যেন ঘরের আলক্ষ্মী হইয়া উঠিল। সকলে হত-

শ্রদ্ধা করে, খোঁটা দেয়, প্রায় দূর ছাই করে। লীলা কখন একদিনের তরেও মুখ তুলিয়া একটী কথা বলে নাই। যার সব ফুরাইয়াছে, তার এ টুকু অধিক দুঃখে কি হইবে?

লীলার পিতা নাই। মাতা দুঃখী। তিনি লোকের মুখে লীলার যন্ত্রণা শুনিতে পাইলেন। লীলা তাঁহাকে নিজে কখন কিছু লিখিত না, চিঠি লিখিলেই লিখিত, ভাল আছি। কন্যার কষ্ট শুনিয়া মার প্রাণ স্থির রহিবে কেন? তিনি লীলাকে একবার দেখিবেন বলিয়া আনাইলেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে তাহাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবেন না। লীলা মার কাছে রহিল।

এইরূপে দুই আড়াই বছর গেল। তাহার পর লীলার মাতার মৃত্যু হইল। লীলার দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। একবার ভাবিল, শ্বশুরবাড়ী সংবাদ পাঠাই। আবার ভাবিল, আমি সেখানে গেলে তাঁহারা ত সন্তুষ্ট হবেন না। লীলা চক্ষের জল মুছিল। মাতার মৃত্যু হইলে সে বড় কাঁদে নাই। দুঃখে দুঃখে তাহার হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। একবার ভাবিল, আমিও কেন মরি না? আবার ভাবিল, আর কি বাকি আছে? খেতে না পাই, ভিক্ষা করব। তা না পাই, উপোস করব।

শ্বশুর বাড়ী হইতে লীলাকে লইতে আসিল না। কিরণের মা গ্রাম সম্পর্কে লীলার মাসী। তিনি সব শুনিতে পাইলেন। তৎ-

ক্ষণাৎ পাল্কী, বেহারা, ঝি, দরওয়ান পাঠাইয়া দিলেন। লীলার বাপের বাড়ী কলিকাতা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ। লীলা কলিকাতায় আসিল। কিরণের মা তাহাকে কন্যার অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। মাতার মৃত্যুর পর লীলা আর কাঁদিত না, পিতৃ গৃহ শুষ্ক চক্ষে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কিরণের মার যত্ন ও স্নেহ দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "বিধবাকে যে কেউ এমন যত্ন করে, তা আমি আগে জান্‌তাম না।"

লীলাকে দেখিয়া কিরণ ও একবার কাঁদিয়াছিল। তার পর লীলাকে দিদি বলিয়া ডাকিল, তাহাকে ভাল বাসিল। লীলাকে সকলে এত যত্ন করে দেখিয়া কিরণও তাহাকে সাধ্যমত যত্ন করিত। লীলার কিসে মন ভাল থাকে, কিরণের সেইটা মস্ত ভাবনা। লীলার মন ভাল থাকিবে বিবেচনা করিয়া সে তাহার কাছে আপনার সুখের কথা বলিত। স্বামীর ভালবাসা, দুই জনের অনুরাগ, স্বামীর সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইত, সব লীলাকে বলিত। যে সব বড় লুকান কথা বড় ভালবাসার কথা, তাহাও বলিতে আরম্ভ করিল। কিরণের এত বুদ্ধি ছিল না যে সে সব তলাইয়া ভাবিবে। তাহার কথায় যে লীলার দুঃখ হইতে পারে, কিরণ তাহা কখন মনে করিত না। যে সব কথায় তাহার এত আহ্লাদ হয়, যে সব কথা সে দিনরাত মনে করে, তাহাতে যে আর কাহারও কিছু দুঃখ হইতে পারে, কিরণ স্বপ্নেও এরূপ মনে করিতে পারিত না। বাস্তবিক কিরণের সুখের কথা শুনিয়া লীলার মন অনেক ভাল থাকিত। কেবল একটা দোষ ঘটিত। কিরণের স্বামীর কথা শুনিয়া লীলার নিজের স্বামীকে মনে পড়িত। যদি সে স্বামী ভাল হইত তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি ছিল না। কি পোড়া কপাল দেখ! তেমন দেববাঞ্ছিত স্ত্রীরত্ন পরিত্যাগ করিয়া লীলার স্বামী বারবিলাসিনীতে আসক্ত হইয়াছিল। লীলা স্বামীকে মনে পড়িলেই, ঘূর্ণিত রক্তচক্ষু, মুখে দুর্গন্ধ আর অশ্রাব্য কটু গালি, স্খলিতবসন, অস্থির গতি যুবককে চক্ষের সম্মুখে দেখিত। অত্যাচারে, অনিয়মে, অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার মৃত্যু হয়। কেবল মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার চৈতন্য হইয়াছিল। তখন লীলার সাক্ষাতে কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "তোমার মত স্ত্রীকে আমি এত দিন ফিরিয়া দেখি নাই। এখন এই বয়সে তোমায় পাথারে ভাসাইয়া চলিলাম। আমার নরকেও স্থান হইবে না।" লীলা সব ভুলিয়া গিয়াছিল, স্বামীর পা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কত কাঁদিয়াছিল, কত ঠাকুর দেবতাদের মানাইয়াছিল। স্বামী যাই হউক, গেলে ত আর আসিবে না। কিন্তু যম লীলার মুখ চাহিল না, যাহাকে লইতে আসিয়াছিল, তাহাকে লইয়া গেল। লীলা আর সব ভুলিয়া স্বামীর সেই শেষ কয়টী কথা মনে করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মনে পড়িলে সুখের কথা যেমন মনে পড়ে, দুঃখের কথা তার চেয়েও বেশী মনে পড়ে।

কিরণ অবুঝ মেয়ে। এক দিন লীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তোমার স্বামী কি তোমায় ভাল বাস্‌তেন?"

লীলা অনেকক্ষণ কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "আগে বাস্‌তেন না।"

কিরণ কহিল, "সে কি! তোমার মত সুন্দরী শান্ত স্ত্রীকে ভাল বাস্‌তেন না?"

লীলার চক্ষে জল পূরিয়া আসিতেছিল। বলিল, "তিনি শেষাশেষি আমায় ভাল বাস্‌তেন, কিন্তু সে ভালবাসা আমার অদৃষ্টে বেশি দিন ছিল না।"

কিরণ লীলার মুখ দেখিতেছিল। সে লীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি চক্ষের জল ফেল না, দিদি। আমি আর কখন তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব না।"

লীলা চোক মুছিয়া একটু হাসিল। কহিল, "আমি ত কিছু মনে করি নি। তোমার যখন যা ইচ্ছা হবে তাই জিজ্ঞাসা কোরো।"

কিরণ সেই অবধি আর কখন লীলার স্বামীর কথা পাড়িত না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

লীলা।

লীলার বয়স সবে সতের বছর। জীবনের নিগ্রহ আরও কত দিন আছে, কে জানে? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেমন করিয়া কাটিবে? কেমন করিয়া জীবনের দীর্ঘ রাত্রি পোহাইবে, এ অন্ধকারে কত কাল মরণের পথ চাহিয়া থাকিবে? কাহার মুখ চাহিয়া সে জীবনের ভার বহন করিবে? সবাই মরে কেবল পোড়া বিধবার মরণ নাই। তাহার বাঁচিয়া কোন সুখ নাই, মরণের কোলে শয়ন করিতে পারিলে তাহার প্রাণ জুড়ায়, কিন্তু যম তাহাকে ছোঁয় না, তাহার ছায়া মাড়ায় না। যে দিবানিশি মরণের পথ চাহিয়া থাকে, তাহার দ্বারে একবার ঘা মারে না। বাড়ীতে কঠিন পীড়া হইয়াছে, বাপ গেল, কার্ত্তিকের মত ভাই, স্বামীসোহাগিনী ভগিনী, কচি কাচা সব গেল, শূন্য ঘরে হাহাকার উঠিল, কেবল সেই হতভাগিনী বিধবা মরিল না। বিধবা হইলেই যেন অমর হয়। তাহার বাঁচিয়া কোন সুখ নাই, জীবনের সব বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যায় না। যাহারা চিরবৈধব্য বিধি করিয়াছিল, তাহারা কি মরণের সঙ্গেও কিছু পরামর্শ করিয়াছিল? যাহাকে মানুষে ঠেলিয়া রাখে তাহাকে কি যমও ডাকিয়া লয় না? যাহাকে মানুষে পরিত্যাগ করে, তাহাকে কি যমও পরিত্যাগ করে? আমোদে আহ্লাদে, কাজে কর্ম্মে বিধবার কোন অধিকার নাই, তবু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। অন্য মানুষে, অন্য স্ত্রীলোকে যেমন বাঁচিয়া থাকে তেমনি থাকিতে হইবে, কিন্তু আর সব পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যের শরীরে যেমন সুখ দুঃখ আছে, তাহারও ত তেমনি আছে। কিন্তু মনুষ্য জন্মের কোন সুখ তাহার কপালে ঘটে না। দেখ, সে

ধর্ম্ম কর্ম্ম জানে না, মনের দৃঢ়তা জানে না, তপস্যা সাধনা জানে না, ইন্দ্রিয় দমন করিতে তাহাকে কেহ কখন শিখায় নাই, সংসারের ভোগাভিলাষেই তাহার মন নিরত, এমন সময় তাহার মাথায় বাজ পড়িল। সংসারে থাকিয়া, সংসারের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের মধ্যে থাকিয়া, সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া, তাহাকে সংসারের সব সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। সুশীতল জলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত রাখিয়া, মাথায় আগুন জ্বালিয়া পুড়িতে হইবে, জ্বালা নিবৃত্তির জন্য এক ফোঁটা জলের তরে হাত বাড়াইতে পারিবে না। কাল সে যে পানটী খাইত, আজ সেটী খাইতে নাই, কাল সে কালাপেড়ে বুলু দেওয়া যে কাপড়খানি পরিত আজ সেটী পরিতে নাই, কাল সে যেমন হাসিত আজ তেমন হাসিতে নাই, কাল যে গানটী গাহিত, আজ সেটী গাহিতে নাই, কাল যাহার সঙ্গে কথা কহিলে কেহ মন্দ মনে করিত না, আজ তাহার সহিত কথা কহিলে লোকে কাণাকাণি করে। কাল সারাদিন ছাদে বেড়াইয়াছিল, কেহ একবার তাহা লক্ষ্য করিয়াও দেখে নাই, আজ তাহার ছাদে উঠিয়া চুল শুকাইতে নাই। কাল সে যেখানে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, আজ সেখানে যাইতে নাই। কাল যা ছিল আজ তা কিছু নাই, কিন্তু মানুষ ত সেই। তার মনে যে দুঃখ হইয়াছে, তাহার উপর আবার এত দুঃখ কেন?

কিরণ এক এক সময় ভাবিত লীলা এমন চোক করিয়া তাকায় কেন? তোমরা একবার লীলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। এক এক সময় যেন তাহার চোকে আলো প্রবেশ করে না, এক এক সময় দৃষ্টি এত শূন্য, এত দুঃখপূর্ণ যে দেখিলে চক্ষের জল রাখা যায় না। লীলা যা দেখে তাই শূন্য, না তাহার প্রাণের ভিতর শূন্য হইয়াছে? বাহিরে ত চারিদিক এত হাসিখুসী, এত লোকে হাসিতেছে, খেলিতেছে, আমোদ আহ্লাদ করিতেছে, বাহিরে ত শূন্য নয়। কিন্তু এক এক সময় লীলা কিছুই দেখিতে পায় না। বাহিরে যাহা কিছু হইতেছে, লীলার চক্ষে যেন তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না। আকাশের নীল রং যেন মিলাইয়া যায়, যেন উপরে কেবল একটা অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বরের মত দেখা যায়। চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করে; যেন কোথাও কিছু নাই। লীলা মনে করে যে সে না থাকিলে জগতের কি ক্ষতি? তাহার দুঃখে আর কাহারও কি? পৃথিবীর ত চারিদিকে আনন্দ কোলাহল, সে কোথায় এক কোণে আপনার দুঃখ লইয়া পড়িয়া আছে, তাহা কে জানিবে? কেহ না জানুক, লীলা কোথাও কিছু সুখ দেখিতে পায় না। জগত আপনা হইতে আরম্ভ, আপনাতেই শেষ। যাহার চক্ষে জল আসে, সে আর কিছু দেখিতে পায় না, সব যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা বোধ হয়। যে দুঃখী সে ভাবে বুঝি সব দুঃখময়। লীলা জানিত যে তাহার দুঃখে আর কাহারও কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু সে আগে যেমন সব সুন্দর দেখিত, এখন আর তেমন

পারিত না। লীলা ভাবিত যে আমার যখন কিছু ভাল লাগে না, তখন আমি বাঁচিয়া আছি কেন? কিন্তু ইচ্ছা হইলেই মরণ আসে না। একটী একটী মানুষ একটী একটী জগৎ। ইহাতে স্বার্থপরতা কিছু মাত্র নাই। আমার কাছে পৃথিবী যে জিনিস, তোমার কাছে কি ঠিক তাই? কাল আমি মরিলে এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকিবে? আজ আমি দুঃখী তুমি সুখী, তোমার কাছে জগৎ আনন্দময়, আমার কাছে দুঃখময়। আমার জগৎ তুমি কেমন করিয়া পাইবে?

লীলা বড় দুঃখী, তোমরা একবার তার মুখের দিকে তাকাও। দেখ, সে একলাটী জগৎসংসারের একটী কোণে দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া ফেল!

সরসী জলে শশী।

কি দেখাও সরসি,
হৃদয়ে ধরেছ তুমি গগণের শশী?
আনন্দ লহরী মেখে
গরবে উঠিছ ফেঁপে
হাসিতেছ টিপি টিপি
সোহাগের হাসি!
ভাবিছ অমন চাঁদ
কার আছে আর,
সুধামুখে হাসি রাশি
ঝরে সুধাধার।
হয়ো না সরসী তুমি
মত্ত অহঙ্কারে,
অই দেখ মাতু অঙ্কে
শিশু শোভাধরে।

তব চাঁদ-মুখে মসী
কলঙ্কের দাগ
মোদের চাঁদের মুখে
নব তাম রাগ।

তব চাঁদ দিবা রাতি
ভাতি না বিকাশে,
আমাদের অঙ্কে চাঁদ
দিবানিশি হাসে।

শুধু সুধা, সরসী,
তোমার চাঁদে ক্ষরে,
আমাদের চাঁদে
সুধা হাসি, মধু রাশি
—আধ আধ স্বরে।

খেলিতে তোমার চাঁদ
না জানে সরসী,
নক্ষত্র বালিকা মাঝে
শুধু থাকে বসি।

পঙ্কজ ভগিনী সনে
নাহি করে খেলা,
মন-দুঃখে মুদে থাকে
সুকোমলা বালা।

খেলিতে মোদের চাঁদ
তব চাঁদ সনে,
ক্ষুদ্র দুই খানিকর
আন্দোলি সঘনে—

কচি কচি দন্তগুলি
বিকাশিয়া কুন্তকলি
মনের হরষে ভাসি-
আধো আধো ডাকে—

আয় চাঁদ, "আই আই"
ঘন ঘন দেয় "তাই"
ছিছি কেন গো তোমার
চাঁদ শুধু চেয়ে থাকে।

কবিতাহার রচয়িত্রী প্রণীত।

ন্যাশনল্ ফণ্ড্।

কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে "ন্যাশনল্ ফণ্ড্" নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তাহা অতি সুলিখিত হইলেও, আমার বিবেচনায়, সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি তাই সে প্রবন্ধের যে২ যুক্তি ভ্রমাত্মক মনে করি তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে, "ন্যাশনল্" কথাটার যে মানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাই আমার বিবেচনায় ভ্রমাত্মক ও অসম্পূর্ণ। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, "ন্যাশনল্ বলিতে আমি ত এই বুঝি, সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে যাহা স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে, যাহা না হইয়া থাকিতে পারে না, যাহাকে জোর করিয়া ন্যাশনল বলিবার আবশ্যকই হয় না; কারণ, তাহা ন্যাশনল নয় বলিয়া কাহার ও মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ ও হয় না।" আদৌ, "সমস্ত নেশন" কোন দেশে কোন কালে কোন কিছু করে নাই; কখনো করিবে অথবা করিতে পারিবে, আমি বিশ্বাস করি না। "সমস্ত নেশন" বলিতে একটি নেশনের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষকে বুঝায়—একটি 'অবলা'কে ছাড়িলেও সে নেশনের সমস্তত্বের হানি হইল। তাই বলি, যদি 'ন্যাশনল' বলিতে কেবল তাহাই বুঝায় "সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে যাহা স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে," তবে উহা ঘোড়ার ডিমের নামান্তর মাত্র, কেননা এ দুনিয়ায় খাওয়া শোওয়া ভিন্ন এমন কিছুই নাই "সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, ইত্যাদি।" প্রবন্ধ-লেখকের মানে বোধ হয় এই, একটি নেশনের অধিকাংশ লোক যাহা করিতেছে, যাহা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, অথবা, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, যাহার উদ্ভাবন করিতেছে, তাহাই ন্যাশনল। পৃথিবীতে এরূপও কোন কার্য্য আছে কি না যাহা একটি নেশনের অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কিংবা কৃত হয়, গভীর সন্দেহের বিষয়। কোন কার্য্যই যে কোন একটি নেশনের অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয় নাই, অথবা হইবে না, এ কথা ত সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে; কেন না উদ্ভাবনী শক্তি লইয়া যে সে লোক জন্ম গ্রহণ করে না—পৃথিবীর যাঁহারা ক্ষণজন্মা পুরুষ তাঁহারাই সে শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান ও কার্য্য বহু লোক কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইলেও কোন একটি নেশনের অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় কি না বলা সুকঠিন—হইলেও অতি কদাচিৎ। ইংলণ্ডের পিয়ুরিটন রিভোলিয়ুশনকে প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি অনুসারে ন্যাশনল বলা যাইতে পারে না, কেন না তাহা সমস্ত নেশন করে নাই, অথবা সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে নাই। লক্ষ লক্ষ লোক রাজপক্ষে ছিল—রাজশক্তি, রাজশ্রী অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিল,—তথাপি আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের যে কেহ ইতিহাস লিখিয়াছেন তিনিই উক্ত বিপ্লবকে ন্যাশনল আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং মানিতে হইবে যে প্রবন্ধ-লেখক ন্যাশনল কথাটার যে মানে করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। "যাহা না হইয়া থাকিতে পারে না" তাহা ন্যাশনল, এ কথাও মানিতে পারি না। যাহা কিছু হয় তাহাই না হইয়া থাকিতে পারে না। আজ কাল যে নব্য ভারত বহু কুবিষয়ে ও ইংরেজের অনুকরণ করেন, তাহাও না হইয়া থাকিতে পারে না—যে শিক্ষা নব্য ভারত পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে ওরূপ অনুকরণ করিতেই হইবে; তাই কি সে অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে ন্যাশনল বলিবে? আর যদি বল তাহাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নাই। আমি কেবল এই বলিতে চাই যে ন্যাশনল বলিতে কেবল সে কার্য্যই বুঝায় না যাহা "সমস্ত নেশন করিতেছে, অথবা যাহা সমস্ত নেশন হইতে স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে।" ন্যাশনল বলিতে তাহাও বুঝায় যাহা একটি নেশনের বহু সংখ্যক লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ন্যাশনল কথাটার মানের একটা প্রধান অঙ্গ এখনও নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কোন একটি নেশনের উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত বা উদ্ভাবিত হয় তাহাও ন্যাশনল—কোন একটি নেশনের উন্নতি-কল্পে যাহা কৃত হয় তাহাও

ন্যাশনল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সমস্ত ভারতবাসী কর্ত্তৃক সংগঠিত নয়, তাই বলিয়া কি বলিব উহাকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নাম দেওয়া ভুল হইয়াছে? সমস্ত ভারতবাসীর জন্যে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই উহাকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং সে নাম দেওয়াটা সে জন্যেই ভুল হয় নাই। ন্যাশনল কথাটার ব্যবহার ও এই রকম। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে যদি ন্যাশনল এসোসিয়েশন নাম দেওয়া যাইত তাহা হইলেও ভুল হইত না, কেন না যদিও উক্ত সমিতিতে সমস্ত নেশন নাই, উহা সমস্ত নেশনের উন্নতিকল্পে সংস্থাপিত বলিয়াই ন্যাশনল নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যে ফণ্ড্ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই কারণেই তাহাকে ন্যাশনল ফণ্ড্ নাম দেওয়াটা একটা বিশেষ অপরাধ হয় নাই। হইতে পারে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যে যে উদ্দেশ্যে উক্ত ফণ্ড্ প্রয়োগ করিবেন কল্পনা করিয়াছেন, কাহারও কাহারও নিকট সে গুলি ঠিক ন্যাশনল বোধ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যতক্ষণ নেশনের উন্নতিকল্পে উক্ত ফণ্ড্ প্রয়োগ করা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সংকল্প ততক্ষণ উহাকে ন্যাশনল্ ফণ্ড্ বলা অযৌক্তিক নয়। এমন কোন উদ্দেশ্যই বোধ হয় হইতে পারে না, তাহাই বিষয়ে সমস্ত নেশন একমত হইবে। কেহ বলিবেন, রাজনৈতিক আন্দোলনেই ন্যাশনল ফণ্ডের অর্থ প্রধানতঃ ব্যয়িত হওয়া উচিত। কেহ বলিবেন, "এখনো ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় আসে নাই, শিল্পাদি আর অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে এখন ন্যাশনল ফণ্ডের প্রয়োগ হওয়া কর্ত্তব্য।" আর কেহ বলিবেন, "জনসাধারণ যতদিন শিক্ষিত না হইবে ততদিন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতি অসম্ভব, সুতরাং জনসাধারণের শিক্ষাকল্পেই ন্যাশনল ফণ্ড প্রযুক্ত হউক।" চতুর্থ এক ব্যক্তি বলিবেন, "নৈতিক উন্নতি ভিন্ন রাজনৈতিক উন্নতি হইতে পারে না—যাহাতে ভারতবাসীরা আত্মদ্রোহ ছাড়িয়া স্বদেশের, স্বজাতির হিতকল্পে আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান করিতে শেখে, তাহারই জন্যে চেষ্টা করা উচিত, তাহারই উদ্দেশে ন্যাশনল ফণ্ড প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।" পঞ্চম ব্যক্তি বলিবেন, "যে দেশের সামাজিক রীতিনীতি এত দুষ্ট সে দেশে সর্ব্বাগ্রে সমাজ সংস্কার চাই—বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দাও, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রচলন কর, স্ত্রীজাতিকে বন্ধনমুক্ত কর, জনসাধারণের গৃহদ্বারে অহর্নিশি যে দুর্ভিক্ষ দাঁড়াইয়া তাহাকে বিদূরিত কর, পরে রাজনৈতিক উন্নতির কথা বলিও—সমাজ সংস্কার উদ্দেশে ন্যাশনল ফণ্ড প্রয়োগ কর।" ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিবেন, "ধর্ম্মোন্নতি সকল উন্নতির মূল—দেশের লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দাও, তাহারা স্বার্থত্যাগী হইবে, দেশের জন্যে প্রাণপণ করিবে—ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি-স্বপ্ন সফল হইবে—ধর্ম্মশিক্ষায় ন্যাশনল ফণ্ডের প্রয়োগ হউক।" প্রবন্ধলেখক ন্যাশনল

কথাটির যে মানে করিয়াছেন তাহা যদি ঠিক হয় তবে ন্যাশনল ফণ্ড নামে একটা পদার্থই হইতে পারে না, তবে ন্যাশনল কথাটাকে ইংরেজী অভিধান হইতে বহিষ্কৃত করিতে হয়, কেন না তাহা হইলে দুনিয়ায় ন্যাশনল বলিয়া একটা চিহ্নই হইতে পারে না। তাই বলি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনে ফণ্ড প্রয়োগ করিবেন যদি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, তবু উহাকে ন্যাশনল ফণ্ড নাম দেওয়া অপরাধ হয় নাই—কেন না সে রাজনৈতিক আন্দোলন নেশনের উন্নতি কল্পেই হইবে।

তার পর প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, "Political agitation জিনিষটাই ন্যাশনল নয়। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, ও কথাটা বোঝে খুব কম লোক, আবার যে দু চার জন লোক বোঝে তাহাদের মধ্যে সকলের ও কাজটার প্রতি বিশেষ অনুরাগ নাই, কথাটার মানে জানে এই পর্য্যন্ত।" এই কথাগুলির উত্তর উপরেই দেওয়া হইয়াছে। এখানে শুধু এই বলিব, খুব কম লোকে বোঝে বলিয়া Political agitation যদি ন্যাশনল না হইল, তবে অস্ত্রনির্ম্মাণাদি শিক্ষার জন্যে ভারতবাসীদিগকে আমেরিকায় পাঠান ও ন্যাশনল কাজ নয়, কেন না উহা বোঝে খুব কম লোকে; বেদবেদান্ত ও ন্যাশনল নয়, কেন না উহা ও বোঝে খুব কম লোকে।

ন্যাশনল ফণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ-লেখকের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে উহার ভার যাঁহাদিগের হাতে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, এবং ইংরেজী ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শন-উদ্দেশেই জীবন ধারণ করিতেছেন। প্রথম কথা, এ দোষারোপটি অন্যায়, কেন না ইহার মূলে বড় একটা সত্য নাই। দ্বিতীয় কথা, এ দোষারোপটি ন্যায়সঙ্গত হইলেও ইহা ন্যাশনল ফণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তিস্বরূপ দাঁড়াইতে পারে না। প্রথমতঃ এই দোষারোপের মূলে যে বড় একটা সত্য নাই তাহাই দেখাইব। কাহার উপর ন্যাশনল ফণ্ডের ভার? ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উপর—অথবা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ন্যাশনল ফণ্ড স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ভার কাহার উপর? ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপর। ঐ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ন্যূনাধিক পঞ্চাশজন সভ্যদ্বারা সংগঠিত—উহাতে কলিকাতার প্রায় সমস্ত সুপরিচিত ব্যক্তিই আছেন—অনেকগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যপ্রিয় ও সুবাঙ্গালালেখকও আছেন—আমি কেবল একটি লোকের নাম করিব, বাবু রাজনারায়ণ বসু—আমার যদি নিতান্ত স্মৃতিবিভ্রম না ঘটিয়া থাকে তবে উক্ত সভার সভ্যগণের নামের তালিকা খুঁজিলে ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয়ের নামও পাওয়া যাইবে। সুতরাং বাঙ্গালা জানেন না এমন কতগুলি লোকের উপর ন্যাশনল ফণ্ডের ভার, একথা ঠিক সত্যমূলক নহে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একজন প্রধান অধিনায়ক বক্তৃতাদি করিতে ইংরেজীতেই করিয়া থাকেন, এ

কথা আমি মানিয়া লইলাম। একজন না হয় ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেন—দশজন যে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতেছেন? প্রবন্ধ-লেখক বলিবেন, "কৈ, আমি ত কখনো তাঁহাদিগের নাম শুনি নাই।" শুনিবেন কি করিয়া?—তাঁহারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে, জনসাধারণের সমিতিতে বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতার কথা খবরের কাগজে ওঠে না—সে ত আর টৌনহলে শিক্ষিত সমাজে বক্তৃতা নয়। আমার একটি সুপরিচিত ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হইয়া একবার আসামে ও ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন—বাঙ্গালায় অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কতক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ সর্ব্বদাই মফস্বলে যাইতেছেন—বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতেছেন—বোধ হয় কখনো তাঁহারা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন না। দেখা যাইতেছে এই সব বাঙ্গালা বক্তাদিগের নাম প্রবন্ধ-লেখক জানেন না—তাঁহারা ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে জানিতেন। ইংরেজীতে যে কাজ না হয় তাহা যে শুধু ইংরেজেরা জানিতে পারেন না এমন নহে, দেশীয় লোকেরা ও অনেকে জানিতে পারেন না—সে কাজটি ও তাহার ইতিহাস তাহার ক্ষেত্রেই বদ্ধ থাকে। সুতরাং আর কোন উদ্দেশ্যে না হউক, কেবল কোন কাজ হইতেছে এই কথাটি দেশময় জানান আবশ্যক হইলে ও সময়ে সময়ে ইংরেজী বক্তৃতাদির দরকার। ন্যাশনল ফণ্ড্ বিষয়ে লিখিতে গিয়া প্রবন্ধ-লেখক ইংরেজী বক্তৃতার বিরুদ্ধে এতগুলি কথা বলিয়াছেন, তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত, ইংরেজী বক্তৃতা দু একটা না হইলে তিনি ন্যাশনল ফণ্ডের বিষয় কখনো কিছু শুনিতেনই না। ইংরেজী বক্তৃতার আরও প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালা কেবলমাত্র বাঙ্গালীর ভাষা, নেশনের ভাষা নহে। ইংরেজী ও নেশনের ভাষা নয়, সত্য; কিন্তু একটি ন্যাশনল ভাষার অভাবে ইংরেজীই তাহার স্থানে এখন ব্যবহর্ত্তব্য, কেননা সমস্ত নেশন ইংরেজী না বুঝিলেও সমস্ত নেশনের যাঁহারা নেতা, শিক্ষাদাতা বা প্রতিনিধি তাঁহারা ইংরেজী বোঝেন—আর তাঁহাদিগকে নেশন সম্পকীয় কোন বিষয় বুঝাইলেই সমস্ত নেশনকে তাহা বুঝাইবার পথ পরিষ্কৃত হইল—অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত নেশনকে বুঝাইবার এক মাত্র যে উপায় আছে তাহা অবলম্বিত হইল। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, "গোড়াতে ইহার নামই হইয়াছে National fund, ইংরাজিতেই ইহার উদ্দেশ্য প্রচার হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত ইংরাজিতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে।" ন্যাশনল ফণ্ড নাম না রাখিয়া যদি জাতীয় ধনভাণ্ডার নাম রাখা যাইত, আর উহার উদ্দেশ্য যদি ইংরাজিতে না লিখিয়া কেবল বাঙ্গালায় লেখা হইত, তবে কি উহা ন্যাশনল ফণ্ড না হইয়া বাঙ্গালী ফণ্ড হইত না? আমি একদিন লাহোরে সর্দ্দার দয়ালসিংহ মজিথীয়ার হস্তে একখানি ন্যাশনল ফণ্ডের বিজ্ঞাপনী বা উদ্দেশ্য-পত্রিকা দেখিয়াছিলাম—যদি বাঙ্গালা

ভাষায় লিখিত হইত তবে কি কখনো উহা আমি তাঁহার হাতে দেখিতে পাইতাম? বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, মান্দ্রাজী, দাক্ষিণী, মধ্যভারতী, সকলেরই জন্যে ন্যাশনল ফণ্ড্—কেবল বাঙ্গালার লিখিলে ও বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলে চলিবে কেন? প্রথমে ইংরেজীতেই বলিতে ও লিখিতে হইবে—ইংরেজীতে বলিয়া, লিখিয়া যাঁহারা এ বিশাল ভারতে নেশনের নেতা ও শিক্ষাদাতা তাঁহাদিগের সহানুভূতি, সাহচর্য্য ও সহকারিতা লাভ করিতে পারিলেই নেশনের অর্দ্ধেক কাজ হইল; তাঁহারা পরে আপন আপন প্রদেশে যাহাতে জনসাধারণ ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়টা বুঝিতে পারে সে চেষ্টা দেখিবেন—অর্থাৎ পঞ্জাবে যাঁহারা শিক্ষিত ও স্বদেশবৎসল তাঁহারা পঞ্জাবী ভাষায় সে বিষয়ে বলিবেন ও লিখিবেন; মহারাষ্ট্রে যাঁহারা শিক্ষিত ও স্বদেশবৎসল তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সে বিষয়ে বলিবেন ও লিখিবেন, মান্দ্রাজে যাঁহারা শিক্ষিত ও স্বদেশবৎসল তাঁহারা মান্দ্রাজী ভাষায় সে বিষয়ে বলিবেন ও লিখিবেন, ইত্যাদি। ঠিক ইহাই কি আমরা দেখিতে পাইতেছি না? সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়ে কলিকাতায় ইংরেজীতে গোটা কতক বক্তৃতা করিয়াছেন, আর আনন্দমোহন বসু ইংরেজীতে লিখিত ন্যাশনল ফণ্ডের বিজ্ঞাপনী ভারতময় শিক্ষিত-সমাজে প্রচার করিয়াছেন, আর বাঙ্গালায়, হিন্দুস্থানে, পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে, মান্দ্রাজে, দাক্ষিণাত্যে, মধ্য ভারতে, সর্ব্বত্রই কি স্ব স্ব প্রদেশীয় ভাষায় ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়ে স্ব স্ব প্রদেশীয় সংবাদ পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই ও হইতেছে না?—সে ইংরেজী বক্তৃতা ও ইংরেজী বিজ্ঞাপনী কি এ মহাদেশে সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত আন্দোলনের সৃষ্টি করে নাই? যদি বা যতটা চাই ততটা আন্দোলনের সৃষ্টি না করিয়া থাকে তাহা ইংরেজী বক্তৃতা অথবা ইংরেজি বিজ্ঞাপনীর দোষ নহে, সে দোষ শিক্ষিত জনসাধারণের। বর্ত্তমান সময়ে দেশময়, নেশনময় কোন আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইলে ইংরেজীতেই তাহার সূচনা করিতে হইবে, কেননা বাঙ্গালা কিংবা অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় সূচনা করিলে তাহা বাঙ্গালা কিংবা অন্য কোন প্রদেশেই আবদ্ধ থাকিবে। তাই বলিয়া আমি বলিতেছি না, আন্দোলন কেবল ইংরেজীতেই হইবে। না, বরং আমি বুঝি, প্রকৃত ন্যাশনল আন্দোলন ইংরেজীতে হইতেই পারে না। ইংরেজী বৈজাতিক ও বৈদেশিক ভাষা, তাহা দ্বারা ভারতে ন্যাশনল আন্দোলন হইবে কিরূপে? আন্দোলন ভারতময় বিস্তৃত করিবার জন্যে সূচনা করিতে হইবে ইংরেজিতে, কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলন করিতে হইলে তাহাকে প্রদেশীয় ভাষা-পরিচ্ছদ পরাইয়া প্রদেশে প্রদেশে পাঠাইতে হইবে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অনেকটা ইহাই করিতেছেন। কেননা একথা সত্য হইলে প্রবন্ধ-লেখকের কথা যে "আজ পর্য্যন্ত ইংরাজিতেই ইহার (ন্যাশনল ফণ্ডের) কাণ্ডকারখানা চলিতেছে,

ঠিক নহে, কেন না আমি দেখাইয়াছি, যদি ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়ে পাঁচ ব্যক্তি ইংরেজিতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন, পঁচিশ ব্যক্তি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছেন—যদি ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়ে পাঁচটি সভার কার্য্য ইংরেজিতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, পঁচিশটি সভার কার্য্য বাঙ্গালায় নির্ব্বাহিত হইয়াছে। আমার দ্বিতীয় কথা এই যে প্রবন্ধ-লেখকের অভিযোগ যদি সত্য হইত, অর্থাৎ যাঁহাদের উপর ন্যাশনল ফণ্ডের ভার তাঁহারা যদি বাঙ্গালা-অনভিজ্ঞ ও ইংরেজী বক্তৃতাগত-প্রাণ হইতেন, তথাপি ন্যাশনল ফণ্ডটা নিন্দনীয় বিষয় হইত না। ন্যাশনল-ফণ্ড সংস্থাপন উচিতই, উহা সংগ্রহের ভার ওরূপ লোকের হাতে ন্যস্ত থাকা অনুচিত হইতে পারে।

প্রবন্ধ-লেখক বলেন "মুখে বলা হইতেছে, peopleরাই আমাদের সহায়, peopleদের জন্যই আমরা এতটা করিতেছি, peopleদের উপরেই আমাদের ভরসা! এসব ভাণ করিবার দরকার কি? * * * তাহাদের (peopleদের) হৃদয়ের সুখদুঃখ কোন খানে, কোন খানে ঘা পড়িলে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে তাহা কি তোমরা জান, না, জানিতে কেয়ার কর?" ইহাও বেচারী ন্যাশানলফণ্ড-সংগ্রহকারী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উপর অন্যায় অভিযোগ। খাজানার আইন সম্বন্ধে কি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন peopleদের পক্ষে বহু যত্ন ও চেষ্টা করেন নাই? সে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া কি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দেশীয় জমিদারগণের বিরাগভাজন হন নাই?

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অথবা ন্যাশনল ফণ্ড সংগ্রহ কর্ত্তারা আমাকে তাঁহাদিগের brief দেন নাই। তাঁহাদিগের বহুদোষ থাকিতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ে নিরপরাধী সে বিষয়ে তাঁহারা অপরাধী সাব্যস্ত না হন, ইহাই আমি দেখিতে চাই।

এতক্ষণ ত প্রবন্ধ-লেখকের সহিত ঝগড়া করিলাম; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে তাঁহার সহিত তাঁহার প্রবন্ধের মুখ্য কথা সম্বন্ধে আমার মতভেদ নাই। Political agitation-এ ন্যাশনল ফণ্ডের অর্থ প্রধানতঃ প্রয়োগ করিলে টাকাগুলি জলে যাইবে, আর দেশের বহু অনিষ্ট হইবে, এ কথা আমিও বলি। প্রবন্ধ-লেখক যথার্থ বলিয়াছেন, "তবে যদি কাজ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ও অসমর্থ পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া ইহার গৌণ উদ্দেশ্য হয়, তবেই ইহার দ্বারা আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি হইবে।" অসমর্থ পক্ষে Political agitation করা অর্থাৎ ভিক্ষা চাওয়া উচিত একথা প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। একেবারে ভিক্ষা ভিন্ন এ সর্ব্বথা দরিদ্র জাতির চলিবে কিরূপে? ভিক্ষালব্ধ শক্তি বা ক্ষমতা দ্বারা যে কোন জাতির উদ্ধার হয় না, একথা ভারতবাসীর জানা কর্ত্তব্য; কিন্তু তবু আমাদিগকে সময়ে সময়ে ভিক্ষা করিতে হইবে, কেন না অন্যথা Gagging Act প্রভৃতি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এরূপ রসাতলে ফেলিবেন যে শেষে আমাদিগের তাহা হইতে উঠিবার শক্তি আর একেবারেই

থাকিবে না। মাছেরা যেমন জলগর্ভে আপন আপন কার্য্য করে, কেবল এক এক বার নিশ্বাস লইবার জন্যে উপরে ওঠে, আমাদেরও তেমনি এক একবার গবর্ণমেণ্টের নিকট বাঁচিয়া থাকিবার অনুমতির জন্য উপস্থিত হইতে হইবে, কিন্তু ন্যাশনল জীবনের যে কার্য্য তাহা সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের অদৃশ্য থাকিয়া নীরবে খাটিতে হইবে। আসল কথা, আজও আমাদের Political agitation-এর সময় আসে নাই—আসিলে প্রবন্ধ-লেখকও সে কথার অর্থ ভিক্ষাবৃত্তি নির্দ্দেশ করিতেন না, আমিও সে অর্থ মানিয়া লইতাম না। Political agitation-এর জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে আমাদিগকে দীর্ঘকাল নিঃশব্দে কার্য্য করিতে হইবে—আমেরিকা ও য়ুরোপে পাঠাইয়া আমাদিগের যুবকদিগকে শিল্প বাণিজ্য, অস্ত্র শস্ত্র শিখাইতে হইবে; দেশের কাপড় দেশের কলে প্রস্তুত করিতে হইবে; দেশের জাহাজ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ দেশের লোকদ্বারা চালাইতে হইবে; দেশের কামান বন্দুক তরবারি দেশের লোকদ্বারা নির্ম্মাণ করাইতে হইবে, ইত্যাদি। একাজগুলি যখন আমরা নিজেরা করিতে পারিব, তখন Political agitation-এর সময় আসিবে, তখন Political agitation আর ভিক্ষাবৃত্তি রহিবে না, তখন সহস্র ইংরেজ ও আট আনা ইয়ুর (Eight-anna Eu) জন্যে পঞ্চবিংশতি কোটি ভারতবাসীর স্বত্ব কোন গবর্ণমেণ্টই বলিদান করিতে সাহসী হইবেন না। ব্যাঘ্র যেমন চীৎকার পূর্ব্বক আহার্য্য জন্তুর উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে নিঃশব্দে শক্তি সংগ্রহ করে, আমাদিগেরও তেমনি Political স্বত্ব বা অধিকারাদির উপর চীৎকার পূর্ব্বক লাফাইয়া পড়িবার আগে শক্তি উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করা আবশ্যক—নহিলে কেবল চীৎকারই সার হইবে, শীকার পলাইয়া যাইবে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কি এই শক্তি উপার্জ্জন ও সঞ্চয় চেষ্টায় ন্যাশনল ফণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন না? আর নাই বা পারিলেন—তাঁহারা না হয় Political agitation বা ভিক্ষা চাওয়ার কাজটাই করুন—প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই ত সময়ে সময়ে আমাদের ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া গবর্ণমেণ্টের দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে। নূতন যে ইণ্ডিয়ান ইয়ুনিয়ন হইয়াছেন তাঁহারা কেন এই শক্তি উপার্জ্জন ও সঞ্চয় চেষ্টা করুন না। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা যাহার সভাপতি সে সভার অর্থাভাব হইতেই পারে না; চিন্তাশীল স্বদেশবৎসল লোকেরও ইণ্ডিয়ান ইয়ুনিয়নে অভাব নাই; ইহাতেও যদি কাজ না হয় ত সে আমাদের দুরদৃষ্ট।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাস ভূমি কি না ?

অসীম আকাশ তলে কত তারা কত নক্ষত্র; আমরা যাহাদের দেখিতে পাইতেছি আবার যাহাদের দেখিতে পাইতেছি না এমন কত অগণ্য নক্ষত্র তারকায় বিশ্ব পুরিয়া রহিয়াছে। উহারা সকলেই এক একটি সূর্য্য, সকলেই এই সূর্য্যের মত গ্রহ উপগ্রহ বেষ্টিত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ঐ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, গ্রহগণ কি সকলেই পৃথিবীর মত জীবের নিবাস ভূমি!

বিশ্বের এই অগণ্য তারকাভাণ্ডারে পৃথিবী একটি অণুকনা, অতি সামান্য, অতি ক্ষুদ্র। এক দিকে এই রূপে অতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়াও পৃথিবী আর এক দিকে অতি মহৎ। পৃথিবী জীবের নিবাস ভূমি, কেবল তাহাই নহে, পৃথিবী মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের নিবাস ভূমি।

ঐ অগণ্য গ্রহ-জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সকলেই কি পৃথিবীর মত তবে জীব পূর্ণ? সকলেই কি জীব প্রতিপালন করিবার উচ্চ উদ্দেশ্য বক্ষে ধারণ করিয়া সেই উদ্দেশ্যকে পোষণ করিতে করিতে চলিয়াছে? এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করে! এখানে বিজ্ঞান নিরুত্তর। দূর দূরান্তর-স্থিত সূর্য্য মণ্ডলী বেষ্টনকারী গ্রহগণ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত। মানুষের দৃষ্টিগম্য এই সৌর জগতের গ্রহ কয়েকটিই যখন পূর্ণ মাত্রায় বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে, তখন সেই অদৃশ্য গ্রহদিগকে বিজ্ঞান কি প্রকারে আয়ত্ত করিবে।

সৌর জগতের যে কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ আছে তাহার মধ্যে চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিজ্ঞানের আয়ত্ত মধ্যে আসিয়াছে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র কতক পরিমাণে চন্দ্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা ভেদ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা জানিয়াছেন চন্দ্রে জল নাই, চন্দ্রে বায়ু নাই। ইহা হইতে তাঁহারা বলেন চন্দ্র জীব শূন্য।

বৃহস্পতি শনি ইয়ুরেনস্ ও নেপচুন এত নিবিড় মেঘ ও বাষ্পাবৃত যে তাহা ভেদ করিয়া দূরবীনের দৃষ্টি চলে না।

কিন্তু সেই নিবিড় মেঘ ও বাষ্প সম্ভবতঃ গ্রহগণের আভ্যন্তরিক বিষম উত্তাপের ফল, এবং সেই উত্তাপে মুহু মুর্হুঃ ঘোর ঘন ঘটায় বজ্র বৃষ্টি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া গ্রহ দিগকে বিপ্লবস্থ করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহগণের সেই বিষম অবস্থা পৃথিবীর সাম্য অবস্থা হইতে এত ভিন্ন যে উহারা জীবের নিবাস ভূমি নহে বলিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন।

বুধ শুক্র ও মঙ্গলের আভ্যন্তরিক অবস্থা যতদূর জানা যায় তাহাতে ইহারা অনেক

বিষয়ে পৃথিবীর বড় কাছাকাছি, বিশেষতঃ মঙ্গলের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐক্য দেখা যায়। এ সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়া থাকেন যে তাহা মনুষ্যের বাসের অনুপযোগী। বুধ ও শুক্র সূর্য্যের অতিরিক্ত নিকট বশতঃ সূর্য্যের নিকট হইতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ ও আলোক পাইয়া থাকে সেরূপ প্রচুর উত্তাপালোকে কোনরূপ জীবের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা জানেন না। মঙ্গল গ্রহ এ সম্বন্ধে ভাগ্যবান, সূর্য্যের নিকট পৃথিবী যে পরিমাণে উত্তাপ ও আলোক পাইয়া থাকে মঙ্গলও প্রায় সেই এক পরিমাণে উত্তাপালোক পায়। সুতরাং উত্তাপালোকের প্রাচুর্য্য বশতঃ মঙ্গলগ্রহ জীবদিগের বাসের অনুপযুক্ত নহে। কিন্তু উত্তাপালোক জীবের প্রাণরক্ষার প্রধান কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে। গ্রহের নিজের মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি তাহার চতুষ্পার্শস্থ অবস্থার উপরেও গ্রহস্থ জীবগণ প্রাণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। অনেকেই জানেন পৃথিবীর আকার ও পদার্থ সমষ্টির উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে। যদি পৃথিবীর পদার্থ সমষ্টির পরিমাণ ঠিক এখনকার মত থাকিয়া আকারে ইহা এখানকার অর্দ্ধেক হইত তাহা হইলে ইহার আকর্ষণ-বল এখন যেমন আছে তাহার চতুর্গুণ হইত, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক দ্রব্যের ভার এখনকার অপেক্ষা চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইত।

মঙ্গল গ্রহের পদার্থ সমষ্টির পরিমাণ পৃথিবীর অপেক্ষা অল্প, এবং যে পরিমাণে অল্প তাহা হইতে গণনা দ্বারা স্থির করা যায় যে পৃথিবীর যে দ্রব্য এখানে ওজনে ২৭ সের সেই দ্রব্য মঙ্গলে লইয়া গেলে ওজনে ১০ সের মাত্র হইবে। পৃথিবীর আকর্ষণ হঠাৎ মঙ্গল গ্রহের মত কম হইয়া পড়িলে ইহার জীবদিগের পক্ষে তাহা যে কিরূপ হানিজনক তাহা সহজেই বুঝা যায়। হিউএল বলেন পৃথিবীর দ্রব্য সকল তাহা হইলে যেখানে রাখা যাইবে সেই খানেই ঠিক হইয়া বসিয়া থাকিবে না, মানুষ জীব জন্তু দাঁড়াইবার সময় বেড়াইবার সময় ঠিক হইয়া চলিতে পারিবে না, জাহাজ যেমন সমুদ্রে টলমল করে সেইরূপ সর্ব্বদা টলমল করিতে থাকিবে। এই স্বল্পাকর্ষণে বাতাস অত্যন্ত লঘু হইয়া যাইবে। এখন পৃথিবীতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক বর্গ ইঞ্চ স্থানের উপর বায়ুর ভার প্রায় সাড়ে সাত সের, কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ মঙ্গলের সমান হইলে, পূর্ব্বোক্ত পরিমিত স্থানের উপর পৃথিবীর বায়ুর ভার প্রায় পৌণে তিন সের মাত্র হইবে। সমুদ্রতীর হইতে ৫মাইল উর্দ্ধে এখন পৃথিবীর এই রূপ লঘু বাতাস দেখা যায়। একরূপ পাখী ছাড়া এ বাতাসে পৃথিবীর অন্য কোন জীব জন্তুর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

মঙ্গলের চারিপাশে কত পরিমাণ বায়ু তাহা এখনো জ্যোতিষীগণ জানেন না, কিন্তু তাহা পৃথিবীর বায়ুর সমপরিমাণ হউক আর নাই হউক পৃথিবীর জীবদিগের পক্ষে উহা সকল অবস্থাতেই হানিজনক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মঙ্গলের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণ

অপেক্ষা অল্প সুতরাং মঙ্গল গ্রহের বায়ুর ঘনত্ব পৃথিবীর বায়ুর ঘনত্বের সমান হইতে গেলে মঙ্গলের বাতাসের পরিমাণ—পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক অধিক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলে আবার মঙ্গলের ন্যায় স্বল্পাকর্ষণ-বিশিষ্ট গ্রহে যখন ঝড় হইবে তখন সেই ঘন বাতাসের বল অত্যন্ত অধিক হইবে। সেই ভীষণ বলে পৃথিবীর মত জীব জন্তু সহজেই উড়াইয়া লইয়া যাইবে। অথচ এদিকে মঙ্গলের বায়ু পৃথিবী অপেক্ষা অধিক ঘন না হইলে মঙ্গলে অত্যন্ত শীতের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে কেননা পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল গ্রহ সূর্য্য হইতে অধিক দূরে অবস্থান করিতেছে। মঙ্গলে বায়ুর ঘনাবরণ না থাকিলে আভ্যন্তরিক উত্তাপ সহজেই সে বাহিরে ফেলিয়া দিবে। সুতরাং মঙ্গলের বায়ু পরিমাণ পৃথিবীর সমান হইতে আরম্ভ হইয়া যতই ইহার অধিক হইবে—ততই ঝড়ের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে—আর যত কম হইবে—ততই শীতের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে—কোন অবস্থাতেই পৃথিবীর জীবগণ জীবন ধারণ করিতে পারে না। তাহার পর মঙ্গল গ্রহের বৎসরের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ। একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে মঙ্গলের ৬৮৭ দিন লাগে। পৃথিবীর বৎসর মঙ্গলের মত দীর্ঘ হইলে তাহাতে উদ্ভিদ-জগতে বিষম বিপ্লব বাধিবার সম্ভাবনা।

এইরূপে মঙ্গলের চারিদিকের অবস্থা পৃথিবীর অবস্থা সমূহের সহিত মিলাইয়া জ্যোতিষীগণ সিদ্ধান্ত করেন সম্ভবতঃ মঙ্গল গ্রহও জীব শূন্য। এখন দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সৌরগ্রহগণে জীব আছে কি না সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়াও অন্যরূপে ইহার উত্তর দেন। পৃথিবীর অবস্থা অন্য গ্রহগণের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা দেখেন যে সে অবস্থায় পৃথিবীর জীব সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর উত্তাপ ও আলোক কিছু অধিক হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, পৃথিবীর আকর্ষণের কিছু অধিক ন্যূনাধিক্য হউক অমনি পৃথিবীর প্রলয় উপস্থিত হইবে। তাঁহারা এই জ্ঞান দিয়া অন্য গ্রহগণের অবস্থাও বিচার করিতে চাহেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বলেন সৌর জগতের অন্য গ্রহগণ জীব শূন্য তাহার অর্থ এই, পৃথিবীতে যেরূপ জীব দেখা যায় অন্য গ্রহে সেইরূপ প্রকৃতির জীব বর্ত্তমান নাই। ইহার অধিক আর তাঁহারা কিছু বলিতে পারেন না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথার যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া যাঁহারা নিষ্পত্তি করেন পৃথিবী ছাড়া সকল গ্রহই প্রকৃত পক্ষে বসতিহীন—তাঁহাদের নিষ্পত্তির কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। এই অবস্থায় জীবন সম্ভব আর এই অবস্থায় জীবন অসম্ভব এইরূপ একটি সীমা আজও পর্য্যন্ত বিজ্ঞান দিতে পারে নাই। মেরুদেশবর্ত্তী স্থানে ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্য দেখা দেয় না, সেই হিমশৈলাবৃত খণ্ডে যে মানুষ আছে ইহা না জানিলে কি আমরা তাহা মনে করিতে পারিতাম? সেইরূপ দারুণ শীত আমাদের দেশে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে আমাদের উদ্ভিদ

জীব জন্তু সকলেরি প্রাণবিনাশ করিবে সন্দেহ নাই। সেই জন্য যথার্থ চিন্তাশীল যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ কি অবস্থায় জীবন সম্ভব আর কি অবস্থায় জীবন অসম্ভব—ইহা মীমাংসা করা অসম্ভব মনে করেন।

বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে অল্প দিন হইল অতি কঠোর শিক্ষা পাইয়াছে। সুগভীর সাগর তলের অবস্থা বৈজ্ঞানিকগণ যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অতি গভীর সাগর তলে কোন প্রাণী থাকিতে পারে না, কেন না অধিক গভীর জলস্তর দ্বারা সিন্ধুতলে যতখানি চাপ পড়িবার কথা ততখানি চাপে আমরা যে সকল জীব জন্তু জানি তাহাদিগের কোনটীই বাঁচিতে পারে না। রূপ সম্বন্ধীয় পরীক্ষা হইতে তাঁহারা প্রতিপন্ন করেন যে সেই ঘোর জল-চাপে কঠিন কুম্ভীর-পৃষ্ঠ কিম্বা গণ্ডার-চর্ম্ম কিম্বা কঠিনতম ও ঘনতম কাষ্ঠও চুরমার হইয়া যাইবে।

অথচ এখন জানা গিয়াছে যে সেই অতি গভীর সাগরতলে জীবের বসতি আছে, কেবল তাহাই নহে তাহারা সাগর তলের সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়াও দেখিতে পায়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে কোন স্থানের চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থা ভেদে সেই অবস্থার অনুযায়ী জীব উৎপন্ন হইতে পারে, জীব জন্মিবার জন্য একটি বা কতকগুলি বিশেষ সার্ব্বভৌমিক উপযোগী অবস্থা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা নহে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন না—যে "এই পর্য্যন্ত ইহার সীমা—ইহার অধিক নহে।"

ইয়োরপের অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা গ্রহগণ যে জীবের নিবাস ভূমি ইহাই কল্পনা করিয়া থাকেন। একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী ছাড়া-আর কোটি কোটি-গ্রহ মণ্ডলী যে জীব পালন-রূপ মহৎ উদ্দেশ্য হীন হইয়া অবারিত গতিতে অনন্ত পথে অনন্তকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহাদের মতে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রাশি রাশি অগণ্য যে সূর্য্য রহিয়াছে তাহারা কত উত্তাপালোক বিকিরণ করিতেছে! সে সকলি যে বৃথা ব্যয় হইতেছে এইরূপ কল্পনাই উচ্চতম বৈজ্ঞানিক কল্পনা বলিয়া স্থির হইতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য নক্ষত্রের কথা ছাড়িয়া যদি কেবলমাত্র আমাদের সূর্য্যের উত্তাপের কথা ভাবা যায় তাহাতেই দেখা যাইবে যে, যে উত্তাপ পাইয়া পৃথিবী জীবিত আছে তাহা সূর্য্যের বিকিরিত উত্তাপের ২১, ৭০০, ০০, ০০০, ভাগের এক ভাগ মাত্র। সূর্য্যের এই উত্তাপ রাশির অতি সামান্য অংশ পৃথিবীর উপকার সাধন করিয়া অবশিষ্ট সকলি কি বৃথা নষ্ট হইতেছে! তাহা নহে, ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই উদ্দেশ্য হীন নহে, কিছুই বৃথা নষ্ট হয় না। আমাদের এই সীমা বদ্ধ ধারণা-শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব জগতের অভিপ্রায় সীমাবদ্ধ করিতে গেলেই আমরা ভ্রমে পতিত হইব। জ্যোতিষী প্রকটার এ সম্বন্ধে সুন্দর কথা বলিয়াছেন,

"ইহা অতি আশ্চর্য্য, যে আমরা মুখে

বলিবার সময় ঈশ্বরের মঙ্গলময় ভাব তাঁহার সৃষ্ট বস্তু মাত্রেতেই অর্পণ করি এবং তাঁহাকে অসীম জ্ঞানবান অসীম ক্ষমতাবান বলিয়া থাকি, অথচ অন্য লোকে প্রাণী আছে কি না এ বিষয় মীমাংসা করিতে গেলেই তখন সেই অসীম ক্ষমতাশালী ঈশ্বরের ক্ষমতা ও জ্ঞান সীমাবদ্ধ রূপে ধরিয়া লই। অন্য লোকের জীব কল্পনার সময় সেই লোকের স্থানীয়-অবস্থার উপযোগী করিয়া যে তিনি সেখানকার জীবদিগকে সৃষ্টি করিবেন ইহা না ভাবিয়া, যেরূপ জীবগণ আমাদের নিকট পরিচিত, আমরা তখনো সেইরূপ জীবগণের কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন লোকে সেরূপ জীব বাস করিতেই পারে না, আর যদিই বা পারে তবে তাহাদের সেখানে কষ্টের সীমা থাকে না।"

যদি প্রকৃতির মূল নিয়ম, সকল বিশ্ব ব্যাপী হয় তবে জীব উৎপাদিনী শক্তি এই পৃথিবীতেই একমাত্র আবদ্ধ এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়। ফরাসী জ্যোতিষী ডাক্তার কার্ল্ ডু-প্রেল গ্রহদিগের নিবাসীগণ বলিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে বলেন অন্য গ্রহে তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থার উপযোগী আকার ও শরীর যন্ত্রাদি সম্পন্ন জীব উৎপত্তি (যেরূপ জীবের অস্তিত্ব আমরা জানি না) যে কেবল সম্ভাবনীয় এমন নহে। যদি উহা সৃষ্টির অবশ্য প্রয়োজনীয় নাও হয়—তাহা হইলেও যুক্তি-যুক্ত রূপে যে উহা অবশ্য ঘটনীয় ইহা বলিতেই হইবে। এখন কথা হইতেছে অন্য গ্রহে জীব থাকিতে পারে—কিন্তু পৃথিবীর মানুষের ন্যায় জ্ঞানবান জীব আছে কি না?

যদি অন্য গ্রহে কোন রূপ জীব থাকা সম্ভব হয়—তবে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব থাকা কেনই বা সম্ভব না হইবে? তবে গ্রহের অবস্থা ভেদে সে জীবদিগের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রাদি পৃথিবীর মানুষ হইতে ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই। জীবগণ যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেই উদ্দেশে চারিদিকের অবস্থা ভেদে তাহাদিগের আকৃতি ও যন্ত্রাদির বিভিন্নতা দেখা যায়; এক লোকে কোন জীবের যে একটি শারীরিক যন্ত্রের আবশ্যক অন্য লোকে তাহারি অনাবশ্যক হইতে পারে। সেই হেতু অন্য লোক নিবাসীদিগের আকৃতি, ভার, বল, ইন্দ্রিয়, জীবনের স্থিতি কাল, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এই সমুদায়কেই বাস ভূমির চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থার উপযোগী হইতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে কোন গ্রহের নিবাসীদিগের শারীরিক ও মানসিক গঠন, সেই গ্রহের উত্তাপালোক প্রভৃতি চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থার সহস্থায়ী ফল মাত্র। সুতরাং অন্য কোন গ্রহে মানুষের ন্যায় জীব থাকাই অধিক সম্ভব, তবে সে জীব পৃথিবীর মানুষ হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন হইবে এই মাত্র।

আমরা দেখিতে পাই, উদ্ভবন, ক্রমোন্নতি, ক্রম বিকাশ সৃষ্টির মূল নিয়ম। ভূতত্ত্ববিদেরা আমাদের দেখাইতেছেন ক্রমোন্নতির নিয়মে জড়ের পর উদ্ভিদ, উদ্ভিদের পর ইতর জীব জন্তু, তাহার পর মানুষ এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাইব যখনি সৃষ্ট জগতে কোন বস্তু জড় পদার্থ রূপে ব্যক্ত হইল তখন প্রাণ উৎপাদিনী শক্তি তাহাতে নিহিতরূপে বিদ্যমান রহিল। এই শক্তি যে সে কোন নূতন স্থান হইতে লইয়া আসিল তাহা নহে, যখন সে জড় রূপে ব্যক্ত হয় নাই যখন সে অতি সূক্ষ্মতম ভাবে বিশ্বে বিলীন ছিল—সেই আদি কাল হইতেই সে শক্তি তাহার সঙ্গে ছিল।

বাস্তবিক পক্ষে আমরা যাহাদের অচেতন পদার্থ বলি তাহারা যে প্রকৃত পক্ষে চেতনাহীন তাহা হইতেই পারে না। তুলনায় মাত্র তাহারা এই নামের বাচ্য। বিজ্ঞান বলিতেছে জগতের শক্তি সমষ্টির হ্রাস বৃদ্ধি নাই, বাহির হইতে নূতন কোন শক্তি আসিয়া শক্তি সমষ্টির সংখ্যা বাড়াইতে পারে না রূপান্তর ভাবে মাত্র তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে জড় রাজ্যের বাহির হইতে কি করিয়া হঠাৎ জ্ঞান আসিবে? আমি যে এই দেয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করিলাম আঘাত করিবার শক্তি আগে হইতেই অবশ্য আমাতে বিদ্যমান ছিল, তবে সে শক্তি আমাতে লুকাইয়া ছিল মাত্র, এখন তাহাই কার্য্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মুষ্ট্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইল। অচেতন জগতও চেতনাময়—সমস্ত জগতেই প্রাণ ও চেতনা অস্ফুট ভাবে শক্তির আকারে বিরাজ করিতেছে। তাহারি ক্রমোন্নতি দ্বারা ক্রমে সে প্রাণ সে জ্ঞান উদ্ভিদ হইতে ইতর জীব জন্তুতে, ইতর জীব জন্তু হইতে মানবে অধিকতর রূপে পরিস্ফুট হইতেছে মাত্র।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে জড় ও প্রাণরাজ্যের বস্তুগত প্রভেদ কিছুই নাই—কেবল মাত্র শ্রেণীগত অর্থাৎ সোপানগত বিভেদ। ঐ যে কতকগুলি সোপান রহিয়াছে উহারা একই পদার্থে নির্ম্মিত কেবল উচ্চ নীচতায়, পরস্পর প্রভেদ মাত্র। সেইরূপ জড় পদার্থে ও জীবিত পদার্থে সোপান গত প্রভেদ মাত্র।

জড় ও প্রাণময়, জড়ও চেতনাময় কেবল তাহার চেতনা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে সে চেতনা আপনার চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। যাহাকে আমরা জীব বলি তাহাতে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং জড়ের সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চতম জ্ঞান-বিশিষ্ট প্রাণী-উদ্ভবনের সম্ভাব্যতা বর্ত্তমান রহিল।

ক্রমোন্নতির এই নিয়মেই পৃথিবীকে আমরা এখনকার এই অবস্থায় দেখিতেছি। প্রথম হইতেই ইহার এ অবস্থা ছিল না—প্রথমেই পৃথিবীতে মানুষ জন্মে নাই। আদিম সৌরজগৎব্যাপী সূর্য্য নীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথিবী-গোলক বাষ্পাবস্থা হইতে তরলাবস্থা তাহা হইতে সংহত-কঠিন অবস্থা ধারণ করিল, তাহার পর পৃথিবী বাসোপযোগী হইলে ইহাতে ইতর জীব উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে মানুষ পর্য্যন্ত আবির্ভাব হইল, এবং এই খানেই যে সেই উন্নতির চরম সীমা তাহাই বা কে বলিবে? বিজ্ঞান দেখাইতেছে যে ক্রমোন্নতির গতি ঘূর্ণ সোপানাবলীর ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। এই গতির সঙ্গে সঙ্গে জড়জগৎ

হইতে প্রাণীজগৎ সকলেরি চলিতে হইতেছে। তবে যাহারা এই গতির সহিত সমান বেগে দৌড়িতে পারে তাহারাই উর্দ্ধ সোপানে উঠে আর যাহারা তাহা না পারে তাহারা নীচে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে তখনকার মত লোপ পায়। ডারউইন এই নিমিত্তই বলিয়াছেন সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য জীবেরাই বাঁচিয়া যাইবে। ভূতত্ত্ববিদেরা দেখিতেছেন যে চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে যে সকল জীব আত্মরক্ষার উপযোগী শরীর যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিতে না পারে সে জাতি ক্রমে ক্রমে একেবারে লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার স্থান শূন্য হইয়া পড়ে না কেন না অন্য উপযোগী জীব উৎপন্ন হইয়া সে স্থান অধিকার করে। অন্য গ্রহগণ জীবের নিবাস ভূমি বলিয়া যদি একবার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে আরো অধিক দূর পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে, ঐ পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিতে পারা যাইবে না। যে লোকে জীব আছে ক্রমোন্নতির নিয়মে সেখানে ইতর হইতে ক্রমে উচ্চতর জীবের আবির্ভাব অবশ্যই সম্ভাবনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে এই আবির্ভাব কোন গ্রহে ঘটিয়া গিয়াছে কোন গ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এরূপ কল্পনা অসঙ্গত নহে।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

এম, বর্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।*

Mr. Bernier, who stand in the first rank of writers on Indian History. (Forster.)

সম্ভবতঃ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস বর্ণিয়ার ফ্রান্সের অন্তঃপাতি এঙ্গরন্‌নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া "ডাক্তার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া বর্ণিয়ার পর্য্যটন ব্রত অবলম্বন করিলেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সিরিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপর পর্য্যটক মিসর দেশে গমন করেন। তিনি কাহারা নগরে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাহার পর সুয়েজে আসিয়া পোতারোহনে লোহিত সাগরে ভ্রমণাভিলাষে বহির্গত হন। কিন্তু মক্কায় আসিয়া তিনি অবগত হইলেন যে রোমান কাথলিক খৃষ্টানদিগের পক্ষে সেই সময়ে গোণ্ডার (ইথোপিয়রাজ্য) দর্শন নিতান্ত নিরাপদ নহে। অগত্যা পর্য্যটক পূর্ব্ব অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় একখানা অর্ণবপোতারোহনে বাবেলমোণ্ডব প্রণালী অতিক্রম করিয়া দ্বাবিংশ দিবসে সুরাটনগরে উপনীত হন। বর্ণিয়ার প্রায় দ্বাদশ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়া ছিলেন। তাঁহার অবস্থান কালের ভারত-ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তাহার গ্রন্থের প্রথম ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ হয়। কিন্তু সেই অনুবাদ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে বলিয়া আর্বিং ব্রোক তাহার দ্বিতীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতে তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

বর্ণিয়ার বলিতেছেন—"বিখ্যাত মোগল সাম্রাজ্যের অধীন সুরাটে উপনীত হইলাম। সে সময় সাজাহান (বা "জগতপতি") ভারত-রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি জাহাঙ্গিরের (বা জগতবিজয়ীর) পুত্র ও আকবরের (বা মঁহতের) পৌত্র। আকবরের পিতা হুমাউনের পূর্ব্বে রাজবংশের বংশাবলী অনুসন্ধান দ্বারা অনুমিত হয় যে সাজাহান তাইমোরলেঙ্ক (বা খোড়ারাজা) হইতে দশ পুরুষ অবতীর্ণ। তাইমোর লেঙ্ক নামটী বিকৃত হইয়া "তাইমোরলেন" হইয়াছে।

সাহাজাহানের বয়ক্রম প্রায় ৭০ বৎসর। তাহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা। কয়েক বৎসর অতীত হইল সম্রাট তাহার চারি পুত্রকে চারিটী প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম দারা বা দারায়োস ; দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা ; তৃতীয় পুত্র ঔরংজীব ; চতুর্থ পুত্র মুরাদ বক্‌স্। কন্যা দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠাকুমারী বেগম সাহেব ও কনিষ্ঠা রুসিনারা বেগম নামে পরিচিত।

জ্যেষ্ঠকুমার দারা বিনয়ী, ভদ্র ও সদাশয় ছিলেন। তাঁহাতে সদগুণ সমূহের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি আপনাকে আপনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও গুণবান বিবেচনা করিতেন। পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কোন কর্ম্ম আছে বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার এরূপ ধারণা ছিল যে তিনি পরামর্শ বা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন এমত মানব জগতে দুর্লভ। দারা প্রকাশ্যে মুসলমান, কিন্তু গোপনে হিন্দুর নিকটে হিন্দু ও খৃষ্টানের নিকট খৃষ্টান বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

দ্বিতীয়কুমার সুলতান সুজা দোষগুণ সম্বন্ধে অধিকাংশই দারার অনুরূপ। কিন্তু তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান উমরা ও সামন্ত-রাজগণকে স্বপক্ষে রাখিবার বিলক্ষণ কৌশল জানিতেন। সুজা প্রকাশ্যরূপে পার্শিয়ানদিগের ধর্ম্ম † গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় রমণী মণ্ডলীর চিত্ত বিনোদনে অতিবাহিত হইত।

তৃতীয়কুমার ঔরংজীব ধীরপ্রকৃতি বুদ্ধিমান। তিনি বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ লোক অ-

---

* Travels in the mogul Empire, by Francis Bernier. Translated from the French, (in English) by Irving Brock. In Two Volumes.

† আবেস্তা গ্রন্থের ধর্ম্ম নহে। পারস্যবাসী মুসলমানদিগের ধর্ম্ম।

ক্লেশে স্থির করিতে পারিতেন। যে সকল লোকের সাহায্য কোন দিন তাঁহার আবশ্যক হইতে পারে তাহাদিগকে তিনি উপহার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। কেহ তাঁহার অন্তরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। যে সময়ে তিনি দক্ষিণাপথের রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন, সে সময়েও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পিতা যদি আমাকে রাজদণ্ড প্রদান না করিয়া ফকীর হইতে অনুমতি করিতেন তাহা হইলে আমি অধিক সুখী হইতাম। তিনি দিবারাত্রের অধিকাংশ সময় ঈশ্বরোপাসনা (বা নেমাজে) অতিবাহিত করিতেন এজন্য লোকে তাহাকে "নেমাজী" বলিত। সাজাহান তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে ঔরংজীবের সমধিক প্রশংসা করিতেন। দারার হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে নেমাজীর নাম, ভয় ও হিংসার সহিত প্রতিধ্বনিত হইত।

চতুর্থকুমার মুরাদ বক্স যেমন বয়সে তেমনি আবার গুণেও সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কোন বিষয় গোপন রাখিতে জানিতেন না। তিনি কেবল স্বীয় বাহুবলের উপরই নির্ভর করিতেন। তাঁহার অসাধারণ সাহস ছিল। যদি উপযুক্ত উপদেশ ও বিবেচনার সহিত তাঁহার সাহস ও বাহুবল পরিচালিত হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ভারত বর্ষের রাজাসন অধিকার করিতে পারিতেন।

জ্যেষ্ঠা কুমারী বেগম সাহেব, মনমোহিনী সুন্দরী ছিলেন। সাজাহান তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সাজাহান সম্বন্ধে ইতিহাস লেখক এমন একটি ঘৃণিত জন প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার সত্যতার প্রতি ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়—এবং তাহা লেখনীতে প্রকাশ করিবারও অযোগ্য। উৎকল ইতিহাস জনৈক উৎকলেশ্বরকে যে কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছে,ফরাসী পরিব্রাজক বর্ণিয়ার সাজাহানকে সেই কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বেগম সাহেব সর্ব্বদা পিতার আহারাদির ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিতেন। যে কোন খাদ্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত না হইত, তাহা সাজাহানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত না। রাজদরবারে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। এই রাজকুমারী স্বীয় ক্ষমতার গুণে অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক "মাসহরা" যেরূপ সর্ব্বাধিক ছিল, সেইরূপ চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্বদাই বহুমূল্য উপঢৌকন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। এইরূপ অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও তিনি স্বামী লাভের অধিকারিণী হন নাই। সাজাহানের নিকট বারংবার বেগম সাহেবের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। রাজকুমারীদিগকে বিবাহ দেওয়া বোধ হয় মোগল সম্রাটদিগের কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। দুইবার দুইটী যুবককে বেগম সাহেবের প্রিয় পাত্র বলিয়া সাজাহান চক্রান্ত করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। বেগম সাহেব প্রকাশ্যে দারার পক্ষ সমর্থন করিতেন। দারা সিংহাসন আরোহণ করিলে

তিনি বেগম সাহেবকে মনোমত স্বামী গ্রহণে অনুমতি দিবেন, এই প্রলোভন দেখাইয়াই বোধ হয় দারা বেগম সাহেবকে স্বীয় পক্ষে আনিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠা কুমারী রুসিনারা বেগম ; ইনি বেগম সাহেবের ন্যায় তত সুন্দরী ছিলেন না। রাজদরবারেও তাঁহার তত দূর প্রতিপত্তি ছিল না, তিনি প্রকাশ্যরূপে ঔরংজীবের পক্ষ সমর্থন করিতেন। সুতরাং দারা ও বেগম সাহেবের সহিত তাহার কিছু মাত্র সদ্ভাব ছিল না। বোধ হয় এ জন্যই তিনি বিশেষ ধন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই।

চরমাবস্থায় সাজাহান কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রগণকে শাসন করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কুমারগণের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। রাজদরবারের লোকগণ চারিভাগে বিভক্ত হইল। বেগতিক দেখিয়া সম্রাট কনিষ্ঠ পুত্রত্রয়কে দূর দেশে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। সুলতান সুজাকে বাঙ্গালার রাজাসনে অভিষিক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঔরংজীব দক্ষিণাপথে ও মুরাদ বক্স গুজরাটে প্রেরিত হইলেন। দৌলতাবাদ (প্রাচীন দেবগিরি) ঔরংজীবের রাজধানী হইয়া দারা কাবুল ও মুলতানের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়াতে তিনি ভারত রাজাসনের ভাবী অধিকারী বলিয়া তাঁহাকে রাজদরবারে থাকিতে হইল। সাজাহানের বিখ্যাত ময়ুরাসনের পার্শ্বে তাঁহার জন্য আর একখানি সিংহাসন স্থাপিত হইল। বেগম সাহেবের যত্নে যদিও সাজাহান দারাকে প্রকাশ্যে যুবরাজের ন্যায় ব্যবহার করিতেন তত্রাচ তাঁহার বিলক্ষণ ধারণা ছিল যে উত্তর কালে ঔরংজীবের বুদ্ধি-বলে দারার রাজাসন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এ জন্যই তিনি গোপনে ঔরংজীবের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব দেখাইতেন।

কনিষ্ঠ রাজপুত্র ত্রয় স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশ স্বাধীন রাজ্যের ন্যায় শাসন করিতে লাগিলেন। কাহাকেও সম্রাট সমক্ষে কোন প্রকার রাজস্ব প্রেরণ করিতে হইত না, সুতরাং তাঁহারা সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য রাজকুমারদিগের কার্য্য কলাপ বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, আমরা ভারতের ভাবী সম্রাট ঔরংজীবের সৌভাগ্য-সূচনার বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গোলকণ্ডার অধিপতির একজন বুদ্ধিমান, সুচতুর ও কর্ম্মঠ মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। পারস্যের রাজধানী ইস্পাহানের নিকটবর্ত্তী অর্দ্দি স্থান নামক পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া জনৈক হীরক বিক্রেতার অধীনে মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেই কার্য্যোপলক্ষে তিনি গোলকণ্ডায় গমনাগমন করিতেন।

কিয়ৎকাল মধ্যে তিনি দাসবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে গোলকণ্ডায় হীরকের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। ক্রমে সেই প্রদেশে তিনি একজন বিশেষ ধনবান বলিয়া খ্যাত হইলেন। তৈলঙ্গ ও গোলকণ্ডার রাজা কুতুবের দরবারে তাঁহার একটী সামান্য কর্ম্ম হইল। অসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে সেই সামান্য পদ হইতে ক্রমে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে উন্নীত করিল। তিনিই ভারত বিখ্যাত আমির জিম্লা প্রকাশ্য মির জুম্লা। তিনি তৈলঙ্গ রাজের সৈন্যগণের নায়কত্ব করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না। হীরকের ব্যবসা দ্বারা তাহার প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। সেই প্রদেশের প্রধান রাজপুরুষ হইয়াও তিনি হীরকের ব্যবসা পরিত্যাগ করেন নাই। জগতের নানা স্থানে তাঁহার ব্যবসা চলিতেছিল। ব্যবসায় দ্বারা অর্জ্জিত অতুল সম্পত্তির কিয়দংশ ব্যয় করিয়া তিনি বৃহৎ এক দল (অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ) সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। ক্রমে এই সংবাদ কুতুবের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার অন্তঃকরণে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি জুম্লাকে রাজসিংহাসন অধিকার লোলুপ বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তখনও তিনি তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত ভাব প্রকাশ করেন নাই। এসময়ে এমন একটী ঘৃণিত সংবাদ * রাজার কর্ণগোচর হইল, যে তৎশ্রবণে তিনি আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না, প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন।

আমির জুম্লা এসময়ে রাজ কার্য্যোপলক্ষে কর্ণাটে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রাজসভা তাঁহার অনুগত ও আত্মীয় বর্গ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের দ্বারা শীঘ্র জুম্লা স্বীয় দুর্ভাগ্যের সংবাদ অবগত হইলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র মহম্মদ আমির খাঁ এসময় রাজ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। জুম্লা তাহাকে কোন কার্য্যের ছল করিয়া রাজ দরবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণাটে উপস্থিত হইতে লিখিলেন। কিন্তু কুতুবের সতর্কতায় আমির খাঁ রাজধানী পরিত্যাগ করিতে অপারক হইলেন।

যাহার সহায়ে ঔরংজীব হিমালয় হইতে কুমারিক, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন সেই জুম্লা এক্ষণে সেই ঔরংজীবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জুম্লা ঔরংজীবকে লিখিলেন ঃ—

"জগৎ ইহা অবগত আছে যে আমি গোলকণ্ডা রাজের কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিয়াছি। রাজা কুতুব আমার নিকট গুরু কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিয়াও আমার ও আমার পরিবার বর্গের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ জন্য আমি আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে আমার পরামর্শ মতে কাজ করিলে আপনি অক্লেশে রাজা ও তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিতে পারিবেন। কেবল চারি পাঁচ সহস্র উপযুক্ত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আপনি গোলকণ্ডায় যাত্রা করুন। গোলকণ্ডায় উপনীত হইতে আপনার ১৬ দিবস লাগিবে। এরূপ প্রচার করিবেন যে আপনি সম্রাট সাজাহানের দূত রূপে গোলকণ্ডা রাজের নিকট যাইতেছেন।

"দবির" যে ব্যক্তি রাজা কুতুবকে সর্ব্ব প্রথম এই সংবাদ অবগত করাইবেন, তিনি আমার পরমাত্মীয়। সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে ও নিঃসংশয়ে বাগনগরের (রাজধানী) দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে পারিবেন। তৎপর যখন গোলকণ্ডা রাজ আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন তৎকালে আপনি অক্লেশে রাজাকে আবদ্ধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিতে সক্ষম হইবেন। অধিকন্তু আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি যে এই যুদ্ধযাত্রার সমস্ত ব্যয় আমি বহন করিব, আরও যতদিবস আপনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, আপনার দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রতি দিবস ৫০০০০ সহস্র টাকা প্রদান করিব।"

যে উপকরণে জুম্লা নির্ম্মিত বিধাতা সেই উপকরণে ঔরংজীবকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জুম্লার কূটবুদ্ধি জনিত পরামর্শ ঔরংজীব সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সুযোগ পরিত্যাগ করা তাঁহার নিকট কোন মতেই সঙ্গত বোধ হইল না। তিনি অবিলম্বে গোলকণ্ডারাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। জুম্লার কৌশলে ঔরংজীব নির্ব্বিঘ্নে বাগনগরের দ্বারদেশে যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন। রাজা কুতুব কয়েকজন সামান্য অনুচরের সহিত সম্রাট-দূতকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ঔরংজীবের নিকটবর্ত্তী হইলে জনেক ওমরা কুতুবকে বলিলেন—"জাহাপনা শীঘ্র পলায়ন করিয়া আত্ম রক্ষা করুন। এ দূত অন্য কেহ নহে স্বয়ং ঔরংজীব।"

রাজা কুতুব এই সংবাদ শ্রবণমাত্র পলায়ন করিয়া বাগনগরের নিকটবর্ত্তী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঔরংজীব সেই দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন।

ক্রমে দুই মাস অতিবাহিত হইল। ঔরংজীব সাজাহানের সাক্ষরিত এক আদেশ লিপি প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে "ঔরংজীব অবিলম্বে গোলকণ্ডা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার রাজধানী দৌলতাবাদে গমন করেন।" আদেশ পত্র পাঠ করিয়াই ঔরংজীব বুঝিতে পারিলেন যে দারা ও বেগম সাহেবের চক্রান্তে বাধ্য হইয়া সম্রাট এই আজ্ঞাপত্রে সাক্ষর করিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষেও ঔরংজীবকে ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে না দেওয়াই দারা ও বেগম সাহেবের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু অদৃষ্ট যাহার সহায় তাহার আর কে কি করিতে পারে। ঔরংজীব এমন কৌশলের সহিত পিতৃ

* The improper intimacy subsisting between Emir—Jemla and the queen-mother, who still retained much beauty.

Vol 1 page 19.

আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যে তদ্দ্বারা তাঁহার স্বীয় ও সম্রাটের যথেষ্ট লাভ হইয়াছিল। গোলকণ্ডা পতি ঔরংজীবের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন। যে—প্রথম, গোলকণ্ডা রাজ্যের মুদ্রায় সম্রাট সাজাহানের নাম অঙ্কিত হইবে। দ্বিতীয়, আমির জুম্লা তাঁহার ধন সম্পত্তি, পরিবার ও অনুচরবর্গ সহ যথা ইচ্ছা যাইতে পারিবেন। তৃতীয়, ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ, কুতুবের জ্যেষ্ঠ কন্যা বিবাহ করিবেন, এবং তিনিই কুতুবের মৃত্যুর পর গোলকণ্ডার রাজাসন অধিকার করিবেন। তদতিরিক্ত যুদ্ধের ব্যয় ও উপঢৌকন স্বরূপ কুতুব ঔরংজীবকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। কুমার মহম্মদ, কুতুবকন্যার পাণিগ্রহণকালে রামগড় দুর্গ ও তদন্তর্গত প্রদেশ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

আমির জুম্লা মুক্তিলাভ করিয়া ঔরংজীবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঔরংজীবের উন্নতির প্রকৃত সূচনা হইল। ঔরংজীব জুম্লার সহিত মিলিত হইয়া বিদর্ভ (বিদার) আক্রমণ করিলেন। সেই স্থান বিজয় ও লুণ্ঠন দ্বারা তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করত দৌলাতাবাদে গমন করিলেন।

জুম্লা কিছুকাল দৌলতাবাদ বাস করিয়াছিলেন। তৎপর সাজাহান তাঁহাকে আহ্বান করিলেন! জুম্লা আগ্রায় উপস্থিত হইয়া সম্রাটকে মণি মাণিক্য প্রভৃতি বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিলেন! এই সময়ে জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর জুম্লা সম্রাটকে অর্পন করেন। বীরকেশরী রঞ্জিতসিংহ যে রত্নের মূল্য "পাঁচজুতী" স্থির করিয়াছিলেন, অদ্য সেই রত্ন একব্যক্তি বিনা মূল্যে উপহার স্বরূপ ভারত সম্রাটকে প্রদান করিল। জুম্লা অমূল্য হীরকের প্রলোভন দেখাইয়া সম্রাটকে গোলকণ্ডা ও বিজয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিতে মন্ত্রণা দিলেন।

হীরকের প্রলোভনে পড়িয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক সাজাহান কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড জয় করিতে মনস্থ করিলেন। আমির জুম্লার অধীনে বৃহৎ একদল সৈন্য প্রস্তুত করা হইল। এই সৈন্য দল প্রস্তুত কালে সাজাহান ও দারার অভিপ্রায় যাহাই হউক না কেন, তদ্দ্বারা ঔরংজীবের ভাবী উন্নতির পথ পরিস্কার হইতে লাগিল।

এই সময়ে দারার চক্রান্তে সাজাহানের প্রধান মন্ত্রী উজির সাদুল্যাখাঁর গুপ্ত হত্যা সম্পাদিত হয়। সম্রাট দারার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তৎপর এত অধিক সৈন্য দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিয়া ঔরংজীবের বল বৃদ্ধি করিয়া দিতে দারা কোনমতেই সম্মত হইলেন না। কিন্তু তৎসম্বন্ধে সাজাহান দারার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না, কেবল এই মাত্র স্থির হইল যে, ঔরংজীবের সহিত এই সৈন্যদলের কোন সম্পর্ক থাকিবেক না, আমির জুম্লা স্বাধীনভাবে ইহার নায়কতা করিবেন এবং তাঁহার সদাচারের জামিন স্বরূপ জুম্লার পরিবার বর্গ আগ্রায় উপস্থিত থাকিবে।

জুম্লা সেই বৃহৎ সেনাদল লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইলেন। বিজয়পুর রাজ্যস্থিত কল্যাণনগরীই তিনি প্রথম অবরোধ করিলেন।

এই সময়ে সম্রাট সাজাহান বাতরোগে আক্রান্ত হন। তখন তাহার বয়ক্রম ৭০ বৎসর। সুতরাং সকলেই সম্রাটের জীবনাশায় নিরাশ হইলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এই সংবাদ ঘোষিত হইল। দারা সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া আগ্রা ও দিল্লীর সেনানিবাস পূর্ণ করিলেন। বাঙ্গালায়, সুজা, দক্ষিণাপথে ঔরংজীব ও গুজরাটে মুরাদ বক্স যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

গোলাপ।

বর্ষাকালেই টক্‌টকে গোলাপী রংএর গোলাপের বড় আমদানী। যে কোন বাগানে গোলাপের গাছ আছে, সেখানেই পবনভরে সতেজ-ডালের উপর ফুটন্ত গোলাপ হিল্লোলিত হইতেছে দেখা যায়। সুরভি ও সুষমাবিশিষ্ট পুষ্পরাজীর মধ্যে গোলাপ যে এক অতি রমণীয় মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য ও গন্ধবিশিষ্ট ফুল, তাহা কেবল মেরু সন্নিহিত অধিবাসীদিগকেই বলিয়া দিতে হয়। ফুটন্ত বড় গোছের গোলাপের সকলেই পক্ষপাতী। শাখার উপর একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ দেখিলেই ছেলে বুড়ো-আদি সকলে অমনি হাত বাড়াইয়া ফুলটি ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু অমন ফুল কি ছিঁড়িতে আছে? ডালের মাথার উপর থাকিয়া সগর্ব্বে দুলিতে দুলিতে ফুলটি যে তোমার আমার পাঁচ জনের হৃদয়ে কত রকমের ভাব আনিয়া দিবে, কত পোকা-মাকড়কে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে উপাদেয় খাদ্যে পরিতোষ করিবে, কত ভৃঙ্গ, প্রজাপতি ও মৌমাছি মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া নানা নৃত্যভঙ্গে উড়িতে উড়িতে গোলাপের নিকট সমাগত হইবে এবং গোলাপ ইহাদিগের দ্বারা পরোক্ষভাবে নিজ বংশ বর্দ্ধনের উপায় করিয়া লইবে, ও ফুল কি ছিঁড়িতে আছে?

আমাদের পাঠকদের অনেকের স্মরণ থাকিলেও থাকিতে পারে, "পুষ্প-তত্ত্ব" পাঠে আমরা জানিয়াছিলাম যে, কোন ফুল মানুষের মন ভুলাইবার জন্য বা তাহার প্রাণে ক্ষণিক সুখের সঞ্চার করিবার নিমিত্ত শাখাগ্রে মুকুলিত বা প্রস্ফুটিত হয় না। ফুল

গাছে ফুটে, কেবল তাহার নিজের জন্য। আমরা আজ এই সম্মুখস্থ গোলাপটি তুলিয়া লই। গন্ধ আঘ্রাণ করিবার জন্য নয়, বুকের উপর রাখিবার জন্যও নয়, বাবুগিরির গিল্টি পরিবার জন্যও নয়। তবে কি? না, গোলাপ ফুলটি কি তাহাই জানিবার জন্য, গোলাপের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য। আমার হাতের এই গোলাপটি অসাধারণ গোলাপ জাতীয় নহে। একটি সাধারণ, যা সচরাচর পাওয়া যায় সেই গোলাপের গোলাপ। সর্ব্বাগ্রেই জানিতে পারা যাইতেছে গোলাপ সবৃন্তক। কেন না লম্বা ডাঁটার উপরে পাবড়িগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে। বৃন্তটি সকণ্টক। গোলাপ গাছ যেমন কণ্টকী, ফুলের ডাঁটার গায়েও কাঁটার মত সরু সরু রোঁয়া রহিয়াছে। কাঁটাযুক্ত গাছেরি যে সকণ্টক বৃন্তবিশিষ্ট ফুল হইতে হয় এমত নহে। অসহায় গাছ পালা ফুলগুলি আত্ম রক্ষার্থ ও তদ্দ্বারা স্ব স্ব বংশ রক্ষার জন্য কাঁটা প্রভৃতি আত্মরক্ষণোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করে। আমাদের গোলাপ অনেকটা 'সাজোয়া পরা' ও 'পাঁচি হাতিয়ার ধরা' শ্রেণীয়। বৃন্তটি খানিক উঠিয়া একটু স্থূল আয়তন হইয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটি অফুটন্ত ফুল দেখিলে দেখা যায় যে এই পাঁচটি হরিৎ অংশ আদত পাবড়িগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বাস্তবিকই কোরক সময়ে এই হরিৎ পাবড়িগুলি বরফ জল হিম পোকা প্রভৃতি অনিষ্টকর কারণ হইতে পুষ্পকে রক্ষা করে। ইহারাই গোলাপের Sepals('বৃতি'); সমুদয় গুলিকে এক সঙ্গে Calyx (কুণ্ড) বলে। কুণ্ডাবর্ত্তের উপরেই রঞ্জিতাবর্ত্ত বা আদত পাবড়ি। কুণ্ডাবর্ত্ত, রঞ্জিতাবর্ত্ত (বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'স্রক্' Corolla) এবং পুংকেসরের সংখ্যার অতি চমৎকার সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। সচরাচর অনেক পুষ্পের বৃতির সংখ্যা তিন হইতে চার বা পাঁচ। রঞ্জিত পাবড়ি বা 'স্রকের সংখ্যাও প্রায় অনেক সময়ে বৃতির সমান অথবা উহার দুই কি তিন অথবা ততোধিক গুণ। পুংকেসরও সংখ্যা সম্বন্ধে কখন বা বৃতির ও স্রগের সম সংখ্যাবাচক হয়, অথবা উহাদের দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ অথবা অধিকতর গুণনীয় হয়। একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ উবুড় করিয়া ধরিলে পাঁচটি বড় বড় সমায়তন-বিশিষ্ট পাবড়ি (petals) লক্ষিত হয়। কিন্তু এই পাঁচটি ভিন্ন গোলাপের আরো অনেক পাবড়ি আছে। যদি পাঠকেরা একটু শ্রম স্বীকার করিয়া আস্তে আস্তে একটি একটি পাবড়ি খসাইয়া লইয়া, সব পাবড়িগুলি বাহির করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, পাবড়ি গুলি পাঁচের কোন-না-কোন গুণনীয়। যে ফুলটি আমার হাতে রহিয়াছে ইহাতে পঁইত্রিশটি পাবড়ি আছে; অধোদেশ হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত পাবড়ি গুলির আয়তন ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে। কেসর সন্নিহিত পাবড়ি গুলি সাধারণ পাবড়ি হইতে এত স্বতন্ত্র যে সে গুলিকে পাবড়ি বলা যাইবে কি কেসর বলা যাইবে ইহাই মীমাংসা স্থলীয়। বস্তুতঃ একটু অনুসন্ধান

করিলেই দেখা যাইবে কেসর সন্নিহিত আকুঞ্চমান, শীর্ণ, অপূর্ণ পাবড়ির মধ্যে কতকগুলি পরাগ কোষ সংযুক্ত। গোলাপের এই দুই চারিটি-পরাগ-কোষ সমন্বিত অসাধারণ পাবড়ি হইতে আমরা একটি চমৎকার তত্ত্ব শিক্ষা করি। উদ্ভিদ্‌বিদেরা বলেন কাণ্ড ও শাখা সংলগ্ন বৃক্ষের যাবতীয় অঙ্গ হয় পত্র আর না হয় পত্রের রূপান্তর মাত্র। পাতার এক প্রকার রূপান্তরিত অবস্থাই ফুল। ফুলের সমুদয় অঙ্গ গুলি ইত্যাদি 'বৃতি' পাবড়ি, পুংকেসর, স্ত্রী কেসর ইত্যাদি—পত্রের রূপভেদ মাত্র। এই জন্য ইহাঁরা পত্রকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর নাম Foliage leaves সবুজপত্র, অন্যটির নাম Flower leaves পুষ্প পত্র। সবুজপত্রও যা আর সাধারণতঃ গাছের পাতাও তাই। পুষ্পের সমুদয় বিভিন্ন অঙ্গগুলির সাধারণ একটি নাম পুষ্প-পত্র। পত্র মাত্রেরই দুই প্রকার কার্য্য—nutrition (পরিপোষকতা) ও Reproduction (ঔৎপাদকতা)। কিন্তু তরুলতার আহার সংগ্রহ করা এবং তাহাদিগের পুষ্টি সাধন করাই সবুজ-পত্রের প্রধানতম কার্য্য আর পুষ্প পত্র গুলির মিলিত কার্য্য বংশোৎপাদনের সহায়তা করা। পোষণক্রিয়া অপেক্ষা উৎপাদন-কার্য্য অধিকতর জটিল। এবং সেই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই পুষ্প-পত্র সবুজপত্র অপেক্ষা নানা প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পাতা হইতেই যে বৃতি, পাবড়ি পুংকেসর স্ত্রীকেসর উদ্ভূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ গোলাপের এই পরাগ-কোষ বিশিষ্ট পাবড়ি গুলি হইতেই পাওয়া যায়। পাবড়ি হইতে কেসর কি কেসর হইতে পাবড়ি উৎপন্ন হয় এ বিষয়ে যদিও এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই তথাপি গোলাপের এই পাবড়িগুলি দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, প্রকৃতি মধ্যে পাবড়ি হইতে কেসর অথবা কেসর হইতে পাবড়ি এইরূপ এক কার্য্য অবিরাম চলিতেছে। আমরা গোলাপের এই উদাহরণ হইতে আর অন্যান্য কতকগুলি ঘটনা হইতে ইহাও অনুমান করিতে পারি যে বৃতি হইতে পাবড়ি কিম্বা পাবড়ি হইতে বৃতি উৎপন্ন হয়। গোলাপের উল্লিখিত পাবড়িগুলি একটি মধ্য অবস্থা। যদি পাবড়ি হইতে কেসর হয়, কালে এগুলি কেসরই হইবে। আর যদি উহার বিপরীত হয়, তবে এই বলা যাইবে যে, এগুলি পূর্ব্বে কেসর ছিল ক্রমে ক্রমে পাবড়ির মতন হইয়া আসিতেছে, সময়ে প্রকৃত পাবড়িই হইবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আরও এমন অনেক ফুল পাওয়া যায় যাহারা এইরূপ একটি আধটি মধ্যপথবর্ত্তী অঙ্গ উদ্ভাবন করিয়াছে। এক রকম গাছ আছে সেগুলি দেখিতে হলুদ গাছের মতন। তবে হলুদ গাছ অপেক্ষা বড়। সচরাচর যেখানে সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজদের প্রাঙ্গণ সংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যানের মধ্যে সেগুলি যত্নে রাখিতে দেখা যায়! ইডেন গার্ডেনে প্রচুর আছে। গার্ডেনে বেড়াইতে আসিলে পাঠকেরা প্রায় যেখানে সেখানে হলুদ গাছের পাতার মতন চওড়া

চওড়া লম্বা লম্বা পাতাযুক্ত এই গাছ দেখিতে পাইবেন। গোলাপের যেমন নানা রকমের ফুল হয় এদেরও হরিদ্রা-লাল পিঙ্গল, গোলাপী-লাল প্রভৃতি নানা বর্ণের ফুল হয়। এই ফুলগুলির কোনটিরই প্রকৃত পুংকেসর নাই। মধ্যস্থলের একটি সরু গোছের পাবড়ির একপার্শ্বে পুষ্প-রেণুকোষ-মধ্যে অবস্থান করে। ফলতঃ এই পাবড়ি-টিই এই ফুলের সম্বন্ধে পুংকেসরের কার্য্য করে। কিন্তু কেসরের কোন অংশই তেমন পরিষ্কাররূপে লক্ষিত হয় না।

স্ত্রী-কেসরটিও একটি পাবড়ি। তবে এই পাবড়িটি অপরগুলি অপেক্ষা পুরু, সরু এবং মসৃণ। এবং ইহারি শিরোভাগে স্ত্রী কেসর সুলভ সেই বিশেষ নিদর্শনটি—'চটচটে অংশ'—দেখিয়া স্ত্রী-কেসর বলিয়া ঠাওরাইয়া লইতে হয়।

গোলাপের পাবড়ি প্রস্ফুটিত হইলে পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খসিয়া যায়। এইরূপ অল্পকাল স্থায়ী পাবড়িদিগকে diciduous (অস্থায়ী) বলে। যে গাছটি হইতে এই ফুলটি তুলিয়া লইয়াছি সেই গাছের অপর একটি ডালে দেখি পাবড়ি খসিয়া গিয়াছে অথচ বৃতিগুলি রহিয়াছে এমন একটি গোলাপের ফল পরিপুষ্ট হইতেছে। পাবড়ি পরিচ্যুত পুষ্টমান ফলটির বৃতিগুলির সবুজ বর্ণের কিঞ্চিমাত্র বিকৃতি হয় নাই। দেখা যায় যে, ফলের পরিপক্ক, শুষ্ক ও বৃন্ত-চ্যুত হওন পর্য্যন্ত বৃতিগুলি অবিকৃতা-কারে সংলগ্ন থাকে। এইরূপ বৃতিকে persistent বৃতি বলে। আবার অনেক ফুলের পাবড়ি গুলি ফুটিতে না ফুটিতেই বৃতিগুলি আপনাদের কাজ করিয়া পড়িয়া যায়। যেমন পোস্তফুল। সাধারণতঃ ফুলের বৃতিগুলি দুই প্রকারের হয়—'সংলিপ্ত' 'অসংলিপ্ত'। গোলাপের বৃতিগুলি দেখিলেই বোধ হয় যেন শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ অসংলিপ্ত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। একটি ফুলকে লম্বালম্বি কাটিয়া ফেলিলেই দেখা যাইবে, স্বতন্ত্র বৃতিগুলি কুণ্ড-নলের (calyx tube) উপরে বসান রহিয়াছে মাত্র। বিভক্ত অংশ গুলিকে পণ্ডিতেরা কুণ্ড-নলের 'অঙ্গ' বলিয়া থাকেন। সরীষা ফুলের বৃতি সম্পূর্ণরূপে অসংলিপ্ত। উদ্ভিদবেত্তারা বৃতি ও পাবড়ির অবস্থান ও আয়তন ভেদে আরও নানা প্রকারের নাম দিয়া থাকেন। কেসর ও বীজাধারের সম্বন্ধেও সেইরূপ। কিন্তু আমরা এ সব অপেক্ষাকৃত জটিল, সুতরাং নীরস, শব্দ লইয়া আর যেয়াদা মাথা বকাইব না।

অপরাপর অনেক ফুলের মত গোলাপ Hermaphrodite অর্থাৎ ইহার একটি ফুলেই পুরুষ ও স্ত্রী ইন্দ্রিয় পরিজ্ঞাপক অঙ্গ লক্ষিত হয়। পুংকেসর মণ্ডলের মধ্যে স্ত্রী কেসর গুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। পুংকেসর গুলি কুণ্ডনলের উপরিদেশে সংস্থাপিত, স্ত্রীকেসর গুলি কুণ্ড-নলের অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া, স্ব স্ব 'চিহ্নকে' সমুন্নত রাখিয়া কুণ্ডনলের গলদেশ ছাড়াইয়া পুংস্পের কেন্দ্রস্থানকে পরিশোভিত করিতেছে। পাঠক, যদি ফুটন্ত ফুলের উপর মৌমাছির উপদ্রব দেখিতে চাও, তবে ঐ অর্দ্ধ বিকসিত গোলাপটির পানে দেখ। দুটি মৌমাছিতে পড়িয়া কিরূপে গোলাপের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে। মৌমাছিরা মধুপানে যেন মত্ত হইয়া গোলাপের উপর মত্ততার নৃত্য নাচিতেছে। অস্থির—সম্পূর্ণরূপে অস্থির। কখন কতকগুলা পুষ্প-রেণু গায়ে মাখিতেছে, কতকগুলা বা খাইতেছে, কতক বা সংগ্রহ করিতেছে। আবার দেখ পুষ্প-রেণু মাখা অঙ্গে উহারা স্ত্রী কেসরদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আপনাদিগকে উহাদের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমার এই হাতের ফুলটিতে দেখি, চিহ্ন গুলির উপরে কতক পুষ্পরেণু লাগিয়া রহিয়াছে। নিশ্চয়ই আমরা এখন বলিতে পারি, ইহার মধুভাণ্ড লুণ্ঠন করিবার সময় মৌমাছিরা এইরূপে ইহাকেও নিষেকিত করিয়াছে। এটি যদি আমরা ছিঁড়িয়া না লইতাম তাহা হইলে সপ্তাহের মধ্যে একটি ফনেলের (মুখ চওড়া ও নীচে সরু চোঙ্গার) আকারের মতন ফল হইত।

আমরা পূর্ব্বে গোলাপের 'ফল' একটি পরিপুষ্ট হইতেছে এরূপ উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। গোলাপের আবার ফল, আবার তাহা হইতে গোলাপ গাছ হয়ত অনেকের কাণে ইহা কেমন এক রকম লাগিতে পারে। কিন্তু কাণের সন্তোষের জন্য প্রাকৃতিক সত্যের ত অপলোপ করা উচিত নয়। ফুটন্ত গোলাপটি হাতে লইয়াই আমরা দেখিয়াছি বৃন্তটি কিয়দ্দূর উঠিয়া একটু স্থূলাকার হইয়া ক্রমে পাবড়ির আধার হইয়াছে। এই স্থূলায়তনটিই গোলাপের বীজাধার। গোলাপের বিচিগুলি এই বীজাধারের অভ্যন্তরে থাকিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ পুষ্টমান ফলটিকে তুলিয়া লই এবং ছুরিকা দ্বারা লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলি। পাঠক, দেখিতেছ কত রোমশ বীজ। তুলার মতন সংলিপ্ত আবরণগুলি ছাড়াইয়া লও ভিতরে গোলাপের দানা দেখিতে পাইবে। আতার কিম্বা জামের শাঁস টুকু খাইয়া যে বিচিটি ফেলিয়া দাও সেই প্রকারের বিচিই এই রোমশ কোষের মধ্যে রহিয়াছে। বস্তুতঃ, আতা কিম্বা জামের সঙ্গে গোলাপের বিভিন্নতা অত্যন্ত অল্প। মূলগত ভেদ নাই বলিলেই হয়। কেবল সময় এবং ভিন্ন অবস্থা আমাদের এই গোলাপকে ঈদৃশ অভুক্ত ফলরূপে পরিণত করিয়াছে আর আতা এরূপ সরল সুমিষ্ট উপাদেয় ফল হইয়াছে। গোলাপ এবং আতা কিম্বা জাম এক শ্রেণীর হইয়াও কেন ঈদৃশ অবস্থান্তর হইল তৎ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

আজ কাল কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা অনেক তরু লতা উৎপাদন করিতেছি। কিন্তু সেই-অতি আদিম কালে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই তরু লতার বংশ রক্ষার একমাত্র হেতু ছিল। মধু-লোভী ভৃঙ্গ, প্রজাপতি, মৌমাছি, অথবা সুমিষ্ট ফল প্রিয় পক্ষীপতঙ্গমের রসনা পরিতৃপ্ত করিতে না পারিলে দীর্ঘকাল বংশ রক্ষা করা উহাদিগের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হইত না। যে উদ্ভিদ যত অধিক পরিমাণে

পোকা মাকড়দের মন যোগাইতে পারিয়াছে, সেই অপরাপর তরু লতা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক-কাল ধরিয়া দূরতম অতীত হইতে নিকটতম বর্ত্তমানে আপনার বংশকে উত্তর জীবী করিতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ সমুদয় রসাল সুমিষ্ট ও স্বাদু ফল—যাহা আমরা কত আদর ও তৃপ্তির সহিত আহার করি, কত যত্নে বাগানে রোপণ করি, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া উন্নত জ্ঞানবলে কলম কাটিয়া নানা কৌশলে এক জল হাওয়ার পরিবর্দ্ধিত গাছকে (অনেক স্থলে কেবল উপভোগ ও বিলাসের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য) বিজাতীয় জল হাওয়ার মধ্যে জন্মাইতেছি, এই সমুদয় সরস ও সুমিষ্ট ফল এককালে স্ব স্ব বংশ রক্ষার জন্যই স্বাদু ফল লোভী পক্ষী পতঙ্গের প্রিয় হইবার নিমিত্ত মিষ্টতা সরসতা স্বাদুতা উৎপাদন করিয়াছে! ফুলের সুগন্ধ সুষমা যেরূপ ক্ষুদ্রতর কীটদের জন্য,ফলের স্বাদুতা ও মিষ্টতা আবার সেইরূপ সেই আদিম কালের পক্ষী পতঙ্গের জন্য।

মনেকর খুব আদিম কালে গোলাপ জাতীয় কোন বৃক্ষ সমজাতীয় অপরাপর বৃক্ষ অপেক্ষা অধিকতর শাঁসল ফল উৎপাদন করিল। পাখীরা নীরস ফল ছাড়িয়া অগ্রে এই শাঁসল ফলই খাইবে এবং উদরে ফলের বীজ ধারণ করিয়া নানা স্থানে চলিয়া যাইবে। ফলের আঁটি কঠিনতম পদার্থ, সহজে হজম হইবার নহে, আর সেই আঁটির অভ্যন্তরেই ভাবী বৃক্ষের সমুদয় উপকরণ নিহিত থাকে। এইরূপে দেশ দেশান্তরে সেই অপেক্ষাকৃত সমধিক শাঁসল ফলবান গোলাপ জাতীয় বৃক্ষের অংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। পক্ষীদের দ্বারা এইরূপ উপকৃত হইবে এই নিমিত্ত বৃক্ষেরা (জানিয়া শুনিয়া না হইতে পারে, কিন্তু কেমন স্বভাবতঃ) আরও সরস ও মিষ্ট ফলোৎপাদনের জন্য যত্ন করে। আর যাহারা অধিকতর রসাল শাঁসল ফল প্রসব করে তাহারাই পক্ষীদের অনুগ্রহে উত্তর জীবীতা লাভ করে। এই জন্যই বিলাতী বেরী (Strauberry Rapsberry ইত্যাদি) ইহারা সকলে গোলাপ জাতীয় হইলেও, পোটেণ্টিলা অপেক্ষা কত দূর দূরদেশ ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। পোটেণ্টিলারা গোলাপ জাতীয় তাবৎ বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীনতম ও আদিমতম ধরণের, পোটেণ্টিলারও ফল হয় কিন্তু সে ফল শাঁসল নয়, মিষ্ট নয়। এই জন্য কেহই সে ফল খায় না। গাছের ফল গাছেই শুকাইয়া যায়। তবে দেখ বেরী শাঁসল রসাল সুমিষ্ট ফল উৎপাদন করিতে পারিয়াছে বলিয়াই আজ উদ্ভিদ জগতে নানা দেশ ব্যাপিয়া এমন করিয়া রাজত্ব করিতেছে। আমাদের সুগন্ধ গোলাপ রসাল ফলোৎপাদন করিতে পারে নাই বটে কিন্তু এমন সুগন্ধ বিস্তার করিতে কেহ জানিত না। গোলাপ তাহার চিত্তমোহন কারী সদ্গন্ধের জন্যই উত্তরজীবিত্ব লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন মনুষ্যেরা এত বিলাসীছিল না, যখন আতরের বা গোলাপ জলের ব্যবহার মনুষ্যে অবিদিত ছিল, তখন গোলাপ স্বীয় রূপের ছটায়, সদ্গন্ধে ও মধুর মিষ্টতায় ভৃঙ্গ, প্রজা

পতি মৌমাছি প্রভৃতিকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। তার পর যখন বিলাসী মনুষ্য গোলাপকে আপনাদের বিলাসের ক্রীড়াবস্তু বলিয়া মনে করিয়া লইল, তখন গোলাপ সঙ্কীর্ণ স্থান ছাড়িয়া, বিলাসিতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা স্থানে, উষ্ণ কি শীত প্রধান, দেশ-নির্ব্বিশেষে ছড়াইয়া পড়িল। এখন আমরা কলম করিয়া গোলাপ গাছ জন্মাইতে শিখিয়াছি। গোলাপের বিচির অপেক্ষা করি না। তাই গোলাপের বিচি ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিতেছে। আমরা এই যে রোমশ বিচিগুলি এমন অপূর্ণাবস্থায় দেখিতেছি প্রাচানকালে বায়ু সঞ্চালনে অথবা অপর কোন গতিমান বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে ইহাই পরিপক্কাবস্থায় স্থান বিশেষে দেশ বিশেষে নিক্ষিপ্ত হইয়া গোলাপ গাছ হইতেছে। কৃত্রিম নির্ব্বাচনের সঙ্গে অনেক প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অন্যতর আবিষ্কর্ত্তা ওয়ালেস বলিয়াছিলেন যে আমরা অনুমান করিতে পারি এমন সময় আসিবে যখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে তরু লতা জীব জন্তুদের মধ্যে কেবল কৃত্রিম নির্ব্বাচন প্রথাই শাসন করিবে। দ্রব্যদিগের গুণাগুণ ও আবশ্যকীয়তা-নাবশ্যকীয়তা, সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম নির্ব্বাচন প্রথা এত বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে ও হইয়া পড়িতেছে যে কালে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন উদ্ভিদ ও জীবরাজ্যের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে কার্য্য করিতে নিরস্ত হইবে। এবং (যেমন ওয়ালেস আরও বলিয়াছেন) সমুদ্রগর্ভই একমাত্র স্থান থাকিবে যেখানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অনাগত কাল ব্যাপিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

বিলাতে ছাত্রজীবন।

আমাদিগের দেশের কেহ কেহ তাঁহাদিগের বিলাত সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে, মাসিক পত্রিকায়, ও সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বিলাতের অবস্থা, বিলাতের লোকের আচার ব্যবহার, বিলাতে শয়ন ভোজন উপবেশনাদির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়ার এদেশে যে কৌতূহল আছে কিয়ৎপরিমাণে তাহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আবার অনেকে পত্রে লিখিয়া কিম্বা মুখে গল্প করিয়া তাঁহাদিগের বন্ধুবান্ধবদিগকে বিলাত সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত করা-

ইয়াছেন, আবার এই সকল ব্যক্তিরা বিলাত সম্বন্ধে যাহা যাহা পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন তাঁহারা তাহা তাহা তাঁহাদিগের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকে, এমন কি হয়ত পথের আলাপীদিগকেও, বলিয়াছেন। এই রূপে হয়ত রামকৃষ্ণ ধোপাও শুনিয়াছে যে বিলাতের বড় সহর লণ্ডনে কখনও কখনও এত ধোঁয়া ও কুয়াশা হয় যে সেখানে সে সকল সময় দিনের বেলাতেও রাস্তা, ঘাট, বাট, মাঠ প্রভৃতি সকল স্থানেই আলোক জ্বালাইতে হয়; এখানে একটু বর্ণনার ভুল হইল, পাঠক পাঠিকাগণ স্ব স্ব গুণে তাহা ক্ষমা করিবেন, ভুলটী এই যে লণ্ডনে ঘাট প্রায়ই নাই, লণ্ডনের লোকেরা সাধারণতঃ আমাদিগের দেশের লোকের ন্যায় নদী, হ্রদ, সরোবর, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ইত্যাদি জলাশয়ে অবগাহন করিতে যান না, তাঁহারা স্ব স্ব আলয়ে শয়নাগারে কলের জল আনাইয়া অথবা স্নানাগারে কল হইতে জল লইয়া স্নান কার্য্য সমাধা করেন। এইরূপে আবার হয়ত পল্লীগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ রায় বাহাদুর মহাশয়ও শুনিয়াছেন যে বিলাতে একটী প্রধান সভা আছে, তাহার নাম পার্লেমেণ্টো, সেখানে বড় বড় লোকে বড় বড় বক্তৃতা দেয়, সেখানে সকল রকম আইন তোয়ের করা হয়, সে সভার এত গৌরব যে আমাদিগের দেশের 'হত্তা কত্তা বিধাতা' ছোট লাট বাহাদুরেরাও স্বদেশে ফিরিয়া যাইয়া সেখানকার সভ্য হওয়ার নিমিত্ত লালায়িত হয়েন। কিন্তু বিলাত সম্বন্ধে আমাদিগের দেশে অনেকের অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এদেশে সাধারণ ভদ্র ও ইতর লোকদিগের দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান এত অল্প যে সময় সময় এই সকল লোকের নিকট বিলাতী দুই একটী এমন গল্পও শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে মনে প্রচুর সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং বিলাত সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকৃত ও জানিবার যোগ্য বিষয় বর্ণনা করা যাউক না কেন, তাহা বৃথায় বলা হইবে না। এদেশে এখনও বিলাতী গল্প শুনিতে লোকের ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখা যায়, এখনও বিলাত হইতে প্রত্যাগত কোন লোক দেখিলে এদেশে অনেকে তাঁহাকে বিলাত সম্বন্ধে নানা রূপ কথা জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপ কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু কৌতূহলের দুই প্রকার উদ্দেশ্য হইতে পারে এক এই যে একটী নূতন গল্প শুনিয়া তৎক্ষণের নিমিত্ত আমোদ লাভ করা আর এক এই যে একটী বিষয়ের বর্ণনা শুনিয়া তাহা হইতে আমরা কি জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিতে পারি তাহা বিবেচনা করিয়া পরে সেই জ্ঞান ও উপদেশের সাহায্যে জীবনের গতি বিধি নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করা। আমরা দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্যবিশিষ্ট কৌতূহল নিবারণ করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধটী লিখিতেছি; ইহা পাঠ করিয়া যদি এ দেশীয় ছাত্রদিগের ও ছাত্রদিগের অভিভাবকদিগের যৎকিঞ্চিৎ উপকারও হয়, তাহা হইলে এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক দিন আমাদিগের জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছিল; এক মাসেরও অধিক সমুদ্রের উপর থাকিয়া সমুদ্রের প্রতি আমার এক রকম মমতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; এই সময়ের মধ্যে কেবল এক দিন স্থলে বেড়াইতে পাইয়াছিলাম, তাহাও আবার রাত্রে। এখন জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছিলে পুনরায় আবার শক্ত মাটীর উপর পা দিতে পারিয়া মনে মনে আহ্লাদ হইল। জাহাজে যাত্রীগণের জিনিষ পত্র পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজ পাওয়ার অভিপ্রায়ে জাহাজে এক জন লোক আসিয়াছিলেন; আমার জিনিষ পত্র পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার এই ব্যক্তি লইলেন আর ইহা ভিন্ন আরও একটী ভার তিনি লইলেন। আমি যেখানে যাব, এই ব্যক্তি সেখানে আমায় পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত হইলেন; আমি বিকালবেলা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম, কোথায় কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইল তাহা এখন আমার দুই এক স্থানের একটু একটু আভাষ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে নাই। বিলাতের বড় বড় সাসিওয়ালা, সুন্দর সুন্দর, বড় বড় দোকানগুলি দেখিতে বোধ হয় আমার ভালই লাগিয়াছিল, আর বিলাতের রাস্তায় জনতা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। সময় ক্রমে আমার যেখানে যাওয়ার কথা, সেখানে উপস্থিত হইলাম, সেখানে আমাদিগের দেশীয় একজনের সহিত দেখা হইল, তাঁহার সহিত আমার পূর্ব্বে আলাপ ছিল না কিন্তু আমি যাইতেছি এ সংবাদ তিনি পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন আর আমার জন্য থাকিবার স্থান খুঁজিয়া দেওয়া, কোথায় কিরূপে চলিতে হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আমায় সাহায্য করেন তাঁহাকে এই অনুরোধ করা হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, এত দিন পরে একজন স্বদেশীয় লোকের মুখ দেখিতে পাইয়া, এত দিন পরে আমাদিগের নিজ ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিবার একজন লোক পাইয়া আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। ইহাঁর সঙ্গে আমার বিকালে দেখা হয়, সন্ধ্যার সময় ইনি আমাকে আর একটী বাড়ীতে লইয়া গেলেন; এখানে আমার নিমিত্ত ঘর ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই বাড়ীতে যখন আসি, তখন দেখি বাড়ীর কাছে রাস্তায় একটা বাজ্‌না বাজাইতেছে; আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ও কিসের বাজ্‌না, তিনি বলিলেন রাস্তায় অমনি করিয়া বাজ্‌না বাজায় আর লোকে তাহা শুনিয়া কিছু কিছু পয়সা দেয়। তখন বোধ হয় ও বাজ্‌না মন্দ লাগে নাই, কিন্তু তাহার পর অনেক সময় ঘরে বসিয়া পড়িতেছি আর রাস্তায় ঢং ঢং করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে বিরক্তি বোধ হইয়াছে। বাজনার যন্ত্রটা দেখিতে একটা বাক্সের মত, সাধারণতঃ এক একটা বাজনার সঙ্গে দুইজন করিয়া লোক থাকে, একজন বাজ্‌না বাজায় আর একজন পয়সা লইয়া বেড়ায়, কখনও কখনও বা একজন লোকই একটা ছোট যন্ত্র লইয়া বাজাইতে আইসে। এই সকল বাজ্‌না

ওয়ালারা অনেকে ইটালী দেশীয়, কিন্তু জার্ম্মাণি দেশীয় ও বোধ হয় ইংলণ্ড দেশীয়ও অনেক ওরূপ বাজানাওয়ালা ভিক্ষুক লণ্ডনে আছে। জার্ম্মাণি দেশীয় বাজ্‌নাওয়ালারা দল বাঁধিয়া আইসে, তাহারা কয়েক রকম বাজ্‌না সঙ্গে লইয়া আইসে, রাস্তার একজায়গায় বাজাইয়া সেই রাস্তার দুই ধারে নিকটস্থ সমুদয় বাড়ীতে দুয়ারে ঘা মারিয়া বা ঘণ্টা বাজাইয়া পয়সা চাহিয়া বেড়ায়। দুয়ারে ঘা মারা বা ঘণ্টা বাজান এই কথা দুটীর অর্থ বোধ হয় এ দেশের কেহ কেহ না বুঝিতে পারেন; আমাদিগের দেশে যেমন খোলা দরওয়াজায় দরওয়ান বসিয়া থাকে, বিলাতে গৃহস্থ লোকের বাড়ীতে সে রূপ নহে। বিলাতে গৃহস্থ লোকের বাহিরের দ্বার সাধারণতঃ বন্ধ থাকে; দুয়ারে ঘা মারিয়া শব্দ করিবার নিমিত্ত তাহাতে দুইখান লৌহ খণ্ড লাগান থাকে, কেহ আসিলে দুই খণ্ড লৌহের এক খণ্ড দ্বারা অপর খণ্ড আঘাত করে; দুয়ারে আবার বাড়ীর মধ্যে ঘণ্টা বাজানর সুবিধাও আছে।

যাহারা দল বাঁধিয়া বাজ্‌না বাজাইতে আইসে, তাহারা এই রূপে রাস্তার উপর বাড়ী গুলির লোককে ডাকিয়া পয়সা লয় আর উপরে যে একটা বাজনার সঙ্গে দুজন কি একজন লোক থাকে বলা হইয়াছে, সে সকল লোকেরা বাড়ীতে ওরকম শব্দ করিয়া ডাকিয়া লোকের নিকট পয়সা লয় না, আপনা হইতে কেহ পয়সা দিতে আসিলে লয়। তাহারা অনেকে বাড়ীর নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, হয়ত জানালার নিকট কাহাকে দেখিতে পাইলে তাহাকে একরকম সেলাম করে, এইরূপ করিয়া যদি তাহারা পয়সা আদায় করিতে পারে ভালই, যদি না পারে, তবে হয় অন্য কোন বাড়ীতে যায় আর না হয় তাহাদিগের এক মহাস্ত্র আছে তাহা ব্যবহার করিতে পারে। মহাস্ত্রটী এই, বাড়ীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজান; এরূপ অবস্থায় হয়ত বাজ্‌না-আক্রান্ত গৃহের অধিবাসীরা বাদ্যধ্বনি সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বাজ্‌নাওয়ালাকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দেয়। ভিখারী বাজ্‌নাওয়ালাদিগকে লণ্ডনে লোকে সাধারণতঃ এক পেনি কি আধ পেনি দেয়, এক পেনি দেখিতে আমাদিগের দেশের একটা ডবল্ পয়সার মত। এই এক আধ পেনি লোকে অনেক সময় ঘর হইতে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, বাজ্‌নাওয়ালারা যেখানে থাকে সেখানে ফেলিয়া দেয়, আর তাহারা উহা কুড়াইয়া লয়। যাহা হউক আমি এখানে এরূপ বিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া লণ্ডনে আমার প্রথম দিনটার সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়ে উপস্থিত হইতেছি। আমার বন্ধু আমাকে যে বাড়ীতে লইয়া গেলেন সেবাড়ীতে একতালায় আমি দুইটী ঘর পাইলাম, একটী বসিবার ঘর আর একটী শুইবার ঘর। বসিবার ঘরে খাওয়া, পড়া, বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করা ইত্যাদি কাজ করা হয়, আর শুইবার ঘরে স্নান করা, হাত মুখ ধোওয়া, আর শোওয়া এই সব রকম কাজ

করা হয়। যে সকল বাড়ীতে আলাহিদা স্নানের ঘর আছে, সে সকল বাড়ীতে হয়ত শোওয়ার ঘরে স্নান করা আবশ্যক না হইলেও পারে। তবে লণ্ডনের সাধারণ গৃহস্থ লোকদিগের বাড়ীতে স্নানের ঘর আলাহিদা প্রায়ইত দেখা যায় না; তবে যাহাদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাহাদিগের বাড়ীতে, বিশেষতঃ এই সকল ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত আজ কাল যে সকল নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে সে সকল বাড়ীতে, স্নানের ঘর আলাহিদা থাকিতে পারে। সে যাহা হউক, আমি বসিবার ঘরে বসিলাম, ঘরের চেয়ার, টেবিল্, কৌচ্ প্রভৃতি দেখিয়া, ঘরের সজ্জা দেখিয়া সন্তুষ্টই হইলাম। লণ্ডনে সাধারণ মধ্যবিৎ অবস্থার লোকদিগের বাড়ীগুলিও সুন্দর রূপে সাজান, ঘরগুলির মেজিয়ায় কার্পেট পাতা, আর দেওয়ালে চিত্রকরা রঙ্গিন কাগজ আঁটা; ঘরগুলির মধ্যে ছাদে কড়িকাঠ দেখা যায় না। সাধারণতঃ ঘরের মাঝখানে টেবিল পাতা থাকে আর টেবিলের উপর একখানা পশমি (অথবা সুতার রঙ্গিন) কাপড় দেওয়া থাকে। ছাদ হইতে টেবিলের কিছু উপরে গ্যাসের আলোক জ্বালাইবার একটী ঝাড়ের মত ধাতুনির্ম্মিত জিনিষ ঝুলিয়া থাকে, গ্যাসের আলোক জ্বালাইবার জন্য ঐ জিনিষের উপর কয়েকটা গোলাকার কাচের পাত্র আছে; লোকে সচরাচর এইরূপ দুটী পাত্রে আলোক জ্বালাইলেই যথেষ্ট মনে করে। টেবিল ছাড়া বসিবার ঘরে আর এই কয়েকটী সরঞ্জাম দেখা যায়, কয়েক খান সাধারণ চেয়ার, একখান আরামের চেয়ার, একখান কৌচ্, আর হয়ত একটা ছোট আল্‌মারি, ইহা ভিন্ন আরও অনেক জিনিষ থাকিতে পারে। আরামের চেয়ারের পায়া গুলি ছোট, তাহাতে নরম উচ্চ গদি দেওয়া আর তাহাতে হেলান দিয়া, হাত পা মেলাইয়া বসিবার সুবিধা করা আছে; সাধারণ চেয়ার গুলিতেও একরকম গদি দেওয়া থাকে। বসিবার ঘরে যে স্থানে আগুণ জ্বালানর বন্দোবস্ত, সে স্থানে মেজিয়ার কতক অংশ দশ, বার অঙ্গুলি উচ্চ লৌহের জিনিষ দিয়া ঘেরা, আর সে স্থানে মেজিয়া হইতে আড়াই হাত কি তিন হাত উপরে দেওয়ালের গায়ে একটা মার্ব্বল্ কি অন্য কোন জিনিষের এক খান তক্তা মত লাগান থাকে; এই তক্তার উপরে দেওয়ালে এক খানা প্রকাণ্ড আয়না বসান থাকে; তক্তা খানির উপর ঘড়ি, ছোট রকমের কাচের বা মাটীর পাত্র, পুতুল ইত্যাদি অনেক রকম সামগ্রী সুন্দর রূপে সাজান থাকে; মাটীর পাত্রগুলিতে রং দেওয়া, কাচের পাত্র গুলি রঙ্গিনও হইতে পারে, সাদাও হইতে পারে। আমি আমার বসিবার ঘরেও এই রকম সরঞ্জাম দেখিলাম; তখনও বরফ পড়িতে আরম্ভ হয় নাই, সুতরাং আগুণ জ্বালাইবার উননটী তখনও ঢাকা রহিয়াছে। বাড়ীর গৃহিনী আসিয়া আমার সহিত কথা কহিলেন, কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমার এখন কিছুই ভাল মনে নাই। সে বাড়ীতে একজন আমাদিগের দেশীয় লোক থাকিতেন, তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না,

রাত্রে তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি ও আমার উল্লিখিত বন্ধুটী এই দুই জনে কয়েক দিনের মধ্যে আমার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; আমি কলেজে যাইতে আরম্ভ করিলাম। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে আমি প্রবিষ্ট হইলাম, সেখানে কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে ছাত্রেরাই বা কি রকমে চলে এই প্রবন্ধে এই দুই বিষয়ের বর্ণনা করা হইতেছে। এই কলেজে কাব্য ও আইন, বিজ্ঞান ও এঞ্জিনীয়ারিং, আর চিকিৎসা বিদ্যা এই কয়টী বিভাগ। কাব্য বিভাগে গ্রীক, ল্যাটিন, ইহুদী, ফরাসি, জার্ম্মান ও ইংরেজী এই কয়টী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়; ইহা ভিন্ন সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও চীন দেশীয় ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, আর গত বৎসর আমি দেখিয়া আসিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি আমাদিগের দেশের কতকগুলি প্রচলিত ভাষাও শিক্ষা দেওয়ার উদ্‌যোগ হইতেছে। কাব্য বিভাগে সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও দর্শন, বার্ত্তাশাস্ত্র, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়; কলেজে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত একটী বিভাগ আছে, সেটী কাব্য-বিভাগের অঙ্গ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্‌ভিদ-বিজ্ঞান, জন্তু বিজ্ঞান, জীব-প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান এই কয়টি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের অনেক ছাত্র অঙ্ক, আর বিজ্ঞানের কোন কোন ছাত্র মনোবিজ্ঞান ও দর্শন, আর বার্ত্তাশাস্ত্র এই কয়টী বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগে দেহবিজ্ঞান, জীব-প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান, ঔষধচিকিৎসা, অস্ত্র-চিকিৎসা ইত্যাদি অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জন্তু-বিজ্ঞান, জীব-প্রক্রিয়া বিজ্ঞান এই কয়টী বিষয়ের শ্রেণীগুলি বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা এইদুই বিভাগেরই অন্তর্গত; চিকিৎসা-বিদ্যা বিভাগের অনেক ছাত্র পদার্থ বিজ্ঞানের উপদেশ-বক্তৃতা শুনিতে আইসে। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ও রোগীদিগের চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত এই কলেজের সংস্রবে একটী হস্‌পিট্যাল্ আছে। এঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞান বিভাগের অন্তর্গত, ইহাতে নানারকম কলের ও অন্যান্য কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়; বিজ্ঞান বিভাগের আর একটী শাখা আছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প কার্য্যে যে যে বিশেষ রাসায়নিক জ্ঞান আবশ্যক করে সে সমুদয়ের উপদেশ দেওয়া হয়। এই কলেজের অন্তর্গত একটী স্কুল আছে, সেখানে অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কত বয়স পর্য্যন্ত এই স্কুলে লোকে পড়িতে পারে তাহা আমি এখন ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লোকে এই স্কুলের ছাত্র হইতে পারে। কলেজে ছাত্রেরা যে বয়স ইচ্ছা সেই বয়সেই প্রবিষ্ট হইতে পারে, কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা বিভাগ ভিন্ন অন্য সমুদয় বিভাগেই বোধ হয় স্ত্রীলোকেরা ছাত্রী হইতে পারেন। এই কলেজের হস্‌পিট্যালে

স্ত্রীলোকেরা ছাত্রী হইতে পারেন কিনা তাহা আমি নিশ্চয় জানি না। ছাত্রদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত কলেজের সংস্রবে একটী বাস-স্থান আছে, কলেজের একজন অধ্যাপক তাহার তত্ত্বাবধান করেন; কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যাহাদিগের ইচ্ছা হয়, তাহারা এই স্থানে বাস করিতে পারে, কিন্তু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই প্রায় নিজ নিজ ইচ্ছামত বাড়ীতে বাস করে। এই সকল ছাত্রদিগের লণ্ডনে নিজের বাড়ী থাকে ভালই, আর তাহা না হইলে তাহারা কোন বাড়ীতে দুইটী কি একটী ঘর লইয়া থাকে। কলেজের সংস্রবে ছাত্রদিগের যেমন একটী বাস-স্থান আছে, ছাত্রীদিগের নিমিত্তও সেইরূপ একটী বাসস্থান হইতেছে ইহা আমি গত বৎসর শুনিয়া আসিয়াছিলাম। কলেজে ছাত্রদিগের শীত ও গ্রীষ্মকালের গায়ের বড় কোট, ছাতা, ব্যাগ ইত্যাদি জিনিষ রাখিবার ঘর আছে, হাত মুখ ধুইবার ঘর আছে, তামাক খাইবার ঘর আছে, খাওয়ার ঘর আছে, পড়িবার জন্য একটা বড় সাধারণ লাইব্রেরী আর একটা ছোট চিকিৎসাবিদ্যার লাইব্রেরী আছে। এইরূপে কলেজে উপদেশ-বক্তৃতার ঘরে, খাওয়ার ঘরে পড়িবার ঘরে ইত্যাদি নানা-স্থানে এক সঙ্গে থাকিতে পাইয়া ছাত্রদিগের মধ্যে পরস্পর বন্ধুতা সংস্থাপন করিবার বিলক্ষণ সুবিধা আছে।

এখন এই কলেজের শিক্ষা প্রণালী বর্ণনা করা যাইতেছে। আমরা এখানে কেবল বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষা প্রণালী বর্ণনা করিতেছি; যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে, সে বিষয়ে তাহার অধ্যাপক উপদেশ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উপদেশ-বক্তৃতা সাধারণতঃ সপ্তাহের মধ্যে সোম হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া দেওয়া হয়; যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় সে বিষয়ের প্রায় সকল অংশেই বক্তৃতা দেওয়া হয়। কোন কোন অধ্যাপক উচ্চতর ছাত্রদিগের নিমিত্ত একটী শ্রেণী খোলেন আর যে সকল ছাত্র নূতন শিক্ষা আরম্ভ করিতেছে তাহাদিগের নিমিত্ত আর একটী শ্রেণী খোলেন; আর কোন কোন অধ্যাপক সকল প্রকার ছাত্রদিগের নিমিত্তই একটী শ্রেণী খোলেন। অধ্যাপকেরা তাঁহাদিগের স্ব স্ব বিষয়ে তাঁহারা আপনারা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা যাহা যাহা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিয়াছেন সে সমুদয়ের মধ্য হইতে পছন্দ করিয়া ছাত্রদিগের যে সকল বিষয় তাঁহারা জ্ঞাতব্য মনে করেন সে সকল বিষয় তাহাদিগকে সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন। কোন্ বিষয়ে কি কি পুস্তক বা পত্রিকা হইবে তাহা তাঁহারা প্রায়ই নিজ হইতেই পড়িতে বলিয়া দেন, আর না হয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দেন। যাহারা কোন বিষয় ভাল করিয়া শিখিতে চায়, তাহারা সে বিষয়ের অধ্যাপকের বক্তৃতায় যাহা শুনিতে পায় তাহা নোট করিয়া লয় অর্থাৎ স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত লিখিয়া লয় আর ইহা ছাড়া অধ্যাপকের পরামর্শানুসারে তাহাতে যে সমুদায় প্রধান প্রধান ভাল ভাল পুস্তক লেখা হইয়াছে সে সকল পুস্তকের

সমুদয় কিম্বা বিশেষ বিশেষ অংশ আর সে বিষয়ের পত্রিকাগুলির ভাল ভাল প্রবন্ধ সমূহ, তাহাদিগের পড়িতে হয়। কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপক স্বয়ং অথবা তাঁহার সহকারী উপদেশ-বক্তৃতার শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রশ্নোত্তরের শ্রেণী খোলেন; উপদেশ বক্তৃতার শ্রেণীতে ছাত্রেরা সাধারণতঃ অধ্যাপক যাহা বলেন তাহা শোনে ও নোট করে, ছাত্রেরা বক্তৃতার যদি কোন অংশ বুঝিতে না পারে, তবে বক্তৃতার শেষে অধ্যাপকের নিকট হইতে সে অংশ বুঝাইয়া লইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ছাত্রদিগের অনেক বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে; এই সকল সন্দেহ দূর করিয়া শিক্ষণীয় বিষয়টী ছাত্রদিগের মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্নোত্তর শ্রেণী খোলা হয়। অধ্যাপকেরা উপদেশ-বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে অনেক দ্রব্য ছাত্রদিগকে দেখান আর পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক রকম পরীক্ষা করিয়া দেখান।

ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

পারমাণবিক সিদ্ধান্ত।

বায়ুর ন্যায় বস্তুকে গ্যাস বলে; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীতে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জমাট ও তরল বস্তু আছে, সেই রূপ আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির গ্যাসও আছে। আমাদের চারিদিকে যে বায়ু রহিয়াছে, নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু শরীরে গ্রহণ করিয়া আমরা জীবন ধারণ করি, সেই বায়ুতে প্রধানতঃ দুই প্রকার গ্যাস আছে। আমরা যদি কতক শুষ্ক বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই যে তাহার ঘন আয়তনের পাঁচ ভাগের প্রায় এক ভাগ অক্সিজেন্ নামক একপ্রকার গ্যাস আর প্রায় চার ভাগ নাইট্রোজেন নামক এক প্রকার গ্যাস। কোন জ্বলন্তবস্তু অক্সিজেন্ গ্যাসে ধরিলে উহা আরও জ্বলিয়া উঠে, কোন জ্বলন্ত বস্তু নাইট্রোজেন্ গ্যাসে ধরিলে উহা শীঘ্রই নিবিয়া যায়। আবার জল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে দুই প্রকার গ্যাস আছে; দুই ঘন আয়তন হাইড্রোজেন্ গ্যাস আর এক ঘন আয়তন অক্সিজেন্ গ্যাস যোগে দুই ঘন আয়তন জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত বস্তু ধরিলে উহা নিবিয়া যায়; কিন্তু যদি একটা বোতলে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরিয়া বায়ুর মধ্যে উহা খুলিয়া উহার মুখের নিকট অগ্নি শিখা ধরা হয় তবে ঐ হাইড্রোজেন গ্যাস আস্তে আস্তে জ্বলিতে থাকে। এই রূপে অনেক বস্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গ্যাস আছে; এই সকল গ্যাস পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহাদের কতকগুলির মধ্যে দুই কি তাহার অধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গ্যাস আছে আর কতকগুলির মধ্যে কেবল একই প্রকারের গ্যাস আছে। যে সকল গ্যাসের মধ্যে কেবল একই প্রকার গ্যাস দেখা যায়, তাহাদিগকে মৌলিক গ্যাস বলা যাইতে পারে, কারণ এই সকল গ্যাসই অন্যান্য গ্যাসের মূল অর্থাৎ এই সকল গ্যাসের দুই কি তাহার অধিকের যোগে অন্যান্য গ্যাস উৎপন্ন হয়। যে সকল গ্যাস দুই কি তাহার অধিক সংখ্যক গ্যাসের যোগে উৎপন্ন তাহাদিগকে যৌগিক গ্যাস বলা যাইতে পারে। আর কতকগুলি গ্যাস আছে, তাহাদের মধ্যেও দুই কি তাহার অধিক সংখ্যক মৌলিক গ্যাস আছে বটে; কিন্তু তাহারা যৌগিক গ্যাস নহে, তাহারা মৌলিক গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। মিশ্র গ্যাসের মধ্যে যে যে মৌলিক গ্যাস থাকে, তাহাদের গুণের পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; কিন্তু যৌগিক গ্যাসের মধ্যে যে যে মৌলিক গ্যাস থাকে, তাহা-

দের ভার ভিন্ন সমুদয় গুণেরই প্রায় পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বায়ু মিশ্র গ্যাস, ইহার মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুই মৌলিক গ্যাস আছে, অক্সিজেনের যে যে গুণ (যেমন জ্বলন্ত বস্তুকে অধিকতর উজ্জ্বলিত করা) আর নাইট্রোজেনের যে যে গুণ (যেমন জ্বলন্ত বস্তুকে নির্ব্বাপিত করা) ইহার মধ্যেও এই দুই গ্যাসের সেই সেই গুণ দেখা যায়। জলীয় বাষ্প একটী যৌগিক গ্যাস. ইহার মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ভার ভিন্ন মৌলিক অবস্থার অত্যন্ত গুণগুলি দেখা যায় না; জলীয় বাষ্পের মধ্যে জ্বলন্ত বস্তু ধরিলে সে জ্বলন্ত বস্তু নিবিয়া যাইতে পারে আবার জলীয় বাষ্পের মুখের নিকট আগুণ ধরাইলেও উহা জ্বলে না। আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে গ্যাস সমুদয় তিন শ্রেণীর, (১) মৌলিক, (২) যৌগিক ও (৩) মিশ্র। কি কি নিয়মে মৌলিক গ্যাসের যোগ হইয়া থাকে, তাহা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

আমরা যদি এমন দুইটী বোতল লই যাহাদিগের অভ্যন্তরের ঘন আয়তন সমান আর তাহাদিগের একটীর মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস আর অন্যটীর মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরি, তবে দেখা যায় যে গ্যাস পূর্ণ ঐ দুইটী বোতলের মধ্যে দ্বিতীয়টীর গ্যাসের অপেক্ষা প্রথমটীর গ্যাসের ওজন ষোল গুণ অধিক, অর্থাৎ ঘন আয়তন সমান হইলে অক্সিজেন গ্যাস হাইড্রোজেন অপেক্ষা ষোলগুণ অধিক ভারী, এরূপ অবস্থায় হাইড্রোজেনের ওজন এক হইলে, অক্সিজেনের ওজন ষোল হইবে। এই রূপে আবার দেখা যায় যে ঘন আয়তন সমান হইলে নাইট্রোজেন্ গ্যাস হাইড্রোজেন অপেক্ষা চতুর্দ্দশ গুণ অধিক ভারী. ক্লোরিণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা ৩৫·৫ গুণ অধিক ভারী। এই প্রকারে নির্ণয় করা হইয়াছে যে ঘন আয়তন সমান হইলে হাইড্রোজেন অপেক্ষা অন্যান্য সমুদয় মৌলিক গ্যাসই এক এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় অধিক ভারী; হাইড্রোজেনের ওজন এক ধরিলে, অক্সিজেনের ওজন ১৬, নাইট্রোজেনের ওজন ১৪, ক্লোরিণের ওজন ৩৫·৫, ব্রোমিনের ওজন ৮০, আইওডিনের ওজন ১২৭, সল্ফরের ওজন ৩২, ইত্যাদি। বিশুদ্ধ গ্যাস লইয়া যখনই পরীক্ষা করা যাইবে, তখনই ওজনের অনুপাত এই রূপ দেখা যাইবে। মৌলিক গ্যাসের যোগে যখন যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হয়, তখন দেখা যায় মৌলিক গ্যাসের ঘন আয়তন যে মাত্রায় যে কয় সংখ্যাই হউক না কেন যৌগিক গ্যাসের ঘন আয়তন সেই মাত্রার দুই সংখ্যা হইবে। দুই ঘন আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস আর এক ঘন আয়তন অক্সিজেন গ্যাসে দুই ঘন আয়তন জলীয় বাষ্প হয়; দুই ঘন ইঞ্চ হাইড্রোজেন আর এক ঘন ইঞ্চ অক্সিজেন্ গ্যাসে দুই ঘন ইঞ্চ জলীয় বাষ্প হয়; দুই ঘন ফুট হাইড্রোজেন আর এক ঘন ফুট অক্সিজেন গ্যাসে দুই ঘন ফুট জলীয় বাষ্প হয়, দুই ঘন হাত হাইড্রোজেন আর এক

ঘন হাত অক্সিজেন্ গ্যাসে দুই ঘন হাত জলীয় বাষ্প হয়, ইত্যাদি। সেই রূপ আবার দুই ঘন আয়তন নাইট্রোজেন গ্যাস ও তিন ঘন আয়তন অক্সিজেন গ্যাসে দুই ঘন আয়তন নাইট্রস্ অ্যাসিড্ নামক এক যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই রূপে আমরা দুই আয়তন যৌগিক গ্যাসের মধ্যে যে কয় আয়তন যে যে মৌলিক গ্যাস আছে তাহা জানিলে পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়াও আমরা বলিতে পারি সমান আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস অপেক্ষা ঐ যৌগিক গ্যাস কত ভারী হইবে। গ্যাস অবস্থার দুই আয়তন জলীয় বাষ্পের মধ্যে দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন্ আছে; দুই আয়তন হাইড্রোজেনের ওজন দুই, আর এক আয়তন অক্সিজেনের ওজন ষোল, সুতরাং দুই আয়তন জলীয় বাষ্পের ওজন ২ + ১৬ = ১৮, অতএব এক আয়তন জলীয় বাষ্প সমান এক আয়তন হাইড্রোজেন অপেক্ষা ওজনে $\frac{১৮}{২}$ = ৯ গুণ অধিক হইবে; যৌগিক অবস্থায় মৌলিক গ্যাসের ওজনের পরিবর্ত্তন হয় না ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দুই আয়তন নাইট্রস্ অ্যাসিড্ গ্যাসের মধ্যে তিন আয়তন অক্সিজেন ও দুই আয়তন নাইট্রোজন আছে; সুতরাং এক আয়তন নাইট্রস্ অ্যাসিড গ্যাসের ভার এক আয়তন হাইড্রোজেনের ভার অপেক্ষা $\frac{(৩ \times ১৬) + (২ + ১৪)}{২}$ = ২৪ + ১৪ = ৩৮ গুণ অধিক হইবে। এইরূপ গণনা করা আমরা যৌগিক গ্যাসের যে ভার স্থির করি, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও প্রায় ঠিক সেই ভার পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই গ্যাসের যোগে যে কয়টী যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া এই দেখা গিয়াছে যে এই দুয়ের প্রথম যৌগিক গ্যাসের (নাইট্রস্ অক্সাইডের) ভারের প্রত্যেক ৪৪ ভাগের মধ্যে ২৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর ১৬ ভাগ অক্সিজেন আছে, অর্থাৎ এই গ্যাসের ৪৪ সেরের কি ৪৪ মণের মধ্যে ২৮ সের কি ২৮ মণ নাইট্রোজেন আর ১৬ সের কি ১৬ মণ অক্সিজেন আছে। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্বিতীয় যৌগিক গ্যাসের (নাইট্রিক্ অক্সাইডের) ভারের প্রত্যেক ৩০ ভাগের মধ্যে নাইট্রোজেন ১৪ ভাগ আর অক্সিজেন ১৬ ভাগ আছে। নাইট্রোজেনের ও অক্সিজেনের তৃতীয় যৌগিক গ্যাসের (নাইট্রস্ অ্যাসিডের) ভারের প্রত্যেক ৭৬ ভাগের মধ্যে ২৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর ৪৮ ভাগ অক্সিজেন আছে। এই দুই গ্যাসের চতুর্থ যৌগিক গ্যাসের (নাইট্রিক্ পার্অক্সাইডের) মধ্যে ভারের প্রত্যেক ৯২ ভাগে ২৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর ৬৪ ভাগ অক্সিজেন আছে। আর পঞ্চম যৌগিক গ্যাসের (নাইট্রিক্ অ্যাসিডের) ভারের প্রত্যেক ১০৮ ভাগের মধ্যে ২৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর ৮০ ভাগ অক্সিজেন আছে। এই পাঁচটী গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ভারের অনুপাত এইরূপে লিখিতে পারা যায়:——

(১), (২×১৪) ঃ(১×১৬) ; (২), * (২×১৪)ঃ (২×১৬) ; (৩), (২×১৪) ঃ (৩×১৬) ; (৪), (২×১৪) ঃ (৪×১৬) ; (৫), (২×১৪) ঃ (৫×১৬)।

আমরা জানি যে আয়তন সমান হইলে হাইড্রোজেন অপেক্ষা নাইট্রোজেন ১৪ গুণ অধিক ভারী ; আর অক্সিজেন ১৬ গুণ অধিক ভারী ; এখন উপরের উদাহরণে দেখিতে পাইতেছি যে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন এই দুয়ের যখন যোগ হয়, তখন অক্সিজেন গ্যাস ওজনে ১৬ ভাগ কি ১৬ ভাগের দ্বিগুণ কি তিন গুণ কি চার গুণ কি পাঁচ গুণ এই নিয়মে যোগ হয় ; অক্সিজেনের ভাগকে ষোল দ্বারা ভাগ করিলে কখনও অবশিষ্ট দেখা যায় না। এখন কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে উল্লিখিত তৃতীয় যৌগিক গ্যাসে ওজনে (২×১৪) ভাগ নাইট্রোজেনের সঙ্গে (৩×১৬) ভাগ অক্সিজেন যোগ হয় এই কথা না বলিয়া এমন বলা যাইতে পারে যে ১৪ ভাগ নাইট্রোজেনের সঙ্গে ২৪ ভাগ অক্সিজেন যোগ হয়, আর তাহা হইলে অক্সিজেনের ভাগকে ১৬ দ্বারা ভাগ করিলে ৮ অবশিষ্ট থাকে। এই আপত্তির খণ্ডন এই যে এই তৃতীয় যৌগিক গ্যাসটী সম আয়তন হাইড্রোজেন অপেক্ষা ৩৮ গুণ অধিক ভারী ; আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যোগের পূর্ব্বে মৌলিক গ্যাসদিগের যে কয় আয়তনই থাকুক না কেন যোগ হইলে তাহারা দুই আয়তন প্রাপ্ত হয় ; যদি দুই আয়তন নাইট্রোজেন আর তিন আয়তন অক্সিজেন যোগ হইয়া উল্লিখিত যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হইয়াছে বলি তাহা হইলে এই যৌগিক গ্যাসের দুই আয়তন এক আয়তন হাইড্রোজেন অপেক্ষা (২×১৪) + (৩×১৬) = ২৮ + ৪৮ = ৭৬ গুণ ভারী হইবে, অর্থাৎ ঐ যৌগিক গ্যাসের এক আয়তন সমান এক আয়তন হাইড্রোজেন অপেক্ষা ৩৮ গুণ ভারী হইবে ; আর আপত্তিকার যাহা বলেন তাহা স্বীকার করিলে এক আয়তন নাইট্রোজেন (১৪) ও দেড় আয়তন অক্সিজন (১৬+৮=২৪) যোগ হইয়া দুই আয়তন উল্লিখিত যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হয় এই কথা বলিতে হয়, আর তাহা হইলে এই যৌগিক গ্যাসের এক আয়তন সমান এক আয়তন হাইড্রোজন অপেক্ষা $\frac{১৪+২৪}{২}$ = ৭+১২=১৯ গুণ ভারী হইবে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এইরূপে আমরা যদি ভিন্ন ভিন্ন গ্যাস পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যে সকল গ্যাসে অক্সিজেন আছে, তাহাদের মধ্যে অকসিজেনের ভাগ ওজনে হয় ১৬ আর না হয় ১৬ র গুণ, কখনই ১৬র ভগ্নাংশ নহে। সেইরূপ আবার যে যে যৌগিক গ্যাসে নাইট্রোজেন দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে নাইট্রোজেনের ভাগ ওজনে হয় ১৪ আর না হয় ১৪র গুণ, কখনই ১৪র ভগ্নাংশ

* প্রকৃত পক্ষে এই দ্বিতীয় অনুপাতটী ১৪ ঃ ১৬ ; দুই আয়তন নাইট্রিক্ অক্সাইড এক আয়তন নাইট্রোজেন আর এক আয়তন অক্সিজেনের যোগে উৎপন্ন।

নহে। এইরূপে দেখা যায় যে মৌলিক গ্যাসগুলি সম আয়তন হাইড্রোজেন অপেক্ষা যে পরিমাণে অধিক ভারী তাহারা সেই পরিমাণে কি তাহার গুণ পরিমাণে যৌগিক গ্যাসে উপস্থিত থাকে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত প্রকটিত করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক মৌলিক গ্যাসের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আছে, এই অংশগুলিকে পরমাণু বলা যাইতে পারে, হাইড্রোজেনের পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, নাইট্রোজেনের পরমাণু হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা ১৪ গুণ অধিক ভারী, অক্সিজেনের পরমাণু হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা ১৬ গুণ অধিক ভারী, ইত্যাদি ; প্রায় সমুদয় পরমাণুরই সমান আয়তন, হাইড্রোজেনের কোন এক পরমাণুর আয়তন অন্য প্রায় কোন এক পরমাণুর আয়তনের সমান, হাইড্রোজেনের কোন এক পরমাণুর আয়তন হাইড্রোজেনের অন্য এক পরমাণুর কিম্বা নাইট্রোজেন কি অক্সিজেন কি প্রায় অন্য কোন মৌলিক গ্যাসের কোন এক পরমাণুর আয়তনের সমান। এই সকল পরমাণুর যোগে সমুদয় যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ গ্যাস সম্বন্ধে যে এই সকল নিয়মের প্রয়োগ হইতে পারে এমন নহে, তরল ও জমাট বস্তুদিগের পক্ষেও এই সকল নিয়মের প্রয়োগ হয়। ফলতঃ জমাট, তরল, ও গ্যাসীয়—এই তিনটী—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। বোধ হয় প্রত্যেক বস্তুই এই তিন অবস্থা ধারণ করিতে পারে। যেমন বরফ, জল, ও জলীয় গ্যাস এই তিনটী বস্তু এক জলেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। পরমাণুদিগের যোগে অণু উৎপন্ন হয় ; যেমন হাইড্রোজেনের দুই পরমাণু আর অক্সিজেনের এক পরমাণু এই দুয়ের যোগে জলের এক অণু উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক অণুর আয়তন দুই পরমাণুর আয়তনের সমান ; অর্থাৎ যতটী পরমাণুতেই একটী অণু উৎপন্ন হউক না কেন, অণুটীর আয়তন দুই পরমাণুর আয়তনের সমান, অর্থাৎ এক পরমাণুর আয়তনের দ্বিগুণ হইবে। প্রায় সকল পরমাণুর আয়তনই সমান, সুতরাং সমান আয়তন কোন দুই ভাগ মৌলিক গ্যাসের মধ্যে সমান সংখ্যার পরমাণু থাকিবে ; আবার সকল অণুরই আয়তন সমান (একপরমাণুর আয়তনের দ্বিগুণ), সুতরাং সমান আয়তন কোন দুই ভাগ যৌগিক গ্যাসের মধ্যেও সমান সংখ্যার অণু থাকিবে। আমরা পূর্ব্বে যে বলিয়াছি যে দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন যোগে দুই আয়তন জলীয় বাষ্প হয় আর এক আয়তন জলীয় বাষ্প এক আয়তন হাইড্রোজেন অপেক্ষা নয়গুণ ভারী, তাহা এখন পারমাণবিক সিদ্ধান্তে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ; এক পরমাণু অক্সিজেন ও দুই পরমাণু হাইড্রোজেন যোগে এক অণু জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয় ; এক পরমাণু অক্সিজেনের আয়তন এক, দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের আয়তন দুই, ইহাদের যোগে যখন এক অণু জলীয় বাষ্প হয়, তখন ইহাদের আয়তন তিনের পরিবর্ত্তে দুই হয় ;

দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের ওজন দুই, এক পরমাণু অক্সিজেনের ওজন ষোল, সুতরাং এক অণু জলীয় বাষ্পের ওজন ১৮। এক ঘন ইঞ্চ অক্সিজেন গ্যাসে যতটী পরমাণু আছে, এক ঘন ইঞ্চ হাইড্রোজেন গ্যাসেও উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ততটী পরমাণু আছে, সুতরাং দুই ঘনইঞ্চ হাইড্রোজেনে তাহার দ্বিগুণসংখ্যক পরমাণু আছে। অতএব এক ঘনইঞ্চ অক্সিজেন আর দুই ঘনইঞ্চ হাইড্রোজেন এই দুয়ের যোগ হইলে এক এক পরমাণু অক্সিজেন দুই দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিয়া এক ঘনইঞ্চ অক্সিজেনে যতটী পরমাণু ছিল, ততটী অণু উৎপন্ন হইবে। মনেকর এক ঘন ইঞ্চ অক্সিজেন গ্যাসে স সংখ্যক পরমাণু ছিল; তাহা হইলে এই রূপ বলা যাইতে পারে যে স সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু ২স সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া স সংখ্যক জলীয় বাষ্পের অণু উৎপাদন করে। এক অণুর আয়তন এক পরমাণুর আয়তনের দ্বিগুণ; সুতরাং স সংখ্যক পরমাণুর আয়তন এক ঘন ইঞ্চ হইলে স সংখ্যক অণুর আয়তন দুই ঘনইঞ্চ হইবে। অতএব এক ঘনইঞ্চ অক্সিজেন (স সংখ্যক পরমাণু) ও দুই ঘনইঞ্চ হাইড্রোজেন (২ স সংখ্যক পরমাণু) যোগে দুই ঘনইঞ্চ জলীয়বাষ্প (স সংখ্যক অণু) উৎপন্ন হইবে। স সংখ্যক জলীয় বাষ্পের অণু স সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ১৮গুণ অধিকভারী (কারণ ইহার কিছু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জলীয় বাষ্পের এক অণুর ওজন ১৮); অর্থাৎ দুই ঘন ইঞ্চ জলীয় বাষ্প এক ঘন ইঞ্চ হাইড্রোজেন অপেক্ষা ১৮ গুণ অধিক ভারী, অতএব এক ঘন ইঞ্চ জলীয় বাষ্প এক ঘন ইঞ্চ হাইড্রোজেন অপেক্ষা ৯ নয় গুণ অধিক ভারী; এইরূপে পরমাণু বিষয়ক সিদ্ধান্ত দ্বারা সমুদয় গ্যাস ও অন্যান্য বস্তুর যোগ বিয়োগ প্রণালী ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এখন পরমাণুদিগের আর একটী প্রকৃতি আলোচনা করা হইতেছে; হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া, ও মার্শগ্যাস এই চারি প্রকার গ্যাসেই হাইড্রোজেন আছে কিন্তু প্রথমটীতে একপরমাণু, দ্বিতীয়টীতে দুই পরমাণু, তৃতীয়টীতে তিন পরমাণু, আর চতুর্থটীতে চারি পরমাণু হাইড্রোজেন আছে। প্রথমটীতে আর কেবল এক পরমাণু ক্লোরিন, দ্বিতীয়টীতে আর কেবল এক পরমাণু অক্সিজেন, তৃতীয়টীতে আর কেবল এক পরমাণু নাইট্রোজেন, আর চতুর্থটীতে আর কেবল এক পরমাণু কার্ব্বন আছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হয়; যে সকল পরমাণু কেবল এক পরমাণু হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হইতে পারে, তাহাদিগকে একমুখী বলা যাইতে পারে, যাহারা দুই কি তিন কি চারি পরমাণু হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হইতে পারে, তাহাদিগকে দ্বি—, কি ত্রি—, কি চতুর—,মুখী পরমাণু বলা যাইতে পারে। কোন একমুখী পরমাণু অন্য

একটী একমুখী পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া স্থায়ী বস্তু উৎপন্ন করিতে পারে; কিন্তু কোন একমুখী পরমাণু একটী দ্বিমুখী পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া স্থায়ী বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না, একটী দ্বিমুখী পরমাণুর সহিত দুইটী একমুখী কি একটী দ্বিমুখী পরমাণুর যোগ হইলে স্থায়ী বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে; সেইরূপ আবার স্থায়ী বস্তু উৎপাদনের নিমিত্ত একটী ত্রিমুখী পরমাণুর সহিত একটী ত্রিমুখী কি তিনটী একমুখী কি একটী একমুখী আর একটী দ্বিমুখী পরমাণুর যোগের আবশ্যক, আর একটী চতুর্মুখী পরমাণুর সহিত একটী চতুর্মুখী কি চারিটী একমুখী কি দুইটী দ্বিমুখী কি একটী একমুখী আর একটী ত্রিমুখী পরমাণুর যোগের আবশ্যক। হাইড্রোজেনের পরমাণু একমুখী, কারণ ইহা একটী একমুখী পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া স্থায়ী থাকিতে পারে। আমরা উপরে চতুর্মুখী পরমাণুর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পঞ্চ, ষষ্ঠ ইত্যাদি কম মুখী পরমাণুও আছে, ইহারা কোন সময়ে বহুমুখী আর কোন সময়ে স্বল্পমুখী হয়। পরমাণুদিগের মুখিত্বের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ইহার উদাহরণ এই যে এক পরমাণু কার্ব্বন দুই পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে, আবার এক পরমাণু অক্সিজেনের সহিতও উহার যোগ হইতে পারে। কোন বস্তুর পরমাণু অন্য এক ভিন্ন বস্তুর পরমাণুর সহিত যুক্ত হয়, যেমন হাইড্রোজেনের পরমাণু আর অক্সিজেনের পরমাণু এই দুই প্রকার পরমাণুর যোগ হয়। কিন্তু যদি ভিন্ন বস্তুর পরমাণু উপস্থিত না থাকে কি উপস্থিত থাকিলেও অন্য কোন অধিক আকর্ষক বস্তুর সহিত যুক্ত আছে এরূপ অবস্থায় কোন বস্তুর পরমাণু সকল তাহাদিগের নিজের মধ্যেই একটী অপর একটীর সহিত মিলিত হয়; যেমন দুই পরমাণু অক্সিজেন মিলিত হইয়া এক অণু অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, দুই পরমাণু হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া এক অণু হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রায় সমুদয় পরমাণুরই সমান আয়তন, প্রায় কথাটী বলার উদ্দেশ্য এই যে কতকগুলি পরমাণু এই নিয়মের বহির্ভূত। এক পরমাণু অক্সিজেনের যে আয়তন এক পরমাণু ফস্ফরসের আয়তন তাহার অর্দ্ধেক, অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ১৬, ফস্ফরসের পরমাণুর ওজন৩১; যদি দুই পরমাণুর আয়তন সমান হইত, তাহা হইলে এক ঘন ইঞ্চ ফস্ফরস্ এক ঘনইঞ্চ অক্সিজেন অপেক্ষা $\frac{৩১}{২}$ = প্রায় ২ গুণভারী হইত কিন্তু তাহা নয় বলিয়া $\frac{২ \times ৩১}{১৬}$ = প্রায় ৪ গুণ ভারী, আবার অক্সিজেন পরমাণুর যে আয়তন পারদ পরমাণুর আয়তন তাহার দ্বিগুণ, পারদ পরমাণুর ওজন ২০০; যদি উভয় পরমাণুর আয়তন সমান হইত তবে পারদ পরমাণু অক্সিজেন পরমাণু অপেক্ষা $\frac{২০০}{১৬}$ গুণ ভারী হইত, কিন্তু তাহা নয় বলিয়া $\frac{২০০}{২ \times ১৬} = \frac{১০০}{১৬}$ গুণ অধিক ভারী।

শ্রীক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম।

সৌন্দর্য্যের কারণ।

পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, যে, যখন জগতের স্বপক্ষে থাকি, তখনই আমাদের প্রকৃত সুখ, যখন স্বার্থ খুঁজিয়া মরি তখনই আমাদের ক্লেশ, শ্রান্তি, অসন্তোষ। ইহা হইতে আর-একটা কথা মনে আসে। যাহাদিগকে আমরা সুন্দর বলি তাহাদিগকে আমাদের কেন ভাল লাগে?

পণ্ডিতেরা বলেন, সুন্দর যে, তাহার মধ্যে বিষম কিছুই নাই;—তাহার আপনার মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য; তাহার কোন-একটি অংশ অপর-একটি অংশের সহিত বিবাদ করে না; জেদ করিয়া অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠে না; ঈর্ষ্যাবশতঃ স্বতন্ত্র হইয়া মুখ বাঁকাইয়া থাকে না। তাহার প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সুখে সুখী; তাহারা ভাবে আমরা যে আপনারা সুন্দর সে কেবল সমগ্রকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য, এই জন্য তাহাদের এই মাত্র চেষ্টা যাহাতে সমস্তটি সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে। এই জন্যই সুন্দরের প্রত্যেক অংশ সুন্দর। তাহারা যদি স্ব স্ব প্রধান হইত, তাহারা যদি সকলেই মনে করিত আর সকলের চেয়ে আমিই মস্ত লোক হইয়া উঠিব, এক জন আর এক জনকে মানিত না, তাহা হইলে, না তাহারা নিজে সুন্দর হইত, না তাহাদের সমগ্র সুন্দর হইয়া উঠিত। তাহা হইলে এক বাঁকাচোরা হ্রস্ব দীর্ঘ, উঁচু নিচু, বিশৃঙ্খল চক্ষুশূল জন্মগ্রহণ করিত। অতএব দেখা যাইতেছে, যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ, প্রেমের প্রভাবেই সে সুন্দর হইয়াছে, তাহার আদ্যন্তমধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা, তাহার কোন খানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই। প্রেমের শতদল একটি বৃন্তের উপরে কি মধুর প্রেমে মিলিয়া থাকে! তাই তাহাকে দেখিতে ভাল লাগে। তাহার কোমলতা মধুর, কারণ কোমলতা প্রেম, কোমলতা কাহাকেও আঘাত করেনা, কোমলতা সকলের গায়ে করুণ হস্তক্ষেপ করে, সে চোখের পাতায় স্নেহ আকর্ষণ করিয়া আনে। ইন্দ্রধনুর রংগুলি প্রেমের রং, তাহাদের মধ্যে কেমন মিল! তাহারা সকলেই সকলের জন্য জায়গা রাখিয়াছে, কেহ কাহাকেও দূর করিতে চায় না, তাহারা সুরবালিকাদের মত হাত-ধরাধরি করিয়া দেখা দেয়, গলাগলি করিয়া মিলাইয়া যায়। গানের সুরগুলি প্রেমের সুর, তাহারা সকলে মিলিয়া খেলাইতে থাকে, তাহারা পরস্পরকে সাজাইয়া দেয়, তাহারা আপনার সঙ্গিনীদের দূর হইতে ডাকিয়া আনে! এই জন্যই

সৌন্দর্য্য মনের মধ্যে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, স আপনার প্রেমে অন্যকে প্রেমিক করিয়া লে, সে আপনি সুন্দর হইয়া অন্যকে ন্দর করে।

সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেমী।

যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের ধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়;—সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে। সৌন্দর্য্য জগতের অনুকূল। কদর্য্যতা সয়তানের দলভুক্ত। সে বিদ্রোহী। সে যে টিঁকিয়া থাকে সে কেবল মাত্র গায়ের জোরে। তাও সে থাকিত না, কারণ, কতটুকুই বা তাহার গায়ের জোর; কিন্তু প্রকৃতি তাহা হইতেও বুঝি সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত করিবেন।

মনের মিল।

জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। জগতের সর্ব্বত্রই তাহার তুলনা তাহার দোসর মেলে। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে সকলের ভাল লাগে। সৌন্দর্য্য যদি একেবারেই নূতন হইত, খাপছাড়া হইত, হঠাৎ-বাবুর মত একটা কিম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে আর কাহারো ভাল লাগিত?

আমাদের মনের মধ্যেই এমন একটা জিনিষ আছে, সৌন্দর্য্যের সহিত যাহার অত্যন্ত ঐক্য হয়। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমার মিত্র" বলিয়া মনে হয়। জগতে আমরা "সদৃশকে" খুঁজিয়া বেড়াই। যথার্থ সদৃশকে দেখিলেই হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিয়া আনে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেমন আমাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, এমন আর কোথায়? সৌন্দর্য্যকে দেখিলেই তাহাকে আমাদের "মনের মত" বলিয়া মনে হয় কেন? সে-ই আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্য্যতার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না।

আমরা সকলেই যদি কিছু না কিছু সুন্দর হইতাম, তাহা হইলে সুন্দর ভাল বাসিতাম না।

উপযোগিতা।

যাহা আমাদের উপকারী ও উপযোগী, তাহাই কালক্রমে অভ্যাসবশতঃ আমাদের চক্ষে সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় ও বংশপরম্পরায় সেই প্রতীতি প্রবাহিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে—এরূপ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে, লোকে অবসর পাইলে ফুলের বাগানে বেড়াইতে না গিয়া ময়রার দোকানে বেড়াইতে যাইত, ঘরের দেয়ালে লুচি টাঙ্গাইয়া রাখিত ও ফুলদানীর পরিবর্ত্তে সন্দেশের হাঁড়ি টেবিলের উপর বিরাজ করিত।

আমরা সুন্দর।

প্রকৃত কথা এই যে আমরা বাহিরে যেমনই হই না কেন, আমরা বাস্তবিকই সুন্দর, সেই জন্য সৌন্দর্য্যের সহিতই আমাদের যথার্থ ঐক্য দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-চেতনা সকলের কিছু সমান্ নয়।

যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার নিজের ঐক্য ততই সে বুঝিতে পারে, ও ততই সে আনন্দ লাভ করে। আমি যে, ফুল এত ভালবাসি তাহার কারণ আর কিছু নয়, ফুলের সহিত আমার হৃদয়ের গূঢ় একটি ঐক্য আছে—আমার মনে হয় ও একই কথা, যে সৌন্দর্য্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যই অবস্থাভেদে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে; সেই জন্য ফুলও আমার হৃদয় চাহিতেছে, আমিও ফুলকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চাহিতেছি। মনের মধ্যে একটি বিলাপ উঠিতেছে—যে, আমরা এক পরিবারের লোক, তবে কেন অবস্থান্তর নামক দেয়ালের আড়ালে পর হইয়া বাস করিতেছি; কেন পরস্পরকে সর্ব্বতোভাবে পাইতেছি না?

সুদূর ঐক্য।

সৌন্দর্য্যের ঐক্য দেখিয়াই বিক্টর হ্যুগো গান গাহিতেছেন।

মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙ্গা এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে;
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে,
"লাবণ্য-কিরণ-ছটা আমারো ত আছে!"
"লক্ষান্তরে হর্কশ্চ জলেষু পদ্মঃ" ইহাদের মধ্যেও ঐক্য!

সুন্দর সুন্দর করে।

সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয়, এবং প্রেমেই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে। শারীরিক সৌন্দর্য্যও প্রেমে যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে না। মানুষের মিলনে যেমন প্রেম আছে, পশুদের মিলনে তেমন প্রেম নাই, এই জন্য বোধ করি, পশুদের অপেক্ষা মানুষের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটতর। যে মানুষ ও যে জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সে মানুষের ও সে জাতির মুখশ্রী সুন্দর হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে, দয়ায় সুন্দর করে, প্রেমে সুন্দর করে, হিংসায় ঘৃণায় নিষ্ঠুরতায় সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। জগতের অনুকূলতাচরণ করিলে সুন্দর হইয়া উঠি ও প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাদের গালে কদর্য্যতার চুনকালী মাখাইয়া তাহার রাজপথে ছাড়িয়া দেয়, আমাদিগকে কেহ সমাদর করিয়া আশ্রয় দেয় না।

শাস্তি।

এ শাস্তি বড় সামান্য নহে। আমাদের নিজের মধ্যে সৌন্দর্য্যের ন্যূনতা থাকিলে, আমরা জগতের সৌন্দর্য্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাই না, ধরণীর ধুলা-কাদার মধ্যে লুটাইতে থাকি। শব্দ শুনি গান শুনি না, চলাফিরা দেখিতে পাই নৃত্য দেখিতে পাই না, আহার করিয়া পেট ভরাই কিন্তু সুস্বাদ কাহাকে বলে জানি না। জগতের যে অংশে কারাগার সেই খানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অত্যন্ত নিরাপদে বৈষয়িক কেঁচো হইয়া বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিই, মৃত্তিকার তলবাসী চক্ষুবিহীন কৃমিদের সহিত কুটুম্বিতা করি, ও তাহাদের সহিত জড়িত বিজড়িত হইয়া স্তূপাকারে নিদ্রা দিই।

উদ্ধার।

এই কৃমিরাজ্য হইতে উদ্ধার পাইয়া আমরা সূর্য্যালোকে আসিতে চাই। কে আনিবে? সৌন্দর্য্য স্বয়ং। কারণ, অশরীরী প্রেম সৌন্দর্য্যে শরীর ধারণ করিয়াছে। প্রেম যেখানে ভাব সৌন্দর্য্য সেখানে তাহার অক্ষর, প্রেম যেখানে হৃদয় সৌন্দর্য্য সেখানে গান, প্রেম যেখানে প্রাণ সৌন্দর্য্য সেখানে শরীর, এই জন্য সৌন্দর্য্যে প্রেম জাগায়, এবং প্রেমে সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে।

কবির কাজ।

কবিদের কি কাজ, এইবার দেখা যাইতেছে। সে আর কিছু নয়, আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া। উপদেশ দিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিয়া প্রকৃতিকে মৃতদেহের মত কাটাকুটি করিয়া এ উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। সুন্দরই সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিতে পারে। বৈষয়িকেরা বলেন ইহাতে লাভটা কি? কেবলমাত্র একটি সুন্দর ছবি পাইয়া, বা সুন্দর কথা শুনিয়া উপকার কি হইল? কি জানিলাম? কি শিক্ষালাভ করিলাম? সঞ্চয়ের খাতায় কোন্ নূতন কড়িটা জমা করিলাম? কিছুক্ষণের মত আনন্দ পাইলাম, সে ত সন্দেশ খাইলেও পাই। ততক্ষণ যদি পাঁজি দেখিতাম, তবে আজকেকার তারিখ বার ও কবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে সে খবরটা জানিতে পাইতাম।

বৈষয়িকেরা যাহাই বলুন না কেন, আর কোন উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না, মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করাই যথেষ্ট মহৎ। কবিতার ইহা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আর থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়;—অসাড়তা, অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া। সে কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহাদের সহিত একটি ময়রার তুলনা ঠিক খাটে না।

অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য্য ফুটাইতে থাকুন—যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবেই আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।

কবিতা ও তত্ত্ব।

কবিরা যদি একটি তত্ত্ববিশেষকে সম্মুখে খাড়া করিয়া তাহারই গায়ের মাপে ছাঁট্-ছোঁট করিয়া কবিতার মেরজাই ও পায়জামা বানাইতে থাকেন, ও সেই পোষাকে সুসজ্জিত করিয়া তত্ত্বকে সমাজে ছাড়িয়া দেন, তবে সে তত্ত্বগুলিকে কেমন খোকাবাবুর মত দেখায় ও সে কাজটাও ঠিক

কবির উপযুক্ত হয় না। এক একবার এমন দর্জ্জীবৃত্তি করিতে দোষ নাই, এবং মোটা মোটা বয়স্ক তত্ত্বেরা যদি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান বিশেষের সময়ে তাঁহাদের থান-ধুতি ছাড়িয়া এইরূপ পোষাক পরিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাহাতেও তেমন আপত্তি দেখি না। কিন্তু এই যদি প্রথা হইয়া পড়ে, কবিতাটি দেখিলেই যদি দশ-জনে পড়িয়া তাহার খোলা ও শাঁস ছাড়া-ইয়া ফেলিয়া তাহা হইতে তত্ত্বের আঁটি বাহির করাই প্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে এমন ফলের চাস হইতে আরম্ভ হইবে, যাহার আঁটিটাই সমস্ত, এবং যে সকল ফলের মধ্যে আঁটির বাহুল্য থাকিবে না শাঁস এবং মধুর রসই অধিক তাহারা নিজের আঁঠি-দরিদ্র অস্তিত্ব ও মাধুর্য্য রসের আধিক্য লইয়া নিতান্ত লজ্জা অনুভব করিবে। তখন গহনা-পরা গরবিণীকে দেখিয়া ভুবন-মোহিনী রূপসীরাও ঈর্ষ্যাদগ্ধ হইবে।

তত্ত্বের বার্দ্ধক্য।

তত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান পুরাতন হইয়া যায়, মৃত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া যায়। আজ যে জ্ঞানটি নানা উপায়ে প্রচার করিবার আবশ্যক থাকে, কাল আর থাকে না, কাল তাহা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে, কাল যদি পুনশ্চ সে কথা উত্থাপন করিতে যাও তবে লোকে তোমাকে মারিতে আসে, বলে "আমি কি জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলাম, না আমি কাল জন্মগ্রহণ করি-য়াছি যে, আমাকে ঐ মান্ধাতার আমলের কথা শুনাইতে আসিয়াছ?" জ্ঞান একটু পুরাতন হইলেই তাহার পুনরুক্তি আর কাহারও সহ্য হয় না। অনেক জ্ঞান কাল-ক্রমে লোপ পায়, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া পড়ে। এমন একদিন ছিল যখন, আমরা শব্দ যে কানেই শুনি, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া শুনি না, এ কথাটাও নূতন সত্য ছিল। তখন এ কথাটা প্রমাণ দিয়া বুঝা-ইতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের কথা চিরকাল পুরাতন এবং চিরকাল নূতন। বাল্মীকির সময়ে যে সকল তত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহাদের অনেকগুলি এখন মিথ্যা বলিয়া স্থির হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন ঋষি-কবি হৃদয়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তা-হার কোনটাই এখনও অপ্রচলিত হয় নাই।

অতএব জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চিরযৌবনা। তাহাকে এই বুড়ার সহিত বিবাহ দিয়া অল্পবয়সে বিধবা ও অনুমৃতা করা উচিত হয় না।

সৌন্দর্য্যের কাজ।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য, জানান' নহে অনুভব করান'। চারিদিক হইতে কেবল নানা উপায়ে হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা হইতেছে। যে জড়-হৃদয়, তাহাকেও মুগ্ধ করিতে হইবে, দিবানিশি তাহার কেবল এই যত্ন। তাহার প্রধান ইচ্ছা এই যে, সক-লের সকল ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে আপনাকে বা অপরকে কেহ যেন বিনাশ না করে, এত ভাল লাগে যে সকলে

সকলের অনুকূল হয়। কারণ এই ইচ্ছার উপর তাহার সমস্ত শুভ, তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। প্রথম অবস্থায় শাস-নের দ্বারা প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। জগৎকে ঘুসি মারিলে তোমার মুষ্টিতে গুরুতর আঘাত লাগে, ক্রমে দেখিলে জগতের সাহায্য করিলে সেও তোমার সাহায্য করে। এরূপ শাসনে এরূপ স্বার্থপরতায় জগতের রক্ষা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ কিছুই নাই, তাহাতে জড়ত্ব ও দাসত্বই অধিক। এই জন্য প্রকৃতিতে যেমন শাসনও আছে, তেমনি সৌন্দর্য্যও আছে। প্রকৃতির অভিপ্রায় এই, যাহাতে শাসন চলিয়া গিয়া সৌন্দর্য্যের বিস্তার হয়। শাসনের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া সৌন্দর্য্যের মাথায় রাজছত্র ধরাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃতি যদি নিষ্ঠুর শাসনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের আবশ্যকই থাকিত না। তাহা হইলে প্রভাত মধুর হইত না, ফুল মধুর হইত না, মানুষের মুখশ্রী মধুর হইত না। এই সকল মাধুর্য্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা ক্রমশঃ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আমরা ভালবাসিব বলিয়া জগতের হিত-সাধন করিব। তখন ভয় কোথায় থাকিবে! তখন সৌন্দর্য্য জগ-তের চতুর্দ্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের হৃদয়-কমল-শায়ী সুপ্ত সৌন্দর্য্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি জাগিয়াই আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শাসনের সি-পাহীগুলোর নাম কাটিয়া দিয়াছেন জগতের চারিদিকে তাঁহার জয়জয়কার উঠিয়াছে।

স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক।

কবিরা সেই সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহারা সেই স্বাধীনতার গান গাহিতেছেন, তাঁহারা সজীব মন্ত্রবলে হৃদয়ের বন্ধন মোচন করি-তেছেন। তাঁহারা সেই শাসনহীন স্বাধীন-তার জন্য আমাদের হৃদয়ে সিংহাসন নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেই মহারাজা কর্ত্তৃক রক্তপাত-হীন জগৎজয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; কবিরা তাঁহারই সৈন্য। তাঁহারা উপদেশ দিতে আসেন নাই, পরা-মর্শ দিতে আসেন নাই, বিজ্ঞতা শিখাইতে আসেন নাই। তত্ত্ব সজীবতা ও সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য কখন কখন তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা তত্ত্বর কাছে কখন উমেদারী করিতে যান না। কবিরা অমর, কেন না তাঁহা-দের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করি-য়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছেন। ফুল চির-কাল ফুটিবে, সমীরণ চিরকাল বহিবে, পাখী চিরকাল ডাকিবে, এবং এই ফুলের মধ্যে কবির স্মৃতি বিকশিত, এই সমীরণের মধ্যে কবির স্মৃতি প্রবাহিত, এই পাখীর গানে কবির গান বাজিয়া ওঠে। কবির নাম নির্জ্জীব পাথরের মধ্যে খোদিত নহে, কবির নাম প্রভাতের নব নব বিকশিত বিচিত্র-বর্ণ ফুলের অক্ষরে প্রত্যহ নূতন করিয়া লিখিত হয়। কবি প্রিয়, কারণ, তিনি যাহাদিগকে ভাল বাসিয়া কবি হইয়াছেন, তাহারা চিরকাল প্রিয়, কোনকালে তা-হারা অপ্রিয় ছিল না, কোনকালে তাহারা অপ্রিয় হইবে না।

পুরাতন কথা।

যাঁহারা বলেন সকল কবিরা ঐ এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন, নূতন কি বলিতেছেন? তাঁহাদের কথার আর উত্তর দিবার কি আবশ্যক আছে? এক কথায় তাঁহাদের উত্তর দেওয়া যায়। পুরাতন কথা বলেন বলিয়াই কবিরা কবি। তাঁহারা নূতন কথা বলেন না। নূতনকে বিশ্বাস করে কে? নূতনকে অসন্দিগ্ধচিত্তে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে কে ডাকিয়া লইয়া যাইতে পারে? তাহার বংশাবলীর খবর রাখে কে? কবিরা এমন পুরাতন কথা বলেন, যাহা আমার পক্ষেও খাটে তোমার পক্ষেও খাটে; যাহা আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে। যাহা শুনিবামাত্র সুদূর অতীত হইতে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিতে পারে, ঠিক কথা! যাহা শুনিয়া আমরা সকলেই আনন্দে বলিতে পারি, পরের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য যোগ, অতীত কালের হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান কালের হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য ঐক্য! হৃদয়ের ব্যাপ্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়িয়া যায়!

জ্ঞান ও প্রেম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানে প্রেমে অনেক প্রভেদ। জ্ঞানে আমাদের ক্ষমতা বাড়ে, প্রেমে আমাদের অধিকার বাড়ে। জ্ঞান শরীরের মত, প্রেম মনের মত। জ্ঞান কুস্তি করিয়া জয়ী হয়, প্রেম সৌন্দর্য্যের দ্বারা জয়ী হয়। জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় মাত্র, প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়। জ্ঞানেতেই বৃদ্ধ করিয়া দেয়, প্রেমেতেই যৌবন জিয়াইয়া রাখে। জ্ঞানের অধিকার যাহার উপরে তাহা চঞ্চল, প্রেমের অধিকার যাহার উপরে তাহা ধ্রুব। জ্ঞানীর সুখ আত্ম গৌরব নামক ক্ষমতার সুখ, প্রেমিকের সুখ আত্ম বিসর্জ্জন নামক স্বাধীনতার সুখ।

নগদ কড়ি।

জ্ঞান যাহা জানে তাহা প্রকৃত জানাই নয়, প্রেম যাহা জানে তাহাই যথার্থ জানা। একজন জ্ঞানী ও প্রেমিকের নিকটে এই সম্বন্ধে একটি পারস্য কবিতার চমৎকার ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম লিখিয়া দিতেছি।

পারস্য কবি এইরূপ একটি ছবি দিতেছেন যে, বৃদ্ধ পক্ককেশ জ্ঞান তাহার লোহার সিন্দুকে চাবি লাগাইয়া বসিয়া আছে; হৃদয় "নগদ কড়ি দাও" "নগদ কড়ি দাও" বলিয়া তাহারই কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, প্রেম এক পাশে বসিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিতেছে "মুকিল!"

অর্থাৎ জ্ঞান নগদ কড়ি কোথায় পাইবে! সে ত কতকগুলো নোট দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই নোট ভাঙ্গাইয়া দিবে এমন পোদ্দার কোথায়! জ্ঞানে ত কেবল কতকগুলো চিহ্ন দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই চিহ্নের অর্থ বলিয়া দিবে কে? জগতের সকল ব্যাঙ্কে নোটই দেখিতেছি, চিহ্নই দেখিতেছি, হৃদয় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, নগদ কড়ি পাইব কোথায়? প্রেমের কাছে পাইবে।

আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার।

যেমন শরীরের দ্বারা শরীরকেই আয়ত্ত করা যায় তেমনি জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যবস্তুর উপরেই ক্ষমতা জন্মে, মর্ম্মের মধ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ।

একজন ইংরাজ স্ত্রীকবি এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মর্ম্ম এই যে, যদি অংশ চাও তবে জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা পাইবে তাও ভাল করিয়া পাইবে না যদি সমস্ত চাও তবে মন বা প্রেমের দ্বারা পাইবে।

Inclusions

Oh, wilt thou have my hand dear,
to lie along in thine?
As a little stone in a running stream,
it seems to lie and pine.
Now drop the poor pale hand, dear,
unfit to ply with thine.

Oh wilt thou have my cheek dear,
drawn closer to thine own?
My cheek is white, my cheek is
worn, by many a tear run down.
Now leave a little space, dear, lest it
should wet thine own.

Oh must thou have my soul, Dear,
commingled with thy soul?
Red grows the cheek, and warm the
hand, the part is in the whole:
Nor hands nor cheeks keep separate,
when soul is joined to soul.

Mrs Browning

সত্যং শিবং সুন্দরং।

সত্য কেবল মাত্র হওয়া, শিব থাকা, সুন্দর ভাল-করিয়া থাকা। সত্য শিব না না হইলে থাকিতে পারে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অসত্য হইয়া যায়। শিব আপনার শিবত্বের প্রভাবে অবশেষে সুন্দর হইয়া উঠে। সত্য আমাদিগকে জন্ম দেয়, শিব আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বাঁচাইয়া রাখে, সুন্দর আমাদিগকে আনন্দ দিয়া আমাদের স্বেচ্ছার সহিত বাঁচাইয়া রাখে। মনুষ্য-জীবন সত্য, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান শিব, প্রেম সুন্দর। বিজ্ঞান সত্য, দর্শন শিব, কাব্য সুন্দর।

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্য ভয় নাই; জগতের সর্ব্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ-করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহারা মরুভূমিতে বাস করে; তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জন্মায় না, তরুলতা নাই, বসন্ত আসে না।

তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। জগতের সর্ব্বত্র তোমার মাতৃস্নেহ। তুমি এই জগতের শীর্ণ

কঠিন কঙ্কাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ পরিবারের বিরোধ বিদ্বেষ দূর করিতেছ। তুমি জননী কি না, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈর্ষা দেখিতে পার না। তুমি বিশ্ব চরাচরকে তোমার বিকশিত কমল দলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখনি পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতেছি, "কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার স্থাপন কর, তোমার স্নেহ হস্তে কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণক ঠিনতা দূর কর। তোমার চরণ রেণু সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া আমার হৃদয়ে পুষ্পগুলি তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে থাকুক!

এই যে, তোমার পদ্মবনের গন্ধ কোথা হইতে জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চরাচর উন্মত্ত হইয়া মধুকরের মত দল বাঁধিয়া গুন্ গুন্ গান করিতে করিতে সুনীল আকাশে চারিদিক হইতে উড়িয়া চলিয়াছে!

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যুদ্ধ ধর্ম্ম।

প্রাচীন ভারতের সকল কার্য্যেই ধর্ম্ম সংযোগ ছিল। আহার করিবে, তাহাতেও ধর্ম্ম, ব্যবহার করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম, বিহার করিবে, তাহাতেও ধর্ম্ম, যুদ্ধ করিবে, তাহাতেও ধর্ম্ম। কোন কার্য্যই অধর্ম্ম পূর্ব্বক করা বিধেয় নহে; সকল কার্য্যই ধর্ম্ম পূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য, এইরূপ দৃঢ়তর জ্ঞান পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধ যে এত নৃশংসের কার্য্য, পূর্ব্বকালে তাহাও ধর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ ছিল। মানুষ মারিব, কিন্তু ধর্ম্ম বা নিয়ম পূর্ব্বক মারিব,—এরূপ ইচ্ছা এরূপ নিয়ম, এরূপ অভিসন্ধি, এরূপ সতর্কতা—ভাবিয়া দেখিলে উহা বীরসমাজের ভূষণ বলিয়া প্রতীতি হয়।

কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বান্তকর যুদ্ধ উপস্থিত হইল, কুরু পাণ্ডব-সৈন্য পূর্ণ উৎসাহে পরস্পর পরস্পরের বধার্থ উৎযোগ করিল—কিন্তু সর্ব্বাগ্রে একটা ধর্ম্ম নিয়ম প্রচার করা হইল। উভয়পক্ষ হইতেই ধ্বনিত হইল যে আমরা অধর্ম্ম বা অন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব না। আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার আমাদের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে। দিন দিন দৈনিক যুদ্ধের অবসানে রাত্রিকালে আমাদের শত্রুতা বিদূরিতথাকিবে। তুল্যযোগ অতিক্রম, অন্যায়াচরণ ও কেহ কাহাকে প্রতারণা করিব না। বাকযুদ্ধকালে বাক্ যুদ্ধই হইবে, অস্ত্রযুদ্ধে অস্ত্র যুদ্ধই হইবে। পলায়িত ব্যক্তিকে ও ব্যূহ-চ্যুত ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারূঢ়ের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারূঢ়ের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে যুদ্ধ করিবে। তাহাতে কেহ প্রতিকূল কি প্রতিবন্ধক হইবে না। অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করা হইবে। বিশ্বস্ত ও ভয় বিহ্বল ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না। নিরস্ত্র হইলে বর্ম্মরহিত হইলে কদাচ তাহাকে প্রহার করা হইবে না। সারথি, ভারবাহী, শস্ত্রনেতা-দাস ও বাদ্যকর প্রভৃতিকে বধকরা হইবে না, ভারত যুদ্ধে ইত্যাদি প্রকার অদ্ভুত ধর্ম্ম নিয়ম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

যুদ্ধে কি প্রকার কার্য্য করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহা মনুসংহিতা, নীতি ময়ূখ, কামন্দকীয়, নীতিসার, বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর, নীতি প্রকাশিকা ও শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত আছে। যথা—

নচহন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলীং।
ন মুক্তকেশ মাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরাযুধম্।
না যুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্॥
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্ম মনুস্মরণ॥

(নীতি ময়ূখধৃত মনুবচন।)

যে ব্যক্তি যান হইতে অবতরণ করিয়াছে স্থলারূঢ় হইয়াছে, তাহাকে আঘাত করা বিধেয় নহে। ক্লীবকে আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। যে অঞ্জলী বদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। মুক্তকেশ ব্যক্তিকে, উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং যে ব্যক্তি "আমি তোমার শরণাগত হইলাম," বলে তাহাকে বধ করিতে নাই। নিদ্রিত ব্যক্তিকে, বর্ম্মাদি পরিচ্ছদ রহিত ব্যক্তিকে, নগ্ন ব্যক্তিকে, ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে যুদ্ধ করিতেছে না, যে যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছে, যে অপরের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, যে ভয় বিহ্বল হইয়াছে, যে পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, যে পশ্চাৎমুখ হইয়াছে, সাধুদিগের ধর্ম্ম মনে করিয়া এই সকল ব্যক্তিকেও আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে।

'বৃদ্ধ বালো ন হন্তব্যো নৈব স্ত্রী নৈবচ দ্বিজ।
তৃণপূর্ণ মুখশ্চৈব তবাস্মীতি চ যো বদেৎ॥"

বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, এবং যে তৃণ মুখে করিয়া "আমি তোমার" এইরূপ কথা বলে, তাহাকে কোনক্রমেই বিনাশ করিবে না।

মহর্ষি বৈশম্পায়নও স্বকৃত নীতিপ্রকাশিকা গ্রন্থে উক্ত প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"ন কূটৈ রা যুধৈ র্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণেরিপূন্।
দিগ্ধৈ রত্যা নৈর্বৈত্রৈস্তৈত্রৈশ্চৈব পৃথক্বিধৈঃ॥
ন হন্যা দ্বৃক্ষমারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্ত কেশং নাসীনং ন তথাস্মীতি বাদিনম্॥
ন প্রসুপ্তং ন প্রণতং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্॥
ন যুদ্ধমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।
আয়ুধ ব্যসনং প্রাপ্তং নার্ত্তং নাতি পরিক্ষতন্॥

ন ক্ষীনং ন পরাবৃত্তং ন চ বর্ম্মীক মাশ্রিতম্।
নমুখে তৃনিনং হন্যাৎ ন স্ত্রীয়ো বেশধা-
রনম্॥
এতাদৃশান্ ভটৈর্বাপি ঘাতয়ন্ কিল্বিষী
ভবেৎ॥"

নীতি প্রকাশিকায় এই সকল বচন অতি সরল শব্দে গ্রথিত আছে। বিশেষতঃ এ গুলির অর্থপ্রায় পূর্ব্বোক্ত বচনাবলীর দ্বারায় গতার্থ হইয়াছে। ফল, প্রথমোক্ত কূটাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে শতঘ্নী প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্রগুলিকেই প্রধান কল্পে গণ্য করিতে হয়। এক্ষণকার কামান্-যুদ্ধ অত্যন্ত কূট। কামানের ন্যায় কূটাস্ত্র আর কিছুই নাই ও ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে কামানের ন্যায় অথবা অন্য-এক আকারের কামান ছিল কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন না। কামানের দ্বারা যুদ্ধ করায় অধর্ম্ম হয় এবং উহাতে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই এইরূপ বোধ থাকাতেই তৎকালের ক্ষত্রবীরেরা কামান কি কোন-রূপ যন্ত্রাগ্নির দ্বারা মনুষ্য-বধ করিতে উৎ-সাহী হইতেন না। মহাভারতে উক্ত হই-য়াছে যে,—

"তাবন্নুঠে পীড়ায়চ্চ শত্রোঃ প্রকৃতয়ঃ সায়ম্।
বশে জাতে পুনস্তাসু শিতৃ চ দৃস্তিমাচরেৎ॥"

শত্রু যতকাল না বশীভূত হয়, ততকাল তাহার অনুগত প্রজা ও অমাত্যদিগকে পীড়িত করিবেক এবং তাহার ধনও লুণ্ঠন করিবেক; পরন্তু সে যখন বশীভূত হইবেক, তখন আর তাহার প্রতি কোন প্রকার অ-তাচার করিবেক না, প্রত্যুত তাহাকে পিতৃবৎ অর্থাৎ পিতাকে যেমন বৃত্তি প্রদান করিতে হয় সেই রূপ তাহাকেও বৃত্তি প্রদান করিবেক।

ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধে মনুর উক্তি এইরূপ ঃ——

"সমোত্তমাধমৈরাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষত্রধর্ম্ম মনুস্মরন্॥"
"আহবেষু মিথোন্যন্যং জিঘাংসন্তো মহী-
ক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্য পরাঙ্মুখাঃ॥"

প্রজা পালনকারী রাজা সমান, মধ্যম ও উত্তম ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগ্রামে আহূত হইলে, ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছু রাজগণ সমধিক শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা পরাঙ্মুখ না হন, তাঁহারা স্বর্গ গমন করিয়া থাকেন।

উৎসাহ বাক্য।

যুদ্ধকালে রাজার সেনা নায়ক উৎসাহ বর্দ্ধক বাক্যের দ্বারা যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। ওজো-বাক্য বা উৎসাহ বাক্য কিরূপ তাহা মহাভারতাদি গ্রন্থে অধিক পরিমাণে আছে। নীতি প্রকাশিকা প্রভৃতি নীতিগ্রন্থেও আছে। মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রায় সকল পাঠকেরই জানা আছে, এজন্য আমরা নীতিগ্রন্থের উদাহৃত কতিপয় ওজো বাক্য আহরণ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। যথা—

"দ্বৈপায়নেন মুনিনা মনুনাচ ধর্ম্মা
যুদ্ধেষু যে নিগদিতা বিদিতাস্ত তে চঃ।

স্বম্যর্থ গো দ্বিজহিতে ত্যজতাং শরীরং
লোকাভবন্তি সুলভা বিপুলং যশশ্চ॥"

১

"তপস্বিভির্য্যাসু চিরেণ লভ্যতে
প্রযত্নতঃ সত্রিভিরিজ্যয়া চ যা।
ব্রজন্তিতা যাশুগতিং মনস্বিনো
রনাশ্বমেধে পশুতা মুপাগতাঃ॥"

২

"স্বর্গস্যমার্গা-বহবঃ প্রদিষ্টাঃ
তে কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ কুটিলাঃ সবিঘ্নাঃ।
নিমেষ মাত্রেণ মহাফলোঽয়ং
ঋজুশ্চ পন্থাঃ সময়ে ব্য সুহৃম্॥"

৩

"সংরক্ষ্যমানা মপি নাশ মুপৈত্য বশ্যং
এতচ্ছরীর মপহায় সুহৃৎ সুতার্থান্।
তৎকিং বরং প্রলপতাং সুদৃশাং সমক্ষম্
কিং নিঘ্নতঃ পরবলং ভৃকুটী মুখস্য॥"

৪

"হাতাত মাতেতি চ বেদনার্ত্তঃ
কিরণ শকৃন্মূত্র কফাসু লিপ্তঃ।
বরং মৃতঃ কিং ভবনে কি মাজৌ
সন্তুষ্ট দন্তচ্ছদ ভীম বক্ত্রঃ॥"

৫

"যস্য তপো ন জনাঃ কথয়ন্তিনোমরণং
সময়ে বিজয়ং বা।
ন শ্রুতদান মহাধনতা বা তস্যভয়ঃ কৃমিকীট
সমানঃ॥"

৬

"লোকেয়শুভ স্তিষ্ঠতু তাবদন্যঃ
পরাঙ্মুখানাং সময়েষু পুংসাম্।
মাত্রোঽপি তেষাং ন হ্রিয়া মুখানি
সুহৃঃ সখিনা মচ লোকয়ন্তি॥

৭

"শত্রু সৈন্যমচদার্য্য বর্ত্ততাং
যৎসুখন্ত কথয়া মিতাদৃশম্।
শৃণ্বতাং স্ব যশোসাপ পল্লবান্
দ্বিগ্ধ বদনবর্ণ পূরকান্॥"

৮

"নিপততি শিরসি বিপস্য সিংহঃ
স্বতনু শতাধিকমাংস রাশি মূর্ত্তিঃ।
পিবতি চ তদসৃঙ্ নদেষ্ট গন্ধং
বদন গতাংশ্চ শনৈঃ প্রমৃজ্য মুক্তান্॥"

৯

"চিত্রং কিমস্মিন্ বদ সাহসং বা
যৎ স্বামিনোঽর্থে গণয়ন্তি নাসূন্।
যুদ্ধাৎ প্রনষ্টো বিদিতোঽস্নি মধ্যে
যত্রানিশস্তিষ্ঠতি সাহসং তৎ॥"

১০

"যদি সময় মাপাস্য নাস্তি মৃত্যো
র্ভয়মিতি যুক্ত মতোন্যতঃ প্রয়াতুম্।
অথমরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বন্॥

১। যোদ্ধাগণ! তোমরা ব্যাসের ও মনুর কথিত যুদ্ধধর্ম্ম জ্ঞাত আছ। প্রভুর জন্য, গোজাতির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ও ব্রা-হ্মণের জন্য যাহারা যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করে, তাহাদের সর্গলোক সুলভ ও বিপুল যশোলাভ হয়।

২। তপস্বিগণ যাহা দীর্ঘকাল পরে প্রাপ্ত হন, যাজ্ঞিকেরা যাহা যত্নসাধ্য যজ্ঞের দ্বারা লাভ করেন, প্রশস্তচেতা বীরগণ যুদ্ধরূপ অশ্বমেধের পশু হইয়া তাহা ক্ষণকাল মধ্যে লাভ করিয়া থাকেন।

৩। ঋষিগণ স্বর্গগমনের বহুবিধ পথ উপদেশ করিয়াছেন, পরন্তু সে সকল পথ অতিশয় কষ্টগম্য কুটিল ও বিঘ্ন পরিপূর্ণ কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগরূপ পথটী ঋজু ও মহা-ফলদায়ক। আরও সুগমতা এই যে, এই পথের পথিক এক নিমেষের মধ্যেই স্বর্গ-গমন করেন।

৪। এই ভৌতিক শরীর যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলেও ইহা রক্ষিত হইবে না। অবশ্যই ইহার পতন বা বিনাশ হইবে। অবশ্যই ইহা বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র ও ধন,—এই সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া ভূমিসাৎ হইবে। এমতস্থলে বল দেখি, ইহা রো-রুদ্যমান বন্ধুগণের চক্ষের উপর পতন হওয়া ভাল কি শত্রুবলবিনাশকারী ভ্রূকুটী-বদ্ধ মুখ বীরপুরুষের সমক্ষে পতন হওয়া ভাল?

৫। হা পিতঃ! হা মাতঃ! ইত্যাদি বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মূত্র, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মাক্ত কলেবর হইয়া গৃহে মরা ভাল কি যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুগণের ভয়প্রদ হইয়া মরণ লাভ করা ভাল? (ইহাও বিচার করিয়া দেখ)

৬। মানুষে যাহার তপস্যা যুদ্ধজয় কিংবা যুদ্ধ মরণের উল্লেখ না করে, অথবা যাহার বিদ্যা, (বেদাধ্যয়ণ), দান ও মহা-ধনের যশঃ কীর্ত্তন না করে, তাহার জন্ম কৃমি ও কীটের তুল্য।

৭। যে পুরুষ সমরে পরাঙ্মুখ হয়, তা-হার শুভলোক গমন দূরে থাকুক, তাহার পত্নিগণও তাহার নিকট লজ্জায় মুখ দেখা-ইতে কুণ্ঠিত হইয়া পুরবাসিনী সখিগণে মুখপানে চাহিয়া থাকে।

৮। যাহারা শত্রুসৈন্য বিদারণ পূর্ব্ব অবস্থান করে, যাহারা আপনার দিগন্ত-ব্যাপী সুযশঃ শ্রবণ করে, তাহাদের কি সুখ তাহা আমি পশ্চাৎ বর্ণন করিব।

৯। সিংহ আপনা অপেক্ষা শতগু অধিক মাংসরাশিমূর্ত্তি হস্তীর উপর নি তিত হয় এবং তাহার মদ-গন্ধ রক্তও পা করে।

১০। বীরপুরুষেরা যে প্রভুর জ সাহসী কার্য্য করে, এবং প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞ করে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। যে মূর্খে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন পূর্ব্বক শত্রু কর্ত্তৃ বিজিত হইয়াও জীবিত থাকে, তাহাই আ শ্চর্য্য এবং তাহাই তাহাদের আশ্চর্য্য সাহস।

১১। যুদ্ধ না করিলে যদি লোকে মৃত্যুভয় নিবারিত হইত তাহা হইলে যু ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করায় ক্ষতি ছিল ন কিন্তু যখন যুদ্ধ না করিলেও মরণ হইবে তখন আর যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া দুষ উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি?

ইন্দ্র অম্বরীষ রাজাকে বলিতেছেন

"ভর্ত্তুরর্থন্তু যঃ শূরো বিক্রমেদ্বাহিনী মুখে।
ভয়ান্ন বিনিবর্ত্তেত তস্য লোকা যথা মম॥
১
"যশ্চ নাচেক্ষ্যতে কঞ্চিৎ সহায়ং বিজয়ে স্থিত
জীবগ্রাহং প্রগৃহ্নাতি তস্য লোকা যথা মম॥
২
"আহবে নিহতঃ শূলৈ র্ন শোচেত কদাচন
অশোচ্যাহিহতঃ শূরঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
৩
"নহি শৌর্য্যাৎ পরং কিঞ্চিৎত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
শূরঃ সর্ব্বং পালয়তি সর্ব্বং শূরে প্রতিষ্ঠিতম্॥"
চরাণা মচরা অন্নং অদষ্ট্রা দংষ্ট্রিণা মপি।
অপানয়ঃ পাণি মতা মন্নং শূরস্য কাতরাঃ॥"
৪
সমান পৃষ্ঠোদর পাণি পাদাঃ
পশ্চাৎ পূরং তীরয়োহনুব্রজন্তি।
অতো ভয়ার্ত্তাঃ প্রণিপত্য ভূয়ঃ
কৃতাঞ্জলী রুপতিষ্ঠন্তি শূরান্॥"
৫

১। যে বীর স্বামীর জন্য শত্রু সৈন্যে বিক্রম প্রকাশ করে ভয় প্রযুক্ত নিবৃত্ত হয় না, তাহার লোক আমার সমান অর্থাৎ সে ব্যক্তি ও ইন্দ্র লোকের প্রভু হয়।

২। যে বীর বিজয়ে অবস্থান করতঃ সহায় মুখ প্রতীক্ষা না করে এবং শত্রুর জীবন গ্রহণ করে, সে ব্যক্তিও মমলোক প্রাপ্ত হয়।

৩। যুদ্ধে শূলাহত হইয়াও যে ব্যক্তি শোক করে না, কাতরও হয় না, শোক

শূন্য হইয়া অর্থাৎ অকাতরে যে ব্যক্তি মৃত হয়, সে বীর নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়।

৪। চর-জীবেরা অচর-জীবের অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য হয়। অদন্ত জীবেরা দন্তর জীবের ভোগ্য হয়। হস্ত সৃর্জ্জিত জীব হস্তযুক্ত জীবের অন্ন হয় আর কাতর ব্যক্তি-রাই শূর পুরুষের অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য হইয়া থাকে।

৫। ভীরু ব্যক্তিরা পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত ও পদ থাকিতেও শূর পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে (ভয়ে তাহার অনুগত হয়)। ভয়ে কাতর হইয়া তাহারা বার বার প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া শূরের উপাসনায় নিযুক্ত থাকে। (কি আশ্চর্য্য। ইহাদেরও হস্ত পদাদি আছে, অথচ তাহারা হস্ত পদাদির কার্য্য বিষয়ে অক্ষম)।

এইরূপ অনেক উত্তেজক বাক্য আছে, তৎসমুদায় একত্রিত করিতে গেলে একখানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করিলাম।

শ্রীরামদাস সেন।

বিদ্যাশিক্ষা ও ভারতের সাধারণ ভাষা।

কার্য্যমাত্রেরই যেমন কারণ আছে তেমনি সকল কার্য্যেরি ফল আছে, একটি কার্য্যের যে কেবল একটি ফল জন্মে এরূপ সর্ব্বস্থানে দেখা যায় না। কার্য্য, বিশেষ

এক এক কার্য্যের বহুবিধ ফল জন্মে। বিদ্যা-শিক্ষাও সেইরূপ বহুবিধ ফলদায়ক একটি কার্য্য। কোন একটি ভাষা শিক্ষা করা যে বিদ্যা শিক্ষা করা তাহা নহে অথচ ভাষা শিক্ষাই এখন তাহার প্রথম সোপান-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি মুখে মুখে, কি পুস্তকে ভাষা দ্বারাই একজনের মনের ভাব মতামত, তাঁহার উপার্জ্জিত জ্ঞান সকল—তাহার সমকালীন এবং ভবিষ্য-জাত কোটি কোটি লোকের মধ্যে প্রচারিত হয়। লিখিত ভাষার সাহায্যেই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগের, আর্য্য ঋষিগণের উপার্জ্জিত দুর্ল্লভ ধনের অধিকারী হইতে পারিতেছি, এবং চীন আরব্য গ্রীশ ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি অতি দূর দূর দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের বিদ্যা চর্চ্চার ফল ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি এবং অন্য দেশের লোকেরাও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ে ভারতের প্রাচীন গৌরবের পরিচয় পাইতেছেন।

বাল্যকালে চানক্য শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত দেশ বিদেশের কত পণ্ডিতের উক্তিতে, বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিদ্যাশিক্ষার শুভ ফল সম্বন্ধে কত কথাই যে শুনিয়াছি তাহা সহজে গণনা করা যায় না। আজ কাল এই ভারত ভূমির ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে শত শত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, শতসহস্র ছাত্রগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে—দিন দিন আবার ঐ রূপ বিদ্যালয়ের এবং ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু ঐ সকল ছাত্রদিগের পিতামাতা রক্ষকগণ এই অধ্যয়নের প্রধানতঃ কি শুভ ফল দেখিতে প্রত্যাশা করেন? প্রধানতঃ কি উদ্দেশে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয় তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা কি দেখিতে পাই? সে অনুসন্ধানের জন্য আমাদের দূরে যাইতে হয় না। আমাদের আপন বাটীর ছেলেদের যখন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দিতে থাকি, তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার উন্নতি হইতে দেখিয়া আহ্লাদিত হই, তখন তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার কিরূপ ফল লাভের কথা আমাদের মনে প্রথমেই উদয় হয়? তাহা ভাবিয়া দেখিলেই অন্য ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য আমরা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারি।

প্রকৃত ধনশালী লোকের সংখ্যা দেশে অতি অল্প এবং তাঁহাদের কথা এখানে উল্লেখ করা বৃথা। ইহারা ছাড়া প্রায় সকলেই আপন আপন পুত্র পৌত্র ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি কৃতবিদ্য আত্মীয় যুবকদিগকে হাইকোর্টের জজ, সিভিলসার্ভেণ্ট, মাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের বড় বড় চাকরী হইতে সামান্য কেরাণী পদে নিযুক্ত হইতে দেখিতে ইচ্ছা ও আশা করেন। যিনি যেমন পদবীর লোক—সেই অনুসারে তাঁহার আশার তারতম্য হইয়া থাকে। দাসত্ব বৃত্তিতে রুচির অভাব হেতু আবার কেহ কেহ ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদের বাড়ীর ছেলেরা উকীল কৌন্সিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কোন না কোন বিদ্যাব্যবসায়ী হইবে, এবং উল্লিখিত শ্রেণীগত যে সকল লোক অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা জানেন বা শুনেন, তাঁহাদের আপন আপন ছেলেরাও সেইরূপ বড় উকীল বড় কৌন্সিল বড় ডাক্তার হইবে আশায় তাহাদের শিক্ষার তদনুযায়ী ব্যবস্থা করেন। এক প্রকারে দেখিলে এই উভয় দলের লোকের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না। এই উভয় স্থলেই বিদ্যার সাহায্যে সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা-বৃদ্ধি করা কিম্বা সাংসারিক অভাব মোচন করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে। সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করাই বিদ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য দেখিয়া কেহ কেহ মহা আক্ষেপ করিয়া থাকেন, দেশকে দোষী করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা এ জন্য দেশকে দোষী করিতে পারি না—যদি কাহারো ইহাতে দোষ থাকে ত সে সময়ের দোষ, দেশের নহে। বিদ্যা শিক্ষার যে অনেক উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে এই কথা বলিতে চাই বাঁচিবার উপায় আগে হইলে তখন লোকে সে সকল উদ্দেশ্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে সময় পায়। আমাদের দেশের সাধারণতঃ যেরূপ দারিদ্র্য-দশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আবার কি ইতর কি ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকদিগের ব্যবহার্য্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদায়ও (সৌখিন জিনিস কি বাবুগিরির জিনিস নয়) এখন

যেরূপ দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে ও দিন দিন পড়িতেছে তাহাতে সৎ পথে থাকিয়া উপযুক্ত মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া, অবশ্য পোষ্য পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ও বালক বালিকাদের বিশেষতঃ বালকদের অধ্যয়ন ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই সাধারণতঃ প্রায় সকল ভদ্র লোকেই যথেষ্ট মনে করেন। ইহাও অনেকের পক্ষে সাধ্যাতীত।

ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হইলে এরূপ অবস্থা হইত না—কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইতেছে না।

ভারত ভূমি সোনার ভূমি বলিয়া বিখ্যাত সেই সোনার ভারতে আজ না আছে সোনা না আছে চাঁদি কি তামা। সে সব না থাকুক কিন্তু ভারতের সোনার মাটিত আছে, যাতে সোনার গাছ ফলে তাত আছে। সেই মাটিতে উৎপন্ন যব, গম, ধান, বুট প্রভৃতি শষ্য দ্বারা পৃথিবীর বহুখণ্ডে বহু লোকের উদর পোষণ হইতেছে—তবে কেন আমাদের এত দুর্দ্দশা? এদেশ জাত শষ্য সকল ভিন্ন দেশে যাওয়াই কি আমাদের এই সব দুর্দ্দশার কারণ? না আমাদের দুর্দ্দশার কারণ তাহা হইতে পারে না। কোন দেশের উৎপন্ন সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সে দেশের লোকের কুলাইয়া বাকী যাহা থাকে তাহা, আর সে দেশজাত বিলাসসাধনোপযোগী দ্রব্যগুলি ভিন্ন দেশের লোকেরা যতই কিনিয়া লয়—ততই সে দেশের পক্ষে মঙ্গল। এইরূপে এক দেশ জাত দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে তাহাদের নিকট অন্য দেশের লোক গ্রহণ

করে সে দেশের ততই অধিক লাভ ব্যতীত লোকসান হয় না। তাহা হইলে এ দেশের এত পাট এত তূলা এত শষ্য প্রভৃতি যে অপর দেশে যাইতেছে অপর দেশের লোকেরা তাহার মূল্য স্বরূপ যে অর্থ দিতেছে তাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হওয়ার কথা, তবে কেন আমাদের ধন বৃদ্ধি হওয়ার বদলে তাহা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। সেরূপ হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে। দেশের ধন হ্রাসের কারণ কিছু উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে উপর উক্ত শষ্যাদি দ্বারা দেশের দৃশ্যতঃ লাভ সকলও দেশে আইসে কি না তাহা দেখা যাউক। ঐ সকল দ্রব্যের বিনিময়ে ভিন্ন দেশ হইতে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন করিবার ব্যয় বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই দেশের লাভ; সে লাভের এক অংশ, যাহারা ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে তাহারা পায় এবং অপর অংশ যাহারা উহা ভিন্ন দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে তাহারা পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শেষোক্ত ব্যক্তিগণ এ দেশের লোক না হওয়ায় তাঁহাদের লাভের ভাগ দেশের লাভ ভুক্ত হয় না এবং তাঁহারাই এখন মোট লাভের অধিক অংশ পাইয়া থাকেন স্তুতরাং দেশে দিন দিন বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে বলিয়া আজ কাল চারি দিকে যে এক সুমিষ্ট কথা শুনা যায় সে মিষ্ট কথা শুনা ব্যতীত তাহাতে আমাদের আর বড় লাভ নাই। কাকের পক্ষে যেমন পাকা বেল, দেশের এই বাণিজ্য উন্নতিও আমাদের পক্ষে সেই রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। * এইরূপে এক দেশের দ্রব্য অপর দেশে লইয়া যাওয়া যেমন বাণিজ্যের এক দিক, আবার অন্য দেশ হইতে দ্রব্য সকল সে দেশে আনিয়া বিক্রয় করা তেমনি বাণিজ্যের আর এক দিক্ আছে এবং ঐ উভয় প্রকার বাণিজ্যের তারতম্যে এক দেশের যথার্থ লাভ লোকসান্ দেখা যায়। কোন দেশের ব্যবহার্য্য দ্রব্য গুলি সুলভ পদ্ধতিতে যেদেশে যত উৎপন্ন হয় অপর দেশ হইতে তাহা যতই কম আনিতে হয়—ততই সেদেশের মঙ্গল, কারণ ঐ দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিবার সময় অনেক গুলি শ্রমজীবি ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হয়, আর ঐ দ্রব্যগুলি বিদেশ হইতে আনাইতে হইলে যে খরচ পড়ে—দেশে প্রস্তুত করিতে পারিলে তত খরচ পড়ে না; পড়িলেও দেশের লোকের মধ্যেই সে খরচ থাকিয়া যায়। মোট কথা, যে পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য আমরা অপর দেশের লোকদের দিতে পারি তাহার কম পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য যদি অপর দেশ হইতে আমাদের গ্রহণ করিতে হয় তবেই আমাদের দেশের লাভ হয় এবং গৃহীত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক দিতে হইলে দেশের ক্ষতি হয়—কিন্তু আমাদের দুর্দশা বশতঃ আমাদের এখন এমন অবস্থা হই-

* ইংলণ্ডের নাইন্‌টিন্‌থ্ সেন্‌চুরি পত্রিকাতে জে সাইমুর কি প্রণীত ভারত লুণ্ঠন নামক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে সহৃদয় লেখক বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের দুর্দশা অতি জ্বলন্ত রূপে দেখাইয়াছেন।

য়াছে যে অপর দেশ হইতেই আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। এখানে আমি সৌখিন দ্রব্য, যেমন ভাল কাগজ ভাল কলম, ভাল কাপড়, ঝাড় লণ্ঠন প্রভৃতি কাঁচের দ্রব্য সাবান ইত্যাদি জিনিসের কথাই উল্লেখ করিতেছি না, নিত্য প্রয়োজনীয় সামান্য দ্রব্যের নিমিত্তও এখন আমাদের অপর দেশের উপর নির্ভর না করিলে চলে না। বাঙ্গালার একজন মৃত কবি একটী গানের মধ্যে একবার আপেক্ষ করিয়া বলিয়া ছিলেন যে "বিলাতি দেশালাই নইলে দেশে প্রদীপ জ্বলে না" এ কথা যে কতদূর সত্য তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। ইহার অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা আমাদের আর কি হইতে পারে। কেন আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইল? শিল্প কার্য্যের চর্চ্চা কি আমাদের এদেশে ছিল না—না এ দেশে তাহার উন্নতি হয় নাই? এখনও কি দেশে তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না? যে ইয়োরোপীয়গণের শিল্প নৈপুণ্যের নিমিত্ত এত গৌরব বাড়িয়াছে, যাঁহারা এজন্য আত্ম শ্লাঘা করেন—তাঁহারা কি বারাণসীর বস্ত্রের ন্যায়, কাশ্মীরের শালের ন্যায়, কটকের এবং ঢাকার সোনা রূপার তারের জিনিষের ন্যায়, ঢাকার অদ্বিতীয় মস্‌লিন কাপড়ের ন্যায় কোন সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন? অল্প দিন হইল কলিকাতায় যে প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে সেই প্রদর্শনীতে ভারতের এই চারু শিল্প-নৈপুণ্যের চাক্ষস প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; দেশে যখন এখনও এত শিল্প-দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায় এত সুচতুর কারিকর রহিয়াছে সে কালে শিল্প কর্ম্মের অভাবে কেন দেশের এত দুর্দ্দশা? নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত কেন আমরা এত পরাধীন?

কালের গতিক্রমে মানুষের রীতি-নীতি, রুচি, পরণ, পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন সহকারে ব্যবহার্য্য নূতন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল জোগাইবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের যেরূপ পরিবর্ত্তন, বিচিত্রতা ও উন্নতি আবশ্যক তাহা আমাদের দেশে হয় নাই। এবং সে নিমিত্ত রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার বিশেষ সাহায্য আবশ্যক সে সব বিদ্যারও এখন আমাদের কোন চর্চ্চা নাই। শিল্পদ্রব্য সাধারণব্যবহারউপযোগী করিবার প্রধান উপায় তাহার মূল্য সুলভ করা—কিন্তু তাহা করিবার আমাদের উপায় কিম্বা চেষ্টা নাই। অল্প মূল্যে কোন দ্রব্য পাইলে অধিক মূল্য দিয়া সেরূপ জিনিষ লইতে আমাদের ইচ্ছা হয় না—সেই জন্য দেশী তাঁতির ব্যবসা প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে; যেরূপ সুতার যেরূপ একখানি বস্ত্র এদেশে প্রস্তুত হইলে তাহা তিন টাকার কম দামে পাওয়া যায় না—ঠিক সেই রকম একখানি বিলাতি কাপড় কিনিতে বোধ হয় দুই টাকার বেশি দিতে হইবে না। এখান হইতে অনেক কম খরচে বিলাতে বস্ত্র প্রস্তুত হয় বলিয়াই তাহা ওরূপ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের একজন লোকের দিন মজুরি যত পড়ে, বিলাতের

একজন লোকের দিন মজুরি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী, তবে কি প্রকারে এ দেশ অপেক্ষা অত কম খরচে সে দেশে কাপড় প্রস্তুত হয়? হস্তবল অপেক্ষা যন্ত্র বলে মানুষের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়, অন্য কথায় পরিশ্রম সুলভ হয়। হস্তের অনেক কার্য্যই এখন ইয়োরোপ এবং আমেরিকা দেশে যন্ত্রের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। ছুঁচ সুতার দ্বারা সেলাই করা যে যন্ত্রের দ্বারা হইতে পারে ইহা বোধ হয় পূর্ব্বে আমরা কেহ মনেও করিতে পারিতাম না আর এখন তাহা পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কালি কলম দিয়া কাগজে লেখার কাজ কলের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবার উপযোগী যন্ত্রও পুরাতন হইতে চলিল, আবার হরণ পূরণের কল নির্ম্মাণ দ্বারা গণিত বিদ্যা চর্চ্চার কত না সুগম হইয়াছে। ধূম কলের সাহায্যে আবার বহুবিধ যন্ত্রের ক্ষমতার মহা প্রভাব হইয়া পড়িয়াছে। ডাঙ্গায় গাড়ি, জলে নৌকা, ঘরে তাঁত, মাঠে লাঙ্গল এ সকলই এখন ধূম কলের দ্বারা চালিত হইতেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যখন নানা দিকে এত উন্নতি হইয়াছে এবং দিন দিন অধিকতর উন্নতি হইতেছে তখন আমাদের দেশে তাহার অভাব কেন? ইহার অন্য অনেক কারণ আছে সত্য তবে বিজ্ঞান চর্চ্চার অভাবই ইহার মূল ও প্রধান কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সকল প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা বিশেষ তাহার সোপান স্বরূপ ভাষা শিক্ষা পর্য্যন্ত যেদেশে লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল সে দেশে কি রূপে বিজ্ঞানের চর্চ্চা থাকিতে পারে! অথচ এই ভারত ভূমিই বিজ্ঞানের জন্ম ভূমি। গণিত রসায়ণ চিকিৎসা জ্যোতিষ, ভৌতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা সকল এই দেশ হইতেই ক্রমে আরব্য মিসর গ্রীশ হইয়া ইয়োরপে প্রবেশ করে—সেই ইয়োরপে আজ এ সকল বিজ্ঞানের কত উন্নতি আর উহাদের জন্ম ভূমিতে উহাদের কি দুর্দ্দশা! এ দেশে যদি ঐ সকল বিদ্যার সূত্রপাত হইয়াই থাকিত পরে চর্চ্চা কিম্বা উন্নতি না হইত তবে বুঝিতাম ভারত ভূমি উহার উন্নতির স্থান নহে, ও সকল বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া ভারত সন্তানের ক্ষমতাতীত। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থায় তাহা নহে এককালে যখন পৃথিবীর অন্য সকল খণ্ডের লোকেরাই প্রায় পশুবৎ অসভ্য ছিল সেই পুরাকালে ঐ সকল বিদ্যার এদেশে এত উন্নতি হইয়াছিল যে এখন পর্য্যন্তও ইয়োরোপে কোন কোন স্থলে তত দূর উন্নতি হয় নাই; আবার কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এ দেশের লোক যাহা বহুকাল পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন ইয়োরোপে তাহা অল্প কাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে; যেমন পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণ গতি। সেই সমস্ত বিদ্যার উন্নতির পরিবর্ত্তে অজ্ঞতার উন্নতির এখন আমাদের এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে কি কি বিদ্যার তখন চর্চ্চা ছিল, কোন বিদ্যার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা জানেন এরকম লোকের সংখ্যাও দেশে এখন অতি বিরল; সেই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকটেই আমাদের ঐ

সকল সম্বাদ জানিতে হয়, তাহা নহিলে বোধ হয় আমরা ও সকল জানিতেও পারিতাম না। ইহা হইতে মনুষ্যের দুরবস্থা—উন্নতির অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

এ দুরবস্থা মোচন করিতে ইচ্ছা করিলে ইহার মুখ্য গৌণ বৃহৎ ক্ষুদ্র সমস্ত কারণ আলোচনা করিয়া সেই সকল কারণ বিদূরিত করিবার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু সেই সমুদায় কারণ ও তাহা দূর করিবার সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিবার স্থান এ প্রবন্ধ নহে। তবে প্রকৃত বিদ্যা চর্চ্চার অভাবই যে ইহার মূল কারণ পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, কাজেই দেশকে যদি আবার উঠাইতে হয়, যদি ভারতবর্ষীয় জাতির নাম বাঁচাইতে হয়—তবে অন্ততঃ দেশের কতকগুলি লোককে গভীর বিদ্যা চর্চ্চায় মগ্ন হইতে হইবে; আর এক কথা এই, দেশের মধ্যে তাহা হইলে একটি সাধারণ ভাষা চলিত করিতে হইবে।

দেশে সাধারণ লোকের প্রকৃত বিদ্যা চর্চ্চা করিবার পক্ষে যেরূপ বিঘ্ন দেখা যায়—দেশের সর্ব্বসাধারণ একটি ভাষা হইবার পক্ষে সেরূপ বিঘ্ন দেখা যায় না।

গভীর বিদ্যা চর্চ্চায় সক্ষম নাই হৌন দেশের ভদ্রলোক মাত্রেই এখন বিদ্যার গৌরব বুঝিয়াছেন, এই দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য পড়িয়াছে কতক পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা এখন ইহাঁদের করিতেই হয়, এজন্য ভাষা শিক্ষা না করিলে চলে না। এরূপ স্থলে এমন একটি ভাষা যদি স্থির করা যায়—যাহা সমস্ত ভারতবাসীদের পক্ষেই সকল বিষয়ে উপযোগী তবে ভারতবর্ষের একটি সাধারণ ভাষা সহজেই হইতে পারে। আর বিদ্যা চর্চ্চা সম্বন্ধেও যতরূপই অসুবিধা থাক, সে অসুবিধা যে কেবল সাধারণ লোক সম্বন্ধে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু দেশের কতকগুলি লোকও যে অর্থ কিম্বা অন্য চিন্তা বিরহিত হইয়া বিদ্যা চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না দেশ যে একেবারে এরূপ ধন হীন তাহাও হইতে পারে না। যদি কতক গুলি লোকেও অন্ততঃ সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছাড়িয়া উচ্চতর উদ্দেশ্য সম্মুখে ধরিয়া বিদ্যা চর্চ্চায় জীবন দান করেন ত তাহা হইলেই দূর ভবিষ্যতে দেশের সুদিন ফিরিবে আশা করা যাইতে পারে।

অনেকেই বলেন যে অর্থ এবং ধন সম্পত্তির সহিত বিদ্যা শিক্ষার অতি দূর সম্পর্ক বাস্তবিক কি তাহা সত্য। প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে, মনুষ্য জাতির সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? কোন দেশে বিজ্ঞান কি সুকুমার বিদ্যাদির উন্নতি করিবার জন্য তাহার চর্চ্চায় সে দেশের কতকগুলি লোকের বিশেষরূপে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। যাহাদের অন্নের চিন্তা থাকে কিম্বা অন্য কোন রকম সাংসারিক অভাবথাকে তাহারা সে সব চিন্তা ছাড়িয়া কোন রূপ বিদ্যা চর্চ্চায় নিমগ্ন হইতে পারে না। সুতরাং কোন দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পাদির প্রকৃত চর্চ্চা হওয়ার পূর্ব্বে সে দেশের ধন সম্পত্তি কতক পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া আব-

শ্যক। দেশের কতকগুলি লোকের আপনার আপনার ভরণ পোষণের উপায় জন্য সময় ব্যয় করিতে কিম্বা চিন্তা করিতে না হইলেই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন শিল্প প্রভৃতি বিদ্যার চর্চ্চায় সময় নিয়োগ করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থাতেই তখন সেই দেশের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি সহকারে সভ্যতা বৃদ্ধির সোপান হয়। এখানে আমরা বিদ্যার সহিত ধন সম্পত্তির অতি নিকট সম্বন্ধ দেখিতে পাই এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে পরস্পার ভগিনী সম্পর্কের কারণ বুঝিতে পারি।

বিষয় চিন্তা কিম্বা সাংসারিক অভাব মোচনের নিমিত্ত যাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত তাহারা প্রকৃত বিদ্যা চর্চ্চা করিতে পারে না—বিজ্ঞানের গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারে না—এই জন্যই ধন সম্পত্তির সহিত বিদ্যার দূর সম্পর্ক, লক্ষ্মী সরস্বতী দুই জনের সহিত ভগিনী সম্পর্ক থাকিয়াও ইহাঁরা আবার এই জন্য উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই জন্যই পুরাকালে যে ব্রাহ্মণগণ নিষ্কাম ভাবে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাতে চিরজীবন কাটাইতেন তাঁহারাই সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন। বিদ্যা তাঁহারা দান করিতেন অর্থ মূল্য লইয়া বিক্রয় করিতেন না। অধ্যাপকদের বাটীতেই ছাত্রগণ আহারাদি করিতে পাইত। এক এক জন অধ্যাপকের নিকট অনেক ছাত্রগণ এইরূপে একত্র থাকিয়া সুশিক্ষিত এবং লালিত পালিত হইত ঐ সকল সৎব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজা প্রভৃতি ধনশালী লোকে বৃহৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান কালে এবং নিয়মিত রূপে সময়ে সময়ে সেই অধ্যাপকগণকে সাহায্য করিতেন এবং সেই প্রথা অনুসারেই এখন সঙ্গতিপন্ন লোকে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে অধ্যাপকগণকে আহ্বান ও তাহাদিগকে অর্থ দান করিয়া থাকেন। অর্থ সাহায্য ব্যতীত বিদ্যার উন্নতি হয় না; কিন্তু সর্ব্ব মত্যন্ত গর্হিতম এখানেও দেখা যায়। অর্থ হইতেই যেমন বিদ্যার উন্নতি তেমনি আবার অর্থের আতিশয্য হইতেই বিদ্যা নাশ ঘটে, অধিক অর্থ ভোগে লোকে অধিক বিলাসী বৃথা আমোদ প্রিয় হইয়া বিদ্যা চর্চ্চার নিমিত্ত যেরূপ আয়াস ও যত্ন স্বীকার করা অতি প্রয়োজন তাহাতে অক্ষম হইয়া পড়ে, এবং এইরূপে অতিরিক্ত ভোগী হইয়া অনেক স্থলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভাব সকল মন হইতে দূরে চলিয়া যাইতে থাকে।

লক্ষ্মীর অভাবেই এখন দেশে সরস্বতী নাই কিন্তু মূল দেখিতে গেলে—উল্লিখিত প্রকারে সরস্বতীকে ছাড়াতেই লক্ষ্মী দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। ভোগস্পৃহা হইতেই আধ্যাত্মিক দুর্গতি এবং দুর্নীতি উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে অলস, এবং স্বার্থপর করিয়া তুলিল। এক দেশের লোকদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইলে তাহার যে কি মন্দ ফল হয় প্রাচীন রোম ও আধুনিক ফরাসী-দেশ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। দুর্নীতি এবং আলস্যপরবশ ও স্বার্থপর হইয়াই আমরা ক্ষুদ্রাশয় এবং ক্রমে পরাধীন হইলাম-দেশে যবনরাজ্য স্থাপিত

হইল, ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ দৃঢ় হইল, বিদ্যা চর্চ্চার কথা দূরে থাক ক্রমে ভাষা শিক্ষা পর্য্যন্ত রহিত হইল; যে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় উন্নত ভাষা অদ্যাপি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কোন স্থানে সৃষ্টি হয় নাই ইয়োরোপে যার এখন এত আদর এত প্রশংসা সেই সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়া গেলাম। সংস্কৃতই ভারতবাসী আর্য্যগণের ভাষা, সমুদয় শাস্ত্রই এই ভাষাতে লিখিত। ভাষা পর্য্যন্ত যখন আমরা ভুলিয়া গেলাম তখন আর কি প্রকারে শাস্ত্র পড়িব? এবং না পড়িয়া কিরূপে তাহার মর্ম্ম জানিব? দেশের আসল ভাষা এইরূপে লুপ্ত-প্রায় হইলে, বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে হিসাব পত্র রাখা ইত্যাদির নিমিত্ত কোন না কোন একটা ভাষার প্রয়োজন হওয়াতে লোকেরা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, অশিক্ষিত লোকের, ইতর লোকের কথিত ভাষাকে লিখিত ভাষা করিয়া লইল, এই প্রকারে দেশ কাল এবং পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি হইয়া পড়িল—সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাই ঐসব ভাষার বর্ণমালা হইয়া পড়িল। অনেক সংস্কৃত কথাও তাহাতে প্রয়োগ হইল। কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত ঐ সব মিশ্র ভাষার সম্পর্ক প্রায় রহিত হইল। এই প্রকারেই প্রথমে বাঙ্গালা, হিন্দী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, কেনারী প্রভৃতি ভাষার জন্ম হইল। যবন অধিকারের পরে কতক লোকে কার্য্য গতিকে আরবী পারসীও শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভারতের বিভিন্ন খণ্ডের ভাষা বিভিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে অন্য অনেক অনর্থের কারণ উৎপত্তি হইতে লাগিল। এক সংস্কৃত ভাষা হইতে যেমন বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইল তেমনি আবার এক আর্য্য সন্তানগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, গুজরাটী, পঞ্জাবী মান্দ্রাজী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই বিভিন্নতা এতদূর বাড়িয়াছে যে কেবল উপর উপর দেখিলে মনে হয় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডবাসী আর্য্যগণ এখন যেন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কারণ দেশ ভেদে যেমন জাতি (nation) ভেদ হয় ভাষা ভেদেও অনেক পরিমাণে সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। সমগ্র ভারতবাসী আর্য্য সন্তানগণের সাধারণ ভাষা যেমন এক সংস্কৃত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে অপর কোন একটি ভাষা যদি পরে তাঁহাদের সাধারণ ভাষা হইত তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না। যত দিনে আবার একটি ভাষা সমুদয় ভারতের সাধারণ ভাষা না হইবে ততদিন সমুদয় ভারতবাসীগণ প্রকৃতরূপে একজাতি হইবে না; এক জাতি না হইলে যে আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘুচিবে না ইহা বোধ হয় বলা বাহুল্য।

ইংরাজী যদিও ভিন্ন দেশের ভাষা তথাপি এখন ভারতের সকল খণ্ডেই ঐ ভাষার চর্চ্চা হওয়াতে এক খণ্ডের লোকেরা অপর খণ্ডের লোকদের সহিত উহার সাহায্যে পরস্পরের মনের ভাব বিনিময় করিতে

পারেন, ইহাতে জাতীয় ভাবের বীজ আবার আমাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সমুদয় ভারতে এক সাধারণ ভাষা প্রচলিত হইলে যে কি শুভ ফল ফলিতে পারে ইহা হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু ইংরাজী ভাষাই কি আমাদের জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে? তাহা কখনও হইবে না, তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে, এবং ভারতে এখন যত প্রকার মিশ্রভাষা প্রচলিতআছে তাহার কোন একটিও দেশের সাধারণ ভাষা হইবার মত নাই কেবল সংস্কৃত ভাষাই সে স্থান পুনরায় অধিকার করিবার উপযোগী।

উপরি উক্ত অপভ্রংশ ভাষাগুলিরও এখন অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পূর্ব্বে ঐ সকল ভাষায় যে সকল ভাব প্রকাশ হইত না তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উহাতে অনেক নূতন কথার ব্যবহার হইতেছে, সংস্কৃত ব্যাকরণ সংক্ষেপ করিয়াই উহাদের ব্যাকরণ হইতেছে এবং সংস্কৃত শব্দ হইতেই নূতন নূতন কথা বাড়িতেছে। এইরূপে ক্রমে যদিও ঐ সকল ভাষা মূল সংস্কৃত ভাষারদিকে অগ্রসর হইতেছে তবুও ঐ সমস্ত ভাষা একত্র মিলিয়া কিম্বা উহার মধ্যে কোন একটির, পরে এক সাধারণ ভাষা হওয়া অসম্ভব। এখন ভারতে এত অধিক ভাষা যে তাহার এক ভাষায় লিখিত কোন পুস্তক কেবল এক স্থানের লোকদেরই ব্যবহারে আইসে অবশিষ্ট কোন স্থানের লোকদের তাহাতে কোন উপকার হয় না। সেই জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে এক সময়ে এক বিষয়ে এক ভাব প্রকাশ করিতেই অনেক কৃতবিদ্য লোককে এখন সময় কাটাইতে হয়। সর্ব্বত্র এক ভাষা প্রচলিত থাকিলে তাহার মধ্যে এক জন লোক সেই ভাষায় কোন বিষয় লিখিলে তাহাই সকল স্থানের সকল লোকদের ব্যবহারে লাগিত। অপর কয়েক জনের মধ্যে কেহ তাহার উন্নতির নিমিত্ত কেহ অপর আবশ্যকীয় কর্ম্মে সময় নিয়োগ করিয়া দেশের অধিক কাজ করিতে পারিতেন।

একটু চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে এখন পর্য্যন্ত কিয়ৎপরিমাণে সংস্কৃত ভাষাই ভারতের সর্ব্বসাধারণ ভাষা রহিয়াছে। হিন্দুস্থানী, গুজরাটী বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী আমরা যে যাহাই হইনা কেন, আমাদের সকলকারই ধর্ম্মশাস্ত্র এখনও একই রহিয়াছে এবং ভারতের যেখানেই যাই সে খানে এখনও যে দুই চারি জন যথার্থ পণ্ডিত দেখিতে পাই সংস্কৃতই তাহাদের সকলের ভাষা এবং যে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত পুস্তক সকল লিখিত সে দেবনাগরী অক্ষরও এখনও দেশের সর্ব্বভাগেই চলিত আছে; সংস্কৃতের চর্চ্চা কিছু বৃদ্ধি হইলেই ভারতের একটি জাতীয় ভাষা হইবে এবং আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের ভাষা, পুনরায় দেশের সাধারণ ভাষা হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইলে সাধারণের সম্মুখে দেশের বিদ্যাভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া যাইবে। তাহা হইলে নূতন জ্ঞান এবং নূতন বল পাইয়া আমাদের নির্জ্জীব ভাবও

জীবন্ত হইয়া উঠিবে এবং ভারতের উন্নতির সোপান দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইবে।

আমরা অল্প যাহা বলিলাম তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের যথার্থ উন্নতির নিমিত্ত ইহার সকল খণ্ডেই এক সাধারণ ভাষা প্রচলিত হওয়া কত প্রয়োজন এবং যেকালে এক সংস্কৃত ভাষাই সে উদ্দেশ্য সফল করিবার উপযোগী সে কালে সেই সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধি জন্য আমাদের সকলেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। এখানে কেহ যেন মনে না করেন যে ইংরাজি ভাষাকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষা স্থাপন করার কথাই এখানে বলা হইতেছে। না, তাহা হইলে দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না। দেশের উন্নতির জন্য ইংরাজি ভাষার চর্চ্চাও প্রয়োজন। বহু পুরাকালে আমাদের দেশে কোন বিদ্যার কত উন্নতি হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ কি প্রকার যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন তাহা দেখিয়া একজন সহজে বুঝিতে পারেন যে ইয়োরোপে যে উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা জ্ঞাত হওয়া আমাদের কত অধিক প্রয়োজন? সংস্কৃত মৃত ভাষা, ইংরাজি জীবন্ত ভাষা, সংস্কৃত ভাষায় যে সকল জ্ঞান বদ্ধ রহিয়াছে তাহা সংস্কৃত শিক্ষা দ্বারা আমরা লাভ করিতে পারি আর ইয়োরোপ অধুনা যে সকল জ্ঞান লাভ করিতেছে তাহার ভাগ লইতে গেলে ইয়োরপীয় কোন ভাষা আমাদের জানিতেই হইবে। এ অবস্থায় ইংরাজি শিখিলেই আমাদের সকল দিকে সুবিধা। কেন না ইংরাজি ভাষা আমাদের রাজ ভাষা, কেবল ইয়োরপীয় বিদ্যাচর্চ্চার ফল লাভ করা ছাড়া অন্য কারণেও ইংরাজি ভাষা না জানিলে আমাদের চলে না। তবে, কি ভাষা, কি বিজ্ঞান, কি অন্য প্রকার শিক্ষা, সকল শিক্ষারই প্রয়োজনের তারতম্য আছে, আমরা যদি সেই তারতম্য বুঝিয়া চলি, মুখ্যকে গৌণ এবং গৌণকে মুখ্য বলিয়া ভুল না করি এবং সেই অনুসারে আপন আপন পুত্র কন্যাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করি তাহা হইলে আমরা যথার্থ এবং স্থায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব, বিদ্যা শিক্ষার মহত্তর উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারিব। বিদ্যা শিক্ষার যে ফল লাভে আপনার, দেশের এবং সমগ্র মনুষ্য জাতির উপকার করা যায়—তাহাই বিদ্যা শিক্ষার মহত্তর উদ্দেশ্য।

পশু হইতে মনুষ্য যে শ্রেষ্ঠ জীব হইা আমরা প্রতি কথায় বলিয়া থাকি, কিন্তু পশু অপেক্ষা আমরা কিসে শ্রেষ্ঠ? শারীরিক শক্তি, হস্তপদ চালনার ক্ষমতায় কি মানুষ পশু পক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ? না। আমরা আমাদের যে বুদ্ধির এত আত্ম শ্লাঘা করি সে বুদ্ধিও কি পশুদের নাই? হস্তী, অশ্ব, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি পশুগণের বুদ্ধির পরিচয়ে সময় সময় আমরাই অবাক্ হইয়া যাই। তবে তাহাদের অপেক্ষা আমাদের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? সংক্ষেপে বলিতে গেলে মনুষ্য-বুদ্ধি দুই শ্রেণীতে

বিভক্ত। বাবুই পক্ষীর বাসা নির্ম্মাণের শিল্পনৈপুণ্যে, শৃগালের চতুরতায় যে প্রকারের বুদ্ধি প্রকাশ পায় তাহাও বুদ্ধি. কিন্তু যে বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে পারে অসত্য হইতে সত্য বাছিতে পারে জীবনের প্রকৃত মহান উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া এই পৃথিবীর স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে পারে—সেই বুদ্ধিতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়। এ যেরূপ শিক্ষায় এইরূপ বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত করে তাহাই যথার্থ শিক্ষা।

কারে—ডাক জলধর ?

১

মথিয়া অনন্ত শূন্য মর্ম্মভেদী স্বরে,-কারে-
ডাক জলধর ?
সাধনার ধন যাহা, মিলে কি কাঁদিলে তাহা
যুগ যুগান্তর !
প্রাণের আঁধারে জলে, প্রাণের আঁধারে নেভে
প্রাণে যার স্থান,
প্রাণের বাহিরে তাঁরে কাঁদিয়া ডাকিলে, তবু
মিলে না সন্ধান।
জুড়াতে প্রাণের তৃষ্ণা, বিহঙ্গ অনন্ত পথে
উধাও কাঁদিয়া,
প্রাণের সৌরভ খুঁজি, কুরঙ্গ বিশাল বন
ভ্রমিছে ছুটিয়া।
আশা—জীবনের ভ্রান্তি, কল্পনার প্রস্রবিনী
যন্ত্রণার মূল,
বিকৃত প্রবৃত্তি আশা—জীবের পার্থিব মায়া,
কলুষ বিপুল।
সেই আশা হৃদে ধরি, হৃদয়ের ধনে তুমি
ডাক জলধর।
আশা না ভুলিলে কভু মিলে কি আশার ধ
অবোধ অম্বর !

২

সাধিতে না জানে যেই, রোদন সম্বল তা
অকৃতি সে জন।
প্রাণের তৃষিত ধন, কাঁদিলে না মিলে রে-
সম্বর রোদন।
হের এই হৃদিতল কি দশা হইয়াছি
কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
মথি শূন্য ধরাতল, কেঁদেছি আকুল প্রাণে
তাঁহারে ডাকিয়া।
শিহরিত পঞ্চ ভূত ব্রহ্মাণ্ড উঠিত কাঁ
আমার রোদনে।
মেদিনী কাতরা হ'য়ে হৃদয়ে জড়া'য়ে মো
ধরিত যতনে।
ওই চন্দ্র সূর্য্য তারা, হৃদয়ের অন্ধকারে
জ্বলিতে চাহিত।
ওই বিহঙ্গম কুল শূন্য করি কণ্ঠ, প্রাণে-
সঙ্গীত ঢালিত।

ওই বন উপবন ঐশ্বর্য্য তুলিয়া তার
দিত উপহার।
গিরি নদী সিন্ধু ওই সম্মুখে ধরিত খুলি
হৃদয় ভাণ্ডার।

৩

যা কিছু বৈভব ভবে, সেই শূন্য হৃদি তলে
উঠিত উথলি,
আমার প্রাণের রত্ন ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া নাহি
মিলিত কেবলি,
জগৎ আকুল ক'রে উঠেছিল যে রোদন
সেই সে রোদন—
হৃদয়ের দ্বারে তাঁর একটী আঘাত নাহি
করিত কখন।
তোমার হৃদয়ময়ী ওই চপলার মত
থাকিয়া থাকিয়া।
প্রাণের আঁধারে মম, জ্বলিয়া, সে অন্ধকারে
যাইত নিভিয়া।
বিপুল ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ অন্ধের হৃদয়-রাজ্য
যেমতি আঁধার
তেমতি এ পূর্ণপ্রাণ, আঁধারে রহিত ডুবি
বিহনে তাঁহার।
তখন বুঝিনু স্থির, পার্থিব-বৈভব-পূর্ণ
হৃদয় আমার,—
আশা তৃষ্ণা অভিমান, রূপান্তরে স্বার্থ যথা,
নহে স্থান তাঁর।

৪

বসিলাম যোগাসনে সৃজিতে আশ্রম নব
হৃদয়ে আমার।
সুখ—দুখ—অভিলাষ, সংযত করিয়া, চিত্ত
করিনু সংস্কার।
ভূত ভবিষ্যৎ ভুলি, সেবিলাম বর্ত্তমানে
আনন্দের ভরে।
প্রাণের অতল তলে ডুবিলাম একা আমি
সাধনার তরে।
পূর্ণ করি সেই পুরী ডাকিনু কাতর স্বরে
দেবীরে আমার
অনন্ত সে প্রাণ-পুরী উজলিয়া বিকাশিল
প্রতিভা তাঁহার।
স্বার্থের বিপুল বিশ্ব গ্রাসিতে সহসা প্রাণ
হইল অস্থির
আকুলিয়া আলোড়িয়া,
উৎক্ষেপিয়া প্রোৎক্ষেপিয়া
চূর্ণ করি তীর—
দুরাশার মহাসিন্ধু আঁধার সে হৃদিতলে
গেল শুকাইয়া।
শুষ্ক বেলা ভূমে তার পিপাসার মহানদী
গেল মিলাইয়া।

৫

মৃৎময় বারিময় কাষ্ঠময় শিলাময়
বসুধা আকৃতি,
সূর্য্যময় চন্দ্রময় গ্রহময় শূন্যময়
অনন্ত প্রকৃতি—
শূন্য করি অন্ধকার খসিয়া হইল চূর্ণ
নিভৃত অন্তরে
সে মহা শ্মশান স্থলে, সৃজিনু মন্দির আমি
আত্মার প্রাচীরে।
সংযমে জুড়িয়া প্রাণ, তৃপ্তির অতল জল,
করিয়া বিদার—
অক্ষুব্ধ পবিত্র বারি, মন্দিরের পদমূলে
করিনু প্রচার।

"শান্তি" নামে সেই নদী, প্রবাহিত আজ তথা
কর দরশন।
হের তার দুই তীরে "আত্মদান" নামে তরু
করেছি রোপন।
দেবী প্রতিভার আভা, করি ঘণীভূত, তায়—
গঠিনু আকৃতি।
প্রবেশি মন্দিরে হের প্রতিষ্ঠা করেছি মম
দেবীর মূরতি।

৬

এ নহে সে দেবীমম, সারদ উৎসবে যাঁরে
বাঙ্গালীর ঘরে
মাটির প্রতিমা গঠি রাঙ অলঙ্কার দিয়ে
উপাসনা করে।
বনজাত তৃণ তুলি সুলভ গাঙ্গের ঢালি
অর্চ্চনা যাঁহার
ধনং দেহি মানং দেহি, দেহি দেহি একি মন্ত্রে,
আরাধনা যাঁর।
এ নহে সে দেবীমম পরমার্থ প্রদায়িনী
যাঁর নিরাকার,
কাননে ভূধরে বসি ধ্যান মগ্ন ঋষিকুল
পূজে অনিবার।
জীবন্ত এ দেবী মম বসন্তের স্বরূপিনী
সদা প্রফুল্লিতা
প্রেম-পদ্ম বিরাজিনী, পূর্ণ প্রীতি বিধায়িনী
একি' ভক্তে প্রীতা।
পরকাল হ'তে দূরে বিরাজিতা এ সংসারে
তবু সাধনায়
প্রাণের মন্দিরে মম সদত প্রসন্নময়ী
কল্পতরু প্রায়।

৭

দেখিয়াছ কিবা ধ্যান, শুনিয়াছ কিবা স্তুতি
জীবের সংসারে
শুন আজ কোন মন্ত্রে পূজি প্রাণেশ্বরী
কি রূপ আচারে।

স্তোত্র।

"দেবি!
আবৃত শরীরে তুমি, চক্ষুর কনিকা
বিরাজ আমার
স্পর্শ শক্তি রূপে তুমি, এই শরীরের
সদত প্রচার।
শব্দ শক্তি রূপে তুমি, শ্রবণের মূলে
কর অবস্থান।
জ্ঞান রূপে চিত্তে মম, ঢালিয়া অমৃত
তুমি বিদ্যমান।
দর্পন বিহনে যথা স্বীয় বদনের
নহে অনুমান।
তোমা বিনা সেইরূপ প্রাণের ব্রহ্মাণ্ড
নহে বিদ্যমান।
তুমি মম—আমি তব, যেই তুমি সেই আমি
নহি ভিন্নাকার।
তব অপার্থিব রূপে, আমারো তদ্গত প্রাণে
করি নমস্কার।

৮

প্রাণের হারাণ ধন, চাহ যদি জলধর
সত্বর রোদন
আপন হৃদয় তলে, মগ্ন হ'য়ে অবিষাদে
কর অন্বেষণ।
আপনার সাধনায় নহে উপার্জ্জিত যাহা
সে ধন কি মিলে?
সে নহেরে ধন সেই, প্রাণ কাঁদে যার তরে
অন্যে যদি দিলে।
সাধিতে যে জন জানে কঠোর সাধনে তাঁরে
সকলি আপন,

স জন কি রহে ভুলি, কোথায় বিরাজে তাঁর
জীবনের ধন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজি, যে ধন পা'বার নয়,—
প্রাণের মন্দিরে—
হৃদয়ের অন্ধকারে দেবীরূপে সেই ধন
সদত বিহরে।

"তুমি-মম" ভাবি যেই খুঁজে সেই অমরীরে
ভকত সে নয়।
"আমি তব" ভাবি যেই করে তাঁর উদ্বোধন
তাহারে সদয়।

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাউ সাহেবের বখর।

তথা হইতে মারয়াড় প্রান্তে যাইবার
কালে উদেপুর রাজ্যস্থ শিবসিং সিসওদে
আসিয়া নিবেদন করিল, "শিবপুরের রাজা
আমার চাকর হইয়াও নানা প্রকার গোল
যোগ করিতেছে। ছোট বড় কিল্লা বল
পূর্ব্বক হস্তগত করিয়া আমার মতের
বিরুদ্ধে নিজ প্রান্তে ধূমধাম করিতেছে।
এই নিমিত্ত বর্ষার চতুর্মাস শিবপুরের
নিকটে বাস করুন বিংশতি লক্ষ টাকা
দিব। শিবপুর ও দুর্গ আমার অধীন করিয়া
দিন্।" জনকোজী বিবেচনা করিলেন
দত্তাজী শিন্দে গ্রামে গিয়াছেন, তিনি
আসা পর্য্যন্ত চতুর্মাস চুপ চাপ করিয়া যে
কোন স্থানে কাটাইতে হইত তাহা অ-
পেক্ষা এ উত্তম। একপথ দুই কাজ।"
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিতে স্বীকৃত
হইলেন। শিবপুর বেষ্টন করিয়া রহিলেন।
রাণোজী ভোইটে উত্তম কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি
ছিলেন। তিনি টেকাল গড়ে মোর্চে লাগা-
ইয়া ছিলেন। হঠাৎ মোর্চে হইতে গোলা
লাগিয়া তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। জন-
কোজী এই সংবাদ পাইয়া বড়ই দুঃখিত
হইলেন। সেই খানেই দিপবালি হইল।
শিবপুরের রাজাকে হস্তগত করিয়া উদে-
পুরের রাণোজীর সহিত ঐক্য করিয়া
দিলেন। রানোজীর আজ্ঞায় সেবাবৃত্তিতে
থাকিবে এইরূপ অঙ্গীকারানুসারে কর
গ্রহণ করিলেন।

রঘুনাথ দাদা লাহোরে কার্য্য সিদ্ধি
করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন,
পথে জনকোজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিলেন। জনকোজী তাহা জানিতে
পারিয়াই সসৈন্যে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।
দাদা সাহেবও স্বীয় শিবির হইতে দুইক্রোশ
অগ্রসর হইয়া আসিলেন। উভয়ে সাক্ষাৎ
হইল; দাদা সাহেব জনকাজীর শিবিরে
আসিয়া তাঁহাকে একান্তে এই মন্ত্রণা দিলেন
"তুমি এ বৎসরের কার্য্য নষ্ট করিলেও ক্ষতি

নাই। অনুষ্ঠানার্থে যদি ক্রোর টাকা ব্যয় হয় তাহাও দিব। কিন্তু নজীবখান রোহিলাকে শাস্তি দিবে, তাহার প্রাণ থাকিতে তাহাকে ছাড়িবে না এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও। আমিই তাহাকে শাস্তি দিতাম কিন্তু মলহার রাওয়ের অনুরোধে পারিলাম না। তিনি তাহাকে আপনার ধর্ম্মপুত্র বলিয়া সেই অনুরোধে অন্তর্ব্বেদ-প্রান্ত ও কুরুক্ষেত্র হইতে কুঁজ-পুরা পর্য্যন্ত চল্লিশ লক্ষ টাকার বিষয় তাহার অধীন করিয়া দিলেন। মলহাররাওয়ের পুত্র অনেক। বিজয় নগরের মাধবসিং ও মারয়াড়ের বিজেসিং এই প্রকার অনেক আছে। আবার নজীবখান রোহিলা এক পুত্র হইল। তিনি যতগুলিকে পুত্র বলিয়াছেন ততগুলি ফলও ভুগিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অহঙ্কার যায় না। তাঁহার যতগুলি ধর্ম্মপুত্র সবগুলি কুলাঙ্গার। আমি নজীবখানের পাগলাকুকুরের দশা করিতাম কিন্তু 'ঘৃতের কলসে ইদুঁর বসে' সেই প্রকার ঘটিয়াছে। এক্ষণে আঁচল পাতিয়া তোমার নিকটে এই ভিক্ষামাত্র চাহিতেছি।" ইহা বলিবামাত্র জনকোজী শিন্দে বন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেন, দাদাসাহেব, আমি আপনার ভৃত্য, যেরূপ আজ্ঞা করিবেন তাহাই হইবে। নজীবখান কোন্ পদার্থ? তাহার শাস্তির ভার আমার রহিল। কিন্তু আপনি লাহোর মুলতান পঞ্জাব অটক পর্য্যন্ত জয় করিলেন এখন আমি কোনদিকে যাত্রা করিব?" দাদা-সাহেব উত্তরদিলেন, "তুমি নজীবখানের শিরচ্ছেদ করিলে তোমা দ্বারা আমার সকলি হইল।" এই প্রকারে তিনবার বলিলেন। পরে বহুমান, হাতি, ঘোড়া, রত্নাদি দিয়া রাজশ্রী রঘুনাথরাও দেশে আগমন করিলেন।

দশ পনের দিন পরে মলহাররাও আসিলেন। তাঁহাতে শিন্দেতে বার ক্রোশ অন্তর থাকিতে তিনি গঙ্গাধর তাত্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "জন্মাবধি শিন্দেতে আমাতে সঙ্গী ছিলাম। ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত আমাদের ভয় করিত। আর যে কোন কর্ম্ম অসাধ্য তাহা সাধ্য হইত। আমার একটি পুত্র, সেও পিশাচবৎ এবং আমার বার্দ্ধক্য। যে কোন প্রকারে হয় জনকোজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মনের মালিন্য দূর করিয়া তাহার হস্তে পুরকে সমর্পণ করিতে হইবে।" এই বলিয়া গঙ্গোবা তাত্যাকে জনকোজী শিন্দের নিকট পাঠাইলেন। গঙ্গোবা তাত্যা সাক্ষাৎ করিয়া মমতার সহিত অতি নম্র ভাবে নিবেদন করিল, 'সুভেদারের বৃদ্ধাবস্থা এবং তুমি সুবোধ লোক। সুভেদার দেখা করিতে আসিতেছেন। তুমি তাচ্ছিল্য করিবে না।" জনকোজী বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "তাঁহাতে আমাতে স্বর্গে সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে তোমাদের যাহা উচিত বোধ হয় কর?" ইহা শুনিয়া গঙ্গোবা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। তখন জনকোজী এক কথায় তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, 'দত্তাজী শিন্দে আমার গুরু লোক, তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ প্রকার দেখা শুনা করা উচিত হয় না।" এই বলিয়া গঙ্গাধরকে বিদায় করিলেন।

ক্রমশঃ।

চারুতার জয়!

অশ্বতেজে ভরা,
মৃদু হস্তে ধরা;
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার!"

স্বপ্নপ্রয়াণ।

আমাদের দেশের একজন গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক কেমন সরল ও মধুর কবিতায় এই মহান সত্যটি প্রচার করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কুটিল রাজনীতি অনুমোদিত কঠোর পশুবলের পক্ষপাতী তাঁহাদের নিকট সবিনয় প্রার্থনা এই যে তাঁহারা একবার ক্ষণকালের জন্য উল্লিখিত সুন্দর কবিতাংশের গাম্ভীর্য্য ও মধুরতা অনুভব করিয়া দেখুন। শারীরিক চারুতা লাভ করিলে মানব যথার্থ সুন্দর হয় না হৃদয়ের চারুতাতেই মানব যথার্থ সুন্দর। যাঁহারা বিশুদ্ধ হৃদয়-জাত বিশ্ববিজয়ী নৈতিক বলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পঙ্কিল-হৃদয়-উৎপন্ন বিকৃত পশুবলের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শিষ্য হইয়াছেন তাঁহারা যতই দাম্ভিক ও গর্ব্বিত হউক না কেন, তাঁহাদিগকে অবনত মস্তকে এই মহা সত্যের বিজয় অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরের জগতে যিনি উদার হৃদয়ের অনন্ত প্রীতি ও অনন্ত প্রেম বিতরণ করিয়া কোন একটি মহান্ সাধনায় সিদ্ধ হইতে বাসনা করেন এবং জগতের অমৃত নর নারীকে তাহার অমৃতাস্বাদ দানে কৃতার্থ করিতে সঙ্কল্প করেন তিনি ধন্য—তাঁহার জীবন অনন্ত পুণ্যের সুমধুর উৎসব-ক্ষেত্র! তিনিই প্রকৃত বীর—তাঁহার বীরত্ব অতুলনীয় এবং অনন্তকাল স্থায়ী—আমরা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

পশুবলের উপাসকগণ অল্প কালের জন্য বিজয়ী হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পরিণাম ঘোর পরাজয়! আলোকের পর অন্ধকার যেমন অখণ্ডনীয়, অত্যাচারীর উত্থান ও জয়ের পর পতন ও পরাজয় তেমনই নিশ্চিত। ভারতের ভূত পূর্ব্ব শাসন কর্ত্তা পশুবলের উপাসক, এবং বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা নৈতিকবলের মন্ত্র-শিষ্য। একজন কলঙ্কিত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ ও অস্ত্র বিষয়ক আইন প্রভৃতি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া ২০ কোটি ভারতবাসীর দারুণ অশ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন, অপর জন স্বায়ত্ব-শাসন প্রণালী ও শিক্ষা-বিভাগ সংস্কার প্রভৃতি মঙ্গলকর বিষয়ের অবতারণা করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণ গত ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

পশুবলের মন্ত্র-শিষ্য প্রবল পরাক্রান্ত ফরাশিস্ বীর নেপোলিয়ন্ শাণিত অসি, সুতীক্ষ্ণ বেঅনেট্ ও বিশ্বগ্রাসী কামান বলে কিছু দিনের জন্য বীর দুর্দ্দমনীয় রাজ্য-জয়-

বাসনা চরিতার্থ করিয়াছিলেন—কিছু দিনের জন্য তাঁহার রুদ্রতেজে সমগ্র ইয়ুরোপ ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল—কিন্তু কিছু দিন পরেই তাঁহার যে পরিণাম উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিরবচ্ছিন্ন বিষাদময়! অমর ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে জগতে তাঁহার শোচনীয় পতন ও পরাভব ঘোষণা করিতেছে। তিনি শত্রু হস্তে বিজিত ও বন্দী হইয়া দেশ হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন! একদিন তিনি তাঁহার অদৃষ্টের নিদারুণ পরিবর্ত্তন চিন্তা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ছিলেন, "অহো! আমি পরাক্রম শালী রাজা হইয়াও জগতের কিছুই করিতে পারিলাম না; কিন্তু ভিখারী যীশু ধর্ম্মবলে জগতের মহাব্রত সাধনে ধন্য হইয়াছেন।" তাঁহার এই আক্ষেপে তাঁহার বিদ্বেষী শত্রুরাও করুণার অশ্রুপাত করিয়াছিলেন!

এই মৃত্যুর জগতে ধর্ম্মবীর যীশু কি এক অদ্ভুত বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। কত কাল গত হইল তিনি তৎসমসাময়িক অকৃতজ্ঞ মানবমণ্ডলীর উদ্ধারের জন্য নিয়ত কঠোর যন্ত্রণা ভোগ এবং পরিশেষে স্বীয় মহা মূল্য জীবন হাসিতে হাসিতে বলিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের কি বিচিত্র চারুতা, এবং চরিত্রের কি অপরূপ মধুরতা—আজিও তিনি শিক্ষিত জগতের কোটি কোটি নর নারীর হৃদয়-জাত ভক্তি কুসুমাঞ্জলি লাভে জীবিত রহিয়াছেন!

আমাদের দেশে শুভক্ষণে রাম জন্মিয়াছিলেন! কোন কোন বৈদেশিক সমালোচক বলেন, রামচন্দ্র কবি কল্পনার এক অতি অদ্ভুত সৃষ্টি—তিনি অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র নহেন। একথা আমরা সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বাস করি। হৃদয়ের মধুরতা প্রভাবে আমাদের রামচন্দ্র ভীষণ শত্রুরও আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ এবং সমস্ত ভারতবাসীর অকৃত্রিম ভক্তি লাভ করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কঠোর সাধনা ভারতের গৌরবের পরিচায়ক। ধন্য সেই দেশ যে দেশে তাঁহার জন্ম, এবং ধন্য সেই মহা কবি যিনি তাঁহার পূর্ণবিকশিত চরিত্রের গুণ গান করিয়াছেন!

আর রাজ পুত্র সিদ্ধার্থ ভিকারী হইয়া যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন সে কীর্ত্তি কোন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন? সিদ্ধার্থ দিবানিশি সুখের নিকুঞ্জ মধ্যে কাল কাটাইতেন, দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না—তিনি জানিতেন সমস্ত জগতই সুখময় সমস্ত জগতই উল্লাসময়। সহসা চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন জগতে কাহারো সুখ নাই শোক-তাপ-দুঃখ-জ্বালায় জগৎ দিবানিশি হাহাকার করিতেছে। সম-দুঃখে সিদ্ধার্থের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, এক মাত্র পরোপকারকে জীবনের ব্রত রূপে ধরিয়া অতুল বিভব,রাজ সিংহাসন, প্রাণের অধিক স্ত্রী পুত্র সকলকে ত্যাগ করিয়া জগতের দুঃখ নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করিতে বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইলেন। এই যে হৃদয়ের বীরত্ব ইহার সহিত আর কোন বীরত্বের তুলনা?

অল্পদিন হইল আমাদের চৈতন্যও হৃদয়ের মধুরতার প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া এক মহা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন! তিনিও পবিত্র পিতার নাম লইয়া প্রাণ ভরিয়া গাইয়াছিলেন,

"তোমারই জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারই কার্য্য যা সাধিব!"

কে বলে তিনি সাধনায় সিদ্ধ হন নাই? তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশ অশিক্ষিত হউক, তাঁহার উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম না হউক, এবং অন্য বহুবিধ দোষে দোষী হউক, কিন্তু বঙ্গ-সন্তান অকৃতজ্ঞ নহে, আজিও বঙ্গের সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষ দিনান্তে একবার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে পাইলে অপার সুখ অনুভব করিয়া থাকে। খ্রীষ্ট যেমন তদীয় শিষ্য মণ্ডলীকে মধুর ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন, "যদি কেহ তোমার দক্ষিণ গণ্ডে করাঘাত করে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে তোমার বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিবে," আমাদের চৈতন্যও তেমনই একদিন নিজে আহত হইয়া তদীয় শিষ্য মণ্ডলীর সম্মুখে একটি জলন্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। দস্যু মাধাই তাঁহার সুকোমল অঙ্গে গুরুতর আঘাত করিয়াছে—দর দর ধারে শোণিত স্রাব হইতেছে—তিনি তথাপি দৃক্‌পাত শূন্য—তিনি প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গাইলেন,

"মাধাইরে!
মেরেছিস তুই কলসীর কাণা
তাই বলে কি প্রেম দিব না!"

হৃদয়ের কি অদ্ভুত শৌর্য্য! চরিত্রের কি অপার মাধুর্য্য!! প্রেমের কি বিশ্ববিজয়ী জলন্ত ভাব!!! যিনি প্রেমের উচ্ছ্বাসে শত্রুকেও মিত্রজ্ঞানে স্নেহালিঙ্গন দান করিতে পারেন, তিনি যথার্থই অমর—এই মর জগতে অমর দেবতা!

আর আমাদের সে দিনকার মহাত্মা রামমোহন রায়! কলঙ্কিত বঙ্গদেশ শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার জন্মে পবিত্র হইয়াছে। বঙ্গের অযুত নরনারীর দুর্গতি দর্শনে তিনি ব্যথিত হৃদয়ে যে মহা জ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশ দীর্ঘকাল ব্যাপী নিবিড় কুসংস্কারে বিজড়িত হইয়া তাহা গ্রাহ্য করিল না। অধিকতর দুর্ভাগ্যের বিষয় যাঁহারা তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন তাঁহারাও অতি অল্প দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। মহাত্মা রামমোহন স্বদেশের পঙ্কোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ হৃদয়ের চারুতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অনক্ষর ভিন্ন অপরের অবিদিত নাই।

খ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, রামচন্দ্র, চৈতন্য ও রামমোহন ইহাঁরা সকলেই এক একটি কঠোর সাধনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং স্ব স্ব সাধনানুরূপ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মহা সাধনার মহা-মন্ত্র সুবিমল উদার হৃদয়ের বিশ্বজনীন ভাল বাসা এবং পূর্ণ বিকশিত চরিত্রের হৃদয় গ্রাহী প্রীতি। মহাব্রতে ব্রতী হওয়া ক্ষতি-লাভ-গণনায় নিমগ্ন ক্ষুদ্র হৃদয়ের আয়ত্তাধীন নহে। জগতের হিত সাধন অথবা

স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেমের বাসনায় উন্মত্ত হইয়া একাল পর্য্যন্ত অনেকেই এক একটি গুরু ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। যাঁহারা সূক্ষ্ম ন্যায় পথের পথিক হইয়া শারদ জ্যোৎস্নাময়ী সুস্নিগ্ধ সুবিমল রজনীর ন্যায় অনন্ত প্রেম ও প্রীতি বিকশিত হৃদয়ের মধুরতায় জগতের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারাই কেবল স্ব স্ব অবলম্বিত দৃঢ়ব্রত পালনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাঁহারা চরিত্রের শোভা দেখাইতে পারেন নাই, লক্ষ্য পথে তাঁহাদের পদস্খলন হইয়াছে, সুতরাং আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই শেষোক্ত শ্রেণীর অনেকের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অনাবশ্যক; কারণ তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। আজি আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেখাইতে প্রয়াস পাইব, আমাদের অধঃপতিত দেশের কলঙ্কমোচন করিতে হইলে আমাদের হৃদয় ও চরিত্রের শোভা কেমন হওয়া উচিত।

অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, আজি কালি আমাদের দেশের শত শত সুশিক্ষিত নরনারীর অন্তরে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশের দুর্গতির বিষয় চিন্তা করিয়া একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে উক্ত দুর্গতি দমন করিতে শত শত উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধু উদ্যম দেখিয়া আশা করা যাইতে পারে যে তাঁহাদের সমবেত যত্নে একদিন শুভ ফল জন্মিবে। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, যে প্রণালীতে এক্ষণে যত্ন ও উদ্যম বিহিত হইতেছে তাহা হইতে শীঘ্র কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। একটি অধঃপতিত দেশের পঙ্কোদ্ধার কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নয়। কঠোরতম সাধনা ভিন্ন একটি দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির ললাট হইতে কলঙ্কের কালিমা প্রক্ষালিত হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে আমরা সভ্যতার আদি জননী ইটালির পতন ও পুনরুত্থান পাঠ করিয়াছি। পুণ্যাত্মা রায়েন্‌জী, গ্যারিবল্‌ডী ও ম্যাজিনি যে কঠোরতম সাধনায় স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং যে মহামন্ত্রে স্বজাতিকে দীক্ষিত করিয়া স্বদেশের মৃতকল্প দেহে নব জীবন দান করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। ইহারা সকলেই ক্ষুদ্র আত্মাভিমান বিসর্জ্জন, নীচ স্বার্থপরতা বলিদান, এবং ধন মান ও যশের আশা জলাঞ্জলি দিয়া নিয়ত স্বদেশের জন্য অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কখনও ভীষণ কারাগারে বদ্ধ, কখনও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত এবং কখনও বা নিতান্ত অসহ্য উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ের প্রকৃত-বল ও চরিত্রের যথার্থ মহত্ব নিস্তেজ হয় নাই। আজি তাঁহাদের বীরত্ব গৌরব সভ্য জগতের শিক্ষার আদর্শ স্থল!

রায়েন্‌জী, ম্যাজিনি, গ্যারিবল্‌ডী, কস্যুথ, ওয়াসিংটন্, ও উইলিয়ম্ টেল্ প্রভৃতি ক্ষণজন্মা বীরগণের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আজি আমাদের দেশের অনেক সুশিক্ষিত যুবক তাঁহাদের অনুকরণ প্রয়াসী হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের অন্তরে যে এই বাসনা টুকু জাগাইয়া দিয়াছে এ বড় সুখের বিষয়! কিন্তু আমাদের দেশের কয়জন স্বদেশানুরাগী যুবকের হৃদয়ে তাঁহাদের হৃদয়ের ন্যায় বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের দশাংশের একাংশ বিদ্যমান আছে। ভ্রান্ত আমরা—ইয়ুরোপীয় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আমাদের জ্ঞান চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে—তাই আমরা আমাদের প্রকৃত বল বুঝিতে পারি না—আমরা মুষ্টিমিত অন্ন ভোজী বাঙ্গালী কি উপাদানে নির্ম্মিত তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না! এই জন্য আমরা কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারি না, কিন্তু কথায় বীরত্ব প্রকাশ করিয়া চরিতার্থ হই! এ সংসারে কথায় কখনই কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় নাই, হইবে না—ধ্যান-রত মহাযোগীর তপশ্চর্য্যার ন্যায় কঠোর সাধনায় উহা সাধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কয়জন যুবক তেমন সাধনা করিতে সমর্থ? কয়জন যুবক চরিত্রের চারু শোভা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত স্বদেশ বাসীকে এক প্রাণতায় বদ্ধ করিতে পারেন? বীর-জননী পুণ্য ভূমি চিতোরের বীররত্ন প্রতাপ জগতে যে মহৎ চরিত্রের শোভা দেখাইয়াছিলেন—তাহা মনে হইলে হৃদয়ের মধ্যে তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটিতে থাকে। তিনি 'স্বর্গাদপী গরিয়সী' পবিত্র জন্মভূমির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে যে মহা ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বিচিত্র বেশ-ভূষা প্রিয়, বিলাসী, নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম ও বাক্‌পটু আমরা তাহা কি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি? আমাদের তেমন ক্ষমতা কোথায়? জানি না কত দিনে আমাদের জাতীয় হৃদয় উন্নত ও জাতীয় চরিত্র পরিশোধিত হইবে! জানি না কত দিনে আমরা আত্ম-সংস্কার ও আত্ম-সম্মান-জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া প্রকৃত শক্তির উপাসক হইব! যে শুভ দিনে সুশিক্ষিত স্বদেশবাসীগণ আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান গুলি বিস্মৃত হইয়া, নীচ স্বার্থপরতা পদ-দলিত করিয়া, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের মধ্যে অকপট সদ্ভাব স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন, এবং পরস্পরে পরস্পরের সামান্য সামান্য দোষ বা শিক্ষার অভাব ভুলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অকৃত্রিম ভালবাসা, অচল বিশ্বাস, গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিক সহায়তা দেখাইতে পারিবেন, বলিতে অপার আনন্দ জন্মে, সেই সুখময় দিনে আমাদের মৃত জাতীয় জীবন পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। যত দিন না আমরা স্বদেশবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিব তত দিন উন্নতির ভাণ করা বিড়ম্বনা মাত্র!

অন্য কথা দূরে যাক এই ত ভারতের হিতের নিমিত্ত "British Indian Association" ও "Indian Association" স্থাপিত হইয়াছে। দুইয়ের প্রায় একই উদ্দেশ্য। দুইটি সভার সভ্যগণ এক দেশেরই লোক এবং প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুই সভার প্রধান প্রধান নেতা গণের মধ্যে লজ্জা জনক মতভেদ ও অসদ্ভাব কেন? ইহাঁরা কি স্বদেশের হিতসাধনরূপ মহাব্রতের কথা সু-

রণ করিয়া পরস্পরের সামান্য সামান্য মত-বৈষম্য গুলি বিস্মরণ এবং স্বস্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান গুলি বিনাশ করিয়া, এক প্রাণে, এক উদ্যমে জন্ম ভূমির মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন না? ইহাঁদের পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য না করিবার যদি কোন কারণ থাকে তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির এই বিশ্বাস যে তাঁহাদের হৃদয়ে মধুরতা ও চরিত্রে পূর্ণতার অভাব আছে। তাঁহারা কি সে অভাব নিবারণ করিবেন না?

স্বদেশের উজ্জ্বল রত্ন সদৃশ সুশিক্ষিত ও সুরুচি-সম্পন্ন নর-নারীগণ। আপনাদের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, আপনারা স্বদেশের দুর্দ্দশা মোচনে স্বস্ব জীবন উৎসর্গ করুন। আসুন, আমরা সকলে হৃদয়ের ক্ষুদ্রভাব দমন করিয়া একপ্রাণে মিলিত হই। পরস্পরে পরস্পরের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস, প্রাণগত ভালবাসা ও যথাসাধ্য সহায়তা স্থাপন করিয়া মৃত দেশকে আবার জীবন দান করি। যদি ভাগ্যে শুভদিন উপস্থিত হয় তাহা হইলে, আজি আমরা যাহাদের চরণ তলে লুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত হইতেছি, তাহারাই আবার সেই শুভদিনে স্বস্ব গর্হিত আচরণের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া অবনত মস্তকে বলিবে "চারুতার কাছে আর দর্পখাটে কার!"

শ্রী বিজয়লাল দত্ত।

লীলা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

আমি যা ভাবিয়াছিলাম তাই ঘটিয়াছে। যাহাদের কপালে কষ্ট আছে, তাহারা সৎ-পরামর্শ শুনিবে কেন? সুরেশচন্দ্র কাহারও কথা শুনিলেন না, তেমনি ফল ফলিল। তিনি এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। ছেলেটী যে নিতান্ত হাবাগোবা এমত ত আমার বোধ হয় না, কিন্তু নিজের কাজ গুছাইয়া লইতে বোধ করি তেমন হুঁসিয়ার নয়। গণেশচন্দ্র বলিতেন, সুরেশচন্দ্র ছেলে মন্দ নয়, কিন্তু বুদ্ধির কিছু অভাব। আমারও তাহাই বোধ হয়। গণেশচন্দ্র অর্থশূন্য কথা বলিবার লোক নন। তাঁহাকে যে জানিত সেই বলিত ছেলেটী অসাধারণ বুদ্ধিমান। তিনি যখন বাল্যাবস্থায় পাঠশালায় যাইতেন, তখন সকলে বলিত, এ ছেলে বাঁচলে হয়।

সুরেশচন্দ্র লজ্জায় আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারেন না। শ্বশুরবাড়ী যাওয়া

বন্ধ করিলেন। নিমন্ত্রণ হইলেও সে মুখো হন না। আমি যলি, বেশ হইয়াছে। ফেল হইলে যদি এতই লজ্জা বোধ হয়, তাহা হইলে এ লজ্জা ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনা কেন? বাবুর নিজের পড়া ভাল লাগে না, শেলি, তাসো, দান্তে পড়িতেন। কই, শেলি পড়িয়া পাস হইতে পারিলে কই? দান্তের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে এখন ত সেনেট হাউসে প্রবেশ নিষেধ হইল। যে চাবি দিয়া কল্পনার দ্বার খোলা যায়, তাহা দিয়া ত বিদ্যার দ্বার এম এ, বি এ উপাধির দ্বার খোলা যায় না। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এখন থাক,বাহিরে পড়িয়া থাক। আর সকলে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট মুন্সেফ, উকীল হইবে, আর তুমি তোমার কবিত্ব লইয়া, শেলি লইয়া ধুইয়া খাইও। সুরেশচন্দ্রের উপর আমার এমনি রাগ হইতেছে, যে আর কি বলিব! দেখ দেখি এমন মূর্খও জগতে আছে! যদি দশ বিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ থাকিত, কিছু তালুক মুলুক থাকিত, তাহা হইলেও বুঝিতাম, আচ্ছা বাপু, তোমার পড়িতে ইচ্ছা হয় পড়, না হয় না পড়, কবিতা লেখ, ছাইভস্ম লেখ, যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। টাকা না নষ্ট করিলেই হইল, হিসাবী হইলেই হইল। তোমার কিছু নাই, তোমাকে পরের চাকরী করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কলম ঠেলিয়া আঙ্গুলে ঘাঁটা পড়াইয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে। তোমার এ সব বিড়ম্বনা কেন? তুমি বলিবে ইংরাজেরা অনেকে কবি হয়। তাহাতে তোমার কি? ইংরাজেরা ত পৃথিবীতে একাধিপত্য করিতেছে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাদের অধীনে, তাহারা যাহা করিবে তুমিও তাই করিবে? তাহাদের টাকা কত, তাহারা কবি হইবে না কেন? তুমি যদি কবিতা লিখিয়া এক পয়সাও পাইতে তাহা হইলেও বা বুঝিতাম। অনর্থক এ উদ্যোর বোঝা বুড়োর ঘাড়ে কেন? তুমি গরিব বাঙ্গালী, তোমার এত কথায়, এত গোলমালে কাজ কি? পড়াশুনা করিবে, পাস করিবে, ভাল চাকরী করিবে, সাহেবের মন রাখিবে, কিছু টাকা কড়ি রাখিবার চেষ্টা করিবে, এই ত জানি। তোমার কি এমন মস্তিত্ব পদ হইয়াছে, যে তুমি মহাভাবনা-যুক্ত হইয়াছ? সুরেশ চন্দ্র বলেন কত কি ভাবি। একথা শুনিয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বলিয়াছিলেন, "তোমার আবার কিসের ভাবনা? তোমার ঘাড়ে সংসারও চাপে নি, কালকেই যে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তাও নয়, তবে তুমি কি ভাবনা ভাব? এ যে তোমার অন্যায় কথা।" ভারি অন্যায় কথা। সংসারের ভাবনা ছাড়া আর কিসের ভাবনা থাকিতে পারে? যে বলে আমি আর কোন ভাবনা ভাবি, আমি তাহার কথা শুনিলে হাসি। হরগৌরী বাবু সুরেশচন্দ্রকে বলিলেন "এবার ত ফেল্ হলে। এখন কি করিবে? আবার পড়।"

সুরেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞা।"

হরগৌরী বাবু বলিয়া দিলেন, "এবার খুব মন দিয়া পড়িবে। আমি আজ বাদে কাল পেন্সন লইব। আর, আমি ক দিনই

বা আছি। যা পার, এই বেলা করিয়া লও।"

গণেশচন্দ্র পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যখন তাঁহার সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গাউনে আবৃত করিয়া, শামলা পরিয়া ডিগ্রী আনিতে গিয়াছিলেন, তখন না কি তাহাকে খুব মানাইয়াছিল। ডিগ্রী লইয়া, ধড়া চূড়া ছাড়িয়া, সোজা সিঁতে কাটিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া তিনি সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। আসলটা, দেখা দিতে আসিলেন। গণেশচন্দ্র দেখিতে যে খুব সুপুরুষ, তা নয়। একে একটু বেঁটে, তাহাতে বর্ণ কালো, চোক ছোট, নাকটীও তেমন টিকল নয়। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা তেমন সুশ্রী হয় না। সুরেশকে দেখিয়া, গণেশচন্দ্র বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা একবার কেশ স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে একবার চাদরের ফুল নাড়িয়া কহিলেন, "কি হে, সুরেশ, কিছু বিষণ্ণ দেখ্‌চি যে।"

সুরেশচন্দ্র। না, তা বড় নয়। দশচক্রে ভগবান ভূত। তা নহিলে আমি যেমন ছিলাম, তেমনি আছি।"

গণেশচন্দ্র আজ কিছু গম্ভীর। ডিগ্রী পাইয়াছেন কি না। বলিলেন, "তাও ত বটে - কবিগণ সহজে বিচলিত হন না। এখন মতলবটা কি? আর একবার দেখ্‌বে না কি?"

সুরেশচন্দ্র। কাজেই।

গণেশচন্দ্র কহিলেন, "তাই ভাল।" তিনি আর দাঁড়াইলেন না। আজ তাঁহাকে আরও অনেক স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরমা।

কিরণের পিতামহী সেকেলে মানুষ, ষাট বছর বয়স হবে। সেকেলে লোক হইলেই একালের লোকের চক্ষে তেমন ভাল দেখায় না। সেকেলে চকমিলান বাড়ী এখনকার নব্য লোকের ভাল লাগে না। এখন সব নূতন হইতেছে, পুরাতন কিছুই ভাল নয়, কিছুই থাকিবে না। যত কিছু সেকেলে আছে, তাহার মধ্যে সেকেলে বিধবা সকলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছেন। সেকেলে বৃদ্ধ আর এখনকার শিক্ষিত যুবায় যত না প্রভেদ, সেকেলে বুড়ী আর এখনকার সভ্য যুবতীতে তত প্রভেদ। কোন যুবতী আর একজন যুবতীর সঙ্গে দেখা হইলে আপনি বলিয়া সম্বোধন করেন, বেশ দস্তুর মত নমস্কার করেন, লেখা পড়া পুস্তকাদির কথাবার্ত্তা হয়, আরও সব সভ্যতানুমোদিত, সুরুচিসম্পন্ন কথাবার্ত্তা হয়। আর একজন সেকেলে বুড়ী, চেনা নাই, শুনা নাই, একেবারে তুমি বলিয়া, হাত ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া ঘরে বসাইবে। তাহার পর গায়ের গহনা দেখিবে, স্বামীর কত মাহিয়ানা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে, শ্বাশুড়ী কি করিতেছেন, বাড়ীতে কে রাঁধে, আজ সকাল বেলা কি রান্না হইল, এক নিশ্বাসে সব জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাতে নবীনারা রাগ না করিবেন কেন?

কিরণের পিতামহীর এ সব দোষ গুলি ছিল। নহিলে লোক নেহাত মন্দ নয়। তিনি ছেলেদের জ্বালায় এক একবার ভারি ত্যক্ত হন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু দলাদলি করিতে একজন অগ্রগণ্য দলপতি। তাই বলিয়া অপাংক্তেয় বাদ যায় না। রাত্রিকালে জনেক সদাড়িক সূপকার বস্ত্র মধ্যে রোষ্ট, কট্‌লেট্, চপ্, করি প্রভৃতি দেবদুর্লভ উপাদেয় সামগ্রী আনয়ন করিত, চৌধুরী মহাশয় কাঁটা চাম্‌চে ধরিয়া সেই মহাপ্রসাদ উপযোগ করিতেন। ছুরী কাঁটা ধরা তেমন ভাল অভ্যস্ত ছিল না, কাঁটাটা প্রায় উল্টাইয়া ধরিতেন, এক একবার কাঁটা চাম্‌চে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পরিচালনা করিতেন। শুনা যায় একবার উইল্‌সনের হোটেলে গোমাংস পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়াছিলেন। বাড়ীতে সেই ইংরাজ জগন্নাথ প্রসাদ আসিলে, ছোট ছোট ছেলেরা একটু আধটু প্রসাদ পাইত। কিরণের পিতামহী সেই সময় মহা বিপদে পড়িতেন। বলিলে কেহ কথা শোনে না, সকলেই সেই ছাই ভস্ম গুলা খাইবে। ঠাকুরমা এক মুখ থুথু লইয়া, অক্ষরের দরজাগোড়ায়, দুই হাতে কাপড় গুটাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কিছুক্ষণ পরেই নবীন, শ্যাম, গোপাল, অক্ষয় সকলে ছুটাছুটি করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিত। হয়ত গোপাল ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিতে আসিল। ঠাকুরমা চেঁচাইলেন, "ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে, সরে যা! ওরে, ওদিকে যাস্‌নে! আগে ভাল জল দিয়ে মুখ হাত ধো, কাপড় ছাড়্, গঙ্গাজল পরশ কর্, তার পর ঘরে দোরে যাস্।' এই বলিয়া তিনি গঙ্গাজল আনিতে গেলেন। কেবা তাঁর কথা শোনে? যে যেদিকে পাইল ছুট মারিয়া বিছানায় শয়ন করিল। ঠাকুরমা পঞ্চপাত্র, কি একটী চুম্‌কি ঘটী করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া, পৌত্র, দৌহিত্রদিগকে দেখিতে না পাইয়া কেবল বকিতেন, "রাম বল, রাম বল। পৃথিবীতে এত খাবার সামগ্রী রয়েচে, তা খেয়ে কি তোদের মন ওঠে না? ওই অমৃত কি না খেলেই নয়? ধর্ম্ম কর্ম্ম, বাচ বিচার সব গেল। যেন মোছোলমানের ঘর করে তুল্লে গা! ইচ্ছা করে এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। বলি আমি আর কদিনই বা আছি, তার পর তোদের যা ইচ্ছা হয় করিস্। মোছোলমানের ছোঁয়া খাস্, বউ নিয়ে চেরেটে কোরে হাওয়া খেতে যাস্, বিবি বিয়ে করিস্, যা ইচ্ছা তাই করিস্। সে কটা দিনও কারুর দেরি সয় না।" যখন দেখিলেন কেহ তাঁহার কথা শোনে না, তখন তিনি আর সব ছাড়িয়া দিয়া আপনি সাবধান হইলেন। তাঁহার ঘরে কোন ছেলে গঙ্গাজল না স্পর্শ করিয়া প্রবেশ করিতে পায় না। তাঁহার পাকের সামগ্রী কোনও ছেলে হাত দিলে সে দিন আর তাঁহার খাওয়া হয় না। এক-দিন রাত্রে কিরণের একটী পিসতুতো ভাই বাহির বাড়ীতে কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া ভিতরে আসিয়া কিরণের পিতামহীকে ছুইয়া ফেলিল। কিরণের পিসির নাম বিন্দুবাসিনী। পিতামহী ডাকিলেন, "বিন্দু।"

"কে, মা ডাক্‌চ?" একটু চড়া স্বরে এই উত্তর হইল।

মা বলিলেন, "দেখেছিস্ তোর ছেলের আক্কেল? আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।" বিন্দুবাসিনী মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরের বাহিরে আসিয়া কিছু রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? বিনোদ কি করেছে?'

মা। করবে আবার কি? আমার মাথা খেয়েচে। এই শীতের রাত্রে আবার নেয়ে মরি।

কন্যা। কি হয়েছে ছাই বলনা।

মা। হবে আবার কি? আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে। বিনোদ আমায় ছুঁয়ে ফেলেচে।

কন্যা। ড্যাক্‌রা গেল কোথায়? তাকে আমি দাদার সঙ্গে খেতে বারণ কোরে দিয়েচি না?

মা। তোমার ছেলেরা কথা শোন্‌বার ছেলে সব কি না। যেটী বারণ কর সেইটী আগে করবে।

কন্যা রাগে ফুলিতে লাগিলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বিনোদ, গেলি কোথায়? ড্যাক্‌রা, পোড়ামুখো, হতভাগা, একবার এদিকে আয় তুই।"

মা তখন নরম হইয়া বলিলেন, "তাই বলে গালাগালি দিলে কি হবে? ছেলে মানুষ ছুঁয়ে ফেলেচে তার এখন কি হবে? ওর কি এখনো জ্ঞান হয়েচে?"

বিনোদ সব কথাটা জানেনা, বাহিরে গুম্ফ শ্মশ্রুধারী পাচক মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে ব্যস্ত ছিল। মার কাছে আসিয়া কহিল, "কি মা ?"

বিন্দুবাসিনী দৃঢ়মুষ্টিতে বিনোদের হাত ধারণ করিয়া কহিলেন, "আজ তোমাকে আস্ত রাখব না। তোকে দাদার সঙ্গে খেতে মানা করেচি, তবু তুমি নোলার জ্বালায় কুকুরের মত পাত চাট্‌তে গিয়েচ। তোর নোলায় ছিচ্‌কে পুড়িয়ে দেব, জাননা ?"

বিনোদবিহারী সেখ হুসেন আলির দীর্ঘ, ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল আর সেই শুভ্রপ্লেটস্থিত অপূর্ব্ব সামগ্রীর সৌরভ ও আস্বাদ স্মরণ করিতে ছিলেন। মাতার কঠোর কথার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার পৃষ্ঠের সঙ্গে মাতার কোমল হস্তের মধ্যে মধ্যে বড় কঠিন আলাপ হয়, এজন্য তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া কহিলেন, "মামা আমায় ডাক্‌লেন তাই গিয়েছিলাম।"

"আর আমি যা বল্লুম তা মনে ছিল না ? দিদিমাকে ছুঁয়েচিস্ কেন, পোড়াকপালে ?" এই বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া করিয়া দুই চড়।

মাতা আসিয়া বিন্দুবাসিনীর হাত ধরিলেন। কহিলেন, "বিন্দু, মার উপর রাগ কোরে কি ছেলে ঠেঙ্গাতে আছে ? ছেড়ে দাও, লক্ষী মা আমার।"

কন্যা মাকে এক ঠেলা দিয়া কহিলেন, "ছেড়ে দাও বল্‌চি, নইলে ভাল হবে না। আমার ছেলেকে আমি মার্‌ব, আর কারুর তাতে কি ?'

এই বলিয়া চড় ছাড়িয়া ছেলের পিঠে দুম্ দুম্ করিয়া কিল মারিতে আরম্ভ করিলেন।

বুড়ী ঠেলা খাইয়া পড়িতে পড়িতে রহিল।

ঘরের ভিতর কিরণ লীলাকে বলিতে ছিল, "ভাদ্র মাসের তাল কার ঘাড়ে ... ড়্‌চে ? সেজপিসীর গলা শুনেচ ত ? বাবা এমন মেয়ের পায়ে গড় করি।"

এদিকে ঠাকুরমা স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "ও মারা ... বিনোদকে হল না, ও আমাকেই মারা হল।"

বিন্দুবাসিনী ছেলেকে মনের সাধ মিটা... ইয়া ঠেঙ্গাইলে পর, পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন।

কিরণের মা আর লীলা দুই জনকে ক... বুঝাইলেন, তাঁহারা কোন মতেই জলস্পর্শ করিতে সম্মত হন না। কিরণের পিতামহী যা ফল মূল খান, কিছুই খাইতে চান না। তাঁহারা না খাইলে আর কেহ খায় না দেখিয়া রাত্রি দুপুরের পর আহার করিলেন।

শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর গরিবের ঘরে বিবাহ হইয়াছে। এজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে থাকেন। তাঁহার তিন চারিটী সন্তান। বাপের বাড়ী আসিলে বাড়ী সুদ্ধ লোক তাঁহার ভয়ে তটস্থ থাকিত।

আবার যখন ঠাকুরমা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, নবান্ন মাখিতে বসিতেন, হরির লুট দিতেন, সে সময় ছেলেরা হাত পাতিয়া তীর্থের কাকের মত তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। সে বৎসর যখন তাঁহার অনন্ত ব্রত সারা হয়, তখন ভারি ঘটা হইয়াছিল। সাত দিন আগে হইতে ব্রতের সামগ্রী সাজান আরম্ভ হইল। ছেলেরা দরজার চৌকাটে দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিত। ঠাকুরমা সুবিধা বুঝিয়া নাতিদের বলিলেন, "আমার কাছে ত মোছোনমানের ভাত নেই, আমার কাছে তোরা এসেছিস কেন ?

জন দুই নাকি সুরে ধরিল, "না ঠাকুর মা, আর আমরা সে সব খাবনা।

ঠাকুরমা তখন চাপিয়া ধরিলেন, "আর ...খন মোছোনমানের এঁটো খাবিনে বল।"

"না ঠাকুরমা আর আমরা কখন খাব ...।" "না দিদিমা, তিন সত্য কর্‌চি।"

"খাবিনে।"

"না, খাবনা।"

"খাবিনে।"

'না, গো, খাবনা, খাবনা।' তোমার ...ায়ে পড়ি আমায় ঐ সন্দেশটা দাওনা ...াকুর মা।"

এই বলিয়া তাহারা ঠাকুরমার কাছে ...ত্তম আহার করিল। রাত্রিকালে আবার ...য কে সেই। আবার সেই যবনান্ন পাই...ার আশায় ছুটিত। ঠাকুরমা মনে মনে ...ঙ্কল্প করিতেন, তিনি ছোঁড়াদের আর ...একটা কথাও বিশ্বাস করিবেন না। আ...ার সে সঙ্কল্প ছোঁড়াগুলার কাকুতি মিন...তিতে ভাঙ্গিয়া যাইত।

ঠাকুরমার আর একটী অভ্যাস ছিল। ...তিনি একজনের কাছে তাহার মনরাখা কথা বলিতেন, আবার তাহার পশ্চাতে ঠিক বিপরীত কথা বলিতেন। কিরণের মার কাছে এক রকম কথা বলিলেন, কিরণের পিসির সাক্ষাতে আর এক রকম বলিলেন। বাড়ীতে একটী নূতন ব্রাহ্মণের মেয়ে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ঠাকুর মা মনে মনে সন্দেহ করেন, বামণ ঠাক্‌রুণের একটু আধটু হাতটান আছে, অথচ সে কথা মুখে ফুটিয়াও বলা যায় না। ব্রাহ্মণী ছাড়িয়া গেলে আর একটী সহজে মেলে না। এক দিন বামণ ঠাক্‌রুণ আসিয়া বলিল, "মা, এক পলা তেল দাও ত গা।"

ঠাকুরমা কিছু সন্দিগ্ধান্তঃকরণে কহিলেন "কেন বাছা, রোজ যেমন একবাটী তেল দি, আজও ত তেমনি দিয়েছি। আবার তেল কেন ?"

ব্রাহ্মণী। আজকে মাছ ভাজতে একটু বেশি তেল লেগেছে, আর আলু পটল ভাজতেও তেল বড় কম লাগে না। তা না দাও ত আমি পুড়িয়ে রাখিগে। আমার তাতে কি ? আমার নিজের দশজন ত আর খাবে না, তোমারই নাতি পুতি খাবে।

ঠাকুরমা অন্য কথা না কহিয়া এক পলা তেল বাহির করিয়া দিলেন।

গৃহিণীর মধ্যমা কন্যা তখন বাপের বাড়ী। সেই দিন ঠাকুরমা কন্যার সাক্ষাতে গল্প করিলেন, "বামণ ঠাকরুণের উপর আমার বড় সন্দ হয়। আজকেই সে তেল চুরী করেচে।"

শৈলবালা গিয়া কিরণের মাকে ইঙ্গিত করিলেন, "বউ একবার শুনে যাও।" এই বলিয়া একটী নিভৃত ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কিরণের মা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েচে ঠাকুরঝি ?"

ঠাকুর্‌ঝি কহিলেন, "তুমি ভাঁড়ার ভাল করে দেখো শুনো। বামণ ঠাক্রুণটী লোক ভাল নয়।"

"কেন, সে কি করেচে ?"

"তুমি বুঝি তা জাননা ? মা বলেচেন যে সে আজ তেল চুরী করেছে।"

"তা নিলেই বা তাই ? আমাদের একটু তেল চুরী কর্‌লে ত আর আমরা গরিব হব না। তুমি ভাই ঠাক্‌রুণকে বুঝিয়ে ব'ল যেন একথা প্রকাশ না হয়। আজকাল লোকের যে কষ্ট।"

প্রকাশ হবে কেন ? কিন্তু তুমি একটু সাবধান থেক।"

কিরণের মা কহিলেন, "তোমরা যেন ঢাক বাজিও না ভাই। কতই বা চুরী কর্‌বে। ভাঁড়ার ত আর তার হাতে নয়।"

"তোমার যদি এত বড়মানুষী হয়ে থাকে ত তোমার ধন যাকে ইচ্ছা তুমি বিলিয়ে দাও না কেন ? সত্যিই ত আমি কোথাকার কে, যে তুমি আমার কথা শুন্‌বে ? আমি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌তে এসেছিলাম।" এই বলিয়া শৈল-

বালা সুন্দরী ফরকিয়া বাহির হইয়া গেলেন!

পর দিবস ঠাকুর মা স্নান করিয়া পূজা আহ্নিকে বসিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা, মা, তুমি নাকি বলেচ যে আমি রান্নার তেল বোতলে করে বিক্রী করি। তা' এমন কলঙ্ক কি না দিলেই নয়? লোকের নামে মিছে কোরে এমন কথা বল্‌তে নাই। বলেছ, বেশ করেছ বাছা, আমার পাওনা চুকিয়ে দাও, আমি এই বেলা মানে মানে বিদায় হই।"

ঠাকুরমা বাম হস্তের উল্টাপিঠ মাথার উপর রাখিয়া কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশের কথা। তুমি হ'লে ভদ্রলোকের মেয়ে, তোমার নামে আমি এমন কথা কখন বললাম। কে তোমার এমন কথা বলেচে, আমায় বল ত?"

ব্রাহ্মণী হাঁড়ির কালিকলঙ্কিত হস্ত দোলাইয়া কহিলেন, "কেন, আমায় আজ কালোঝি বল্‌লে।"

অমনি কাল ঝির ডাক পড়িল। ঠাকুর মা কহিলেন, "হ্যাঁলা ময়না, আমি কখন তোমার গলা ধরে তোমার কানে কানে বল্‌তে গিয়াছিলাম যে বামণঠাকরুণ তেল চুরী করে তাই তুমি ঠগ লাগাতে গিয়েচ?"

ঝি বলিল, "আমার কি অপরাধ বাছা? আমায় হরি বল্লে তাই শুনেছি।"

আবার হরির উপর আক্রমণ হইল। সব শেষ ঠাকুরমা সূর্য্যের দিকে দুই হাত তুলিয়া কহিলেন, "হে দিননাথ! আমি যদি এমন কথা বলে থাকি ত যেন আমার দুটী চক্ষু অন্ধ হয়।"

বামণ ঠাকরুণ ত কোন মতে থাকিবে না। কিরণের মা কত করিয়া তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়া সান্ত্বনা করেন। তার পর শ্বাশুড়ীকে থামাইতে একবেলা লাগিল।

অনেকেই বলিত কিরণের ঠাকুরমা দোঠকা, এক মুখে দুই কথা বলেন। তুমি ও হয়ত তাই বলিতেছ। কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিতেছি তাঁহার বেশি কিছু দোষ নাই। বিবেচনা কর স্ত্রীলোকে চিরকালই পরাধীন। ছেলেবেলা বাপের, বয়সকালে স্বামীর, বুড় বয়সে ছেলে কি মেয়ের বশে থাকিতে হয়। সকলেরই মন রাখিতে হয়। আগে বাপ মার, তার পর শ্বশুর শ্বাশুড়ীর, তার পর পুত্র কন্যার মন রাখিয়া চলিতে হয়। যাহাকে অনেকের মন রাখিতে হয় সে এক রকম কথা কিরূপে কহিবে। অতএব তোমরা যাহাই বল, কিরণের পিতামহীকে আমার বড় মন্দ লোক বোধ হয় না।

লীলাকে দেখিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন। লীলার আচার ব্যবহারেও বড় আহ্লাদিত হইলেন। লীলা তাঁহার পূজার সময় গঙ্গাজল আনিয়া জল ছড়াইয়া দেয়, আগে যাহা কিরণের মা করিতেন এখন সব লীলা করে, তাঁহাকে কিছু করিতে দেয় না। লীলার পবিত্র স্বভাব দেখিয়া তিনি বলিতেন, লীলার হাতের রান্না খেতে আমার রুচি হয়। লীলার এমন বয়সে বৈধব্যদশা হইল, এই বলিয়া কতবার কাঁদিতেন। স্ত্রীলোকে পরের জন্য নিজের চক্ষে এত জলও রাখিতে পারে।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কথাবার্ত্তা।

(সন্ধ্যাবেলায়।)

১ম। আমি সন্ধ্যা কেন এত ভালবাসি জান? সমস্ত দিন আমরা পৃথিবীর মধ্যেই থাকি—সন্ধ্যাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবী-ছাড়াই বেশী—এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী কুচি কুচি সোনার মত আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। জগৎ মহারণ্যের একটি বৃক্ষের একটি শাখার একটি প্রান্তে একটি অতি ক্ষুদ্র ফল প্রতিদিন পাকিতেছে। তাহাই পৃথিবী। আমরা কীটাণুরা তাহারই রসে পুষ্ট হইতেছি। দিনে দেখিতাম পৃথিবীর মধ্যে ছোট-খাট যাহা কিছু সমস্তই চলা-ফিরা করিতেছে, সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই পৃথিবী স্বয়ং চলিতেছে। রেলগাড়ি যেমন পর্ব্বতের খোদিত গুহার মধ্যে প্রবেশ করে—তেমনি, পৃথিবী তাহার কোটি কোটি আরোহী লইয়া একটি সুদীর্ঘ অন্ধকারের গুহার মধ্যে যেন প্রবেশ করিতেছে—এবং সেই ঘোরা নিশীথগুহার ছাদের মণ্ডপে অযুত গ্রহতারা একেকটি প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারি নীচে দিয়া একটি অতি প্রকাণ্ডকায় গোলক নিঃশব্দে অবিশ্রাম গড়াইয়া চলিতেছে।

২য়। এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পথচিহ্নহীন পথে অহর্নিশি হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এক নিমেষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

১ম। এমন একটি পৃথিবী কেন—যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে, ঠিক এই মুহূর্ত্তেই অনন্ত জগৎ প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; অতিবৃহৎ অতি গুরুভার লক্ষকোটি অযুত নিযুত চন্দ্র সূর্য্য তারা গ্রহ উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু, লক্ষ যোজন ব্যাপ্ত নক্ষত্রবাষ্পরাশি কিছুই স্থির নাই; অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনল-গোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে (কি তাহার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ বাহু! কি তাহার বজ্রকঠিন বিপুল মাংসপেশী!) প্রতি পলকেই কি অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে! তখন কল্পনা অনন্তের কোন্ প্রান্তে বিন্দু হইয়া হারাইয়া যায়!

২য়। অথচ দেখ, মনে হইতেছে প্রকৃতি কি শান্ত!

১ম। প্রকৃতি আমাদের সকলকে জানাইতে চায় যে, তোমরাই খুব মস্ত লোক—তোমরা আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছ। বিদ্যুৎ-মায়াবিনীকে তার দিয়া বাঁধিয়াছ—বাষ্প-দানবকে লৌহ কারাগারে বাঁধিয়া

তাহার দ্বারা কাজ উদ্ধার করিতেছ। প্রকৃতি যে অতি বৃহৎ কার্য্যগুলি করিতেছে তাহা আমাদের কাছ হইতে কেমন গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর, আমরা যে অতি ক্ষুদ্র কাজটুকুও করি, তাহাই আমাদের চোখে কেমন দেদীপ্যমান করিয়া দেয়!

২য়। নহিলে, আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই অনন্তের কাজ চলিতেছে, তাহা হইলে কি আমরা আর কাজ করিতে পারি!

১ম। কম কাজ! বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত দেখ। অতি মহৎশক্তিসম্পন্ন কত সহস্র নক্ষত্র লোক, অথচ দেখ, তাহারা ছোট ছোট মাণিকের মত কেবল চিক্‌চিক্ করিতেছে মাত্র! আমরা ফুলবাগানের মধ্যে বসিয়া আছি, মনে হইতেছে চারিদিকে যেন ছুটি। অথচ প্রতি গাছে পাতায় ফুলে ঘাসে অবিশ্রাম কাজ চলিতেছে—রাসায়নিক যোগ-বিয়োগের হাট বসিয়া গিয়াছে—কিন্তু দেখ, উহাদের মুখে গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রমের ভাব কিছুমাত্র নাই। কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল বিরাম, কেবল শান্তি! আমি যখন আরাম করিতেছি, তখনো আমার আপাদমস্তকে কাজ চলিতেছে—আমার শরীরের প্রত্যেক কাজ যদি মেহন্নত করিয়া আমার নিজেকেই করিতে হইত তাহা হইলে কি আর জীবন ধারণ করিয়া সুখ থাকিত!

২য়। প্রকৃতি বলিতেছে, আমি তোমার জন্য বিস্তর কাজ করিয়া দিতেছি আর তুমি কি তোমার নিজের জন্য কিছু করিবে না! জড়ের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তোমার নিজের জন্য অনেক কাজ তোমার নিজেকেই করিতে হয়। তুমি পুরুষের মত আহার উপার্জ্জন করিয়া আন, তার পরে সেটাকে পাকযন্ত্রে রাঁধিয়া লইবার অতি কৌশলসাধ্য কার্য্য ভার, সে আমার উপরে রহিল, তাহার জন্যে তুমি বেশী ভাবিও না। তুমি কেবল চলিবার উদ্যম কর, দেখিবে আমি তোমাকে চালাইয়া লইয়া যাইব।

১ম। ঠিক কথা, কিন্তু প্রকৃতি কখনো বলে না যে, আমি করিতেছি। আমাদের বেশীর ভাগ কাজ যে প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া দিতেছে, তাহা কি আমরা জানি! আমাদের নিরুদ্যমে যে শতসহস্র কাজ চলিতেছে, তাহা চলিতেছে বলিয়া আমাদের চেতনাই থাকে না। এই যে অতি কোমল বাতাস বহিতেছে, এই যে আমার চোখের সুমুখে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে তটের উপরে মুহুর্মুহু লুটাইয়া পড়িতেছে ইহারা আমার হৃদয়ের এই অতি তীব্র শোক অহরহ শান্ত করিতেছে। জগতের চতুর্দ্দিক হইতে আমার উপর অবিশ্রাম সান্তনা বর্ষিত হইতেছে অথচ আমি জানিতে পারিতেছি না, অথচ কেহই একটি সান্তনার বাক্য বলিতেছে না। কেবল অলক্ষ্যে অদৃশ্যে আমার আহত হৃদয়ের উপরে তাহাদের মন্ত্রপূত হাত বুলাইয়া যাইতেছে আহাউহুটুকুও বলিতেছে না। আমাদের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী

এই যে কার্য্যকুশল সদাব্যস্ত ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে থাকে সে কেবল আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য; আমাদিগকে জানাইবার জন্য যে আমরাই স্বাধীন।

২য়। অর্থাৎ, অধীনতা খুব প্রকাণ্ড হইলে তাহাকে কতকটা স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে—কারাগার যদি মস্ত হয়, তবে তাহাকে কারাগার না বলিলেও চলে। বোধ করি, আমাদিগকে স্থায়ীরূপে অধীন রাখিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পাছে মুহুর্মুহু আমাদের চেতনা হয় যে আমরা অধীন, ও বৈরাগ্য সাধনা দ্বারা প্রকৃতির শাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, এই ভয়ে প্রকৃতি আমাদের হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইয়া আমাদিগকে একটা বেড়া-দেওয়া জায়গায় রাখিয়া দিয়াছে। আমরা ভুলিয়া থাকি আমরা অধীনতার দ্বারা বেষ্টিত, মনে করি আমরা ছাড়া পাইয়াছি।

১ম। কিম্বা এমনও হইতে পারে প্রকৃতি আমাদিগকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিতেছেন। দেখ না কেন, উত্তরোত্তর কেমন স্বাধীনতারই বিকাশ হইতেছে। জড় যে, সে নিজের জন্য কিছুই করিতে পারে না। উদ্ভিদ্ তাহার চেয়ে কতকটা উচ্চ। কারণ টিঁকিয়া থাকিবার জন্য খানিকটা যেন তাহার নিজের উদ্যমের আবশ্যক, তাহাকে রস আকর্ষণ করিতে হয়, বাতাস হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়। মানুষ এত বেশী স্বাধীন যে, প্রকৃতি বিস্তর প্রধান প্রধান কাজ বিশ্বাস করিয়া আমাদের নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন। আর, স্বাধীনতা জিনিষ বড় সামান্য নহে। জড়ের কোন বালাই নাই। আমরা, মানুষেরা, কি করিলে যে ভাল হইবে, পদে পদে তাহা ভাবিয়া পাই না। আকুল হইয়া একবার এটা দেখিতেছি, একবার ওটা দেখিতেছি; এবং এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতেই আমরা শতসহস্র করিয়া মারা পড়িতেছি। উত্তরোত্তর যেরূপ স্বাধীনতার বিকাশ হইয়া আসিয়াছে, ইহারই যদি ক্রমিক চালনা হয়, তাহা হইলে মানুষের পর এমন জীব জন্মাইবে, যাহাদের ক্ষুধা পাইবে না, অথচ বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিতে হইবে (অনেক মানুষেরই তাহা করিতে হয়), রক্ত সঞ্চালন ও পরিপাক কার্য্য তাহার নিজের কৌশলে করিয়া লইতে হইবে, (মানুষের রন্ধন-কার্য্যও কতকটা তাহাই) ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার শরীরের পরিণতি সাধন করিতে হইবে—এক কথায়, তাহার আপাদমস্তকের সমস্ত ভার তাহার নিজের হাতে পড়িবে। তাহার প্রত্যেক কার্য্যের ফলাফল সে অনেকটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। একটি কথা কহিলে আঘাতজনিত বাতাসের তরঙ্গ কতদূরে কত বিভিন্ন শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইবে তাহা সে জানিবে, এবং তাহার সেই কথার ভাব সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত হৃদয়কে কতরূপে বিচলিত করিবে, তাহারি ফল পুরুষানুক্রমে কতদূরে কি আকারে প্রবাহিত হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে।

২য়। আমাদের স্বাধীনতাও আছে,

অধীনতাও আছে, বোধ করি, চিরকালই থাকিবে। স্বাধীনতার যেমন সাধনা আবশ্যক, অধীনতারও বোধ হয় সেইরূপ সাধনা আবশ্যক। হয়ত বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধীনতাকেই যথার্থ স্বাধীনতা বলে। কেবল মাত্র স্বাতন্ত্র্যকে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে না। যথার্থ যে রাজা সে প্রজার অধীন, পিতা সন্তানের অধীন, দেবতা এই জগতের অধীন। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে অধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে। জড় পদার্থ অধীন ভাবে অধীন, মানুষেরা অধীন ভাবে স্বাধীন, আর দেবতারা স্বাধীন ভাবে অধীন। আমরা যখন মহত্ত্ব লাভ করিব, তখন আমরা জগতের দাসত্ব করিব, কিন্তু সেই দাসত্ব করাকেই বলে রাজত্ব করা। আর স্বতন্ত্র হওয়াকেই যদি স্বাধীন হওয়া বলে তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাকেই বলে, স্বাধীনতা বিনাশকেই বলে স্বাধীনতা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলাতে ছাত্রজীবন।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

এইরূপ বক্তৃতা শুনিয়া, প্রশ্নোত্তর শ্রেণীতে শিক্ষা পাইয়া, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ছাত্রদিগের যেরূপ জ্ঞান-লাভ হয়, তাহা ছাড়া আবার যাহাতে তাহারা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সমূহ নিজ হাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহার কার্য্যকারী জ্ঞান লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশে বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই ছাত্রদিগের নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখার শ্রেণী আছে। এইরূপ শ্রেণীতে ছাত্রেরা আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি লইয়া অধ্যাপক অথবা তাঁহাদিগের সহকারীদিগের উপদেশমতে আলোচ্য বিষয় সমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখে। মনেকর কোন একটী পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি কি তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা অধ্যাপক কিম্বা তাঁহার সহকারী বলিয়া দিলেন; পরে আবার ছাত্রদিগের নিকটে আসিয়া দেখেন, তাহারা কিরূপে কাজ করিতেছে; যদি কোন ছাত্র কোন বিষয় কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারে, তবে তাঁহারা তাহাকে তাহা দেখাইয়া দেন। এইরূপ শ্রেণীতে কাজ করা ভিন্ন আবার ছাত্রেরা ল্যাবরেটরীতেও কাজ করিতে পারে। ল্যাবরেটরী শব্দে বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি হাতে হাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ও যন্ত্রাদি বিশিষ্ট ঘর বুঝায়। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে অধিক বা অল্প কাল ধরিয়া ল্যাবরেটরীতে কাজ করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার নিমিত্ত, প্রকৃত শিক্ষার নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক হইতে পারে তাহা প্রায় সমুদায়ই এই কলেজে পাওয়া যায়। পদার্থ বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ কর, সেখানে দেখিতে পাইবে যে উত্তাপ, আলোক, শব্দ, তড়িৎ, চৌম্বকশক্তি, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যন্ত্রাদি সজ্জিত রহিয়াছে; জন্তু-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে যাও, সেখানে কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য, পক্ষী, গো অশ্ব, ঘোটক, বানরাদি বিবিধ প্রকার জন্তুর মৃতদেহ ও অস্থিচর্ম্মবর্ম্মাদি দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সুন্দররূপে সাজান আছে। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরী আছে। ছাত্রেরা কোন বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইলে এক, দুই কি তাহার অধিক বৎসর ধরিয়া সে বিষয়ে উপদেশ-বক্তৃতা শোনে আর ল্যাবরেটরীতে কাজ করে। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে যে সকল বক্তৃতা প্রভৃতি অন্য রকম শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা; কিন্তু অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে শুদ্ধ কেবল পরীক্ষার নিমিত্তই শিক্ষা দেন না, আর ছাত্রদিগের মধ্যেও যাহাদিগের বাস্তবিক শিক্ষা লাভের ইচ্ছা আছে তাহারা শুদ্ধ কেবল পরীক্ষা উদ্দেশ্য করিয়াই বিদ্যাভ্যাস করে না। অধ্যাপকেরা তাঁহাদিগের স্ব স্ব বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ছাত্রদিগকে শিখাইতে চেষ্টা করেন আর বুদ্ধিমান্ ও যত্নশীল ছাত্রেরাও সে গুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করে। ছাত্রেরা নিজের নিজের প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষাশালী ছাত্রেরা একটী কি দুইটী বিষয় সমধিক মনোযোগ ও যত্নের সহিত অনুশীলন করে। ছাত্রদিগকে উৎসাহ দেওয়ার নিমিত্ত ইউনিভর্সিটী কলেজে পুস্তকাদির পুরস্কার, অথবা স্বর্ণ বা রৌপ্যমেডলের পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, যাহারা এইরূপ পুরস্কার পায় না অথচ কলেজে পরীক্ষায় উত্তম শিক্ষার পরিচয় দিতে পারিয়াছে তাহাদিগকে প্রশংসা-পত্র দেওয়া হয়। যাহারা পুস্তকাদি বা মেডল পুরস্কার পায়, তাহারাও প্রশংসাপত্র পায়। ইহা ভিন্ন আবার অনেক বিষয়ে বৃত্তি আছে; এই সকল বৃত্তির নিমিত্ত হয় বিশেষ একটী পরীক্ষা দিতে হয় আর না হয় নিজে অনুসন্ধান করিয়া কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হয়, বিজ্ঞান ও কাব্য বিভাগে কয়েকটী বৃত্তি আছে সে গুলির নিমিত্ত বিশেষ কোন পরীক্ষা নাই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে যে সকল শ্রেণী আছে সে সকল শ্রেণীর পরীক্ষায় সমুদয়ে যে দুই চারি জন ছাত্র উত্তম ফল দেখায় তাহারাই এই কয়েকটী বৃত্তি পায়। কলেজের ছাত্রেরা পরীক্ষায় কি রকম ফল

দেখাইল তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত কলেজের ছাত্রদিগকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে পুরস্কার দেওয়ার নিমিত্ত একবার চিকিৎসা বিদ্যা বিভাগে আর এক বার কাব্য, বিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি সকল বিভাগে বৎসরে দুইবার সমারোহ করিয়া সভা হয়। কলেজের প্রেসিডেণ্ট্ (লর্ড্ কিম্বার্লে) অথবা অন্য কোন উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তি এই সময়ে সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ কলেজের ঐ সকল বিভাগের সাম্বাৎসরিক বিবরণী পঠিত হয়, এই বিবরণীতে কলেজের ছাত্রেরা লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কিরূপ ফল দেখাইয়াছে তাহা লেখা থাকে; পরে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে যাহারা যাহারা মেডল বা পুস্তকাদি পুরস্কার পাইবে তাহাদিগের নাম ধাম সভায় পড়িয়া তাহাদিগকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র দেওয়া হয়, আর যাহারা শুদ্ধ প্রশংসা পত্র পাইবে তাহাদিগের নাম ধাম পড়িয়া যাওয়া হয়, ইহারা পরে কোন সময়ে কলেজের অফিস্ হইতে প্রশংসা পত্র চাহিয়া লয়। কলেজে বৎসর বৎসর ক্যালেণ্ডার বহি ছাপা হয়, তাহাতে কলেজের অন্যান্য সমুদয় বৃত্তান্তের সহিত কলেজের পরীক্ষায় কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ ছাত্র উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে তাহা লেখা থাকে। এই রূপে ছাত্রদিগকে অনেক উপায় দ্বারা বিদ্যা চর্চ্চার উৎসাহ দেওয়া হয়।

কলেজে অক্টোবর মাস হইতে মার্চ্চের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত শীতাধিবেশন, আর এপ্রিল হইতে জুনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অথবা মে হইতে জুলাইয়ের শেষ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মাধিবেশন। অন্যান্য সময়ে কলেজ বন্ধ থাকে; শীতাধিবেশনে ক্রিষ্ট্ম্যাসের সময় ডিসেম্বরের শেষভাগে ও জ্যানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কলেজ বন্ধ থাকে। রবিবারে যে কলেজ বন্ধ থাকে তাহা বলা বাহুল্য। হুইট্সন্ডে নামক পর্ব্বোপলক্ষেও এক দিন ছুটী হয়। কলেজে ছুটীর সময়েও কয়েক দিন ও রবিবার ভিন্ন অন্য সকল দিনে লাইব্রেরি খোলা থাকে আর ছাত্রেরা অনেকে সেখানে বসিয়া পড়ে।

অক্টোবর মাসে কলেজ খুলিবার সময় চিকিৎসা বিদ্যা বিভাগে একটী, আর অন্যান্য সকল বিভাগে একটী সভা করা হয়; ইহাতে সাধারণতঃ অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ উপস্থিত থাকেন, অন্যান্য লোকও উপস্থিত থাকিতে পারেন; এই সভার এক জন অধ্যাপক সাধারণের বুঝিবার মত কোন একটী বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কলেজের গ্রীষ্মাধিবেশনে একদিন সন্ধ্যাবেলা একটী সভা করা হয়, তাহাতে অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে, ছাত্রদিগের অনুরোধানুসারে তাহাদিগের কোন কোন বন্ধুকে, ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। সভা উপলক্ষে কলেজের কতকগুলি ঘর উত্তম করিয়া সাজান হয়, কলেজের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কল ও যন্ত্রাদি, অণুবীক্ষণ দ্বারা দ্রষ্টব্য জীব জন্তু ও অন্যান্য পদার্থ, আর চিত্র প্রভৃতি রাখা হয়। সভাতে সঙ্গীত হয়, আর উপস্থিত ব্যক্তিদিগের ব্যবহারার্থে চা, লেমনেড, প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য ও সে সঙ্গে অনেক রকম খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করা হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সভা করিয়া কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, ছাত্রদিগের মনেরও স্ফূর্ত্তি সাধন করা হয়।

ছাত্রেরা কলেজে যে কেবল পাঠাভ্যাসেই ব্যস্ত থাকে, এমন নয়। অবকাশ মতে তাহারা শরীরের সামর্থ্য বিধায়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ভলন্টীয়ার হইয়া কলেজে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করে। ইহা ছাড়া তাহারা আপনাদিগের মধ্যে কলেজে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কয়েকটী সভা সংস্থাপন করিয়াছে। ছাত্রদিগের বাৎসরিক সভায় যন্ব্রাইট্ ও সার্ যন্ লবকের ন্যায় ব্যক্তিরাও আসিয়া সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

কলেজের সাধারণ ভার কলেজের সেক্রেটরীর হস্তে; কলেজের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভার সেই সেই বিভাগের ডীন্ ও ভাইস্-ডীনের হস্তে; এই সকল বিভাগের কোন দুই জন অধ্যাপক এই দুই পদগ্রহণ করেন।

ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্রের বিষয় দুই একটি কথা।

জগৎ বিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো কল্পনার চক্ষে রাজ্য তন্ত্রের যে উৎকর্ষ দেখিয়া যান আজ কাল ইংলণ্ডে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ইহা দেশীয়দের গৌরবের কারণ এবং বিদেশীয়দের উচ্চ আদর্শ স্বরূপ। আধুনিক ইংরাজের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন জর্ম্মাণিতে বাস করিতেন, তখন তাহাদের যে রাজ্যতন্ত্র ছিল তাহা এবং ইংলণ্ডের অদ্যকার রাজ্যতন্ত্র মূলে এক, কিন্তু সময় এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রয়োজন মত প্রথমোক্ত টিতে মধ্যে মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে যে অতি সাবধানের সহিত পরীক্ষা না করিলে এই দুইটি বস্তু যে মূলে এক তাহা হঠাৎ বোধ হয় না। কি প্রকারে যে এই সামান্য বীজ হইতে বৃহৎ শাখা উপশাখা বিশিষ্ট ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজ্যতন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে তাহার বর্ণনা আমাদের সাধ্যাতীত এবং উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। এই বিষয়ের আলোচনায় অনেক লোক তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল স্বরূপ শত শত পুস্তক প্রচলিত আছে। এই আলোচনা হইতে যে অতি উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান লাভ হয় তাহা সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন। ভূত ঘটনার আলোচনা হইতে আমরা যে উপদেশ পাই জীবনের সামান্য

দৈনিক কার্য্যে তাহার কত প্রয়োজন হয়, তাহা অনেকেই জানেন। তবে যে কোন জাতীয়-কার্য্যে ইহার অত্যন্ত প্রয়োজন হইবে তাহা কি অতি আশ্চর্য্য? এই উপদেশ অবহেলা করিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহার নিজের কোন কার্য্যে যে ভুল করেন তাহার সংশোধন সম্ভব না হইলেও ক্ষতি একজনের মাত্র। কিন্তু জাতীয় কার্য্যে কোন ভুলের ফল অতিশোচনীয়। এবিষয় ঠেকিয়া শেখা সচরাচর পোষায় না। আমাদের এই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের সময়। কতক গুলিন ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার আমরা পাইতে চলিলাম। অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য উপনিবেশে যে প্রকার প্রতিনিধি সভা আছে তাহার আদর্শে ভারতবর্ষে সভা সংস্থাপনের জন্য প্রচুর লেখালিখি চলিতেছে, এবং অল্প দিনের মধ্যে যে আমাদের এই অভিলাষটি সফল হইবে তাহা আমরা আশা করিয়া থাকি। এই আশা যে সম্পূর্ণরূপ ভ্রান্তিমূলক তাহা নিতান্ত বোধ হয় না। ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র এবং তাহার ইতিহাসের আলোচনায় যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা এই অবস্থায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডের সহিত আমাদের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাতে ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র বিষয় কতকটা মোটামুটি জ্ঞান আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক বলিলে বোধ হয় বেশি বলা হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সাধারণ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অধিক কি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও দুই এক জন এমত পাওয়া যায় যাঁহাদের এবিষয়ের জ্ঞান অত্যন্ত অস্পষ্ট। ইংরাজেরা এক্ষণে কি প্রকারে শাসিত হইতেছেন সে বিষয়ে মোটামুটি দুই একটি কথা বলা আমাদের অভিপ্রায়। ইহা পড়িয়া যদি এক জনেরও এবিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা জন্মে তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ মনে করিব। ইংলণ্ডের রাজ্য শাসন ভার রাজা বা রাণী এবং পার্লামেণ্ট নামক এক মহা সভার উপর অর্পিত আছে। অল্পের মধ্যে বলিতে গেলে কোন এক রাজ্যের শাসন কর্ত্তার তিনটি কর্ত্তব্য কার্য্য। প্রথম প্রজাদের নিমিত্ত আইন করা—দ্বিতীয়তঃ এই আইন প্রয়োগ করা—এবং তৃতীয়তঃ অন্য কোন রাজ্যের সহিত কাজ পড়িলে প্রজাদের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করা। ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্রে প্রথমটির ভার পার্লামেণ্টের এবং অন্য দুইটির ভার রাজার উপর নিহিত আছে। পার্লামেণ্ট কিন্তু যে আইনই করুন না রাজার স্বাক্ষর ব্যতীত তাহা দেশে প্রচলিত হইবার উপযুক্ত হয় না। রাজার উপর যে দুইটি বিশেষ ভার আছে সে বিষয়ে পার্লামেণ্টের মতের বিরুদ্ধাচরণ নিবারণ করিবার যে উপায় আছে তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার পূর্ব্বে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দুইট কর্ত্তব্য কার্য্য তিনি কি প্রকারে নিষ্পন্ন করেন সেই বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে অভিপ্রায় করি। অন্যান্য দেশের রাজার ক্ষমতা অসীম বলিলেই হয়। স্পষ্ট রূপে

রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে এমন কোন আইন ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যে প্রায় দেখা যায় না। সুবিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের কিছু পূর্ব্বে ফরাসী দেশে রাজার ক্ষমতার ঘোর ব্যভিচার হইয়াছিল। রুসো প্রজার স্বত্ব দাঁড় করাইবার এবং রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া লকের বিখ্যাত 'কাল্পনিক বন্দোবস্ত' (Imaginary contract) মনুষ্যের সম্মুখে নূতন করিয়া, আনয়ন করেন। ইহার মূল কথা এই যে তাঁহারা কল্পনা করিয়া লইলেন আধুনিক সমাজ স্থাপনার পূর্ব্বে অতি প্রাচীন কালে এক জন লোক প্রস্তাবিত কতকগুলিন কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করায় একদল মনুষ্য তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে। এই বন্দোবস্ত হইতেই রাজা প্রজা সম্বন্ধের সূত্রপাত। এখন যদি কোন রাজা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য না করেন তবে সেই মুহূর্ত্তেই প্রজাদের তাঁহাকে রাজ পদ হইতে বিচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এদিকে রাজারা এবং তাঁহাদের পক্ষীয় লোকেরা বলেন যে রাজার শাসন করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত কোন সময়ে কাহার সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্তের ফল নহে। তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে পদচ্যুত কবিবার অথবা তাঁহাদের কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিবার পৃথিবীতে কাহারও ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স এই কথাটি প্রথম বাহির করেন এবং সকল লোকে যাহাতে ইহা বিশ্বাস করে সেই জন্য বিশেষ চেষ্টাবান হন। এবং ইহার জন্যই তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় জেম্‌স্ ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ফরাসী দেশে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। যাহাই হউক ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর এই কথা বলিবার এখন কোন অধিকার নাই।

খ্রীষ্টীয় ১৭০১ সালে পার্লামেণ্ট বন্দ'বস্ত প্রণালী (Act of Settlement) নামক এক ব্যবস্থা করেন; তাহার দ্বারা ব্রন্‌সিক বংশীয় রাজপুত্রদিগকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত কতকগুলিন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত করাইয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন দানকরা হয়। যে মুহূর্ত্তে রাজা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহাকে সিংহাসন বিচ্যুত হইতে হইবে। প্রটেশ্‌ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে অথবা রোমান ক্যাথলিক্ ধর্ম্মাবলম্বীকে বিবাহ করিলে কেহ ইংলণ্ডের সিংহাসনারোহন করিতে পারিবেন না। দেশের অন্য সকল লোকের উপরে যে আইন চলে ইংলণ্ডের রাজা তাহার শাসন বহির্ভূত। স্পষ্টাক্ষরে লেখা না থাকিলে পার্লামেণ্টের কোন আইন রাজার উপর খাটে না। গুরুদোষে দোষী একজন লোককে রাজা স্বেচ্ছামত সম্পূর্ণরূপে মাপ করিতে পারেন। যে কোন ইংরাজকে ইনিই ডিউক, মারকুইস, কৌণ্ট, বাইকৌণ্ট এবং ব্যারন উপাধি দিতে পারেন। এই উপাধিধারী ব্যক্তিদের কতকগুলিন বিশেষ অধিকার (privileges) আছে; ক্রমে সেগুলি কতক কতক উল্লেখ করা যাইবে। ইহারা

সকলে রাজ্যের পিয়ার্স (Peers of the Realm) এই নামে খ্যাত। কোন প্রজাকে ব্যারনেট্ নাইট্ ইত্যাদি খেতাব দিতে এবং কোন বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ মেডল পেনসন্ ইত্যাদি দিতে কেবল ইনিই সক্ষম। ইহাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন প্রজা বিদেশীয় রাজা প্রদত্ত কোন খেতাব গ্রহণ করিতে পারে না। পার্লামেণ্ট ডাকিতে বা কিছু দিনের জন্য ইহার কার্য্য বন্ধ রাখিতে কি নিয়মিত সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেও ভাঙ্গিয়া দিতে, অন্য কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি সংস্থাপন এবং কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিতে কেবলইহাঁরই অধিকার আছে। ইনি অন্য রাজ্যে দূত পাঠান এবং অন্য রাজ্যের দূতের অভ্যর্থনা করেন। এই সকল কার্য্যে রাজাকে কতকগুলি লোকের পরামর্শ লইয়া চলিতে হয়। ইহারা রাজ মন্ত্রী নামে খ্যাত। রাজা কোন আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে এই মন্ত্রীদিগকে পার্লামেণ্টের নিকট তাহার জন্য হিসাব দিতে হয়। দোষ প্রমাণীকৃত হইলে মন্ত্রীরাই শাস্তি পান রাজার কিছু হয় না। ধরিয়া লওয়া হয় যে রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না। এই রাজমন্ত্রীদিগকে লইয়াই ইংলণ্ডের রাজসভা (ব্রিটীশ ক্যাবিনেট)। বলিতে গেলে এই ক্যাবিনেটই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করে। ক্যাবিনেটের ইতিহাসটি অতি চমৎকার। বহু দিবসাবধি ইংলণ্ডে গুপ্তসভা (প্রিবি কৌন্সিল) নামে একটি সভা চলিয়া আসিতেছে। রাজা সমস্ত রাজ কার্য্য সম্বন্ধে ইহার পরামর্শ লইতেন। অনেক দিন অবধি এই প্রকার চলিয়া আসে। ক্রমে সভা বড় হইয়া পড়িল। রাজার কোন লোককে সম্মানিত করিবার ইচ্ছা হইলে তাহাকে এই সভার সভ্য নিযুক্ত করিতেন। এমন একটি বড় সভাদ্বারা রাজ কার্য্য কখনই গুপ্তভাবে এবং সত্বরে সম্পন্ন হইতে পারে না দেখিয়া ক্রমে রাজা প্রয়োজন মত ইহার মধ্য হইতে জন কয়েক লোক বাছিয়া লইয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। বেকন্ এই প্রথার দোষগুণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় অতি স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় চার্লসের সময় হইতে এই মন্ত্রীসভার উপর সকলের নজর পড়িতে আরম্ভ হইল। ইহা দ্বারা ইংরাজ জাতির স্বাধীনতার গর্ব্ব সম্পূর্ণ রূপে লোপ পাইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বৃদ্ধেরা বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। তথাচ ইহার ক্ষমতা দিনে দিনে বাড়িতে চলিল এবং অবশেষে আমরা এখন দেখিতেছি যে প্রকৃত পক্ষে ইহার উপরেই রাজ্যশাসনের ভার। কিন্তু মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দেশের কোন আইনে ইহার নাম গন্ধ নাই। রাজা যাহাদিগকে এই সভার সভ্য নিযুক্ত করেন গবর্ণমেণ্টের কোন গেজেটে তাহাদের নাম বাহির হয় না। রাজার যাহাকে ইচ্ছা মন্ত্রীত্বে বরণ করিবার ক্ষমতা আছে। পরে দেখিব যে পার্লামেণ্টের সভ্য না হইলে এবং তথায় বিশেষ প্রতিপত্তি না থাকিলে কোন লোককে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় না এবং করা হইলেও তাহার দ্বারা কাজ চলে না। এই মন্ত্রী-সভার সভ্যেরা প্রায়ই রাজ্যের

ড় বড় চাকরী একটা না একটা গ্রহণ রেন। প্রিবি কৌন্সিলটি এখনও আছে কিন্তু ইহার ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য উপনিবশ এবং ভারতবর্ষের আপিল শুনা এবং াণিজ্য এবং শিক্ষার তত্ত্বাবধারণ করা পর্য্যন্ত প্রায় বোধ হয় উহার ক্ষমতার শেষ। থমোক্ত কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইবে এই ভিপ্রায়ে বেতনভোগী আইনজ্ঞ জন য়েক পণ্ডিতগণকে এই সভার সভ্য নিযুক্ত রা হয়। প্রিবি কৌন্সিলের সকল সভ্যের ামের পূর্ব্বে The Right honourable এই কয়েকটি কথা বসান হয়। রাজমন্ত্রী াত্রেই এবং রাজ্যের সকল পিয়ার্স প্রিবিকৌন্সিলের সভ্য।

এক্ষণে পার্লেমেণ্টের বিষয় গুটি কতক কথা। এই সভাটি দুই ভাগে বিভক্ত। হাউস্ অব্ লর্ড্স্ এবং হাউস্ অব্ কমন্স। মান্যে াউস্ অব্ লর্ড্স্ রাজার পরই। কিন্তু আসল ক্ষমতা ইহার বড় বেশি নাই। সকলেই বোধ হয় জানেন, সমস্ত রাজবংশীয় পুরুষগণ, দুইজন আর্চবিসপ্ চব্বিশ জন বিসপ্, ইংলণ্ডের সমস্ত পিয়ার্স, স্কট্ল্যাণ্ডের পিয়ার্সদের প্রতিনিধি ষোলজন এবং আয়ারল্যাণ্ডের ২৮ জন এই সভার সভ্য। রাজমন্ত্রীদিগের মধ্যে যিনি এই সভার সভাপতি তিনিই ইংলণ্ডের লর্ড চান্সেলার। আইনজ্ঞ ও আত্মব্যবসায়ীদিগের ইহা অপেক্ষা আর উচ্চপদ নাই। Content এবং non content এই দুইটি কথা দ্বারা কোন প্রস্তাবে সভ্যেরা তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন। টাকা কড়ির সম্বন্ধে অথবা হাউস্ অব কমন্স সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবার অধিকার এ সভার নাই। ইহার সম্পর্কে হাউস্ অব কমন্স কোন আইন করিতে পারে না। রাজ্যের মধ্যে ইহা সর্ব্বোচ্চ আদালত, ইহার উপর আর আপিল নাই। এই সভার কোন সভ্য রাজবিদ্রোহিতা অথবা অন্য কোন গুরু অপরাধ করিলে এই সভাই কেবল তাহার বিচার করিতে সক্ষম। এই সভাগৃহে একটি রাজসিংহাসন আছে। পার্লামেণ্টে আসিলে রাজা এই সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং হাউস্ অব কমন্সের সভ্যদিগকে ডাকিয়া পাঠান। তাহারা আসিয়া সভাগৃহের দরজায় দণ্ডায়মান হইলে রাজার যাহা কিছু বক্তব্য তাহা বলেন। রাজার আর বক্তব্য কি, মন্ত্রীরা যাহা শিখাইয়া দিয়াছেন তাহাই বলেন। এই সভার সভাপতি লর্ড চান্সেলার অন্যান্য সভ্যের ন্যায় কোন প্রস্তাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা করিতে হইলে তাঁহাকে তাঁহার নিজের আসনত্যাগ করিয়া ডিউকরা যেখানে বসেন সেইখানে সরিয়া যাইতে হয়। রাজসিংহাসন এবং লর্ড চান্সেলারের আসনের চতুষ্পার্শ্বে খানিকটা স্থান, কেন জানিনা, হউস অব লর্ড্সের বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা ব্যতীত হউস অব কমন্সের এবং ইহার সভ্যদের আর কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, সেগুলি সমস্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

রাজা হাউস অব লর্ড্‌স এবং হাউস অব কমন্স এই তিনটির মধ্যে শেষেরটির ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজার যাহা যাহা বিশেষ ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে সেগুলিন ক্যাবিনেটের মেম্বররা ভোগ করেন। রাজার নামে তাঁহারা আপনাদের অভিপ্রায় মত কাজ করেন। রাজা ইহাদের কোন কার্য্যে অমত প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। করিলে ইহারা চাকরী পরিত্যাগ করেন। এই স্থলে আমরা এসম্পর্কে অধিক কিছু বলিব না। যথা স্থানে এ বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হাউস্ অব লর্ড্‌সের অতি অল্পই আসল ক্ষমতা আছে। এই সম্বন্ধে অধিক বলা আর আবশ্যক করে না। এ বিষয়ে বড় বড় লোকের যাহা মত তাহা নিম্নের দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে হাউস অব লর্ড্‌সে লর্ড সেলবার্ণ রাজ্যের খরচের হিসাব দেখিবার প্রস্তাব করায় তাঁহার সহযোগীরা বলেন যে ইহা তাঁহাদের অধিকারের বহির্ভূত। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বর্ক মহোদয় হাউস অব কমন্সে তাঁহার একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

I am sure no man is more zealously attached than I am to the privileges of this House(the House of Commons) particularly in regard to the exlusive management of money. The lords have no right to the disposition, in any sense, of the public purse; but they (the lords) have gone further in self-denial than our utmost jealousy could have required. A power of examinnig accounts, to censure, correct and punish it, we never, that I know of, have thought of denying to the House Lords. It is something more than a century since we voted that body useless they have now voted themselves so.

দেখিতে দেখিতে প্রবন্ধটি কিছু বাড়িয়া পড়িয়াছে। হৌস্ অব্ কমন্সের বিষয় এবং পার্লামেণ্টের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলেও অল্প স্থানে হইবে না। এই নিমিত্ত এবারকার মত এই খানেই বন্ধ করা গেল। যদি প্রবন্ধটিকে সাধারণে পাঠ যোগ্য মনে করেন তাহা হইলে বাকি যাহা এ বিষয়ে বলিবার আছে তাহা অতি শীঘ্রই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রী—

অতিথি-আগমন।

বহু দিন পরে আজ পূরিয়ে উঠেছে প্রাণ
উন্মত্ত মধুর তানে,
বহু দিন পরে আজ ফিরেছে আনন্দ দিন
স্মৃতির স্বপন সনে!
অনন্ত নীলিমা মাঝে দুলিছে সুধাংশু তারা,
উৎসবে মেতেছে আজ,
কিরণে কিরণে আজ করিতেছে আলিঙ্গন;
আমিও তাদের মাঝ।
বিশাল নিথর ছায়া, অতল, অচিন্ত্য শূন্য
কাঁপিছে হরষ ভরে,
তন্দ্রিত সে বিশ্ব-বীণা গাহিছে অনন্ত গান
অনাদি দেবতা করে;
অতীত-তপন হতে বরষে কিরণ-কণা,
আঁধার হৃদয় পরে!

প্রফুল্ল কুসুম মালা দিগন্তে জড়ায়ে যায়,
ছায়াপথে ফুটিতেছে ফুল;
বিহ্বল মদিরা পানে ঘূর্ণিত রক্তিম আঁখি
পাগল অমর কুল;
পুলকে পূর্ণিত প্রাণ হাসিছে প্রকৃতি রাণী,
হাসিছে কুসুম বালা,
হাসিছে ধরণী রাণী দুলিছে মুকুতা মালা
জগত করিয়ে আলা;
আকুল সুরভি ভারে জড়িত জড়িত গতি
অলস সমীর;
অস্ফুট বাদিত্র ধ্বনি দুলিয়ে পরশে কানে,
শুনে তায় মানস অধীর।

নক্ষত্র নক্ষত্র সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে গায়,
শুনিছে পরাণ মোর;
কালের বিশাল চক্রে শুনিয়ে ঘর্ঘর রব
বিপুল আনন্দে ভোর;
বিস্ময় মোহের ভুলে ঘোর নিদ্রা নিমগন
শুয়ে কাল অনন্ত শয়নে,—
দূর ভবিষ্যৎ ভেদি নেহারে নয়ন মোর—
নিশি যবে পোহাবে স্বপনে,
মেলিয়া অলস আঁখি উঠিবে ঘুমন্ত কাল,
শিহরিয়ে হেরিবে তখন,
বিপুল ভীষণ চক্র ঘুরিতেছে অন্য পথে
নাহি মানে কালের বারণ!

আলোক-ঊরমি মালা ঢলিয়ে ঢলিয়ে চলে
হেরিতেছি মগ্নমনে;
সৃজন-প্রণব-বাণী অতি সে গম্ভীর ধ্বনি
পশিছে শ্রবণে।
প্রথম প্রণয় ধারা, অতি সে পবিত্র রবে
উথলে হৃদয় মাঝে;
শিশুর প্রথম হাসি, নদীর প্রথম কথা,
কানন প্রথম সাজে।

ঘূর্ণিত ঘূর্ণিত গতি ঘূর্ণিত সৃজন লয়,
ঘূর্ণিত চক্ষের পরে ;
ঘূর্ণিত তরঙ্গদল আহত হৃদয়ে আজি
অতীত-নিশ্বাস ভরে।

তুষার নীহার রাশি, উত্তুঙ্গ ধবলা গিরি,
অন্ধকার গভীর নিশায় ;
প্রভাতিছে শোকনিশি, মিলাইছে মেঘজাল
নিরমল নীলিমায় ;
তুষার স্তূপের পরে উদিতেছে শুকতারা
উজল বরণ,

শুদ্ধ সতী রমণীর মৃত পতি বক্ষ পরে
এক বিন্দু অশ্রুর মতন !

আনন্দ উচ্ছ্বাস মাঝে কেন বা বিষাদ বারি,
কেনরে কাঁদিছে প্রাণ,
আকুলিত বাষ্প ভরে না পায় দেখিতে আঁখি,
ফিরে আমি শিশুর সমান !

নিশ্বাস-আগারে আজি এসেছে অতিথিরে,
এসেছে হারাণ ধন,
সুনীল সাগর হতে গড়িয়ে এসেছে ঢেউ,—
ভাসিয়ে গিয়েছে মন !

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ভাউ সাহেবের বখর।

মহ্লাররাও শুনিয়া ভাবিলেন "ও ছেলে-মানুষ"। পরে কুচ করিয়া দুই ক্রোশ অন্তরে শিবির স্থাপন করিলেন। মহ্লাররাও মান মহত্ত্ব বিবেচনা না করিয়া শিন্দের শিবিরে চলিলেন। সংবাদ পাইয়া জনকোজী ভাবিলেন, "এখন অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত হইতেছে। নহিলে অশ্লাঘ্যতা হইবে।" জনকোজি অগ্রসর হইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দশ পনের দিন দিবারাত্রি একত্রে থাকিয়া মহ্লাররাও শিন্দের মনোবিকার দূরীভূত করিলেন এবং স্বীয় পুত্রকে শিন্দের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক দেশে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে জনকোজী নিবেদন করিলেন, "সুভেদার, তুমি আমার গুরুলোক, তুমি অটক পর্য্যন্ত দেশ জয় করিয়াছ। এক্ষণে আমার যাত্রার নিমিত্ত কোন্ রাজ্য মুক্ত?" মহ্লাররাও উত্তর দিলেন, "তোমার জন্য এক রাজ্য আছে। ভাগীরথীর উপর পুল বাঁধিয়া অযোধ্যায় যাইবে। সুজাউদ্দৌলাকে শাসন করিলে অভিষ্টানুরূপ ধন পাইবে। এ রাজ্য মুক্ত।" জনকোজী নিরুত্তর। উত্তর দিলেন, "ভাগীরথীর পুল বাঁধা কি প্রকারে ঘটিবে?" মহ্লাররাও বলিলেন, "নজীবখান রোহিলার হস্ত ধরিয়া তদ্দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধি করিবে।" জনকোজী বলিলেন, "নজীবখান রোহিলা নরাধম। গাজুদীখানের দ্বারা প্রতিপালিত হইল, তাহারই সর্ব্বনাশ করিল। তাহাত তুমি জানই। আর যদিইবা নিজ প্রয়োজন অনুরোধে তাহার সহিত মিত্রতা করি তাহা হইলেও স্বামীদ্রোহীতা হয়। তিনি আমাকে নজীবখানের প্রতি যুদ্ধ যাত্রার আজ্ঞা দিয়াছেন। এক্ষণে এ প্রকার কর্ম্ম করিলে আমি স্পষ্টরূপে স্বামীদ্রোহী হই। আমি কোন প্রধান কর্ম্মচারী ব্যক্তি নহি। আমি আজ্ঞাধীন সামান্য ভৃত্য মাত্র। আমার এ প্রকার কার্য্য উচিত হয় না।" মহ্লাররাও উত্তর দিলেন, "বাবা, তোমার বালক-স্বভাব" অটক হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত একছত্র রাজ্য হইয়াছে। হিন্দুস্থানে একমাত্র নজীবখান খল রহিয়াছে। সে শাসিত হইলে পেশবে দূত দ্বারা আটক হইতেও কর আনাইতে পারিবেন। তখন তুমি আমি সহজেই নির্মাল্যবৎ হইয়া পড়িব। তখন কেহ খবরও লইবেনা। এই হেতু এই প্রকার খলদের রক্ষা করিয়া যাহা যাহা কর্ত্তব্য করিবে।" ইহা বলিয়া মহ্লাররাও স্বীয় পালিত পুত্র তুকোজী হোলকরকে দুই সহস্র সৈন্য সমেত রাখিয়া বিদায় লইয়া দেশে গমন করিলেন।

দত্তাজী শিন্দে দেশে ছিলেন। তিনি বিবাহ করিয়া চারি সহস্র সৈন্যসহ নারো শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া জনকোজী শিন্দের নিকটে আসিতেছিলেন। পথে রাজশ্রী দাদাসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বহু প্রকারে গৌরব করিলেন এবং জনকোজীকে নজীবখান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন দত্তাজীর নিকটেও আঁচল পাতিয়া তাহা বলিলেন। দত্তাজী মান্য করিলেন। দাদা সাহেব পুনায় পৌঁছিলেন। দত্তাজী উজ্জয়িনীতে উপনীত হইলেন। মলহাররাও উজ্জয়িনীতে গেলেন। জনকোজী শিন্দে ও মলহাররাওয়েতে ঐক্য হইয়াছে ইহা দত্তাজী পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। দত্তাজী শিন্দে অগ্রসর হইয়া বহুসম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া মলহাররাওকে উজ্জয়িনীতে আনিলেন। দুই চারি দিন একত্র থাকিয়া পান ভোজন প্রভৃতি অতিথিসৎকার করিলেন। দত্তাজী শিন্দে মলহাররাওকে প্রশ্ন করিলেন, "সুভেদার, তুমি অটক পর্য্যন্ত দেশ জয় করিয়াছ। এক্ষণে আমার যাত্রার নিমিত্ত কোন রাজ্য মুক্ত?" তখন মহ্লাররাও বলিলেন, "এ বিষয়ে জনকোজীকে বলিয়াছি আর তোমাকেও বলিতেছি যে, নজীবখান রোহিলার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহা দ্বারা ভাগীরথীর পুল প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং পরপারে অযোধ্যা, ঢাকা, বাঙ্গালা এবং কাউর দেশ পর্য্যন্ত যাত্রা করিবে। এ রাজ্য মুক্ত। যত ধন চাহ পাইবে। এবং সুজাউদ্দৌলাকে শাসন করিয়া ভাগীরথীর পরপারের অর্দ্ধ দেশ গ্রহণ করিবে। তন্মধ্যে আট দশটা বৃহৎ কেল্লা আছে তাহাতে থানা স্থাপন করিবে। তাহা হইলে সেতু বন্ধের ন্যায় তাহার উপর দিয়া যখন ইচ্ছা যাতায়াত করা যাইবে।

ইহা না করিয়া তুমি যদি নজীবখানকে শাসন কর তাহা হইলে পেশবে তোমাকে ধুতি কাচার কাজে নিযুক্ত করিবে।" এই রূপ স্পষ্ট বলিলেন। তখন এ কথা দত্তাজী শিন্দের মনে প্রবেশ করিল। স্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা জ্ঞান হইল। মহ্লা-য়রাওয়ের বাক্যেতে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। ধন যেমন লোভীর মন অধিকার করে তদ্রূপ হইল। মলহাররাও মন্ত্র দিয়া দেশে গেলেন। পরে বিঠলরাও শিবদেব দেশে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন, তিনিও ঐ কথা বলিয়া গেলেন। অগ্নিতে ঘৃত দানের ন্যায় আরও বলবৎ হইল। জনকোজীর মনে মহ্লাররাওয়ের মন্ত্রণা স্থান পায় নাই। সুভেদারের কথা রক্ষা করিলে নিমকহারামীর দায়ী হইতে হয়। আর তাহাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হইবেন? স্বামীর যাদৃশ আজ্ঞা জনকোজীর মনোবৃত্তিও তদ-নুযায়ী। এ দিকে দত্তাজী শিন্দে মলহার-রাওয়ের মন্ত্রণাকেই প্রাধান্য দিলেন।

জনকোজী শিন্দে মারয়ার প্রান্তে কার্য্যবিধি নির্দ্ধারিত করিয়া দিল্লী অভি-মুখে চলিলেন। খেড়ীতে পৌঁছিলে দত্তাজী শিন্দেও তথায় আসিলেন। খুড় ভাইপোর মিলন হইল। সে রাজ্যে তাঁহাদের কোন ভয় ছিল না এই হেতু দত্তাজী শিন্দে স্বীয় স্ত্রী ভাগীরথী বাই এবং জনকোজীর স্ত্রী কাশী বাইকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তথা হইতে কুচ করিয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দিল্লী ছাড়াইয়া লাহোর দরোজা সন্নিকটে মজনু পাহাড়ের উপরে যমুনা-তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন। গাজুদীখান উজীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জনকোজীর অভিপ্রায় এই যে, "উজীরের দ্বারা নজীবখানকে শাস্তি দিতে হইবে।" গাজুদীখানেরও তাহাই অভিলাষ। উজী-রের দ্বারা নজীবখানকে শাস্তি দেওয়ার কথা দত্তাজী শিন্দেও মুখস্থ বলেন। কিন্তু তাঁহার মনোগতভাব ভিন্নরূপ। শেষ গাজুদীখান পনের লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার পাইলেন। নিজেও সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল। দত্তাজী শিন্দে ভাবিলেন, "যে কোন ছল করিয়া হয় উজীরকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে।" এই স্থির করিয়া উজীরের উকীলকে আজ্ঞা দিলেন "পাত-শাহী-অস্ত্রমধ্যে যে দুই তোপ আকবরশাহ পাত্শাহের অধীনে ছিল সেই অটক ও ফতেনস্কর এবং অপর এক কিল্লেকুশাদ এই তিন তোপ আমাকে দিতে হইবে।" অন্যান্য তোপ যেখানে সেখানে চলিয়া গিয়াছিল। এই তিনটিমাত্র অবশিষ্ট। এ কয়টি পঞ্চধাতব সুবর্ণ সদৃশ তেজস্বী, দৈর্ঘ্য চৌদ্দহাত, পরিধি সাতহাত এমনি বৃহৎ। এক একটি নয় লক্ষ টাকার। এই তোপ চাওয়াতে গাজুদীখান বড়ই বিষাদিত হই-লেন। "প্রাণ যায় সেও স্বীকার কিন্তু এ তোপ দিতে পারিব না।" এইরূপ উত্তর আসিলে দত্তাজী শিন্দে সেনা সজ্জিত করিয়া পাতসাহী অস্ত্রাগারের দিকে চলি-লেন। গাজুদীখানের সৈন্যও প্রস্তুত হইয়া আসিল। উভয় দিক হইতে কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলিল। কিন্তু উজীরের লোক

অল্প, তাহারা স্বস্থানে সরিয়া পড়িল। সেই গোলযোগে দিল্লির এক অংশ জয়সিং-পুরের সর্ব্বনাশ হইল এবং দিল্লী সহরেরও বিনাশকাল উপস্থিত হইল।

সরোজিনী প্রয়ান।

১১ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরাজি ২৩ শে মে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। আজ শুভলগ্নে "সরো-জিনী" বাষ্পীয় পোত (ব্যাকরণ-অনুসারে বাষ্পীয়া পোতিনী) তাহার দুই সহচরী লৌহ-তরী দুই পার্শ্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। আবার, একটা অলঙ্কারের দোষ পড়িল—কর্ম্ম "ক্ষেত্র" কথাটা ব্যবহার বুঝি ঠিক শুদ্ধ হইল না--কারণ, মানুষ সম্বন্ধেই ও কথাটা সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধি-মান লোকেরা আপনি ছাড়া মানুষ মাত্রেরি সহিত গরুর সাদৃশ্য দেখিতে পান,—এই কর্ম্মক্ষেত্র আপিষকেই বলিতে পারেন। কিন্তু ষ্টীমারকেও গরু বলা যায় না, আবার জলকেও ডাঙ্গা বলা যায় না। যাত্রা যে-লগ্নেই হউক্ লেখাটা শুভলগ্নে আরম্ভ হইল না, কারণ দুছত্র না যাইতেই গোটা দুয়েক গলদ্ করিয়া বসিলাম। কিন্তু গুণগ্রাহী সুধী মরালগণ আমার এই জলযাত্রা বর্ণনার জল-টুকু পরিত্যাগ করিয়া বাকীটুকু গ্রহণ করি-বেন। রামবল, জল-যাত্রার জলই যদি বাদ দিতে হয়, তাহা হইলে ত নিতান্তই চড়ায় উঠিতে হয়, কিন্তু তাহা আমাদের মূলেই উদ্দেশ্য নহে, তবে ভগবান্ অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন এখনো ঠিক বলিতে পারি না। লেখাও যেমন, যাত্রাও তেমন, খুব যে ভাল রকমে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, কেন না—থাক্, সে কথা পরে বলা যাইবে। উল্টাপাল্টা করিয়া বলা আমার অভিপ্রায় নহে, এবং তাহাতে আমি সুদক্ষও নহি। সাহিত্যে একদল লোক আছে তাহারা আগার কথা গোড়ায় আনে, গোড়ার কথা আগায় লইয়া যায়, অথচ শেষকালে আগাগোড়া সমস্তই কেমন সোজা হইয়া আসে। ইহা এক প্রকার দিগ্‌বাজি খেলা, এইমাত্র দেখিলাম পা-দুটো আকাশের দিকে, মাথাটা মাটির দিকে, পরের মুহূর্ত্তেই দেখি আসমানের মাথা আস্‌মানেই আছে, জমির পা জমি-তেই দাঁড়াইয়া। কিন্তু এ সকল কস্‌রৎ আমার আসে না, সুতরাং সমস্ত আনু-পূর্ব্বিক বলিতে হইল।

পাঠকেরা এতক্ষণে ইহা নিশ্চয়ই বুঝি-য়াছেন, বর্ত্তমান লেখকের অন্যান্য নানা

প্রকার দোষ থাকিতে পারে, যথা ব্যাকরণে ভূল হয়, দুটো কথা একত্র জোটাইতে হইলে সমস্ত অলঙ্কার শাস্ত্রটা বন্ধক রাখিতে হয়, এতদ্ভিন্ন মানসিক দুর্ব্বলতাও নানাপ্রকার আছে, কিন্তু অধিক বলা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। ভূমিকা উপক্রমণিকা পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই আসল কথাটার উপরে তাঁহার কলমের অগ্রভাগ তীরের মত আসিয়া বিদ্ধ হয়। আপাততঃ মা সরস্বতীই তাহার লক্ষ্য, কারণ, আরম্ভেই তাঁহাকে সারিয়া ফেলিয়া তবে লেখা উচিত।

অয়ি শ্বেতভুজে ভারতি, শুনিয়াছিলাম তুমি সরোজবাসিনী, সরোজিনীর উপরে তুমি পায়ে পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাক, অতএব আমাদের ভরসা ছিল বিস্তর—কিন্তু আমাদের কপাল এম্‌নি, যে সমস্ত সরোজিনীতে শ্বেতভুজার উদ্দেশ পাওয়া দূরে থাকুক শ্বেতের মধ্যে যে একটা কাপ্তেন ছিল, সেবেটাও যে জাহাজ ছাড়িতে না ছাড়িতে কোথায় ভাগিল, তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না। ক্রমে শ্বেতবর্ণ ভুলিয়া যাইতেছি, দাঁত না খিঁচাইলে মনে পড়ে না। কারণ, জাহাজে পরস্পরের মুখের দিকে যখন চাহি তখন চোখে অন্ধকার ঠেকে, সেটা চোখের দোষ নহে, জাহাজের খোলের দিকে চাহি, সেখানে পাথুরে কয়লা; আর খালাসি যে কয়টা আছে তাহাদের মুখ দেখিলে রাণীগঞ্জের মনের বেদনা দূর হয়। কালো রঙ্গের জ্বালায় তুমি বাঙ্গলা মুল্লুক ছাড়িয়াছ, তুমি যে সরোজিনীতে অধিষ্ঠান কর সেখানকার ভ্রমর গুলোও এত কাল হয় না—অতএব মা তোমার ভরসা ছাড়িয়া এই খানেই তোমাকে গড় করিয়া লেখায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

কিন্তু, তামাসা বেশীক্ষণ ভাল লাগে না,—বিশেষতঃ টানাবোনা তামাসা। হাসি তামাসা অনেক সময়ে পর্দ্দার কাজ করে, হৃদয়ের বেআব্রুতা দূর করে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে সকলই শোভা পায়, কিন্তু নগ্ন প্রাণ লইয়া কিছু বাহিরে বেরোন যায় না—সে সময়ে প্রাণের উপর আবরণ দিবার জন্য গোটাকতক হাল্কা কথা গাঁথিয়া ঢিলেঢালা এক প্রকার শাদা আলখাল্লা বানাইতে হয়, সেটার রং কতকটা হাসির মত দেখায় বটে। কিন্তু সকল সময়ে এ রকম কাপড়ও জোটে না। সে অবস্থায় অসভ্যদের মত গায়ে রং করিয়া, উল্কি পরিয়া, এক ছটাক শুষ্ক দন্তচ্ছটা আধসের জলে গুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহারি ছাপ মারিয়া সমাজে বাহির হইতে হয়—কিন্তু সে হইলে কেমন সংয়ের মত দেখিতে হয়,এবং দেখিতে দেখিতে রংচং শুকাইয়া উঠে ও শরীর চচ্চড় করিতে থাকে। লেখাই লোকে দেখে, লেখকের কথা কি আর কেউ ভাবে। যখন নাটকের পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পঞ্চমদের প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা দুর্জ্জয় সিং তাঁহার সাড়ে তিন লক্ষ সৈনিকের কম্মকুহরের সুরঙ্গ পথ দিয়া হৃদয়ের বারুদখানায় জিহ্বারূপ জলন্ত দেশালাই কাঠি চালাইতেছেন, ও সাড়ে তিন লক্ষের নাক মুখ দিয়া মুহুর্মুহু জয় জয় আওয়াজ বাহির হইতেছে, তখন যে মহাকবি রামধন মুখুয্যেকে অবি-

শ্রাম ছারপোকা কামড়াইতেছে ও তাঁহার ডাবা হুঁকাটিতে জল ফিরান হয় নাই, সে কথা কি আর পাঠকের মনে আসে! উপন্যাসে ২৭৫ পৃষ্ঠায় যখন পাঠক চোখের জল আর রাখিতে পারেন না, কঠিন বুকও দেখিতে দেখিতে ফাটিয়া উঠে—তখন যে পটল নামক খুদে খোকাটি বিছানার চাদরের উপরে ভদ্রতার নিয়ন লঙ্ঘন পূর্ব্বক জগৎকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া তাহার বিরুদ্ধে গলা ছাড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার লেখক মামা কলম রাখিয়া বিষম আক্রোশে খুদি চাকরানীকে হাঁকাহাঁকি করিতেছেন, সে কথা কি কোন সমালোচকের মনে উদয় হয়, হইলেও কি সমালোচনায় তিনি এক তিল রাখিয়া কথা কন্! আমি যে আজ দুপর বেলায় একপেট আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে একটা বালিষ কোলে করিয়া জাহাজের একটি ক্ষুদ্র কামরায় বসিয়া কাগজ পেন্সিল হাতে করিয়া লিখিতে বসিয়াছি, আমার আশপাশের খবর এ লেখার মধ্যে কেহত দেখিতে পাইবেন না! কানের কাছে তিনটে মিস্ত্রি বসিয়া লোহার পাতের উপরে যে হাতুড়ি ঠুকিতেছে, দক্ষিণ পার্শ্বে অবিশ্রাম করাতের ঘস্‌ঘস্ শব্দ উঠিতেছে—তাহার উপরে আবার যে কাগজে লিখিতেছি, বাতাসে ক্রমাগত তাহার পাতা উড়াইতেছে, কোনক্রমে তাহাকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না, কোন্ মমতাবান্ পাঠক এসব কথা জানিবেন বা গ্রাহ্য করিবেন! ব্যাপারগুলি নিতান্ত ছোট নহে। আর, ছোট হইলই বা,—বড় যত বড়ই হউন না কেন, জগতের শত সহস্র ছোটগুলি তাঁহার সম্ভ্রান্ত নাকের মধ্য দিয়া শত সহস্র দড়ি চালাইয়া তাঁহাকে যে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে এ তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। ঠিক্ কোন্ মুহূর্ত্তে আমি মাথাজমার গলিতে ডান পা না বাড়াইয়া বাঁ পা বাড়াইয়াছিলাম সেই জন্য বেনেপুকুরের রাস্তায় গাড়িচাপা পড়িলাম না সে কি আমরা জানিতে পাই! দুই ঘণ্টা আগে যদি লিখিতে বসিতাম তবে ঠিক এ লেখা কখনই বাহির হইত না—তাহাতে নূতন লেখার ভঙ্গী থাকিত, আর পাঁচটা নূতন কথা থাকিত। আমার সেই দুই ঘণ্টা আগেকার সম্ভাবিত লেখা অর্থাৎ যে লেখা হইল না,সে একেবারে অনন্তকালের মধ্যে হারাইয়া গেল, হয়ত বা তাহার মধ্যে সঙ্গে আমার এক অনঙ্কুরিত কীর্ত্তি ভাসিয়া গেল। অসংখ্য সম্ভাবিত ঘটনার কণায় ঘোলা হইয়া কালস্রোত জগতের উপর দিয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে বেগ এত বেশী যে, সকল কণা থিতাইয়া পড়িবার অবসর পায় না। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত গোটাকতক সম্ভাবনামাত্র জগতের তলে রাখিয়া যাইতেছে ও অসংখ্য সম্ভাবনা, নিষ্ফল অসীমতা, কোটি কোটি নূতন যুগ যুগান্তরের বীজ লইয়া অনন্ত মরণ সাগরে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে! এই সমস্ত ক্ষুব্ধিত "হইতে পারিল না" রা মিলিয়া দল বাঁধিয়া যদি জগতে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসে তাহা হইলে জগতের কি আর কোথাও ঠাঁই থাকে! দেখ একবার কি কথা বলিতে

কি কথা আসিয়া পড়িল। এই জন্যইত বলি সম্ভাবনার কুষ্ঠি আগে হইতে কে নির্ণয় করিতে পারে! যখন ভাতের কাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলাম, তখন কে জানিত আমি জয়ঢাক বাজাইতে বসিব!

লেখার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, আমাদের যাত্রার সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। মনেত করিয়াছি বরিশালে যাইব—কিন্তু যেরূপ সম্ভাবনা প্রত্যহ দেখা যাইতেছে তাহাতে বরিশালে নাও যাইতে পারি! এমন স্থানে যাইতে পারি যেখানকার ভূগোল-বিবরণ আজও প্রস্তুত হয় নাই; সকল রাস্তা দিয়াই যেখানে যাওয়া যায়, অথচ কোন রাস্তা দিয়াই ফেরা যায় না! সেই সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে দেখিতেছি বলিয়াই লেখাটা সহজেই কেমন তামাসার মত হইয়া আসিতেছে। কারণ মরণের বাড়া আর ত তামাসা নাই! এতবড় দাম্ভিক জীবনটা যে দুইটি ক্ষুদ্র নাসাগহ্বরের মধ্য দিয়া সুট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না—পাঁচটা অঙ্ক দাপাদাপি করিয়া অবশেষে শেষ গর্ভাঙ্কে সমস্তই যে প্রহসনে পরিণত হইল, ইহার হাস্য রসটুকু আমরা ঠিক আস্বাদন করিতে পাই না, কারণ আমরা নাট্যশালার মধ্যেই বাস করি, দর্শক যদি কেহ থাকে সে বোধ করি হাসি রাখিতে পারে না! তাহার চেয়ে আমরা আপনারাই হাসিয়া লই না কেন! কাঁদিলেই ত আমাদের হার হইল, এতবড় একটা ঠাট্টা যখন ধরা পড়িল, তখন ত আমাদেরই জিত! জীবনের সিংহাসনের উপর জরী জড়ান মছলন্দ পাতিয়া আমাদিগকে পুঁতুলটির মত সমস্ত দিন কে বসাইয়া রাখিয়াছে, অবশেষে সন্ধ্যা-বেলাটিতে মছলন্দখানি তুলিয়া দেয়, দেখা যায় খানকতক চিতার কাষ্ঠ—এই ত পরিহাস; এই জন্যই ত এত বিকট অট্টহাস্য! আমরাও হাসিতেছি—হাঃ হাঃ হাঃ!

এস তবে, হাসিতে হাসিতে সকালে বাহির হওয়া যাক্! আজ এগারই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, শুনিয়াছি আজ যাত্রা শুভ। যাত্রীর দল বাড়িল। কথা ছিল আমরা তিন জনে যাইব—তিনটি সাবালক পুরুষ মানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিষ পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পরম-পরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীর নিকটে ম্লান-মুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করিতেছি, এমন কি আমার এই খঞ্জন গঞ্জন মৃগ লোচনের আশে পাশে ফোঁটা দুয়েক লোনা জলের সরঞ্জাম করা গিয়াছে, এমন সময় শুনা গেল তিনি তাঁহার দুইটি পুণ্যফল তাঁহার শ্রীমতী যথা ও শ্রীমান্ সর্ব্বস্বটিকে লইয়া আমাদের অনুবর্ত্তিনী হইবেন। অনেকটা চখের জলের আয়োজন ব্যর্থ হইল; গম্ভীর মুখে বিদায় লইবার যে একটি গুরুতর মহিমা আছে, ঠিক যাইবার সময়ে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তিনি কার মুখে শুনিয়াছেন যে আমরা যে পথে যাইতেছি, সে পথ বড় সহজ নহে, সে পথ দিয়া বরিশালে যাব বলিয়া অনেকেই বরিশালে যায় নাই এমন শুনা গিয়াছে; আমরাও পাছে সেইরূপ

ফাঁকি দিই এই সংশয়ে তিনি অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের ডান হাতের পাঁচটা ছোট ছোট সরু সরু আঙ্গুলের নখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে ঠিক আটটার সময় নখাগ্র হইতে যতগুলো বিবেচনা ও যুক্তি সংগ্রহ হইতে পারে সমস্ত নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। সকাল বেলায় কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ সুদৃশ্য তাহা নহে, বিশেষতঃ চিৎপুর রোড। সকাল বেলাকার প্রথম সূর্য্য কিরণ পড়িয়াছে, সেকরা গাড়ির আস্তাবলের উপর—আর এক সার বেলোয়ারি ঝাড়-ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর। গ্যাস ল্যাম্প গুলোর উপর সূর্য্যের আলো এমনি চিক্‌মিক্ করিতেছে সেদিকে চাহিবার যো নাই। সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকাল বেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্য্যকে মুখ ভেঙাইয়া অতিশয় চক্‌চোকে মহত্বলাভের চেষ্টায় আছে। ট্রাম গাড়ি শিষ্ দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনো যাত্রী বেশী জুটে নাই। চিৎপুরের যে ধূলাগুলো নীচে পড়িয়া থাকে মুনিসিপালিটির ঝাঁটা সে গুলোকে উপরে উঠাইয়া তাহাদের কতক অংশ আশপাশের বাড়ি ঘরের জানলা দরজার মধ্যে, কতক পান্থদের নাসিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কতক ময়রার দোকানের মিঠাইয়ের দানার দানায়, অপক্ষপাতিতার সহিত বিভাগ করিয়া দিতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ পুনশ্চ পরদিন প্রভাতের সম্মার্জনীর সম্মান অপেক্ষা করিয়া সেই রাস্তায় আসিয়া জমা হইতেছে। মুনিসিপালিটির শকট কলিকাতার পাপের বোঝা বহন করিয়া, কৃতজ্ঞ নাসিকার নধ্যে অদৃশ্য দূত সকল প্রেরণ করিয়া নিজের গৌরবে অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। যাত্রা আরম্ভেই আমাদের ফুট্ পাথের পার্শ্বে সারি সারি ছ্যাকরা গাড়ি আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং সেই অবসরে অশ্ব-চর্ম্মাবৃত চতুষ্পদ কঙ্কাল গুলা ঘাড় হেঁট্ করিয়া অত্যন্ত শুক্‌নো ঘাসের আঁটি অন্যমনস্কভাবে চিবাইতেছে; তাহাদের সেই পারমার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থ ঘাসের আঁটির সঙ্গে সমস্ত জগৎসংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা, ও সরসতা সম্বন্ধে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় নাই—অবশেষে পরম বৈরাগ্য ভরে নীরবে অহরহ নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনে রত হইয়াছে। দক্ষিণে মুসলমানের দোকানে হৃতচর্ম্ম খাসীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক খণ্ড খণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিখার উপরে ঘুর খাইতেছে—এবং বৃহৎকায় রক্তবর্ণ কেশবিহীন শ্মশ্রুলগণ বড় বড় হাতে মস্ত মস্ত রুটি সেঁকিয়া তুলিতেছে। (নোট। এইখানে একটা মস্ত তত্ত্ব লেখকের নজর এড়াইয়া গেছে—পাঠকদের চতুর্ব্বর্গ ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা অত্র নিবিষ্ট হইল। মানুষেরাও প্রত্যেকে যেন একটা মস্ত খাসীর পৃথক্ পৃথক্ টুক্‌রা,—সামাজিকতা নামক একটা অতি বৃহৎ লৌহশলা-

কার মধ্যে বিদ্ধ হইয়া এই লক্ষ লক্ষ মনুষ্য টুক্‌রা ঘেঁষাঘেঁসি অবস্থায় সংসারের অগ্নি-শিখার উপর ক্রমিক ঘুর খাইতেছে। নীতিজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে শুনা যায় যে, এই উপায়ে তাহারা উত্তরোত্তর ভারি সুস্বাদু হইয়া উঠিতেছে, এমন কি এমন আর দশ পনেরো শতাব্দী ক্রমিক সেঁক খাইলে পর সবশুদ্ধ মিলিয়া চরম সভ্যতার পরম সুগন্ধি শিক্‌কাবাব প্রস্তুত হইবে। কি সান্ত্বনার কথা! ঘোর, আরো ঘোর, পোড় আরো পোড়, সমস্ত প্রস্তুত হইলে একদিন আমাদের মাথার উপরকার এই নীলাকাশের ঢাক্‌নাটা হঠাৎ কে খুলিয়া দিবে এবং এই বসুন্ধরার গোল থালাটি হইতে বাষ্পাকুল কাবাবি গন্ধ সুরলোকের নবাবী নাসিকায় প্রবেশ করিতে থাকিবে!) কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুষ নির্ম্মানের জায়গা, কিন্তু তাহাদের চুলায় কখনো আগুন জ্বালান হয় না। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ বা হাত মুখ ধুইতেছে, কেহ বা দোকানের সম্মুখে ঝাঁট দিতেছে, দৈবাৎ কেহ বা পাকা দাড়ি লইয়া চোখে চষমা আঁটিয়া একখানা পার্সী কেতাব পড়িতেছে। সম্মুখে মস্‌জিদ্, একজন অন্ধ ভিক্ষুক মস্‌জিদের সিঁড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাবুলী ওয়ালারা কেহ পথে দাঁড়াইয়া, কেহ দোকানে বসিয়া। টেরিটি বাজারের কাছে গরুর গাড়ি-পূর্ণ শাক সব্‌জি; মুটেদের মাথায় বড় বড় ঝাঁকায় পরস্পর-বাঁধা হাঁস মুরগী প্রভৃতি স্তূপাকৃতি হইয়া চলিয়াছে; হাঁস গুলির কোমলশুভ্র দীর্ঘ ঘাড় গুলি ঝাঁকা হইতে নীচে ঝুলিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে, মুরগীরা বন্দী অবস্থায় পরস্পর ঝগড়া করিতে ত্রুটি করিতেছে না; সদয় হৃদয় মনুষ্য মহারাজারা এই অসহায়দের পরম মুক্তি দিবার জন্য জবর যজ্ঞের হুতাশন জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। আবার দক্ষিণ পার্শ্বে চাহিয়া দেখ, পাখীর দোকান। এক একটি ছোট খাঁচা কুড়ি পঁচিশটি করিয়া অরণ্যের ছোট ছোট পাখীগুলির দ্বারা একেবারে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে—অবিশ্রাম তাহারা কিচ্‌মিচ্ করিতেছে—মুনিসিপালিটির ধূলা ও খাবি খাইতেছে—আকাশের দিকে উড়িতে চাহিতেছে অথচ পাখাটুকু ছড়াইবার জায়গা নাই।

গঙ্গার ধারে কয়লা ঘাটে গিয়া পৌঁছান গেল। সমুখ হইতে ছাউনি-ওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলা দৈত্যদের পায়ের মাপে বড় বড় চটিজুতার মত দেখাইতেছে। মনে হইতেছে, তাহারা যেন হঠাৎ প্রাণ পাইয়া অনুপস্থিত চরণগুলি স্মরণ করিয়া চট্‌পট্ করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। একবার চলিতে পাইলে হয়, এইরূপ তাহাদের মুখের ভাব। একবার উঠিতেছে, যেন উঁচু হইয়া ডাঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কি না,—আবার নামিয়া পড়িতেছে। একবার আগ্রহে অধীর হইয়া জলের দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার কি মনে করিয়া অতি সন্তরণ পূর্ব্বক ডাঙ্গার দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হইতে মাটিতে পা দিতে

দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাঝি আসিয়া আমাদিগকে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। এ বলে, আমার নৌকায় আইস ও বলে, আমার নৌকায় আইস, এইরূপে মাঝির তরঙ্গে পড়িয়া আমাদের তনুর তরী একবার দক্ষিণে যায়, একবার বামে যায়, একবার মাঝখানে আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে থাকে। অবশেষে অবস্থার তোড়ে, পূর্ব্ব জন্মের বিশেষ একটা কি কর্ম্মফলে বিশেষ একটা নৌকার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গায় আজ কিছু বেশী ঢেউ দিয়াছে, বাতাসও উঠিয়াছে। এখন জোয়ার। ছোট ছোট নৌকাগুলি আজ পাল ফুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে আপনার দেমাকে আপনি কাৎ হইয়া পড়ে বা! কিন্তু আমরা কয়জন স্বভাবতঃই সাবধানী লোক, এই জন্য আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারি আমরা বাঙ্গালী;—চাণক্যের শ্লোক-পড়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতির নাড়ির সহিত আমাদের নাড়ী এক-স্রোতে জোয়ার ভাঁটা খেলাইতেছে, বুক একতালে টিপ্‌টিপ্ করিতেছে, এবং একই শব্দে কাছাকোঁচা খুলিয়া যায় ও তাড়াতাড়ি চৌকাট ডিঙ্গাইতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়ি। বিশেষতঃ আমরা নীতিজ্ঞানী তত্ত্ববিদ্ লোক এই জন্য হঠাৎ মনে হইল যে, যখন "অতি দর্পে হতা লঙ্কা" তখন "অতি দর্পে কাতা নৌকাই", বা আশ্চর্য্য কি! মাঝিদের প্রতি বিশেষ অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক বলিলাম যে, "বাপু, পাল নামাইয়া দাঁড় টানিয়া চল, কাজ কি, হঠাৎ যদি দম্‌কা বাতাস দেয়!" কিন্তু পাষণ্ড মাঝিরা বাঙ্গালীর সন্তান হইয়াও ও কথায় বেশী মনোযোগ দিল না—মনে মনে কহিলাম, আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তোমরা জলে ডুবিয়া মর'! কিন্তু সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ব্রাহ্মণের অভিশাপ সদ্য সদ্যই সফল হয় বা! একটা মস্ত ষ্টীমার দুই পাশে দুই লৌহতরী লইয়া আশপাশের ছোটখাট নৌকাগুলির প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা ভরে লোহার নাকটা আকাশে তুলিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে সধূম্র নিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মনোযোগ দিয়া দেখি আমাদেরই জাহাজ—রাখ্ রাখ্ থাম্ থাম্-ওরে, ডোবালি বুঝি—ওরে, পাল নামা, ওরে, দাঁড় টান্—ওরে বাঁয়ে যা, ওরে, ডাইনে আয়, সুমুখে যাস্‌নে, পিছনে আসিস্‌নে! মাঝি কহিল-"মহাশয়, ভয় করিবেন না, এমন ঢের বার জাহাজ ধরিয়াছি।" তখন ঠিক তর্ক করিবার সময় নয়, কিন্তু মনে মনে কহিলাম—"ঠিক কথা, ঢেরবার জাহাজ ধরিতে পার কিন্তু শেষবারের পর ইহজন্মে আর জাহাজ ধরা যায় না।" কিন্তু সে কথা না বলিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলাম। বিস্তর প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার মনুষ্য জন্ম একেবারে অস্বীকার করিয়া একই সময়ে তাহাকে গর্দ্দভ ও শূকর নামক দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রাণী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম; এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সে কোন যুক্তি প্রয়োগ করিল না, সে বুঝি তখন মনে করিতেছিল যে প্রাণীই হই না কেন, আপাততঃ প্রাণটা

থাকিলেই যথেষ্ট। কারণ, তখন জাহাজ অত্যন্ত কাছে আসিয়াছে। মনে মনে বলিলাম, হে অদৃষ্ট এই যদি তোমার লিখন ছিল যে নিজের জাহাজে লাগিয়া নিজে ডুবিব, তবে এত আয়োজনের কি আবশ্যক ছিল, বাড়ির দুয়ারের কাছে পৈতৃক পুকুরটা ছিল, সেইখানেই ডুব মারিলেই ত হইত! অনেক কষ্টে জাহাজ থামিল নৌকাটা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কথাটা ঠিক নয়, তাহার পাশে আসিয়া তুর্কি নাচন নাচিতে লাগিল। মহা গোল-যোগ বাধিল, ঢেউ খাইয়া খাইয়া নৌকার পেট ভরিয়া যাইবার যো হইল, জাহাজের উপর হইতে একটা সিঁড়ি নামাইয়া দিল। ছেলেদের প্রথমে উঠান গেল তাহার পর আমার ভাজ ঠাকুরাণী যখন বহুকষ্টে তাঁহার পূজ্য পাজোড়া স্থূল পদ্ম-দুখানি জাহাজের উপরে তুলিলেন তখন আমরাও মধুকরের মত তাহাদেরি পশ্চাতে উপরে উঠিয়া পড়িলাম। এখন মরণকে আর কে ভয় করে! জীবনের ভার অত্যন্ত দুর্ব্বহ, যমই আমাদের প্রিয়জন। এ কিন্তু শুকনো ডাঙ্গার উপরে—তার পর জলে নামিয়া যখন ঢেউ দেখা যায় তখন মনের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতান্তর উপস্থিত হয়।

ক্রমশঃ।

পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা কিরণ পদার্থ।

—:০:—

জগতের সকল পদার্থই আমরা কঠিন, তরল, ও বাষ্পময়, এই তিনের কোন না কোন অবস্থায় অবস্থিত দেখিতে পাই। এত দিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণও পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানিতেন না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ক্রুক্‌শ্ পদার্থের চতুর্থ অবস্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা যে কি নিম্নে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

পদার্থ জগৎ যে পরমাণু দ্বারা গঠিত ইহা বিজ্ঞানের একটি সামান্য সত্য। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকেই পরমাণু বলা যায়, কিন্তু এই পরমাণুর অস্তিত্ব মনশ্চক্ষু দ্বারাই ধারণা করা যাইতে পারে। অতি ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণও কোন পদার্থের পরমাণু রাশি দেখাইতে পারে না। পরমাণুসকল পদার্থ মধ্যে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থান করে না। একাধিক পরমাণু একত্রিত হইয়া একটি বিন্দু রূপে স্থিত হয়—এইরূপ পরমাণুর সম্মিলিত বিন্দুকে অণু কহে।

পদার্থ মাত্রেই এইরূপ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুরাশির সমষ্টি, এবং কি কঠিন, কি তরল, কি বাষ্পীয়, সকল অবস্থাপন্ন পদার্থের

অণুদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান ব্যবধান আছে, অণুগুলি সেই স্থান মধ্যে বিকম্পন করিতেছে। কঠিন পদার্থের অণু সকল পরস্পর এত ঘন সংলগ্ন যে তাহাদের মধ্যে কোন স্থান ব্যবধান আছে বলিয়া মনেই হয় না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কঠিনতম প্রস্তর আর মসৃণতম ধাতুও অবিচ্ছিন্ন-অন্তরায়-বিহীন, অণুময় নহে। তবে ইহাদের অণুগুলির মধ্যে স্থান ব্যবধান অতি অল্প, এবং সেই অল্প স্থানেই তাহাদের বিকম্পন আবদ্ধ ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই—কেননা পরমাণু যেমন দৃষ্টির অতীত অণুও তেমনি দৃষ্টির অতীত, অণুদিগের বিকম্পন পথও সেইরূপ দৃষ্টির অতীত, সুতরাং জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিয়াই বিজ্ঞান পূর্ব্বোক্ত রূপ অনুমান সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে।

যদি কঠিন দ্রব্যের অণুদিগের মধ্যে স্থান ব্যবধান আছে বলিয়া বুঝিতে হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে সাধারণতঃ যে পদার্থের কঠিনত্ব যত অল্প, তাহার অণুগুলি তত দূর সন্নিবিষ্ট, অর্থাৎ সেই অণুগুলির মধ্যে তত স্থান ব্যবধানের মাত্রা অধিক। সুতরাং কঠিন পদার্থের অণু বিকম্পনস্থান হইতে তরল পদার্থের অণুবিকম্পন স্থান অধিক, কেন না কঠিন পদার্থের অণু সংযোগ যত ঘন, তরল পদার্থের অণুসংযোগ তত ঘন নহে। আবার তরল পদার্থ হইতে বাষ্পীয় অণুর বিকম্পন পথ আরো প্রশস্ত, কেন না পূর্ব্বোক্ত তিন অবস্থার মধ্যে বাষ্পীয় অবস্থাতেই পদার্থের অণু সকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে গমন করে।

কিন্তু কঠিন পদার্থ-অণুর অতি ক্ষুদ্র বিকম্পন পথ হইতে বায়ু-বিরল কাচ-পাত্র মধ্যস্থ অতি লঘু বাষ্পের (গ্যাস) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত অণুবিকম্পন পথও এত দিন বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক বিন্দুমাত্র লক্ষিত হয় নাই। অনুমান ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত বসাইতে তাঁহারা এতদিন সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। ক্রুক্‌শ্ সম্প্রতি ইহাতে কৃত কার্য্য হইয়া বিজ্ঞানকে আর একটি উচ্চ সোপানের উপর দাঁড় করাইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এত দিন কোন বায়ু-নিষ্কাশণ যন্ত্র দ্বারা কাচনলকে অধিক মাত্রায় বায়ু-বিরল করা যাইত না, ক্রুক্‌শ্ যে নূতন উপায় বাহির করিয়াছেন তদ্বারা কোন নল হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বায়ু বাহির করিতে পারা যায়, এবং এইরূপে একটি কাচনলে বায়ুঅণুর সংখ্যা এত কমান যাইতে পারে যে সেই অবস্থায় অভ্যন্তরস্থ অণুদিগের বিকম্পন পথ স্পষ্ট অনুভূত হয়, কেবল ইহাই নহে, এই বিকম্পন পথের মাত্রা পর্য্যন্ত তখন মাপা যাইতে পারে।

অণুদিগের এইরূপ অতি দূর দূর অবস্থিত অবস্থাই পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। ইহাকেই কিরন্ত পদার্থ (Radiant matter) বলা যায়। কিরন্ত পদার্থ এস্থলে কিরণময় অর্থে ব্যবহৃত নহে। চতুর্থ অবস্থাপন্ন পদার্থ কতকগুলি বিশেষ নিয়মে বিকিরণ করিয়া থাকে, এই বিকিরণ হইতেই ক্রুক্‌শ্ ইহার কিরন্ত অর্থাৎ বৈকিরক এই নাম দিয়াছেন। অন্য সকল

অবস্থায়, স্থানাভাবে, চাকসংলগ্ন মৌমাছির ন্যায়,পদার্থঅণু অবিরত একটির উপর একটি আসিয়া ঝাঁকিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু চতুর্থ অবস্থায় একটি অণু আর একটি অণুর গাত্র স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে পথমুক্ত পাইয়া স্বাধীন ভাবে খানিক দূরে চলিয়া যায়, চলিয়া গিয়া আবার সেখান হইতে ফিরিতে থাকে, এবং এইরূপ গতির সময় সেই গতির পথ স্পষ্ট প্রত্যক্ষমান হয়। আরো স্পষ্ট বুঝিবার জন্য, কিরূপ পরীক্ষা দ্বারা এই বিকম্পন পথ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একটু বলা আবশ্যক।

চৌদিক-রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কোন একটি কাচের নলের দুই সীমায় মনে কর দুইটি প্ল্যাটিনম তার প্রবিষ্ট করান আছে। এই দুইটি তারকে কোন তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের সম বিষম বিদ্যুৎ যুক্ত মেরুর সহিত যুক্ত করিলে নলমধ্যস্থ তারের এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত সমরেখায় একটি আলোক উৎপন্ন হয়। কিন্তু বায়ু নিষ্কাসন যন্ত্র দ্বারা যদি এই নল বায়ু-বিরল করা যায়, নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর ২৫ ভাগের ২৪ ভাগ যদি বাহির করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে তখন এই নল মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে আর সমরেখায় আলোক লক্ষিত হইবে না। তাহার পরিবর্ত্তে তাহাতে নলের সমস্ত অভ্যন্তর সমান রূপে একটি গোলাপ বর্ণের আভায় প্রজ্জলিত হইবে। কিন্তু ক্রুক্‌শের আবিষ্কৃত উপায় দ্বারা সেই নলে অধিকতর বায়ু বিরলতা উৎপাদন করিলে আর একটি সম্পূর্ণ নূতন ফল দেখা যাইবে।

যদি ২৫ ভাগের ২৪ ভাগ বায়ু বাহির না করিয়া নূতনাবিষ্কৃত উপায় দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নলবায়ুর ৪০ ভাগের ৩৯ ভাগ বায়ু বাহির করা যায় তাহা হইলে সমস্ত নলের অভ্যন্তর দেশ একরূপ অস্পষ্ট আলোকপূর্ণ হইবে, কেবল বিষম মেরুতারের কাছাকাছি একটা স্থানে অন্ধকার দেখা যাইবে। কিন্তু এই অন্ধকার স্থান ও বিষম মেরুবিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গাঢ় নীল বর্ণের একটা আলোকের টুকরা দেখা যাইবে। ইহার পর যদি ৪০ ভাগের ৩৯ ভাগের স্থলে ১৬০ ভাগের ১৫৯ ভাগ বায়ু নল হইতে বাহির করিয়া ফেলা যায় তবে সমমেরুর বিস্তৃত আলোকের মাঝে মাঝে কাল রেখা পড়িতে থাকিবে—এবং পূর্ব্বোক্ত বিষমমেরুতারের অন্ধকারটির কলেবর আরো বর্দ্ধিত হইবে। ইহার পর আরো বায়ু বাহির করিয়া লইলে—সমমেরুতারের মাঝে মাঝে যে কাল রেখা দেখা গিয়াছে তাহার বিস্তৃতি ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে—এবং বিষম মেরুর অন্ধকারটিও আরো বিস্তৃত হইবে। তাহার পর নলটি আরো বায়ু বিরল কর, বিষম মেরুতারের নিকট,পূর্ব্বে যেমন একটি অন্ধকার হইয়াছে তাহার কাছাকাছি ঐরূপ আর একটি অন্ধকার হইবে, কিন্তু এই উভয় অন্ধকার স্থানের মধ্যে একটু আলো দেখা যাইবে। পশ্চাদুক্ত এই দ্বিতীয় অন্ধকারময় স্থানটি ক্রুক্‌শের নামে অভিহিত, কারণ তিনিই ইহার বিশেষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন। ক্রমে আরো বায়ু

বাহির করিয়া লইতে লইতে শেষোক্ত অন্ধকারটি বাড়িয়া বাড়িয়া সমস্ত নলটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। এই অবস্থাতেও নলটি সম্পূর্ণ বায়ু শূন্য নহে। এখন ঐ নলের ভিতর বায়ু যে অবস্থায় থাকে তাহা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা নামে কথিত হয়—এই অবস্থায় নলাভ্যন্তরস্থিত বায়ু লঘু অপেক্ষাও লঘুতম, এবং এই অবস্থাপন্ন বায়ুর অণুগুলির বিকম্পন পথ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে তাহা মাপা যাইতে পারে। নলটি উপরি উক্ত রূপে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার কারণ কি তাহা এইবার দেখা যাউক। ইহা একটি বৈদ্যুতিক নিয়ম যে, যে দ্রব্যে বিদ্যুৎ আছে, তাহাকে স্পর্শ দ্বারা অন্য দ্রব্য বিদ্যুৎযুক্ত হয়—এবং এইরূপ বিদ্যুৎযুক্ত হইয়া সে দ্রব্য অন্য কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবা মাত্র তাহাকে সেই বিদ্যুৎ দান করে—এবং এইরূপে বিদ্যুৎ গ্রহণ করিবার সময় একবার—ও দান করিবার সময় আর একবার আলোক উৎপন্ন হয়। এখন নল মধ্যস্থিত বায়ু-অণু এইরূপে মেরু তারকে স্পর্শ করিবা মাত্র একটি আলোক উৎপন্ন হয়;—তাহার পর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া অন্য অণুকে স্পর্শ করিবা মাত্র একটি আলোক উৎপন্ন হয়। যখন নল বায়ুপূর্ণ থাকে, তখন একটি অণু আর একটিকে এবং সে আর একটিকে এইরূপে একের নিকট অন্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে—যে নলটির ভিতর এক মেরুতার হইতে আর এক তার পর্য্যন্ত আলোক প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু নলটির বায়ুঅণুর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে যতই বিরল করিয়া ফেলা যায়—ততই একটি অণুর, মেরুতার হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করিয়া অন্যটির কাছে যাইতে কিছু দেরী হয় এবং তাহাকে বিদ্যুৎ দিয়া আবার মেরুতারের নিকট ফিরিয়া আসিতেও সময় লাগে, এই মধ্যবর্ত্তী দুই সময় আলোক উৎপন্ন হয় না, কাজেই মেরুর কাছে ও নলের স্থানে স্থানে অন্ধকার উৎপন্ন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে নল মধ্যে যতই বায়ু কমিতে থাকে, যতই অণুগুলির চলিবার পথ বাড়িতে থাকে, ততই একটির সহিত একটির সংঘটন বিরল হয় এবং সংঘটন জনিত আলোক উৎপাদনও ক্রমে কমিয়া মেরুতে অন্ধকার ঘনাইতে থাকে আর এই অন্ধকারের গাঢ়ত্বের ন্যূনাধিক্য অনুসারে অণুর সংখ্যা পরিমান করা যাইতে পারে। এইরূপে পাত্র মধ্যে বায়ু-অণুর সংখ্যা কমিতে কমিতে যখন নল-বায়ু একেবারে চতুর্থ অবস্থায় আসিয়া সম্পূর্ণরূপে উহার নিয়মাধীন হয়, তখন বিদ্যুৎ প্রবাহ একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়ে, তখন নলাভ্যন্তর একেবারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় তখন অণু সকল এত স্বল্পতম হইয়াছে যে একটি অণুর এক মেরু হইতে অন্য মেরুতে আসিবার সময় পথে আর কোন অণুর সহিত স্পর্শ লাভ ঘটে না।

একেবারে এইরূপ অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে সেই নল মধ্যস্থিত আলোক পরীক্ষা দ্বারা পদার্থের অনাবিকৃত কতকগুলি গুণ জানা গিয়াছে।

নলমধ্যস্থিত প্লাটিনম তারের অগ্রভাগ যদি একটি ক্ষুদ্রবিন্দু না হইয়া একটি চাকতির মত হয়, এবং সেই চাকতি নিম্নাভিমুখী করিয়া রাখা হয় তবে সেই অণুগুলি, দর্পণ হইতে আলোক বিক্ষিপ্ত হইবার ন্যায়, চাকতির গাত্র স্পর্শ করিয়া সমরেখায় বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। অন্য কথায়, স্বঅঙ্গের বিদ্যুতালোক নলের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, নলের মধ্যে উহারা নির্ঝর প্রবাহে খেলিতে থাকে। এই সময় আলোক বিশ্লেষণী যন্ত্র দ্বারা এই আলোক বিশ্লেষণ করিয়াই পদার্থের অনেক গুপ্ত ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইতেছে। এই উপায় দ্বারা ইট্রিয়াম নামে একটি নূতন ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং ভবিষ্যতে যে ইহা দ্বারা পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞান আরো বর্দ্ধিত হইবে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ এইরূপ আশা করিতেছেন।

পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে আজ ইয়োরপ এই এক নূতন জ্ঞান লাভ করিল, কিন্তু এ জ্ঞানও যে ভারতের বহু পুরাতন, তাহা শাস্ত্রের নানাস্থানীয় উল্লেখ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বৈশেষিক দর্শনের মতে পদার্থের দুইরূপ, সংঘাতরূপ ও পরমাণুরূপ। "তত্র তাবৎ পৃথিব্যাদয়ঃ নিত্যা অনিত্যাচ। পরমাণুরূপা নিত্যা, সংঘাতরূপা অনিত্যা" পদার্থ তত্বগ্রন্থ। যাহা কিছু পরমাণুর সংহতিতে গঠিত তাহাই এ মতে পদার্থের সংঘাতরূপ, সুতরাং কঠিন তরল ও বাষ্পীয় এই তিন অবস্থাই পদার্থের সংঘাতরূপ, কেন না এই তিনই পরমাণুর সংযোগ অবস্থা—কেবল এই তিনের অবস্থা ভেদে এই সংযোগের পরিমাণ মাত্র প্রভেদ। যোগ শাস্ত্র ইহা হইতে আরো অধিক দূর গিয়াছে এই শাস্ত্রের মতে পদার্থের সপ্তবিধ অবস্থা।

স্থূল (কঠিন তরল ও বায়বীয়) স্বরূপ,—সূক্ষ্ম অন্বয় ও অর্থবত্ব। *

কঠিন তরল ও বায়বীয় এই ত্রিবিধ অবস্থা সম্পন্ন পদার্থই আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট হয়—সেই জন্য এই তিন অবস্থাই স্থূল বলিয়া গণ্য। ঐ অবস্থাপন্ন পদার্থ যখন কার্য্য করে—তখন উহাদের স্বরূপ-অবস্থা। যাহা পরমাণুত্ব প্রাপ্ত হইল তাহা সূক্ষ্ম অবস্থা—অবশিষ্ট দুই অবস্থাকে আত্মার সুখ দুঃখাদিদায়ক সম্বন্ধ ধরিয়া অন্যগুলি হইতে প্রভেদ করা হয়। এইরূপে আমরা ইয়োরপের নবাবিষ্কৃত সত্য সম্বন্ধে আর্য্যদিগের স্থূল জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি।

কিন্তু প্রশ্ন এই, যদি বাস্তবিক প্রাচীন আর্য্যগণ বিজ্ঞানে এত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তবে ইয়োরপীয় শাস্ত্রকারগণের ন্যায় তাহারা কেন সে সকল বিষয় অতি সুস্পষ্ট বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই? শাস্ত্রমধ্যে তাহা এত প্রহেলিকাময় কুজ্ঝটিকায় আবদ্ধ কেন? প্রথমতঃ আমরা যে সকল শাস্ত্রমধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উল্লেখ দেখিতে পাই তাহা বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক নহে। দর্শন, পুরাণ প্রভৃতিতে,

* মাননীয় কালিবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

অন্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে, প্রসঙ্গক্রমে মাত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উল্লেখ দেখিতে পাই—সুতরাং এরূপ স্থলে ও সকল বিষয়ের বিবৃত আলোচনা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, বেশ তাহা যেন হইল কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রাচীন লুপ্তাবশিষ্ট পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতেও ত ইয়োরপ শাস্ত্রের ন্যায় আলোচ্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং বিজ্ঞানের যে যে সমস্ত পুস্তক বিনষ্ট হইয়াছে তাহাতেও যে বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ আলোচনা ছিল এমন সম্ভবে না। বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতি হইলে কি এরূপ হইত?

কিন্তু বাস্তব পক্ষে ইহা বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত অবনতির পরিচয় নহে। সত্য বটে সংস্কৃত শাস্ত্র মাত্রেরি প্রকাশ প্রণালী ইয়োরপীয় শাস্ত্র প্রণালী হইতে ভিন্ন। কি দর্শন কি বিজ্ঞান প্রত্যেক বিষয়েই ইয়োরপ শাস্ত্রকারগণ যে সিদ্ধান্তে আসিতেছেন তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান এবং সোপান গুলিতে উঠিবার নিয়ম দেখাইতেছেন—কিন্তু আর্য্যগণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সোপান—তাহার প্রণালী কিছু না বলিয়া কেবল সিদ্ধান্তটি বলিয়াই যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পাইতেছে না—কেবল সেই জ্ঞান প্রকাশের প্রণালীর অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সেই জ্ঞানশালী পণ্ডিতদিগের পুস্তকে এ অসম্পূর্ণতাটুকই বা কেন? একটু ভাবিয়া দেখিলেই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তখন পণ্ডিতদিগের যে সকল জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা হইতে সে কাহাদিগের জন্য? সাধারণ পাঠকদিগের জন্য। যাহারা যথার্থ বিদ্যাপ্রয়াসী তাহাদের জন্য নহে? যাহারা প্রকৃত পক্ষে বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষী হইত, তাহারা পুস্তক মাত্র পাঠে তাহা লাভ করিত না, গুরু স্বয়ং তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। যাহারা তত গভীর রূপে বিদ্যা শিক্ষা করিতে অপারক কিম্বা শিখিতে ইচ্ছা করে না—তাহাদিগকে স্থূল জ্ঞান দিবার জন্যই বিশেষ রূপে শাস্ত্র প্রণয়ন হইত। সুতরাং এরূপ স্থলে—সকল সিদ্ধান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ সোপান শাস্ত্রে সবিস্তার আলোচনার সার্থকতাই তাঁহারা দেখিতেন না—কেন না—কত কষ্টে কত পরিশ্রমে তাঁহারা যাহা জানিয়াছেন; পুস্তকে তাহা বুঝান অসম্ভব। সুতরাং তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলমাত্র জ্ঞানের সারাংশ মাত্র সাধারণকে জানাইয়া ক্ষান্ত থাকিতেন।

ইহা ছাড়া তখন সমাজের গঠন ভিন্ন ছিল, সভ্যতার প্রকৃতি স্বতন্ত্র ছিল। তখন বাহ্যিক পদার্থগত উন্নতি যথার্থ সভ্যতা বলিয়া গণ্য হইত না—আত্মার উন্নতিই সভ্যতার মূল ও যথার্থ সভ্যতা বলিয়া গণ্য হইত।

যেরূপ জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে—তাহাই পণ্ডিতগণ সাধারণের শিক্ষার উপযোগী ভাবিতেন, বিজ্ঞানের যে সকল অংশ, যে সকল সোপান কেবল পার্থিব পদার্থের অন্তর্গত, যাহাতে পার্থিব জ্ঞানের মাত্র উৎকর্ষ সাধন করে

তাহা তাঁহারা সাধারণকে তন্ন তন্ন রূপে বুঝাইবার আবশ্যকতাই বুঝিতেন না। বিজ্ঞান-জ্ঞানকে পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির উপায় স্বরূপ করিতে তাঁহারা যেন ঘৃণা করিতেন। আর্য্যগণের আচার, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রণালী প্রভৃতি সকলরূপ সামাজিক নিয়ম হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনই আর্য্যগণের চরম লক্ষ্যছিল। তাঁহারা জানিতেন মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পার্থিব সুখ শান্তি লাভ হইবে—কিন্তু কেবল মাত্র সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকেই যদি লোকের দৃষ্টি পড়ে তাহাতে বিপরীত ফল দর্শিবে। সুতরাং পদার্থ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও, তাহা তাঁহারা সাধারণের জন্য ব্যাখ্যা করিবার উপকারিতা দেখিতেন না, তাহা কেবল পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেই জন্য আবদ্ধ থাকিয়া যাইত। সাধারণ যাহা সহজে বুঝিতে পারিবে, যাহাতে তাহাদের যথার্থ উপকার হইবে, আত্মার উৎকর্ষ সাধনের যাহা সাহায্য করিবে, তাহাই তাঁহারা বিশেষ রূপে পুস্তকের আলোচ্য বলিয়া মনে করিতেন।

সাঙ্খ্য প্রণয়িতা কপিল বলিতেছেন সংসারের বা গৃহ কার্য্যের উন্নতি সাধক জড়-পিণ্ডের গুণাগুণ ও স্থিতি প্রকার জানিলে কি হইবে? উহা অনর্থের মূল, উহা অসার, এবং বিবেক জ্ঞানের বা তত্ত্বজ্ঞানের বাধক ভিন্ন সাধক নহে। সংসার এক প্রকার রজ্জু বিশেষ সুতরাং আপনিই আপনার বন্ধনের নিমিত্ত আয়োজন করা মূর্খের কার্য্য। অতএব যাহাদের কুতূহল নিবৃত্তি করাই অভিলষিত, শিল্প সাধন করাই যাহাদের পুরুষার্থ, চিরকাল বন্ধন দশায় থাকিতে যাহারা ক্লেশ বোধ করে না, তাহারাই উহার অনুষ্ঠান করুক, কিন্তু যাহারা জ্ঞান ভোগ করিবে, অধ্যাত্ম তত্ত্বে নিমগ্ন হইয়া আত্মাকে মুক্ত করিবে, তাহারা উহা করিবেও না জানিবেও না। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষের উপর আবার ভাসমান পদার্থের উপদেশ কি? মনুষ্য বুদ্ধিবলেই তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবে। উৎপ্রেক্ষা বা উদ্ধার করিতে পারিবে। * কপিল ত একজন দার্শনিক, তিনি একথা বলা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু ইনি একা নহেন শাস্ত্রকার মাত্রেরি যেন উহা মনোগত ভাব। তখনকার বিজ্ঞান, দর্শন ছাড়া নহে, কেন না যাঁহারা বিজ্ঞান আবিষ্কর্ত্তা তাঁহারাই প্রায় দার্শনিক ছিলেন। কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইতে, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে, তাঁহাদের যে সকল ক্ষুদ্র পথ অতিক্রম করিতে হইত তাহাতে যেরূপ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত, সেই কষ্ট ও পরিশ্রম যাহারা স্বীকার করিবে না, তাহারা তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল মাত্র ভোগ করুক, একের সিদ্ধান্ত অন্যে গ্রহণ করুক, প্রতি ক্ষুদ্র পথ দিয়া চলিতে সকলের যে সময় ক্ষেপ হইবে, বৃথা সময় ক্ষেপ হইবে (কেন না তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল গুরুর

* সাংখ্য দর্শন। শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত।

সাহায্য ব্যতীত কেবল শাস্ত্র পাঠে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে না) সেই সময় পরমার্থ চিন্তায় ক্ষেপণ করিয়া মনের উন্নতি সাধন করুক, এই অভিপ্রায়েই আর্য্য শাস্ত্রের প্রকাশ প্রণালী ইয়োরোপ শাস্ত্রের প্রকাশ প্রণালী হইতে ভিন্ন এইরূপ ধারণা হয়।

শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী।

বিদেশী ফুলের গুচ্ছ।

সিন্ধুতীরে বিষণ্ণ-হৃদয়ের গান।

(Shelley)

১

মধুর সূর্য্যের আলো, আকাশ বিমল,
সঘনে উঠিছে নাচি তরঙ্গ উজ্জ্বল।
মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ করে
সাজিয়াছে থরে থরে
ক্ষুদ্র নীল দ্বীপগুলি, শুভ্র-শৈল-শির;
কাননে কুঁড়িরে ঘিরি,
পড়িতেছে ধীরি ধীরি
পৃথিবীর অতি মৃদু নিঃশ্বাস সমীর।
একই আনন্দে যেন গায় শত প্রাণ;
বাতাসের গান আর পাখীদের গান,
সাগরের জলরব
নগরের কলরব
এসেছে কোমল হ'য়ে স্তব্ধতার সঙ্গীত সমান।

২

আমি দেখিতেছি চেয়ে সমুদ্রের জলে
শৈবাল বিচিত্র বর্ণ ভাসে দলে দলে।
আমি দেখিতেছি চেয়ে,
উপকূল পানে ধেয়ে
মুঠি মুঠি তারাবৃষ্টি করে ঢেউগুলি!
বিরলে বালুকা তীরে
একা বসে রয়েছি রে,
চারিদিকে তারাবৃষ্টি করিছে বিজুলী।
তালে তালে ঢেউগুলি করিছে উত্থান,
তাই হতে উঠিতেছে কি একটি তান!
মধুর ভাবের ভরে
হৃদয় কেমন করে
আমার সে ভাব আজি বুঝিবে কি আর
কোন প্রাণ!

৩

হায় মোর নাই আশা, নাইক আরাম,
ভিতরে নাইক শান্তি অন্তরে বিরাম।
নাই সে সন্তোষ ধন—
জ্ঞানী ঋষি যোগীগণ
ধ্যান সাধনায় যাহা পায় করতলে;
আনন্দ মগন মন
করে তারা বিচরণ
বিমল মহিমালোক অন্তরেতে জ্বলে।

নাই যশ, নাই প্রেম, নাই অবসর ;
পূর্ণ করে আছে এরা সকলেরি ঘর,
সুখে তারা হাসে খেলে,
সুখের জীবন বলে
আমার কপালে বিধি লিখিয়াছে আরেক
অক্ষর।

৪

কিন্তু নিরাশাও শান্ত হয়েছে এমন,
যেমন বাতাস এই, সলিল যেমন।
মনে হয় মাথা থুয়ে
এইখানে থাকি শুয়ে
অতিশয় শ্রান্তকায় শিশুটির মত,
কাঁদিয়া দুঃখের প্রাণ
ক'রে দিই অবসান,
যে দুঃখ বহিতে হবে, বহিয়াছি কত!
আসিবে ঘুমের মত মরণের কোল,
ধীরে ধীরে হিম হয়ে আসিবে কপোল।
মুমূর্ষু শ্রবণ তলে
মিশাইবে পলে পলে
সাগরের অবিরাম একতান অন্তিম কল্লোল!

(Mrs. Browning.)

সারাদিন গিয়েছিনু বনে,
ফুলগুলি তুলেছি যতনে।
প্রাতে মধুপানে রত
মুগ্ধ মধুপের মত
গান গাহিয়াছি আনমনে!

এখন চাহিয়া দেখি, হায়,
ফুলগুলি শুকায় শুকায়!
যত চাপিলাম মুঠি
পাপ্‌ড়িগুলি গেল টুটি,
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কি বলিছ সখা হে আমার,
ফুল নিতে যাব কি আবার!
থাক্, বঁধু, থাক্ থাক্,
আর কেহ যায় যাক্,
আমি ত যাবনা কভু আর!
শ্রান্ত এ হৃদয় অতি দীন,
পরাণ হয়েছে বলহীন।
ফুলগুলি মুঠা ভরি
মুঠায় রহিবে মরি,
আমি না মরিব যত দিন!

(Ernest Myers)

আমায় রেখ না ধ'রে আর,
আর হেথা ফুল নাহি ফুটে।
হেমন্তের পড়িছে নীহার,
আমায় রেখ না ধ'রে আর।
যাই হেথা হতে যাই উঠে,
আমার স্বপন গেছে টুটে!
কঠিন পাষাণ-পথে
যেতে হবে কোন মতে
পা দিয়েছি যবে!
একটি বসন্ত রাতে
ছিলে তুমি মোর সাথে,
পোহাল ত, চলে যাও তবে!

(Aubrey De Verr.)

প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস ;
একটি বিরল অশ্রুবারি
ধীরে ওঠে, ধীরে ঝ'রে যায় ;
শুনিলে তোমার নাম আজ,
কেবল একটুখানি লাজ—
এই শুধু বাকি আছে হায়!
আর সব পেয়েছে বিনাশ!
এককালে ছিল যে আমারি,
গেছে আজ করি পরিহাস!

(Augusta webster.)

গোলাপ হাসিয়া বলে,"আগে বৃষ্টি যাক্‌চ'লে,
দিক্ দেখা তরুণ তপন,
তখন ফুটাব এ যৌবন!"
গেল মেঘ, এল উষা, আকাশের আঁখি হতে
মুছে দিলে বৃষ্টি বারি কণা।
সেত রহিল না!
কোকিল ভাবিছে মনে,"শীত যাবে কতক্ষণে,
গাছপালা ছাইবে মুকুলে,
তখন গাহিব মন খুলে!"
কুয়াশা কাটিয়া যায়—বসন্ত হাসিয়া চায়,
কানন কুসুমে ভ'রে গেল।
সে যে ম'রে গেল!

(Hid.)

এত শীঘ্র ফুটিলি কেনরে!
ফুটিলে পড়িতে হয় ঝ'রে ;
মুকুলের দিন আছে তবু,
ফোটা ফুল ফোটেনাত আর!

বড় শীঘ্র গেলি মধুমাস,
দুদিনেই ফুরাল নিশ্বাস!
বসন্ত আবার আসে বটে,
গেল যে সে ফেরে না আবার!

(P. B. Marston.)

হাসির সময় বড় নেই,
দুদণ্ডের তরে গান গাওয়া ;
নিমেষের মাঝে চুম খেয়ে
মুহূর্ত্তে ফুরাবে চুম খাওয়া!
বেলা নাই শেষ করিবারে
অসম্পূর্ণ প্রেমের মন্ত্রনা ;
সুখস্বপ্ন পলকে ফুরায়,
তার পরে জাগ্রত যন্ত্রণা!
কিছুক্ষণ কথা ক'য়ে লও,
তাড়াতাড়ি দেখে লও মুখ ;
দুদণ্ডের খোঁজ দেখা শুনা,
ফুরাইবে খুঁজিবার সুখ।
বেলা নাই কথা কহিবারে
যে কথা কহিতে ফাটে প্রাণ ;
দেবতারে দুট কথা বলে
পূজার সময় অবসান!
কাঁদিতে রয়েছে দীর্ঘদিন,
জীবন করিতে মরুময়,
ভাবিতে রয়েছে চিরকাল,
ঘুমাইতে অনন্ত সময়!

(Victor Hugo)

বেঁচেছিল, হেসে হেসে,
খেলা ক'রে বেড়াত সে,

নাই যশ, নাই
পূর্ণ কা

তোমার ! না-হয় একটি শিশু নিলি চুরি ক'রে—
অসীম ঐশ্বর্য্য-তব
তাহে কি বাড়িল নব !
!
শ অপার ! নূতন আনন্দ কণা মিলিল কি ওরে !
ব কেড়ে নিলি ! অথচ তোমারি মত বিশাল মায়ের হিয়া,
য়ে ঢেকে দিলি ! সব শূন্য হয়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া !

শত-৩া
মহতী প্রকৃতি অয়ি,

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মণ্ডন শঙ্কর সংবাদ।

(মাধবাচার্য্যের শঙ্কর দিগ্বিজয় হইতে গৃহীত।)

শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদের নির্দ্দেশে প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া গগণপথে মণ্ডন পণ্ডিত কে জয় করিতে চলিলেন। যাইতে যাইতে মাহিস্মতী নামে এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইলেন; তথায় মণ্ডন পণ্ডিতের নিবাস। আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন চারিদিকে রত্ন খচিত অট্টালিকা। কোথাও পদ্মবন, কোথাও বা সারি সারি শালবৃক্ষ বাত্যায় আন্দোলিত; গন্ধ-বহ পদ্ম-গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়াছে। নিকটে প্রসন্ন-জলা নর্ম্মদা প্রবাহিত। নদীতীরে বসিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার সুশীতল বায়ু সেবনে পথশ্রান্তি দূর করিলেন। বিশ্রামান্তে আহ্নিক সমাপন করিয়া তিনি দ্বিপ্রহর বেলায় মণ্ডনের গৃহোদ্দেশে চলিলেন। যাইতে যাইতে পথে মণ্ডন মিশ্রের বাড়ীর দাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা জল আনিতে যাইতেছিল; দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'মণ্ডনের গৃহ কোথায়'? দাসীগণ শঙ্করের অপূর্ব্ব মুখজ্যোতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উত্তর করিল,—"বেদ স্বতই প্রমাণ, না প্রত্যক্ষাদি অপর প্রমাণাপেক্ষী, যে গৃহদ্বারে পিঞ্জরে বসিয়া শুকাঙ্গণাগণ এ সমুদায় আলোচনা করে, তাহাই মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ জানিবে। ফলদাতা স্বকৃত কর্ম্ম, না ফলদাতা ঈশ্বর, যে গৃহদ্বারে পিঞ্জরে বসিয়া শুকাঙ্গণাগণ এ সমুদয় আলোচনা করে সেই মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ

জানিবে। জগৎ নিত্য কি অনিত্য, যে গৃহদ্বারে পিঞ্জরে বসিয়া শুকাঙ্গণাগণ এ সমুদায় আলোচনা করে সেই মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ জানিবে"। দাসীদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি মণ্ডনের বহির্ব্বাটিতে যাইয়া দেখিলেন দ্বাররুদ্ধ, প্রবেশের সুবিধা নাই। তিনি যোগ বলে গগণপথে উঠিয়া অঙ্গনান্তে অবতরণ করিলেন। দেখিলেন গৃহ যেন ইন্দ্রধাম। মণ্ডনেরও মুখচ্ছবি ব্রহ্মার তুল্য তেজস্বী, তিনি তপস্যার প্রভাবে সজৈমিনি ব্যাসদেবকে সাক্ষাৎ আনিয়া যথাবিধি তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, এমন সময় শঙ্কর তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ সূত্রকার ভাষ্যকারকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। মণ্ডন সহসা একজন শিখোপবীত-বর্জ্জিত অপরিচিত সন্ন্যাসীকে ব্যাস-জৈমিনির সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। শ্রাদ্ধকালে ক্রোধ নিষিদ্ধ, হইলে কি হইবে। একে পণ্ডিত তাহাতে আবার তাঁহার সৎকর্ম্মের অভিমান, বিধি-নিষেধের ধার ধারে কে? মণ্ডন ও শঙ্করের মধ্যে তৎকালের পরস্পর প্রশ্নোত্তর অতি রহস্য পূর্ণ, একদিকে গৃহস্থাশ্রমীর অভিমান অপর দিকে সন্ন্যাসীর রসিকতা! প্রয়োজন বোধে স্থলে স্থলে মূল সংস্কৃতই অনুবাদসহ দেওয়া গেল;—

মণ্ডন। "কুতোমুণ্ডী"? অর্থাৎ, মুণ্ডী, অর্থাৎ নেড়ামাথা সন্ন্যাসী কোন পথে আসিলে?

কিন্তু শঙ্কর অর্থ করিলেন, কুতো-মুণ্ডী অর্থাৎ তোমার 'মাথা কোন পর্য্যন্ত নেড়া?'

এই অর্থ করিয়া লইয়া বলিলেন গলদেশ পর্য্যন্ত (নেড়া)।

মণ্ডন ভাবিলেন হয়ত এ আমার প্রশ্ন বুঝিতে পারে নাই। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন

"পন্থাস্তে পৃচ্ছ্যতেময়া"। অর্থ এই, তোমার পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

কিন্তু শঙ্কর অর্থ করিলেন তোমার পথকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই অর্থ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

পথ তোমায় কি বলিল?

মণ্ডন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "ত্বংমাতামুণ্ডেতি"। তুমি (শঙ্কর) মাতা-মুণ্ড।

কিন্তু শঙ্কর অর্থ করিলেন, পথ মণ্ডনকে বলিয়াছে তুমিই (মণ্ডন) মাতামুণ্ড।

শঙ্কর। বেশ বলিয়াছে। হে মণ্ডন, তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, উত্তর তোমাকেই লক্ষ্য করিবে। আমি জিজ্ঞাসাও করি নাই, উত্তরও আমাকে লক্ষ্য করে না।

মণ্ডন। "অহো পীতাকিমুস্থরা"

মণ্ডনের অভিপ্রায়, আঃ, তুমি কি সুরাপান করিয়াছ? কিন্তু শঙ্কর তাহার অর্থ করিলেন—সুরা কি পীত বর্ণ?

শঙ্কর। না, শ্বেত বর্ণ, স্মরণ করিয়া দেখ।

মণ্ডন। তোমার কি সুরার বর্ণ-জ্ঞান আছে। তবে তুমি সুরাপায়ী ভণ্ড যোগী।

শঙ্কর। আমার সুরার বর্ণজ্ঞান আছে তাহাতে দোষ হয় না, একবার দেখিবামাত্র বর্ণজ্ঞান লাভ হয়; কিন্তু তুমি যখন সুরা-পানের কথা বলিয়াছ, অবশ্য তোমার সুরার রসজ্ঞান আছে, যাহা পান ভিন্ন জন্মে না। তবে তুমি অব্রাহ্মণ।

মণ্ডন ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন "মত্তো-জাতঃ কলঞ্জাশী বিপরীতানি ভাষতে।" অর্থাৎ এব্যক্তি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া পাগল হইয়াছে, তাই প্রতি কথার বিপরীত অর্থ করিতেছে। কিন্তু শঙ্কর তাহার অর্থ করিলেন আমা হইতে-এক অভক্ষ্য ভক্ষণ শীল পুত্র জন্মিয়াছে, সে অনুচিত ভাষা ব্যবহার করে।

শঙ্কর। ঠিক হইয়াছে, যেমন তুমি পিতা, তেমনই তোমার কলঞ্জভুক সন্তান জন্মিয়াছে।

মণ্ডন। হে দুর্ব্বুদ্ধে গর্দ্দভের ও দুর্ব্বহ কন্থা ভার বহন করিতেছ, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে তোমার কি এমন অধিক ভার হইত।

শঙ্কর। হে দুর্ব্বুদ্ধে, তোমার পিতার ও দুর্ব্বহ কন্থা ভার বহন করিতেছি বটে; কিন্তু যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে স্বয়ং শ্রুতির পক্ষেই তাহা দুর্ব্বহ হইত।

মণ্ডন। ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে তুমি কতকগুলি শিষ্য আর পুস্তকের ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহাতেই তোমার শ্রুতি নিষ্ঠতার পরিচয় হইয়াছে।

শঙ্কর। গুরু শুশ্রূষার ভয়ে গুরু কুল-পরিত্যাগ করিয়া যে তুমি স্ত্রী শুশ্রূষায় রত হইয়াছ, তাহাতেই তোমার কর্ম্ম নিষ্ঠতার পরিচয় হইয়াছে।

মণ্ডন। স্ত্রীর গর্ভে তোমার জন্ম, স্ত্রী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছ, হে মূর্খ, তুমি কি অকৃতজ্ঞ, যে তাহাদেরই নিন্দা করিতেছ।

শঙ্কর। যাঁহাদের স্তন্যে তুমি পোষিত, যাঁহাদের গর্ভে তোমার উৎপত্তি হে অতি মূর্খ কোন্ লজ্জায় তুমি তাহাদের পশুর চক্ষে দেখিতেছ।

মণ্ডন। গার্হ-পত্য প্রভৃতি অগ্নির রক্ষণে যত্ন না করিয়া তুমি ইন্দ্রবধের পাতকী হইয়াছ।

শঙ্কর। পরমাত্ম-স্বরূপ না জানিয়া তুমি আত্ম-বধের পাতকী হইয়াছ।

মণ্ডন। দ্বারপাল দিগকে বঞ্চনা করিয়া চোরের মতন আসিলে কি রূপে?

শঙ্কর। ভিক্ষুক দিগকে বঞ্চনা করিয়া কোন প্রাণে তুমি চোরের মতন একাকী ভোগ কর?

মণ্ডন প্রত্যুত্তর দানে অসমর্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কর্ম্ম কালে ন সম্ভাষ্য অহং মূর্খেন সম্প্রতি'। কার্য্য কালে এখন আমার তোমার মতন মুর্খের সহিত আলাপ করা উচিত হয় না।

'সম্ভাষ্যঃ' এবং 'অহং' সন্ধি করিলে হয় সম্ভাষ্যোঽহং, কিন্তু এরূপ পদ করিলে যতি (ছন্দ) ভঙ্গ হয়। যথা, কার্য্য-কালেন সম্ভাষ্যোঽহং মূর্খেন সম্প্রতি। তাই শঙ্কর বলিলেন,

'অহো প্রকটিতং জ্ঞানং যতিভঙ্গেন ভাষিনা', কথা বলিতে ছন্দ ভঙ্গ করিয়া কি বিদ্যারই পরিচয় দিয়াছ।

কিন্তু মণ্ডন অর্থ করিলেন যতি-ভঙ্গ অর্থাৎ সন্ন্যাসী পরাজয় করিয়া কি বিদ্যারই পরিচয় দিয়াছ।

মণ্ডন। যতি ভঙ্গই আমার লক্ষ্য আমার পক্ষে যতি ভঙ্গে কি দোষ!

শঙ্কর। তবে-যতি ভঙ্গ, এই পদে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস কর। যতি ভঙ্গ অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইতে পরাজয়।

মণ্ডন। কোথায় বা বেদ আর কোথায় বা এ দুর্ব্বুদ্ধি, কোথায় বা সন্ন্যাস আর কোথায় এ কলি যুগ, বোধ হয় এব্যক্তি নিষিদ্ধ ভক্ষণের লোভে যতি বেশ ধারণ করিয়াছে।

শঙ্কর। কোথায় বা স্বর্গ আর কোথায় এ দুরাচার, কোথায় বা অগ্নিহোত্র আর কোথায় এ ঘোর কলি, মনে হয় যেন এ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আশয়ে কর্ম্মীর বেশ ধারণ করিয়াছে!

বিশ্বরূপ এইরূপে সরোষে দুর্ব্বাক্য সকল প্রয়োগ করিলে পর, এবং শঙ্করও সকৌতুকে তাহার অতি সুন্দর উত্তর প্রদান করিলে পর, জৈমিনি বিশ্বরূপের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ব্যাসদেবও তাহাকে বলিতে লাগিলেন 'বৎস অনাসক্ত তত্ত্বজ্ঞানী যোগীর প্রতি এইরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা সাধুজনের কর্ত্তব্য হয় না। বিষ্ণু স্বয়ং এই যতির বেশে তোমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা জানিয়া শীঘ্র তাঁহার অভ্যর্থনা কর।' ব্যাসের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মণ্ডন পণ্ডিত লজ্জিত হইলেন। শান্তভাবে আচমন করিয়া শঙ্করকে ভিক্ষা গ্রহণে সবিনয় অনুরোধ করিলেন। শঙ্কর উত্তর করিলেন 'হে সৌম্য বিবাদ ভিক্ষা ইচ্ছা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। যিনি পরাজিত হইবেন তিনি জেতার শিষ্য হইবেন, এই পণে বিচার করিব; এই মাত্র ভিক্ষা করি। অপর কোন ভিক্ষায় আমার স্পৃহা নাই। যদিও সন্ন্যাসীর পক্ষে তর্ক দ্বারা কোন পক্ষ আশ্রয় করা নিষিদ্ধ হয়, আমার বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কোনরূপ যশের বাসনা করি না। সংসার তাপের শান্তি স্বরূপ, সেই একমাত্র পথের তুমি নিন্দা করিয়াছ। সকল প্রকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া আমি জগতে বেদান্ত পথ প্রচার করিব। হয় তুমি সেই পথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রহণ কর, না হয় আমার সহিত বিচার কর, না হয় বল যে পরাজিত হইয়াছ।

যোগীর কথায় মণ্ডনের অভিমানে আঘাত লাগিল; স্বীয় পূর্ব্বকৃত পরাভবে বিস্মিত হইয়া মণ্ডন নিজের গৌরব সূচক বাক্যে বলিতে লাগিলেন "যদি স্বয়ং শেষও আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, বিজিত হইয়াছি এরূপ কথা এ মণ্ডন বলিবে না। অথবা বৈদিক কর্ম্ম মার্গ পরিত্যাগ করিয়া তোমার মত গ্রহণ করিবে না। কবে পণ্ডিতদিগের সহিত সমাগম হইবে, কবে তাঁহাদের সহিত নানা রসযুক্ত বাদকথা

হইবে, এই কুতূহল আমার মনে সর্ব্বদা জাগরূক। অহো, আমার জয়োৎসব অদ্য স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছে। হউক আমাদের মধ্যে বিচার, আমাদের শাস্ত্রাভ্যাসের শ্রম অদ্য সফল হউক। তোমার বাক্যরূপ নবসুধা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত, সংসারবাসী লোকে কি তাহা গ্রহণ করিবে না? এই আমি স্বয়ং কৃতান্তান্তক ঈশ্বরকেও পলকে উড়াইয়া দিতে পারি; হউক তোমায় আমায় বিচার, তুমি আমার বাক্‌চাতুরী কদাপি শোন নাই। তাহা প্রতিপক্ষের অহঙ্কার কানন বিনাশে কঠোর কুঠারবৎ। তুমি যে বাদ-দান ভিক্ষা করিয়াছ, এ অতি সামান্য কথা; শুনিবামাত্র আমি তাহা করিতে প্রস্তুত, ইহাতে আমার চির আনন্দ; তবে কি না প্রতিযোগী বাদকর্ত্তা কেহ মিলে না। বাদ করিব, কিন্তু আমাদের জয় পরাজয় স্থির করিবে কে? কেবল কণ্ঠশোষণের জন্য না হইয়া পরস্পর জয়েচ্ছায় বিবাদ করিতে হয়। আমাদের মধ্যে কিরূপ প্রতিজ্ঞা হইবে? কেইবা আমাদের মধ্যস্থ হইবে?

আমি গৃহীদিগের প্রধান, আপনিও যোগীদিগের প্রধান, জয় অথবা পরাজয়ে কোন পণ স্থির করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইব। আজ আমি কৃতার্থ হইলাম যে আর্য্যপাদ আমার সহিত বাদ প্রার্থনা করিতেছেন, কল্য বাদ কথা হইবে, এখন আমি মধ্যাহ্নিক ক্রিয়া করিতে যাই।

"হউক, কল্যই বিচার হইবে," শঙ্কর এই কথা বলিলে পর, মণ্ডন, ব্যাস ও জৈমিনিকে মধ্যস্থ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা মণ্ডন-পত্নী-দ্বয় ভারতীকে মধ্যস্থপদে নিয়োগ করিতে বলিলেন। মণ্ডনও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া মুনিত্রয়ের বিধিবৎ পূজা করিলেন। হে শিক্ষাভিমানী যুবক যদি প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখিতে চাও, তবে একবার নিজ ঘরের দিকে চক্ষু ফিরাও; আর সেই বিলাতি বৈটকখানার পুতুল পূজা করিয়া বিলাসের স্রোতে দেশ ভাসাইও না। পার্শ্বস্থ শিষ্যদ্বয় তাঁহাদের শ্রম অপনোদনের জন্য চামর ব্যজন করিতে লাগিল। ব্যাস জৈমিনি ও শঙ্কর পরস্পর কিয়ৎকাল আলাপ করিলেন। অনন্তর সকলে মণ্ডনের গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র ব্যাস ও জৈমিনির অদর্শন হইল। শঙ্কর নর্ম্মদাতীরে কোন এক দেবালয়ে অবস্থান করিলেন। এইরূপে যতি-রাজ দৈবযোগে ইতর-জন-দুর্ল্লভ ব্যাস-জৈমিনির দর্শন লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় শিষ্যদিগকে তাঁহাদের কথিত কথা সকল শুনাইয়া সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

পারমাণবিক সিদ্ধান্ত।

পদার্থ জগৎ পরমাণু দ্বারা গঠিত এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা-পদার্থদিগের গঠন, যোগ, ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় সমুদয় ঘটনা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছি। প্রায় সমুদয় পরমাণুদিগেরই এক আয়তন, অর্থাৎ কোন এক পরমাণুর যে আয়তন প্রায় অন্য কোন এক পরমাণুরও সেই আয়তন; পরমাণুদিগের যোগ দ্বারা যে অণু গঠিত হয়, সে অণু যে কয় পরমাণু দ্বারাই গঠিত হউক না কেন, তাহার আয়তন দুই পরমাণুর আয়তনের সমান। পরমাণু শব্দে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বুঝিতে হইবে, এই ক্ষুদ্রতম অংশ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু আমরা যুক্তি দ্বারা তাহার অস্তিত্ব প্রস্তাব করিয়া থাকি; মৌলিক পদার্থে পরমাণুগণ পৃথক্ পৃথক্ থাকে না, এক পরমাণু অপর এক পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া একটী অণু উৎপাদন করে, এইরূপে দুই দুই পরমাণুতে যে সকল অণু উৎপন্ন হয় তাহারা আবার পরস্পর একত্রিত হইলে পদার্থ খণ্ড উৎপন্ন হয়। এই অণুও আমাদিগের ইন্দ্রিয় গোচর নহে, ইহারও অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে। যদি কোন যৌগিক পদার্থ হইতে একটী মৌলিক পদার্থ বিচ্ছিন্ন করা যায় (যেমন উত্তপ্ত লৌহের উপর দিয়া উষ্ণজলীয় বাষ্প লইয়া গেলে ঐ বাষ্পের অক্সিজেন লৌহের সহিত যুক্ত হয় আর হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে) তাহা হইলে ঐ মৌলিক পদার্থের পরমাণুগণ হয় অন্য কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সহিত যুক্ত হয় আর তাহা না হইলে তাহাদিগের মধ্যে দুইটী দুইটী যুক্ত হইয়া ঐ মৌলিক পদার্থের একটী একটী অণু উৎপাদন করে। মৌলিক পদার্থের অণুর ন্যায় যৌগিক পদার্থের অণুও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যুক্তি দ্বারা তাহারও অস্তিত্ব প্রস্তাব করা হইয়া থাকে। আমরা অণু ও পরমাণু সম্বন্ধে এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তবে যাহাতে আমরা কথাগুলি মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে পারি সেই উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার তাহাদিগের উল্লেখ করা হইল। আমরা পূর্ব্বে পরমাণুদিগের মুখিত্বের কথা বলিয়াছি, এখন দেখা যাউক এই মুখিত্ব দ্বারা পরমাণুদিগের যোগ বিয়োগ কিরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; হাইড্রোজেন পরমাণু এক মুখী, আমরা যদি হ এই অক্ষর দ্বারা হাইড্রোজেনের এক পরমাণু বুঝাই আর হাইড্রোজেন পরমাণু এক মুখী ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত হ'য়ের পাশে

একটা রেখা টানি, যেমন হ—, তাহা হইলে যখন দুই পরমাণু হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তখন তাহাদিগের যোগ এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে হ—হ, অর্থাৎ এক পরমাণুর এক মুখিত্ব অপর পরমাণুর এক মুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেইরূপ আবার অ=অ এই চিহ্ন দ্বারা এই বুঝিতে হয় যে অক্সিজেনের দুই পরমাণু যুক্ত হইয়া তাহাদিগের একের দুই মুখিত্ব অপরের দুই মুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে; আবার ন≡ন এইরূপ চিহ্ন দ্বারা দুইটী ত্রিমুখী নাইট্রোজেন পরমাণুর, আর ক≡ক এই চিহ্ন দ্বারা দুইটী চতুর্মুখী কার্বন পরমাণুর যোগ প্রকাশিত হইতেছে। যখন এক অণু অক্সিজেন আর দুই অণু হাইড্রোজেন হইতে দুই অণু জল হয়, তখন যে যোগ ও বিয়োগ ঘটে তাহা এইরূপে দেখান যাইতে পারে, (অ=অ)+(হ−হ)+(হ−হ)= (হ−অ−হ)+(হ−অ−হ), অর্থাৎ এক 'অ' এর দ্বিমুখিত্ব অন্য 'অ' এর দ্বিমুখিত্বের সহিত যুক্ত হইয়া এক অণু অক্সিজেন হয়, সেইরূপ দুইটী একমুখী হাইড্রোজেন পরমাণুর যোগে এক অণু হাইড্রোজেন হয়। যখন এক অণু অক্সিজেন ও দুই অণু হাইড্রোজেনের যোগে দুই অণু জল হয় তখন দুই 'অ' পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে দুই 'হ' এর সহিত যুক্ত হয়; 'অ' এর দ্বিমুখিত্ব দুই 'হ' এর দুই এক মুখিত্বের সহিত মিলিত হয়। হাইড্রোজেন অণুতে দুইটী হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর অব্যবহিত ভাবে যুক্ত থাকে (হ—হ); জলের অণুতে এই দুই হাইড্রোজেন পরমাণু একটী অক্সিজেন্ পরমাণু দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধিত হয় (হ—অ—হ)। পরমাণুদিগের মুখিত্ব কিরূপে পরস্পর সম্বদ্ধিত থাকে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আর কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম বিভাগে যে চারিটী পরমাণুবর্গ দেখা যাইতেছে, তাহা দ্বারা কার্বনের চারিটী যৌগিক বস্তু বুঝান হইতেছে; প্রথমটীর নাম মার্শ গ্যাস (এই গ্যাস 'ডোবা' জায়গায় গাছের পাতা প্রভৃতি পচিয়া উৎপন্ন হয়,) ইহাতে কার্ব্বণের চতুর্মুখিত্ব চার হাইড্রোজেনের চার এক মুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে; দ্বিতীয়টীর নাম এথিলীন গ্যাস (অ্যাল্‌কোহল নামক মদ হইতে ইহা পাওয়া যায়,) ইহাতে দুই কার্ব্বণ পরমাণুর একের দ্বিমুখিত্ব অপরের দ্বিমুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে, আর উভয়ের অবশিষ্ট দুই দ্বিমুখিত্ব চার হাই-

ড্রোজেন পরমাণুর চার এক মুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে; তৃতীয়টীর নাম অ্যাসেটিলীন্ গ্যাস (যখন প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া যায়, তখন যে এক প্রকার গন্ধময় গ্যাস সলিতা হইতে উঠে তাহা এই অ্যাসেটিলীন্ গ্যাস,) ইহাতে দুই কার্ব্বণ পরমাণুর একের ত্রিমুখিত্ব অপরের ত্রিমুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে; আর উভয়ের অবশিষ্ট একমুখিত্ব এক পরমাণু হাইড্রোজেনের একমুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে; আর চতুর্থটীর নাম কার্ব্বণিক অ্যাসিড্ গ্যাস (যখন কাঠ পোড়ান যায়, তখন এই গ্যাস উৎপন্ন হয়; আমাদিগের নিশ্বাসেও এই গ্যাস বহির্গত হয়,) ইহাতে এক কার্ব্বণ পরমাণুর চতুর্মুখিত্ব দুই অক্সিজেন পরমাণুর দুই দ্বিমুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরমাণুবর্গের মধ্যে প্রথমটীর নাম নাইট্রস্ অক্সাইড, দ্বিতীয়টীর নাম অ্যামোনিয়া, তৃতীয়টীর নাম অ্যামোনিক্ ক্লোরাইড্, আর চতুর্থটীর অ্যামোনিক হাইড্রেট্ (অ্যামোনিয়া ও জলের যৌগিক;) এই চারিটী গ্যাসের গঠন উহাদিগের চিহ্ন হইতেই বুঝা যাইবেক, 'ন' দ্বারা নাইট্রোজেন, 'হ' দ্বারা হাইড্রোজেন, 'অ' দ্বারা অক্সিজেন, আর 'ক্ল' দ্বারা ক্লোরিন্ বুঝিতে হইবে, প্রথম দুই বর্গে 'ন' ত্রিমুখী, শেষ দুই বর্গে 'ন' পঞ্চমুখী; 'অ' দ্বিমুখী, 'হ' ও 'ক্ল' একমুখী। পরমাণুদিগের উত্তাপ সম্বন্ধে কয়েকটী গুণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। সমান ওজন এক ভাগ হাইড্রোজেন্ আর এক ভাগ জল, সমান পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে হইলে দেখা যায় যে তাহাতে জলের অপেক্ষা হাইড্রোজেনের ৩·৪ গুণ অধিক উত্তাপের প্রয়োজন, অর্থাৎ এক সের হাইড্রোজেন উত্তপ্ত করিতে যত উত্তাপের প্রয়োজন, ৩·৪ সের জল সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতেও তত উত্তাপের প্রয়োজন। সমান ওজন এক ভাগ অক্সিজেন আর এক ভাগ জল সমান পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে জলের যত উত্তাপ লাগিবে, অক্সিজেনের তাহার $\frac{১৭}{৮০}$ ভাগ উত্তাপ লাগিবে; অতএব এক সের জল উত্তপ্ত করিতে যত উত্তাপের প্রয়োজন ষোল সের অক্সিজেন সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে তাহা অপেক্ষা $\frac{১৭}{৮০} \times ১৬ = \frac{১৭}{৫} = \frac{৩৪}{১০} = ৩.৪$ গুণ অধিক উত্তাপের প্রয়োজন। সুতরাং এক সের হাইড্রোজেন উত্তপ্ত করিতে যত উত্তাপের প্রয়োজন ষোলসের অক্সিজেন তাহার সহিত সমান পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে তত উত্তাপের প্রয়োজন, অক্সিজেন হাইড্রোজেন্ অপেক্ষা ষোলগুণ ভারী, অতএব একসের হাইড্রোজেনের যে আয়তন ষোলসের অক্সিজেনেরও সেই আয়তন; আয়তন সমান হইলে, পরমাণু সংখ্যাও সমান; মনেকর একসের হাইড্রোজেনে মোটে স সংখ্যক পরমাণু আছে, ষোলসের অক্সিজেনেও তাহা হইলে মোটে স সংখ্যক পরমাণু আছে, অতএব দেখা যাইতেছে যে স সংখ্যক হাইড্রোজন পরমাণু আর স সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু সমান পরিমাণে উত্তপ্ত

করিতে সমান উত্তাপের প্রয়োজন, অর্থাৎ এক পরমাণু হাইড্রোজেন উত্তপ্ত করিতে যত খানি উত্তাপের প্রয়োজন এক পরমাণু অক্সিজেন সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে ততখানি উত্তাপের প্রয়োজন। এইরূপ যুক্তি দ্বারা দেখা গিয়াছে যে হাইড্রোজেন গ্যাসের এক পরমাণু উত্তপ্ত করিতে যত উত্তাপের প্রয়োজন, অন্য কোন মৌলিক গ্যাসের এক পরমাণু সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে তত উত্তাপের প্রয়োজন। এই বিষয় প্রকাশ করার নিমিত্ত এই কথা বলা হইয়া থাকে যে গ্যাস অবস্থায় সকল মৌলিক বস্তুরই পারমাণবিক উত্তাপ ৩·৪, অর্থাৎ কোন গ্যাসের এক পরমাণু উত্তপ্ত করিতে যত উত্তাপ আবশ্যক এক পরমাণুর সম আয়তন জল সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে তাহার অপেক্ষা ৩·৪ গুণ অধিক উত্তাপের আবশ্যক। যখন মৌলিক গ্যাসদিগের যোগে যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হয়, তখন ঐ যৌগিক গ্যাসের এক অণুকে উত্তপ্ত করিতে হইলে যে উত্তাপের আবশ্যক আর সম আয়তন জলকে তাহার সহিত সমান পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে যে উত্তাপের আবশ্যক এই দুয়ের প্রথমটীর দ্বিতীয়টীর সহিত যে অনুপাত তাহাকে আণবিক উত্তাপ বলে, আণবিক উত্তাপ অণুর অন্তর্গত পরমাণুদিগের পারমাণবিক উত্তাপের সমষ্টি। জলীয় বাষ্পের আণবিক উত্তাপ ৩×৩·৪=১০·২ (জলীয় বাষ্পের অণুর মধ্যে তিনটি পরমাণু আছে), অর্থাৎ এক অণু জলীয় বাষ্প কোন পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে যে উত্তাপ লাগিবে সম-আয়তন জল সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে তাহা অপেক্ষা ১০·২ গুণ অধিক উত্তাপের প্রয়োজন। যখন পরমাণুগণ পরস্পর যুক্ত হয়, তখন উত্তাপের আবির্ভাব হয়। আর যখন পরমাণুগণ পরস্পর হইতে বিযুক্ত হয় তখন উত্তাপের তিরোভাব হয়। এক কি তাহার অধিক সংখ্যক পরমাণু যখন অন্য এক কি তাহার অধিক সংখ্যক পরমাণুর সহিত যুক্ত হয়, তখন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উত্তাপ আবির্ভূত হয়; আবার যখন ঐ পরমাণু পরস্পর হইতে বিযুক্ত হয়, তখন ঠিক সেই পরিমাণ উত্তাপ তিরোভূত হয়। এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু বর্গদিগের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন; যেমন এক পরমাণু সোডিয়ম্ এক পরমাণু হাইড্রক্সিলর সহিত যুক্ত হইলে যে উত্তাপ আবির্ভূত হয়, এক পরমাণু পোটাসিয়ম আর এক পরমাণু হাইড্রক্সিল পরস্পর যুক্ত হইলে তাহার অপেক্ষা অধিক উত্তাপ আবির্ভূত হয়। এক পরমাণু হাইড্রোজেন যুক্ত এক পরমাণু অকসিজেনকে এক 'পরমাণু' হাইড্রক্সিল্ বলে। আমরা এই সে পারমাণবিক সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিলাম, ইহার প্রধান উদ্ভাবক ডল্টন নামক ইংরাজ রাসায়নিক পণ্ডিতের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে উল্লিখিত হয়।

শ্রী ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নারীনীতি, শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। আজ কাল অনেকেই আক্ষেপ করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন যে উচ্চ আদর্শনীয় প্রাচীন বঙ্গ রমণী হইতে, নবীনাগণ ক্রমেই নামিয়া পড়িতেছেন। না ইহাঁরা গৃহকার্য্যে সুদক্ষ, রমণীর কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়, না ইহাঁদের বিদ্যাশিক্ষার দিকে বিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। নভেল পড়িয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইতে পারিলে ইহাঁরা আর কিছু চাহেন না। এ কথা কতদূর সত্য কে জানে, তবে সম্পূর্ণ সত্য হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলে যদিও এখন বুঝিয়াছেন, রমণীগণ বিদ্যাশিক্ষা পাইতে যদিও আরম্ভ করিয়াছেন,—কিন্তু যে শিক্ষায় এতকাল বঙ্গ রমণী দেশের গৌরব রূপে পূজনীয়া হইয়া আসিতেছিলেন—যে সকল নৈতিক ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারা অতুলনীয় হৃদয় লাভ করিতেছিলেন—সেই সকল শিক্ষার প্রতি দারুণ অবহেলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফল যদি না ফলে তাহাই ত আশ্চর্য্য।

নারীনীতি রচয়িতা এই অবহেলার অপকারিতা হৃদয়ের সহিত বুঝিয়া ইহার অপনয়নে যত্নবান হইয়াছেন, এজন্য আমরা মনের সহিত তাহাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যে আমরা কতদূর সুখী হইয়াছি বলিতে পারি না।

যেরূপ ভাব, যেরূপ ব্যবহার, যেরূপ কর্ম্ম রমণীদের পক্ষে শোভন, যাহাতে স্ত্রীলোকদের মনের সৌন্দর্য্য একটুখানিও ফুটিয়া উঠে—তাহাই নারীনীতি বিশেষ রূপে শিক্ষা দিতেছে। এমন কি নারীদের গুরুতর কর্ত্তব্য, সন্তান পালন, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, এই সকল হইতে কাহার সহিত কিরূপ করিয়া কথা কহিলে শোভাপায় তাহা পর্য্যন্ত নারীনীতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে,—এক কথায় যে উৎকৃষ্ট হৃদয়ের জন্য বঙ্গ রমণী পুরাকাল হইতে আদরণীয় সেই

গৌরব তাঁহারা চিরকাল রক্ষা করুন নারী নীতি তাহাই চাহিতেছে।

উপদেশ হইলেই সচরাচর তাহা পড়িতে বিরক্তিকর লাগে, কিন্তু নারীনীতির উপদেশ গুলি অতি সুখপাঠ্য। ইহার ভাষা যেমন সরল, ভাবগুলি কথা গুলি তেমনি হৃদয় স্পর্শ করে। উপদেশ হইতে নিম্নে কয়েকটি এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

৩৩

"গৃহই নারীদিগের রাজ্য। সেখানে তাঁহারা ঈশ্বরীরূপে আপনার শাসন বিস্তার করিবেন। পুরুষেরা যিনি যেখানে থাকুন তাঁহাদিগকে গৃহের ঈশ্বরীর কর যোগাইতে হয়। বাহিরে যিনি মন্দ আচরণ করেন গৃহে তাঁহাকে সাধু হইতে হয়। "দরবারের" কত অন্যায় আচরণ অন্তঃপুর হইতে সংশোধিত হইয়া যায়। সমগ্র মনুষ্য জাতি নীতিতন্ত্রের প্রথম আদর্শ গৃহাভ্যন্তরে মাতার ক্রোড় হইতে প্রাপ্ত হয়। পরন্তু এক প্রকার বিবেচনায় নরপতিরাও নরদাস; যেহেতু তাঁহাদিগকে স্বস্ব রাজ্যের লোকগণের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিবিধ উপায়ে যোগাইতে হয়। সেরূপ বিচারে স্ত্রীরাও দাসী, যেহেতু তাঁহাদিগকে আপন আপন পরিবার-স্থিত পুরুষদিগের, স্ত্রীদিগের, ও শিশুদিগের প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য দ্রব্য সকল যোগাইতে হয়।

৩৪

গৃহ রাজ্যেশ্বরীগণ আপনাদের রাজ্যের পরিবারের নিয়ম সকল আপনারা স্থাপন করিবেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে পরিবারস্থ সকলের মতামত গ্রহণ করিবেন; যেহেতু রাজারাও সেরূপ করিয়া থাকেন। রাজাগণ যাহাদিগকে শাসন করেন, তাহাদের বাধ্য হইয়াই তাহাদের শাসন করেন, নতুবা তাহাদের শাসন স্থায়ী হয় না। স্ত্রীরাও তাহাই করিবেন। পরস্পর অবাধ্য হইলে কাহারো সহিত কাহারো কর্ম্ম চলে না।

৩৫

আপনাকে শাসন করিতে না পারিলে অন্যকে শাসন করা যায় না। আপনাকে বশে রাখিতে না পারিলে অন্যকে বশে রাখিবার শক্তি থাকে না। আপনি ভাল না হইলে অন্যকে ভাল করা যায় না। অতএব যদি গৃহিণী এমন ইচ্ছা করেন যে তাঁহার পরিবারস্থ সকলে তাঁহার বশে থাকিবে, তবে তিনি আপনাকে আপনার সৎচিন্তার বশীভূত করুন। সদ্বিবেচনায় সকলের মিল থাকিবে। অসদ্বিবেচনায় কাহারো সহিত কাহারো ঐক্য হয় না। যথেচ্ছাচারীর বশে কেহ থাকিতে পারে না।

৬৫

পৃথিবীতে সুখের বসন্ত সমীরণ চিরদিন

প্রবাহিত হয় না,—বসন্ত অল্পকাল থাকে, পরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র, বর্ষার প্রবল ঝঞ্ঝা, শীতের দারুণ পীড়ন সহ্য করিতে হয়। পৃথিবীতে মনুষ্যের এইরূপ সুখ দুঃখের লক্ষণ জানিবে। এখানে যাহার নিকট যে প্রত্যাশা কর তাই যে পাইবে এমন নিশ্চয় নাই। হয় ত তাহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়া বসে, এখানে গুরুজনের অনুচিত শাসন, স্বজনের পরভাব, বন্ধুর ঔদাসিন্য বা শত্রুতা, উপকৃত ব্যক্তির কৃতঘ্নতা—এ সকল বিচিত্র নহে। এখানে আপনার কোন ক্লেশ হইবে না, এমন আশা করিয়া থাকা যাইতে পারে না। অতএব ক্লেশ নিবারণের বিবিধ উপায় ও প্রক্রিয়া জানা প্রয়োজনীয়। ক্লেশ নিবারণ করিতে না পারি—অপরাজিত চিত্তে তাহা সহ্য করিব, এইরূপ সহিষ্ণুতা আবশ্যক। তাড়া তাড়ি করিলে অনেক কর্ম্ম সাধনের ব্যাঘাত হয়। সকল বিষয়ের সিদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। যে কিছু বিষয় তোমার ইচ্ছার প্রতিকূল, তাহা তখনি বিদূরিত হইবে,—যে কেহ তোমার বিরুদ্ধ আচরণ করে—অমনি দণ্ড দিতে হইবে, এ প্রবৃত্তি শ্রেয়স্কর নহে। ইহা বুঝিয়া রাখিবে এ সংসার এমন রচিত যে এখানে মিথ্যার ফল হয় না; অত্যাচারীর জয় হয় না; বক্রপথে সিদ্ধি লাভ হয় না। যদি হয়; তাহা কিছু দিনের জন্য এবং অধিকতর শাস্তির জন্য। কালেতে সত্যেরি জয় হয়; সৎ ও সাধুভাবেরি প্রতিষ্ঠা হয়! তুমি দেখ যে ব্যক্তি লোকের অহিতাচারী যে ব্যক্তি বক্রপথগামী, ইহারা কালেতে সংসার-চক্রে আপনারাই সোজা হইয়া পড়িবে। যদি তুমি সেই কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পার তাহাতে তোমারি দোষ। এমন হইলে হয় ত তুমি অপথে পদার্পণ করিবে। কিন্তু এ সকল স্থলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাতেই প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাহারো প্রতি বিদ্রোহাচরণ না করিয়া আপনার অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্ট সাধন চেষ্টা করিবে। তোমার যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমের উপর বিধাতা যখন যে ফল দিবেন, তাহাই গ্রহণ জন্য আপনার অন্তঃকরণকে প্রস্তুত রাখিবে। যে সংসারে মৃত্যুতে মানব লীলার অবসান সে স্থলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সূত্রেই যে জীবনের মালা গ্রথিত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি।"

উপরের এই কয়টিই আত্ম-সংযম সম্বন্ধে উপদেশ; স্ত্রীলোকের রূপ অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন—তাহা হইতেও একটি তুলিয়া দিতেছি।

১১৪

স্ত্রীলোকদের অলঙ্কার নানা বিধ। শরী-

রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর স্বাভাবিক অলঙ্কারও আছে। নয়নের বিনম্র দৃষ্টি, হস্ত পদের মৃদু সঞ্চালন, বসনের সম্বরণ, এ-গুলির দ্বারা অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য সাধন হয়। বিনয় সংযুক্ত সুস্বর সুমিষ্ট কথায় স্ত্রী প্রকৃতি লোকের দ্বিগুণ প্রিয় বোধ হইয়া থাকে। পুত্তলবৎ যখন তুমি দাঁড়াইয়া থাকিবে তখনি তোমাকে সুন্দর দেখা যাইবে এমন হইলে মানুষের গুণ কি হইল? যখন চাহিবে, কথা কহিবে, চলিবে, কর্ম্ম করিবে, সে সকলেতেও যেন তোমার সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হয়।"

এইরূপ উপদেশ গুলি সকলই সুন্দর সকলেই হৃদয়গ্রাহী, উদ্ধৃত করিতে গেলে আর ফুরায় না। বঙ্গের প্রতি রমণীর হাতে হাতে পুস্তক খানি শোভিত হউক, কেবল তাহাই নহে, সকল রমণীগণের মনে মনে ইহার নীতি গুলি গ্রথিত হউক, নারীনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হউক, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

প্রকৃতি বিজ্ঞান; মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ শ্রী সূর্য্যকুমার অধিকারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক অতি বিরল। এ সম্বন্ধে অন্য দুই একখানি পুস্তক যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে তাপ,আলোক,তড়িত প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়, একেবারেই আলোচনা হয় নাই; সূর্য্যকুমার বাবু তাঁহার পুস্তকে এ সকল কিছুই বাদ দেন নাই। যাহা কিছু প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত মোটামুটি তাহার সকলগুলিই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে "জড় ও জড়ের গুণ, বল ও গতির নিয়ম, কঠিন, তরল, বায়বীয় এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন জড়ের ধর্ম্ম ও কার্য্যাদি, শক্তির সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ, শব্দ, তাপ, আলোক, তাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সমূহের স্থূল স্থূল বিবরণ" সন্নিবেশিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়গুলির কারণ, ধর্ম্ম, নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করিয়াই লেখক ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্তের দ্বারা, স্থানে স্থানে প্রতিকৃতি দ্বারা পুস্তকখানি অতি সুখবোধ্য করিয়াছেন। ইহার ভাষা সুস্পষ্ট, লিখনপ্রণালী সুন্দর, প্রতিকৃতিগুলিও বাছা বাছা। প্রকৃতিবিজ্ঞান-রচয়িতা পুস্তকখানি যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত লিখিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা অতি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে সে যত্ন ও পরিশ্রম তাঁহার বিফল হয় নাই, পুস্তকখানি অল্পের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। ছাত্রবৃত্তি—ইংরাজি মধ্যবৃত্তি ও নর্ম্মালস্কুলে এই পুস্তকখানির অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত দেখিতে আমরা ইচ্ছা করি।

তপস্বিনী। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। ইহাতে সম্পাদকের নাম নাই। বর্ত্তমান বৈশাখ হইতে "শ্রী জীবনচন্দ্র ভক্ত" কর্ত্তৃক চিৎপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের দুই খানি তপস্বিনী আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। দুই সংখ্যাতে পড়িবার মত অনেক গুলি বিষয় আছে। বিশেষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ম্যাকবেথের একটি অনুবাদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অনুবাদটি করিয়া উঠিতে পারিলে একটি কাজ করা হয়। আষাঢ় মাসের তপস্বিনী এখনও হস্তগত হয় নাই। তপস্বিনীর জীবন যদি এই খানেই শেষ হইয়া থাকে ত বড় দুঃখের বিষয়। তপস্বিনী দীর্ঘায়ু হইয়া অভিলষিত উন্নতি পথে অগ্রসর হউন এই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

বস্তু বিদ্যা। মাসিক পত্রিকা। শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়া এপর্য্যন্ত মোট দুই খানি বাহির হইয়াছে। দুই খানিই আমরা পাইয়াছি এবং অন্যান্য গুলিও শীঘ্র পাইবার আশা করিতেছি। বস্তু বিদ্যার উদ্দেশ্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বস্তুর গুণাগুণ সাধারণে যতই জানিতে পারে ততই ভাল। আজ কাল এ সম্বন্ধে যে অভাব দেখিতে পাওয়া যায় বস্তু বিদ্যা তাহা ঘুচাইতে সক্ষম হইলে বিশেষ উপকার করিবে। সেই জন্য পত্রিকা খানি স্থায়ী দেখিতে আমাদের বিশেষ ইচ্ছা। এই দুই সংখ্যক বস্তু বিদ্যা পড়িতে বেশ লাগিল। তবে একটি কথা, সত্যের সহিত মিথ্যা মিশাইলে বস্তু বিদ্যার মর্য্যাদার হানি হইবে। ইন্দ্রজাল শীর্ষকে বস্তুদিগের যেরূপ গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট সত্য বলিয়া মনে হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা, লেখকও যেন সত্য বলিয়াই তাহা বুঝাইতে চাহেন। সম্পাদক ঐদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

উত্তর।

কেহ কতকগুলি প্রশ্ন, মীমাংসার অভিপ্রায়ে, ভারতীর জন্য পাঠাইয়া সেই সঙ্গে জানিতে চাহিয়াছেন, পূর্ব্বে ভারতীতে জিজ্ঞাসা শীর্ষকে যেরূপ প্রশ্ন সন্নিবেশিত করিবার নিয়ম ছিল—এখন তাহা আছে কি না।

এইখানে তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। না, সে নিয়ম একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই। তবে প্রশ্ন কারী যেরূপ প্রশ্ন লিখিয়া ভারতীর জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহা ভারতীতে স্থান দিয়া মস্তিষ্ক রোগের অপবাদ ঘাড়ে লইতে আমরা প্রস্তুত নহি।

কেহ ভুল নাবুঝেন সেই জন্য পরিশেষে বক্তব্য এই,

যেরূপ প্রশ্নের মীমাংসা যথার্থ প্রার্থনীয়, যাহার মীমাংসায় এক জনেরও একটু জ্ঞানবৃদ্ধি হইবার কথা, সেইরূপ প্রশ্ন ও তাহার উপযুক্ত উত্তর পাইলে আদরের সহিত ভারতীতে গৃহীত হইবে।

সরোজিনী প্রয়াণ।

আবার কেমন হৃদয়ের মধ্যে মেঘ করিয়া আসে—লেখার উপর গম্ভীর ছায়া পড়ে,—মনের কথাগুলি শ্রাবণের বারিধারার মত অশ্রুর আকারে ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে চায়। কিন্তু এ লেখার বাদ্‌লা কাহারো ত ভাল লাগিবে না। আমার মনের মধ্যে যাহাই হউক, আমি নিজের মেঘে পাঠকের সূর্য্যকিরণ রোধ করিয়া রাখিতে চাই না—সুতরাং নিশ্বাস ফেলিয়া আমি সরিয়া পড়িলাম, আর সমস্ত প্রকাশ হউক্! এই জন্যই ত বলি, লেখা ব্যাপারটা বড় সামান্য নয়। জাহাজটা বন্দরে বন্দরে পৌঁছাইয়া দেওয়াই যে নাবিকের একমাত্র কাজ তাহা নহে, পথের মাঝে মাঝে জলের মধ্যে নানা বিঘ্ন শিং তুলিয়া আছে, তাহাদের সকলগুলিকে এড়াইয়া যাওয়া বড় সামান্য কারখানা নহে। বলিবার কথা ঢের আছে, আবার না বলিবার কথা ততোধিক—তাহারা আপনাকেই মস্ত করিয়া তুলিবার আশায় হৃদয়ের মাঝে মাঝে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। যেমন করিয়াই চালাইতে চাই, স্রোতের বেগে লেখা তাহাদেরই ঘাড়ে গিয়া পড়ে পাঠকেরা নাবিককে গাল পাড়িতে থাকেন।

জাহাজী তুলনা দিতে গিয়া জাহাজের কথা ফের মনে পড়িল। জাহাজে ত উঠা গেল। আমাদের যাত্রার অভিমুখ দক্ষিণে। শাস্ত্রমতে সকল যাত্রারই মুখ সেই দিকে; কেবল যে পাঠক আমার এই লেখা আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন এবং লেখকের কবিত্ব শক্তি ও রচনা-পারিপাট্যের ভূয়সী প্রশংসা করিবেন—তাঁহার ভাগ্যে এই ঘোরা দাক্ষিণাত্য যাত্রা কিছু রহিয়া-বসিয়া বিলম্বে শেষ হয় যেন, লেখকও স্বয়ং সেই চালে তাঁহার সঙ্গ লইতে প্রস্তুত আছেন। যদিও স্রোত এবং বাতাস প্রতিকূলে ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর ঊর্দ্ধশুণ্ডে বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা করিয়া চত্বারিংশ তুরঙ্গ-বেগে ছুটিতে লাগিল। আমরা ছয়জন এবং জাহাজের বৃদ্ধ কর্ত্তাবাবু এই সাতজনে মিলিয়া জাহাজের কামরার সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গায় কেদারা লইয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপরে কেবল একটি ছাত আছে। সম্মুখ হইতে হু হু করিয়া বাতাস আসিয়া কানের কাছে সোঁ সোঁ করিতে লাগিল, জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফুলাইয়া তুলিয়া ফর্ ফর্ আওয়াজ করিতে লাগিল, কুপরামর্শ দিয়া আমার ভ্রাতৃজায়ার সুদীর্ঘ চুলগুলিকে বারবার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিতে লাগিল। তাহারা না কি

জাত-সাপিনীর বংশ, এই নিমিত্ত বিদ্রোহী হইয়া বেণী-বন্ধন এড়াইয়া পূজনীয়া ঠাকুরাণীর নাসাবিবর ও মুখরন্ধ্রের মধ্যে পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; আবার আর কতকগুলি উর্দ্ধমুখ হইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, মাথার উপর রীতিমত নাগলোকের উৎসব পড়িয়া গেল, কেবল বেণী নামক অজগর সাপটা শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া শত শেলে বিদ্ধ হইয়া শত পাক পাকাইয়া নির্জ্জীব ভাবে খোঁপা আকারে ভক্তিভাগিনীর ঘাড়ের কাছে লুটাইয়া রহিল। আমার দাদার দীর্ঘ আলপাকার জোব্বাটা পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা অপমান জ্ঞান করিয়া পতপতঃ শব্দে নিতান্ত পরাধীন চাপকানের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আকাশে লেজ উড়াইতে লাগিল, ও বাঙ্গালী আর্য্য-রক্তবান্ বক্তাদের মত পশ্চাতে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য অভিমানে ভারি ফুলিয়া উঠিল। আমরা সকলেই আপনাপন হৃদয়ের ভার লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে দাদা মাথাটি কাঁধের দিকে নোয়াইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন, বৌঠাকুরাণীও চুলের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া চৌকির উপরে চক্ষু মুদিলেন। জাহাজ অবিশ্রাম চলিতেছে। ঢেউগুলো চারিদিকে লাফাইয়া উঠিতেছে—তাহাদের মধ্যে এক-একটা, শুভ্র-ফণা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে—শব্দ করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে—স্পর্দ্ধা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছে—মাথার উপরে সূর্য্যকিরণ দীপ্তিমান্ চোখের মত জ্বলিতেছে—নৌকাগুলাকে কাৎ করিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে, একবার এ দেখে একবার ও দেখে, একবার এ ধারে কাৎ হয় একবার ও ধারে কাৎ হয়—মুহূর্ত্তের মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া নৌকাটাকে ঝাঁকানী দিয়া আবার কোথায় তাহারা চলিয়া যাইতেছে! আপিসের ছিপ্‌ছিপে পান্সীগুলি পালটুকু ফুলাইয়া আপনার মধুর গতির আনন্দ আপনি যেন উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছে, তাহারা মহৎ মাস্তুল-কিরীটী জাহাজের গাম্ভীর্য্য উপেক্ষা করে, ষ্টিমারের পিনাক ধ্বনিও মান্য করে না, বরঞ্চ বড় বড় জাহাজের মুখের উপরে পাল দুলাইয়া হাসিয়া রঙ্গ করিয়া চলিয়া যায় জাহাজও তাহাতে বড় অপমান জ্ঞান করে না। কিন্তু গাধাবোটের ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহাদের নড়িতে তিনঘণ্টা, তাহাদের চেহারাটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির মত—তাহারা নিজে নড়িতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে জাহাজকে সরিতে বলে—তাহারা গায়ের কাছে আসিয়া পড়িলে সেই স্পর্দ্ধা অসহ্য বোধ হয়! এমনকি একটি গাধাবোট জাহাজের অত্যন্ত কাছে আসিয়াও কোন মতে ধাক্কা এড়াইয়া গেল দেখিয়া আমার সহৃদয় ভ্রাতুষ্পুত্রটি অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিল, সে বলিল মজা হইল না। এমন সময়ে শুনা গেল আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বরাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে। শুনিয়া আমাদের ভাজ ঠাকুরা-

ণীর ঘুমের ঘোর একেবারে ছাড়িয়া গেল—তাঁহার সহসা মনে হইল যে, যে-জাহাজের কাপ্তেন নাই সে জাহাজের চলা অপেক্ষা নোঙর করিয়া থাকাই ভাল। দাদা বলিলেন তাহার আবশ্যক নাই, কাপ্তেনের নীচেকার লোকেরা কাপ্তেনের চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন নহে। কর্ত্তা বাবুরও সেই রূপ মত। বাকী সকলে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তাহাদের মনের ভিতরটা আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। তবে, দেখিলাম নাকি জাহাজটা সত্য সত্যই চলিতেছে, আর, হাঁক-ডাকেও কাপ্তেনের অভাব কিছুমাত্র টের পাওয়া যাইতেছে না, তাই চুপ মারিয়া রহিলাম। হঠাৎ জাহাজের হৃদয়ের ধুক-ধুক শব্দ বন্ধ হইয়া গেল—কল চলিতেছে না—নোঙর ফেল নোঙর ফেল বলিয়া শব্দ উঠিল—নোঙর ফেলা হইল। কলের এক জায়গায় কোথায় একটা জোড় খুলিয়া গেছে—সেটা মেরামত করিলে তবে জাহাজ চলিবে। মেরামত আরম্ভ হইল। এখন বেলা সাড়ে দশটা, দেড়টার পূর্ব্বে মেরামৎ সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছ পালা, ছায়া, কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাওবা একেবারে নদীর জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে, কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি, গাছ পালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা-বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঁকা একটা পথের মত জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁকে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙ্গা ঘাটগুলির কি শোভা! নূতন আস্ত ঘাটগুলির যে কোন শোভা নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু প্রাচীন ভাঙ্গা ঘাটগুলি অনেক দিন একত্রে বাস করাতে চারিদিকের আশপাশের সঙ্গে কেমন ভাব করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এক-পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা এক রকম ভুলিয়া যাইতে হয়, এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার

জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙ্গাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি গৃহস্থ ঘরের শ্বাশুড়ি, তিনি বড় মানুষের ঝিকে ঘরে আনিয়া, তাহাকে নিজের ঘরকন্নার উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। এখন এ পাষাণ ঘাটের মুখেও একটা কেমন কোমল স্নেহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে! গ্রামের যে সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার ভাগ্‌নে, কেহ ইহার মা মাসী। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌড়ী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারি জন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনেও নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সেখানেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষিমত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। জীর্ণদেহ অতীতের কিয়দংশ যেন বর্ত্তমানের মাঝখানে বসিয়া আছে। তাহার কি গভীর বিষাদপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য! তাহার সেই সন্ধ্যাচ্ছায়াময় বিষাদের, তাহার সেই প্রাচীনতাবেষ্টিত স্বাতন্ত্র্যের কি একটি পবিত্রতা আছে—এই গঙ্গার তীরে শ্মশানের পার্শ্বে তাহার যেমন উপযুক্ত স্থান এমন আর কোথায়! এক এক জায়গায় কতকটা লে.কালয়ের মত—জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙ্গায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়েঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোনটা কোনটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু আপন মনে চরিয়া বেড়াইতেছে—গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্ম্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একটা উলঙ্গছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া কোনের ক্ষেতের সমুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাটি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়ি মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে তাহারা আমাদের প্রতি বড় একটা দৃক্‌পাতও করিল না। সুমুখে তীরে বটগাছের জাল-বদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোত

মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে—ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দুই চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারি মধ্যে বাস করে। আবার আর-একদিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশ বন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক্, গঙ্গার ধারের ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ লাগে—প্রায় তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিক পোড়ো জায়গার মত দেখিতে—এবড়ো খেবড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুলি ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ান—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্ব্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সমুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তাল গাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান'। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি—চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গন পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে তুলসীতলা। সূর্য্যাস্তের সমস্ত নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায়া ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্ব্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত, ছায়াপথের পরপারবর্ত্তী সুদূর শান্তি-নিকেতনের একখানি ছবির মত পশ্চিম দিগন্তের ধার-টুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতে থাকে—সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ আঘাতে ছল্‌ছল্ করিয়া শব্দ উঠিতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিবিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথ গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া রহিল

তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর খানিকটা আলো পড়িল—সেইটুকু আলোতে ভাল কিছুই দেখা গেল না। কেবল ও-পারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তুলিল—এ-পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। গভীর রাত্রে ও-পারে অনেক দূরে একখানি নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে দাঁড় টানিতেছে না, একটু একটু দেখা যাইতেছে।

এই যে সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার ষ্টীমার-যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ সব কতদিনকার কত ছবি মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা সব বড় সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতর শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না। এখন যাহা-কিছু দেখিব সেইগুলি কেবল মনে করাইয়া দিবে—এখনকার সৌন্দর্য্য সেই সকল স্মৃতির ছায়ায় সুন্দর হইয়া উঠিবে। কিন্তু লিখিতে লিখিতে মনের মধ্যে এক-একবার সংশয় উপস্থিত হইতেছে পাছে এ ছবিগুলি আর কাহারও ভাল না লাগে—এই ভয়ে এই খানেই আত্মসম্বরণ করিলাম।

এমন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি যে পুনশ্চ এই জাহাজটার কল-কারখানার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিতেছে না। কিন্তু এতদূর আসিয়া জাহাজত ছাড়া যায় না। সুতরাং ফিরিতে হইল। মেরামৎ শেষ হইয়া গেছে—যাত্রীদের স্নানাহার হইয়া বিস্তর কোলাহল করিয়া নোঙর তো হইতেছে। জাহাজ ছাড়া হইল। বা মুচিখোলার নবাবের প্রকাণ্ড খাঁচা। নবা বের জেনানা, নবাব স্বয়ং, মনুষ্য পশু প সকলে মিলিয়া এই একটা খাঁচার মধ্যে সমস্ত দিন কতভাবে কত কিচিমিচি করি তেছে, রুদ্ধদ্বারগুলির বাহির হইতে তাহার শব্দও ভাল শুনা যাইতেছে না। ডান দিকে শিবপুর বটানিকেল গার্ডেন। একপাশে রুদ্ধগবাক্ষ দেয়ালের মধ্যে শত শত মনুষ্য-হৃদয়ের আমরণ সমাধি—আর-এক পাশে সুশ্যামল বনের মধ্যে হৃদয়ের অবারিত স্বাধীনতা, গঙ্গার দুই পার হইতে দুই জনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছে। দুই পার্শ্বে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত দক্ষিণে যাইতে লাগিলাম, গঙ্গা ততই চওড়া হইতে লাগিল। এদিকে আমরা সকলে মিলিয়া মহানন্দে কাপ্তেনী করিতে আরম্ভ করিলাম। কতকগুলি নিরীহ কাপ্তেনী গৎ শিখিয়া লইয়া গলাভারি করিয়া জাহির করিতে লাগিলাম। কেহ বলিতেছি—কয়লা ভাঙ্গো, কেহ বলিতেছি হাবেষ হাবেষ, কেহ চেঁচাইতেছি দফরা দফরা। নানা-প্রকার গল্পগুজব হাসিতামাসা চলিতে লাগিল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটি তাঁহার জ্যেষ্ঠের পিঠের উপর চড়িয়া গলার ভিতর হইতে পাঁচ রকম আওয়াজ বাহির করিতে লাগিল। বেলা দুটো তিনটের সময় নানাবিধ ফলমূল সেবন করিয়া আজ সন্ধ্যা বেলায়

াধায় গিয়া থামা যাইবে তাহারই আলোায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আমাদের দক্ষিণে মে নিশান উড়াইয়া অনেক জাহাজ গেল াসিল—তাহাদের সগর্ব্ব গতি দেখিয়া মাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল। তাস যদিও উল্টা বহিতেছে, কিন্তু স্রোত খন আমাদের অনুকূল। ভাঁটা পড়িয়াছে, রঙ্গ অনেক কমিয়া আসিয়াছে—আমাদের ৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বেগও অক বাড়িয়াছে। মাঝের এক জায়গায় াসিয়া অত্যন্ত তুফান দেখা দিল। জাহাজ বশ দুলিতে লাগিল। আমাদের দুইপার্শ্বর্ত্তিনী তরীতে দুটো একটা ঢেউ উঠিতে াগিল। আমাদের প্রাণের মধ্যেও দোলা িতে লাগিল। দূর হইতে দেখিতেছি একটা মস্ত ঢেউ ঘাড় তুলিয়া আসিতেছে, আমরা সকলে আনন্দের সঙ্গে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি—তাহারা জাহাজের াশে নিষ্ফল রোষে ফেনাইয়া উঠিয়া গর্জ্জন রিয়া জাহাজের লোহার পাঁজরায় সবলে মাথা ঠুকিতেছে, হতাশ্বাস হইয়া দুই পা পিছাইয়া পুনশ্চ আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতেছি। হঠাৎ দেখি কর্ত্তাবাবু মুখ বিবর্ণ করিয়া কর্ণধারের কাছে ছুটিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ আর্ত্তনাদ উঠিল, এই এই—রাখ্ রাখ্, থাম্ থাম্। গঙ্গার তরঙ্গ অপেক্ষা প্রচণ্ডতর বেগে আমাদের সকলেরই হৃদয় একতালে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে আমাদের জাহাজের উপর সবেগে একটা লোহার বয়া আসিতেছে, অর্থাৎ আমরা বয়ার উপরে ছুটিয়া চলিতেছি। কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না। তখন যে কে কি করিতেছিল ঠিক ঠাহর হয় না—সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত বয়াটার দিকে চাহিয়া আছি। সে জিনিষটা মহিষের মত ঢুঁ উদ্যত করিয়া আসিতেছে। আর বড় দেরি নাই। আর দুই এক মিনিট বাকী আছে। বয়া আসিয়া ঘা মারিল।

হায়।

রাগিণী ললিত।

তোরা বসে, গাঁথিস মালা,
তা'রা গলায় পরে।
কখন্ যে শুকায়ে যায়
ফেলে দেয়রে অনাদরে!

তোরা সুধা করিস্ দান,
তা'রা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হ'লে
ফিরেও যে নাহি চায়;

হৃদয়ের পাত্রখানি
ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়।
তোরা শুধু হাসি দিবি,
তারা কেবল ব'সে আছে,
চোথের জল দেখিলে তারা
আর ত রবে না কাছে !

প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে,
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরাণ ভেঙ্গে মধু দিবি
অশ্রু-ছাঁকা হাসি হেসে,
বুক-ফেটে কথা না ক'য়ে
শুকায়ে পড়িবি শেষে।

সংস্কৃত ভাষায় "সংযম" আর ইংরাজী ভাষায়

WILL FORCE.

পতঞ্জলির যোগ শাস্ত্রে, সংযম-নামক মানস-ক্রিয়াকে সিদ্ধিলাভের উপায় বা মূলতত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সংযম কি ? তাহা উত্তম রূপ চিন্তা করিয়া দে-খিলে প্রতীত হয় যে, "সংযম" একটী পারি-ভাষিক শব্দ এবং তাহার অর্থ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই তিন মানসক্রিয়া। প্রথমতঃ ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে ধারণা, ধারণা হইতে ধ্যান অর্থাৎ ধ্যেয়াকার বৃত্তির প্রবাহ,—অনন্তর তাহারই পরিপাকে সমাধি। কোন এক ঈপ্সিত বিষয়ের উপর, উত্তরোত্তর ক্রমে বা পর পর সংলগ্ন ক্রমে, ঐ তিন মানস ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইলে তাহার এমন এক অদ্ভুত অসীম প্রভাব আবির্ভূত হয়—যাহার বর্ণনা বাক্‌পথাতীত। সেই অদ্ভুত প্রভা-বের সাহায্যে পূর্ব্বকালের যোগীরা অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন, এরূপ শুনা যায় ; এবং আধুনিক থিয়োসফিষ্ট লো-কের মুখেও উইল্ ফোর্স নামক শক্তি বিশে-ষের অস্তিত্ব থাকার কথাও শুনা যায়। ঐ দুই শক্তির অর্থাৎ যোগীদিগের সংযম শক্তি আর থিয়োসফিষ্টদিগের ইচ্ছাশক্তি, এই দুই শক্তির মধ্যে কোন সমঞ্জস-ভাব আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলাম। ইহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ জানিতে পারি-বেন যে, উক্ত উভয়ের কি প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ দেখুন, মহর্ষি পতঞ্জলি কিরূপ ক্রিয়া প্রবাহকে সংযম-সংজ্ঞা দিতেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি স্বকৃত যোগ-দর্শনের বিভূতি পাদের ১ম সূত্রে প্রথমতঃ ধারণা কি, তাহা নির্ণয় করিয়া, পশ্চাৎ ২য় সূত্রে তাহা হইতে ধ্যান প্রবাহ,—এইরূপ উল্লেখ করিয়া, অনন্তর ৩য় সূত্রের দ্বারা তাহারই উৎকর্ষ ভূমিকে সমাধি আখ্যা প্রদান করিয়া, অবশেষে এক বস্তু বিষয়ক উক্তবিধ প্রক্রিয়াত্রয়কে সংযম

[না]মে ব্যবহার করিবার উপদেশ করিয়া-[ছে]ন। যথা—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রা-[খা]র নাম "ধারণা"। রাগদ্বেষাদি শূন্য [হ]ইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মৈত্রাদি ভাবনার [দ্বা]রা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, যমনিয়মাদিতে [সি]দ্ধ হইয়া, কোন এক যোগাসন আয়ত্ত [ক]রিয়া, প্রাণগতি অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বশী-[ভূ]ত করিয়া, শীতগ্রীষ্মাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হ-[ই]য়া, কোন এক অনুদ্বেগজনক প্রদেশে, [কো]ন এক যোগাসনে, ঋজুভাবে অর্থাৎ [অন]ভুগ্নভাবে উপবেশন কর। অনন্তর ইন্দ্রিয়-[]গকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় (রূপাদি) [হ]ইতে বা স্ব স্ব গন্তব্য স্থান হইতে প্রত্যা-[হ]রণ করিয়া (টানিয়া আনিয়া বা আক-[র্ষণ] করিয়া) চিত্তের নিকট সমর্পণ কর। [অ]র্থাৎ চিত্তের মধ্যে মিশাইয়া দাও। [অ]নন্তর তাদৃশচিত্তকে হয় নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, [হৃ]ৎপদ্মমধ্যে, কিংবা নাড়ীচক্র প্রভৃতি [আ]ধ্যাত্মিক প্রদেশে, না হয় ভূত-ভৌতিক, [কি]ংবা কোন সুন্দরতম মূর্ত্তি প্রভৃতি বহি-[র্ব]স্তুতে ধারণ কর। এরূপ প্রযত্নে ধারণ ক-[রি]বে যে, চিত্ত যেন তাহা হইতে না প্রচ্যুত [হ]য়। তাহা হইলেই চিত্তকে বাঁধা হইবে, [এ]বং চিত্তকে বাঁধিতে পারিলেই তোমার ["ধ]ারণা" নামক যোগাঙ্গটী আয়ত্ত হইবে। ধারণ করার নাম ধারণা। সেই ধারণা [য]দি স্থায়ী হয় ত ক্রমে তাহাই তোমার [ধ্যা]ন হইয়া দাঁড়াইবে। যথা—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা এক প্রবাহ জন্মে, তাহা হইলে তাহা "ধ্যান" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধ-পূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অনন্তরিত ভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ বৃত্তি-প্রবাহ ধ্যান নামে কথিত হয়।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব স-মাধিঃ ॥ ৩ ॥

ক্রমে সেই ধ্যান যখন কেবলমাত্র ধ্যেয়-বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ অর্থাৎ (আমি ধ্যান করি-তেছি ইত্যাদি জ্ঞান) লুপ্ত করিয়া দিবেক, তখন তাহা "সমাধি" আখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

ধ্যান গাঢ় হইলেই তাহার পরিপাক-দশায় অন্য জ্ঞান থাকা দূরে থাকুক, ধ্যান জ্ঞানও থাকে না। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয়-বস্তুতে লীন হয়, ধ্যেয়স্বরূপ বা ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিত্ত তখন স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থাৎ না থাকার ন্যায় হইয়া যায়। সুতরাং তৎ-কালে অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। তাদৃশ চিত্তাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি হইল, স্থির করিবে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

কোন এক আলম্বনে উক্ত তিন প্রকার মানস-বাপার অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও স-মাধি,—এই ত্রিবিধ মানস প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার নাম "সংযম"। সংযম শব্দের উল্লেখ

দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ত্রিবিধ প্রয়োগের কথাই বলিতেছেন।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

উহাকে অর্থাৎ উক্তবিধ সংযমকে জয় অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদির ন্যায় স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণায়ত্ত করিতে পারিলে তাহা হইতে প্রজ্ঞা নামক উৎকৃষ্ট বুদ্ধির আলোক অর্থাৎ সমধিক নৈর্ম্মল্যজনিত শক্তিবিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়।

সংযম, তাহার জয়, এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞা নামক জ্ঞানের আলোক,—এই তিন কথার মধ্যে অনেক গুপ্ততথ্য বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ উহার প্রকৃত তথ্য এবং উহার শিক্ষাকৌশল যোগীরাই জানেন অন্য কেহ জানেন না। সুতরাং বিনা উপদেশে উহার যথার্থ স্বরূপ এবং উহার শিক্ষাকৌশল কিরূপ, তাহা জানা যায় না। অনুমান-শক্তির সাহায্যে আমরা হদ্দমুদ্দ এই বলিতে পারি যে, প্রাচীন যোগ-ভাষার "সংযম" আর আধুনিক ইংরাজি ভাষার concentration প্রায় তুল্যানুতুল্য অর্থের দ্যোতক।

কেন? তাহা বিবেচনা কর। অগ্রে ধারণা, পরে ধ্যান, ক্রমে তাহার পরিপাক দশায় তদ্বিষয়ক সমাধি। এই প্রক্রিয়াত্রিতয়ের মূলে উত্তেজক ও বুদ্ধিপরিষ্কারক ইচ্ছা শক্তি বিদ্যমান আছে। যোগীরা শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঐ তিন প্রক্রিয়াকে জয় অর্থাৎ স্বাত্মীকৃত করিয়া থাকেন। স্বাত্মীকরণ কি? না উহাকে স্বাভাবিক-কার্য্যের ন্যায় আয়ত্ত করা। মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক বা সাত্মীকৃত,—অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিতে যেমন কোনরূপ প্রযত্ন বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না,—উল্লিখিত সংযম কার্য্যটী যদি সেইরূপ সাত্মী কৃত হয়,—অর্থাৎ উহাকে যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজে ও বিনা ক্লেশে নির্ব্বাহ করা যায়,—তাহা হইলেই জানিবে যে, সংযম জয় হইয়াছে। এতদ্বিধ সংযমজয়ী যোগীদিগের সংকল্প বা ইচ্ছাপ্রয়োগ অমোঘ। তাঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, সঙ্কল্প করেন, সংযম প্রয়োগ করিয়া তাহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ করিতে পারেন। "সংযমজয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।" এই চতুর্থ সূত্র দেখিয়া, সংযমের বলে কেবল জ্ঞানবিকাশই হয়, অন্য কিছু হয় না, এরূপ মনে করিও না। ইহার পরের সূত্রগুলি দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, উহার দ্বারা সকল সঙ্কল্পই সুসিদ্ধ হয়। জ্ঞানবিকাশ হইলে, অর্থাৎ প্রকাশ শক্তি বাড়িলে ক্রিয়াশক্তিও বাড়ে, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং ভূতজয়, প্রকৃতিবশিত্ব, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য,—এ সমস্তই একমাত্র সংযমের প্রভাবে (অজ্ঞাত-শক্তিতেই) সাধিত হইয়া থাকে। কিরূপ সংযমের দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হয়, ও না হয়, তাহা পাতঞ্জলের তৃতীয় পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সমস্তযোগশাস্ত্রের সারসংগ্রহ বা ফলিতার্থ এই যে, সিদ্ধিলাভের প্রতি একমাত্র সংযমই মূল কারণ। সংযমের দ্বারা সমস্ত ইচ্ছাধিকারই

পূর্ণ হয়। সংযমের দ্বারা সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই নাই। সংযমের মধ্যে যে কত প্রভূত ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে, তাহা যোগীরাই জানেন, অন্যে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। যোগীরা কিরূপে সংযম-বল জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝি না। বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিব কি না, সন্দেহ। তথাপি আমাদের এবিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য আছে। একজন পুরাতন যোগী বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গান্বেষকোবনে।
ইষুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবোমতাঃ ॥"

পিঙ্গলা নামক বেশ্যা, কুরর নামক পক্ষী, অজগর নামক সর্প, মৃগান্বেষী ব্যাধ, শরনির্ম্মাতা শিল্পী, অবিবাহিতা কুলনারী,—এই ছয় ব্যক্তি আমাদের গুরু অর্থাৎ উক্ত ছয় ব্যক্তির নিকট আমরা অনেক গুহ্যতত্ত্ব; জানিয়াছি।

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন "অনারম্ভেঽপি সুখী সর্পবৎ।" (সাঙ্খ্যের ৪ অধ্যায় ১২'সূত্র) অর্থাৎ এমন কতকগুলি সর্প আছে, তাহারা আহারের জন্য কিছু মাত্র আরম্ভ বা উদ্যোগ করে না, অথচ তাহারা ইচ্ছানুরূপ আহারাদি লাভ করে। অতএব এতদ্দৃষ্টান্তে যোগীরাও অনারম্ভপর হইবেন। যোগী দিগের এই সকল কথার ভাবভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা অজগর সর্পের বহির্নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া তাহাদের অভ্যন্তরের বা অন্তরাত্মার স্তিমিতভাব, দৃঢ়সঙ্কল্প ও দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রবল ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই অনুকরণে সংযম নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজ সাপ-নামক এক প্রকার সর্প আছে। তাহারা ভ্রমণ করিয়া আহার করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ব্বিষ সর্প এবং বৃশ্চিকাদি ক্ষুদ্র জীব তাহাদের মুখ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজ সাপ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। এ সম্বন্ধে অজ্ঞ মানবদিগের নিকট এরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, "উহারা সাপের রাজা, সেই জন্যই উহারা আহারার্থ ভ্রমণ করে না। ক্ষুদ্র সর্প সকল উহাদের ভয়ে আপনা আপনিই আহারীয় হইয়া উহাদের নিকট গমন করে।" কিন্তু সাপুড়েরা বলে, "তাহা নহে। রাজ সাপেরা আহারের পূর্ব্বে কোন এক নিভৃত স্থানে (মনুষ্য শূন্য অথচ সর্পাদি জীব জন্তুর গতিবিধি স্থানে) গিয়া নিঃসাড়ে পড়িয়া থাকে এবং তন্মনা হইয়া বা একমন একচিত্ত হইয়া শীস্ দিতে থাকে। উহাদের সেই শীস্ শব্দের এমন এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, এমন এক আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি আছে, এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তৎপ্রভাবে তাহাদের মুখসন্নিধানে আহারোপযুক্ত ক্ষুদ্রজীবদিগকে যাইতে হইবেই হইবে। তাহাদের সেই শীস-শব্দ যতদূর যাইবে,—ততদূরের মধ্যে যে-কোন ক্ষুদ্রসত্ত্ব (বৃশ্চিকাদি)—ক্ষুদ্রজীব থাকিবে—তাহাদের সকলকেই শীস্-শব্দে মোহিত হইয়া, হতজ্ঞান হইয়া, তৎসন্নিধানে যাইতে হইবে। তাহাদের সেই শীস-শব্দের আকর্ষণী শক্তি অতীব অদ্ভুত ও অচিন্ত্য!" এতজ্জাতীয় সর্প এ

দেশে আছে কি না এবং যদি থাকে ত কোন প্রদেশে আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইংরাজী ভাষায় এতজ্জাতীয় সর্পকে Rattling Serpant (This word is pronounced from the word Rattle) বলে, এবং এরূপ সর্প নাকি আফ্রিকা দেশে আছে।* আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার বৃহৎকায় সর্প আছে, শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহাদিগকে অজগর বলে। অপভাষায় তাহাদের কি নাম আছে তাহা জানি না। কেহ কেহ ইহাদিগকেই রাজসাপ কেহ বা বোড়াচিতি ও নাওদোড়া বলিয়া উল্লেখ করেন। যাহাই হউক, এই অজগর সর্পেরাও আহারার্থ উদ্যম করে না। বৃহৎকায়তা নিবন্ধন নড়িতে চড়িতে পারে না বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক, আহারের পূর্ব্বে ইহারা কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলনিস্পন্দভাবে পতিত থাকে। কিছুকাল তদ্রূপ থাকার পর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু সকল তাহাদের সম্মুখে আগত হয়। বনচর মনুষ্যদিগের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে যে, উহারা নিঃশ্বাসের দ্বারা আহারীয়-জন্তুদিগকে টানিয়া লয়। বস্তুতঃ তাহা ঠিক্ নিঃশ্বাসের আকর্ষণ না হইলেও পারে। যাহাই হউক, অজগরদিগের তাদৃশ কার্য্যের মূল কারণ কি, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু যোগীরা বোধ হয় উহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এবং জানিতে পারিয়াও ছিলেন। কেন না পাতঞ্জলের চতুর্থ পাদের প্রথম সূত্রে এ সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সেই আভাসিত ভাবটী স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে "রাজ সাপেরা অথবা অজগর সর্পেরা জন্ম সিদ্ধ সংযমী" এইরূপ বিস্পষ্ট কথায় পরিণত হয়। অর্থাৎ উহারা জন্ম সিদ্ধ সংযমী। উহাদের সেই স্বতঃসিদ্ধ সংযমশক্তির প্রভাব বা ক্ষমতা এত অধিক যে তাহার ইয়ত্তা অবধারণ করা যায় না। উহারা আপন আপন সংযমশক্তির, ইচ্ছাশক্তির, সঙ্কল্পশক্তির বা ধ্যানশক্তির পরিচালন বা প্রয়োগ করিয়াই নিজ নিজ ভক্ষ্য আকর্ষণ করে। ঐ কার্য্য করিবার সময় তাহাদিগকে অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিতে হয়, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে উহারা তখন কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দরূপে প্রতীয়মান হয়।

সাপুড়েদিগের "ক্ষুদ্র সর্প সকল রাজসাপের মত শীস্ বা সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া হতচৈতন্য ও অবশপ্রায় হইয়া তাহাদের নিকট আইসে" এই প্রবাদ বোধ হয় অসত্য নহে। কেন না শীস্ শব্দের বা সোঁ সোঁ ইত্যাকার শব্দের ও অন্যান্য শব্দবিশেষের তাদৃশ বশীকরণ সামর্থ্য (Mesmeric power) থাকা অসম্ভব নহে।

* এ দেশে এখন রাজসাপ বলিলে "বোড়াচিতি" বুঝায়। বস্তুতঃ "বোড়াচিতি" রাজসাপ নহে। বোড়াচিতির অন্য এক জাতিকে বরং অজগর বলিলেও বলা যায়। কেহ কেহ সাপিনী সাপকে রাজসাপ কলিয়া উল্লেখ করেন। বোধ হয়, তাহাদের কথাও সত্য নহে। যাহাই হউক, যাহাদের উক্তবিধ ক্ষমতা আছে, আমাদের মতে তাহারাই রাজসাপ।

জীব যে শব্দ শুনিয়া রূপ, বা, রং দেখিয়া, রস বা আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, গন্ধ আঘ্রাণ ও স্পর্শ গ্রহণ করিয়া বিবিধ মানস বিকারের বশতাপন্ন হয়, তাহা বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই অবিদিত নাই সুতরাং শব্দের, স্পর্শের, রূপের, রসের ও গন্ধের প্রবল প্রতাপান্বিত বশীকরণ সামর্থ্য থাকা বিষয়ে অধিক কথা বলিতে হইবে না। * কেবল মাত্র পুরাতন যোগীরাই যে, রাজসাপের অদ্ভুত আহারচেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্য অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে সংযম শক্তির বা তাহার অতুল্যক্ষমতা জ্ঞাত হইয়া ছিলেন, এরূপ নহে। আমরা শুনিয়াছি, ইয়ুরোপবাসী জনৈক আধুনিক ডাক্তারও অজগর-সর্পের অদ্ভুত আহারচেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে তাহা হইতে বশীকরণ বিদ্যা অর্থাৎ (Mesmerism) অথবা এক প্রবল আশ্চর্য্য চেতনাশিল্প আবিষ্কার করিয়াছেন। "মেস্‌মার" নামক জনৈক জর্ম্মাণ পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি একদা পোতারোহণে বিদেশ গমন করিতেছিলাম। জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় কেবলমাত্র আমিই বিধাতার কৃপায় সে বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। জাহাজের ভগ্ন মাস্তুল অবলম্বন করিয়া আমি ধীরে ধীরে তীর প্রাপ্ত হইলাম। উপরে জঙ্গল ও পাহাড়। হিংস্র জন্তুর ভয়ে বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক রাত্রিযোপন করিলাম। প্রাতে অবতরণ কালে দেখিলাম, নীচে একটা বৃহৎ কায় সর্প মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া আমি ভয়প্রযুক্ত নামিতে সাহস করিলাম না। বেলা অনেক হইল, তথাপি সে সেইরূপেই থাকিল। অন্যূন ৪ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, আকাশ হইতে ২।৩ টা পক্ষী তাহার মুখনিকটে পতিত হইল। সাপ্ তাহা ভক্ষণ করিল। ক্রমে দুই চারিটী ক্ষুদ্রজন্তুও তাহার মুখের নিকট আসিল। সাপ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। এতক্ষণের পর সে শরীরসঞ্চালন আরম্ভ করিল, ক্রমে সে অল্পে অল্পে সরিয়া গেল। আকাশের পাখী কেন তাহার মুখে পড়িল? কি কারণে তাহার মুখনিকটে, দূরের জন্তু আগমন করিল? ইহা ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমার মস্তিষ্ক ভাবিতে ভাবিতে বিকল হইয়াছিল বটে, পরন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেই ব্যাপার তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। তজ্জাতীয়-সর্পদিগের উইলফোর্স অত্যন্ত তীব্র, এবং সেই প্রবল প্রতাপান্বিত ক্ষমতার সাহায্যেই উহারা ঐরূপ করিয়া আহার সংগ্রহ করে।"

মেস্‌মার সাহেব যেমন সাপের আহার চেষ্টা দেখিয়া তাহা হইতে মিস্‌মেরিজম্ আবিষ্কার করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ, বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভারতীয় যোগীরা হয় ত অজগরদিগের আহার ও তাহার মূল তথ্য অনুসন্ধান করিয়া সংযম নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং

* সিদ্ধান্তটি মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ব্যাস কর্তৃক কথিত হইয়াছে। প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে সে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল না।

যোগীদিগের পরিভাষিত "সংযম" আর মেস্‌মার সাহেবের পরিভাষিত উইল্‌ফোর্স প্রায় তুল্যানুতুল্য অর্থের দ্যোতক বলিয়া প্রতীত হয়।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

যে সময়ে কবিকুলরত্ন শেলি, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্কট, ক্যামবেল, সাদে প্রভৃতি মহাত্মাদিগের দ্বারা ইংলণ্ডভূমি উজ্জ্বলতর হইয়াছিল সেই তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে মনুষ্যকুল-কেশরী জনষ্টুয়ার্ট মিল ১৮০৬ খৃঃ-ষ্টাব্দের মে মাসে বিশে তারিখে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা বিখ্যাত দার্শনিক জেম্‌স্‌মিল ইঁহার পিতা। মিলের অদ্ভুত বিদ্যা উপার্জ্জন হইতে যাহা কিছু ফল উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ইহাঁর পিতার অতুল ধৈর্য্যশালিতা এবং অপরিমেয় অধ্যবসায়ের পরিণাম। মনুষ্যগণ যখন বাল্যাবস্থায় থাকে তখন যে পিতা মাতার সাহায্য তাহাদিগের কি পর্য্যন্ত আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পিতা মাতা হইতেই বালকদিগের হৃদয়, মন, প্রাণ, শরীর যাহা কিছু সকলই গঠিত হয়, অতএব পিতা মাতার চরিত্র এবং শিক্ষা অতি উৎকৃষ্ট থাকাই প্রার্থনীয়, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের বঙ্গদেশে তাদৃশ পিতা মাতার অত্যন্ত অভাব। ষ্টুয়ার্ট মিল সৌভাগ্যক্রমেই বাঞ্ছনীয় পিতা পাইয়াছিলেন, এবং জগতের বাঞ্ছনীয় ফল উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন।

আজ আমরা তাঁহার সেই অপরিসীম বিদ্যাশিক্ষার বিষয় এই প্রস্তাবে বর্ণনা করিতে যত্নবান হইব, যদি কোন ব্যক্তির পড়িতে আস্থা হয় ত পড়িবেন, নচেৎ কাহাকেও এলেখা পড়িতে অনুরোধ করি না। মিল নিজ-জীবনী লিখিবার প্রারম্ভেই এক-স্থলে বলিয়াছেন যে "The reader whom these things do not interest has only himself to blame if he reads farther, and I do not desire any other indulgence from him, than that of bearing in mind that for him these pages were not written.

মিলের জীবনের আর কিছু পড়িতে ভাল নাও লাগিতে পারে, কিন্তু তাহার অদ্ভুত বিদ্যাশিক্ষার বিষয় পড়িতে মনুষ্য মাত্রেরই কৌতূহল জন্মে ইহা আমার বিশ্বাস। মিল

পিতার নিকট অতি শৈশবকাল হইতেই বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন, এবং তিন বৎসর বয়স হইতেই বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা লাভ করিতে অগ্রসর হয়েন, একস্থলে তিনি বলিতেছেন "আমি যে কত ছেলে বেলায় গ্রীক ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি, তাহা আমার স্মরণ হয় না; তবে শুনিতে পাই যে বাবা আমাকে আমার তিন বৎসর হইতেই গ্রীক ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।" মিলের পিতা ছোট ছোট টুকরা কাগজে সচরাচর চলিত গ্রীক কথা গুলি লিখিয়া তাঁহাকে অভ্যাস করিতে দিতেন, এবং তিনিও অতিশয় একাগ্রতা ও যত্ন সহকারে সেই গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লইতেন। সর্ব্বপ্রথমে উক্ত ভাষা হইতে ঈষপের গল্প এবং আনাবেসিস নামক এই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করেন, তৎপরে কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ব্যাকরণের কিয়দংশে বিশিষ্টরূপে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সহিত এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া গ্রীকভাষা পাঠ করিতেন, এবং বুঝিতে না পারিলেই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। যদিও তাঁহার পিতা সেই সময়ে ভারত-ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তত্রাচ তাঁহার পুত্রের পাঠ বলিয়া দিতে অসন্তুষ্ট হইতেন না। এই সময়েই মিল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। মিলের বয়স যখন চারি-বৎসর তখন মিল ও তাহার পিতা "নিউইং টন" নামক গ্রামে বাস করিতেন, এই স্থানে ইহাঁরা তিন বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে মিল যাহা কিছু শিক্ষা করিতেন, প্রতিদিন প্রাতঃকালে পিতার সহিত হরিত প্রান্তর সমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহা তাঁহাকে গল্প করিয়া শুনাইতেন। মিলের জীবনে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহার পিতাই এই সংসাররূপ মরুভূমিতে তাঁহার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র বন্ধু ও একমাত্র হিতৈষী। নিম্নলিখিত গ্রীক ও ইংরাজী পুস্তকগুলি মিল সবে মাত্র সাত বৎসর বয়সের মধ্যেই পড়িয়াছিলেন।

"The whole of Herodotus;

The whole of Xenophon's Cyropoedia and Memorials of Socrates;

Some of the lives of the philosophers by Diogenes Laertius;

Part of Lucian and Isocrates ad demonicum and Ad Nicoclem;

The first six dialogues of Plato."

Robertson's Histories;

Hume's history,

Gibbon's history;

Watson's Philip the second and third;

Hookes History of Rome;

Rollin's ançient History beginning with philip of Macedon,

Langhorne's Translation of Plutarch;

Burnet's History of his own time,

Millar's historical view of the English government.

Mosheim's Ecclesiastical history,

Mc. Crie's life of John Knox;

Sewell and Rutly's histories of the Quakers ;

Beaver's African Memoranda ;

Collin's account of the first settlement of New Sonth Wales.

Arsor's voyages round the World in four volumes, beginning with Drake and ending with Cook and Bouganville,

Robinson Crusoe,

Arabian nights,

Cazotte's Arabian Tales,

Don Quixote;

Miss Edge worth's Popular Tales;

Brooke's' fool of Quality."

উপরোক্ত গ্রন্থ কয়েক খানির মধ্যে দুচারিখানি ব্যতিরেকে এখনকার অক্সফোর্ড কলেজের বি এ পাস করা ছেলেরাও বুঝিতে সঙ্কুচিত হন তা আমাদের ছেলেদের কথা দূরে থাকুক। সবে মাত্র আট বৎসর বয়সেই মিল লাটিন ভাষা শিক্ষা এবং গ্রীক কবিদিগের লেখা পড়িতে আরম্ভ করেন, এই সময়ে [তাঁহার পিতা তাঁহার হস্তে অন্য পুত্রদিগের শিক্ষকতার ভারার্পণ করেন এবং তাহাদিগকে এতসুন্দর রূপে শিক্ষা দিতে বলেন, যে, যেন তাহারা কখনো পাঠ দিবার কালে অযথারূপে ভুলিয়া না যায়, তন্নিমিত্ত মিলকে বিশেষ যত্ন সহকারে পড়াইতে হইত। মিল এ সময়ে বহুসংখ্যক ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, বীজগণিত এবং ইউক্লিড্ প্রণীত জ্যামিতি তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা করেন। আমাদিগের দেশীয় অনেকানেক ষোড়শ বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে সমস্ত জ্যামিতি পাঠ করা একটি কঠিন ব্যাপার কিন্তু মিল আট বৎসর বয়সেই এই গ্রন্থখানি চূড়ান্তরূপে পড়িয়াছেন, মিল যে গ্রন্থই পড়িতেন তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। মিলের মত অদ্বিতীয় লোক যে সকলেই হইবে ইহা কিছু সহজ কথা নহে, কিন্তু মিল তাহা মনে করিতেন না। মিল নিজে আপনার বুদ্ধি ও শক্তির বিষয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম "What I could do, could assuredly be done by any boy or girl of average capacity and healthy phisical constitution.

এই সময়ে মিল যে কি পর্য্যন্ত যত্ন সহকারে এবং কত সারগর্ভ ও কঠিন পুস্তক সমূহ পাঠ করেন তাহার বিষয় লিখিতে হইলে প্রবন্ধ এত বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে অগত্যা আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। তবে এই পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে গ্রীক এবং লাটিন ভাষায় যত কিছু কঠিন এবং দার্শনিক পুস্তক আছে মিল তাহা পড়িতে কিছুই বাকি রাখেন নাই। মিল যখনই কোন কঠিন পুস্তক পাঠ করিতেন, তখনই ইহাকে উপর্যুপরি বিশ ত্রিশ বার না পড়িয়া ক্ষান্ত হইতেন না, আমাদের দেশীয় এণ্ট্রেন্স ফেল হতভাগ্যেরা যদি তাঁহাদের দুচারিখানি পুস্তক এই প্রথা অবলম্বনে পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর পাস হইবার বিষয়ে মস্তকে হাত দিয়া অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হয় না। মিলের পিতা স্বয়ং

দার্শনিক ছিলেন বলিয়া, পুত্রকে একজন প্রধান কবি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই জন্য মিলকে তিনি হোমরের ইলিয়ড্ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে দেন। মিল পিতার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কবিতা লিখিতে যত্নবান এবং কবিত্বশক্তি না থাকিলেও, চেষ্টা দ্বারা যতদূর লিখিতে পারা যায়, তাহা তিনি লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের কবিকুলগুরু সেক্সপিয়র এবং জোয়ানাবেলি কৃত নাটক পাঠে তাঁহারও নাটক লিখিবার দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মে, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি একেবারেই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তিনি যাহা কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাদিগের ভালমন্দের বিষয় নিজেই স্পষ্টতররূপে বুঝিতেন, তজ্জন্য নিজেই একস্থলে বলিয়াছেন "আমার কবিতাগুলি রবিস্ ব্যতিরেকে আর্ কিছুই নহে"। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গদেশে যে কতকগুলি কষ্টকবি আছেন তাঁহারা যদি আপনাপন ক্ষমতা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে আমাদিগের দেশের লোকের পক্ষে অনেক মঙ্গল হইত।

মিল চৌদ্দবৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতার ছাত্র ছিলেন, যদিও এই সময়ের পরে তিনি পিতার নিকট হইতে অনেকানেক বিষয় বলিয়া লইতে ত্রুটি করেন নাই, তত্রাচ তাঁহার পিতার নিতান্ত অধীনে থাকিবার তাঁহার আর প্রয়োজন হয় নাই। এখন তিনি নিজেই চূড়ান্ত করিয়া দার্শনিক পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, এবং কিছু কিছু লিখিবারও সূত্রপাত করেন, আবার নিজেই সেগুলিকে অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে যদি কোন বালক সমবয়স্ক বালক হইতে কয়েকখানি পুস্তক অধিক পাঠ করেন, অমনি তাঁহার মন আত্মশ্লাঘায় পূরিয়া উঠে, মিলের পিতা এই বিষয় হইতে মিলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি মিলকে একজন মানুষের মত মানুষ হইতে গেলে কি প্রকার বিদ্যা উপার্জ্জন করা উচিত ইহারই বিষয় শিক্ষা দিতেন, তন্নিমিত্ত মিল যখনই কোন ব্যক্তিকে আপনার অপেক্ষা অল্পজ্ঞ দেখিতেন, তখনি বুঝিতেন যে সে হতভাগ্য ব্যক্তির মিলের পিতার মত পিতা ছিল না অথবা মিলের মত বিদ্যা শিক্ষার সম্যক সুবিধা হয় নাই। মিল যখনই আপনার বিদ্যার বিষয়ে আলোচনা করিতেন তখনই দেখিতেন যে তাঁহার যতদূর শিক্ষা করা উচিত ছিল ততদূর শিক্ষা করা হয় নাই, এবং তাঁহার সমক্ষে নিজের সহিত তুলনা করিবার লোক তাঁহার অদ্বিতীয় পিতা ব্যতিরেকে আর কেহই ছিলেন না, এই জন্য পিতার সহিত তুলনায় আপনাকে মিল সতত অজ্ঞ ভাবিতেন। ইহা তাঁহার পক্ষে বড় কম সুবিধার হয় নাই। এবং মিলের আরো একটি প্রধান সুবিধা হইয়াছিল, যে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে কদাচ কোন বালকের সহিত অধিক মিশিতে দিতেন না, এই নিমিত্ত মিল বাল্যসুলভ কোন কুকাজে কখনও প্রবৃত্ত হন নাই, এবং ইহার নিমিত্ত প্রৌঢ় বয়সে পিতাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

মিল কখনও আপনার অপেক্ষা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সহিত তর্ক করিতে বিমুখ হইতেন না, তন্নিমিত্ত ইহাঁর পিতা ইহাঁকে কখনো নিষেধ করেন নাই। আমাদের দেশে যদি কোন পিতা আপনার পুত্রকে অধিক বয়স্ক লোকের সহিত তর্ক করিতে দেখেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কপালে হাত দিয়া ছেলেটির পরিণাম চিন্তা করেন, এবং জ্যেষ্ঠতাত, তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নানা খেতাব দিয়া সেই স্থান হইতে পুত্রকে বিদায় করেন, তাহার কারণ আমাদের দেশে মিলের মত ছেলেও দেখা যায় না, আর্ জেম্‌স মিলের মত পিতাও বিরল। মিল দেখিতে বিশেষ বলিষ্ঠ ছিলেন না, তিনি কখনও কুস্তিগিরি করেন নাই, কেবল মাত্র চরিত্র পবিত্র রাখিয়াছিলেন, ও প্রত্যহ যথাসময়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার শরীর পালনের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল।

মিলের পিতা মিলকে শৈশব কাল হইতে কখনও কোন ধর্ম্মবিশেষ অবলম্বন করিবার প্রস্তাব করেন নাই, ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকাই ইহার কারণ, তিনি বলিতেন জগতের উৎপত্তির যদি কোন কারণ থাকে তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। এরূপ সত্ত্বেও তিনি চিরকালই সত্যের পূজা ও অসত্যের অনাদর করিয়া আসিয়াছেন। নিজ পুত্রকে সততই সত্যবাদী ন্যায়বান্, দৃঢ়ব্রত, জগতের উপকারক, এবং সৎগুণানুসন্ধায়ী হইতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্যগণ স্বইচ্ছায় উপরোক্ত গুণগুলির অধিকারী হইতে পারেন, এবং প্রত্যেকেই এই গুণ গুলির অধিকারী হইতে পারিলে পৃথিবীর যথেষ্ট উপকারে আইসে।

এরূপ শিক্ষায় যে প্রকার পরিণাম সম্ভবে তাহাই হইয়াছিল, মিলের অন্যান্য নানা গুণ সত্ত্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁহার মনকে স্পর্শ করে নাই। ষ্টুয়ার্ট মিল বলিতেছেন "Who made me? cannot be answered, because we have no experience or authentic information from which to answer it, and that any answer only throws the difficulty a step further back, since the question immediately presents itself "who made God"?

(যদিও মিলের মতামত আমরা সমালোচনা করিতেছি না, তথাপি একটি কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন স্রষ্টা ব্যতিরেকে প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে ইহা মিল কল্পনা করিতে পারেন—কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধারণা করিবার সময় তাঁহার আর একজন স্রষ্টার আবশ্যক মনে হয়! জড় প্রকৃতি স্বতঃ উৎপন্ন ইহা মনে করিতে গোল বাধে না আর জ্ঞানময় ঈশ্বরকে আদিকারণ স্বয়ম্ভু ভাবিতেই যত সন্দেহ আসিয়া আক্রমণ করে!)

সে যাহা হউক মিল ও তাঁহার পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহারা সৎ বা উদারস্বভাব বিশিষ্ট লোক ছিলেন না। ষ্টুয়ার্ট মিলের

চরিত্র বিষয়ে লিখিতে হইলে তিনি দেবতাদিগের অপেক্ষাও সচ্চরিত্র এবং ধীশক্তি বিষয়ে অদ্বিতীয় ও ক্ষণজন্মা ছিলেন।

মিল কিম্বা ইহাঁর পিতা উভয়েই চিরকাল ধীশক্তির পূজা করিয়া আসিয়াছেন এবং ধীশক্তির পরিচালনা হইতে যে রূপ বিমল আনন্দ উৎপাদন করা যাইতে পারে, এমন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না, ইহা তাঁহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। প্রগাঢ় চিন্তানিমগ্ন মহর্ষি দার্শনিকগণ যে রূপ উদারতম এবং পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করেন, তাহার সহিত সাধারণ লোকের কর্দ্দমময় পৈশাচিক আনন্দের কি প্রকারে তুলনা হইতে পারে? সে সুখ কেবল মনুষ্যচর্ম্মাবৃত দেবতাদিগেরই ভোগ্য, নচেৎ সে সুখের তুলনা কোথায়?

মিল ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম কালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এই প্রবন্ধটি পাঠে ইঁহার পিতা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই বয়সে তিনি এবং আর গুটিকত বালকে মিলিয়া একটি সমিতি স্থাপনা করেন। এই সমিতি তিনবৎসর ছয়মাস কাল চলিয়াছিল, ইহাতে অনেক গুলি বালক ইহাঁর শিষ্য হইয়াছিলেন।

পুত্রকে কবি হইতে দেখা ব্যতীত জেম্‌স মিলের আরো একটি সাধ ছিল—সে সাধটি পুত্রকে ব্যারিষ্টর করা; কিন্তু বিধাতা বোধ হয় ইহাঁকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুখভোগী করিবেন বলিয়াই ইহাঁর এ বাসনাটীও পূর্ণ করেন নাই।

মিল সতের বৎসর বয়ক্রম কালে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি কেরানীগিরি কর্ম্ম পান, এবং শীঘ্রই পিতার সাহায্যে ও নিজ বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে উক্ত কোম্পানির সর্ব্বনিম্নপদ হইতে সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া মিল বলিতেছেন যে "আমার এই কর্ম্মস্থল বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হইতে বিশ্রাম লইবার প্রধান উপায়-স্থল হইয়াছিল।" ইঁহার এই অপরিসীম কার্য্য শক্তির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে কাহার না হৃদয় স্তম্ভিত হয়, নিজের অজ্ঞতা দর্শনে কাহার না মুখ লজ্জায় অবনত হয়?

ইতিমধ্যে পিতৃবন্ধু জেনারেল সার সামুয়েল্ বেন্থামের সহিত ফ্রান্সে এক বৎসর কাল অবস্থান করেন, এবং সুবিধাক্রমে ফরাসী ভাষাজ্ঞ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতেও তাঁর যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। ফরাসী ভাষা হইতে বিস্তর গ্রন্থ পড়িতে সক্ষম হইতেন, এবং উক্ত ভাষা হইতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট পুস্তক সমূহ বাছিয়া দিতেন।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে মিলের ষোড়শ বৎসর বয়স হইতেই লিখিবার সূত্রপাত হয়; প্রথমে তিনি "ট্রাভেলর" নামক পত্রিকায় দুইখানি পত্র প্রেরণ করেন, এই পত্র দুইখানি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তিনি অপরাপর লেখাও প্রকাশ করেন। প্রথম বয়সে মিল আপনার রচনার নিম্নে নিজনাম সাক্ষরিত না করিয়া

"উইক্‌লিফ্‌" এই কল্পিত নামটি সাক্ষর করিতেন। মিলের হৃদয়ে চিরকালই জনসমাজে বিখ্যাতি লাভ করিবার অতিশয় বাসনা ছিল, এবং এই বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে যে প্রকার পরিশ্রম ক্ষমতা এবং বুদ্ধিশক্তি থাকা আবশ্যক মিলের তাহা যথেষ্টই ছিল। মিল নিজের ভাষার সৌন্দর্য্য ও সরলতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত গোল্‌ডস্মিথ্‌, ফিল্‌ডিং, পাস্‌কাল্‌, ভল্টেয়র ও কুরিয়ের প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সমূহ বিশেষ যত্নসহকারে পড়িতেন, তন্মধ্যে গোল্‌ডস্মিথের "The vicar of Wakefield" নামক গ্রন্থখানি অসংখ্যবার পড়িয়াছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষা করিলেন। তিনি এই সময়ে কর্ম্মস্থলে দিবসের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করিয়া, নিজবুদ্ধি প্রসূত রচনা সমূহ লিখিতেই বা কখন অবকাশ পাইতেন, আর ইতিমধ্যে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষাই বা কখন করিতেন, ইহাই আশ্চর্য্য। মিল বলিতেছেন "While thus engaged in writing for the public, I did not neglect other modes of self cultivation. It was at this time that I learnt German."

বিদেশীয় ভাষায় শীঘ্র অধিকার লাভ করিতে সার উইলিয়ম্‌ জোন্সের ন্যায় অদ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ, তত্রাচ মিলের এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে আমাদের মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়। যখনই আমরা মিলের রচনা পাঠ করি, ইহাঁর বুদ্ধিশক্তির বিচিত্র অভিব্যক্তি দর্শনে স্তম্ভিত হই এবং ইহার ভাষার সারল্য দর্শনে মুগ্ধ হই, কিন্তু তত্রাচ বক্তৃতা কালে ইহাঁর বাগ্মিতার অভাব হইত, তাহা বলিয়া কেহই ইহাঁর বক্তৃতা শ্রবণে অসন্তুষ্ট হইতেন না, বরং ভাবের প্রগাঢ়তা দর্শনে নিস্তব্ধ হইয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সকলেই শ্রবণ করিতেন। ইনি যাহা কিছু বক্তৃতা করিতেন বা রচনা লিখিতেন তাহার অধিকাংশ গুলিই "ওয়েষ্টমিনিষ্টর" এবং "এডিন বরা রিভিউ" নামক এই দুই খানি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হইত, এবং এই নিমিত্ত উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট হইতে টাকা লইতেন। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি সংবাদ পত্রেও তৎকালীন আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ লিখিতেন, এবং প্রত্যেক লেখাতেই ইহাঁর বুদ্ধি বৃত্তির ঔদার্য্য ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইত।

বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক প্রকার অন্ধকারাবৃত কি-যেন-কি-ময় ভাব আসিয়া মিলের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আর তাহার সেই আগেকার মত উৎসাহ নাই, জনসমাজে প্রাধান্য লাভের দারুন আকাঙ্ক্ষা নাই, এখন তিনি অনেকটা উদাস হইয়া পড়িয়াছেন, জীবনের আর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছেন না, কে যেন দূর হইতে তাঁহাকে বলিতেছে, যে, তিনি যাহা কিছু পাইবার নিমিত্ত এ জগতে আশা করিয়া আছেন, যদি সেই মুহূর্ত্তেই তাহা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হয় তাহা হইলেই তিনি কি সুখী হয়েন? মিল এই

কথাগুলি হৃদয়ে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহাতেই বা তাঁহার সুখ কি? তাঁহার হৃদয় অন্ধকারে আবৃত হইল, মন মনের ভিতর বসিয়া গেল, জীবনের একমাত্র উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, যাহা হইতে তিনি পূর্ব্বে সুখী হইবেন ভাবিয়াছিলেন, এখন সেই আকাঙ্ক্ষা কোথায় লুকাইয়া গেল। মরুময় এই জীবনধারণের কি প্রয়োজন তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কয়েক দিবসের মধ্যেই তাঁহার এইরূপ ঔদাস্যের ভাব মন হইতে বিদূরিত হইবে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আসিতে লাগিল, এমন করিয়া কিছু দিন চলিয়া গেল, তত্রাচ তাহার হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতরই হইতে লাগিল। জগতে মিল এমন একজনকেও দেখিতে পাইলেন না, যে, যাঁহার নিকট হৃদয় খুলিয়া দুই দণ্ড কথা কহেন, কথা কহিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েন, এমন কোন বন্ধু নাই যে তাঁহার মনের ভাব বুঝে; তাহাকে ভুলাইয়া রাখে। অবশেষে মিলের একমাত্র বন্ধু পিতার নিকটে মিল হৃদয়ের তৎকালীন অবস্থা খুলিয়া বলিবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন, অবশেষে পিতাকে অনর্থক কষ্ট দিবার ভয়ে তিনি তাঁহাকে না বলাই স্থির করিলেন। এখন তিনি আর তাঁহার সেই প্রিয়পুস্তকগুলি সেরূপ উৎসাহ ও যত্নের সহিত পড়িতে পারিতেন না, তবে অদ্ভুত অভ্যাস শক্তির বলে তিনি পুস্তকগুলিকে উল্টাইতেন, কিন্তু আর তাহারা তাঁহাকে আগেকার মত আনন্দ দিত না। এই রূপ অন্ধকারাবৃত ভাব তাঁহার হৃদয়কে প্রায় এক বৎসরকাল ব্যাপিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময়ে একদিন তিনি "মারমণ্টেল্‌" প্রণীত "মেমরিস্‌" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে সহসা একস্থল এমন করুণরসাত্মকভাবে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলেন, যে তিনি আর সেই নিদারুণ বৃত্তান্ত পাঠে অশ্রুবারি সংবরণ করিতে পারিলেন না। এতদিন পরে মিলের শুষ্ক অবসন্ন হৃদয়ের ঘনান্ধকার অশ্রুবারিধারায় পরিণত হইল, এখন তিনি আপন হৃদয় দিয়া পরের হৃদয়ের সহিত মমতা করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার মন হইতে নিবিড় কুজ্ঝটিকা সরিয়া যাইতে লাগিল, অমানিশার অবসানে ঊষার আকাশে প্রভাত তারাটি যেমন হাসিতে হাসিতে উদয় হয়, সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ে আশালোক ধীরে ধীরে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, আবার তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার সুখের নিমিত্ত সোনার তারকাপূর্ণ সুনীল আকাশ মাথার উপর বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নিমিত্ত সূর্য্য উঠে, তাঁহার নিমিত্ত চন্দ্রমা মধুর কিরণ ধারা বর্ষণ করে, কুসুমরাজি কানন সুশোভিত করিয়া হাসিতেছে, এবং মধুর নিনাদিনী নির্ঝরিণী কল্লোলমালায় বহিয়া যাইতেছে। এখন তাঁহার সেই প্রিয়পুস্তকগুলি তাঁহার নিকট প্রিয়তর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এই দুর্লভ মানবজীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে লাগিল, এখন তিনি আর জড়ের ন্যায় পড়িয়া

রহিলেন না, এখন তিনি বায়রণ, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণের লেখাসমূহ পড়িতে লাগিলেন, তন্মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা-গুলিই তাঁহার চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপে তিনি সেই মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাঁচিলেন, এমন যন্ত্রণা ইহজীবনে তাঁহাকে আর কখনও সহ্য করিতে হয় নাই।

এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তিনি নানাবিধ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিতে গেলে মিলের জীবনে অনর্থক এক দিনও কাটে নাই, এই সামান্য এবং ক্ষুদ্রতম প্রস্তাবে সকল দিনের বিবরণ লিখা অনুকূল নহে এই বিবেচনায় অগত্যা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। জগদ্বিখ্যাত "লজিক নামক গ্রন্থ খানির প্রথম পত্তন মিলের চব্বিশ বৎ বয়ঃক্রম হইতেই আরম্ভ হয়, পৃথিবী এমন কোন দেশই নাই যে স্থলে এই পুস্ত খানি সমাদৃত না হইয়া থাকে, অব তাহা বলিয়া বানরের গলায় মুক্তার যথা ব্যবহার কোন কালেই হয় না এবিষয় আ কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই এই সময় হইতে মিলের পিতার সহিত মি লের মতের কিছু কিছু অনৈক্য হইতে আরম্ভ হয়, মিল বলিতেছেন যে সকল বিষ লইয়া তাঁহার পিতার সহিত মতের ঐক্য না হইত সে সকল বিষয়ে পিতার সহিত তিনি তর্ক বিতর্ক করিতে ভালবাসিতেন না; তবে তাহার পিতা তাহার মতের নিতান্ত বিপরীত কোন কথা কহিলে, তিনি অগত্যা তর্ক না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যেমন পিতা তাঁহার সেই রূপই সন্তান হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? বরং না হওয়াই আশ্চর্য্য।

ক্রমশঃ।

নীরব নিশীথে।

১

ঘুমায় নীরব ধরা,
তারকা আকাশ-ভরা,
চৌদিকে বিষম নীরবতা!

সুদূর শ্মশান হ'তে
সমীর আনিছে ব'য়ে
জগতের মরণ-বারতা!

২

পাশরি মায়ার খেলা,
চেতনা জাগিছে প্রাণে,
মহাযোগে যোগী নিমগন;
অনিমেষ দুনয়ানে,
চাহিয়া গগন পানে,
নিরখেন মহান্ স্বপন।

৩

পবিত্র জাহ্নবী-জল,
নিষ্কম্প পাদপ দল,
যামিনী ফেলিছে মৃদু শ্বাস;
নীরব নিস্তব্ধ সব,
উঠিছে ঝিল্লীর রব,
প্রাণ যেন উদাস-উদাস!

৪

শ্মশানের মহামায়া,
প্রাণেতে ফেলেছে ছায়া;
আবরি রেখেছে প্রাণ মোর—

শ্মশানের সেই চিতা
শ্মশানের সেই আলো
বিজন আঁধার অতি ঘোর!

৫

জগৎ দেখিতে কিগো
এসেছি জগতী তলে,
আর কিছু নাই দেখিবার?
এ ক্ষুদ্র জীবন ল'য়ে
চোলেছি অনন্ত পথে,
পার হোতে মহা পারাবার!

৬

আসিবে কি কোন দিন
ভাঙ্গাতে ঘুমের ঘোর,
চিরকাল রবে কি আঁধার!
এ মায়া কাহার্ মায়া,
বুঝিতে না পারে হিয়া
প্রাণ বলে—"এযে কারাগার"!

তোমাকে।

১

নীরব তটিনী বুকে,
মৃদু বায়ু মন সুখে
ধীরি ধীরি করে বিচরণ;
চম্পক চামেলি বেলা,
ফুটেছে মালতী মেলা,
সৌরভে পুলকে ত্রিভুবন!

২

ওই বুকে রাখি মাথা,
ওই মুখ পানে চেয়ে,
প্রাণ মোর ঘুমাইতে চায়;

দূরে দূরে হাসে ফুল,
দূরে দূরে নাচে লতা,
দূরে দূরে পাখী গান গায়।

৩

তটিনী জ্যোৎস্না মাখা,
আকাশ তারকাময়,
দশদিশি হাসিছে কেমন!
এহেন সময় প্রিয়ে
কেন লো কিসের দুখে
ম্লানমুখ, নত দুনয়ন!

৪

অয়ি সোহাগিনী লতা,
কে বল দিয়েছে ব্যথা,
কেন বল এত অভিমান!
সে মধুর হাসিখানি,
দেখাও আমায় রাণি,
কেন হেরি বিরস বয়ান!

৫

আমরা দুটিতে মিলি,
আছি হেথা নিরবিলি,
এস সখি মন কথা কই;
গেছে চলে কত কাল,
আরো বল কত কাল,
দুজনে দুজন মোরা রই!

৬

জগতের প্রান্ত দেশে,
ওই আকাশের শেষে,
যেথায় তারারা চেয়ে আছে;
সুধামুখী মেয়ে গুলি,
কাননে কুসুম তুলি
বেড়ায় মন্দার কাছে কাছে!

৭

ওই দেখ হাত তুলে,
হেসে হেসে দুলে দুলে,
ওই ওরা ডাকিছে তোমায়;
আকাশ খুলেছে দ্বার,
কোন বাধা নাহি আর,
আয় সখি আয় তবে আয়!

উ—

স্ত্রী-আচার।

আজ কাল অনেকেই স্ত্রী আচারের কোন অর্থ দেখিতে পান না; এই অনুষ্ঠান তাঁহারা অর্থশূন্য কুসংস্কার মাত্র বলিয়া হাস্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে যে সকল আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, দেশের অসভ্যতর অবস্থার পরিচয় দেয়—স্ত্রী আচার তাহার মধ্যে একটী; সুতরাং আধুনিক সভ্যতারউন্নতি-সহকারে ইহা অবশ্য পরিত্যজ্য। কিন্তু ইহা বলিবার আগে বাস্তবিক সেই সকল আচারের অর্থ আছে কি না ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়।

প্রথমতঃ—সমাজের উপযোগিতা বুঝিয়া আচার ব্যবহার সৃষ্টি হয়। সুতরাং সেই আচার ব্যবহারের নূতন সৃষ্টির সময় তাহার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা থাকে কালে সমাজের পরিবর্ত্তন সহকারে তাহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িলে তখন তাহা অর্থ শূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু এইরূপ অর্থাভাব দৃষ্ট হইলেই যে সে রীতি অসভ্য সমাজের এমন অনুমান কিরূপ যুক্তি সঙ্গত? কেন ঠিক কি তাহার বিপরীত হইতে পারে না? যে সকল আচার-অনুষ্ঠান—সমাজের উন্নতির অবস্থায় গঠিত, সমাজের অবনতি-অবস্থায় তাহার কিছুই উপযোগিতা থাকেনা, কাজেই তাহা অর্থশূন্য মনে হইতে পারে। সুতরাং কোন রীতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হইলেই তাহা অসভ্য সমাজের এরূপ বলা যাইতে পারে না।

সভ্য অসভ্য যে কোন জাতির রীতিই হউক না কেন বহু কারণে কাল সহকারে তাহার অর্থ লোপ পাইতে পারে। এমন কোন বিষয় যাহার উর্দ্ধে আমার জ্ঞান উঠিতে পারে না তাহাত অর্থ হীন মনে হইবেই—একজন অন্ধ যদি চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব ধারণা করিতে না পারে তাই বলিয়া কি বাস্তবিক চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব থাকিবে না?

তাহার পর দ্বিতীয়তঃ— আচার যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহাতে যদি সমাজের কোন ক্ষতি না করে, তাহা হইলে সে আচারের অর্থ বোধ গম্য না হইলেও পুরাতন বলিয়া তাহার একটি গৌরব আছে; তাহা অর্থময় না হইলেও ভাবময়। আমি সেই পুরাতন আচারের অতি সূক্ষ্ম-সূত্রে আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সহিত গ্রথিত, সেই আচারের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ধারাবহ স্মৃতি পরম্পরা আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ ঢালিয়া দেয়—এই জন্যই সে আচার অতি আদরে রক্ষণীয়।

আমার কোন বিশেষ বন্ধু যদি একদিন আদর করিয়া একটি সামান্য উপহার দিয়া যান তবে কি তাহা অতি মহামূল্য রত্ন অপেক্ষা আমার নিকট অধিক আদরের হইবে না? সে সামান্য দ্রব্য আমার নিকট অমূল্য ধন,—কেন না—সেই দ্রব্যে আমার বন্ধুর ভালবাসা—তাহার যত্ন, তাহার স্মৃতি সকলি বিজড়িত। যাহাতে প্রাণে এতখানি আনন্দ ঢালিয়া দেয়, যাহার ভিতর আমরা অতীতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই—কুসংস্কার বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিব? তাহা হইলে কি কুসংস্কার নহে? কি ভ্রান্তি নহে? কে বলিল এ জগৎ আমাদের মনের একটি ভ্রান্তি নহে,—সুতরাং কুসংস্কার নহে? অনেকে ত এরূপ কথাও বলিয়া থাকেন। সেই এক সত্য নিত্য পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ছাড়া ধরিতে গেলে আর সমস্তইত মায়া। তাহা হইলে ত আমাদের সংসার ত্যাগ করিতে হয়।

সভ্য ইংরাজদিগের ভিতর একটি রীতি দেখা যায়—বিবাহের পর চারিদিক হইতে বরের উপর জুতা বৃষ্টি হইতে থাকে। ইহার যাহা অর্থ পাওয়া যায় তাহাতে বড় একটা সভ্যতার আভাষ দেখা যায় না। অসভ্য অবস্থায় কেহ বাড়ীর কন্যাদিগকে অপরকে

পূর্ব্বে আয়বড়ভাত—বা গায়ে হলুদ, তার পর বিবাহ, বিবাহের পরদিন বাসি বিবাহ, আবার তার পর দিন ফুলশয্যা, তারপর আবার বৌভাত আছে। এই কয়দিনেই বর কন্যাকে বরণ করা হইয়া থাকে। গায়ে হলুদের দিন—বরের বাড়ীতে বরের, কন্যার বাড়ীতে কন্যার বরণ হয়। অন্তঃপুরের একটি বারাণ্ডায় একটি মাটির চতুষ্কোন আল গড়িয়া সেই আল জলপূর্ণ করিয়া সেই আলের চারি কোনে চারিটি কলাগাছ পোতা হয়, এই আলের বাহিরের চারিপাশের স্থানকে কলা তলা বলে। গায়ে হলুদের দিন বর স্নান করিবার সময় বরের বাড়ীতে বরকে এই কলাতলায় নূতন আলপনা পিঁড়াতে দাঁড় করাইয়া বরের মা কি বাড়ীর অন্যকোন সধবা রমণী বরণ করিবার পর সাতজন সধবা মিলিয়া তাহার কপালে—হলুদ ছোঁয়াইয়া দেয়। সেই হলুদ কন্যার জন্য কন্যার বাটীতে আসিলে, তখন কন্যাকে তাহাদের বাড়ীতে আবার সেইরূপ বরণ করিয়া হলুদ মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। বিবাহের দিন বর, কন্যার গৃহে আসিবার পূর্ব্বে বিকালে কন্যাকে কলাতলায় দাঁড় করাইয়া কন্যার মাতা কি ঠাকুর মা—কি পিতৃস্বসা-কিম্বা অন্য কোন সধবা মহিলা তাহাকে বরণ করেন, বরণের পর গাত্রে জলের ছিটা দিয়া সজ্জিত করিবার জন্য গৃহে লইয়া যান। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার এই বরণের নাম কন্যাস্নান। বোধ হয় পূর্ব্বে এই সময়ে সত্যই কন্যাকে স্নান করান হইত—এখন তাহার পরিবর্ত্তে গাত্রে জলের ছিটা মাত্র দেওয়া হয়। কন্যাকে সজ্জিত করিয়া, যতক্ষণ না বর আসিবে ততক্ষণ একটি নির্জ্জন গৃহে একাকী বসাইয়া রাখিতে হয়।

তাহার পর বর বিবাহ করিতে কন্যাগৃহে আসিলে জামাতারূপে সভায় বরণ পাইবার পর—তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসা হয়। অন্তঃপুরে কলাতলায় যেখানে পূর্ব্বে কন্যার বরণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে মঙ্গল ভাঁড়-ধান দূর্ব্বা সজ্জিত বরণ ডালা, শ্রী, জলের ঘটি—প্রভৃতি স্ত্রী আচারের সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত থাকে। বর সেইখানে আসিয়া একখানি আলপনা পিঁড়িতে দাঁড়াইলে তখন বরের বরণ হয়। বরকেও কন্যার মাতা কি ঠাকুর মাতা কি পিতৃ স্বসা—এইরূপ কন্যার একজন বিশেষ আত্মসম্পর্কীয় মহিলা বরণ করেন।

গায়ে হলুদ, বাসি বিবাহ, কিম্বা-অন্ন-প্রাশন প্রভৃতি অন্য কোন সংস্কার কার্য্যে স্ত্রীগণ বরণ ইত্যাদি যে সকল অনুষ্ঠান করেন তাহা স্ত্রী আচার নামে উক্ত হয় না এমন নহে, তবে বর আসিবার পর যে বরণ, প্রদক্ষিণ, শুভদৃষ্টি ও মাল্য বদল হইয়া থাকে—তাহাকেই বিশেষরূপে স্ত্রীআচার বলে। এইখানে বরণের একটু বর্ণনা করিয়া মাল্য বদল পর্য্যন্ত কি কি করা হয় দেখা যাউক।

বরণে হাতের নানারূপ চালনা আছে। রমণী সমাজে এই বরণের জন্যই এক এক-জন বিশেষ প্রসিদ্ধ। দুই হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলী ও তর্জ্জনীতে ধান দূর্ব্বা ধরিয়া অন্য অঙ্গুলী গুলি প্রসারিত করিতে হয়। সেই প্রসারিত সংলগ্ন হস্ত দুটি বরের

পদমূলের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া বরের মস্তকের নিকট তুলিতে হয় তাহার পর সেখান হইতে হাত দুটি আবার ক্রমে তাহার পদমূলে আনিতে হয়। তাহা হইয়া গেলে তখন হাত খুলিয়া হাতের ধান দূর্ব্বা তাহার গাত্রে ফেলিয়া দিতে হয়। মোটা-মুটি ইহাই বরণ—কিন্তু ইহাতে আরো অনেক রকম হাত চালাইবার ভঙ্গী আছে। যাঁহারা মেশামেরাইজ করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন—বর-ণও একরূপ মেশমেরাইজ করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগে—বরের মন ও কন্যার মনকে একত্র বাঁধা—তাহাদের মন এক হউক্ এই ইচ্ছা করাই বরণের উদ্দেশ্য। স্ত্রী-আচারের সময় কন্যার মাতাই বরণের বিশেষ অধিকারী। কন্যার মঙ্গল কামনা মায়ের মনে স্বতঃ উৎসারিত, এই ইচ্ছা কন্যা জন্ম হইতে মাতার হৃদয়ের শিরায় শিরায় বিজড়িত, সুতরাং বরণ কালে মায়ের মত প্রাণ মন হৃদয়ের সহিত কে আর বর কন্যার শুভ ইচ্ছা করিতে পারে? সেই জন্যই কন্যার মাতা বিশেষরূপে এই সময় বরণের অধিকারী। কোন কারণবশতঃ মাতা না পা-রিলে ঠাকুরমা পিশিমা ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি কেহ করিতে পারেন,—কিন্তু বিধবা হইলে কাহাকেই বরণ করিতে নাই।

যিনি বরণ করিবেন—তাঁহার সে দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়—এবং বর কন্যাও বিবাহ পর্য্যন্ত উপবাসী থাকা নিয়ম। সকলেই জানেন আহারের পর কোন কাজে যত দূর মনোনিবেশ করা যায় আহারের আগে তাহা অপেক্ষা অধিক মন সংযোগ করা যায়। বিশিষ্টরূপে সংযতমনা হইবার জন্যই বরণকারীর উপবাস আবশ্যক। বর কন্যার উপবাসের কারণ অন্য। যত-ক্ষণ উদর পূর্ণ থাকে ততক্ষণ বাহিরের কোন রূপ ভাল মন্দ শক্তি তাহাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিতে পারে না—সেই জন্যই কোন কোন ডাক্তারে ম্যালেরিয়া দূষিত প্রদেশে প্রাতঃকালে না খাইয়া বাহিরে গমন করিতে নিষেধ করেন। নিরাহার থাকিলে বর কন্যার উপর ইচ্ছার বল যত অধিক কাজ করিবে—উদর পূর্ণ থাকিলে তাহা হইবার নহে।

ধানদূর্ব্বার বরণ—তিনবার হউক সাত বার হউক হইয়া গেলে তখন অন্য রূপে বরণ করিতে হয়। বরণডালা হইতে মঙ্গল ভাড় লইয়া সেই ভাঁড় বরের পদমূল হইতে ক্রমে মাথার কাছে উঠাইয়া বরের মস্তকে ছোঁয়াইতে হয়। তার পর জল হাতে লইয়া সেই হাত উল্লিখিত রূপে চালনা করিবার পর গাত্রে ছিটা দিতে হয়। জলের পর প্রদীপের বরণ। প্রদীপ-পদমূল হইতে মা-থার কাছে উঠাইয়া তখন বরণকারী তাহার তাপ হাতে ধরিয়া বরের গালে বক্ষে কপালে দিয়া দেন।

উদ্ভিদ, মাটি, জল, উত্তাপ হইতেই সাধারণতঃ লোকে জীবনী শক্তি গ্রহণ করে। ধান দূর্ব্বা, মাটির ভাঁড়—জল ও প্রদীপের তাপ দিয়া বরণ করিবার হয়ত সেই জন্য বিশেষ কোন কারণ আছে। ইহার এমন কোন

রূপ শুভাকর্ষণ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত এই শুভাকর্ষণ গুণযুক্ত দ্রব্যকে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রঃপূত করিয়া তাহা বর কন্যার গাত্র সংস্পর্শ করাইলে বরণকারীর শুভ ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি হইয়া বরকন্যার উপর কার্য্য করিতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞানের জন্য আজ কাল ইয়োরপ মনুষ্য সমাজে প্রধান পদ গ্রহণ করিতেছে কিন্তু এই এক বরণের মধ্যেই প্রাচীন ভারত কতখানি সে জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। বরণের পর প্রদক্ষিণ। বরণ হইয়া গেলে বরকে কলা তলা হইতে সরাইয়া দালানের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রশস্ত স্থানে দাঁড় করাইতে হয়। তাহার পর যেদিকে বরের মুখফিরান —সেই দিকের কোন দ্রব্য যাহাতে বর না আর দেখিতে পায় সেই অভিপ্রায়ে দুইজন লোক একখানি পট্টবস্ত্রের দুই প্রান্ত ধরিয়া বরের চোখের সমুখে যবনিকা প্রস্তুত করে। তখন সেই স্ত্রী-আচার স্থলে কন্যা আনীত হয়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কন্যা পট্টবস্ত্র পরিয়া চন্দনচর্চ্চিত সুসজ্জিত হইয়া মন্ত্রঃপূত প্রাণে একটি নির্জ্জন গৃহে বসিয়াছিল। যাহাতে নির্জ্জন গৃহে এক মনে বসিয়া কন্যা, স্বামীর প্রাণে প্রাণ মিলাইতে সক্ষম হয়, স্বামীকেই একমাত্র প্রভু-বিধাতা বলিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্পী হইতে পারে—এই জন্যই বরণের পর কন্যার এই নির্জ্জন বাস সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যে এখনকার মত সাধারণ বাল্য-বিবাহ ছিল না তাহা বিবাহের এই সকল নিয়ম হইতেই বুঝা যাইতেছে।

কন্যা নির্জ্জন স্থান হইতে স্ত্রী-আচা স্থলে আনীত হইয়া এই যবনিকার আড়া সপ্ত সধবা মহিলার সহিত বর প্রদক্ষিণ ক যবনিকার এক পার্শ্বে বর আর অপ পার্শ্বে সপ্ত সধবা মহিলা—কেহ বরণডা মাথায় করিয়া কেহ জল ছড়াইতে ছড়া ইতে কেহ প্রদীপ লইয়া বরের চতুর্দ্দি ঘুরিতে থাকেন। মপ্ত মহিলাদের একজ কন্যার হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া ঘোরেন। মহিলাগণ বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবার সময়—বস্ত্র যবনিকাধারী দুই ব্যক্তি—সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা ঘুরাইতে ঘুরা ইতে চলে। সমস্ত প্রদক্ষিণের সময় বর কন্যা সমান যবনিকার আড়ালে থাকেন, কেহ কাহাকেও দেখিতে পান না।

বরণের সময় এখন সাধারণতঃ কন্যাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া এইরূপ প্রদক্ষিণ করান হয়। ইহাকে মেয়েলি ভাষায় সাত-পাক বলে। বাল্য বিবাহ প্রথা হইতেই এইরূপ পিঁড়িতে বসাইয়া ঘোরান প্রথা হইয়াছে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এরূপ হইত না। কন্যা স্বয়ং স্বামী প্রদক্ষিণ করিতেন—রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যেখানে স্বয়ম্বরার কথা আছে সেই খানেই ইহা দেখা যায়। আর এখনো যেখানে স্ত্রী-আচার আছে অথচ কন্যা নিতান্ত বালিকা নহে, সেখানে বালিকাকে আর পিঁড়ায় করিয়া ঘোরান হয় না।

বরণেরও যে উদ্দেশ্য প্রদক্ষিণেরও সেই উদ্দেশ্য। সপ্ত সধবা সুলক্ষণাক্রান্ত সুশীলা সাধ্বী মহিলা বরকন্যার শুভাকাঙ্ক্ষা

রিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করেন। চারিদিক ইতে তাহাদের শুভ ইচ্ছার তরঙ্গ বরের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। চারিদিক ইতে ইচ্ছার বলপ্রয়োগ করিলে তাহার কিরূপ কার্য্য হয় তাহা টেবিল জাগান ঘটনাহইতে সকলেই বুঝিতে পারেন। সে ইচ্ছার সমষ্টিভূত শক্তিতে জড়ও জাগিয়া উঠে মানুষের কি কথা!

মাতা, ঠাকুরমা প্রভৃতি বরণের বিশেষ যাঁহারা অধিকারিণী তাঁহারা যদি কোন কারণে বরণ করিতে না পারেন তবে অন্য যে সে সধবাই বরণ করিতে পারে না। বরণের জন্য প্রদক্ষিণ করিবার জন্য সচরিত্রা সাধ্বী মহিলাদিগকে বাছিয়া লইতে হয়—এমন কি অসচ্চরিত্র মন্দ স্ত্রীলোক-দিগের স্ত্রীআচার দালানে থাকাই নিষেধ। যে হিসাবে শুভ ইচ্ছা চালিত হইতে পারে সেই কারণে অশুভ মন্দ ইচ্ছারত ফল আছে। যদি জ্ঞাত ভাবেও কোন অস-চ্চরিত্র স্ত্রী বরকন্যার অশুভ ইচ্ছা না করে, তাহা হইলেও তাহাদের স্বভাবের দূষিত ভাব অজ্ঞাত ভাবে অন্য মহিলাদের শুভ ইচ্ছার ফলকে কতক পরিমাণে বিফল করিতে পারে।

এইরূপ বিশ্বাসকে কেহ কেহ কুসংস্কার মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক পবিত্র ভাবের পবিত্রতা, ও অপবিত্র ভাবের মলিনতা, যে সঙ্গগুণে অদৃশ্য ভাবে ক্রমে আমাদের উপর আসিয়া পড়ে ইহাত আমরা দৈনিক জীবনেই দেখিতে পাই। ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব বিশ্বাস করিলে ইহা ফলদায়ক বিবেচনা করিলে, ভাল মন্দ দুই ইচ্ছারি ফল আছে, এরূপ বিশ্বাস কেনই বা অস-ঙ্গত হইবে।

প্রদক্ষিণের পর শুভদৃষ্টি। সাতবার প্রদক্ষিণ হইবার পর—কন্যাকে বরের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তখন পট্টবস্ত্রের যবনিকা সরাইয়া, পট্টবস্ত্র খানি বর কন্যার মাথার উপর দিয়া ফেলিয়া দিতে হয়,—তাহাতে বর কন্যার নেত্রপথে বাহি-রের আর কিছু পড়িতে পায় না—কিম্বা বাহিরের কেহ বর কন্যাকে দেখিতে পায় না,—এইরূপে শত শত লোক বেষ্টিত হইয়াও বর কন্যার বিজন-শুভদৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রথম বরণ ও প্রদক্ষিণ দ্বারা যখন বর কন্যার হৃদয় মন্ত্রঃপূত হইল,—চারিদিকের শুভ ইচ্ছায় দুই জনের হৃদয় শুভভাবে পূর্ণ হইল—প্রেমের ভাবে উথ-লিয়া উঠিল—দুই হৃদয় এক করিতে দুজ-নকে দুজন সুখী করিতে—পরস্পরের প্রেমে বন্দী হইতে দুজনের উৎসুক হৃদি আকুল ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল—তখন শুভদৃষ্টি। শত শত রমণীর আশী-র্ব্বাদ মধ্যে, সুমঙ্গল হুলুধ্বনির মধ্যে সেই কবিতাময় শুভলগ্নে—সজন বেষ্টিত অথচ নির্জন কুঞ্জ মধ্যে বর কন্যার শুভদৃষ্টি—তাহাদের চারিচক্ষের মিলন। এই মিলনে এই দর্শনে—জানিনা কোন যুবক যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ—সুখের উচ্ছ্বাস উথলিয়া না উঠে,—নিতান্ত অপ্রেমিক হৃদয়কেও এ সময় কবিতাময় ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলে।

সেই শুভলগ্নে মন্ত্রঃপূত প্রাণে সেই যে বর, কন্যার মুখখানি কি চোখে দেখিয়া লন,—সেই দেখা, সেই ভাব পরে জীবনের শত সহস্র বিপ্লবেও একেবারে মুছিয়া যাইবার নহে,—নানা অবস্থা চক্রে হৃদয় সে হৃদয় না থাকিলেও অন্ততঃ মনের চক্ষে এক একবার সে ভাব জলন্তভাবে জাগিয়া উঠিতে চাহিবেই চাহিবে ;—অন্ততঃ একবারের জন্যও আকুল ভাবে সেই পুরাতন কাল সেই পুরাত ভাবকে পাইতে মন ব্যগ্র হইবে। এরূপ যাহার একেবারে হয় না সে পাষাণ হইতেও পাষাণ, মানুষ হইয়াও পশুর অধম, —তাহার কথা এখানে মনে না করাই ভাল।

সেই শুভলগ্নে কবিতাময় মুহূর্ত্তে বর কন্যা উভয়ে উভয়কে মুগ্ধনেত্রে মুগ্ধ পরাণে দেখিয়া মনে মনে একজন আমার হৃদয়-রাণি বলিয়া অভিবাদন- করিলেন,—আর একজন তুমি আমার দেবতা বলিয়া মনে মনে প্রণাম করিলেন—উভয়ের প্রাণে প্রাণে যে কি ভাব বহিয়া গেল কি নীরব কথা চলিতে লাগিল—তাহা সে অবস্থায় যে না পড়িয়াছে তাহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই। শুভ দৃষ্টি হইয়া গেল, বর কন্যার হৃদয় সম্পূর্ণ রূপে মিশিয়া এক হইল, তাহার পর ভবিষ্যতে আবার সে হৃদয় স্বতন্ত্র করিতে কে পারে কে জানে!

ইহার পর মাল্য বদল। হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময় হইয়াছে, ইহার বাহিরের প্রকাশ মাল্য বদল। মাল্য বদল হইয়া গেলে তখন বর কন্যা লোক সমাজে উভয়ে উভয়কে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবার উ যুক্ত হইলেন, তখন জগতের সমক্ষে দুজ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

বিবাহের পর দিন বর কন্যাকে বরে ঘরে আনা হইলে তখন বরের মাতা ব কন্যা দু জনকে একত্রে বরণ করেন। বিবাহের রাত্রে বর কন্যাকে পৃথক পৃথ যেরূপ বরণ করা হইয়াছে বিবাহের প দিন তাহাদের এক সঙ্গে দাঁড় করাইয় সেইরূপ জল, প্রদীপ, ধান, দূর্ব্বা মঙ্গলভাঁ ইত্যাদি সকলরূপ উপকরণ দিয়া দু জনকে একসঙ্গে বরণ করিতে হয়। তাহার প বৌভাতে ফুলশয্যায় ইহাতেও বরণ আছে। এইরূপে ক্রমাগত শুভ ইচ্ছার চালনা দ্বারা বর কন্যার মনকে এক করা, শুভ আশীর্ব্বাদ দ্বারা উহাদের সুখ কামনা করা হইয়া থাকে।

শুভ ইচ্ছার ফল, আশীর্ব্বাদের ফলের উপর যে আমাদের দেশেরই বিশ্বাস তাহা নহে, সকল দেশেই আশীর্ব্বাদের নিয়ম দেখা যায়। আশীর্ব্বাদ মাতা পিতা প্রভৃতি স্নেহময় হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। কিন্তু আমাদের দেশে এই আশীর্ব্বাদও অধিকতর ফলপ্রদ করিবার ইচ্ছায় এই উচ্ছাস মনের যথা শক্তি বলের সহিত প্রয়োগিত হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাই স্ত্রী আচার—ইহার মধ্যে কি কোন অর্থ নাই? ইহার মূল কি আমরা বিজ্ঞানের গভীর প্রদেশে প্রোথিত দেখিতেছি না?

স্ত্রী আচার যে কেবল বিজ্ঞানময় এমনও

, সরস কবিতাময় ভাবে ইহা পূর্ণ। ইহার মূলে কোন রূপ বিজ্ঞান না কিত—তাহা হইলেও কেবল ইহার কবিময় ভাবে অমর হইয়া ইহা ভারতবাসীগের ঘরে ঘরে বিরাজ করিত।

আমিত বলি স্ত্রী আচারই বিবাহের সব। চারিদিকে শত শত সুসজ্জিত দরী, চারিদিকে হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি—রিদিকে ফুল চন্দন সুগন্ধির পরিমল—হার মধ্যে একটি বালিকার নবপ্রেমে য় বিনিময়! বিবাহ করিয়া এ, আনন্দ নি অনুভব না করিয়াছেন তিনি কৃপাত্র অতিদীন। বিবাহ করিয়া তাঁহার খল পরাই সার।

তখনকার মুনি ঋষিরা যে কেবল বিজ্ঞানৎ ছিলেন এমন নহে—যথার্থ কবিও লেন। বিজ্ঞানের চক্ষে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হারাই অনুভব করিতে পারিতেন, এবং হা পারিয়া অন্যকেও সেই সৌন্দর্য্য অনুব না করাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন । সেই জন্যই তখনকার পুস্তক সকল মন প্রহেলিকাময়,—যে জ্ঞানে গভীর জ্ঞান লুক্কায়িত তাহাও কবিতা দ্বারা াবরিত। তাঁহারা জানিতেন সকল বিষর অন্তর নিহিত বিজ্ঞান লোকের দুর্ব্বোধ্য, ই জন্য সেই বিজ্ঞানকে তাঁহারা কবিতার াজ পরাইয়া সেই ছবি দেখাইয়া লোককে খী করিতে যত্ন করিতেন। যে তাহার ন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত সে বিজ্ঞানও ঝিত, যে না পারিত সে কবিতাটুক লইাই সুখী হইত।

তাঁহারা মহান চেতা—আপনারা যে আনন্দ লাভ করিতেন সে আনন্দের ভাগ অন্যকে না দিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না।

প্রবন্ধটি শেষ করিবার আগে এইখানে আরো দু একটি কথা বলিব।

অনেক কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মহোদয়গণ আমাদের ভগ্ন সমাজের সংস্কারে আজ কাল যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু কিরূপ করিয়া সংস্কার করা উচিত ইহা লইয়া দুই দল লোকে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এক দল বলেন—যাহা কিছু নূতন মসলা—তাহাই মন্দ, তাহা দিয়া সমাজ সংস্কার অনুচিত—বিদেশীয় ভাষা বিদেশীয় ভাব এমন কি জ্ঞান পর্য্যন্ত বিদেশীদিগের নিকট লইব না।

আর এক দল বলেন যাহা কিছু পুরাতন তাহাই অজ্য, দেশীয় রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, কিছুই তাঁহাদের ভাল লাগে না—সকলি অর্থ শূন্য কুসংস্কার বলিয়া বোধ হয়। আমরা বলি এই প্রান্ত সীমাস্থিত দুই মতের মধ্যস্থানে থাকিয়া চলিতে পারিলেই যথার্থ দেশের উন্নতি হইবে।

বিদ্যা, জ্ঞানের কুল শীল নাই—তাহা সর্ব্বস্থান হইতেই গ্রহণীয়। এমন কি বিদেশীয় কোন রীতিনীতির অনুকরণ মাত্রেই যে সকল অবস্থাতেই কুফল প্রদ তাহাই বা কি রূপে বলা যায়।

যাহা কিছু পাশ্চাত্য তাহা সমস্তই অবহেলা করিলে যেমন উন্নতির আশা নাই, তেমনি রীতিনীতি যাহা কিছু দেশের

যাহা কিছু পুরাতন তাহা ত্যাগকরাও যুক্তি সিদ্ধ নহে।

পুরাতনই হউক নূতনই হউক দেশীয়ই হউক বিদেশীয়ই হউক সকল আচার ব্যবহার রীতি নীতির সার্থকতা, অর্থ, উ অনুসন্ধান করিয়া, দোষগুণ স্থির ক তবে গ্রহণ বা ত্যাগ করা না করা স্থি আবশ্যক। *

সন্ন্যাসীর জীবন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমি কাটমুণ্ড সহর পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিনাথ দর্শনে যাত্রা কালীন পথে কনকগিরি নামে একটি যুবতী সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎলাভ করি। ইনিও আর কয়েকটি যাত্রীর সহিত মুক্তি নাথ দর্শনে যাইতেছিলেন—আমি ইহাদের আর একটি সঙ্গী হইলাম। এই নবীন বয়সে কি দুঃখে কনক সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন তাহা জানিবার জন্য কুতূহল হইয়া একদিন মধ্যাহ্নে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে তাঁহার জীবন কাহিনী বলিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি তাহাও হয়ত পাঠকগণ ভোলেন নাই।

কনক আমার ঐ প্রশ্ন শুনিয়া বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, "ভাই সে সকল দুঃখের কথা কহিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।" এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার নেত্র দ্বয় হইতে অবিরত অশ্রু বারি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তদৃষ্টে আমি তাঁহাকে বহু মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিলাম। পরে তিনি গদ গদ বচনে যে পরিচয় দিয়াছিলেন আমি সংক্ষেপে লিখিতেছি। তাঁহার জন্ম ভূমি মধ্য প্রদেশে, মাতার জ কাশ্মীর রাজ্যে, তাঁহার জন্ম গুজরাট হয়। তাঁহার পিতা বেদান্তাদি শাস্ত্রে শয় পণ্ডিতছিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশ্মীর দেশে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি কের মাতার অসামান্যরূপ লাবণ্য বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণি গ্রহণ ক কনকের মাতাও বিদ্যাবতী ছিলেন, কনকও অল্প বয়সের মধ্যে ধর্ম্মশা পড়িয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়ঃ বৎসর হইয়াছিল তখন তাঁহার পিতা পরিণয়ের জন্য বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ কু ভব ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী এক সুন্দর পুরুষকে মনোনীত করিয়া হিমাচল নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার বিবাহ দিয়াছি বিবাহান্তে তিনি স্বামী সহ তাঁহার পি তপোবনে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করি

* আমি যেরূপ স্ত্রী-আচার দেখিয়াছি এ প্রবন্ধে তাহারি স্থূল বর্ণনা করা হ য়াছে। স্ত্রী-আচারের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান আছে তাহা ইহাতে লি দে। শ্রীযুতের মুখারবিন্দ হইতে এই করিয়া বলা হয় নাই, শেষোক্ত অনুষ্ঠান গুলি গৃহভেদে কিছু কিছু প্রভেদ বচন নিঃসৃত হইবামাত্রই কয়েকদেখা যায়।

লের অর্থাদি বুঝিতে না পারিতেন তাহার পিতার নিকট বুঝাইয়া লই। তাঁহার পিতার অন্য কোন সন্তানাথাকাতে তাঁহাদিগকে দূরে যাইতে য়া আপনাদের সহিত এক আশ্রমেই লেন। কিন্তু বিবাহের কিছু কাল পরেই র যৌবনকাল প্রস্ফুটিত না হইতেই কাল হইল—স্বামী হীনা হইবার দিন পরেই জনক জননীও ইহলোক াগ করিলেন। তাঁহার পিতামাতা ান্তর প্রাপ্তির পর তিনি একাকী ভ্রমণ ত করিতে একদা কোন এক সন্ন্যাসীর উপস্থিত হন। উক্ত মঠের মোহন্ত য় তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া, া মাতা বলিয়া ডাকিতেন। তিনি র স্নেহে বশীভূত হইয়া নিরুদ্বেগে উক্ত াবজ্জীবন বাস করিবেন এইরূপ মনস্থ াছিলেন। মনুষ্যের আশা কখনই য় না তাহাতে নানা রূপ বিঘ্ন আছেই ।

এক দিন মোহন্ত মহাশয় নত মস্তকে বহু ভন প্রদর্শন ও বিস্তর অনুনয় বিনয় া কনককে বলিলেন তিনি তাহার চরণে বিকাইয়াছেন। কিন্তু কনককে কিছুতে ইতে না পারিয়া মোহন্ত মহাশয় ন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া আপন ভৃত্যকে য়া কহিলেন, এই সন্ন্যাসিনীকে যথেষ্ট র করিয়া উহার ঝুলি ডাণ্ডা কাড়িয়া া উহাকে এখনি মঠ হইতে তাড়া-

জন ভৃত্য ও কয়েক জন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া, তাঁহার দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া গভীর অন্ধকার রজনীতে তাঁহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দেয়। তথা হইতে তিনি নানা স্থানের তীর্থ দর্শন করিয়া একদা পুষ্করের নিকট কোন এক গ্রাম হইতে দূর গ্রামান্তরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ক্লান্ত হইয়া, এক ক্ষুদ্রারণ্যের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রামান্তে গাঢ় মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা পাঠ করিতে ছিলেন। ঐ সময় তিনজন জটাজূটধারী নাগাসন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি গীতা পাঠে নিবিষ্ট থাকা প্রযুক্ত তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। উক্ত নাগাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কর্কশ স্বরে তাঁহাকে কহিল "** বার বিলাসিনি তুই আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছিস্ না * *।" তাহার রূঢ় অশ্রাব্য বাক্য সকল শুনিয়া তিনি বিনয় ও নম্রভাবে তাহাদিগকে অভিবাদন পুরঃস্বর কহিলেন, "আমি অনন্যমনা হইয়া গীতা পাঠে ব্যাপৃত ছিলাম, এজন্য আপনাদিগের আগমন জানিতে পারি নাই। আপনারা আমার পিতা, আমি আপনাদিগের কন্যার স্বরূপ, আপনারা অতিশয় বিজ্ঞ, মহাত্মা, আমি অজ্ঞান বালিকা, আমি অত্যন্ত অনভিজ্ঞতার কার্য্য করিয়াছি, তাহা নিজ মহদ্গুণে ক্ষমা করুন।" ইত্যাদি প্রকারে তিনি তাহাদিগকে বহু স্তুতি মিনতি করিলেও তাহারা তাহাকে ক্ষমা না করিয়া আক্রমণ করিতে

বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি যে সময়ে বৈরাগ্য পথ আশ্রয় করেন ঐ সময়ে নবাব সাহেবের অনেক হিন্দু কর্ম্মচারীরা সন্ন্যাসী, বৈরাগী, উদাসী, যোগী ইত্যাদি ধর্ম্মমার্গ আশ্রয় করেন, মুসলমান কর্ম্মচারীর মধ্যে অনেকে ফকিরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল বাক্যালাপন শুনিতে শুনিতে তৃতীয় প্রহর যামিনী অতিবাহিত হইল, তখন আমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সঙ্গীদিগের পার্শ্বে আসিয়া অদ্রিগহ্বরে বহ্নি সেবন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলাম। প্রভাতে পূর্ব্ব নিশির পরিচিত সাধুমহাশয়েরা একদিকে চলিয়া গেলেন, আমরা অপর দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে একটী নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। ঈশ্বরের অসীম রাজ্যে কোন বস্তুরই অভাব নাই, তিনি হিমালয় পর্ব্বতেও মনুষ্যের বাসোপযুক্ত গহ্বর সকল সৃজন করিয়াছেন, আমরা তথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ঐ দিবস ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার কাহারো ইচ্ছা হইলনা। এজন্য ঐ স্থানে সকলেই বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সায়াহ্ন কালের পূর্ব্বে আমি উক্ত নদীতটে বৃহদাকার একখণ্ড প্রস্তরোপরি উপবেশন করিয়া, প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য শোভা সন্দর্শনে মোহিত হইয়া, একদৃষ্টে সম্মুখস্থ পর্ব্বতোপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনন্যমনে জগৎপাতা জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় সৃজন কৌশল মনে মনে আলোচনা করিতেছি, এমত সময় পশ্চাৎ দিক হইতে নিঃশব্দ পদ সঞ্চালনে কনক আসিয়া আমার উভয় চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার কোমল হস্ত স্পর্শ মাত্রই অনুভবে বুঝিতে পারিয়া আমি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলাম। তখন তিনি আমার চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া উচ্চ হাস্যে কহিলেন "আপনি কি ঘরে বউ ফেলে এসেছেন তাই একেলা নির্জ্জনে বসিয়া এত চিন্তা করিতেছেন?" তাঁহার বাক্য শুনিয়া আমি মৃদু হাস্যে কহিলাম মূলেই শূন্য তার আর ভাবনা কি। এই বাক্য আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইবামাত্রই তিনি কহিলেন তবে একটি বিয়ে করবার ভাবনা ভাবছেন, তার আর ভাবনা কি, কালই এতদ্দেশীয় একটি সুন্দরী থাকালি জাতীয় মেয়ের সঙ্গে আপনার বিবাহ দিয়ে দেব।" তাঁহার বাক্য শুনিয়া আমি হাস্য পূর্ব্বক কহিলাম সন্ন্যাসীকে সুন্দরী কন্যা কে দান দিবে? তিনি হাস্য বদনে উত্তর দিলেন "এই উত্তরাখণ্ডেই পূর্ব্বকালে ভগবান মহাদেবকে হিমালয়রাজ পরমা সুন্দরী গৌরী নামক কন্যা দান দিয়াছিলেন তাতো জানেন। এইজন্য কহিতেছি আপনি সুন্দর যুবা পুরুষ আপনাকে কন্যা দান দিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি, আমি কালই ঘটকালি করিব, কিন্তু ঘটকালির বিদায়টা আমাকে কি দিবেন।" তদুত্তরে কহিলাম তোমার নিমিত্ত আমিও একটি সুপাত্র খুজিয়া দিব তাহা হইলেই গায়ে গায়ে শোধ যাইবে"। তিনি বলিলেন

বিধবার কি আর বিয়ে হয়!" আমি কহিলাম বিধবার বিবাহ হয় ইহা শাস্ত্র সঙ্গত, বিশেষ সন্ন্যাসিনী দিগের সচরাচর হইয়া থাকে ইহা কি তুমি জাননা? এতদুত্তরে তিনি বলিলেন ব্রহ্মচারীরও বিবাহ হয় ইহাও শাস্ত্র সঙ্গত, বিশেষ লোক নিন্দাও নাই"। অবশেষে আমি তাঁহাকে কহিলাম এ বাদানুবাদে তোমারি জয়, সে যাহা হউক স্ত্রীকে যে বউ বলে একথা তুমি কেথায় শিখিয়াছিলে, সত্য করিয়া আমার নিকট বল দেখি? তিনি বলিলেন "আপনি বুঝি মনে করেন আমি বাঙ্গালা কথা কিছুই জানিনা, সকল কথা মুখে বলিতে পারি আর না পারি দুই চারটা কথা বুঝিতে পারি। তিনি (স্বামী) আমাকে সামান্য সামান্য কতক গুলি কথা ও চারি পাঁচটা গান শিখাইয়াছিলেন, ঐ সকল কথা প্রায় এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছি, গান গুলি স্মরণ আছে কিন্তু তাহার অর্থ আমি জানিনা। আপনি যদি কৃপা করিয়া তাহার অর্থ আমাকে বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে আমি বড় সুখী হইব, আমি কহিলাম তুমি গাও আমি অর্থ বুঝাইয়া দিব"।

এই বাক্য শুনিয়া তিনি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমশঃ।

উদাসীন।

সংস্কার-রহস্য।

ভারতবর্ষবাসী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির নিমিত্ত কতকগুলি অবশ্য-অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, সে সকল ক্রিয়া অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে। ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যগণ মনে করিতেন, যেমন বস্ত্রে ক্ষারসংযোগ, উত্তাপন, ও নির্নেজনাদি করিলে বস্ত্রের সংস্কার হয়, ভগ্নাংশ নূতন করিলে গৃহের সংস্কার হয়, মার্জ্জন করিলে দেহের সংস্কার হয়, তদ্রূপ যাগ হোম প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেও ক্রমে আত্মার সংস্কার সাধিত হয়। সংস্কার ব্যতীত মানবাত্মা পবিত্র হয় না, পারলৌকিক উন্নতির যোগ্যপাত্র হয় না।

পারলৌকিক উন্নতিকারক সংস্কার দ্বিবিধ। বৈদিক ও স্মার্ত্ত। বেদ-প্রধান কালে অর্থাৎ অতি আদিম কালে আর্য্যগণ যেমন বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানরূপ সংস্কার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন, তৎসঙ্গে

কোন পূজাদি কার্য্য করিতেন না। কিছু-কাল পরে বেদমর্ম্ম বজায় রাখিয়া স্মৃতিকার ঋষিরা আরও কতকগুলি অধিকার-বোধক ক্রিয়ার উপদেশ করিলেন। সে সকল উপ-দেশ ক্রমে স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম বা স্মৃত্যুক্ত সংস্কার বলিয়া অভিহিত হইল। গৌতম ঋষি সর্ব্ব-সমেত চত্বারিংশৎ অর্থাৎ ৪০ চল্লিশটী মাত্র সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে বৈদিক সংস্কারগুলি লোপ পাইয়াছে, স্মার্ত্ত সংস্কারের মধ্যে দশটী মাত্র সংস্কার অদ্যাপি কৃত হইয়া থাকে। বৈদিক সংস্কার ও স্মার্ত্ত সংস্কার একত্রে গণনা করিলে যে চত্বারিংশৎ সংখ্যক হয় তাহার প্রমাণ এই—

"গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত-কর্ম্ম, নামকরণান্নপ্রাশন, চৌলোপনয়নানি। চত্বারি বেদব্রতানি। স্নানং সহচারিনীসং-যোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানম্। অষ্টকা পার্ব্বণশ্রাদ্ধং শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্রী আশ্ব-যুজীতি সপ্তপাকযজ্ঞসংস্থা। অগ্ন্যাধেয়-মগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্ম্মাস্যানি। আ-শ্রয়জেষ্টির্নিরূঢ়পশুবন্ধঃ সৌত্রামনীতি সপ্ত-হবির্যজ্ঞাসংস্থাঃ। অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম-উক্থ্যঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্র আ-প্তোর্যাম ইতি সপ্তসোমসংস্থাঃ। ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কারা ইতি। যস্যেতে চত্বা-রিংশৎ সংস্কারা অষ্টাবাত্মগুণাশ্চ স ব্রাহ্মণঃ সাযুজ্যমাপ্নোতি ইতি।"

(গৌতমস্মৃতি।)

অর্থ—গর্ভাধান (১), পুংসবন (১), সীম-ন্তোন্নয়ন (১), জাতকর্ম্ম (১) নামকরণ (১), অন্নপ্রাশন (১), চূড়াকরণ(১), ও উপনয়ন(১) এই সাতটির শেষ চারিটী বেদব্রত অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইবার জন্যই করিতে হয়। অনন্তর সমাবর্ত্তন-স্নান (১) পরে সহ-চারিণী-সংযোগ অর্থাৎ বিবাহ (১)। বিবা-হের পর প্রতিদিন পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান (১) তিনটী অষ্টকাশ্রাদ্ধ (১) পার্ব্বণশ্রাবণী (১) অগ্রহায়ণী (১), চৈত্রী (১) ও আশ্বযুজী (১) নামক পাক যজ্ঞ। অগ্ন্যাধান (১), অগ্নি-হোত্র (১) দর্শযাগ (১), পূর্ণ মাস যাগ (১) ও চাতুর্ম্মাস্য যাগ (১) আশ্রয়ণ ইষ্টি (১) পশুবন্ধ (১), সৌত্রামনী (১),। অগ্নিষ্টোম (১), অত্যগ্নিষ্টোম (১), উক্থ্য (১), ষোড়শী (১), বাজপেয় (১), অতিরাত্র (১), আপ্তো-র্যাম (১)। সর্ব্বসমেত ৪০। যে ব্যক্তির এই ৪০ প্রকার সংস্কার ও ৮ প্রকার আত্মগুণ জন্মে, সে ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার সমান ও ব্রহ্মলোকবাসী হয়। *

মহর্ষি হারীত বলেন, দ্বিজবর্ণের সংস্কার দুই প্রকার। ব্রাহ্ম ও দৈব। তন্মধ্যে গর্ভা-ধান প্রভৃতি সংস্কারগুলি যাহা কেবল স্মৃতির অনুমোদিত বা স্মার্ত্ত-সংস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে—সেই সকল সংস্কার ব্রহ্মা এবং পাক যজ্ঞ ও হবির্যজ্ঞ প্রভৃতি অর্থাৎ বেদ প্রতি-পাদিত সংস্কারগুলি দৈব। ব্রহ্মা সংস্কারে সংস্কৃত হইলে আত্মা ঋষিলোক প্রাপ্ত হয় এবং দৈব সংস্কার উপপন্ন হইলে জীব দেব-লোকে গমন করে।

অঙ্গিরা নামক ঋষি, গৌতমোক্ত ৪০ সংস্কারের মধ্যে ২৫ টা-সংস্কারের অবশ্য-কার্য্যতা দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ সকল সংস্কারের হউক বা না হউক ব্রাহ্মণদিগের ২৫ টা সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; অন্যগুলি হয় ভালই, না হইলেও হানি নাই। যথা—

"গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো বলিরেবচ।
জাতকৃত্যং নামকর্ম্ম নিষ্ক্রমোঽন্নাশনং পরম্॥
চৌলকর্ম্মোপনয়নং তদ্ব্রতানাং চতুষ্টয়ম্।
স্নানোদ্বাহৌ চাগ্রহণমষ্টকাশ্চ যথাযথম্॥
শ্রাবণ্যামাশ্বযুজ্যাঞ্চ মার্গশীর্ষাঞ্চ পার্ব্বণম্।
উৎসর্গশ্চাখুপাকর্ম্ম মহাযজ্ঞাশ্চ নিত্যশঃ॥
সংস্কারা নিয়তা হ্যেতে ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
পঞ্চবিংশতিসংস্কারৈঃ সংস্কৃতা যে দ্বিজাতয়ঃ॥
তে পবিত্রাশ্চ যোগ্যাশ্চ শ্রাদ্ধাদিষু সুমন্ত্রিতাঃ॥

অঙ্গিরা স্মৃতি।

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, বিষ্ণু-বলি, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্ন-প্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, উদ্বাহ, আশ্রয়ণ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ শ্রাবণী আশ্বিনী ও মার্গশীর্ষীতে পার্ব্বণ, উৎসর্গ, উপাকর্ম্ম, (এই দুইটা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে) ও মহাযজ্ঞ। যে দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) এই পঞ্চ বিংশতি সংস্কার ক্রিয়ার সুসংস্কৃত হয়, সে পবিত্র হয় এবং শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্যকরণের যোগ্যতা লাভ করে।

আশ্বলায়ন নামক অন্য এক মুনি লি-খিত সংস্কার গুলির সংজ্ঞা ও কর্ত্তব্য ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে—

"নৈমিত্তিকাঃ ষোড়শোক্তাঃ সমুদ্বাহাবসা-নকাঃ।
সপ্তৈবাগ্রয়নাদ্যাশ্চ সংস্কারা বার্ষিকা মতাঃ॥
মাসিকং পার্ব্বণং প্রোক্ত মশক্তানান্তু বার্ষি-কম্।
মহাযজ্ঞাশ্চ নিত্যাঃ স্যুঃ সন্ধ্যাবচ্চাগ্নিহোত্র-বৎ॥"

সংস্কার সমূহের মধ্যে ১৬টী নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। আশ্র-য়ণ—ইষ্টি প্রভৃতি সাত প্রকার পাকযজ্ঞ বার্ষিক অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র করিতে হয় এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধগুলি মাসিক অর্থাৎ মাসে মাসে করিতে হয়। অশক্ত হইলে বার্ষিক অর্থাৎ বৎসরে একবার করি-লেও হয়। মহাযজ্ঞ (পঞ্চ যজ্ঞ) গুলি সন্ধ্যা-বন্দনা ও অগ্নিহোত্রের ন্যায় নিত্য অর্থাৎ প্রতিদিনই করিতে হয়।

পূর্ব্বকালে এদেশের ব্রাহ্মণেরা এতগুলি সংস্কার অনুষ্ঠান করিতেন; কিন্তু এক্ষণে ইহার কিছুই নাই বলিলে বলা যায়। এখন আমরা বিবাহ, গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, চূড়া ও উপনয়ন ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতে দেখি না। ভবদেব ভট্ট, পশুপতি, কালেশী, এই তিন মহাত্মা তিন বেদের ব্রাহ্মণাদির জন্য যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দশটীমাত্র

---

* বিবাহান্তে ১০ দশ সংস্কার আমরা একটী করিয়া বলিব। পঞ্চ যজ্ঞের কথাও বলিব। তিন্‌মাসের তিনটী অষ্টমী তিথিতে মাংসান্ন দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করার বিধান আছে। সেই শ্রাদ্ধের নাম অষ্টকা। শ্রাবণী প্রভৃতি ও শ্রাদ্ধ। অগ্ন্যাধান প্রভৃতি যজ্ঞগুলি আমাদের "ভারতবর্ষীয় যজ্ঞ" প্র-স্তাবে দেখিতে পাইবেন। সর্ব্বভূতে দয়া ক্ষমা, ঈর্ষাত্যাগ, শুচিত্ব, অনায়াস, মঙ্গলা-নুষ্ঠান, কার্পণ্যত্যাগ ও নিস্পৃহ থাকা, এই দশটা আত্মগুণ বলিয়া খ্যাত।

সংস্কারের অনুষ্ঠান প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। সেই জন্যই এক্ষণকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা "দশবিধ সংস্কারই" জানেন এবং কেহ বা দশটীই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সামবেদিদের জন্য ভবদেব ভট্ট, যজুর্ব্বেদীদিগের জন্য পশুপতি, ঋগ্বেদীদিগের জন্য কালেশী পণ্ডিত উক্ত দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠানপদ্ধতি বঙ্গরাজ আদিশূরের রাজত্বকালে ও লক্ষণসেনের রাজ্যকালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এদেশের ব্রাহ্মণেরা এই সকল পদ্ধতি অদ্যাপি লইয়া কর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন। বটতলায় মুদ্রাকরেরা উক্ত গ্রন্থত্রয় মুদ্রিত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের অনেক উপকার করিয়াছেন বলিতে হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, শূদ্র জাতির সংস্কারক্রিয়া বিধিবোধিত কি না, এবং তাঁহাদের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা প্রকাশিত আছে। এসম্বন্ধে যমস্মৃতির অনুমতি এই যে শূদ্রেরাও এই সকল সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারে; কিন্তু অমন্ত্রক অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ না করিয়া কেবল নমোনমঃ বলিয়া উক্ত দশ প্রকার সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবেক। যথা—

"শূদ্রোঽপ্যেবংবিধঃ কার্য্যো বিনামন্ত্রেণ সংস্কৃতঃ।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই বিধানের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিশ্শূদ্রা বর্ণা স্ত্বাদ্যা ত্রয়োদ্বিজাঃ।
নিষেকাদ্যাঃ শ্মশানান্তা স্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারি প্রকার বর্ণের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ গর্ভাধানাদি শ্মশানান্ত কার্য্য সকল মন্ত্র পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক, শূদ্রবর্ণেরা অমন্ত্রক অনুষ্ঠান করিবেক।

শূদ্রের ন্যায় হতভাগিনী রমণীরাও এদেশের ঋষিদিগের ঘৃণার পাত্র ছিলেন, তাই তাঁহাদেরও সংস্কারগুলির শূদ্রের ন্যায় অমন্ত্রক অনুষ্ঠান হইত। কেবল বিবাহ সংস্কারটী তাঁহাদের মন্ত্র পূর্ব্বক হইত যথা—

"তূষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়া স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ।"

[সংস্কার ময়ূখ।

উল্লিখিত সংস্কাররাশির মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত আবশ্যক, কতকগুলি ঐচ্ছিক। অর্থাৎ না করিলেও ক্ষতি নাই। পরন্তু সংগ্রহকর্ত্তাদিগের সিদ্ধান্তে উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার গুলিই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সন্ন্যাসী হইলে উপনয়নের পর আর কোনও সংস্কার আবশ্যক হয় না; কিন্তু গৃহে থাকিলে হয়। আশ্বলায়ন শাখার উপনিষদ গ্রন্থে গর্ভলম্ভন, ও অনবলোড়ন নামক আরও দুই সংস্কারের উল্লেখ আছে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের মধ্যে কর্ণবেধ প্রভৃতি আরও কএকটী সংস্কারের কথা লিখিত আছে।

সংস্কারের প্রয়োজন কি? উদ্দেশ্য কি? শাস্ত্রকারেরা একথার কোন উত্তর দিয়াছেন কি না? এক্ষণে তাহাই অনুসন্ধান করা যাউক।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"গার্ভৈর্হোমৈ র্জাতকর্ম্মচূড়ামৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানা মপমৃজ্যতে।'

গর্ভাধান, হোম, জাতকর্ম্ম চূড়াকরণ, মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার, এই সকল দ্বারা দ্বিজজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির) জন্মকালীন পাপ ও গার্ভিক পাপ মার্জ্জিত হইয়া যায়।

গর্ভাধানাদি সংস্কার ক্রিয়ার দ্বারা উপরি উক্ত দোষ নষ্ট হয়—ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহা প্রধান প্রধান নিবন্ধকারেরা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রকাশ গ্রন্থকার যাহা বলেন—তাহার অভিপ্রায় এই যে—অযুক্তকালে, অথবা নিষিদ্ধকালে, কিম্বা কোন রূপ দোষসংস্রব সত্ত্বে যদি সন্তান জন্মে তবে তৎ কালের দোষ সকল সেই সন্তানশরীরে আশ্রয় করিবে। সেই সকল দোষের অন্য নাম গার্ভিক ও জন্মকালীন দোষ। কালে ইহা এক প্রকার প্রকৃতি বা স্বভাব বলিয়া গণ্য হয়। গর্ভাধানাদি সংস্কার করিলে সে সকল দোষ থাকে না,—সুতরাং দ্বিজজাতিরা শুদ্ধ প্রকৃতি হইয়া থাকেন। জন্মসংক্রান্ত দোষ, ও অশুচি গর্ভবাসজনিত দোষ (ভবিষ্যৎ মনুষ্যের বীজস্বরূপ শক্তি বিশেষ) সংস্কার কার্য্যের দ্বারা উন্মার্জ্জিত হয় বলিয়াই গর্ভাধানাদি সংস্কার করিতে হয় এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর নির্ণয় করিয়াছেন যে "গোত্র ব্যাধি সংক্রান্তি নিমিত্ত মনো ন তু পতিতোৎপন্নত্বাদি।"

গার্ভিক দোষ প্রভৃতি আর কিছুই নহে, উহা গোত্র সংক্রান্ত ব্যাধির সঞ্চারিত্ব শক্তি প্রভৃতিই মাত্র। সে দোষ সংস্কার কার্য্যের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়।

পুত্র যে পৈতৃক রোগে আক্রান্ত হয়, তাহা সকলেই বোধ হয় জানেন। সেইরূপ পৈতৃক মনোবৃত্তিও পুত্রে অনুক্রান্ত হইয়া থাকে। মাতৃদোষ কিছু কন্যাতেই অধিক বর্ত্তে। বীজের ও ক্ষেত্রের গুণে ও দোষে যেমন শস্যাদির কি বৃক্ষাদির গুণ ও দোষ ঘটনা হয়, সেই রূপ মাতাপিতার দোষে ও গুণে তদুৎপন্ন সন্তানেরা দোষী ও গুণী হয়। গুণ প্রার্থনীয় দোষ বর্জ্জনীয়। সেই জন্য, অর্থাৎ পৈতৃক ও মাতৃক দোষ যাহাতে পুত্রে অনুক্রান্ত না হয় তজ্জন্যই উল্লিখিত সংস্কার ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গর্ভাধান হইতে উপনয়ন কাল পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার করিবার অনুজ্ঞা আছে ঐ সকল সংস্কার যথাবিধি কৃত হইলে গোত্রজ ব্যাধি প্রভৃতির অবশ্যই সঞ্চারিতা শক্তি মার্জ্জিত হইয়া যায়। পিতার কাসরোগ থাকিলেও, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে যদি সন্তান জন্মে, যদি মাতা শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন থাকিয়া গর্ভরক্ষা করেন, প্রসবের পর ৮ বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার করিবার উপদেশ আছে, সেই সকল সংস্কার যদি যথা নিয়মে কৃত হয়, তাহা হইলে সে পুত্র কখনই পৈতৃক কাস রোগে আক্রান্ত হইবে না। মহর্ষিদিগের এইরূপ জ্ঞান তত্ত্বে যাহার বিশ্বাস থাকে, সে অবশ্যই ইহা প্রতিপালন করিবে।

আট বৎসরের অর্থ উপনয়ন। উপ-

নয়ন ১১ বৎসরেও হইয়া থাকে। ১১ বৎসরেও যাহাদের উপনয়ন না হয়, তাহাদের কালাতিক্রম জন্য পাপ হয়। অর্থাৎ ১১ বৎসরের পরেই পৈতৃক ও মাতৃক রোগাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে। তজ্জন্য তাহার সংস্কার ১১ বৎসরের মধ্যেই নির্ব্বা করা ভাল।

আর্য্যদিগের উপদিষ্ট সংস্কার তত্ত্বের উ- দ্দেশ্য বর্ণনা করা হইল এক্ষণে সংস্কারগুলির অনুষ্ঠান প্রকার যথাক্রমে বর্ণনা করিব।—

শ্রীরামদাস সেন।

হাতে কলমে।

প্রেমের ধর্ম্ম এই, সে ছোটকেও বড় করিয়া লয়। আর, আড়ম্বর-প্রিয়তা বড়কেও ছোট করিয়া দেখে। এই নিমিত্ত প্রেমের হাতে কাজের আর অন্ত নাই, কিন্তু আড়ম্বরের হাতে কাজ থাকে না। প্রেম শিশুকেও অগ্রাহ্য করে না, বার্দ্ধক্যকে উপেক্ষা করে না, আয়তন মাপিয়া সমাদরের মাত্রা স্থির করে না। প্রেমের অসীম ধৈর্য্য; যে চারা শত বৎসর পরে ফলবান্ হইবে, তাহাতেও সে এমন আগ্রহসহকারে জলসেক করে, যে, ব্যবসায়ী লোকেরা ফলবান তরুকেও তেমন যত্ন করিতে পারে না। সে যদি একটা বড় কাজে হাত দেয়, তবে তাহার ক্ষুদ্র সোপান-গুলিকে হতাদর করে না। প্রেম, প্রেমের সামগ্রীর বসনের প্রান্ত চরণের চিহ্ন পর্য্যন্ত ভালবাসিয়া দেখে। আর আড়ম্বর ধরাকেও সরা জ্ঞান করেন। ছোট কাজের কথা হইলেই তিনি বলিয়া বসেন, "ও পরে হইবে"। তিনি বলেন এক-পা এক-পা করিয়া চলা ও ত আপামর-সাধারণ সকলেই করিয়া থাকে, তবে উৎকট লম্ফ-প্রয়োগ যদি বল তবে তিনিই তাহা সাধন করিবেন, এবং ইতিহাস যদি সত্য হয় তবে ত্রেতাযুগে তাঁহারই এক পূর্ব্বপুরুষ তাহা সাধন করিয়াছিলেন। * তিনি এমন সকল কাজে হস্তক্ষেপ করেন যাহা "ঊনবিংশ শতাব্দীর" শাস্ত্রসম্মত, ইতিহাসসম্মত, যাহা কনষ্টিট্যুশনল। সমস্ত ভারতবর্ষের যত দুঃখ দুর্দ্দশা দুর্ঘটনা দুর্নাম আছে সমস্তই তিনি বালীর লাঙ্গুলপাশবদ্ধ দশাননের ন্যায় এক-পাকে জড়াইয়া একই-কালে ভারতসমুদ্রের জলে চুবাইয়া মারিবেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন-একটা ক্ষুদ্র অংশের কোন একটা কাজ সে তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। বিপুলা পৃথিবীতে জ-

* ইহা যদি কেহ "রুচিবিরুদ্ধ" বা গালাগালি জ্ঞান করেন তবে আমি "ঊনবিংশ শতাব্দীর" ডারুয়িনের দোহাই দিব!

য়া ইহাঁর আর কোন কষ্ট নাই, কেবল ধনাভাবের জন্য কিঞ্চিৎ কাতর আছেন। বামনদেব তিনপায়ে তিন লোক অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তদপেক্ষা বামন এই বামনশ্রেষ্ঠের জিহ্বার মধ্যে তিনটে লোক তিনটে বাতাসার মত গলিয়া যায়! "হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী" ও "সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্রের" মধ্যে অবিশ্রাম ফুঁ দিয়া ইনি একটা বেলুন বানাইতেছেন; অভিপ্রায়, আস্‌মানে উড়িবেন; সেখানে আকাশ-কুসুমের ফলাও আবাদ করিবার অনুষ্ঠান-পত্র বাহির হইয়াছে। ইনি যদি ইহাঁর উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করেন সে একরকম হয়, আর তা' যদি নিতান্ত না পারেন তবে না হয় খুব ঘটা করিয়া নিদ্রার আয়োজন করুন। হিমালয় নামক উঁচু জায়গাটাকে শিয়রের বালিশ করিয়া কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পা ছড়াইয়া দিন, দুই পাশে দুই ঘাটগিরি রহিল। স্থানসংক্ষেপ করিয়া কাজ নাই,কারণ আড়ম্বরের স্বভাবই এই, একবার সে যখন ঘুমায় তখন চতুর্দ্দিকে হাত পা ছড়াইয়া এম্‌নি আয়োজন করিয়া ঘুমায় যে, কাহার সাধ্য তাহাকে জাগায়। তাহার জাগরণও যেরূপ বিকট তাহার ঘুমও সেই রূপ সুগভীর।

কেবল আড়ম্বরপ্রিয়তার নহে, ক্ষুদ্রত্বেরই লক্ষণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের প্রতি মন দিতে পারে না। পিপীলিকাকে আমরা যে চক্ষে দেখি ঈশ্বর সে চক্ষে দেখেন না। বড়র প্রতি যে মনোযোগ বা হস্তক্ষেপ করে, আত্মশ্লাঘা, যশ, ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশায় সদাসর্ব্বক্ষণ তাহাকে উত্তেজিত করিয়া রাখিতে পারে, সে তাহার ক্ষুদ্রত্বের চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ছোটর প্রতি যে মন দেয়, তাহার তেমন উত্তেজনা কিছুই থাকে না, সুতরাং তাহার প্রেম থাকা চাই, তাহার মহত্ত্ব থাকা চাই—তাহার পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই, সে প্রাণের টানে সে নিজের মহিমার প্রভাবে কাজ করে, তাহার কাজের আর অন্ত নাই।

আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশ-প্রেম যাহার বেশী সেই প্রাণ ধরিয়া স্বদেশের ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অভাবের প্রতি মন দিতে পারে; সে কিছুই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে না। বাস্তবিকপক্ষে কোন্‌টা ছোট কোন্‌টা বড় তাহা স্থির করিতে পারে কে! ইতিহাস-বিখ্যাত একটা কুহেলিকাময় দিগ্‌গজ ব্যাপারই যে বড়, আর দ্বারের নিকটস্থ একটি রক্তমাংসময় দৃষ্টিগোচর অসম্পূর্ণতাই যে সামান্য তাহা কে জানে! কিসের হইতে যে কি হয়, কোন্ ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে কোন্ বৃহৎ বৃক্ষ হয় তাহা জানি না, এই পর্য্যন্ত জানি সহজ হৃদয়ের প্রেম হইতে কাজ করিলে কিছুই আর ভাবিতে হয় না। কারণ, সহজ ভাবের গুণ এই, সে আর হিসাবের অপেক্ষা রাখে না। তাহার আপনার মধ্যেই আপনার নথী, আপনার দলিল। তাহাকে আর চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া ছন্দ রচনা করিতে হয় না, সুতরাং তাহার আর ছন্দোভঙ্গ হয় না; আর যাহাকে গণনা করিতে হয়, তাহার গণনায় ভুল হইতেই বা আটক কি! সে বড়কে ছোট মনে

করিতে পারে, ছোটকে বড় মনে করিতে পারে।

আমাদের স্বদেশহিতৈষীদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহাদের এক হাতে ঢাল এক হাতে তলোয়ার—তাঁহাদের হাতের অপেক্ষা হাতিয়ার বেশী হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য কাজকর্ম্ম সমস্তই একেবারে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। এবং এই অবসরে দু-শ পাঁচ-শ ঊর্দ্ধপুচ্ছ জিহ্বা এককালে ছাড়া পাইয়া দেশের লোকের কানের মাথাটি মুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেছে। এই সকল ভীমার্জ্জুনের প্রপৌত্রগণের, স্বদেশের উপর প্রেম এত অত্যন্ত বেশী যে স্বদেশের "লোকের" উপর প্রেম আর বড় অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে, ইহাঁরা স্বদেশের হিতসাধনে অত্যন্ত উন্মুখ, সুতরাং স্বদেশীর হিতসাধনে সময় পান না। ব্যাপারটা যে কিরূপ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। ঘোড়াটা না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, ও সকলে মিলিয়া একটা ঘোড়ার ডিম লইয়া তা' দিতেছেন, দেশে বিদেশে রাষ্ট্র তাহা হইতে এক যোড়া পক্ষীরাজের জন্ম হইবে।

যে ব্যক্তি দয়া প্রচার করিয়া বেড়ায় অথচ ভিক্ষুককে এক মুঠা ভিক্ষা দেয় না, তাহার প্রতি আমার কেমন স্বভাবতই অবিশ্বাস জন্মে। সে, কথায় কথায় বড় বড় চেক্ কাটে, কেন না কোন ব্যাঙ্কেই তাহার এক পয়সা জমা নাই। পুরাকালে কাঠবিড়ালিদের মধ্যে একজন জ্ঞানী জন্মিয়াছিলেন। তিনি কুলবৃক্ষে বাস করিতেন। দর্শনশাস্ত্রে যখন তাঁহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিল, তখন তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, একটি শ্বেত পদার্থের অপেক্ষা শ্বেতত্ব ব্যাপক, একটি কুলফলের অপেক্ষা কুলফলত্ব বৃহৎ, কারণ তাহা চরাচরস্থ যাবৎ কুলফলের আধার। এই মহৎতত্ত্ব আবিষ্কারের পর হইতে কুলের প্রতি তাঁহার এমনি ঘৃণা জন্মিল যে, তিনি কুল ভক্ষণ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন—কুল-ত্বের চারা কিরূপে আবাদ করা যাইতে পারে ইহারই অন্বেষণে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর গবেষণার প্রভাবে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন এম্‌নি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল যে, কুলত্বের চারা আজ পর্য্যন্ত বাহির হইল না। আজিও সেই কুলগাছ তাঁহার সমাধির উপরে মনুমেণ্ট স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে, এবং ভক্ত কাঠবিড়ালীগণ আজিও দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া তাঁহাকে স্মরণ পূর্ব্বক সেই বৃক্ষ হইতে পেটভরিয়া কুল খাইয়া যায়। বিষ্ণুশর্ম্মার অপ্রকাশিত পুঁথিতে এই গল্পটি পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, হিতবাদ, প্রত্যক্ষবাদ এবং অন্যান্য বাদানুবাদের ন্যায় উক্ত কুলফলত্ববাদও সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই 'বাদ"কে যে কোন অনুষ্ঠান আশ্রয় করে সে উক্ত পূজনীয় কাঠবিড়ালী মহাশয়ের ন্যায় বেশীদিন বাঁচে না। আমাদের দেশহিতৈষিতাও বোধ করি নিজের মহত্ত্বের অভিমানে স্থূল খাদ্য ভক্ষণ করা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া হাওয়া ও বাষ্পের মত

আকারে জীবনধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই নিমিত্ত দেখা যায় আমাদের এই দেশহিতৈষিতা পদার্থটা কামারের হাপরের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিতেছে এবং পরের মুহূর্ত্তেই চুপসিয়া শুক্‌না চাম্‌চিকার আকার ধারণ করিতেছে। ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি নাই। ইহা হাওয়ার গতিকে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠে, আবার একটু আঘাত পাইলেই আওয়াজ করিয়া ফাটিয়া যায়, তারপরে আর সে আওয়াজও করে না, ফোলেও না। কিন্তু, খোরাক বদল করা যায় যদি, যদি ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের প্রতি দক্ষিণহস্ত চালনা করে, তবে আর এমনতর আকস্মিক দুর্ঘটনাগুলো ঘটিতে পায় না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজকর্ত্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা-না-একটা শুনিতেই হয়। কিন্তু কে সেই স্বদেশীয় অসহায়দের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়! বাঙ্গলার জেলায় জেলায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিলিতি উত্তরাধিকারীগণ চাবুক হস্তে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যে রাজত্ব অর্থাৎ অরাজকত্ব করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি গরীব অনাথদের পরিত্রাণ করিতে কে ধাবমান হয়! পেট্রিয়টেরা বলিতেছেন স্বদেশের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ তাঁহারা পাকেপ্রকারে জানাইতে চান্ তাঁহাদের হৃদয় নামক একটা পদার্থ আছে; তাঁহারা তাঁহাদের "মাথাব্যথার" কথাটা এমন্‌ই রাষ্ট্র করিয়া দিতেছেন যে, লোকে তাঁহাদের মাথা না দেখিতে পাইলেও মনে করে সেটা কোন এক জায়গায় আছে বা। কিন্তু হৃদয় যদি থাকিবে, হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায় না কেন? চারিদিক হইতে যখন নিপীড়িত স্বদেশীয়দের আর্ত্তস্বর উঠিতেছে, তখন সেই স্বজাতিবৎসল হৃদয় নিদ্রা যায় কি করিয়া? এইত সেদিন শুনিলাম, স্বজাতিদুঃখকাতর কতকগুলি লোক মিলিয়া একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের দেশীয় ব্যারিষ্টর অনেকগুলি তাহাতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বোধ করি, উক্ত ব্যারিষ্টরগুলির মধ্যে মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত এমন অল্পলোকই আছেন যাঁহারা বিদেশীর অত্যাচারীর হস্ত হইতে স্বদেশীয় অসহায়কে মুক্তি দিবার জন্য প্রাণ ধরিয়া টাকার মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। স্বজাতির প্রতি যাঁহাদের আন্তরিক প্রাণের টান নাই, তাঁহাদের "স্বদেশ" জিনিসটা কি জানিতে কৌতূহল হয়! সেটা কি রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান ও রাবণ বিবর্জ্জিত রামায়ণ? না কলার আত্যন্তিক অভাব বিশিষ্ট কলার কাঁদি! না লাঙ্গুলের সম্পর্কশূন্য কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড! ইতিহাসপড়া স্বদেশহিতৈষিতা এমনিতর একটা ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস-খাওয়া। দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত স্বদেশের দুঃখে যাহাদের হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হয়, তাহারা সেই হৃদয়বিদারণব্যাপারটাকে বিশেষ একটা দুর্ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করে না। তাহারা সেই বিদীর্ণ হৃদয়-

টাকে সভায় লইয়া আসে, তাহার মধ্যে ফুঁ দিয়া ভেঁপু বাজাইতে থাকে ও উৎসব বাধাইয়া দেয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই বিদীর্ণ হৃদয়ের রীতিমত কন্সট বসিয়া গেছে, নৃত্যেরও বিরাম নাই। কিন্তু এই অবিশ্রাম নৃত্যের উৎসাহে কিছুক্ষণের মধ্যে নটদিগের শরীর ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে ও তাহারা নাট্যশালার আলো নিভাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহে গিয়া শয়ন করে। কিন্তু দেশের লোকের সত্যকার ক্রন্দনধ্বনিতে—অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত কাল্পনিক অশ্রুজলে নহে,—মনুষ্যচক্ষুপ্রবাহিত লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সত্যকার অশ্রুধারায় যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কেবলমাত্র শ্রোতৃবর্গের করতালিবর্ষণে তাঁহাদের সে বিদীর্ণ-হৃদয়ের শান্তি নাই। তাঁহারা কাতরের অশ্রু-জল মুছাইবার জন্য নিজের ক্ষতিস্বীকার অনায়াসে করিতে পারেন। তাঁহারা কাজ করেন।

যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিরূপ কাজ তাহার উপযোগী তাহা জানিনা! অনেকের মতে মুষ্টিযোগের ন্যায় অত্যাচারের আর ঔষধ নাই—অবশ্য, রোগীর ধাত বুঝিয়া। যাহারা খৃষ্টান সভ্যতার ভান করিয়াও মনে মনে পশুবলের উপাসক, অকাতরে অসহায়দের প্রতি শারীরিক বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহা ভীরুতা মনে করে না, খেলাচ্ছলে কালো মানুষের প্রাণহিংসা করিতে পারে, কড়া মুষ্টিযোগ ব্যতীত আর কোন ঔষধ কি তাহারা মানে! স্নিগ্ধ কবিরাজি তৈল তাহাদের চরণে অবিশ্রাম মর্দ্দন করিয়া তাহার কি কোন ফল দেখা গেল! ইহাদের হিংস্র প্রবৃত্তি বোধ করি ব্যাঘ্রের মত ইহাদের হৃদয়ের ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, অবসর পাইলেই কাতরের মাথার উপরে অকাতরে লম্ফ দিয়া পড়ে। ইহাদের ধাত ইহারাই বুঝে। তাহার সাক্ষী আইরিষ জাতি। তাহারাও খুণী, এই জন্য তাহারা খুনের মাদার-টিংচার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা তাহাদের দুঃখ নিরাকরণের সহজ উপায় দেখে নাই, এই জন্য ডাকের পরিবর্ত্তে ডাইনামাইটযোগে আগ্নেয় দরখাস্ত ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতেছে! তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র স্বয়ং তাহাদের রোগীর জন্য অনন্ত অগ্নিদাহ প্রেস্ক্রিপ্‌শন্ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের আর অল্পে স্বল্পে কি করিবে? Simila Similibus curantur, অর্থাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, ইহা হোমিওপ্যাথিক বৈদ্যদের মত। কিন্তু আমরা ত খুণী জাত নহি, এবং ততদূর সভ্য হইয়া উঠিতে আমরা চাহিও না; মুষ্টিযোগ চিকিৎসাশাস্ত্রে আমাদের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই, এবং সে চিকিৎসা রোগীর পক্ষে আশুফলপ্রদ হইলেও চিকিৎসকের পক্ষে পরিণামে শুভকরী নহে। সুতরাং আমাদিগকে অন্য কোন সহজ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইংরাজের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশ্যে আমরা দেশীয় লোকদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিব। দেশের লোকের জন্য কেবল জিহ্বা আন্দোলন নহে, যথার্থ স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিব। বিদেশীয়ের হস্তে দেশের লোকের বিপদ নিজের অপমান ও

জের বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিব। হিলে একে, ইংরাজেরা আমাদের বিধাতৃবর্গ, মফস্বলে তাহাদের অসীম প্রভাব, হারা সুশিক্ষিত সতর্ক, তাহাতে আবার ংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ইংরাজ জুরি তাহাদের বিচারক; কেবল তাহাই নয়, তাহাদের স্বজাতি সমস্ত অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ন তাহাদের সহায়—এমন স্থলে একজন ভীত ত্রস্ত শিক্ষিত স্বদেশী-সহায়বর্জ্জিত দরিদ্র কৃষ্ণকায়ের আশা ভরসা কোথায়!

আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, agitate কর, অর্থাৎ বাক্‌যন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিও না। ইল্‌বর্টবিল্ ও লোকল্-সেল্লগবর্মেণ্ট সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াও। তাহার একটা ফল এই হইবে যে, লোকেদের মধ্যে পোলিটিকল্ এডুকেশন্ বিস্তৃত হইবে। স্বদেশের হিত কাহাকে বলে লোকে তাহাই শিখিবে। ইত্যাদি! কিন্তু ইন্দ্রদেবের ন্যায় আকাশের মেঘের মধ্যে থাকিয়া মর্ত্তবাসীদের পরম উপকার করিবার জন্য কন্‌ষ্টিটুশনল্‌হিষ্ট্রি-পড়া ইংরাজি বক্তৃতার শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিলেও তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে "পোলিটিকল্ এডুকেশন" প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। আমি বোধ করি, এ সকল শিক্ষা ঘরের ভিতর হইতে হয়, অত্যন্ত পরিপক্ক লাউ কুমড়ার মতন চালের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে না! যতবার মফস্বলে এক জন ইংরাজ এক জন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার সেই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক-পা এক-পা করিয়া আরও নামিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা দিবে কি করিয়া! যাহার গৃহের সম্ভ্রম প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে, তুমি তাহাকে লোকল্ সেল্‌ফ্ গবর্মেণ্টের মাচার উপর চড়াইয়া কি আর রাজা করিবে বল! ঘরে যাহার হাঁড়ি চড়ে না, তুমি তাহার ছবির হাতে একটা টাকার তোড়া আঁকিয়া তাহার ক্ষুধার যন্ত্রণা কিরূপে নিবারণ করিবে! যাহারা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে, শাসনকর্ত্তাদের ভয়ে যাহাদের অহর্নিশি নাড়ি ঠক্‌ঠক্ করিতেছে, তাহাদের হাতে শাসনভার দিতে যাওয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষা দিতে চাও ত এক কাজ কর; একবার একজন ইংরাজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ কর, একবার সে বুঝিতে পারুক্ ইংরাজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে, একবার সে হৃদয়ের মধ্যে জয়গর্ব্ব অনুভব করুক, একবার তাহার হৃদয়ের ন্যায্য প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হউক্! তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। সে জ্ঞান যদি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল না হয় তবে জাতির উন্নতি

কোথায়! ইংরাজেরা যে আমাদের পশুর ন্যায় জ্ঞান করে, ও তাহা ব্যবহারে ক্রমাগত প্রকাশ করে, ড্যাম নিগর বলিয়া সম্বোধন করে, ও কটাক্ষপাতে কাঁপাইয়া তোলে, ইহার যে কুফল তাহার প্রতিবিধান কিসে হইবে! Agitate করিয়া দরখাস্ত করিয়া একটা সুবিধাজনক আইন পাস্ করাইয়া যে টুকু লাভ, তাহাতেও এ লোকসান পূরণ করিতে পারে না। ইংরাজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে, দাসত্বের থরহরভীতি দূর হইবে, ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব! সে কখন্ হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন্ আসিবে? যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে! এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা, এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে,ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চ্চা।

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব, তখন আমাদের আর-এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে! স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু স্বদেশীদের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পাই নাই। তাহার কারণ, আমরা স্বদে প্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারি দিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব কেহ কাহারো সাড়া পাই না, কেহ কাহারে সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ! এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইংরা কেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও জনমণ্ডলী আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয় পরিবার মনে করিতে হইবে! কেন করিতে হইবে! না, সহরের কালেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত ঊর্দ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত! আমাকে যদি একজন ইংরাজ পথে অন্যায় প্রহার করে, তবে সেই বক্তাই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সে সময়ে কি আমরা আমাদের স্বদেশের কোন লোকের সাহায্য প্রত্যাশা করি! স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায় এমন আর কোথাও নহি! এই জন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না! হাতেকলমে এক একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া

প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পরে চোক বুজিয়া ঢুলিয়াছিল, ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যিপিরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময়, অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোন কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারিদিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে! তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কি, আফালনই বা কি! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন্ কাহার কাছে কোন্ চূলায় আমরা "agitate" করিতে যাইব!

তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সসঙ্কোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই, আফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি ও ঘৃণা সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া যোড় হস্তে তাহাকে মা বাপ বলিয়া তাহার নিকটে উমেদারী করি, ও তাহার খানসামা রসুলবক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ-সাহেব বলিয়া চাচা বলিয়া খুসী করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারী বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লবে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেলগাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, Gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও ব্যাবু অর্থে মসীজীবী ভীরু দাসকে বোঝে, ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাহাঁদের আহার্য্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পরি না, সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও! মনে করি, কেবল মাত্র আমাদের হাঁক শুনিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজের আসন তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে! কেতাবে পড়িয়াছি ইংরাজেরা স্বদেশে কি করিয়া agitate করে, মনে করি তবে আর কি, আমরাও ঠীক অমনি করিব ফলও ঠিক সেইরূপ হইবে; কিন্তু একটা constitutional সিংহচর্ম্ম পরিলেই কি ক্ষুরের জায়গায় নখ উঠিবার সম্ভাবনা আছে! গল্প আছে একটা গরু রোজ তাহার গোয়াল হইতে দেখিত তাহার মনিবের কুকুরটি লম্ফ-

ঝম্ফ করিয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিত এবং পরমাদরে প্রভুর পাত হইতে খাদ্যখণ্ড খাইতে পাইত; গরুটা অনেক দিন ভাবিয়া, অনেক খড়ের আঁটি নীরবে চর্ব্বণ করিয়া স্থির করিল, মনিবের পাত হইতে দুই এক টুকুরা সুস্বাদু প্রসাদ পাইবার পক্ষে এই চরণ-উত্থাপন এবং সঘনে লাঙ্গুল ও লোলজিহ্বা আন্দোলনই প্রকৃত Constitutional agitation; এই স্থির করিয়া সে তাহার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপরে লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করিল। কুকুরের সহিত তাহার ব্যবহার সমস্ত অবিকল মিলিয়া ছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি গোষ্ঠবিহারীকে নিরাশ হইয়া অবিলম্বে গোয়াল ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ আহার হইয়াছিল বটে. কিন্তু সেই বাহ্যিক আহারে পেট না ফুলিয়া পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমরাও agitate করি, বাহ্যিক পিট-থাব্‌ড়াও খাই, কিন্তু তাহাতে কি পেট ভরে? আর, ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাতযোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতর তামাসা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না? কেবল ইংরাজের পায়ের ধূলা লইয়া যোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিতে থাকিব, "দোহাই সাহেব, দোহাই হুজুর, ধর্ম্মাবতার, আমরা তোমাদের সমকক্ষ, আমরা তোমাদের ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার অতি পরিপক্ক কদলী-লোলুপ, আমাদিগকে তোমাদের লাঙ্গুলে জড়াইয়া উঠাও, তোমাদের উচ্চ শাখার পাশে বসাও, আমরা তোমাদের উক্ত পরহিতৈষী লাঙ্গুলে তৈল দিব!" যদি বা ইংরাজ অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদিগকে বসিবার আসন দেয় ও আমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহাতেই কি আমাদের প্রতি দিনকার নেপথ্যপ্রাপ্য লাথি ঝাঁটার অপমানচিহ্ন একেবারে মুছিয়া যাইবে! ইংরাজের প্রসাদে আমাদের যখন পদবৃদ্ধি হয়, সে পায়া কাঠের পায়া মাত্র, সহজ পদের অপেক্ষা তাহাতে পদশব্দ বেশী হয় বটে, কিন্তু সে জিনিষটা যখনই খুলিয়া লয় তখনই পুনশ্চ অলাবুর মত ভূতলে গড়াইতে থাকি। কিন্তু নিজের পদের উপরে দাঁড়াইলেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন ত ঘুচিল না; এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনিই কি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!

নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না, পরের এমনিই কি মাথাব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘৃণা করি, স্বভাষার

কথা কই না; স্ববস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া দিতে পারিলে গোলোক-প্রাপ্তিসুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষার, আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতিগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়ত সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন; নিজে যাহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা করিতে থাকেন ইংরাজেরা তাহাদিগকে সম্মান করিবে! সে স্থলে স্বজাতি বলিতে বোধ হয় তাঁহারা আপনাদের গুটি কয়েককে বুঝেন, ও নিজেদের সামান্য অভিমানে আঘাত লাগাতে স্বজাতির অপমান হইয়াছে জ্ঞান করেন। আমাদের গলার শৃঙ্খলটা ধরিয়া ইংরাজ যদি আমাদিগকে তাহাদের কড়িকাঠে অত্যন্ত উঁচু জায়গায় লট্‌কাইয়া দেয় তাহা হইলেই কি আমাদের চরম উন্নতি আমাদের পরম সম্মান হইল! যথার্থ স্থায়ী ও ব্যাপক উন্নতি কি আমাদের নিজের ভাষা নিজের সাহিত্য নিজের গৃহের মধ্য হইতে হইবে না! নহিলে পেটের মধ্যে ক্ষুধা লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইলে কি রূপ স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে! হৃদয়ের মধ্যে আত্মাবমান বহন করিয়া অনুগ্রহলব্ধ বাহিরের সম্মান খুঁটিয়া খুঁটিয়া মোরগপুচ্ছ বিস্তার করিলে মহত্ব কি! যেমন তেলা মাথায় লোকে তেল দেয়, তেম্‌নি টাকগ্রস্ত মাথা হইতে লোকে চুল ছিঁড়িয়া লয়। যে অবমানিত, তাহাকে আরও অবমানিত করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা ঘরে অবমানিত, সেই জন্যই আমাদিগকে পরে অবমান করে। সেই জন্য বলিতেছি, আইস আমরা ঘরের সম্মান রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই; স্বহস্তে আমাদের উৎকর্ষ সাধন করি; আমাদের গৃহের মধ্যে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করি; তবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বল সঞ্চয় হইবে। তখন এমন মহত্ব লাভ করিব যে পরের কাছে সামান্য সম্মানটুকু না পাইলে দিন রাত্রি খুঁৎখুঁৎ করিয়া মারা পড়িব না।

যাহা বলিলাম, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—ইংরাজেরা আমাদিগকে সম্মান করে না, তাহাদের অপেক্ষা হীন জ্ঞান করে এই জন্য সর্ব্বত্র শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ রাখিতে চায়। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সকলেই প্রস্তাব করিতেছেন, আমরা ইংরাজের নিকটে খুব গলা ছাড়িয়া বলিতে থাকি, তোমরা আমাদিগকে হীন-জ্ঞান করিও না, তাহা হইলেই তাহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে আরম্ভ করিবে।

আমি বলিতেছি প্রথমতঃ এ প্রস্তাবটা অসঙ্গত, দ্বিতীয়তঃ, যদি বা ইংরাজরা আমাদিগের প্রতি সম্মানের ভান করে, তাহাতেই বা আমাদের লাভ কি! বিকারের

রোগী কতকগুলা প্রলাপ বকিতেছে দেখিয়া তুমি না হয় তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিলে কিন্তু তাহার রোগের উপায় কি করিলে! আমাদের দেশের দুরবস্থার কারণ তাহার অস্থি মজ্জার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, বাহ্যিক লক্ষণ যে সকল প্রকাশ পাইতেছে তাহা ভাল বই মন্দ নহে, কারণ, তাহাতে রোগের নির্ণয় হয়। আমি তাহার রীতিমত চিকিৎসার জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা করিতেছি। আর, রোগও ত এক-আধটা নহে; আমাদের দেশের শরীরং তব্যাধি মন্দিরং নহে এযে একেবারে ব্যাধি-ব্যারাকং।

যদি আমার এই কথা কাহারো যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, যদি দৈবক্রমে আমার এ সকল কথা কাহারও হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায়, তিনি সহসা এমন স্থির করিতে পারেন যে, একটা সভা আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। কিন্তু আমার বলিবার অভিপ্রায় তাহা নহে।

এখন্ আমাদের কি কাজ!' এখন কি "সভা" নামক একটা প্রকাণ্ডকায় যন্ত্রের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব? মনে করিব যে, আমাদের স্বদেশকে একটা এঞ্জিনের পশ্চাতে জুড়িয়া দিলাম, এখন এ উর্দ্ধশ্বাসে উন্নতির পথেই ছুটিতে থাকুক্! এখন কি Public নামক একটা কাল্পনিক ভাঙ্গাকুলার উপরে দেশের সমস্ত ছাই ফেলিবার ভার অর্পণ করিব, ও যদি তাহাতে ক্রমে দেখিতে পাই, তবে সেই অনধিগম্য উপ ছায়ার প্রতি অত্যন্ত অভিমান করি ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইব! অর্থাৎ কর্ত্তব্য কাজকে কোন মতেই গৃহের মধ্যে না রাখিয়া অনাবশ্যক জেঠাইমার ম অবসর পাইবামাত্র সুদূরে গঙ্গাতীরে সমর্প করিয়া আসিব, ও তাহার পরম সদ্গতি করিলাম মনে করিয়া আত্মপ্রসাদসুখ অনু ভব করিব! তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করি Public কোথায়, Public কি! চারিদিকে মরুভূমির এই যে বালুকাসমষ্টি ধূধূ করি তেছে দেখিতেছি, ইহাই কি Public! ইহার মধ্য হইতে কয়েক মুষ্টি একত্র করিয়া স্তূপ করিয়া একটা যে মূর্ত্তির মত গড়িয়া তোলা হয়, তাহাই কি Public! তাহারই মাথার উপরে আমরা যত পারি কার্য্যভার নিক্ষেপ করি, ও তাহা বার বার ধসিয়া যায়। তাহার মধ্যে অটল স্থায়িত্বের লক্ষণ কি আমরা কিছু দেখিতে পাইতেছি!

কথায় কথায় সভা ডাকিয়া Public নামক একটা কাল্পনিক মূর্ত্তির হৃদয় হাতড়াইয়া বেড়াইবার একটা কুফল আছে। তাহাতে কোন কাজই হইয়া উঠে না; একটা কাজ উঠিলেই মনে হয়, আমি কি করিব, একটা বিরাট সভা নহিলে এ কাজ হইতে পারে না! আমি একলা যতটুকু কাজ করিতে পারি, ততটুকুও কোন কালে হইয়া উঠে না। মনে করি, হয় একটা অত্যন্ত ফলাও ব্যাপার করিব, নয় কিছুই করিব না! ক্ষুদ্র কাজ মনে করিলেই হাসি আসে। তাহা ছাড়া হয়ত এমনও মনে হয়,

ভা করিয়া তোলা সভ্যদেশপ্রচলিত একটা ন্তর; সুতরাং সভা না করিয়া কোন কাজ করিলে মনের তেমন তৃপ্তি হয় না! ইহা ব্যতীত, নিজের উদ্যম নিজের উৎসাহ, নিজের দায়িকতা, অতলস্পর্শ সভার গর্ভে একাতরে জলাঞ্জলি দিয়া আসা যায়।

আমাদের দেশের অবস্থা কি, তাহাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। এখানে Public নাই। উপন্যাসের দুয়ারাণী যেমন কুলগাছের কাঁটায় আঁচল বাধাইয়া স্বামীকর্ত্তৃক অবরোধসুখ কল্পনা করিত, আমরা তেমনি কাপড়চোপড় পরাইয়া একটা ফাঁকি পব্লিক সাজাইয়া রাখিয়াছি, কখন তাহাকে আদর করিতেছি, কখন তিরস্কার করিতেছি, কখন বা তাহার প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছি এবং এইরূপে মনে মনে ঐতিহাসিক সুখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখনও কি খেলার সময় ফুরায় নাই, এখনো কি কাজের সময় আসে নাই! মনে যদি কষ্ট হয়ত হৌক্, কিন্তু এই পুত্তলিকাটাকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এখন এই মনে করিতে হইবে, আমরা সকলেই কাজ করিব। যেখানে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিরুদ্যমী, সেখানে ব্যক্তিসমষ্টির কার্য্যতৎপরতা একটা গুজবমাত্র। আমি উনি তুমি তিনি সকলেই নিদ্রা দিব, অথচ আশা করিব "আমরা" নামক সর্ব্বনাম শব্দটা জাগ্রত থাকিয়া কাজ করিতে থাকিবে! সর্ব্বত্রই সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ, ও পরিণত অবস্থায় ব্যক্তিসাধারণ। প্রথম অবস্থায় মহাপুরুষ, পরিণত অবস্থায় মহামণ্ডলী। জলনিমগ্ন শৈশব পৃথিবীতেও আভ্যন্তরিক গূঢ়বিপ্লবে বিচ্ছিন্ন উন্নত শিখর সকল জলের উপর ইতস্তত জাগিয়া উঠিত। তাহারা একক মাহাত্ম্যে চতুর্দ্দিকের কল্লোলময় মহাপ্লাবনের মধ্যে জীবদিগকে আশ্রয় দিত। সমলগ্ন সমতল উন্নত মহাদেশ, সে ত আজ পৃথিবীর পরিণত অবস্থায় দেখিতেছি। এখনই যথার্থ পৃথিবীর ভূ-পব্লিক তৈরি হইয়াছে। আগে যেখানে ছিল মহাশিখর, এখন সেখানে হইয়াছে মহাদেশ। আমাদের এই তরুণ সমাজে, আমাদের এই ভাবিতে হইবে, কবে আমাদের সেই সামাজিক মহাদেশ সৃজিত হইবে! কিন্তু সেই মহাদেশ ত একটা ভুঁইফোঁড়া ভেল্কি নহে! সেই মহাদেশ সৃজন করিবার উদ্দেশে আমাদের সকলকেই আপনাকে সৃজন করিতে হইবে, আপনার আশপাশ সৃজন করিতে হইবে। আপনাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেকে উঠিব, প্রত্যেকে উঠাইব, এই আমাদের এখনকার কাজ। কিন্তু সে না কি কঠোর সাধনা, সে না কি নিভৃতে সাধ্য, সে না কি প্রকাশ্যস্থলে হাঙ্গাম করিবার বিষয় নহে, সে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সমষ্টি; সে কঠিন কর্ত্তব্য বটে, অথচ ছায়াময়ী বৃহদাকৃতি দুরাশা নহে, এই নিমিত্ত উদ্দীপ্ত হৃদয়দের তাহাতে রুচি হয় না। এরূপ অবস্থায় এই সকল ছোট কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ডমূর্ত্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র! আমাদের চারিদিকে, আমাদের আশে পাশে, আমাদের গৃহের মধ্যে আমা-

দের কার্য্যক্ষেত্র। সমস্ত কাজই বাকী রহিয়াছে, এমন স্থলে সমস্ত ভারতবর্ষকে একেবারে উদ্ধার করা, সে বরাহ বা কূর্ম্ম অবতারই পারেন; আমাদের না আছে নাসার পার্শ্বে তেমন দন্ত না আছে পৃষ্ঠের উপরে তেমন বর্ম্ম।

এখন আমাদের গঠন করিবার সময়, শিক্ষা করিবার সময়। এখন আমাদিগকে চরিত্র গঠন করিতে হইবে, সমাজ গঠন করিতে হইবে, পব্‌লিক গঠন করিতে হইবে। বিদেশীয়দের দেখাদেখি আগে ভাগে মনে করিতেছি, সমস্ত গঠিত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য গঠনশালার গোপনীয়তা নষ্ট করিয়া কতকগুলি কুগঠিত কাঠখড়-বাহির-করা অসম্পূর্ণ বিরূপ মূর্ত্তি জনসমাজে আনয়ন করিয়া আমরা তামাসা দেখিতেছি। শত্রু পক্ষ হাসিতেছে।

এতক্ষণে সকলে নিশ্চয় বুঝিয়াছেন পব্‌লিকের উপযোগিতা স্বীকার করি বলিয়াই আমি এত কথা বলিতেছি। এখন দেখিতে হইবে পব্‌লিক গঠন করিতে হইবে কি উপায়ে! সে কেবল পরস্পরকে সাহায্য করিয়া। হাতেকলমে প্রকৃত সাহায্য করিয়া। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করা চাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভর করা চাই। মমতাসূত্রে সকলের একত্রে গাঁথা থাকা চাই। নতুবা, কাজের বেলায় কে কাহার তাহার ঠিকানা নাই, অথচ বক্তৃতা করিবার সময় বক্তা ওঝা মহাশয় মন্ত্র পড়িয়া কোন্ বটবৃক্ষ হইতে যে পব্‌লিক ব্রহ্মদৈত্যটাকে সভা-স্থলে নাবান্ তাহা ঠাহর পাওয়া যায় না! পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, পরস্পরের মধ্যে মমতা, পরস্পরের প্রতি নির্ভর—এ ত চাঁদা করিয়া রেজোল্যুষণ পাস্ করিয়া হয় না। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র কাজের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। এবং সে সকল কাজ সকলেরই আয়ত্তাধীন। এখন সেই উদ্দ্যেশ্যের প্রতি আমরা সকলে লক্ষ্য স্থির করি না কেন! অর্থাৎ যেখানে বাস করিতেছি, সেখানটা যাহাতে গৃহের মত হয় তাহার চেষ্টা করি না কেন! নহিলে যে, বাহির হইতে যে-সে আসিয়া আমাদের সম্ভ্রম হানি করিয়া যাইতেছে; এমন একটু স্থান পাইতেছি না যাহা নিতান্ত আমাদেরই, যেখানে পরের কোন অধিকার নাই, যেখানে আত্মীয়দের স্নেহের অমৃতে পুষ্টিলাভ করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিদিন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে যাই, বাহির হইতে সঞ্চয় করিয়া যেখানে আনয়ন ও বিতরণ করি, আমাদের পিতামাতারা যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আমাদের সন্তানেরা যেখানে আশ্রয় পাইবে বলিয়া আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, যেখানে কেহ আমাদিগকে হীন জ্ঞান করিবে না কেহ আমাদিগের প্রতি অবিচার করিবে না, কেহ আমাদিগের ম্লানমুখ নতশির সহ্য করিতে পারিবে না, যেখানকার রমণীরা আমাদিগের লক্ষ্মীস্বরূপিনী আনন্দবিধায়িনী অন্নপূর্ণা, যেখানকার বালক বালিকারা আমাদেরই গৃহের আলোক আমাদেরই গৃহের ভাবী আশা, যেখানে কেহ আমাদের মাতৃভাষা আমাদের দেশীয় সাহিত্য আমাদের জাতির আচার ব্যবহার অনুষ্ঠানকে কঠোরহৃদয় বিদেশীয়ের ন্যায় অকাতরে উপহাস ও উপেক্ষা করিবে না। আর কিছু নয়, সেই গৃহপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশে সেই স্বদেশপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশীয়ের প্রতি স্বদেশীয়ের বাহু প্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ব্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইংরাজেরা আমাদিগকে সোহাগ করে কি না করে তাহারই প্রতীক্ষা করা তাহার জন্য আবদার করিতে যাওয়া—সে ত অনেক হইয়া গেছে, এখন এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া দেখা যাক্ না কেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাদ্য।

স্বাস্থ্য রক্ষা ও আহার।

আমাদিগের দেশে স্বাস্থ্য রক্ষা ও আহার সম্বন্ধে যেরূপ কুসংস্কার আছে এমন কুত্রাপি দেখা যায় না। একটি কথা আছে যে নিজের মনোমত আহার করিবে অন্যের মনোগত পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। ইহার অর্থ সকলেই অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিজের মনোমত আহার করার অর্থ যাহা, তাহা খাওয়া নহে; যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য সহজে পরিপাক করিতে পারিব জানি তাহাই খাইব। কিয়দংশ লোক অনেক বিচার করিয়া আহার করেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে বিশেষ কোন উপকার দর্শে না। তাঁহারা আহার সম্বন্ধে তিনটি বিষয় ভাবেন যথা অমুক দ্রব্য পিত্ত, বায়ু ও কফ্ নাশক বা বর্দ্ধক কি না। বায়ু, পিত্ত, কফ্ যে বাস্তবিক কি তাহা অনেক বিদ্যাভিমানী কবিরাজও বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন না। এমত অবস্থায় সাধারণ লোক যে ইহাদিগের তাৎপর্য্য বুঝিবে তাহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে?

খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত যে কত অনিষ্ট উৎপাদন হইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে আমাদিগের দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতি দিন দিন যেরূপ হীনবল হইয়া আসিতেছে, আরও শত বৎসর এইরূপ ভাবে চলিলে এ জাতির নিশ্চিত ধ্বংশ হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুমূত্র, অজীর্ণ, শিরঃপীড়া ও স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যতা (Nervous debility) এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহার ঠিক নাই। কোন এক

জন ইউরোপীয় ডাক্তার প্রস্তাব করিয়াছেন যে বহুমূত্র রোগের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসাগার কলিকাতায় স্থাপিত করিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার দর্শিবে। এই সকল পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব কেন? অন্যান্য কারণের মধ্যে আহার সম্বন্ধে অমনোযোগ তাহার একটি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অনেকে হয়ত বলিবেন, জল বায়ুর দোষে আমাদের পরিপাক শক্তি কম। জল বায়ুর দোষ অনেক স্থলে থাকিতে পারে। কিন্তু জল বায়ুর দাষ ঘোষণা করার পূর্ব্বে নিজের দোষটি স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমরা এ স্থলে অজীর্ণ ও অন্যন্য রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি না কিন্তু এই মাত্র বলিতেছি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ জানেন না বলিয়াই অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হয়েন। কোন্ খাদ্যদ্রব্য কিরূপ পরিপাচ্য, কিরূপে আহার করা কর্ত্তব্য, কতক্ষণে পরিপাক হয়, কিরূপ রন্ধন করিলে অপরিপাচ্য ভক্ষ্যদ্রব্যও পরিপাচ্য হয় তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরই জানা কর্ত্তব্য। পৃথিবীস্থ অধিকাংশ সভ্য জাতিরা আহারের বিস্তর আড়ম্বর করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর আহার অতি সামান্য ও আড়ম্বর বিহীন। তিনি আহারটা অনেক সময় আবশ্যকই মনে করেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত আমাদিগের আহারের আড়ম্বর বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু আহার সম্বন্ধে কুসংস্কার এখনও অপনয়ন হয় নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদি শিক্ষিত সম্প্রদায়দিগের আহার সম্বন্ধে রূ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহারা নূতন নূ ভক্ষ্য দ্রব্য আহার করিতে শিখিয়াছেন, অ এই নূতন নূতন ভক্ষ্য দ্রব্য সমূহ বাঙ্গালী পক্ষে কিরূপ উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর তা অনেকেই অবগত নহেন এবং জানি ইচ্ছাও করেন না।

দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে বলবর্দ্ধক আহা যে কতদূর প্রার্থনীয় তাহা দেশহিতৈ ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। য নিয়মে উত্তম আহার দ্বারা শরীর বলি ও মানসিক শক্তির তেজোবর্দ্ধন হয়। আ হার সম্বন্ধে সামান্য ব্যতিক্রমে যে কত ক্ষ হইতে পারে তাহা আমরা একবারও ভা না। নিয়ম পূর্ব্বক আহারের আবশ্যক সকলেই বুঝেন কিন্তু অতি অল্প লোকে আহার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম রক্ষা করেন পাশ্চাত্য আহার অনুকরণ করিতে শিখি সমাজে আমরা আরও কুদৃষ্টান্তের বী রোপণ করিতেছি। আমি এস্থলে পাশ্চা আহারের দোষ গুণ বিচার করিতেছি ন কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে আমর পাশ্চাত্য আহার অনুকরণ করিয়া থাকি কিন্তু পাশ্চাত্য লোকেরা আহার পরিপাক করিবার জন্য যে সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অনুকরণ করি না। ইউরোপীয়দিগের ক্রিকেট, ব্যাড্‌মিন্‌টন্, লনটেনিস্, পোলো ১ ও অশ্বা-

১ ইহা হইতে যদি কেহ পোলো খেলা ইয়োরপীয়দিগের বলিয়া ভুল বুঝেন, সেই

রোহণ ২ প্রভৃতি ব্যায়াম সকল অনুকরণ না করিয়া তাহাদিগের আহার মাত্র কেবল অনুকরণ করিয়া উহার পরিপাকের কোন উপায় অবলম্বন করি না। শরীররক্ষার্থ আহার ও ব্যায়াম উভয়ই অত্যাবশ্যক। আমাদের সবউল্টা। যিনি পড়িবেন তিনি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" করিয়া পড়িতেই থাকিবেন। যিনি ব্যবসা করিবেন তিনি কেবল ব্যবসায়েরই উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন অন্য দিকে চাহিয়া দেখিবেন না— আহারের নিয়ম পালন কি শরীর রক্ষার্থ একটু যত্ন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করিবেন না। যিনি ধনী তাঁহার ত কথাই নাই—তিনি দিনকে রাত ও রাতকে দিন করিয়া স্বাস্থ্যে একবারে জলাঞ্জলী দিয়া থাকেন। এমন কি চিকিৎসকগণ যাঁহাদিগের নিকট জনসাধারণে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ করিবে তাঁহারাও স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া আপনাদিগের কুদৃষ্টান্তে আমাদের দেশে বিষময় ফলোৎপাদন করিতেছেন। অধিকাংশ চিকিৎসক মনে করেন যে তাঁহারা যদি দিনের বেলায় একটা ও রাত্রে ১২ টার পূর্ব্বে বাটি আসিয়া যথানিয়মে আহার করেন তাহা হইলে সাধারণে মনে করিবে যে তাঁহাদের পশার নাই। কোন কার্য্য না থাকিলেও ডিস্পেন্সরিতে কিম্বা বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে গিয়া গুড়ুক ফুঁকিয়া ও গল্প করিয়া বেলা একটা বাজাইয়া বাড়িতে আসিবেন। লোককে দেখান চাই যে তাঁহার ভারি পসার, একটু মাত্রও অবসর নাই। সকল শ্রেনীর মধ্যেই দেখা যায় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রায়ই কেহ যত্নবান নহেন। শিক্ষিত লোকদিগের আহারের বিষয় ভাবিবার সময় নাই এবং চেষ্টাও নাই। ছাত্রদশা হইতেই ইঁহারা আহারে অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন। ছাত্রদশায় প্রাতঃকালে উঠিয়াই পড়িতে বসিলেন। নয়টার সময় তাড়াতাড়ি নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। বিকালে বাড়ি আসিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পড়িতে বসিলেন। রাত্রে পুনরায় আহার করিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে স্বাস্থ্যে অবহেলা করিয়া এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছাত্রেরা প্রায় অন্যান্য কার্য্য

ন্য এখানে বলা ভাল, যে উহা ইয়োরোপীর খেলা নহে। আমাদের দেশে মণিপুরে হার সৃষ্টি, ইয়োরোপীয়গণ এখনো মণিপুরীদিগের মত এ খেলায় দক্ষ হয়েন নাই। ারতের কোন কোন খণ্ডের রাজাদিগকেও খেলায় নিপুণ দেখা যায়। এ খেলায় ই দলে ঘোঁড়ায় চড়িয়া গোলা মারামারি রিতে হয়। ইহাতে অশ্বারোহণে অতিশয় নিপুণতা থাকা আবশ্যক। উত্তমের অনুকরণে গুণ ব্যতীত দোষ নাই, এই জন্যই ইয়োরপীয়গণ আমাদের দেশের এই পোলো খেলার অনুকরণ করিয়াছেন। ভা-সং

২ অশ্বারোহণ করিলে যে ইয়োরোপীয়দের অনুকরণ করিতে হইবে এমনও নহে।

ভারতবর্ষীয়গণ বহুকাল হইতে অশ্বারোহণে নিপুণ। ভারতবর্ষও এ প্রথা ইয়োরোপীয়দিগের নিকট গ্রহণ করে নাই—ইয়োরোপীয়েরাও ইহা আমাদের কাছে শিক্ষা করে নাই। ভা সং

অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। সংসারে তাঁহাদের সুখ ও উন্নতি কম্। কালেজে যেরূপ চমক্ দেখাইয়া থাকেন কার্য্যক্ষেত্রে তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন না। পঠদ্দশায় কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইবার জন্যই ব্যস্ত—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কখন ভাবেন নাই; আহার ও ব্যায়াম যাহা দ্বারা শরীর পালন হয় তাহাতে বিশেষ অমনোযোগ করিয়া পাঠান্তে এবং কেহ কেহ পঠদ্দশাতেই একবারে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। এই কারণে তাঁহারা উপাধি দ্বারা শোভিত হইয়া মৃত্তিকা-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া থাকেন। যাহা কলেজে অধ্যয়ন কালে শিখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেকে আর অধিক শিখিতে পারেন না, বরং অনেকে পূর্ব্বশিক্ষাও ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যান। কর্ম্মচারীরাও কতকগুলি কারণে শরীর পালনে অক্ষম হয়েন। এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই অজীর্ণ-রোগ-বশতঃ ভগ্ন-স্বাস্থ্য হয়েন। ছাত্রদিগের ন্যায় ইহাঁদিগকেও তাড়াতাড়ি আহার করিয়া আফিস্ যাইতে হয়—সন্ধ্যার সময় বাটি আসিয়া আফিসের কাগজ পত্র লইয়া কার্য্য করিতে হয়,কেননা এক এক জনকে দুই জন বা ততোধিকের কার্য্য করিতে হয়। এই সকল কারণে ইহাঁদিগের মস্তিষ্কের অবকাশ নাই, নিয়ম পূর্ব্বক আহার নাই,ব্যায়ামের সময় নাই, শরীরপালনে যত্ন নাই, সময়ও নাই। এই অবহেলা হেতু ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই আজীবন রোগ ভোগ করেন। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইহাঁদিগের বংশজাত। অসুস্থ পি মাতার যে অসুস্থ সন্তান হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? এই অসুস্থ সন্তানগ পাঠাবস্থায় শরীরপালনের নিয়ম সম্ একবারে অবহেলা করিয়া আরো অসু হয়েন এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াও শরীরপালনে যত্নবান হয়েন না সুতরা ইহাঁদের সন্তান সন্ততিও যে কিরূপ বলি ও সুস্থ হইবে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। যদি আর একশত বৎসর এইরূ ভাবে চলে তাহা হইলে শিক্ষিত বঙ্গবাসী নাম যে জগত হইতে লোপ প্রাপ্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অস্মদ্দেশীয় আধুনিক রাজ-নৈতিক আন্দোলনকারীরা বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা যে বীজ রোপণ করিতেছেন তাহা দুই শত বৎসর প.র অঙ্কুরিত হইয়া ফলোৎপাদন করিবে এবং তাঁহাদের বংশ-জাতগণ সেই ফল ভোগ করিবেন। আমি বলি যে দুই শত বৎসর পরে হয়ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর নামই থাকিবে না। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগের নিকট নিবেদন এই যে যদি তাঁহারা বাস্তবিক দেশের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়া থাকেন তাহা হইলে কিসে বাঙ্গালী বলিষ্ঠ ও সুস্থশরীর হয় সেই চেষ্টা প্রথমে করুন। কোন্ কালে কোন্ দে দুর্ব্বল ভীরু লোকেরা জাতীয় উন্নতি ল করিয়াছে। আমরা নিজ দোষে ভীরু দুর্ব্বল সেই জন্য পরপদ দলিত হইয় কেবল বাগাড়ম্বরে বিশেষ উন্নতি সাধ করিতেছি। স্বদেশহিতৈষীগণ যদি জাতী

উন্নতি দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে স্বদেশবাসীদিগকে বিদ্যাশিক্ষার সহিত শরীরপালনে শিক্ষা দিয়া বিদ্বান ও সবলকায় করুন—জাতীয় উন্নতি সত্বরই হইবে।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অর্থাৎ পূর্ব্বতন হিন্দুরা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম উত্তমরূপে জানিতেন। তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি অতি সুন্দর। সেই হিন্দুবংশজাত হইয়া আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অযত্ন করিয়া এত ভীরু ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি যে আর্য্যবংশজাত বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করা উচিত। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুনিয়ম—বিশেষতঃ আহারের সুনিয়ম অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বতন হিন্দু ঋষিগণ কত দীর্ঘায়ু হইয়া জনসাধারণের মঙ্গলার্থে জীবন যাপন করিতেন। শরীরের সহিত মনের উন্নতির যে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা আছে তাহা আমরা উপলব্ধি করি না। পূর্ব্বতন মহাত্মারা জানিতেন যে সুস্থশরীর না হইলে এমন কি অধ্যাত্মিক কোন উন্নতিও হইতে পারে না। শরীর সুস্থ না হইলে মন প্রস্ফুটিত হয় না—আত্মোন্নতি হয় না। শরীর সুস্থ রাখিতে গেলে শরীর-সঞ্চালন-ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যায়াম যেরূপ অত্যাবশ্যক সেইরূপ আহার সম্বন্ধীয় নিয়ম তদপেক্ষা আরও প্রয়োজনীয়। নিয়ম পূর্ব্বক অতি সামান্য আহার দ্বারা মুনিগণ কেমন সুস্থশরীর ভোগ করিতেন।

ধন ও মান অনেকে উপার্জ্জন করিয়া থাকেন—পারিবারিক সুখও অনেকে লাভ করিয়া থাকেন—বিদ্যাও অনেকে উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহার স্বাস্থ্য নাই তাঁহার উপরিউক্ত উপার্জ্জন সত্বেও কোন সুখ নাই। স্বাস্থ্য অপেক্ষা মূল্যবান আর কিছুই নাই। একবার ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইলে পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য লাভ দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। বিদ্যা, মান, ধন, ও পারিবারিক সুখ সত্বেও ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি অসুখী। যদি পরলোক বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে ইহ ও পর উভয় লোকের উন্নতির জন্যই উত্তম স্বাস্থ্য অত্যাবশ্যক।

অধুনাতন শিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা সংসারে প্রবেশ করিয়া কেন উন্নতি লাভ করিতে পারেন না? সুশিক্ষা সত্বেও কেন ইহাঁদের মধ্যে অনেকে পশুবৎ জীবন যাপন করেন। ইহাঁরা কেন স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বনে অক্ষম? ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই অল্পায়ু কেন? শিক্ষিতদিগের শিশু সন্তানেরা কেন এত অধিক পরিমাণে অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়? স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মভঙ্গই ইহার প্রধান কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষাগৃহ (Senate House) হইতে যখন পরীক্ষার্থীরা বাহির হইয়া আইসেন তখন তাঁহাদিগের চেহারা দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা মেডিক্যাল্ কলেজের হাঁসপাতাল ভ্রমে সিনেট হাউসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক অধিকাংশ পরীক্ষার্থীদিগকে এত রুগ্ন ও পীড়িতের ন্যায় দেখায় যে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে হাঁস্পাতালে থাকিবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই

যে এই সকল রুগ্ন ও দুর্ব্বলেরা কিরূপে দেশের অভীষ্ট আশা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন?

কেন আমরা আহার করি?

একটি বিলাতী যুবতীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে তুমি প্রত্যহ আহার কর কেন? "আহার করি কেন? আহার না করিলে মাতা ডাক্তার ডাকাইবেন এবং ডাক্তার অমনি একটি কটু তিক্ত কষায় "টনিক" পাঠাইয়া দিবেন"। অনেকে বলেন যে আমরা আহার করি কেবল জীবন-ধারণ জন্য। আবার কতকগুলি পেটুক বলেন যে আমরা খাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকি। বাস্তবিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে আহারটি একপ্রকার সূক্ষ্ম শিল্পের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। জীবন ধারণ ব্যতীত আহার একটি সামাজিক কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অশিক্ষিত আদিম নিবাসীরাও কেবল প্রাণধারণার্থে আহার করে না। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে সকল প্রকার মঙ্গলজনক কার্য্যোপলক্ষে আহারের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে বাস্তবিক শিশুদিগের ন্যায় শুদ্ধ প্রাণধারণার্থে আমরা আহার করি না। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, ব্রত, পূজা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সময় ক্ষুধা না থাকিলেও অনুরোধ-বশতঃ যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতে হয়। বন্ধু ও কুটুম্বের আগমন হইলেও তৎক্ষণাৎ আহারের উদ্যোগ হয়। হিন্দুর বাটিতে আত্মীয় স্বজন আসিলেই আহারের নিমিত্ত অনুরোধ করা হয়।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও প্রায় সমস্ত মঙ্গলজনক কার্য্যে ভোজের আয়োজন হয়। আমাদিগের দেশের অপেক্ষা ইহাদিগের ভোজের নিয়মগুলি অতি পরিপাটি। নিমন্ত্রণের নাম শুনিলেই আমরা একেবারে নাচিয়া উঠি। পাড়াগাঁয়ে পাকা ফলারের সংবাদ রাষ্ট্র হইলে মহা ধুম পড়িয়া যায়। ভদ্র, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ স্বহস্তে লুচি ভাজিয়াও থাকেন। সহরের লোকেরা নিমন্ত্রণ রক্ষার বিষয় অতিশয় কুদৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। নিমন্ত্রণ রক্ষাটা তাঁহারা সামাজিক কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করেন না। কি সহরে কি পাড়াগাঁয়ে নিমন্ত্রণের দিন আহারের অতিশয় অনিয়ম হইয়া থাকে। নিমন্ত্রণের পরদিন দশ বিশ জন নিশ্চয় পীড়িত হইবেন। দিনের বেলা আহারের নিমন্ত্রণ থাকিলে বেলা দুটার কম্ আহার সমাপ্ত হয় না। রাত্রের আহারও এত অধিক রাত্রে হইয়া থাকে যে অনেকে পরদিন অজীর্ণতার জ্বালায় অস্থির হইয়া শতবার শপথ করেন যে আর কখন রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন না। এই কারণে নিমন্ত্রণ রক্ষা আজ কাল মহা দায় হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতদিগের এরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা, নিমন্ত্রণে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সহিত আহার করা একটি আমোদের বিষয়, কিন্তু যদি সেই আমোদ দুঃখ জনক ও রোগোৎপাদনের মূল হয় তাহা হইলে সে আমোদ হইতে বরং বঞ্চিত হওয়াই ভাল। সকল অবস্থায়, কি পাঠের দশায় কি কর্ম্মক্ষেত্রে—কি ভ্রমণ কালীন্—কি নিমন্ত্রণে—সকল সময়েই স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষতি সহ্য করিতে হয় তাহা হইলে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করাই উচিত।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রণে আহারের সময় সমাজহিতকর বা রাজনৈতিক বিষয় আন্দোলন করি না। কেবল আহারের ভাল মন্দ ও অমুকের বাটিতে বেশ পরিপাটি ভোজ হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয়ের সমালোচনা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ঠিক ইহার বিপরীত। ভোজগুলি প্রায়ই বিশেষ ফলদায়ক হয়। অমুক চিকিৎসালয়ে মূলধন কমিয়া গিয়াছে বা একটি নূতন বাটীর আবশ্যক, একটি ভোজের আয়োজন হইল। এমন কি রাজপুত্রেরাও ইহাতে যোগ দিয়া অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। প্রকাশ্য ভোজে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন একটি গুরুতর রাজকীয় বিষয়ে কোন দলের কি মত তাহা ভোজ শেষে বক্তৃতাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে রাজপুরুষেরা কোন বিষয়ে নিজের মত প্রায়ই প্রকাশ করেন না কিন্তু কোন প্রকাশ্য ভোজে নিমন্ত্রিত হইলে আহারশেষে বক্তৃতার সময় মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। একত্র ভোজনে ইংরাজের বন্ধুতা যেরূপ বদ্ধমূল হইয়া থাকে এমত আর কিছুতেই হয় না। পারিবারিক ভোজ গুলিও ইংরাজ সমাজে বিশেষ আদরণীয়। অবিবাহিতা কন্যাদিগের পক্ষে এই ভোজ গুলি স্বয়ম্বর সভার ন্যায় কার্য্য করে। যাঁহার অবিবাহিতা যুবতী কন্যা আছে তিনি অবিবাহিত নিজ মনোমত যুবকদিগকে প্রায়ই পারিবারিক ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এই উপায় দ্বারা অবিবাহিত যুবক যুবতীদিগের মিলন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে সামাজিক সকল কাজেই আহার একটি প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। অতএব ভক্ষ্য দ্রব্যের বিশেষ জ্ঞান ও আহারের নিয়ম যে ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আবশ্যক তাহার আর সন্দেহ কি?

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
এল্, এম্, এস্।

হিমালয়ে প্রকৃতি দর্শন।

স্থান—ধবলগিরির উপত্যকা।

সময়—অন্ধকার রাত্রি।

উঃ কি গভীর নিশি, ঝাঁ ঝাঁ করে দিশি দিশি
দেব-মন্ত্রে মুগ্ধ চারি ধার,
সহসা মনেতে হয়, এ যেন পৃথিবী নয়,
ধরার নাহিক ধারে ধার।
স্বন্‌ঃস্বন্ বহি বায়, নীহার কাঁপায়ে যায়,
এ ত নহে ধরার পবন,
এই যে আঁধার ঘন, ছিদ্র তাহে নাহি যেন,
কে দেখেছে ভূতলে এমন।
এ ঘোর গগণ-গায়, কি ওই মহান ছায়
দিগন্ত ক'রেছে আবরণ!
ও কি রে বিরাট মূর্ত্তি—অনন্তের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—
কল্পনার অসাধ্য সাধন!
কটাক্ষে পৃথ্বিরে ঠেলি, ব্যোমমার্গ ঢেকে ফেলি
সপ্তম স্বরগে ওঠে শির,
বক্ষে ভ্রমে মেঘরাশি, বিকট হাসিয়ে হাসি
নেচে যায় চপলা অধীর।
অহো কি কঠোর ঠাঁই, শব্দ সাড়া কিছু নাই,
অনির্দ্দেশ—মহান—গম্ভীর!
প্রকৃতি! পেয়েছি তোরে, আর না ঘুরিব ঘোরে
এই তোর তপস্যা-মন্দির?
উর ভবে মহামায়া! দেহ গো চরণ ছায়া,
কাতরে কর গো কৃপাদান,
আকুল ব্যাকুল হোয়ে দুর্ব্বল পরাণ লোয়ে
করেছি তোমার বহু ধ্যান।

মা গো মা! খুঁজেছি তোরে, শ্মশান-মশান ঘোরে
দেদীপ্য বিভীষিকা মাঝে,
ও প্রতিমা হেরিবারে, বসি মহাসিন্ধু ধারে
উপেক্ষা করেছি বৃষ্টি-বাজে!
কে জানিত এই স্থলে, এই মহা হিমাচলে
তুমি মা গো পেতেছ আসন,
উরঃ ভবে মহামায়া, মাগি ও চরণ-ছায়া
একবার দেহ দরশন!
একবার কহ মাতঃ কিছুই ত বুঝিনা ত
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিলে,
বিশাল মশান ভূমি এই যে এ বিশ্ব এ তুমি
কোন প্রাণে কহ বিরচিলে?
আঁধারে আবৃত মা গো—কিছুই ত দেখনাগো
কি হতেছে শূন্য জলে স্থলে,
অধিক শকতি যার দুর্ব্বল শীকার তার,
মমতার গন্ধ নাহি মূলে।
বাজ পক্ষী ছিড়ে খায় হীনশক্তি চটিকায়,
শার্দ্দুল চিবায় হরিণীরে,
মকরে মমতা নাই, ক্ষীণ ক্ষুদ্র মাছে তাই
অকাতরে গ্রাসে সিন্ধু নীরে!
কি আর বলিব হায়, মানুষে মানুষ খায়,
হৃদয়ে হৃদয় করে গ্রাস,
যদি সে শকতি পায়, পরাণ চিবায়ে খায়
দেখিয়ে গৃধিনী পায় ত্রাস।

জ পক্ষী রূঢ় অতি, বিষধর ক্রূরমতি
শার্দ্দুল নৃশংস অতিশয়,
স্রক মকরগণ, মানুষ পাষাণ মন
এই ত কলঙ্ক দেশময়।
স্ত মা প্রকৃতি তোরে, জিজ্ঞাসি কহ ত মোরে
কার দোষ কাহারে চাপাই!
ব জন্তু কে সৃজিল, কেই বা প্রবৃত্তি দিল
সে প্রবৃত্তি কোথা পায় ঠাঁই?
জে সব বিরচিলে, নিজেই প্রবৃত্তি দিলে
বল দেবি! অপরাধ কার?
ধীন কে আছে ভবে, ঘোর পরাধীন সবে
ইচ্ছা শক্তি প্রকৃতি বিকার!
মম-মন্দিরে মা গো জানি নাই কিছু বেগো
হাসিনু কাদিনু মন্ত্র বলে,
সে যে হাসিতে হয়, কিসে যে কাঁদিতে হয়
কহ তা আমারে কে শিখালে!
বন, মোহের মায়া, স্বপনের উপছায়া
দীপ্ত প্রাণ দগ্ধ দুরাশায়,
টন্ত না হতে ফুল, কীটে করে ছিন্নমূল,
শুষ্ক পাপ্‌ড়ী ঝরে ঝরে যায়।
র্দ্ধক্যে শিথিল অঙ্গ, জীবন স্বপন ভঙ্গ
ঔদাস্য বৈরাগ্যময় প্রাণ,
রণ আসিলে ক্রমে, তরুটী লুটায় ভূমে,
মাটীতে মাটীর অবসান!
ই ত জীবন লীলা, তোমার সখের খেলা,
আমি ত গো পুত্তলিকা তার,
মন খেলাও তুমি তেমনি ত খেলি আমি
নাহি স্বত্ব আমাতে আমার!
ঘোর ভবের ঘোরে, তুমিই ফেলিলে মোরে
উঠি পড়ি তোমারই শাসনে,
ক্ষুদ্র শক্তি এ আমার, তৃণ-বাঁধ ঝটিকার,
চলিবে ত তোমারি চালনে!
বুদ্ধি—সেত বল-হীন, জ্ঞান—সেত ভ্রমাধীন
বিবেক ত অহঙ্কারময়,
আমি ত প্রবৃত্তি-দাস, পরায়েছ মায়াফাঁস
এ আমি তোমারি বই নয়!
এ ঘোর মরুভূ ভবে, তুমি না রাখিলে তবে
কে আর রাখিবে, মহামায়া!
কিন্তু গো পাষাণ মেয়ে (কঠোর পাষাণ চেয়ে)
কই তোর মাতৃস্নেহ ছায়া?

* * *
* . * *

(পরদিন সন্ধ্যাকালে
স্থান ধবলগিরি—)

একি গো প্রকৃতি এবে মূরতি তোমার!
ভয়ে রুদ্ধ হৃদে মোর রুধিরের ধার।
এই ছিলে উল্লাসিনী, কেন হলে উন্মাদিনী,
মৌন মুখে কেন দেবি বজ্রের হুঙ্কার?
মহামায়া কেন এবে এ মূর্ত্তি তোমার!
এই যে সুন্দরী-সাজে, শত ইন্দ্রধনু মাঝে,
প্রশান্ত হরষ দীপ্তি করি বিকীরণ
নীরবে গাহিয়ে গান, মাতালে ভক্তের প্রাণ,
জাগালে মর্ত্তের মাঝে নন্দন কানন,
গভীর রক্তিম ঘটা, অস্তমিত ভানুছটা,
এই যে গো পরেছিলে সীমন্ত প্রদেশে,
জড়ায়ে রতন বাস হাসিয়ে মধুর হাস,
রেখেছিলে পা দুখানি মেঘের উরসে!
সে মূর্ত্তি এখন দেবি, লুকালে কোথায়,
একি লীলা, লীলাময়ী, কহ গো আমায়!
একেবারে চারিধার, ঘনঘোর অন্ধকার,
জমাট বেঁধেছে মেঘে ছিদ্র নাহি তায়,

নদ নদী গাছ পালা, হিমাদ্রি শিখর মালা
লুকায়েছে, হারায়েছে, ডুবেছে কোথায়!
চপলা বিকট হাসি, বিদারি নীরদ রাশি
লহরে লহরে ঘন ঘনীভূত করে,
প্রলয়ের পরমাদ কড় কড় বজ্রনাদ
লাফায়ে লাফায়ে ছোটে শিখরে শিখরে।
শত গুণ প্রতিশব্দ, দিগঙ্গণা ভয়ে স্তব্ধ
সুকুমার বুকে রাখে আটকি নিঃশ্বাস,
বাসুকি অধীরপ্রায়, ঘন ভূকম্পন তায়
ব্রহ্মাণ্ডের আজ বুঝি হয় সর্ব্বনাশ!
ইন্দ্রকরী কর পারা, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা
আকাশ উজাড়ি যেন হতেছে বর্ষণ,
উথলি উঠেছে হ্রদ, উচ্ছ্বসিত নদী নদ
ঐক্যতানে করে সবে বিকট গর্জ্জন।
আছাড়িয়ে পাছাড়িয়ে, গিরি খণ্ড বিচূর্ণিয়ে
বিদরিয়ে বীরদর্পে ক্ষীণ ধরাতলে
অধীর উন্মত্ত পারা, ছুটেছে নির্ঝর-ধারা
সক্রোধে পশিছে যেন রসাতল তলে।
সর্ব্ব সংহারিতে যেন, ভয়ঙ্করী রূপে হেন
কেন গো প্রকৃতি আজি সাজিলে এ বেশে,
ক্ষান্ত হও মহামায়া! সংহর প্রলয় ছায়া,
গেল যে এ তৃণ ধরা রসাতল দেশে!
তুমি ত চলিলে ক্রোধে, কে তব ও গতি রোধে
কে পারে রাখিতে তব প্রতাপ ভীষণ!
ক্ষীণ এ পৃথিবী অতি তার কেন এ দুর্গতি
তার প্রতি কেন দেবি তাড়না এমন!
না ভ্রূক্ষেপি আগুপিছু, কটাক্ষ না করি কিছু
তুমি ত আপন তেজে চল গো গরবে—
উথুলি সহস্র ধারা—বিচূর্ণিয়ে গ্রহ তারা
আকুল করিয়ে তোল দেবতা দানবে,
তোমার বিক্রম দেবি কেনা জানে ভবে।

বুঝি নাকি দেবি, তব মাতৃমমতায়
ভেবেছ কি চণ্ডালিনী চিনি না তোমায়!
কহ মাতঃ সত্য করি—বিদীর্ণিয়ে অগ্নিগিরি
ছাইয়ে বসুধা ব্যোম অনল শিখায়—
জীব জন্তু কত প্রাণ, রত্নশালী কত গ্রাম
বিসর্জ্জিলে অকাতরে জ্বলন্ত চিতায়!
ভীষণ ঝটিকা ঝড়ে—নির্ম্মম বন্যার তোড়ে
সর্ব্বনাশা ভূকম্পনে মাতিয়ে, জননি!
অবনীর স্তরে স্তরে প্রলয় বিপ্লব করে
কে খেলে রাক্ষসী লীলা সর্ব্ব সংহারিণী!
ছুঁড়িয়ে অনন্ত শূন্যে ভীম ধূমকেতু
একটী সমগ্র গ্রহ চূর্ণিলে কি হেতু?
বুঝি নাকি দেবি তব মাতৃমমতায়!
ভেবেছ কি চণ্ডালিনি চিনি না তোমায়!
যুগ যুগান্তর ধ'রে এত যে যতন করে
তুচ্ছ এক তৃণগাছি করিলে প্রকাশ,
এত কোটী কোটী কল্পে, প্রাণপণে অল্পে অল্পে
জড়ে প্রাণ, প্রাণে বুদ্ধি, করিলে বিকাশ,
পরিণাম কিবা তার—যদি তুমি বার বার
ভাঙ্গ গড় গড় ভাঙ্গ, সৌখীন লীলায়,
সৃষ্টি নাশে যদি তোর, এতই আমোদ ঘোর,
ব্রহ্মময়ি! ধিক তব ব্রহ্মাণ্ড গড়ায়!
করিছ মরণ-বৃষ্টি, যাহে লয় হয় সৃষ্টি
যাহে বিশ্ব রসাতলে লণ্ড ভণ্ড যায়—
গড়িতেছ গড় আরো, ভাঙ্গিতেছ যত পারো,
প্রণমি, প্রকৃতি তব মাতৃ মমতায়!

* * *
* * *
* * *
* * *

(সময়—পূর্ণিমা নিশি।)

আজি এ পূর্ণিমা নিশি, স্বপ্রকাশ দিশি দিশি
জোছনায় দিগন্ত ঘুমায়—
আপনি স্বপন রাণী, বরণ বরণ রঙ্গে
বিশ্বপট সোহাগে সাজায়।
ধরায় ঝরিছে নদী, সুবর্ণ সূত্রটী যেন,
পশিতে পশে না যেন চোখে;
ঝক ঝক জ্বলে তন্বী, আধ' স্বপনের রেখা
আধ' আঁধারে তনু ঢেকে।
ও দিকে উঠেছে শৃঙ্গ, কত উচ্চে কত দূর—
কল্পনার স্বপন ভেদিয়ে—
এদিকে পাতালপুরি, ওদিকে সপ্তম স্বর্গ
কোন্ দিকে থাকিব চাহিয়ে!
এদিকে অনন্ত তল, ওদিকে অনন্ত শৃঙ্গ
অনন্ত শয়ান দুই ধারে,
পাতাল ত মহাশূন্য মহাশূন্য ব্যোম দেশ
কে আমি এ অনন্ত মাঝারে!
ঊর্দ্ধে ফোটে পূর্ণশশী, চারিদিক মোহে ঢাকি
ঘুমন্ত জোছনা আবরণে,
গাছ পালা পুলকিত, দিগঙ্গণা উলসিত
উলসে আলস লাগে প্রাণে।
ধবল শিখরে বসি—নীহারে চরণ রাখি
ঝলকিত মুকুট মাথায়,
আজি মা প্রকৃতি দেবি, রাজ-রাজেশ্বরী রূপে
কি মধুর হাসিছ হেথায়!
অদূরে সুধীরে ঝরে, নির্ঝরের শত ধারা
চূর্ণিত হীরক-স্রোত প্রায়,
অন্নপূর্ণা হোয়ে আজি, ঢালিতেছ রত্ন রাশি
যেন এই দরিদ্র ধরায়!
শূন্যে শূন্যে ওড়ে মেঘ আলোক আঁধার মাখি
স্বরগের প্রজাপতি সম—
উড়ে উড়ে যায় চোখে ধরি ধরি ধরিব না
পাছে দাগ লাগে স্পর্শে মম।
এ ঘোর ঘুমের মাঝে নিস্তব্ধতা চমকিয়ে
কি বোল বলিল ওই পাখী——
"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"
গীতিময় সব যেন দেখি!
একটী বিহঙ্গ গানে ব্রহ্মাণ্ডের মহাগীতি
কহ মাতঃ কেমনে জাগিল,
একটী কোকিল স্বরে বাসন্তিক কুঞ্জে যেন
বিহঙ্গম মণ্ডলী মাতিল!
গ্রহ উপগ্রহ মাঝে উথলে স্বর্গীয় গীতি
স্তরে স্তরে শূন্যে ভেসে যায়,
শব্দ শূন্য বায়ু শূন্য বর্ণ শূন্য মহা শূন্য,
সে সঙ্গীত তরঙ্গিয়ে ধায়!
এই এ সঙ্গীত মাঝে, অনন্ত সঙ্গীত মাঝে
কেন মাগো আনিলে আমায়,
সহিতে পারিনে আর—দুর্ব্বল মানব হৃদি
আনন্দে বা অনন্তে মিশায়।
এই মহা ঐক্যতান ইহার মাঝারে বসি
তোমারে মা দেখিতে দেখিতে—
কেন না এ ছার প্রাণ অবসান হইতেছে
প্রশান্ত এ সহাস নিশীথে!
আছি আমি থাকি আমি চাও মোরে—যাব আমি,
বিমুক্ত করেছি মোহ ফাঁস,
জীবন স্বপন ময়, স্বপন প্রমোদ ময়—
প্রমোদেতে স্বর্গের আভাস!
সে স্বর্গ যে মর্ত্ত ভূমে, মন্ত্রবলে আসে নেমে
বুঝেছি এখন তাহা সার,
জন্ম জন্ম এই সুখে, জনম কাটায়ে যাব'
এই তব উদ্দেশ্য উদার।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশের ইতিহাস।

ডাক্তার হণ্টার সাহেব তাঁহার Statistical Report মধ্যে প্রত্যেক জেলায় কি কি আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে, কি কি ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়াছিল অনেক যত্নের সহিত সঙ্কলন করিয়াছেন। হণ্টার সাহেব তজ্জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহার Report এ অনেক বিষয় নাই ও যাহা আছে তাহাও অনেকে জানিতে ইচ্ছা করিলেও জানিতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে আমি বাঙ্গালায় মুরসিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরে যে সকল অতি আশ্চর্য্য প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

এক সময়ে বিষ্ণুপুরে হিন্দুরাজারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের সময় বঙ্গদেশ মুসলমানাধিকৃত হইলে তাঁহার সনন্দানুসারে বিষ্ণুপুরের রাজা মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন হন। কিছুদিন মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন থাকিয়া বিষ্ণুপুরের রাজা পুনরায় স্বাধীন হইয়াছিলেন। বোধ হয় লোকে বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বিদিত আছেন। কিন্তু আমি রাজবংশীয়দিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের বংশের সকল রাজার নাম, রাজত্বকাল ও তৎসাময়িক ঘটনা সমূহের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাইয়াছিলাম; এবং তাহার সাহায্যে প্রচলিত বঙ্গদেশের ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া নিম্নলিখিত ইতিহাস লিখিয়াছি। ইহাতে কোন ঐতিহাসিক ভ্রম দর্শিত হইবে না। শুনিয়াছি মাননীয় মাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত ইহাঁদের ইতিহাস স্বতন্ত্র প্রকাশ করিবেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন অনুষ্ঠান দেখিতে পাই নাই। সেই জন্য আশা করি পাঠকবর্গ এই ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। বিষ্ণুপুরের ইতিহাস একটি নূতন বিষয়। বিশেষতঃ এখন মুরসিদাবাদের নবাবদিগের কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের ভগ্নাবশেষ দেখিলে বোধ হয় যেন বিষ্ণুপুরই বঙ্গদেশের প্রধান রাজ্য ছিল। হণ্টার সাহেব মুরসিদাবাদের কথা যাহা লিখিয়াছেন সে অনুপাতে বিষ্ণুপুরের কথা কিছুই লেখেন নাই। বোধ হয় হণ্টার সাহেব উপযুক্ত সাহায্য পান নাই। এই জন্য আমি প্রথমে বিষ্ণুপুরের সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি সেইগুলি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ঐতিহাসিক বিষয় ইতিহাসের ভাষায় লিখিব। পাঠকগণ ইহাতে কাব্যের কোন রসই পাইবেন না। আমার এ দোষ মার্জ্জনীয়।

১০২ মল্লাব্দে অর্থাৎ ৬৯৬ খৃষ্টাব্দে

আদিমল্ল বিষ্ণুপুরে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইনি মল্লবংশীয়। ইনিই এই মল্লরাজ বংশের স্রষ্টা। ইহাঁর সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে ইনি একজন ক্ষত্রিয়ের সন্তান। ইহাঁর মাতা বানপ্রস্থাবলম্বী স্বামী সমভিব্যাহারে পশ্চিম দেশ হইতে জগন্নাথ-যাত্রাকালে বিষ্ণুপুরের নিকট আদিমল্লকে প্রসব করিয়া সকল মায়া মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পথপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া যান। সদ্যপ্রসূত অনাথ বালক একটী ব্রাহ্মণের নয়নপথে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহার লালন পালনের উপায় করিয়া দেন। পরে বালক যৌবনে পদার্পণ করিলে অসাধারণ বল বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ এই বালকে অনেক সুচিহ্ন দেখিয়া তাহাকে বড় যত্ন করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ তত্রস্থ রাজার বাটী নিমন্ত্রিত হইয়া এই বালককে দাসস্বরূপ সঙ্গে লইয়া যান। সকলে আহারে বসিলেন। আদিমল্লও প্রাঙ্গনে আহার করিতে বসিলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টি আসিল। অতিথিপ্রিয় রাজা স্বয়ং আদিমল্লের মস্তকে ছত্র ধরিয়া বৃষ্টি নিবারিত করিলেন। আদিমল্ল তখন বলিলেন মহারাজ যখন স্বয়ং আমার মস্তকে ছত্র ধরিলেন তখন যাহাতে ইতঃপর অন্যে ছত্র ধরিতে পারে এরূপ করুন। রাজা এই কথা শুনিয়া আদিমল্লকে জমিদারী স্বরূপ একটি পরগণা দিলেন এবং রাজা উপাধি প্রদান করিলেন। আদিমল্ল ক্রমে ক্রমে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা আপনার রাজ্য বিস্তৃত করিলেন। কিন্তু তিনি কাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন জানা যায় না। ইনি লাউগ্রামে একটি অতি উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত দেবালয় প্রস্তুত করিয়া দেন। এখনও এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইতি আপনার নামের মুদ্রা ও মল্লাব্দ নামে একটি সাল প্রচলিত করেন। ১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া আদিমল্ল পরলোক গত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল রাজা হইলেন। ইহাঁদের বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইতেন। জয়মল্ল হইতে ১৯ জন রাজা ক্রমান্বয়ে ৩১১ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্ব কালে ৮টী প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে ৬টী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও বিষ্ণুপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ১৯ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সময়ের কোন ঐতিহাসিক বিষয় জানা যায় না। একবিংশ রাজা রূপমল্ল ১০০৩ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহার সময়ে নিকটবর্ত্তী রাজারা বিষ্ণুপুরের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিলেন। ইনি আপনাদিগের বাসস্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত করিয়াছিলেন। এই প্রাচীর উর্দ্ধে ৪১ হাত ও প্রস্থে ১২ হস্ত পরিমিত। এখনও ইহার কিয়দংশ অক্ষুণ্ণ ভাবে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রূপমল্ল দুইটী প্রস্তরময় প্রবেশদ্বার নির্ম্মিত করিয়া বিষ্ণুপুরের দুর্গের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই দুইটি দ্বার আজও প্রায় অবিকৃত ভাবে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বহির্দ্বারটি অতিশয় উচ্চ ও অপরটির নির্ম্মাণ অতি আশ্চর্য্য।

শুনা গিয়াছে ভরতপুরের কেল্লা নির্ম্মাণ-কৌশলতা প্রযুক্ত অজেয় ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা অজেয় দুর্গ নির্ম্মাণের সূত্রপাত করিয়া যান। তিনি যে দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা ভরতপুরের কেল্লার দ্বারের অনুরূপ। বাস্তবিক যাঁহারা ভরতপুরের কেল্লার দ্বার দেখেন নাই তাঁহারা বিষ্ণুপুরের এই দ্বার ও তথাকার গড় নির্ম্মাণের প্রণালী দেখিলেই কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন কিজন্য ভরতপুরের কেল্লা অজেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা যে ভাবে দুর্গ প্রাকারের মধ্যে স্থাপিত. ইহাতে যে ভাবে শত শত সৈন্য গোপনে রাখিবার উপায় আছে, ইহাতে যে ভাবে কামান স্থাপন করিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা দেখিলে বোধ হয় কোন রূপে এক জন সৈন্যও এই দ্বার অতিক্রম করিতে সক্ষম হইত না। ইহার মধ্যে এরূপ গুপ্ত ভাবে সোপানশ্রেণী অবস্থিত যে বহু আয়াস ব্যতীত সহজে কোন ব্যক্তি তাহা অনুসরণ করিতে পারেনা। বঙ্গদেশীয়েরা যে যুদ্ধপ্রণালী বিশেষ জানিত বিষ্ণুপুরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইনি ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হইলে সুন্দরমল্ল রাজা হইলেন। ইনি রাজা রূপমল্লকৃত গড় সুদৃঢ় করিবার জন্য গড়ের দুই দিকে ক্রমান্বয়ে পাঁচশ্রেণী অত্যুচ্চ প্রাচীর ও তৎপার্শ্বে পাঁচশ্রেণী গভীর পরিখা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গড়ের দক্ষিণদিকে এই সময়ে একটী কেয়ারাখানা প্রস্তুত করা হয়। এটী ইষ্টক নির্ম্মিত ও অতি উচ্চ দুর্গপ্রাচীরের উপর অবস্থিত। এখনও এই কেয়ারাখানা দেখিলে নূতন বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায় গ্রীষ্মকালে রাজারা কোন প্রকার কল সংযোগ নিকটস্থিত জলাশয় হইতে জলোত্থিত করিয়া সেই জল আপনাদিগের বাসস্থানের চতুস্পার্শ্বে বিন্দু বিন্দু করিয়া বৃষ্টির ন্যায় পাতিত করিবার জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ত্রয়োবিংশ রাজা কুমদমল্ল ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তৎপুত্র দুইজনে ক্রমান্বয়ে ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাঁর রাজত্ব কালে বিষ্ণুপুরের দুর্গ সম্পূর্ণ হয়। দুর্গের দুই পার্শ্ব ইতিপূর্ব্বেই সুরক্ষিত হইয়াছিল। বিড়াই নদী এক সীমা রক্ষা করিয়াছিল। এক্ষণে অবশিষ্ট একপার্শ্ব অবরোধ করিবার জন্য ইহাঁরা বাঁদ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল বাঁদ বিড়াই নদীর জলে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত। ইহাঁদের সময়ের শ্যাম বাঁদ ও কৃষ্ণবাঁদ নামক দুইটি বাঁদ দেখিলে মনুষ্যকৃত বলিয়া বোধ হয় না। এখন ইহাদের যে অবস্থায় দেখা যায় ইহারা তদপেক্ষা অনেক অধিক বিস্তৃত ছিল। ১১০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশমল্ল রাজা হন। ইনি কোন স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিতে পারেন নাই। ইঁহার সময়ে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল কি না তাহাও জানা যায় না। তদনন্তর প্রতাপ মল্ল রাজা হইয়া লাল বাঁদ প্রস্তুত করাইয়া দুর্গসীমার আরও কিয়দংশ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। লাল বাঁদ এক আশ্চর্য্য জলাশয়। একটী কাচের গ্লাসে কলের জল রাখিয়া

তাহাতে কোন দ্রব্য ফেলিয়া দিলে যেরূপ দেখা সম্ভব লাল বাঁদের জলে তৃণের ন্যায় দ্রব্যও থাকিলে সেইরূপ দেখা যায়। আজও দেখা যায় স্ত্রীলোকে লালবাঁদে স্নান করিতে সঙ্কুচিত হয়। ইহার তলদেশে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা জলের ভিতর দিয়া স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার জল অতি সুস্বাদু। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত ও উত্তর দক্ষিণে ১ মাইলের ন্যূন নয়। লাল বাঁদ বিষ্ণুপুরের একটী মহৎ কীর্ত্তি। প্রকাশ মল্লের পর ৪ জন রাজা ১২১৭ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁরা প্রত্যেকে চৌকান, গাঁড়াইত, যমুনা, ও কালিন্দী নামক ৪টী বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুপুরের দুর্গ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখন দেখিতে পাওয়া যায় এই ৪টী জলাশয়ের মধ্যে অনেক আবাদী জমী হইয়াছে। এই বাঁদ গুলির অবস্থানের ভাব দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় রাজারা ইহা দ্বারা গড়ের এক পার্শ্ব শত্রুআক্রমণের উপায়শূন্য করিয়াছিলেন। এই রূপ প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে বিষ্ণুপুর নগর অবস্থিত ছিল। আধুনিক বিষ্ণুপুর প্রাচীন বিষ্ণুপুর হইতে স্বতন্ত্র স্থান। আধুনিক বিষ্ণুপুর প্রাচীন দুর্গের বহির্দ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহাদের পর ১৭ জন রাজা ৩৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সকল রাজাদের রাজত্ব কালে যে ১০টী অতি উচ্চ ও সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দশটী দেবালয়ের মধ্যে ২ টী একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছে। বিষ্ণুপুর রাজ্যের স্থাপনাবধি ৮৯১ বৎসরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ৪৫ জন রাজা রাজত্ব করিলেন। কিন্তু আমি যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে এই পর্য্যন্ত সঙ্কলন করিয়াছি তাহাতে ইহাদের সময়ের—কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা পাই নাই। কেবল জানা গিয়াছে যে ইহাদের শেষ ২৪ জন রাজা ৫৮৪ বৎসরে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনন্তর খৃষ্টীয় ১৫৮৭ সালে বীর হাম্বীর আপনার পিতা বীড়িমল্লের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহাঁর সময়েই বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের অন্তর্ভূত হইল। বীর হাম্বীর একজন বীরপুরুষ ছিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট আকবর বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য মানসিংহকে প্রেরণ করেন। যদিও বীর হাম্বীরের সহিত মানসিংহের কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কি না জানা যায় না তথাপি বিষ্ণুপুর যে দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইয়াছিল ইহার প্রমাণ আছে। এবং দিল্লীর সম্রাটের সনন্দানুসারে ইহাঁদিগকে মুরসিদাবাদের নবাবকে কর দিতে হইয়াছিল! বীর হাম্বীর সন্ধিরূপে মুরসিদাবাদের নবাবকে বৎসর ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা করস্বরূপে দিতে স্বীকার করেন। এই সময়ে মুরসিদাবাদের নবাব বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে "সিংহ" উপাধি দেন। সেই জন্য বীর হাম্বীরের উত্তরাধিকারীরা মল্ল উপাধি ত্যাগ করিয়া সিংহ উপাধি ধারণ

করেন। বিষ্ণুপুরের রাজারা স্থপতি বিদ্যার যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহার প্রমাণস্বরূপ বীর হাম্বীর কৃত একটী রাশমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আধুনিক অবস্থা বড় হীন। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই মঞ্চে সমারোহের সহিত রাসলীলা হইয়া গিয়াছে। এই মঞ্চে স্থপতি বিদ্যার একশেষ হইয়াছে। তৎকালে স্থপতি বিদ্যার এরূপ উৎকর্ষ দেখিলে অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হয়। মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। আকবরের চক্ষু দাক্ষিণাত্যে চাঁদ বিবির রাজত্ব আমেদ নগরের উপর পতিত হইল। বিষ্ণুপুরের রাজারাও কর দিতে হস্ত সঙ্কোচন করিলেন। বীর হাম্বীর ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র ৫ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইনিও এ পর্য্যন্ত কর দেন নাই। অনন্তর ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথসিংহ রাজা হইলেন। ইহাঁর বীরত্বের সম্বন্ধে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কর না দেওয়া দোষে রঘুনাথসিংহ নবাব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুরসিদাবাদে যান। তিনি যে সময় তথায় উপস্থিত হন সেই সময় দেখিলেন নবাব যুবতী রমণীগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে আমোদ করিতেছেন। সে সময়ে কোন ব্যক্তি নবাবকে রঘুনাথসিংহের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে অগ্রসর হইল না। রঘুনাথসিংহ আপনার আগমনবার্ত্তা নবাবের গোচর করিবার জন্য যে তাঁবুর মধ্যে নবাব বসিয়াছিলেন তাহার একটী বন্ধন-কাষ্ঠ স্বহস্তে তুলিয়া ফেলিলেন, তাঁবু হেলিল; নবাব কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া শুনিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথসিংহ আসিয়াছেন। তখন নবাব নিঃস্তব্ধ হইলেন। পরদিন প্রাতে নবাবের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল। নবাব রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঘোড়ায় চড়িতে পার। রাজা বলিলেন "পারি।" তৎপরে নবাব একটী দুর্দ্দমনীয় ঘোড়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু রঘুনাথসিংহ বলিলেন "আমি চড়িলে ঘোড়া মরিয়া যাইবে। বাস্তবিক তাহাই হইল, দেখিয়া নবাব রঘুনাথসিংহের দেয় কর মখুব করিলেন। অন্য এক সময়ে রঘুনাথসিংহ একটী মত্ত হস্তীর শুণ্ড স্বহস্তে উৎপাটন করিয়া আপনার অসীম বলের পরিচয় দিয়াছিলেন। রঘুনাথসিংহ সত্যের অনুরোধে না করিয়াছেন এমন কার্য্যই নাই। একবার তিনি কর না দিয়া মুরসিদাবাদের নবাবের নিকট বলিলেন আমি কর সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎপরেই বিষ্ণুপুর হইতে দেয় কর মুরসিদাবাদে পৌঁছিল। রঘুনাথসিংহ এই কথা শুনিবামাত্র সমস্ত অর্থ গঙ্গাগর্ভে নিহিত করিলেন। সত্যের অনুরোধে এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন শুনিয়া নবাব এবারও রাজার কর মাপ করিয়াছিলেন। এইরূপে ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া রঘুনাথসিংহ প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাঁর পর বীরসিংহ, দুর্জনসিংহ, রঘুনাথসিংহ (২য়) ও গোপালসিংহ নামক ৪ জন রাজা ক্রমে রাজত্ব করেন। বীরসিংহ ৬১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা হয় নাই। ইনি পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের কৃত অনেক দেবালয়, গড়ের দুই প্রাচীর ও প্রবেশ-দ্বার সংস্কার করেন এবং নিজে ৫।৬ টী দেবালয় সংস্থাপন করেন। ও জোড় বাঙ্গালা নামক আর একটী দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। জোড় বাঙ্গালা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর সময়ে পোকাবাঁদ নামক আরও একটী অতি বৃহৎ বাঁদ খাত হইয়াছিল। এই বাঁদ গ্রীষ্মকালে এক প্রকার পোকায় এরূপ পূরিয়া যায় যে তখন ইহার জল ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পোকা ছাঁকিয়া ফেলিলে ইহার জল অতি পরিস্কার ও সুসেব্য। পণ্ডিত ও বহুদর্শী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই পোকাগুলি কি, ও কিরূপে হয় জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সফল-প্রয়াস হন নাই। অবশিষ্ট তিন জনে ৬১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা দুর্জনসিংহের সময় একটী চমৎকার ইন্দারা প্রস্তুত হয়। ইন্দারাটী আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গভীরতা নিরূপণ করা সুকঠিন। বোধ হয় ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণীর দ্বারা অবতরণ করিবার উপায় করা হইয়াছিল। রঘুনাথ সিংহের পুত্র না হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা গোপালসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। গোপালসিংহের সময় বর্গির হাঙ্গামে সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। গোপালসিংহ স্বয়ং একজন ভীরু রাজা ছিলেন। প্রায় অগণনীয় মহারাষ্ট্র সৈন্য বিষ্ণুপুরের দুর্গের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল। রাজা ভয়ে কাতর হইলেন। ইনি অনন্তর রাজাদিগের জাগ্রত দেবতা মদনমোহনের শরণাপন্ন হইলেন, এবং আপনার সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। যাহা হউক রাজা কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে দলমদল কামানদ্বয়ের জলদ গম্ভীর—স্বর শুনিলেন! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার অনুমতি ব্যতীত কে কামান প্রয়োগ করিল। সকল সেনাপতিই আপনাদের কামান প্রয়োগ বিষয়ে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিলেন। তখন রাজা দূত দ্বারা শুনিলেন মদনমোহন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বীতালঙ্কৃত শরীরে সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। রাজা বুঝিলেন মদনমোহন স্বয়ং কামান ছুড়িয়াছেন। এই গল্পটী চির-প্রসিদ্ধ। কিন্তু কি ঘটনা হইতে যে এই গল্পের উৎপত্তি হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, অবশেষে সংবাদ পাইলেন যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য কামানের ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। এই স্থানে দলমদল কামানের একটী বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক। দলমদল দুইটী কামান। ইহাদের মধ্যে একটী আজও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কামানটী দৈর্ঘ্যে ১৩ হস্ত পরিমিত। ইহার পরিধি ৬ হস্তের কম নয়। এই কামানটী দক্ষিণ দিকের দুর্গপ্রাচীরের উপর অবস্থিত ছিল। কিন্তু অধুনা সেই

স্থান হইতে নিম্নভূমির উপর পতিত আছে। লেফটেনাণ্ট গর্ডনর কাম্বেল সাহেব এইটীকে কলিকাতায় আনিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আনিতে লক্ষ টাকার অধিক খরচ হইবে দেখিয়া আপাততঃ সে অভিলাষ ত্যাগ করেন। প্রায় দেড় শত বৎসর এই কামানটী এরূপ অযত্ন ভাবে থাকাতেও সম্পূর্ণ মসৃণ আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহাতে একবার শব্দ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা হইয়াছিল। শুনা যায় সেই সময় গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা গর্ভপাতের ভয়ে গৃহমধ্যে দ্বারাদি রুদ্ধ করিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের লোকে এই কামানটীর পূজা করিয়া থাকে। ইহার আর একটী কামান লালবাঁদের মধ্যে পড়িয়া আছে। লোকে বলে সেটী ইহার অপেক্ষা বৃহৎ।

বন্দীকৃত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে গোপালসিংহ দুর্গ মধ্যে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া থাকিতে দিয়াছিলেন। ঐ স্থান অদ্যাপি মহারাষ্ট্রী পাড়া বলিয়া খ্যাত। গোপালসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণসিংহ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি ৪৯ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাঁর ভ্রাতা দামোদর সিংহের সহিত ইহাঁর রাজ্য লইয়া বিবাদ হয়। দামোদর সিংহ একজন অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধূর্ত্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি প্রায় লক্ষ মহারাষ্ট্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজার দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য দুর্গ প্রাকারের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহার সৈন্যেরা অর্থের জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি তখন রাজার শরণাপন্ন হইয়া লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। আর বলিলেন যে আপনার প্রধান সেনাপতিকে আজ্ঞা করুন আমার এই সমস্ত সৈন্যকে বিষ্ণুপুরের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আইসে।' রাজা অর্থ দিলেন, এবং ভ্রাতার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেনাপতিকে ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা সত্বেও যাইতে আজ্ঞা করিলেন। দামোদরসিংহ সৈন্যদিগকে অর্থদিয়া বশীভূত করিলেন। এবং সেনাপতি (চৈতন্যসিংহের) যেমন তাঁহার শিবিরের নিকট উপস্থিত হইল, অমনি তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। রাজা ভয় পাইলেন। এদিকে দামোদরসিংহ দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজার হাবসি সৈন্যগণও যুদ্ধসজ্জা করিল। কিন্তু অসংখ্য মহারাষ্ট্র সেনার নিকট সেই অল্প মাত্র সৈন্যে কি হইবে। তথাপি দুর্ভেদ্য দুর্গের ভরসায় রাজার ৫০০শত সৈন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই উভয় পক্ষে বন্দুক ব্যবহার করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। ধূর্ত্ত ও কপটাচারী দামোদর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল না। কিন্তু সত্যপরায়ণ রাজার সৈন্যেরা বন্দুক ব্যবহার করিল না। কাজেই ৫০০ শত লোক কতক্ষণ লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? ক্রমে ক্রমে, একে একে, যুদ্ধ করিতে করিতে সেই কয়েক শত অসমসাহসী লোক নিধন প্রাপ্ত হইল। রাজা গুপ্ত দ্বার দিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দামোদর সিংহ দুর্গ অধিকার

করিয়া ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বহুদিনের পর দিল্লীর সম্রাট, চৈতন্য সিংহকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত মুরসিদাবাদের নবাবের প্রতি আদেশ করিলেন। তখন বঙ্গদেশে ইংরাজ-পতাকা উঠিয়াছে। রাজা চৈতন্য সিংহ নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব সম্রাটের আজ্ঞানুযায়ী ১০০০০ দশ সহস্র পদাতিক, ১০০০ সহস্র অশ্বারোহী, হস্তী, ও ৩২ কামান দিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু ক্লাইব সমস্ত ঘটনা শুনিয়া কেবল দুই দল ইংরাজসৈন্য কাপ্তেন মাউরের অধীনে প্রেরণ করিলেন। দামোদর সিংহ ইতি পূর্ব্বে স্বচক্ষে পলাসীর যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজদিগের নাম শুনিয়া ভয় পাইলেন, এবং বহুকাল হইতে সঞ্চিত রাজাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া পলায়ন করিলেন। চৈতন্য সিংহ ৮ বৎসর পরে পুনরায় রাজত্ব পাইলেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র অর্থ পাইলেন না। বিষ্ণুপুরের রাজাগণ মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন হওয়া পর্য্যন্ত যদিও রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন ও রাজার ন্যায় সৈন্য, অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে পারিতেন তথাপি তাঁহারা একরূপ জমীদার মাত্র ছিলেন। এদিকে ক্রমে ক্রমে মীরজাফরের পর মীরকাশিমের রাজত্ব শেষ হইল। ইংরাজেরা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ সালে ইংরাজেরাই বঙ্গদেশের দেওয়ানী পাইলেন। ক্রমে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া ১৭৯৩ সালে জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা হীনবল; তিনি যেমন নবাবদের কর দিতে বাধ্য ছিলেন, সেইরূপ ইংরাজদের কর দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখন কর দিবার সে বন্দোবস্ত নাই। এখন সূর্য্যাস্তের দিন অতীত হইলে, দেয় করের কিছু মাত্র বাকি থাকিলে জমীদারী নিলামে উঠিবে। বিষ্ণুপুরের রাজারা ৩৬০ টী দেবালয় স্থাপন করেন। এই সকলের রীতিমত বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনেক লাখরাজ দিয়াছিলেন; তাহাতে আবার তাঁহাদের ধনাগার দামোদর কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের ঘরে অনেক টাকা সঞ্চিত ছিল না। খাজনাও অধিক আদায় হইত না। এখন প্রতি বৎসর খাজানা দাখিল করা বড় বিপদ হইল। রাজারা কখনও নিয়মিত রূপে কর দেন নাই। যথাসময়ে কর দাখিল করা অনভ্যাস বশতঃ এবং দেয় কর সমস্ত সংগ্রহ করিতে না পারায় রাজারা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খাজানা দাখিল করিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া পরগণা নিলাম হইতে আরম্ভ হইল। ইতি পূর্ব্ব হইতেই রাজাদিগের বীরত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এখন হইতে তাঁহারা অর্থহীন হইতে চলিলেন। চঞ্চলা লক্ষ্মী আর পুরাতন স্বামীতে পরিতৃপ্ত হইলেন না। রাজ সরকারে যাঁহারা কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহাদের প্রতিই লক্ষ্মী প্রসন্ন হইলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। রাজারা ক্রমেই বিমর্ষ হইতে লাগিলেন।

রাজা চৈতন্য সিংহ প্রায় অর্দ্ধেক জমিদারী নষ্ট করিয়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত হইলেন। তাঁহার পুত্র রাজা মদনমোহন সিংহ ১৫ দিন রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র মাধব সিংহ ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়েই ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে, সূর্য্যাস্তের দিন খাজনা দিতে অসমর্থতা হেতু সমস্ত সম্পত্তি রাজাদিগের হস্তান্তর হইল। ইঁহারা নিঃসম্বল হইলেন। দিল্লীর সম্রাট নাম মাত্র। বাঙ্গালার নবাবও নাম মাত্র। ইংরেজই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারাই বঙ্গদেশে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সৌভাগ্য ক্রমে ইংরাজ গবর্ণর রাজা মাধব সিংহকে পেন্সন্ দিলেন। এই সামান্য পেন্সনের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিতে হইল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মাধব সিংহের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল সিংহ পিতার পেন্সনের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি আর রাজা উপাধি পাইলেন না। গোপাল সিংহ রাজত্ব বা জমিদারী বিহীন হইয়া ৬৬ বৎসর পেন্সন্ ভোগ করিয়া পরলোকগত হইলেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজাদিগের একষষ্টিতম রাজা। রামকৃষ্ণ সিংহদেব ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পেন্সন্ ভোগ করিতেছেন। রামকৃষ্ণসিংহের পুত্র নাই, বোধ হয় ইঁহার মৃত্যুর পরই এই বংশ লোপ হইতে চলিল।

রামকিশোর সিংহ দেব রামকৃষ্ণ সিংহের উত্তরাধিকারী হইবেন। এই বংশের একটী সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। তাহাতে অনেক বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যাইবে। জামকুড়ী, কুচিয়াকোল প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের বংশীয়েরা জমীদার আছেন। বিষ্ণুপুরের দুর্গ প্রাকারের মধ্যে একটী গড় আছে। সেটী অতি সুদৃঢ়। কিম্বদন্তী আছে রাজারা যুদ্ধকালে স্ত্রীলোকদিগকে এই গড়ে রাখিতেন। এটী কোন সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

আর একটী কথা বলিয়া শেষ করিব। আজও সাহেব মহোদয়গণ ও এদেশীয় প্রায় সকলে রামকৃষ্ণ সিংহ দেবকে "রাজা" বলিয়া থাকেন। কিন্তু সরকারী কাগজ পত্রে "রাজা" লিখিবার নিয়ম নাই। অনেকেই এখন রাজা মহারাজা; কিন্তু যিনি পঞ্চদশ শত বৎসর স্বাধীন রাজা ছিলেন তিনি কিছুই নন। এ মহিমা বুঝিলাম না।

উপসংহারে এই মাত্র বলিতেছি যে কিষ্ণুপুর দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক সময়ে বিষ্ণুপুর একটী বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রাচীন দুর্গ এক্ষণে বনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি ইংরাজেরা সেই বন সকল পরিষ্কার করিয়া দুর্গটী সংস্কার করেন তাহা হইলে বঙ্গদেশের একটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তি রাখিবেন। মুরসিদাবাদ ও ঢাকা যদিও বাঙ্গালার রাজধানী ছিল কিন্তু মানসিংহের বঙ্গদেশে আসিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুপুরে স্বাধীন রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদের কীর্ত্তির যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। আশা করি সকলেই বিষ্ণুপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে ইচ্ছা করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সভ্যতার উন্নতি সহকারে নরজাতির শারীরিক পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে কি না।

এই বিষয়ের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ সভ্যতা কাহাকে বলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া উচিত। আমাদিগের বোধ হয় যে সেই আভাস নিম্ন লিখিতরূপে পাওয়া যাইতে পারে। ইয়োরোপের পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষণে যে নরজাতির বাস অর্থাৎ ইংরাজ, ফরাসি, জর্ম্মণ, স্পেনীয়, ও ইটালীয় এই পাঁচ জাতিকে আমরা সভ্যতা-মঞ্চের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞান করি। এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার কতিপয় জাতি সেই মঞ্চের অধস্তন শ্রেণী অধিকার করিয়া আছে বলিতে হইবেক! পাঠকবর্গ মনে মনে রাগ করিবেন না যে আমরা স্বজাতি অর্থাৎ হিন্দুজাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিতে পারিলাম না। তাঁহারা হয়ত মনে মনে ভাবিবেন 'কি আমরা আসল আর্য্যজাতি হইতেছি, আমাদিগের মধ্যে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির পুরুষরত্ন সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য নহি!" সত্য, কিন্তু ইহার উত্তর এক কথায় হয়, সভ্য যে জাতি, সে কখন পরাধীন হইবার নহে, অথচ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আমরা অদ্য আটশত বৎসর হইল বৈদেশিকদিগের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছি। এই একটী বিষয়ই আমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে খাট করিবে। পরাধীন হওয়ার মানে কি? কেবল দুএক যুদ্ধে হারিয়া যাওয়া নহে। তবে কি না, মনের সেই তেজ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া, যাহাতে করিয়া পরজাতির শাসনে থাকা অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত শ্রেয়স্কর বোধ থাকে। এই বোধ কিংবা এই তেজ দুটী একটী পুরুষের থাকিলে হয় না যদি আপামর সাধারণের স্বভাবসিদ্ধ অন্তঃকরণবৃত্তি তাদৃশ হয়, তাহা হইলে কোন বিজেতা জাতিই তাহাদিগকে করতলগত করিয়া রাখিতে পারে না, অর্থাৎ কোন বিজেতা জাতির পক্ষে তাদৃশ লোকদিগকে শাসন করা পোষায় না। পরজাতির শাসন যাহারা যাহারা করিয়া থাকে, সকলেই কোন কোন

লাভের জন্য। কিন্তু বিজিত লোকগণ অত 'জ্বলামেজাজের' হইলে তাহাদিগকে শাসন করিয়া কিছু লাভ থাকে না। মোটা মোটা বেতন, সস্তা চাকর বাকর, সস্তা আহারাদি, অসীম প্রভুত্ব, অসীম খোসামোদলাভ, বিশ্বহিতকারিতার যশ, এ সমস্তই দুর্লভ হয়। এই নিমিত্ত অত্যুন্নত সভ্যতা ও পরাধীনতা এই দুটী বিষয় একাধারে বর্ত্তমান বলিয়া জ্ঞান করিতে আমরা অপারগ। যাহা হউক, একথা কেবল প্রাসঙ্গিক মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই।

প্রকৃত প্রস্তাব হইতেছে এই যে, মানুষ যখন সভ্যতার কোন বীজ বপন করে নাই, তখন তাহার শরীরের গঠন যে প্রকারের ছিল, অনেক দূর সভ্যতা পাইবার পর তাহা এখনও আছে, কি অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে আমরা 'সভ্য' এই নাম উচ্চারণ কালে ইংরাজ ফরাশী প্রভৃতি দিগকে ধ্যান করিব আর পাটাগনিয়ার লোক বা হটেন্‌টট্‌দিগকে অপর দিকে ধ্যান করিব। অথবা আমরা স্বচক্ষে যাহাদিগকে দেখিয়াছি, অর্থাৎ আন্দামানী লোক দিগকে ধ্যান করিলেও ক্ষতি নাই।

যদি এই দুই জাতি লোকের ধ্যান এক সঙ্গে করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। যাঁহারা আপনাদিগকে দার্শনিক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা সৌন্দর্য্যের কিছু ঠিকানা নাই এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে চীনেরা খাঁদা নাক ও ক্ষুদ্র চক্ষু সুন্দর জ্ঞান করে, আমরা তদ্বিপরীতকে। সুতরাং আমরা যদি বলি যে অসভ্য অবস্থা অপেক্ষা সভ্যতর অবস্থায় মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়, তাহা দার্শনিক অভিমানীরা ফুঁয়ে উড়াইয়া দিবেন। তাঁহারা কহিবেন, সৌন্দর্য্য কেবল মনের ধর্ম্ম মাত্র, সুন্দর পদার্থ-গত কোন ধর্ম্ম নহে। একই বস্তু বা ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চক্ষে সুন্দর বা সুশ্রী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে ইত্যাদি। কিন্তু তদুত্তরে বলা যায় যে কাল রঙ অপেক্ষা ফর্শা রঙের কি অপেক্ষাকৃত রমণীয়তা নাই, শরীরের চর্ম্মে ক্রমাগত দাগ কড়া আঁচড় মশা কামড় ইত্যাদি থাকিলে সেই চর্ম্ম দেখিতে সুন্দর হয় কি চর্ম্ম মসৃণ ও চোস্ত ও পরিষ্কার হইলে তাহা হয়? কিন্তু যখন বস্ত্রের মধ্যে দিগম্বর, অথবা সেলাই করা তরু পল্লব এই প্রকার পোসাকের বন্দোবস্ত, সেই অবস্থায় কি মসৃণ ও পরিষ্কার দেহচর্ম্ম হওয়া সম্ভব? আর এক কথা বলি, যদি উদরটি বিলক্ষণ লম্বমান হয়, তাহা হইলে দেখায় ভাল, না ক্ষীণ কটিযুক্ত সূক্ষ্ম উদর দেখিতে সুশ্রী? কিন্তু অসভ্য অবস্থায় খাদ্য দ্রব্য দুর্লভ, শামুক গেঁড়ি বা বনফল যেদিন জুটিল সে দিন পেট ভরিয়া খাইতে হয়, আবার কবে জুটিবে স্থির নাই, এই নিমিত্ত উদরে এককালে এত বোঝাই লইতে হয়, যে উদর সহজেই স্ফীতাকৃতি ও লম্বমান হইয়া উঠে। অসভ্য মাত্রেরি এই লক্ষণ, অসভ্য মাত্রেরি এরূপ ক্ষমতা আছে যে, সে সুদীর্ঘ উপবাস সহ্য করিতে পারে, অথচ এককালে অত্যন্ত

অতিরিক্ত পরিমাণের আহার দেহ-মধ্যগত করিতে পারে। এই নিমিত্ত বলিতে হই বেক যে লম্বোদরতা যদি কদাকার হয়, আর উদরের কৃশতা যদি অঙ্গসৌষ্ঠব বলিয়া গণ্য হয়, তবে অসভ্য অপেক্ষা সভ্যের অঙ্গসৌষ্ঠব এ অংশে প্রকৃষ্ট। আরও এক অংশে প্রকৃষ্ট, সর্ব্বাঙ্গ সুগঠন মূর্ত্তি উপার্জ্জন করিতে হইলে রীতিমত ও শাস্ত্রানুমোদিত ব্যায়াম অভ্যাস করা চাই। অসভ্যকে সময়ে সময়ে আহারের অনুসন্ধানে ঘোর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে করিয়া উহার শরীরের কোন কোন মাংসপেশী বিপুল পরিমাণে ব্যায়াম প্রাপ্ত হইয়া অসম্ভব বৃদ্ধি ও প্রকর্ষলাভ করে বটে, তাহার পায়ের ডিম হয়ত অত্যন্ত মোটা হইয়া উঠে, পায়ের তলা হয়ত বিলক্ষণ প্রশস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু কালিদাস যাহাকে বলেন চতুরস্র শোভি, অর্থাৎ চৌরস, চোস্ত, যেখানে যে রকমটী চাই সেই রকম, এ প্রকার গঠন সৌষ্ঠব উপার্জ্জন করা অসভ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহার পক্ষে সে বিষয়ের বিঘ্ন বিস্তর আছে। অসভ্য প্রচুর ও উৎকৃষ্ট আহার প্রাপ্ত হয়, উহার এমন পরিচ্ছদ নাই যে আবশ্যকমত শরীরকে আচ্ছাদন করিতে পারে; শীত, গ্রীষ্ম, বাত্যাতপ সমস্ত উহাকে একভাবে সহ্য করিতে হয়, শরীরের এক স্থানে একবার চোট লাগিলে চিরকালের জন্য সেই স্থানে কড়া পড়িয়া যায়, শয়নসুখ বা বাসস্থানের সুখস্বচ্ছন্দ যাহাকে বলে, তাহার কিছুই অসভ্যের পক্ষে ঐকান্তিক অপ্রাপ্য। এ অবস্থার কথন শরীরের চর্চ্চা হইতে পারে! আজি কালি লোকে মনেরি চর্চ্চা, মানসিক শক্তিরই অনুশীলনে উন্নতি সাধন এই বিষয়টী বুঝে। কিন্তু শরীরের যে একটা চর্চ্চা ও উন্নতি সাধন আছে, সে বিষয়ে এক্ষণে লোকের মনোযোগ বড় কম হইয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্যই আক্ষেপের বিষয়। মনের উন্নতি সাধনের ফল চিরস্থায়ী, অর্থাৎ তদ্দ্বারা নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া আর প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ পূর্ব্বক প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে অধিকতর রূপে আমাদিগের স্বকার্য্যসাধনোপযোগী করিতে পারি, ইহা সত্য বটে। কিন্তু শরীরের উন্নতি সাধনের ফলও কি সেইরূপ চিরস্থায়ী নহে? তাহাও কি সন্তান-পরম্পরাক্রমে স্থায়ী হইয়া যায় না? আমরা ছিলাম বনমানুষ, হয়ত লাঙ্গুলধারী, আমাদিগের হস্ত পদ দুইই এক প্রকারের ছিল, অর্থাৎ হাত দিয়া এক্ষণে যেমন ধারণকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকি, শাখামৃগ অবস্থায় পা দিয়া সেই কার্য্য করিতাম। আর ঠিক্ হইয়া বা স্থিরভাবে বা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম না, দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে ডাহিনে বামে হেলিতে দুলিতে হইত। সেই অবস্থা হইতে আমাদিগের কত উন্নতি ও সুশ্রীকতা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখ। আমাদিগেয় সর্ব্বাঙ্গের লোম প্রায় তিরোহিত হইয়াছে, আমাদিগের দুই পা শরীরের ভর ধারণ করিতে এতদূর সক্ষম হইয়াছে যে আমরা সচ্ছন্দে খাড়া হইয়া দ্রুতবেগে দৌড়িতে পারি, আমাদিগের অনেক স্থানের মাংসপেশী সুন্দর সুগোল সুগঠন প্রাপ্ত

হইয়াছে, বক্ষস্থল চেটাল হইয়াছে, মস্তিষ্ক অনেকটা সম্মুখদিকে ঠেলিয়া আসিয়াছে, দুই চক্ষু দীর্ঘ ও সুশ্রী হইয়াছে, ললাট প্রশস্ত ও নাসিকা সুগঠন হইয়াছে। এই সমস্ত পরিবর্ত্ত কি একেবারে হইয়াছে, কখনই নহে। প্রকৃতির নিয়মই নয় যে এরূপ বিপুল পরিবর্ত্ত সমস্ত এককালে সমাধা করিবেন। আর শাখামৃগ যে আমরা এক কালে ছিলাম, অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন, তদ্বিষয়ে 'কিন্তু' হওয়া সেইরূপই অসংগত, যেরূপ পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করা অস্বীকার করা অসংগত হয়। কিন্তু সেই শাখামৃগ একটী আর পাশ্চাত্য ইয়োরোপের একটী কোট পেণ্টেলুন আদি-ধারী সভ্য পুরুষ একটী পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিয়া দেখ দেখি এত প্রকাণ্ড অদ্ভুত পরিবর্ত্ত কি একলম্ফে হওয়া সম্ভব?—যদি তাহা না হয়, তবে কি ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না যে যখন 'মানুষ' বলিয়া একটী জাতি সাধারণ শাখামৃগের দল হইতে পৃথক হইয়া গেল, তখন সেই মানুষ, আর এক্ষণকার 'মানুষ' এ দুয়ের আকারগত বিস্তর বৈসাদৃশ্য থাকা কি নিতান্তই সম্ভব নহে? ইহাতেই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে অসভ্য অবস্থা অপেক্ষা সভ্য অবস্থাতে শারীরিক গঠনের বিষয়ে অনেক অন্যথা হইয়াছে? বিজ্ঞানের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমরা কেবল ন্যায়প্রয়োগ (deductive reasoning) দ্বারাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে নিতান্ত প্রাচীনতম অসভ্য অবস্থা হইতে আমরা বিস্তররূপে অবয়বগত পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য কেবল ন্যায় প্রয়োগের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এক্ষণে বিস্তর অসভ্য জাতি বিদ্যমান আছে, যাহাদিগের সহিত সভ্য জাতির তুলনা দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তই সাব্যস্ত হইয়া উঠে। ফলতঃ সভ্যতা কোন জাতির এককালে উদয় হয় নাই, ইহা ধাপে ধাপে গঠন হইয়াছে এবং সেই সমস্ত রূপ কোন কোন পণ্ডিত এইরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। প্রথম একটী রূপ মনে কর আগুন জ্বালিবার ক্ষমতা। আমরা এক্ষণে ইয়োরোপীয়দিগের কল্যাণে দুলাখ পাঁচলাখ অগ্নি শলাকা জামার জেবে লইয়া বিচরণ করিতে পারি। কিন্তু এক সময়ে ধরাতলের এরূপ অবস্থা ছিল যে 'একটু আগুন দাও ত গা' এ কথা সম্বোধন করা যায় এমন কেহ ছিল না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা আগুন বাহির হয় এই সামান্য তত্ত্বটুকু পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যতই শীত পড়ুক, সকলই বর্দাস্ত করিয়া লইতে হইত এবং প্রত্যহ শীতকালে শত করা আশী নব্বই লোক মারা পড়িত। এই নিমিত্ত যখন অগ্নি প্রস্তুত করিবার সন্ধান বাহির হইল, তখন একটী মহীয়সী আবিক্রিয়া করা হইল বলিতে হইবেক। আমাদিগের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ বনমানুষগণ এ ক্ষমতা উপার্জ্জন করেন নাই। যখন খাড়া হইয়া বেড়াইবার ক্ষমতা কতকটা বৃদ্ধি হইয়াছিল যখন দুই হাত চলনক্রিয়ার সহকারিতা কার্য্য হইতে কতকটা অবসর পাইয়াছিল, তখন বোধ হয়

উহার মধ্যে একটু বেশী চালাক অসভ্য শীতকালে কোন দাবানলের নিকটে কি রূপ আরাম পাওয়া যায় তাহা অনুভব করিতে করিতে হঠাৎ এক দিন দুই ডালের ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখিয়া থাকিবে। সে অবশ্যই কিছু বেশী একটু চালাক ছিল, নচেৎ তাহার ঠাহর থাকিত না। এই আবিক্রিয়া বোধ হয় মানুষের সভ্যতা আরোহণের প্রথম ধাপ। ইহার গুরুতরতা বাক্যে ব্যক্ত করা অসাধ্য। কলের গাড়ীই বল, কলের জাহাজই বল, তারের খবরই বল, এই অগ্নি আবিক্রিয়ার নিকটে কিছুই লাগে না। এই নিমিত্ত ভুবনমাননীয় কর্ম্মট মহাত্মা মনুষ্যসমাজের সর্ব্বসাধারণের জন্য যে সমস্ত পর্ব্বাহ কল্পনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অগ্নি-আবিক্রিয়া-সংক্রান্ত এই একটি উৎসব সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীনতম কবিতাতে অর্থাৎ ঋগ্বেদে অগ্নির উপাসনা, ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা বর্ণন এই সকল রচনার আর ইয়ত্তা নাই। ঋগ্বেদ যখন রচনা হইয়াছিল, তখন যে অগ্নি-আবিক্রিয়া অনেক দিন হইয়া গিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অর্থাৎ ঋগ্বেদরচয়িতাদিগকে আমরা এতদূর ঘোর অসভ্যাবস্থাপন্ন জ্ঞান করি না, যেন এইমাত্র তাহারা আগুন জ্বালিতে শিখিয়াছে, যেন ঐ আবিক্রিয়ার নবতা তাহাদিগের নিকট তখনও অপনীত হয় নাই, যেন তাহারা নূতন নিধি পাইয়া সেই নিধির গুণগানে কণ্ঠস্বর ছাড়িয়া দিয়াছে। এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসংগত হইবেক। কিন্তু আমাদিগের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অগ্নি-আবিক্রিয়ার পরম্পরাগত কিংবদন্তীটী ব্রাহ্মণেরা অতি যত্নে লালন পালন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই 'মামুলী' কাঠে কাঠে ঘর্ষণের আগুনটী ভুলিতে পারেন নাই, যজ্ঞের অগ্নি ঘর্ষণ-জনিতই হওয়া চাই, উহা পুরাতন আগুন হইলে চলিত না। এই বিশ্বাসের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, ঘর্ষণ জন্য তাঁহারা অগ্নিকে পবিত্র জ্ঞান করিতেন। আর পবিত্র বলিতে যাহা প্রাচীন প্রথানুগত। ইহাতে বোধ হইতেছে যে অগ্নি-উৎপাদনের আদিম প্রথাটী ব্রাহ্মণেরা কোন মতে হাতছাড়া করিতে রাজী ছিলেন না।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার পরিণাম।

প্রাচীন হিন্দুগণ ত্রয়ী, দণ্ডনীতি ও বার্ত্তাশাস্ত্রে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন আন্বীক্ষিকীতেও তাহার কোন অংশে হীন ছিলেন না। আন্বীক্ষিকী বি-

জ্ঞান শাস্ত্র। কেবল আন্বীক্ষিকী কিম্বা বিজ্ঞান বলিলে হয়ত অনেকের বোধগম্য হইবে না। বিজ্ঞান নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত। বিজ্ঞান বলিলে তর্কশাস্ত্র রসায়ন-বিদ্যা শিল্পশাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বুঝায়। এমন এক সময় ছিল যখন হিন্দুগণ পৃথিবীস্থ সকল জাতি অপেক্ষা কি সভ্যতা, কি ঐশ্বর্য্য, কি প্রতাপ, কি জ্ঞান সকল বিষয়েই উন্নতিশালী ছিলেন। সংসারকে সুখধাম করিবার জন্য যে সকল শিক্ষা ও উপায়ের প্রয়োজন তাহা তাঁহারা সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র একটী। সংসারে আগন্তুক ও অনাগন্তুক ব্যাধি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। এমন কেহ নাই যে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। তাহার দমনের নিমিত্ত একমাত্র উপায় চিকিৎসাতত্ত্ব (শাস্ত্র)। হিন্দুদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম আয়ুর্ব্বেদ। অনেকের জ্ঞান আছে সাম ঋক্ প্রভৃতির ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া একটী স্বতন্ত্র বেদ আছে। এ জ্ঞানটী ভ্রমমূলক। যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য রুগ্ন ব্যক্তির রোগ শান্তি ও সুস্থ শরীরীর স্বাস্থ্যরক্ষা এবং যে শাস্ত্রে আয়ুর বিষয় বর্ণিত ও আয়ুর বর্দ্ধনোপায় প্রদর্শিত আছে তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে। *

এইটী আয়ুর্ব্বেদের বিশদ ও বিস্তৃত লক্ষণ নহে। কি রূপ নিয়মে থাকিলে জীবন সুখময় হইবে, নিয়ম লঙ্ঘনে কতদূর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, জীবনের সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, আয়ুর পরিমাণ কত এবং আয়ু কাহাকে বলে, এই সমস্ত বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। †

পৌরাণিকী বার্ত্তানুসারে ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গভূত সহস্রাধ্যায়ে বিভক্ত লক্ষশ্লোকী আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করিয়া তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে সেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। প্রজাপতি আবার অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে ধন্বন্তরি এবং ভরদ্বাজ শিক্ষা লাভ করিয়া প্রথম শল্যতন্ত্র দ্বিতীয় কায়-চিকিৎসা মর্ত্ত্যলোকে প্রচার করেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মাই আবার মনুষ্য সকলকে অল্পায়ু ও অল্পমেধা দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে এক জনের জীবনে অপারগতা জানিয়া আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় আট অঙ্গে বিভক্ত করেন। যথা, শল্য, শলোক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার-ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন-তন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র। বিভক্ত করিবার তাৎপর্য্য এই যে এক এক ব্যক্তি এক

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ। আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ। সুশ্রুতঃ সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়ঃ।

† হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতং মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে। চরক সূত্রস্থান প্রথম অধ্যায়।

অঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে পারদর্শী হইতে পারিবে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ইন্দ্রের নিকট হইতে ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ ঋষি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ধন্বন্তরি দিবোদাস নামে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া কাশীর রাজা হইলেন। তিনি বাণপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিতি কালে সুশ্রুত প্রভৃতি কয়েকটী ঋষিকুমারকে অন্যান্য অঙ্গের সহিত প্রধানরূপে শল্যতন্ত্র উপদেশ দেন। তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই এক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুশ্রুতের গ্রন্থ, সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়াতে তাহাই আদরণীয় হয়। সুশ্রুতের কৃত গ্রন্থের নাম সুশ্রুত। এই সুশ্রুতে শল্যাঙ্গের বিষয়ই বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে ও অন্যান্য অঙ্গ সংক্ষেপে আছে। আমরা যে সুশ্রুত এক্ষণে দেখিতে পাই তাহা আবার নাগার্জ্জুন নামে এক জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং তৎকালের কাশ্মীরাধিপতির মন্ত্রী, ইহার প্রতিসংস্কার অর্থাৎ সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টরূপে সংশোধন করেন। নাগার্জ্জুন কোন সময়ের লোক তাহা অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এসিয়াটিক রিসার্চে এক নাগার্জ্জুনের কথা আছে তাঁহার বয়স খৃঃ শাকের ১৪১ একশত একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব। বোধ হয় সেই নাগার্জ্জুনই সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা হইবেন। কারণ এসিয়াটিক রিসার্চে তাঁহাকে চিকিৎসক বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে।

ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসিয়া আত্রেয় পুনর্ব্বসু প্রভৃতি ঋষিগণকে উপদেশ দেন। আত্রেয় পুনর্ব্বসু আবার অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণকে উপদেশ দেন। অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রত্যেকে এক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে অগ্নিবেশের গ্রন্থই অধিকতর আদরণীয় হয়। এই গ্রন্থে (অগ্নিবেশকৃত) কায়চিকিৎসাই বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে। অন্যান্য অঙ্গ অল্প পরিমাণে উল্লেখ আছে মাত্র। কিন্তু সুশ্রুতে যেরূপ শল্যাঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য তন্ত্রের বিষয় বর্ণিত আছে অগ্নিবেশের গ্রন্থে কায়চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ সেরূপ বাহুল্য বর্ণিত নাই।

অগ্নিবেশের গ্রন্থের আবার কিছুকাল পরে চরক নামক এক ব্যক্তি প্রতিসংস্কার করেন। চরক কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করা অসাধ্য। পৌরাণিক বার্ত্তা অনুসারে পৃথিবী এক সময়ে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়াতে মানবগণ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় হাহাকার করিতেছিল তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান্ বিষ্ণু মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন এবং চরের ন্যায় গুপ্ত ভাবে নানা স্থানে ভ্রমণ করতঃ অগ্নিবেশের গ্রন্থ উদ্ধার ও তাহার প্রতিসংস্কার করিয়া মানবগণকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন ও পৃথিবীকে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন।

বিষ্ণু রোগশোকার্ত্ত মানবগণের ক্লেশ শান্তির নিমিত্ত চররূপে গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চরক।

সেই চরক দ্বারা প্রতিসংস্কৃত, এই জন্য অগ্নিবেশের গ্রন্থের ন্যম চরক হইয়াছে।

চরক বিষ্ণুর হাতেও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার সিদ্ধিস্থান আর এক ব্যক্তির কৃত; তাঁহার নাম দৃঢ়বল।

আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয় বাক্যতা ও পবিত্রতা দর্শাইবার জন্য উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল না। ইহার প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার জন্যই লিখিত হইল। ইহা এক দিনের ও এক সময়ের বস্তু নহে। মুনিগণ ধ্যানস্থ হইয়া দৈববাণী দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মানসপটে মুহূর্ত্ত মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ অঙ্কিত দেখেন নাই। ইহা তিল প্রমাণে সংগৃহীত এবং বহুকালের বহুদর্শিতার ফল।

প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়ের (চরক সুশ্রুতের) পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা অতিশয় সুকঠিন, তবে উভয় গ্রন্থের আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় যে সুশ্রুত চরক অপেক্ষা প্রাচীন। যাহা হউক এস্থলে আমি সে বিষয়ের তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। সময়ান্তরে এবিষয়ের কথা উত্থাপন করিব।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এই আয়ুর্ব্বেদ শল্য প্রভৃতি আট অঙ্গে বিভক্ত। আট অঙ্গের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ নাই। চরক সুশ্রুতেই সমুদায় অঙ্গ ন্যূনাধিক কল্পনায় বর্ণিত আছে। চরক সুশ্রুতই হিন্দুদিগের প্রাচীন মূল চিকিৎসা গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই—বাগভট প্রভৃতি সংগৃহীত ও বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও আয়ুর্ব্বেদ উত্তরোত্তর বিস্তীর্ণ হইয়াছে তথাপি নিদান স্থানের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। প্রাচীন চরক সুশ্রুতে যাহা আছে তাহাতে তিলমাত্রও সংযোগ হয় নাই, তবে চিকিৎসিত স্থানের ক্রমশঃ যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে উদ্ভিজ্জঘটিত ঔষধিই অধিক পরিমাণে ছিল। উদ্ভিজ্জ কষায়, উদ্ভিজ্জ বটিকা, উদ্ভিজ্জাবলেহ, উদ্ভিজ্জ-মিশ্রিত ঘৃত তৈল প্রভৃতিই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ধাতু ও উপধাতু-ঘটিত ঔষধ অতি অল্প মাত্র ছিল। পারদের একেবারেই ব্যবহার ছিল না। ধাতুর মধ্যে কেবল লৌহেরই ভূরিপ্রয়োগ ছিল। স্বর্ণের ব্যবহার অতি অল্পমাত্র ছিল। তবে সকল ধাতুরই গুণ বর্ণিত আছে। ধাতু উপধাতু ও খনিজ দ্রব্য সকলের পরস্পরের উপর রাসায়নিক ক্রিয়ানির্ণয়, পরস্পরের সংযোগ বিয়োগ করণ, মনুষ্য-শরীরে তাহার পরীক্ষা ইত্যাদি তান্ত্রিকদিগের সময়েই পরীক্ষিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণ পারদ ও গন্ধককে শিব ও শক্তির অংশ ও এই দুই দ্রব্য ব্যবহার করিলে দীর্ঘ জীবন ও যোগাদি সাধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে বিবেচনা করিতেন। তদনুসারে তাঁহারা পারদ ও গন্ধকের সংশোধন জারণ মারণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং পারদ গন্ধক ঘটিত নানা প্রকার রাসায়নিক সংযুক্ত দ্রব্য সৃষ্টি করেন। "রসসিন্দূর" 'রসকর্পূর' 'রসমাণিক' এবং হিঙ্গুল সেই সময়ের ফল। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর পারদ ও গন্ধকের সহিত জারণ এবং স্বর্ণ মাক্ষিক প্রভৃতি উপধাতুর

মারণও সেই সময়ে আবিষ্কৃত হয়। ফলতঃ যেরূপ মধ্য সময়ের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পর্শমণির অনুসন্ধানে রসায়ন বিদ্যার (কেমিষ্ট্রীর) মূল ভিত্তি স্থাপন করেন; সেইরূপ তান্ত্রিকগণ দীর্ঘজীবন ও যোগ সাধনার উৎসাহে পারদ ও গন্ধকের জারণ মারণের প্রসঙ্গে বিবিধ ধাতুর জারণ মারণ ও প্রাণীশরীরে তাহার প্রয়োগের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ঔষধকল্পে ধাতু বিষয়ের যাহা উন্নতি হইয়াছিল তাহা সেই তান্ত্রিকদিগের সময়েই। ধাতু বিষয়ক গ্রন্থ 'রস রত্নাকর' রসেন্দ্র চিন্তামণি, ও রসসাগর প্রভৃতি। অনেক তন্ত্রেও ধাতু ও উদ্ভিজ্জ ঘটিত ঔষধের কথা আছে। তান্ত্রিকদিগের মতে তন্ত্র সকল শিববাক্য, এজন্য সাধারণ লোকে শিবকে হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে শিবের নামোল্লেখও নাই।

পুরাতন ঋষিগণ পর্ণকুটীরে বাস এবং ফল মূলাহার করিয়া বন, উপবন, মহারণ্য, পর্ব্বতগুহা, উপত্যকা প্রভৃতি পরিভ্রমণ ও অনুসন্ধান করিয়া এবং মনুষ্য, পশু প্রভৃতির শবচ্ছেদ পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ রূপ কীর্ত্তিস্তম্ভের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধস্তন সন্তানগণেরাও সেই ভিত্তির উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে তান্ত্রিক সাধুবৃন্দও তাহার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। উন্নতির কথা অধিক আর কি বলিব কায় চিকিৎসার কথাই নাই, যাহা লইয়া এক্ষণকার অনভিজ্ঞ দেশীয় চিকিৎসকগণও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণের সহিতও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। শল্যতন্ত্রেরও এত উন্নতি হইয়াছিল যে অশ্মরী চ্ছেদ এবং মূঢ় গর্ভের গর্ভবহিষ্করণের প্রণালী দেখিয়া অনেকানেক পাশ্চাত্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকও বিস্মিত হইয়াছেন।

সেই আয়ুর্ব্বেদের পরিণাম কি হইয়াছে? সে রাম নাই সে অযোধ্যাও নাই। আয়ুর্ব্বেদ এখন সহায়হীন। যতদিন ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাগণের আধিপত্য ছিল ততদিন ইহার আদর ছিল। ভারতবর্ষ যে সময় হইতে বিজাতীয়গণের হস্তগত হইলেন সেই সময় হইতেই ইহার উন্নতির ধ্বংশ হইল। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রেরও উন্নতির পথ রোধ হইল। ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। মুসলমানদের সময় তাহাদের যুনানী চিকিৎসার বহুল প্রচার ছিল। এখন ইংরাজদের সময় এলোপ্যাথি চিকিৎসার বহুল প্রচার। যে বিষয়ে রাজার আদর নাই প্রজাদেরও তাহাতে আদর হয় না। যেমন এলোপ্যাথি চিকিৎসার বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ও ঔষধালয় নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে স্থাপিত হইতেছে, সেইরূপ রাজার আদর থাকিলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ঔষধালয়ও স্থাপিত হইত। কিন্তু রাজা বিদেশীয়; তাঁহাদের এদেশীয় চিকিৎসার উপর আদর বা আস্থা কেন হইবে? তাঁহারা এদেশীয় সমুদায় শাস্ত্রই প্রায় ভ্রমাত্মক বলিয়া থাকেন, কিন্তু এদেশীয় লোকেরা

যে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় রাজচ্ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া বহুকালের সঞ্চিত রত্নসকল পদদলিত করিয়া বিনষ্ট করিতেছেন, তাঁহাদের মনে কি ক্ষোভ বা কষ্ট হইতেছে না।

শ্রী—ব

শঙ্করমণ্ডন সংবাদ।

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পর শঙ্কর বিচার করিতে হইবে বলিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাধা পূর্ব্বক সশিষ্য মণ্ডনের গৃহে যাইয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মণ্ডন পণ্ডিতও স্বীয় পত্নীকে মধ্যস্থ পদে নিয়োগ করিয়া বিচারে সমুৎসুক হইলেন। পতিদেবতা সারদা পতি-কর্ত্তৃক তাঁহাদের বিদ্যার তারতম্য বিচারে মধ্যস্থপদে নিযুক্ত হইয়া স্বয়ং সরস্বতীর ন্যায় শোভা পাইলেন।

যতীন্দ্রও বিচারে মণ্ডনের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া প্রথমে জীবেশ্বরের একত্ব রূপ স্বীয় মত বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বলিলেন এক মাত্র সচ্চিদমল পরমবস্তু ব্রহ্মই, অজ্ঞানের আবরণে এই প্রপঞ্চ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। শুক্তি যেমন রজতাত্মক না হইয়াও রজত রূপে প্রকাশ পায়, পরমাত্মাও সেইরূপ এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত। জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য-জ্ঞান লাভ হইলে নিখিল প্রপঞ্চ ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। এই ঐক্য-জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মেতে লয়ের নামই নির্ব্বাণ।* নির্ব্বাণ লাভ হইলে আর ফিরিয়া সংসারে আসিতে হয় না, বেদান্ত তাহার প্রমাণ। যদি আমার জয় হয় ভাল, আর আমার যদি পরাজয় হয়, হে মণ্ডন, আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হইব, এই পাটল বসনের পরিবর্ত্তে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিব; উভয়-ভারতী, আমাদের জয় পরাজয়ের বিচার করুন"।

যতিবর নিজ সম্বন্ধে এই রূপ উদার প্রতিজ্ঞা করিলে পর গৃহি-শ্রেষ্ঠ মণ্ডন স্বপক্ষ স্থাপনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বলিলেন—"পরমাত্মা বিষয়ে বেদান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না অথবা যদিও করা যায়, যেহেতু পরমাত্মা নির্লিপ্ত তাহাতে শক্তিযোগ না হইলে তাহা দ্বারা কোন

* একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বাচারম্ভনম্বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং, তরতিশোকমাত্মবিৎ। তত্র কোমোহঃ কঃশোকঃ একত্ব মনুপশ্যতঃ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ন স পুনরাবর্ত্ততে ইত্যাদি।

কার্য্য হয় না; বেদ অপৌরুষেয় অতএব স্বতই প্রমাণসিদ্ধ। বেদে কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানেরই কথা আছে কথার প্রয়োজন কার্য্যেতেই পর্য্যবসিত হয়। কেহ যদি বলে ঘট আন, ঘটানয়ন পর্য্যন্তই সেই কথার প্রয়োজন থাকে। ঘট আনিলে পরে সে কথা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আবার 'ঘট আন' এই কথার দ্বারা ঘট কি পদার্থ তাহার মীমাংসা হয় না, বেদবাক্য সম্বন্ধেও অবিকল সেই রূপ; বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান মাত্র তাহার প্রয়োজন। ক্রিয়ানুষ্ঠানেই মুক্তিলাভ হয় ইহা বেদের অভিমত, মানুষ আজীবন তাহাই করিবে।

যদি আমি বিচারে পরাজিত হই আমিও এই শুক্ল বসন পরিত্যাগ করিয়া পাটল সাটি পরিধান করিব, গার্হস্থ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিব। তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ তাহার বিপরীত আমার ঘটিবে। আমাদের উভয়ের সম্মতি ক্রমে আমার স্ত্রীই মধ্যস্থ হউন"।

পরাজিত ব্যক্তি জেতার আশ্রম গ্রহণ করিবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শঙ্কর ও বিশ্বরূপ উভয়েই জয় লাভের মানসে বিচার আরম্ভ করিলেন। দ্বয়-ভারতী * বিচারে মধ্যস্থ রহিলেন। নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়াই তাঁহারা বিচার আরম্ভ করেন, এইরূপ দিনের পর দিন যায়, উভয়-ভারতী গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া সকল সময়ে সভাস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারেন না, অতএব তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতদ্বয়ের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া বলিলেন যাহার কণ্ঠমালা মলিন ভাব ধারণ করিবে তাহারই পরাজয় জানিবে। এই বলিয়া তিনি মণ্ডনের আহারের এবং যোগীর ভিক্ষার আয়োজন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করেন।

* উভয়-ভারতী, দ্বয়-ভারতী, সারদা ইত্যাদি মণ্ডনের স্ত্রীর নাম।

বাস্তবিক পক্ষে অন্তরাত্মার সাক্ষ্যের মতন সাক্ষ্য নাই, কে জেতা কে জিত উভয়ের অন্তরাত্মা তাহার প্রধান সাক্ষী। আত্মার সাক্ষ্য মুখচ্ছবিতে প্রতিভাত হয়। কোনরূপেই মুখের উজ্জ্বল অথবা মলিন কান্তি পরিবর্ত্তন করা যায় না। শত চেষ্টার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অলক্ষিত ভাবে তাহা বাহির হইয়া পড়ে। জড় প্রকৃতি কণ্ঠের হার পর্য্যন্ত যে সহানুভূতিসূত্রে, জয় হইলে আনন্দে উজ্জ্বল, ও পরাজয় হইলে মলিন কান্তি ধারণ করিবে ইহার বিচিত্র কি। তাপমান যন্ত্রে যেমন উত্তাপের তারতম্য স্থির হয় সেইরূপ জয় পরাজয়ে গলার মালায় তাহা প্রকাশ হইবে মণ্ডন পত্নী স্থির করিলেন।

এদিকে তাঁহারা বিবাদ চালাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদিদেবগণ আসিয়া আকাশে নিজ নিজ বাহনে বসিয়া তাঁহাদের বিচার শুনিতেছিলেন। তুমুল বিবাদ হইতে চলিল। সভাস্থ লোকেরা সাধুবাদ করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই বেদকে নিজ পক্ষে সাক্ষী করিতে লাগিলেন, দিনে দিনে বিবাদ বৃদ্ধি পাইতে চলিল, দেশদেশান্তর হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। পরস্পর জিগীষা ক্রমে বৃদ্ধি পাইল, তথাপি একের অন্যের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব হইল না।

উভয় ভারতী প্রতিদিন মধ্যাহ্নে যথা সময়ে আসিয়া মণ্ডনকে আহারের জন্য, যতিকে ভিক্ষার জন্য বলিয়া যাইতেন। এইরূপে পাঁচ ছয় দিন চলিয়া গেল। তাঁহারা একাসনে বসিয়া পরস্পরের উত্তর সকল খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মুছিবার সময় বা একবার আকাশ পানে তাকান্ এমন অবসর নাই। অনেক বিচারের পর যতিরাজ মণ্ডনের বিচার-নিপুণতায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তোমার যাহা বলিবার থাকে বল"। মণ্ডন বেদান্তসিদ্ধ অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "হে যতি-রাজ আপনারা যে বলেন জীব এবং ঈশ্বর বস্তুতঃ এক আমরা তাহার কোন প্রমাণ দেখি না।"

শঙ্কর উত্তর করিলেন "এই ত প্রমাণ যে উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গুরুগণ শ্বেতকেতু জনক প্রভৃতি শিষ্যদিগকে তুমিই ঈশ্বর, আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া জান এই রূপ বুঝাইতেছেন। *

মণ্ডন। "বেদান্তে যেমন হুম্‌ফট্ প্রভৃতি শব্দ কোন বিশেষ অর্থে বলা হয় না কিন্তু জপ্ করিলে পাপমোচন হয় তত্ত্বমসি শব্দও সেইরূপ"

শঙ্কর। "হুম্‌ফট্ প্রভৃতি শব্দের কোন অর্থ হয় না বলিয়াই বিজ্ঞেরা সে সকল জপোপযোগী স্থির করিয়াছেন। হে প্রাজ্ঞ, এই সকল বাক্যের যখন স্পষ্ট অর্থ হয় তখন কি করিয়া এ সকলের জপমাত্র প্রয়োজন হইবে।"

এ স্থলে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে অর্থশূন্য শব্দ জপের প্রয়োজন কি ?

যত কিছু শব্দ সার্থক তাহাদের অর্থ বাহ্য অথবা মানস বৃত্তির গোচর। পরমাত্মা বাহ্য, মানস সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর। তবে তিনি আছেন কি করিয়া জানা যায় ? যেহেতু তিনি চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ। তাঁহাকে জানিতে হইলে বাহ্য অথবা মানস কোন ইন্দ্রিয়ের চালনা করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিলেই তাঁহার স্বপ্রকাশ সত্তা উপলব্ধি হয়। যাহা মনে ধারণা করা যায় না সার্থক শব্দে তাহার নাম দেওয়া যায় না। সেই জন্য কোন শব্দে পরমাত্মার নাম হয় না। যদি হয় তবে অর্থশূন্য শব্দে কিঞ্চিৎ হয়; এই হয় যে তিনি আছেন; কিন্তু তাঁহাকে বর্ণনা অসাধ্য। নতুবা সন্ন্যাসীদের মতন অজপা সাধন করিতে হয়।

মণ্ডন পূর্ব্ব কথা ফিরাইয়া বলিলেন "আপাততঃ তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য দ্বারা জীব এবং ঈশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন হয় বটে, তথাপি এ কেবল যজ্ঞকর্ত্তার প্রশংসাবোধক মাত্র, তাহার স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য নাই।"

শঙ্কর। "ক্রিয়াকাণ্ডে যজ্ঞাঙ্গভূত যূপাদিকে অর্যমাদি রূপে প্রশংসা করিয়াছে বটে, যথা 'যূপ্ আদিত্য স্বরূপ' 'প্রস্তর যজ্ঞ-

* "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" আবার যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন "অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোসি তদাত্মানমেব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ সর্ব্বমভবৎ তত্রকো মোহঃ কঃশোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ"।

স্বরূপ'। সে স্থলে যদি এ সকলের বিধি শেষ করা মাত্র প্রয়োজন হয় হউক। কিন্তু জ্ঞান কাণ্ড স্থিত তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, ইত্যাদি বাক্য কি রূপে বিধিশেষার্থ হইবে ? *

* বিধিশেষ, অথবা অর্থবাদ কথা আমাদের শাস্ত্রে এক প্রকার পতিত পাবন বিশেষ বলিলে হয়। যাহা কিছু শাস্ত্রে অসত্য অথবা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় সমস্তই এই নামে পার পাইতে পারে।

মাতা যেমন সন্তানকে ঘুম পাড়াইতে হইলে বলেন 'ঘুম, না হইলে তোকে শিয়ালে লইয়া যাইবে'। দুরন্ত বালক স্থির ভাবে বসিয়া না খাইলে ভয় দেখাইয়া বলেন 'খাইতে বসিয়া যে উঠে সে বিবাহের সময় পিঁড়া হইতে পড়িয়া যায়' খাবার বস্তুতে পিপড়া পড়িলে শিশু না খাইলে প্রলোভন দেখান 'পিপড়া খাইলে সাঁতার শিখে'; ইত্যাদি এইরূপ করাতে যদি মিথ্যা কথনের দোষ হয় তবে পঞ্চতন্ত্র অথবা হিতোপদেশের কাক শৃগালাদির গল্পতেও সেই দোষ না হইবে কেন ? শাস্ত্রকারগণও জন সাধারণের মাতা হইয়া এইরূপ অনেক অলীক ফলের কথা বলিয়া গিয়াছেন। শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে তাহার নিকট নিদ্রার উপকারিতা বর্ণন করিয়া নিদ্রাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন যেমন অসম্ভব, সাধারণেরও অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে যাহার উপকারিতা তাহার স্থূল বুদ্ধির অগম্য। শিয়ালে নেবার কথা যেমন শিশুর বুদ্ধির অগম্য বলিয়াই মাতা তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রকারগণও সাধারণের স্থূল বুদ্ধির গোচর কোন কাল্পনিক ফলের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত অথবা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। নিষ্কাম দানের উপকারিতা

মণ্ডন। হে অর্হন্, তবে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য জীব ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক হউক।

সকলের বোধগম্য হয় না। দান না করিলেও আবার মন পশুবৎ সঙ্কীর্ণ হয়। স্বর্গ লাভের আশায় দান করিতে অনেকেই প্রস্তুত, এ জন্যই স্বর্গলাভের জন্য দান দক্ষিণা যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। স্বর্গকামোযজেত। বিধি অর্থাৎ অনুজ্ঞাবাক্যের নিন্দা বা স্তুতিবোধক ফল কথনের নাম বিধিশেষ। বিধি, যথা, "ওদনং পচেৎ" 'অন্ন প্রস্তুত করিবে'; বিধিশেষ যথা, "আয়ুর্ব্বচো বলং সুখং প্রতিভানঞ্চান্নে প্রতিষ্ঠিতং", আয়ু, বাক্য, বল, বুদ্ধি, সুখ, অন্নই সকলের মূল। অনেক স্থলে কথিত ফলসকল বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় বিরুদ্ধ। "সর্ব্বস্যাপ্তৈ সর্ব্বস্য জিত্যৈ সর্ব্বমেবৈতেনাপ্নোতি।" অর্থ, সকল 'কামনা সিদ্ধ হয়, সমস্ত জয় হয়, এই যাগ করিলে সমস্ত লাভ হয়।'

কবিরাজ খুড়োর! ব্যবস্থায় গরু হারাইলেও পাওয়া যায়। একেবারে যদি সমস্তই লাভ হইল পরে সে ব্যক্তি করিবে কি ? অনেক স্থলে কথিত ফল নিতান্ত ছেলে ভুলানর মতন। যেমন 'জ্যোতিষ্টোম না করিয়া যে অন্য যজ্ঞ করে সে একেবারে গর্ত্তে পড়ে', ইত্যাদি। এইরূপ শাস্ত্রে যতপ্রকার অপ্রত্যক্ষ ফলের কথা বলা হইয়াছে তাহার কোন্‌টি প্রকৃত আর কোন্‌টি বিধিশেষ মাত্র তাহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত দুরূহ। হয়ত শাস্ত্রের অপ্রত্যক্ষ ফল মাত্রেই অলীক কল্পনা, বিধিশেষ মাত্র। এই জন্যই ভগবান্ কৃষ্ণ এই সকল অলীক বৈদিক কর্ম্মফলের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদ রতাঃ পার্থ নান্য দস্তীতি বাদিনঃ"।

এ জন্যই ভগবান্ জৈমিনি সূত্র করিতেছেন।

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং।"

কিন্তু তাহা কেবল কর্ম্মের উন্নতির জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছে। যেমন "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত, অন্নমুপাস্ব, আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ প্রাণো বাব সম্বর্গ বাক্য ইত্যাদি দ্বারা অব্রহ্মভূত মন অন্ন অর্ক এবং বায়ু পূজাতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য সে সমস্ত ব্রহ্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ জীবোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য জীবকেই ব্রহ্ম কল্পনা করা হইয়াছে।

শঙ্কর। "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" 'মন ব্রহ্ম তাহার উপাসনা করিবে' ইত্যাদি স্থলে লিঙ্ প্রয়োগদ্বারা অথবা 'করিবে' পদদ্বারা মনের উপাসনার বিধি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু 'তুমিই ব্রহ্ম' এই বাক্যে কোন উপাসনা বিধির নির্দ্দেশ করা হয় নাই; অতএব হে মনীষিন্ কি রূপে কল্পনা করা যায় যে জীবোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অন্নব্রহ্মের ন্যায় জীবব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

মণ্ডন। হে যতিরাজ, মীমাংসা শাস্ত্রে যেমন "প্রতিতিষ্ঠন্তিহবায এতা রাত্রীরূপযন্তীতি" 'যাহারা রাত্রি নামে সোমযাগ বিশেষের অনুষ্ঠান করে, তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে,' এস্থলে প্রতিষ্ঠা রূপ ফল লাভের উল্লেখ আছে বলিয়া রাত্রিযাগের বিধি কল্পনা করা যায়, সেইরূপ 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈবভবতি' 'যে ব্রহ্ম জানে সে ব্রহ্ম হয়' এস্থলে ব্রহ্মত্ব-লাভ রূপ ফলের উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের বিধি কল্পনা করা যায়। যথা 'যদি ব্রহ্ম হইতে চাও তবে ব্রহ্ম জ্ঞান লা কর।'

শঙ্কর। যদি উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মা ইবার জন্যই 'জীব ব্রহ্ম' বলা হইয়া থাকে এবং মোক্ষ যদি উপাসনা ক্রিয়ার ফল বিশেষ মাত্রই হয়, তবে স্বর্গাদি রূপ অপর ক্রিয়াফলের ন্যায় মোক্ষও নশ্বর হইবে যেহেতু উপাসনা মনের কার্য্য বিশেষ, কর না করা মানুষের অধিকার। 'সন্ধ্যাং ধ্যা য়েৎ' ইত্যাদি বিধিবাক্যে ধ্যান করা ন করা ধ্যাতার অধীনে, মোক্ষ যদি এইরূ কোন বিধি অনুষ্ঠানের ফল মাত্র হয় তবে তাহাও অনিত্য হইবে। যদি বল তোমার মতেওত মোক্ষ অনিত্য' যেহেতু 'আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞানও মনের ক্রিয়া বিশেষ। ইহার উত্তর এই অদ্বৈত জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া বিশেষ হইলেও বস্তু যে রূপ ঠিক তাহারই জ্ঞান বলিয়া জ্ঞান করা না করা আ জ্ঞাতার মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে না যেমন যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প ভ্রম করিয় ভয় পাইয়াছে, সে যদি একবার রজ্জু বলিয়া জানিতে পারে, তবে আর সে পুন রায় সেই রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করিয়া ভ পায় না।

মণ্ডন। তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য উপা সনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য নাই ব হইল, কিন্তু জীবাত্মার এবং পরমাত্মার সা দৃশ্য প্রতিপাদক হউক।

ক্রমশঃ

—:০:—

ভাউ সাহেবের বখর।

শিন্দে অটক ও কিল্লেকুশাদ এই দুই তোপ বাহির করিয়া লইলেন। অটকের ঘোড়া তোপ ফত্তে নক্কর মাত্র শিলিম গড়ের কিল্লায় রহিল। অটক তোপের চতুর্দ্দিকে তিন সারি করিয়া তিন শত পঞ্চাশ গরু যুড়িয়া দিল। দুই হাতি লাগাইল। তত্রাপি তোপ সেস্থান হইতে সরে না। পরে নগর হইতে একজন মানুষ আনিয়া তোপের উপর বলি দিল। ছাগ, মোরগ, নারিকেল, নেবু প্রভৃতি বলিরত সংখ্যা ছিল না। অতি কষ্টে তোপ লক্করেতে আনীত হইল। তোপ উজ্জয়িনীতে লইবার প্রস্তাব হইল। তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। শিন্দের মানস যে, "আর একবার নাগুরাতে যাইয়া এই তোপ দ্বারা বিজেসিংকে আক্রমণ করিব।" তাঁহার মনে এই আশাই অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু তোপ লইবার বিষয়ে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইল। ভাট পক্ষীয় রূপরাম কটারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার কর হইতে দুই লক্ষ টাকা কমাইলে তিনি তোপ উজ্জয়িনীতে পৌঁছাইতে সম্মত হইলেন। উক্ত অঙ্গীকারে তোপ তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। তিনি তোপ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এ তোপ কোন কালেই উজ্জয়িনীতে পৌঁছিল না। শেষে যখন ইহাঁদের বিনাশ কাল উপস্থিত হইল তখন এই তোপ চমেলীর খালে আচরী ঘাটে পড়িয়াছিল। কিল্লেকুশাদ সঙ্গে চলিল। গাজুদীখান উজীরের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি দিল্লিতেই রহিলেন। দত্তাজী শিন্দে কুচ করিয়া মজল দর মজল পানিপত হইয়া কুরুক্ষেত্রে আসিলেন। সেখানে আটদিন থাকিয়া চারি তুলাদান করিলেন, পরে মজল দর মজল শতদ্রু পর্য্যন্ত গেলেন। লাহোরের সুভা সন্দীপ বেগের পুত্র ও লক্ষ্মীনারায়ন আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া পনের সহস্র সৈন্য সহ সাবাজী শিন্দে ও ত্র্যম্বক বাপুজীকে লাহোর, মুলতান, পঞ্জাব, কাশ্মীর, অটক পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পাঠাইলেন। শিন্দে নিজে কুচ করিয়া কুঞ্জপুরার নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। মনে যোজনা করিলেন, 'নজীবখানকে হস্তগত করত তাহার দ্বারা ভাগীরথীর উপর পুল বাঁধিয়া মহৎকার্য্য সাধন করিব।" জনকোজী শিন্দে, নারো শঙ্কর ও অন্তাজী মানকেশ্বর ইহাঁদের মনোভাব এই যে, "শ্রীমন্ত আজ্ঞা দিয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য করা হউক। নজীবখানকে শাস্তি দেওয়া যাউক।" সকলেরই এই মত।

গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলে ও নজীবখান পরস্পরের সহিত মিত্রতা ছিল। নজীবখান বলিতে লাগিলেন, "গোবিন্দ পন্ত

দাওনী, সুভেদার মলহাররাও তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ দত্তাজী শিন্দে সম্মুখে উপস্থিত। আমার গতি কি হইবে?" গোবিন্দ পন্ত অভয়দান করিয়া বলিলেন, "তুমি স্বস্থানে নিশ্চিন্ত থাক। উভয় পক্ষে মধ্যস্থতার ভার আমার।" গোবিন্দ পন্ত দত্তাজী শিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শিন্দে ভাগীরথীর পুল বাঁধা সম্বন্ধে গোবিন্দ পন্তের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন, "পাটীল বাবা, নজীবখান বিনা এ কার্য্য হইবার নহে।" ইহাঁর মনে ইহাই ছিল। উনিও সেই প্রস্তাব করিলেন। এ বিষয় ইহাঁর মন সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিল। গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলকে বলিলেন, "নজীবখানকে অসঙ্কোচে লইয়া আসিবে। তোমার ও আমার বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করা যাইবে।" গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলে নজীবখানের নিকটে উকীল পাঠাইলেন। তিনি তো পূর্ব্ব হইতেই আকুল হইয়াছিলেন। চারি সহস্র সৈন্যসহ নজীবখান রোহিলা সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দুই ক্রোশ অন্তরে শিবির স্থাপন করিলেন। বুন্দেলে দত্তাজী শিন্দেকে এই সংবাদ শুনাইবামাত্র তিনি অগ্রসর হইয়া যাইবার নিমিত্ত সজ্জিত হইলেন। তখন জনকোজী, নারো শঙ্কর, অন্তাজী মানকেশ্বর, জানরাও বাম্বলে প্রভৃতি ছোট বড় সরদার একত্রে মিলিত হইয়া এই পরামর্শ করিলেন, "শশক যেমন জালে পড়ে নজীবখান রোহিলা তদ্রূপ আসিয়াছে। আজিকার দিন কোন মতে ইহাকে ছাড়া হইবে না।" তাঁহারা দত্তাজী শিন্দেকে এই কথা বলিতে আসিলেন। তিনি শুনিয়া তাচ্ছল্য প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "স্বকার্য্য সাধনার্থে বৈরীর সহিত মিত্রতা করা আবশ্যক। ইহাতে আমি কি ক্ষতি করিতেছি?' জনকোজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, মনে করিলেন, "নাক খাট ভাল তবু বয়স ছোট ভাল না।" কাহারও চেষ্টা সফল হইল না। স্ত্রীলোকদিগের, বালক বালিকাদের পর্য্যন্ত ইচ্ছা নহে যে এবার নজীবখানকে ছাড়া হয়। কিন্তু কাহারও কথা না শুনিয়া দত্তাজী শিন্দে অগ্রসর হইয়া নজীবখানকে লইয়া আসিলেন। নজীবখানকে বলিলেন, "আমার নিমিত্ত ভাগীরথীর পুল বাঁধিয়া দেও। তোমাকে সর্ব্বাগ্রে পাঠাইতেছি। পরে যে ধন লাভ করিব তাহার দশমাংশ দিব। আর যে দেশ হস্তগত হইবে তাহারও দশমাংশ দিব। তুমি আমি এক প্রভুর ভৃত্য, একনিষ্ঠ হইয়া সেবা করা উচিত।" নজীবখান তাহা মান্য করিলেন। দত্তাজী শিন্দে নজীবখানকে বিল্বপত্র হরিদ্রা দিয়া বাকদত্ত হইলেন। নজীবখান তাঁহাকে সাজক্ রোটী দিলেন। দুই জনে অভেদাত্মা হইলেন। দশপনের দিন একত্রে রহিলেন।

ভাগীরথীর পরপার অযোধ্যাতে সুজাউদ্দৌলা ছিলেন। নজীবখান গুপ্তরূপে চেতরাম উকীল দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "দত্তাজী শিন্দে স্থির প্রতিজ্ঞ। তোমার প্রতিই যাত্রা করিবে। আমি একবার মন্ত্রণা করিয়া অবদুল অল্লীকে আনাইয়াছিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে তোমরা সকলে সাহায্য করিলে না। সে মন্ত্রণার ফল এইরূপ দাঁড়াইল। আমিই সকলের শত্রু হইলাম। এক্ষণে আর একবার সব তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই কথা বলিয়া বলিয়া পাঠাইলাম। ইহার উত্তর যাহা হয় দিবে। অনুপসহরের অহমদখান নংগড়া পাঠাণ তাঁরই কেবল আমাদের উপর মমতা আছে। তুমি কি স্থির কর বলিয়া পাঠাইবে।" ইহা শুনিয়া সুজাউদ্দৌলা উত্তর দিলেন, "আমার পিতার উজিরী গেল, আমরা এই স্থানে আসিয়া কোন প্রকারে কালক্ষেপ করিতেছি, এখানেও নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে না। মরণাপেক্ষা অপমান অধম। এখন আমার অন্য উপায় নাই। নজীবখানকে বলিবে, আমি সর্ব্বতোভাবে তার আয়ত্তাধীন। পঞ্চাশ সহস্র ফৌজ ও তিন শত তোপ তাহাকে সমর্পণ করিতেছি, আর যদি পাঁচ কোটি টাকাও খরচ লাগে তাহাও যোগাইব। কিন্তু শত্রুকে নদীপার হইতে দিবে না।" উকীলকে সাজক রোটী দিয়া বিদায় করিলেন।

এ দিকে অবদুল আলির সঙ্গে বরাবর একটা মন্ত্রণা চলিয়াছে। এর মধ্যে আবার সুজাদ্দৌলার সাহায্য পাওয়া নিশ্চিত হইলে

রোহিলা নজীবখাঁ দত্তাজী সিন্দের শিবিরে গিয়া বলিল—"সাহেব, তুমি গড়মুক্তেশ্বরীতে গিয়া তীর্থ বিধি কর, আমাকে আজ্ঞা দেও মীরসুরের নিকটে শুক্রতাল আছে সেখানে গিয়া ভাগীরথীর পুল বান্ধিয়া ঠিক করিয়া রাখিব। ইচ্ছা হয় ত এক মাসের পূর্ব্বে আপনি আসিবেন"।

নজীবখাঁ এক মাস ১৫ দিন থাকিয়া খোসামোদ করিয়া অকপট ভাব দেখাইয়া ছিল সিন্দে তাই তাহার কথা সব সত্য মনে করিলেন। হাতি ঘোড়া জহর বস্ত্র বহু মান দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। এ সময় জনকোজী সিন্দে ও আর আর সকলে বলিলেন "ইহাকে শাসন করা উচিত ছিল তাহা করিলেন না। এখন ইহাকে কাছে রাখিয়া ইহার দ্বারা কার্য্য করিয়া লওয়া হৌক্—ইহাকে হাতছাড়া না করা হয়।" ইহাতে দত্তাজী সিন্দে উত্তর দিলেন "তোমরা সবাই খুব কাজের লোক আর আমিই কেবল কিছু বুঝিনে। নজীব খাঁ একজন খাঁটী লোক আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে। সেই জন্য আমি তাঁহাকে বিদায় দিলাম।" এ উত্তরে আর কে কি বলিবে। সকলে ভাবিল—পিঁপড়ার পাখা হইলে যাহা হয় তাই হইয়াছে"—উপায় নাই সুতরাং সকলেই চুপ চাপ করিয়া রহিল।

ক্রমশঃ।

———*———

সমালোচনা।

সঙ্গীত সংগ্রহ। (বাউলের গাঁথা)। দ্বিতীয় খণ্ড। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমালোচনা কালে গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের রচিত কতকগুলি সঙ্গীত দেখিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে সংগ্রহকার বলিতেছেন, "যখন আধুনিক অশিক্ষিত বাউলের ও বৈষ্ণবের গান সংগ্রহ করিব—কারণ আধুনিক ও প্রাচীন গান প্রভেদ করিবার বড় কোন উপায় নাই—তখন সুশিক্ষিত সুভাবুক লোকের সুন্দর সুন্দর সুভাবপূর্ণ সঙ্গীত কেন সংগ্রহ করিব না আমি বুঝিতে পারি না। এই সংগ্রহের লক্ষ্য ও ভাবের বিরোধী না হইলেই আমি যথেষ্ট মনে করি।" এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে নিবেদন করি। প্রথমতঃ গ্রন্থের নাম হইতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। এ গ্রন্থের নাম শুনিয়া মনে হয়, বাউল সম্প্রদায় রচিত গান অথবা বাউলদিগের অনুকরণে রচিত গান সংগ্রহই ইহার লক্ষ্য। তবে কেন ইহাতে শঙ্করাচার্য্য-রচিত "মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং" ইত্যাদি সংস্কৃত গান নিবিষ্ট হইল? মুন্সী জালাল উদ্দিন রচিত "আহে বন্দে খোদা, যুরা ছুচ্চা কারো" ইত্যাদি দুর্ব্বোধ উর্দ্দু গান ইহার মধ্যে দেখা যায় কেন! গ্রন্থের উদ্দেশ্যবহির্ভূত গান আরও অনেক এই গ্রন্থে দেখা যায়। একটাত নিয়ম রক্ষা, একটাত গণ্ডী থাকা আবশ্যক। নহিলে, বিশ্বে যত গান আছে সকলেইত এই গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করিতে পারে। দ্বিতীয় কথা—আমরা কেন যে প্রাচীন ও অশিক্ষিত লোকের রচিত সঙ্গীত বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষা লাভ করি, আমাদের সকলেরই হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হই না। কিন্তু, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের গানের একটা মিল খুঁজিয়া পাই, তবে আমাদের কি বিস্ময়, কি আনন্দ! আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ভূমি আমরা দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই, মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগবিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক খরস্রোতে ভাসমান বিচ্ছিন্ন

কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে না। অসীম মানবহৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের হৃদয়ের উপরে ততই আমাদের বিশ্বাস জন্মে, সুতরাং ততই আমরা বললাভ করিতে থাকি। আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থনসূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয়, এ কি আমার নিজের হৃদয়স্থিত সঙ্কীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত, না অভ্রভেদী মানবহৃদয়ের গঙ্গোত্রীশিখরনিঃসৃত সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্ব সাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল! যদি কোন সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কি প্রসন্ন হয়! প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে! অতীত কালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায়, সে হৃদয় কি মরুভূমি!

ওরে বংশীবট, অক্ষয় বট, কোথারে তমাল বন!
ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ!
ওরে শ্যামকুঞ্জ, রাধা কুঞ্জ, কোথা গিরি গোবর্দ্ধন!

গ্রন্থ হইতে একটি গান উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করি।

ঐ বুঝি এসেছি বৃন্দাবন।
আমায় বলে দেরে নিতাই ধন॥
ওরে বৃন্দাবনের পশু পাখীর রব শুনি না কি কারণ!

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া! তা' যদি না হইত, আজ যদি সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিতে পাইতাম! আমাদের হৃদয়ের কত তৃপ্তি হইত!

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন। —কালীকচ্ছের কোন পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত করায় কালীকচ্ছ সার্ব্বজনিক সভান্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী গুণময়ী—সেই আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া উল্লিখিত পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয় যে আটটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার দারুণ গুরুত্ব পাঠকদিগকে অনুভব করাইবার জন্য আমরা নিম্নে সমস্ত গুলিই উঠাইয়া দিলাম।

আপত্তি।

১। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক কি? শিখিলে উপকার কি?

২। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে অন্ধ হয়।

৩। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।

৪। স্ত্রীলোকের, লেখাপড়া শিখিলে, সন্তান হয় না।

৫। স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে, অবিনীতা, লজ্জাহীনা ও অকর্ম্মণ্যা হয়।

৬। লেখাপড়া করিয়া কি মেয়েরা চাকুরী করিবে না জমীদারী মহাজনী করিবে?

৭। মেয়ে লেখাপড়া না শিখিলে কি ক্ষতি আছে।

৮। বিদ্যাশিক্ষায় নারীগণের চরিত্র দোষ জন্মে?

আপত্তিগুলির অধিকাংশই এমনতর যে একজন বালিকার মুখেও শোভা পায় না,—পণ্ডিতের মুখে যে কিরূপ সাজে তাহা সকলেই বুঝিবেন। শ্রীমতী গুণময়ী যে আপত্তিগুলি অতি সহজেই খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইহার পর বলা বাহুল্য।

ভাষাশিক্ষা—গ্রন্থকারের নাম নাই

গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই লিখিয়াছেন যে এই পুস্তক খানি ইংরাজি প্রণালী অনুসারে লিখিত, বাস্তবিকই তাহা সত্য। আজ কাল "A Higher English Grammar, by Bain," "Studies in English" by W. Mc. Mordie, Translation and Retranslation by Gangadhor Bannrajee, প্রভৃতি যে সকল পুস্তক এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থী বালক মাত্রেই পড়িয়া থাকেন, বলা বাহুল্য যে এই পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। পুস্তক খানি পাঠে, লেখকের ভাষা শিক্ষা দিবার সুরুচি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইঁহার সহিত আমাদের অনেক গুলি মতের ঐক্য হইয়াছে, এবং সে মতগুলি সুরুচি সঙ্গত জ্ঞান করি। আমাদিগের বিশ্বাস যে পুস্তক খানি পাঠে ব্যাকরণজ্ঞ বালকদিগের উপকার জন্মিতে পারে।

বর্ত্তমান শিক্ষা।

কিসের অন্বেষণে মানুষ অহর্নিশি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? মানুষ কি চায়? সুখ। সুখ পাইবার জন্যই মানুষ সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমরা লেখাপড়া করি, আমরা ধন উপার্জ্জন করি, আমরা ঈশ্বরারাধনা করি, আমরা যাহা করি তাহার শেষ লক্ষ্য সুখ। এমন কি সংসার ত্যাগ করিয়া যিনি সন্ন্যাসী হইতে যাইতেছেন তিনি যে সুখ তাচ্ছীল্য করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, সংসারে তিনি সুখ পাইলেন না, নূতন ক্ষেত্রে সুখ অন্বেষণই বহির্গত হইলেন। এই সুখের জন্যই মানুষের সুখ নাই। সুখ খুঁজিয়া খুঁজিয়া দিন রাত্রি নাই মানুষ হাহা করিয়া বেড়াইতেছে, অথচ কয়জনের প্রতি সুখ প্রসন্ন! কি প্রাণ পণ আরাধনায় কয় জনের নিকট সুখদেবী আবির্ভাব হইয়াছেন? এ সংসারে ভক্তের প্রতি বাম কে! কায়মনোবাক্যে জড়কে আরাধনা কর তাহাকেও জাগাইতে পারিবে—দেবতার কি কথা!

সংসারের গতিই এমন নহে যে যথার্থ শ্রম যথার্থ ভক্তি উপেক্ষিত হইবে। তবে কি সুখের সম্বন্ধে পৃথিবীর গতি উজান বহিয়া চলিতেছে? নহিলে সুখদেবী ভক্তের প্রতি এতই বিমুখ কেন? না তাহা নহে, আমরা প্রকৃত পথে সুখ খুঁজিতেছি না, আমরা সুখের অন্বেষণে যে পথে চলিতেছি তাহা বিপথ। দূর হইতে সুখ দেবী আমাদের ভ্রম দেখিয়া ব্যথিত পরাণে নিশ্বাস ফেলিতেছেন, ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু কি করিবেন তিনিও প্রকৃতির অধীন। বিপথে ভ্রমণকারী ভক্তদিগকে দেখা দিতে তিনি অপারক, অশ্রু বর্ষণ ভিন্ন তাঁহার আর উপায় নাই। সুখের প্রকৃত পথ নীতি। প্রকৃতির অভিমুখী গতির নামই নীতি। প্রকৃতির গতির সঙ্গে সঙ্গে চলিলে আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না—আর প্রকৃতির গতির বিমুখে চল, প্রতিপদে তোমার নিশ্চয় পতন পড়িয়া রহিয়াছে। নৈতিক পথ দিয়া চলিলে নিঃসন্দেহ আমরা সুখকে ধরিতে পারিব।

প্রকৃতির বিমুখে চলিতে প্রকৃত পক্ষে কাহারো সাধ্য নাই। মানুষ দুর্ব্বল, প্রকৃতি মহাবল, তাহার বিপক্ষে লড়িয়া কি তুমি জয়ী হইবে? এ সংগ্রামে বল প্রয়োগ মাত্রই তোমার সার। প্রকৃতির বিপক্ষে এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে তোমার পতন হইবে এবং পতনের আঘাত মাত্র তোমার সেই চেষ্টার পুরস্কার। যেরূপ বলের সহিত তুমি বিমুখে যাইতে চেষ্টা

করিবে সেইরূপ সবলে প্রকৃতি তোমাকে ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিবে, সেই পরিমাণে তোমার যন্ত্রনা সহিতে হইবে। সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যগণ প্রকৃতির এই অদম্য অতি সূক্ষ্ম নিয়ম দেখিয়া মানুষের পূর্ব্ব জন্মের সহিত পর জন্মের কর্ম্ম সূত্রের বন্ধন অনিবার্য্য মনে করিয়া গিয়াছেন।

পুনর্জ্জন্ম থাক আর নাই থাক, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে বর্ত্তাক্ আর নাই বর্ত্তাক, কর্ম্মফল যে অখণ্ডনীয় তাহা আমরা এই জীবনেই প্রতিপদে দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির পথ লঙ্ঘন করিতে গেলে প্রকৃতি তোমাকে ক্ষমা করিবে না—প্রকৃতি বড় কঠিন বিচারক। বিমুখে যাইবামাত্র প্রতিপদে তোমার জোর করিয়া ধরিয়া সোজাপথে ফিরাইতে চেষ্টা করিবে, আর প্রকৃতির অভিমুখে চল—সুখে চলিয়া যাইতে পারিবে। এ কথা সকলেই জানে—ইহা একটি অতি সামান্য সত্য, ইহা কাহাকেও বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই। অথচ সেই জনাই বুঝি ইহা সকলে এত ভুলিয়া যায়,এই সামান্য সত্যকে মনে করিয়া কাজ করা লোকে আবশ্যকই মনে করে না,—যেন ইহা আপনা হইতেই সাধিত হইবে। দেশের উন্নতির দিকে অর্থাৎ দেশের লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৰ্দ্ধনের দিকে সকলেরই লক্ষ্য পড়িয়াছে। বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে,স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি লোকের মনোযোগ পড়িতেছে—অথচ দেশে যাহাতে এই সকল
শিক্ষার প্রকৃত ফল জন্মিতে পারে—তাহা
জন্য যে বিশেষ যত্ন হইতেছে এরূপ দেখ
যায় না। বালক বালিকার নীতিশিক্ষা
যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা হৃদয়ঙ্গম
করিয়া ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে
সকলে যথোপযুক্ত উদ্যোগ করিতেছেন
না। মানুষ বিদ্যা বুদ্ধিতে সম্যক যশস্বী
হইলেও যতক্ষণ তিনি নীতিসম্পন্ন ন
হয়েন—ততক্ষণ তিনি যথার্থ পক্ষে মানু
যের পদবীতে উঠেন না, সমাজের আদ
হইয়া, সমাজের যথার্থ উপকার সাধন ক
রিতে পারেন না। মানুষ হইতে গেলে
এক দিকে বুদ্ধির মার্জ্জনা যেমন আ
শ্যক, আর এক দিকে নীতির অনুবর্ত্তী
হওয়া, তাহা হইতে যদি অধিকও না হয়
সমান আবশ্যক; নীতিই মনুষ্য হৃদয়ে
মনুষ্যত্ব স্থাপন করে, নীতিই মানু
ষকে সংসারের দুরূহ পথ দিয়াও সহ
গম্যদিকে লইয়া যায়। যদি বাঙ্গাল
জাতিকে মানুষ করিতে হয় তবে অ
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাদিগকে
প্রকৃতরূপে নীতি শিক্ষা দেওয়া অতি বিশে
আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষ
দাও সেই শিক্ষা মনে অতি দৃঢ় হইয়া ব
বালক বালিকাদের কোমল মন যেরূ
ছাঁচে ঢাল—সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়
বাল্যকাল হইতে যতদিন পর্যান্ত আজকা
বিদ্যাশিক্ষা চলে, সেই সমস্ত সময় য
বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শি
দ্বারা মনোরাজ্যে বিবেক শক্তির সম্য
স্ফূর্ত্তি সাধন করা যায়—তবে পরে

াব কখনোই হৃদয় হইতে সহজে চলিয়া
াইবার নয়।
পুরাতন আর্য্যগণ নীতিই সভ্যতার
ল বলিয়া জানিতেন। তখন সংসার
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কিছুকাল ধ-
রা সকলেরই যে শিক্ষাতে সময় অতি-
াহিত করিতে হইত—সে শিক্ষা কেবল
বিদ্যা শিক্ষা নহে। আর্য্যদিগের বিদ্যা,
জ্ঞান সমস্তই নীতির সহিত এমন দৃঢ় রূপে
জড়িত ছিল যে একটি ছাড়িয়া আর একটি
লাভ করা যাইত না। সেই জন্যই আর্য্য-
গণ অসাধারণ জাতি হইয়াছিলেন।
আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে পূর্ব্ব নামের
যোগ্য করিতে যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে
তবে এখনকার অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর
তেন সংস্কার অবশ্যই করিতে হইবে।
এখন সাধারণতঃ কিরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে?
বালকদিগকে স্কুলে দিতে পারিলেই সাধা-
রণতঃ পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন হইল।
আমরা এস্থলে সকল পিতার কথা বলি-
তেছি না।) তাহার পর মাঝে মাঝে যদি
পিতা, পুত্রকে পাঠ্য পুস্তক হইতে একবার
পরীক্ষা করিলেন—একবার পড়া বলিয়া
দিলেন, পড়া না পারিলে গাড়ী ঘোড়া
চড়িতে পারিবে না বলিয়া দুটা উপদেশ
দিলেন ত যথেষ্ট। পুত্রের স্বভাব গঠনের
দিকে বাল্যকাল হইতে দৃষ্টি রাখা, স্কুলের
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, কথায় বার্ত্তায় দৃষ্টান্তে
উপদেশে পুত্রের যথার্থ সুশিক্ষা বিধান
করা—এ কয় জন পিতা করিয়া থাকেন?
মাতার নিকটেই বা এরূপ শিক্ষা বালকে

কি পায়? মাতা, মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতির নিকট হইতে বংশাবলীর গল্প, উপকথা, বিবাহ ইত্যাদি সাংসারিক কথা যাহা শোনে তাহার মধ্যে যদিও বালকদের উপযুক্ত চরিত্র গঠনোপযোগী অনেক উপকরণ থাকে—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই গল্পের ছলে মহিলাগণ যে উপদেশের কথা কহেন—সে উপদেশ তাঁহাদের নিকট হইতে দুই পা না সরিতেই বালকেরা ভুলিয়া যায়। বালক হৃদয়েও উপদেশ বদ্ধমূল করিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, ইহাতেও প্রচুর নিপুণতা ও অধ্যবসায় চাই।

উপদেশ দাতার জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাহার উপদেশ বালক বালিকাদের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উদ্রেক করিতে পারিবে কেন? কিন্তু এখনকার কয়জন মহিলা সেইরূপ সুশিক্ষিত হইতে পারিয়াছেন যাহাতে সে কথা তাঁহাদের সন্তানগণ অবশ্য পালনীয় বলিয়া তাহাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিবে।

প্রকৃত পক্ষে ইহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। বালকগণ কিছুদিন স্কুলে পড়িয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করে তাহার আত্মীয় মহিলাদের ভিতর ততটুকু জ্ঞানেরও অভাব দেখিতে পায়—এবং ক্রমে স্ত্রীলোকদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার যতই তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে ততই তাঁহাদের উপদেশের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। কেবল সাংসারিক বিষয়ে মাত্র স্ত্রীলোকদের কথা শোভনীয় ক্রমে

তাহাদের এই বিবেচনা জন্মে। এইরূপ অবস্থায় স্কুলের ও তাহার চারি পাশের জল বায়ু হইতেই উপযোগী উপাদান টানিয়া লইয়া বালকগণ মানুষ হইতে থাকে। প্রকৃত যুবা না হইতে হইতে কলেজ ছাড়িতে না ছাড়িতে খ্যাতনামা ইয়োরপীয় পণ্ডিতদিগের মতগুলি ইহাদিগের কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে। (ইহার মধ্যে মিল, স্পেনসারই এখনকার নব্য সম্প্রদায়ের বিশেষরূপ পূজ্য দেবতা। কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষিত বঙ্গসমাজে ফরাসীস্ দার্শনিক কমটি একরূপ একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতাপ এখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে—আজ কাল মিল, স্পেনসারেরই প্রাদুর্ভাব কাল।) কিন্তু এরূপ অপরিপক্ক বয়সে ওরূপ পণ্ডিতদিগের কথার গভীর মর্ম্ম তলাইয়া বুঝা বড় সহজ নহে। তাহা কণ্ঠস্থ হওয়া মাত্র অনেকের সার হয়, গলাধঃকরণ হইতে পায় না। তাঁহাদের কোন একটি কথার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে তাঁহাদের প্রণীত সমুদয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডুবিয়া তবে তাহা বুঝিতে হয়। এক জন হয়ত তাহার এক পুস্তকে এক বিষয় সম্বন্ধে এক কথা বলিলেন অন্য পুস্তকে সে বিষয়েরি আর এক কথা বলিলেন, এই দুইটি কথা না মিলাইয়া দেখিলে সে বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার যথার্থ মত কি তাহা জানিতে পারা গেল না—কিন্তু এরূপ তলাইয়া পড়িতে কয় জন বৃদ্ধ লোক অবকাশ পাইয়া থাকেন যে যুবা বালকেরা তাহার রাশি রাশি পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে, তাহা করিতে সমর্থ হইবে? দুই এক খান পুস্তকের মাঝে মাঝে চোখ বুলাইয়া পণ্ডি মাষ্টার এবং আলাপী বড় লোকের নি তাহাদের পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটি ক শুনিয়াই সাধারণতঃ যুবকগণ ইয়োরপী পণ্ডিতদিগের মতামত মারিয়া লইয়া কেন। এ অবস্থায় যাহা হওয়া স তাহাই হইয়া থাকে। সেই পণ্ডিতে যাহা বলেন নাই, অনেক সময় তাহা ব য়াছেন বলিয়া তাহাদিগের নিকট প্রত মান হয়। হয়ত বা যাহার বিপরীত বলি ছেন তাহাই তাঁহাদের মত বলিয়া গৃহী হয় এবং তাহাই শ্রেয় বিবেচনা করি সেই মত অবলম্বনে জীবনের গতি নি হইয়া থাকে। এইরূপে কেহ নাস্তি হইয়া নির্ব্বোধ আস্তিকদিগের কৃপাদৃ দৃষ্টি করিয়া থাকেন কেহ বা ইউটিলি রিয়ন অর্থাৎ ফলবাদী হইয়া তাহার প্র অর্থ না বুঝিয়া সমস্ত নীতির ভিত্তি উ টাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন।

দুষ্কর্ম্মের জন্যই দুষ্কর্ম্মকে তাঁহারা ঘৃ করেন না—তাঁহাদের কাছে দুষ্কর্ম্ম অন্যরূপ আদর্শ হইয়া পড়ে, ইহাতে ক্রমে ভারতবর্ষীয় জা নৈতিক বাঁধুনি তাঁহাদের হৃদয় হই শিথীল মুল হইতে থাকে। যুবা ব যখন মনের স্ফূর্ত্তি, উদ্যম, উৎসাহ থাকে, তখন মানুষ তাহার জীবনের প্র পথে চলিতে পারিলে কেবল আপ কাজ নয় দেশেরও যথার্থ কাজ ক পারে। কিন্তু সেই যুবা বয়সে যদি বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তাহা হ

সেই যৌবন সুলভ উদ্যমের আশানুরূপ ফল কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে যখন বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, নানা প্রকারে বহুদর্শীতা লাভ হইয়া মনের সুস্থ অবস্থা ফিরিয়া আসে, তখন নিজের পূর্ব্বকৃত ভ্রম নিজেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখন সময় চলিয়া গিয়াছে—আর সে উদ্যম নাই, আর সে উৎসাহ নাই, চারিদিকের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নূতন জ্ঞান অনুসারে কাঁচিয়া নূতন ক্ষেত্রে কাজ করিতে তখন আর পারিয়া উঠা যায় না, হয়ত বা পারিলেও তখন আর অবসর পাওয়া যায় না—হয়ত বা অবসর পাইলেও তাহাতে তেমন কাজ হয় না।

নব্য সম্প্রদায়দিগের এই মানসিক বিকার অবস্থা দেখিয়া অনেকে দুঃখ করেন—অথচ প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করেন না। তাঁহাদিগের ইহাতে দোষী করিয়া থাকেন অথচ দোষের মূল উৎপাটন করেন না। বাস্তবিক পক্ষে দোষ তাঁহাদের নহে, দোষশিক্ষার। মানুষ অবস্থার দাস, বালককাল হইতে সমাজ বালকদিগকে যে অবস্থায় ফেলিয়া যে ছাঁচে গঠিত হইতে পাঠাইতেছে সেইরূপই তাহারা হইয়া আসিতেছে, ইহাতে সমাজ আবার কোন বিবেচনায় তাহাদিগকেই দোষী করিতে চায়!

এইত গেল পুরুষদিগের কথা। বঙ্গ মহিলাদিগের অবস্থা ইহা হইতে ভিন্ন। বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিতে না করিতে সাধারণতঃ বঙ্গবালারা বিবাহিত হইল, শশুরালয়ে গিয়া গৃহাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইল, অনেকগুলি পুরাতন ভাল ভাব প্রাচীনা মহিলাদিগের নিকট শিক্ষা পাইতে লাগিল। পতিই রমণীর গতি, পিতা মাতা, শশুর, শ্বাশুড়ি, গুরুজন, ইহাঁরা দেবতুল্য, ইত্যাদি রমণী প্রতিপাল্য অবশ্য কর্ত্তব্য কতকগুলি উচ্চ কার্য্যের ভাব তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইল—অল্প বাঙ্গালা যাহা শিখিয়াছে তাহাতে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া এই সকল শিক্ষা আরো মনে দৃঢ় হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু বিপরীত শিক্ষা (পাশ্চাত্য) হইল না যাহাতে তাহাদের এ সকল ভাব মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায়। এইরূপে এক হিসাবে ধরিতে গেলে বিদ্যা শিক্ষা না করিয়াও পুরুষ অপেক্ষা কুলকামিনীগণ যথার্থ কতকটা সুশিক্ষা পাইয়া থাকেন—কিন্তু এইখানে একটি কথা, রীতিমত পাশ্চাত্য শিক্ষা না পাইলেও কালের গতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাব কতকটা যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উপরোক্ত কারণে তাহারও ততটা কুফল হইতেছে না, পুরাতন নীতিভাবের আদর্শ তাঁহারা একেবারে হারাইয়া ফেলিতেছেন না। কিন্তু এই নীতি শিক্ষা হইতে যত দূর সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির অনুশীলনা না থাকায় তাহা দেখা যাইতেছে না।

কোমলতা নম্রতা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা দয়া মায়া ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা এই সকল হৃদয়ের গুণ বঙ্গবালার জাতীয় সম্পত্তি। এই

সকল গুণ লইয়াই বঙ্গবালা জন্মগ্রহণ করে। কোন রূপ শিক্ষার (যাহাকে সচরাচর শিক্ষা বলে) আবরণ ইহার উপর নাই। স্বাভাবিক খাঁটি সরল সৌন্দর্য্য যদি দেখিতে চাও ত বঙ্গবালার হৃদয়ে দেখিতে পাইবে। ইহাতে শিক্ষার (কুশিক্ষার) কৃত্রিমতা নাই, সভ্যতার (পাশ্চাত্য) মৌখিকতা নাই। ইহার বাহিরে এক ভিতরে এক নাই। বঙ্গবালার হৃদয়ের অশিক্ষিত সৌন্দর্য্য অতি সরল মধুময়। যাহারা কৃত্রিম চাকচিক্য দেখিয়া মোহিত হন এ সৌন্দর্য্য তাঁহার জন্য নহে, যাঁহারা প্রকৃতির সরল সৌন্দর্য্য চাহেন—ইহার রমণীয়তা তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গ মহিলাদিগের এই স্বাভাবিক গুণসকল যদি সুশিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত করা যায় তবে ইহাদের সৌন্দর্য্য আরো কত ফুটিয়া উঠিবে—রূপ আরো কত খুলিয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া বঙ্গ মহিলাদের সবই কি গুণ দোষ কি কিছুই নাই? আছে। মানব মাত্রেই অসম্পূর্ণ। সুশিক্ষার দ্বারা ইঁহাদের স্বাভাবিক গুণ সকল যেমন ফুটিতেছে না তেমনি দোষ সকলও নির্ম্মূল হইতেছে না। ইঁহাদের দোষ গুলিও শিক্ষার অভাবে তেমনি বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। তবে গুণের তুলনায় দোষের ভাগ ইঁহাদের অল্প। গুরুতর দোষ, ঘৃণা প্রবৃত্তি বঙ্গ বালার স্বভাবে সাধারণতঃ বিরল, বুদ্ধি বিবেচনার অভাবই ইঁহাদের সাধারণ দোষ—বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন নাই বলিয়াই এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গ পরিবারের মধ্যে সচরাচর এইরূপ দোষ দেখা যায়—একজন দাসী আসিয়া বড় বৌকে বলিল "দেখ মা ছোট বৌএর ছেলে আর আমাদের খোকা বাবুতে মারামারি করেছে, আহা ছেলেকে ত এমন মারেনি—ছোট বৌ সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছে—বলব কি মা—ছেলেকে ছাড়িয়ে নেবে তা না—আমি ছাড়িয়ে দিয়ে বল্লুম—যে' ছোটগিন্নি দাঁড়িয়ে দেখছ তা ছেলেকে কিছু কি বলতে নেই—তাতে বল্লে কি ছেলেয় ছেলেয় মারামারি করবে তা আমি আর কি বলব" বড়বৌ শুনিয়া পর্য্যন্ত ছোটবৌএর সহিত কথা বন্ধ করিলেন, বাস্তবিক কি হইয়াছে একবার যাচাই করিলেন না, দাসীর কথা কত দূর সত্য মিথ্যা একবার বিবেচনা করিলেন না—হয়ত সেই দিন হইতে ছোটবৌতে তাতে মুখ দেখা দেখি রহিল না—এবং শেষে এই এক ক্ষুদ্র কারণ হইতে হয়ত অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইল। জ্ঞান বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা যদি বিবেচনা শক্তির স্ফূর্ত্তি লাভ করা যায়—তাহা হইলে এরূপ ঘটিতে পারে না। সেই জন্য বলিতেছি অতুলনীয় হৃদয় লাভ করিয়াও বুদ্ধি বিবেচনার চর্চ্চার অভাব হেতু বঙ্গ রমণী এখনো অবোধ অবলা নামের বাচ্য। সুতরাং ইঁহারা স্বামী পুত্র পরিবারকে হৃদয় দিয়া সুখী করিতে পারেন কিন্তু জ্ঞান দিয়া সন্তানদিগের মনের যথার্থ শিক্ষা বিধান করিতে অপারক—বাহিরের হানিজনক আকর্ষণ হইতে নিজ বুদ্ধি বলে সন্তানদিগকে স্বপথে টানিয়া রাখিতে অপারক।

আজ কাল এই অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় অনেকে নিজ নিজ স্ত্রী কন্যাদিগকে শিক্ষিত করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ শিক্ষিত মহিলাদিগের মধ্যে অনেক সময় যেরূপ শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যথার্থ শিক্ষা নহে শিক্ষার ভাণ মাত্র। একটু ইংরাজি ভাষা শিখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার কৃত্রিমতা, বাহিরের চাকচিক্য মাত্র ভাব গ্রহণ করাইত অনেক সময় এ শিক্ষার পরিণাম হইয়া দাঁড়ায়। আর বাস্তবিক পক্ষে যদি ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে সে শিক্ষা শিক্ষা বলা যাইতে পারে না তাহাকুশিক্ষা। এ শিক্ষায় দেশীয় মহিলাদের কোমলতা নম্রতা প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাব গিয়া অনেক সময় কেমন বিদেশীয় খট খটে ভাব আসিয়া স্ত্রীলোকের বিশেষ সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। বঙ্গ রমণীগণ তাঁহাদের সুন্দর হৃদয় বিকৃত শিক্ষার জলে যে হারাইয়া ফেলিবেন—কৃত্রিম সভ্যতা আসিয়া তাঁহাদের সরল প্রাণ যে কৃত্রিম করিয়া ফেলিবে, ইহা কখনোই বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের দেশের একজন অশিক্ষিত রমণীর (পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগীগণ—যাহাকে অশিক্ষিত বলিবেন) সহিত কথা কহিয়া তাঁহার প্রাণ খোলা কথায় বার্ত্তায় প্রাণে কতখানি আহ্লাদ ঢালিয়া দিবে আর সভ্যতার সেই মৌখিক দু এক কথা কাহার প্রাণ স্পর্শ করিবে? সেরূপ কথা সেরূপ আলাপ পাশ্চাত্য সভ্য সমাজেই আদরণীয়, পাশ্চাত্য সমাজেরই উপযোগী—কেন না সেখানে স্ত্রীপুরুষে মিশিতে হয়। এখানে স্ত্রীপুরুষে মিশিবার স্থলে হয়ত সেইরূপ সভ্যতার আলাপ আবশ্যক হইয়া পড়িবে—কিন্তু স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ওরূপ ভাব এখনো আমাদের কাছে বড়ই কেমন কেমন ঠেকে।

একজন বাঙ্গালীর মেয়ের আর একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর মেয়ের সহিত দেখা হউক সে তাহার সহিত বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিবে—সে তাহাকে ভগিনী ভাবিয়া কথা বার্ত্তা কহিবে, তাহার সহিত খোলা প্রাণে খোলা ভাবে গল্প করিবে, তাহার দুঃখ সুখ বাস্তবিকই তাহার হৃদয় স্পর্শ করিবে—সে তাহাকে আপনার করিয়া লইবে। বাঙ্গালির মেয়ে বাঙ্গালির মেয়েকে পর ভাবিতে জানেনা, ভগিনী ভাব তাহাদের হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত—এ ভাব তাহাদের শিক্ষা দিতে হয় না। এই ভাবের আধিক্য হেতু এবং বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাব চালিত না হওয়ায়, অনেক সময় বরঞ্চ হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। বড় ভয় হয় পাছে শিক্ষায় ইঁহারা প্রাণের এই সরলতা টুকু হারাইয়া ফেলেন, আর তেমন উদার ভাবে অন্য ভগিনীদের আলিঙ্গন করিতে না পারেন, শিক্ষায় তাঁহাদের প্রাণ পাছে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। আর যদি শিক্ষার ইহাই ফল হয় তবে সে শিক্ষা হইতে অশিক্ষাই ভাল।

যে শিক্ষায় গুণ সকল ফুটিয়া উঠিবে, দোষ নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, প্রাণকে উদার করিবে, হৃদয়কে মহান করিবে—তাহাই যথার্থ শিক্ষা। যথার্থ শিক্ষা হইলে আপ-

নার ক্ষুদ্রত্ব প্রতিপদে বুঝা যায়, আর অল্প শিক্ষাতেই হৃদয় গর্ব্বিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে অহঙ্কার হৃদয়ে থাকিতে পারে না— জ্ঞান দেখাইয়া দেয়—দেখ তুমি কিছুই জান না, কিছুই বোঝ না, কেন না যাহা জান তাহা কি সামান্য, যাহা জান না তাহা অসীম। আমাদের দেশের বহু শাস্ত্র বিশারদ একজন মাননীয় পণ্ডিত সেদিন একজন বালককে বলিয়াছিলেন—আমি তোমার চেয়ে জ্ঞানী কিসে? দুচার খানা বেশী বই পড়িয়াছি বলিয়াই কি আমি তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী হইলাম?

একথা কত মহান শিক্ষার ফল—কত উদার হৃদয়ের কথা? যথার্থ জ্ঞানী লোকেই ইহা বুঝিতে পারেন ইহা বলিতে পারেন।

অগভীর অল্প শিক্ষার অপকারিতা স্ত্রী পুরুষ উভয়েতেই বর্ত্তায়। তবে পুরুষগণের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ, নানা লোকের সহিত মিশিয়া কথা কহিয়া ঠেকিয়া তাঁহাদের প্রথম শিক্ষার কুফল কালে অনেক ঘুচিয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মন একে কোমল যাহা তাহাদের শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই মনে বিশেষ করিয়া আঁটিয়া বসে তাহার পর তেমন অবস্থাতে পড়িতে হয় না যাহাতে পরে সেই শিক্ষার দোষ বুঝিয়া নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। যদি সুন্দরীগণ গর্ব্বিত হইয়া না উঠেন—ত আরো একটি কথা এই যে, যে দ্রব্য যত অধিক সুন্দর তাহাতে অল্প মাত্র কলঙ্কই অধিক অশোভনীয়। সুতরাং পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে দোষহীন দেখিতে সকলেরই বেশী ইচ্ছা হয়। এই জন্য যদি মহিলাদের শিক্ষা দিতে হয় ত যথার্থ এমন সুশিক্ষা দাও যাহাতে হৃদয়ের গুণের সহিত জ্ঞান বুদ্ধি সকলেরই মার্জ্জনা হইতে পারে। নহিলে কুশিক্ষার ফলে ইঁহারা দুনিয়ার বার হইতে পারেন। যে উৎকৃষ্ট হৃদয়ের জন্য তাঁহারা সকলের ভক্তিভাজন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে সে হৃদয় হারাইবার সম্ভাবনা—আর ওরূপ শিক্ষায় জ্ঞান বুদ্ধির কোন বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইবে সে আশাও নাই। এ অবস্থায় না হৃদয় দিয়া—না বুদ্ধি বিবেচনায় তাঁহারা পরিবারের ও নিজের উপকারে আসিতে পারিবেন।

স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার প্রতি দেশের যে একেবারে লক্ষ্য দেখা যায় না তাহা নহে। এখন মহিলাগণ পুরুষদিগের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা দেশের কম সৌভাগ্যের কথা গৌরবের বিষয় নহে। অতি অল্প দিনমাত্র সুসভ্য ইয়োরপীয় মহিলাগণ এই উচ্চ শিক্ষার অধিকারী হইয়াছেন।

কিন্তু এই আহ্লাদে মত্ত হইয়া আমরা যেন ইহার আর একদিক দেখিতে না ভুলি। ইহা উচ্চ শিক্ষা হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ সুশিক্ষা বলাযায় না তাহা আগেই বলা হইয়াছে। পুরুষ দিগের শিক্ষা প্রণালী ও ইহাঁদের শিক্ষা প্রণালী একই, সুতরাং সে শিক্ষার যে অভাব রহিয়াছে ইহাতেও সেই অভাব রহিয়াছে। সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার গুণে যুবাদের মনের যেরূপ বিকার

হা ঘটে—যুবতীদেরও তাহা ঘটিতে রে। আর তাহা হইলে কত অধিক নিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা ভাবিয়া খিলে নীতি শিক্ষার বিশেষ উপায় া যে কত প্রয়োজন আমরা বুঝিতে রিব।

যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে মানুষ রিতে হয়—তবে বালক বালিকাদিগের কারদিকে দৃষ্টিপাত কর, যাহারা এখন বালক বালিকা তাহারাই ভাবীবংশের পিতা মাতা।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া বালক বালিকাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এক সঙ্গে যখন ফুটিয়া উঠিবে, আমাদের বংশ এক সঙ্গে যখন বুদ্ধিশীল ও নীতিশীল হইতে পারিবে—তখনই দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে—ভারতবর্ষ প্রকৃত সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবে।

—:০:—

জনষ্টুয়ার্টমিল।

মিল পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন সৎকুলোদ্ভবা, রূপলাবণ্যসম্পন্না ত্রিংশবর্ষীয়া মহীয়সী গুণবতী রমণীর সবন্ধুতসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। এই বন্ধুত্বই ার জীবনের ও হৃদয়ের উন্নতির মূলীভূত রণ স্বরূপ হইয়াছিল। এই অসীমগুণ সম্পন্না রমণী মিষ্টর টেলরের ভার্য্যা ছিলেন। নিই এই রমণীকে দেখিতেন, তিনিই ইহাঁর বুদ্ধি বৃত্তির প্রাচুর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতেন ইহাঁর মধুর আলাপে প্রীতি লাভ করিন। ইহাঁর স্বামী মিষ্টর টেলর একজন ার স্বভাব বিশিষ্ট, মাননীয় ও সৎপ্রতিপন্ন লোক ছিলেন, ও নিজ সহধর্ম্মিণীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ইহাঁর ীও ইহাঁর প্রতি যথেষ্টা অনুরাগিণী লেন। মিল এই বালিকার সহিত বন্ধুত্ব ত্রে আবদ্ধ হওয়া অবধি ইহাঁর শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাঁর সম্পর্কে মিলের দুএকটি কথা উদ্ধৃত করিলাম।

"Her fiery and tender soul and her vigorous eloquence would certainly have made her a great orator, and her profound knowledge of human nature and discernment and sagacity in practical life, would, in the time when such a career was open *to* women, have made her eminent among the rulers of mankind. &."

মিল বলিতেছেন যতদিন এই রমণী স্বামীর অধীনে ছিলেন, ততদিন ইনি ইহাঁর প্রখর ও উদার ধীশক্তির সম্যকরূপ পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়েন নাই, কারণ, যদিও তাঁহার স্বামী উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন,

তত্রাচ বিদ্যার উন্নতি ও রচনা বিষয়ে যে রূপ উৎসাহ দেওয়া উচিত ছিল, সেরূপ উৎসাহ ও স্বাধীনতা দেন নাই। মিল কর্ত্তৃক এই রমণীর ধীশক্তির ক্ষমতা সম্যক রূপে অনুভূত হইয়াছিল, এবং পরস্পরে সততই অবকাশক্রমে আপনাদিগের মতামত ব্যক্ত করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির চালনাদ্বারা উভয়েই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন।

এই মহতী বালিকার হৃদয় কোন প্রকার কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না, ইহাঁর হৃদয় স্বাভাবিক নিঃস্বার্থপরতাগুণে সততই অলঙ্কৃত, ও ইহাঁর হৃদয়ের ঔদার্য্য সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সমভাবে প্রকাশ পাইত।

উপরি উক্ত গুণসম্পন্না রমণীর সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিল যে কত সুখী ও উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য, মিল বলিতেছেন, "What I owe, even intellectually, to her, is in its detail, almost infinite." সে যাহা হউক এখন আমরা মিলের কার্য্য বিষয়ে মনোযোগী হইব, পশ্চাৎ ইহাঁর বিবাহ সম্বন্ধে যথা সময়ে আলোচনা করা যাইবে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি "Considerations on Representative Government,""Essays on unsettled Questions in political Economy," "Papers on corporation and church property and the currency Juggle," "Thoughts on poetry," "Analysis of Platonic Dialogues" নামক এই কয়টি ও অপরাপর বহুসংখ্যক রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মিল "টকেভিলে "Democracy in America" নামক গ্র খানি পাঠ ও তাহার একটি উপযুক্ত সম লোচনা করেন।

কিয়দ্দিবসের মধ্যেই তাঁহার পিতা "Fragment on Mackintosh" নাম পুস্তকখানি বাহির হয়, মিল গ্রন্থখানি কিয়দংশের যথেষ্ট প্রশংসা করেন বটে কি সমস্ত পুস্তকখানি তাঁহাকে সুখী করি পারে নাই, মিল বলিতেছেন "Althoug I greatly admired some parts of i I read as a whole with more pai than pleasure"। মিল এই সময়ে "C vilisation" নামক একটি অতি উৎক্ প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁহার পিতা এই প্র ন্ধটি পাঠে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন পুত্রকে যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদান করেন কিন্তু হায় মিলকে আর অধিকদিবস পিত সহিত আলাপ করিতে হয় নাই। ১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জেম্‌সমিলের স্বাস্থ্যভঙ্গ হই আরম্ভ হয় ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জুনমা তেইশে তারিখে এই মহাত্মা মানবলী সংবরণ করেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার উদার ধীশক্তির কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই তিনি আপনাকে জগতের উপকারক জ্ঞ করিয়া পূর্ণ শান্তিতে অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন লেন, তাঁহার আক্ষেপ এই যে আরো কি কাল জীবিত থাকিলে জগতের অধিক উপকার সাধনে সমর্থ হইতেন, তাহা আ পারিলেন না।

এতদিন পরে মিলের প্রাণে একটি গু

র আঘাত লাগিল, আজ তিনি এই পৃথিবী ইতে তাঁহার একমাত্র বন্ধুকে হারাইলেন, ার্থভরা, হিংসক মানববেষ্টিত এই পৃথিবী খণ্ডে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে আর কেহই রহিল না, এখন তিনি এই সুদীর্ঘ জীবনপথ অতিক্রম করিতে একেলাই রহিলেন, এজগতে যাঁহাকে হারাইলেন ার তাঁহাকে কোথাও পাইবেন না।

এই সময়ে মিল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত ইয়া ইটালি যাত্রা করিলেন. পরে ইহাঁর একত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পুনর্ব্বার তিনি তাঁহার "লজিক" নামক গ্রন্থখানি পরিবর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করেন ও অবকাশ ক্রমে তৎকালীন বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহ পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময়েই তিনি ফরাশিশ দার্শনিক "কম্‌টির" "কুর্‌ ডে ফিলসফি পসিটিভ্‌' নামক গ্রন্থখানি বিশেষ যত্ন সহকারে পাঠ করেন। এই গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ অংশ যদিও তাহার মতের সহিত ঐক্য হয় নাই, তথাচ ইহা দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন, ও গ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রশংসা করেন। এখন হইতে তিনি "কম্‌টির" অতিশয় ভক্ত হইলেন ও তাঁহার সহিত পত্রাদি লেখা আরম্ভ করিলেন। যে পর্য্যন্ত না তাঁহাদিগের পরস্পরের মতের বিশেষ অনৈক্য উপস্থিত হয় সে পর্য্যন্ত এইরূপ পত্রলেখালেখি চলে. তৎপরে আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়, মিল বলিতেছেন I was the first to slacken correspondence ; he was the first to drop it" এই সময়েই তিনি "কারলাইলের" ফরাশিশ বিদ্রোহ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির সমালোচনা করেন ও কোলরিজের রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। মিল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "লজিক" গ্রন্থখানির তৃতীয় খণ্ড সমাধা করেন, ও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের "এপ্রিল" মাস হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত "লজিক" খানির আদ্যোপান্ত যথোপযুক্ত শোধন ও পরিবর্ত্তন করেন। এই ধারা অবলম্বনে মিল গ্রন্থরচনা করিতেন। কোন একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইলে তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা লিখিবেন তাহা ভাবিয়া লইতেন ও তৎপরে সেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিতেন। দ্বিতীয়বার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া যে কথাটি যেখানে বসানো উচিত ছিল সে কথাটি সেইখানে বসাইতেন, কতকগুলি কথা বা উঠাইয়া দিতেন ও তৎপরিবর্ত্তে আর কতকগুলি পরিষ্কাররূপে ভাবব্যক্ত কারী কথা সন্নিবেশিত করিতেন, এইরূপে একটি প্রবন্ধ লইয়া অনেকবার না দেখিয়া সহসাই মুদ্রিত করিতে দিতেন না, ইহা দ্বারা রচনা সম্পর্কে ইঁহার যথেষ্টই উপকার হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষে "লজিক" নামক গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়া মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত "মিষ্টর জন মরেকে' পাঠাইয়া দেন, "মরে" পুস্তকখানি মুদ্রিত না করিয়া কিছু দিন পরে মিলের নিকট ফিরাইয়া পাঠাইলেন, ইহাতে মিল কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েন নাই, পরে তিনি মিষ্টর "পার্কারের" নিকট পুস্তকখানি পাঠাইলেন, ইনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ করেন।

কিয়দ্দিবস গত হইলে মিল গুটিকতক বিশেষ পরিচিত, বিদ্বান, ও বুদ্ধিমান মিত্রকে লইয়া একটি ছোটখাট সমিতি স্থাপনা করিলেন, ইহা দ্বারা সকলেই বিশেষ উপকৃত হয়।

এক্ষণে মিলের জীবনের তৃতীয় অঙ্ক আমাদিগের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, প্রথম অঙ্কে আমরা মিলকে পিতার অধীনে অতিশয় যত্ন ও আগ্রহ সহকারে শাস্ত্র অধ্যয়নে সতত নিবিষ্টমনা দেখিয়া আসিয়াছি, সে সময়ে পিতাই তাঁহার বন্ধু, হিতকারী, ও শৈশবজীবনের একমাত্র উন্নতিকর্ত্তা ছিলেন, তৎপরে আমাদিগের সম্মুখে আর এক অঙ্ক উদ্ঘাটিত হয়, যখন মিসেস টেলরের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়, এবং তাঁহার উদার বুদ্ধিবৃত্তির জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে "লজিক" গ্রন্থে বিভাসিত হয়, অবশেষে তাঁহার প্রধান মিত্র, শিক্ষক ও গুরুদেব পিতা মানবলীলা সংবরণ করেন। সে যাহা হউক এখন আমরা বর্ত্তমান সময়ের কথা বলিতে আরম্ভ করি এই সময়ে মিসেস টেলর আপনার শিশুকন্যাটিকে লইয়া একেলা গ্রামে বাস করিতেন, কখন কখন স্বামীসন্নিধানে নগর বাসও হইত, যেখানেই বাস হউক না কেন, মিল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও উভয়ে মিলিয়া শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেন, মিলের হৃদয়ের ধ্রুবতারা স্বরূপিনী, আনন্দদায়িনী, প্রিয়বন্ধু মিসেস টেলর মিলের সহিত বিজন ভ্রমণে বা আলাপনে কখনও কুণ্ঠিতা হয়েন নাই, কারণ এই বুদ্ধিমতী নারী পবিত্রহৃদয়াবশিষ্টা ছিলেন এবং মিল তদনুযায়ী তেজস্বী ও সদাশয় পুরু ছিলেন। এমন কি ইঁহাদিগের চরি বিষয়ে পরদোষানুসন্ধায়ী কূটবুদ্ধি কাপুরু মনুষ্যদিগেরও মনে সন্দেহের উদ্রেক হ নাই।

আজন্মকাল হইতে উভয়ের হৃদয় যেন জগতের উপকার সাধন ব্রতে দীক্ষি হইয়াছিল, মিল জগতে একেলা যাহ করিতেন, এখন তাঁহার এমন একটি ব হওয়াতে, তিনি দ্বিগুণতর কার্য্য সমাধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ পৃথিবীতে নিঃস্বার্থপর বন্ধু পাওয়া বড়ই কঠিন, প্রথমতঃ সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি সচ রাচর জন্মগ্রহণ করেন না, যদিও আমরা কখন কখন এমন সহৃদয় দুএকটী লোক দেখিতেও পাই, কিন্তু হায় তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে এজগৎ তাহাদের উপযুক্ত বাস স্থান নহে, ও শীঘ্রই এ স্থান হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন। বন্ধুভ্রমে বিষ কুম্ভ পয়োমুখী ছদ্মবেশী নীচাশয়দিগের মিত্রতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ তাহাদিগের মনের নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা দর্শনে আমাদিগের হৃদয়ে অনুতাপের ও ঘৃণার উদয় হয় ও জগৎ সংসার হইতে মন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মিল যে একজন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, কারণ এরূপ বন্ধু লাভ করা বহু তপস্যার ফল মিলের পিতা শৈশব কালে মিলের হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আজ মিসেস টেলর সেই স্থান অধিকার করিয়া

আছেন, ও বিশুদ্ধ জ্যোতি দ্বারা মিলের পবিত্র হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত এই কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকালের মধ্যে মিল তাঁহার বিখ্যাত "political Economy" নামক গ্রন্থ খানি রচনা করেন, এই গ্রন্থখানিতে মিলের একেলার অধিকার ছিল না, কারণ মিসেস টেলর এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করেন, বলিতে গেলে মিলের অধিকাংশ লেখাই এই দুজনকার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির একীভূত সমষ্টি। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের পর বহুদিবসাবধি যদিও তিনি এবম্প্রকার কোন বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই তথাচ তিনি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত আয়র্লণ্ড বাসীদিগের বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লেখেন ও সংবাদপত্র সমূহের তদীয় রচনাগুলি একত্রিত করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

মিল চিরকালই সমাজস্থিত সমস্ত ব্যক্তির মানসিক গতির পরিবর্ত্তন করিতে যত্নবান হয়েন, এবং ইহাও নিশ্চিৎ, তৎকালীন অনেকানেক সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মনের উপর তিনি নিজ রাজ্য স্থাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এখন অনেকেই পুরাতন ধর্ম্মোপদেশ বা পুরাতন মত সমূহকে অন্ধ হইয়া পূজা করিতেন না, বিশেষ বুদ্ধি ও বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ মত সকলের সারত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। ৮৪৯১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিষ্টর টেলরের মৃত্যু হয়, এই মৃত্যুতে তাঁহার ভার্য্যা অত্যন্তকাতর হইয়া পড়িলেন, মিলও সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি প্রাণপণে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্নবান হইলেন। জগতের খেলা কে বুঝিতে পারে, কিছুদিন পরে মিশেষ টেলরের শোক কিছু শমিত হইলে মিল তাঁহার হস্ত-প্রার্থনা করিলেন। সচরাচর প্রেম বলিতে যাহা বুঝায় এপর্য্যন্ত সেরূপ ভালবাসা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, তিনি স্বপ্নেও কখনো মুহূর্ত্তের জন্য এরূপ আশা, এরূপ বাসনাকে মনে ঠাঁই দেন নাই, এরূপ প্রণয়ের ভাব অতিদূর কল্পনাতেও মনে আঁকিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব ভাব কলঙ্কিত করেন নাই—কেবল মাত্র একটি উদার বন্ধুত্বভাবে তাঁহার হৃদয় এতদিন পূর্ণ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই জন্য ঘোর নীচমনা ব্যক্তিও তাঁহাদের বিরুদ্ধে কখনো কানাকানি পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। এত দিন পরে সেই বন্ধুতা প্রেমের আকার ধারণ করিল। তাঁহার যৌবনের সখীর সহিত চির জীবন একত্রে কাটাইবার একটি ইচ্ছা প্রাণের মধ্যে আসিয়া পড়িল। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সুখে সুখী হইয়া সেই যৌবনের চির সঙ্গিনীর সহিত এখন মিল বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইলেন, ও স্ত্রী সুখে সুখী হইয়া বিমল আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটী সুখের নব-রাজ্য উদ্ঘাটিত হইল, আপনি যাহা লিখিতেন স্ত্রীকে পড়িয়া শুনাইতেন, তাঁহার অদ্বিতীয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীও নিজ মতগুলি স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিতেন ও

মিল সেই গুলিকে পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া সুখী হইতেন। মিল বলিতেন পুস্তকখানি যিনিই লিখুন না কেন, গ্রন্থস্থিত মত সমূহের যিনি অধিকারী গ্রন্থখানি তাঁহারই বলিতে হইবে। এই নিমিত্তই আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে মিলের অনেকগুলি গ্রন্থে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর সমান অধিকার আছে। মিলের হৃদয়ে এতদিন যে সমস্ত ভাব ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, এই সময় হইতে তাঁহার পত্নী দ্বারা সেই সব ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। দুইটি হৃদয় এক হইয়া একই ব্রত সমাধা করিতে কৃতযত্ন ও সক্ষম হইয়াছিল। এরূপ সুখ সচরাচর সকলের ভাগ্যে ঘটে না, মিল যেরূপ স্বামী তিনি তদনুরূপই পত্নী পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকে অধিককাল বিবাহ সুখে সুখী হইতে হয় নাই, সবে মাত্র সার্দ্ধ-সাতবৎসর কাল বিবাহের পরেই তাঁহার প্রিয়তমা অসীম গুণবতী ভার্য্যার মৃত্যু হয়। মিল অতিশয় কাতর হইয়াই বলিয়াছেন, "For Seven and a half years that blessing was Mine, for seven and a half only! I can say nothing which could describe even in the faintest manner, what that loss was and is. Her memory is to me a religion, and her approbation the standard by which, summing up as it does all worthiness, I endeavour to regulate my life."

এ কথাগুলি আমরা কতবারই পড়িয়াছি, তথাচ এখনও যেন আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি "For seven and a half years that blessing was mine, for seven and a half only!" জীবনের মধ্যে মিলের হৃদয়ে দুইবার আঘাত লাগিল প্রথম পিতৃবিয়োগে, দ্বিতায় প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে। এখন তিনি যাহা লিখিতেন তাহা নিজেই পড়িতেন ও নিজেই সংশোধন ক পরিবর্ত্তন করিতেন, কেহ নাই যে গুলিকে স্নেহের চক্ষে দেখে, প্রাণের সহি মমতা করে।

শত্রুপক্ষীয় লোকদিগকে দমন করি মিলের মত অদ্বিতীয় লোক আর দে যায় না, ইনিই পুরাতন ও কুসংস্কারাচ্ছ মত সমূহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয় ছেন, চিরকালই ইঁহাকে খৃষ্টীয় মুক্তিদাত গণ কৃতান্তের ন্যায় ভয় করিয়া থাকেন মিলের বিবাহ হইতে স্ত্রীর মৃত্যু পর্য্যন্ত কটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তিনি ১৮ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়া হাউসের করেসপণ্ডেন্স বিভাগে সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরোহণ করেন আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মিল পনে বৎসর বয়ঃক্রম কালে উক্ত কোম্পানী অধীনে একটি কেরাণিগিরি কর্ম্ম পান, এ তিনি সেই কর্ম্ম স্থলেই সর্ব্বোচ্চ আ গ্রহণে সমর্থ হইলেন, কিন্তু তাহাকে অ অধিক কাল এ কর্ম্ম করিতে হয় নাই, কা উক্ত কোম্পানি দুই বৎসরের মধ্যেই উঠি যায় ও রাণী "ভিক্টোরিয়া" স্বহস্তে রাজ ভার গ্রহণ করেন। মিল ও তাঁহার প উভয়ে মিলিয়া বিখ্যাত "লিবার্টি" না

গ্রন্থখানি রচনা করেন, এই গ্রন্থখানি দুজনেই উপর্য্যুপরি পাঠ ও যথোপযুক্ত সংশোধনাদি করেন, অবশেষে তাঁহাদিগের মনে এই আশা ছিল যে যখন তাঁহারা ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিতি করিবেন তৎকালে আরেকবার এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখিবেন, কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার স্ত্রীর বিয়োগের সহিত সে আশারও অবসান হইয়াছিল। মিল বলেন যে তিনি ভারতবর্ষের হিতকামনায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থায়িত্ব বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হয়েন নাই। উক্ত কোম্পানি উঠিয়া যাইলে পর লর্ড ষ্টান্‌লে ভারতবর্ষীয় সভার আসন গ্রহণে তাঁহাকে অনুরোধ করাতে তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে তিনি "Thoughts on Parliamentary Reform" নামক একখানি ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ইঁহার স্ত্রী পূর্ব্বে একবার এ গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

বিজন চিন্তা।

ওই হোথা আকাশের অনন্ত সীমায়
প্রাণ মোর দেহ ছেড়ে বিরাম লভিতে চায়,
জগতের কোলাহল বহেনাক অবিরল,
কি প্রশান্ত চারিধার কি মধুর বহে বায়!

২

জগৎ আমার নয়, আমি জগতের নয়,
জগতের কোন কথা পশেনা শ্রবণে;
জগতের হাহাকার, জগতের ব্যভিচার,
চিরকাল এ জগতে থাক্ সংগোপনে।

৩

জীবনের নাহি মূল, সব হ'য়ে গেছে ভুল,
এ জগতে কেহ কারো নহেরে আপন;
প্রেম-মোহে ভুলে ভুলে, চলিয়াছ কুতূহলে,
জাননারে একদিন ভাঙিবে স্বপন!

৪

এসেছি দুদিন তরে, আবার দুদিন পরে,
জীবনের সব কথা হবে অবসান;
কেন এত হাহাকার, আসিতেছে অনিবার,
পারিনা সহিতে আর কাতর পরাণ!

৫

ওই আকাশের কোলে যেথায় তারাটি দোলে,
ওই খানে প্রাণ মোর প্রতিদিন যায়!
জগতের কোলাহল বহেনাক অবিরল,
কি প্রশান্ত চারিধার কি মধুর বহে বায়!

শ্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সন্ন্যাসীর জীবন।

কনফ নেপালি ভাষায় সংগীত আরম্ভ করিলেন, "আমার গুফামে নিরঞ্জন যোগী বনমে বালা কাঁহা ঢুঁরো হাঁ হাঁহা জী।" ক্রমান্বয়ে ৩।৪ টী ভক্তিরস যুক্ত মোক্ষ তত্ত্ব-বিষয়ক গান গাহিলেন। আমি ঐ সংগীতের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারায় তিনি আমাকে সরল হিন্দি ভাষাতে উহার অর্থ অতি উত্তমরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমি লিখিতেছি। "আমার দুই ভ্রুর মধ্য স্থলে গহ্বর দেশে যে নিরঞ্জন পর ব্রহ্ম সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া প্রজ্জলিত দীপ শিখার ন্যায় জ্যোতি প্রকাশ করিতেছেন, হে মূঢ় মন তুমি ভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্বশরীরে তাঁহাকে দৃষ্টি না করিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় তিনি কোথায় তিনি কোথায় বলিয়া ভ্রমণ করিতেছ। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিলে ও গঙ্গাদি স্নান করিলে তাঁহাকে পাইবে না, দেহরূপ ঘটেই গঙ্গা, দেহরূপ ঘটেই যমুনা, দেহরূপ ঘটেই কাশী, প্রয়াগ। ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে যে অতি সূক্ষ্মতর সুষুম্না নাড়ী আছে তাহাতেই সমুদায় তীর্থ অবস্থিতি করিতেছে, ইহা জানিয়া তীর্থ যাত্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে স্থির চিত্তে বসিয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হও। এই পঞ্চ ভৌতিক অনিত্য দেহ নিশ্চয় পঞ্চভূতে মিলিয়া যাইবে, কামক্রোধ আদি রিপু সকল দেহের সহিত বিলীন হইবে, বন্ধু বান্ধবেরা স্পন্দহীন শরীর দৃষ্টে বিলাপ করিয়া অবশেষে মৃত্তিকাতে প্রোথিত কিম্বা অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবে। হে ভ্রান্ত চিত্ত-মল মূত্র যুক্ত দেহ ভাণ্ডকে নশ্বর জানিয়া ধন জন যৌবনাদির গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, অহিংসা, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি যাবতীয় গুণ যুক্তহইয়া বিশ্বপতি মহেশ্বরকে আত্মস্থ কর। সুখ দুঃখ মানাপমান নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি সমভাবজ্ঞান করিয়া ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া ক্ষণস্থায়ী জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। হে মন তোমাকে বিশেষ মিনতি করিতেছি তুমি পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল না হইয়া মন্দরের ন্যায় স্থির হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মনামামৃত সুধাপান কর, পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইও না।" এই সকল বাক্যে তিনি সংগীতের অর্থ শেষ করিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি "কি নিমিত্ত ঐ সকল উচ্চ সাধনা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইয়াছ?" তিনি আমার বাক্যের উত্তরে বলিলেন "যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞান না হয় তাবৎকাল চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গাস্নান ও তীর্থ দর্শন ও মূর্ত্তি পূজাদি করিবার বিধি আছে। যদিও

যাতে চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই, তত্রাচ অন্তঃকরণ বিধৌত না করিতে পারিলে কোন কার্য্যই ফলবতী হয় না। দেখ ঐ সকল কর্ম্মে স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির কথাও কোন কোন শাস্ত্রে আছে, যদি ঐ সকল মিথ্যাও হয় তাহা হইলে ভ্রমণ ও সৎসঙ্গ জনিত যে জ্ঞান তাহা নিশ্চয়ই উপার্জ্জিত হয়। একখণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন রাশি রাশি তৃণকে ভস্মীভূত করে তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি নিখিল কর্ম্ম রাশিকে ভস্মীভূত করে তাহা আমি জ্ঞাত আছি। তত্রাচ চঞ্চল চিত্ত বাল্য স্বভাব প্রযুক্ত নানাবিষয়ে প্রধাবিত হইয়া চিত্তক্ষেত্রে, ভবসমুদ্রের ভীষণতরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গ উত্থিত করিয়া বিশ্বপতির অচিন্তানির্ব্বচনীয় জ্ঞান ভক্তির ধ্যান হইতে অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা অন্য পথে লইয়া যায়। এজন্য সর্ব্বদা ইচ্ছা হয় কোন ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুর শরণাপন্ন হইয়া ক্রমেঃ শনৈঃ ব্রহ্ম বিদ্যালাভ করত এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহের চরিতার্থতা সম্পাদন করি। কিন্তু আমার পক্ষে উহা আকাশ কুসুম তুল্যরূপ হইয়াছে। এই কালে বিত্তাপহারক সদ্‌গুণযুক্ত গুরুই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সন্তাপহারক সদ্‌গুরু পাওয়া অতি দুরূহ। অথচ গুরু বিনা কোন কার্য্যই সাধিত হয় না।" ইহা শুনিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম তুমিতো পড়িতে জান, যোগশাস্ত্র দেখিয়া তদুপযুক্ত কার্য্য করিতে পার।" তিনি বলিলেন; "যেমন তরণী বর্ত্তমান সত্ত্বেও কর্ণধার বিনা নদী পার হওয়া যায় না, তদ্রূপ অনন্ত শাস্ত্রাদি বর্ত্তমান থাকিলেও যোগসিদ্ধি লাভ কিম্বা এই ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। সুবিস্তীর্ণ সংসারে বহুশাস্ত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে যাহা সহস্র বর্ষ অধ্যয়ন করিলেও শেষ করা যায় না, তাহা এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে কিরূপে শেষ হইবে। পূর্ব্বে পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম গোপ যেরূপ দুগ্ধ হইতে তাহার সার ভাগ নবনীত গ্রহণ করিয়া ঘোল ভাগ পরিত্যাগ করে তদ্রূপ ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা অসীম ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে তাহার সারভাগরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রাদিকে পশ্চাৎ পরিত্যাগ করেন। মুক্তির নিমিত্ত এক ব্রহ্মজ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর বাহ্য পূজা যে অধমসাধন তাহা কেবল মাত্র শ্রবণাধারেই শ্রবণ করিয়াছি, এ পর্য্যন্ত উক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলাম না, এই খেদে অন্তঃকরণ সময় সময় অত্যন্ত খেদান্বিত হয়।" তাঁহার ঐ সকল বাক্য অন্ত হইলে অপরদিকে তদ্দেশবাসী থাকালি জাতির গীতধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইল তখন আমি তাহাদিগের নিকটে যাইলাম। তথায় গিয়া দেখি তাহারা (সরলকাষ্ঠ) জ্বালানিকাষ্ঠ প্রজ্জলিত করিয়া সকলে শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইয়া সংগীত আরম্ভ করিয়া ক্রমে তথা হইতে স্থানান্তরে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি তাঁহাদের ঐ সংগীতের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এক ব্যক্তিকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন উহারা ভগবান বুদ্ধদেবের ভজনা করিতেছে। উহা শ্রবণান্তে ঐ জাতির পুরাবৃত্ত শুনিবার

নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি ঐ জাতি সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি। থাকালি, মগর প্রভৃতি কয়েকটী জাতি পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এক্ষণ থাকালি জাতি সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছে। ইহারা ব্রাহ্মণ,সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে গুরু করিয়া দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে সুরু করিয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণ ও মহাত্মা দিগের প্রমুখাৎ ভগবান বুদ্ধদেব বিষ্ণু অবতার শ্রুত হইয়া পিতৃ পিতামহের সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ অন্যায় বোধে অদ্যাবধি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে নারায়ণের মূর্ত্তি বোধে পূজা ও মহাত্মা লামা গুরুদিগকে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মাদিগের ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। অবশেষে তদ্দেশের রীতি নীতি সম্বন্ধে কিছু শুনিলাম। উক্ত দেশে ক্ষৌর কার্য্য ও বস্ত্রাদি ধৌত করিবার নিমিত্ত কোন জাতি কিম্বা কোন লোক নিয়মিত নাই। তাহারা স্ব স্ব কার্য্য স্বীয় হস্তে কিম্বা চাকরের দ্বারায় করাইয়া থাকে, এজন্য ঐ সকল দেশে ঘর ঘর রজক ঘর ঘর নাপিত বলিয়া কথিত হয়। পর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে একটী গ্রামে এক জন থাকালি জাতির বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক বিশ্রাম স্থান ও আহারীয় দ্রব্য দিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি, গৃহ কর্ত্তার নিকট আমার জন্ম স্থানের পরিচয় দিলে, তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমাকে কহিলেন "এক্ষণে আপনাকে দেখিলে আর বাঙ্গালি বলি চিনিতে পারা যায় না। কয়েক বৎস হইল আমি জগন্নাথ ধাম দর্শন ও কলি কাতা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি আসিয়াছি। কলিকাতা ভারী সহর অমন সহর বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই বাঙ্গালি জাতি বড় সুখী, সকলেই ধনী অতিশয় বুদ্ধিমান, বিদ্বান, দয়া, শ্রদ্ধ ভক্তিতে অদ্বিতীয়। আজ আমার ব ভাগ্য. গৃহে বসিয়া মহাশয়ের দর্শন পাই লাম, মহাশয়ের পদার্পণে আমার গৃহ পবি হইল, আমিও কৃতার্থ হইলাম। আ অতি অধম আপনার যথাবিধি সম্মানরক্ষ করিতে পারি ঈশ্বর আমাকে এমত ধ দেন নাই, নিজ গুণে আশ্রিতের প্রতি কৃপ প্রকাশ করিয়া এই যৎকিঞ্চিৎ পত্র পু (সুখাদ্য দ্রব্য) গ্রহণ করুন।" তাঁহার মিনতি যুক্ত বাক্যের উত্তরে কহিলা আমি তোমার বাক্যে অতিশয় প্রসন্ন হ য়াছি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তি তোমার মঙ্গল করুন। "পর দিবস সন্ধ্য পূর্ব্বে কালী নদীর তীরবর্ত্তী (কালীর অপ নাম সরযু নদী) একটী বৃহদাকার বা দৃষ্টে তথায় যামিনী যাপনের ইচ্ছুক হই প্রাসাদাভ্যান্তরে গমনোন্মুখ হইলাম। প্রবেশ মাত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ যুগল মৃগেন্দ্রে ন্যায় দুই দ্বার রক্ষক প্রভু ভক্ত কুকুর হইল। আমাদিগের প্রতি তাহাদের নক্ষেপ হইবা মাত্রই তাহারা অশনিপাতে ন্যায় গগণভেদী রব করিতে করিতে ঝম্প আরম্ভ করিল। তৎশ্রবণে গৃহ স্বামি

র্গত হইয়া হিন্দি ভাষায় আমাদিগকে জ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি চান ?" ত্তরে সঙ্গী একজন নেপালিভাষায় কহিন "আমরা অদ্য রাত্রি এই স্থানে বিশ্রাম রিবার ইচ্ছা করি।" গৃহকর্ত্রী আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া কুকুরদিগকে রন্ত হইবার সঙ্কেত করিলেন, তাহারা তিপালনকারী প্রভুপত্নীর আদেশ তৎণাৎ পালন করিল। আমরা যে বাটীতে াশ্রয় লইয়াছিলাম উহা একজন ভূটীয়া াতির গৃহ, তিব্বত নেপাল প্রভৃতি স্থানী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সচরাচর ভুটীয়া হে, কিন্তু মান্যার্থে গৃহস্থদিগকেও লামা হাশয় বা মাহাত্মা' শব্দ ব্যবহার করিয়া কে, ভূটীয়া বলিয়া সম্বোধন করিলে হারা দুঃখিত ও রাগান্বিত হয়। সন্ধ্যার র লামাপত্নী, কন্যা ও পুত্রবধূাদি পরিা হইয়া আমাদিগের বিশ্রাম কক্ষে বেশ করত অভিবাদনান্তে উপবেশন রিল। পরে তাহাদিগের মুখে শ্রুত হইম গৃহাধ্যক্ষ পুত্র সকলের সহিত স্থানারে গমন করিয়াছেন এজন্য বাটীতে ান্য ২।১ জন ভৃত্য ভিন্ন অন্য কোন ক্ষ নাই। প্রমদাগণ আমাদিগের গান নিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলে ক মোক্ষ তত্ত্ববিষয়ের একটী গান গাহিন, কিন্তু তৎশ্রবণে তাহাদের মনোরঞ্জন ন না। তখন তাহারা তাঁহাকে প্রেম- গাহিতে অনুরোধ করিল, তিনি াদিগের বহু স্তুতিতে সম্মত হইয়া করনি প্রদান পূর্ব্বক গাহিতে লাগিলেন "বেণুবাজে সখি মধুবন মে।" ইহা শ্রবণে তাহারা অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তালে তালে তালি দিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী ও বঙ্কিমনেত্রে দৃষ্টিপাত করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। উহারা কস্মিনকালে স্নান কিম্বা গাত্রবস্ত্র পরিষ্কার করে না এজন্য সতত উহাদিগের গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, পরন্তু উহারা সুন্দরী, সতীত্বাদি গুণসম্পন্না। কিছুক্ষণ পরে কনক তাহাদিগকে কহিলেন আমি তো তোমাদিগকে ৪।৫ টা গান শুনাইলাম এক্ষণ তোমরা ২।৪টি আমাদিগকে শুনাও, তৎবাক্য শ্রবণে উহারা ২টী সঙ্গীত করিল। আমি উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম, উহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক রসিকা রমণী চতুরতা পূর্ব্বক অর্থ শুনাইল। হে মহারাজ আজ আমাদের ধন্য ভাগ্য, যোগী ঋষিগণ যাঁহার সাক্ষাত দুর্লভ বিবেচনা করেন, আমরা গৃহে তাঁহার দর্শন পাইলাম। আপনার অনুপম মোহন মূর্ত্তি ও চন্দ্রাপেক্ষা উজ্জলতর মুখকান্তি সুবিশাল বক্ষস্থল দৃষ্টে আমাদের মন প্রাণ সুশীতল হইল। আপনার কমল আঁখিতে আঁখি পতিত হইলে আর উহাকে অন্তর করিবার ইচ্ছাহয় না, মনে হয় চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীন হইলেই ভাল হইত। হে নাগরীরঞ্জন, ভক্তবৎসল তোমাকে আমরা বার বার নমস্কার করি।"

সেই ছলনা বাক্যে প্রথমতঃ নির্ব্বাক হইলাম পরে তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। যখন ভগবান হিমালয়রাজের

গৃহে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তৎসময় বাসর গৃহে নারী বৃন্দ মহাদেবকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন এইরূপ কল্পনা করিয়া ঐজাতিরা স্বীয় ভাষায় ঐরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে। আমি ঐ চাতুর্য্য জালের অর্থ বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে লাগিলাম।

রাত্রি অধিক হওয়া প্রযুক্ত কিছুক্ষণ পরেই তাহারা নিরস্ত হইয়া আমাদিগকে বহুবিধ স্তুতি ও অভিবাদন করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে স্ব স্ব শয়ন কক্ষে চলিয়াগেল। ক্ষণকাল পরে সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, বিশ্বপতি বিধাতা এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ পুরুষ জাতিকে গৃহস্থাশ্রমরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার নিমিত্তই স্ত্রী জাতির সৃজন করিয়াছেন। বিশেষ মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকরগণ স্ত্রীকে গৃহের লক্ষ্মী, জীবনের শক্তি, ভার্য্যাহীন ব্যক্তিই শ্রীহীন, শক্তিহীন ইত্যাদি লিখিয়া গৃহস্থাশ্রমের পরম পোষকতা করি গিয়াছেন। যে মহাবীর ভীষণ সম্মুখ সম শত সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া স্ব বাহুবলে জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন তিনি দুর্ব্বলা অবলার কর কমলের নিকট পর ভূত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণের দাস হইয় ছেন। যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভারতবাসী সম হিন্দু জাতি নারায়ণ বলিয়া পূজা করি থাকেন তিনিও কুঞ্জবনে শ্রীরাধিকার মা ভঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহার পদ ধারণ করি ছিলেন। হে লোকনাথ, তোমার ইচ্ছ এই বিশ্ব-সংসার চলিতেছে পুরুষ-প্রকৃ রূপা নরনারী-তোমার উচ্চতর উদ্দে সাধন করিতেছে, আমি তোমাকে নমস্ক করি। ইত্যাদি প্রকার বহু চিন্তা করি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

ক্রমশঃ

উদাসী

ঘাটের কথা।

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত, তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পড়িতে পাইতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাক, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আরেকদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বি মাস পড়িতে আর দুই চারি দিন বা আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ ম নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরুপ অম্‌নি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে ভরা গঙ্গা। আমার চারটমাত্র ধাপ জলে উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থ

সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্র-কাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ঐ বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইঁটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙ্গার বাব্‌লাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্ত-যৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল্‌ছল্ আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে। ভরা গঙ্গার উপরে শরৎ প্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোনার মত রং, চাঁপা ফুলের মত রং। রৌদ্রের এমন রং আর কোন সময়েত দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝীরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখীরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে ছোট ছোট নৌকাগুলি তেম্‌নি ছোট ছোট পাল ফুলাইয়া সূর্য্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখী বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাজহাঁসের মত জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখাদুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড় বেশী দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সে দিনের কথা! আমার দিনগুলি না কি গঙ্গার স্রোতের উপরে খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায় বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এই জন্য সময় বড় দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেই জন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মত দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালের ভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্য্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায় না, সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতা গুল্ম শৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তাহারা পুরাতনকে শ্যামল ও মধুর করিয়া রাখিয়াছে; তাহারা পুরাতনকে চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক এক পা সরিয়া যাইতেছেন, আমিও ততই এক এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ির ঐ যে বৃদ্ধা স্নান

করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উঁহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে, তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মত ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিত, সে মেয়েও আবার বড় হইল, বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা ভাসান মনে পড়িত ও বড় কৌতুক বোধ হইত।

যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ঘৃতকুমারীর নৌকাগুলির মত পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখন্ ডোবে কখন্ ডোবে। পাতাটুকুরই মত সে অতি ছোট, তাহাতে বেশী কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবল মাত্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ঐ গোঁসাইদের গোয়াল ঘরের বেড়া দেখিতেছ, ঐখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ঐখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র। এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র, কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিল্‌বিল্ করিত মাত্র। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত। যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া অষ্টাবক্রের মত বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মত সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে

খানি ইটের অভাব ছিল, সেই গর্ত্তটির মধ্যে একটা ফিঙ্গে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উস্‌খুস্ করিয়া জাগিয়া উঠিত মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার ঘোড়াপুচ্ছ দুই চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিষ দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোট ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি। সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপরে পা ফেলিত, ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবাল গুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশী খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাসা করিত, তাহা নহে, তথাপি, আশ্চর্য্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারো নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে সহিতে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত খুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুসি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুস্‌মি। যখন্ তখন্ দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কি মিল ছিল। সে জল ভারি ভাল বাসিত।

কিছুদিন পরে আর কুসুমকে দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম নাকি তাহাদের কুনীখুসীরাকুসীকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে না কি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কা'রা সব নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙ্গায় রোপন করিতে লইয়া গেছে।

ক্রমে কুসুমের কথা এক রকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড় করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের আর সে সঙ্গীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্রে অনুভব করিয়া আসিতেছি—আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া বাতাস কেমন হাহা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরী করিত দুই একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাতই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিন্দুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড় কেহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুর ঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ন মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউ গুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসীখুসীরাকুসী বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্য্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন বসন, করুণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চখে পড়িত না। কুসুম যে বড় হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি ত পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড় কখন দেখি নাই। তাহার মল ছিলনা বটে, কিন্তু সে যখনি চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বৎসর কখন্ কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেও পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমনি এক দিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সে দিন সকালে উঠিয়া এমনিতর মধুর সূর্য্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন, তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের একপার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্য সত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য যেমন জীবন্ত সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মত তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরই মত টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারাহীন, তাঁহাদের সুখ দুঃখের স্মৃতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেই দিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতেছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়া ছিল। সেই দিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যউজ্জ্বলমুখচ্ছবি, দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ঐ শিব মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া

পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না; ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননীদিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারী সমাজে অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোন দিন ভাগবত পাঠ করিতেন কোন দিন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোন দিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া কাবলি করিত,—আহা, কি রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া বক্ষ গঙ্গার জলে নিমগ্ন করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন তাহার পূর্ব্ব উপকূলের শিয়রের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ-পুটের মত ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত, ও আকাশ সরোবরে উষা-কুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইতে থাকিত। ক্রমে গাছের প্রান্তগুলি আকাশে ফুটিতে থাকিত, বাতাস জাগিত, আকাশের বর্ণ শুভ্র হইয়া আসিত, অবশেষে নেপথ্য হইতে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে প্রাতঃস্নাত বিমল সূর্য্য ধীরে ধীরে সোপানে সোপানে আকাশে উত্থান করিতে থাকিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক একটি করিয়া শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঙ্গিয়া যায়, চন্দ্র তারা পশ্চিমে নামিয়া যায়, সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী! স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজুট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্য্যকিরণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে সূর্য্য গ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যও লোক সমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল। সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আরেক জনের গা টিপিয়

বলিয়া উঠিল—"ওলো এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী!" আরেকজন তুই আঙুলে ঘোম্‌টা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা, তাইত গা, এ যে আমাদের চাটুয্যেদের বাড়ির ছোট দাদাবাবু।" আরেক জন ঘোম্‌টার বড় ঘটা করিত না, সে কহিল—"আহা, তেম্‌নি কপাল, তেম্‌নি নাক, তেম্‌নি চোক্।" আর একজন সন্ন্যাসীরদিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসীদিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা, সে কি আর আছে! সে কি আর আস্‌বে! কুসুমের কি তেমনি কপাল!" তখন কেহ কহিল "তার এত দাড়ি ছিল না।" কেহ বলিল "সে এমন একহারা ছিল না।" কেহ কহিল—"সে যেন এতটা লম্বা ছিল না।" এইরূপে এ কথাটার এক-রূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পা-ইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া-ছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমাতিথিতে পূর্ব্ব-দিকে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল। তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল। মন্দিরের কাঁ-শর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল—তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণ-তর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মত মিলাইয়া গেছে। পরি-

পূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল্‌ছ-করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড় ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না—কুসু-মের পশ্চাতে আশেপাশে ঝোপে ঝাপে গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙ্গা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিমগাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালে-উর্দ্ধচীৎকার ধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন,—এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। ঊর্দ্ধমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপর তেম্‌নি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্ব্বজন্মের পরিচয় ছিল। মনে হইল যেন বহুদিন পরে পূর্ব্ব পরিচিত কোন্ দুই জন ক্ষীণালোকে বহুদূর ব্যবধান থাকিয়া পরস্পরকে দেখিতে পাইল—দুজনে দুজনকে চিনিতে পারিল, তবু চিনিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের চিত্ত পিতের মত ভাব দেখিয়া, আমার উপর

জ্যোৎস্নালোকে উভয়ের যে ছায়া পড়িয়া-ছিল সেই ছায়ায় ছায়ায় ক্ষণেকের জন্য স্থিরভাবে একত্রে মিলন দেখিয়া আমার এইরূপ মনে হইল—ইহা আমার কল্পনাও হইতে পারে। আমার মনে হইল—প্রথম দৃষ্টিতেই যদি ইহাদের চেনাশোনা না হয়, ইহাদের পূর্ব্বজন্মের সম্পর্ক সহসা মনে না পড়ে তবে আর চেনাশোনা হইবে না, আর মনে পড়িবে না। মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচ-কিত হইয়া, আত্মসম্বরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বৎসে, তোমার নাম কি।' কুসুম কহিল—"আমার নাম কুসুম।" সে রাত্রে আর কোন কথা হইল না। কুসু-মের ঘর খুব কাছেই ছিল. কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে রাত্রে সন্ন্যাসী অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সোপানে বসিয়াছিলেন। অবশেষে যখন পূর্ব্বের চাঁদ পশ্চিমে আ-সিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আ-সিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া গ্রামকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্ম্মের কথা শুনাইতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে পারিত! কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত—সে বুঝিতে চেষ্টা করিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন, সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবসেবায় আলস্য করিত না—পূজার ফুল তুলিত—গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যে সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল হৃদয় উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লা-গিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। শিশির-ধৌত পূজার ফুলের মত তাহাকে পবিত্র দেখাইতে লাগিল--এমন কি, সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেব-তার নিকটে উৎসর্গীকৃত ফুলের মতই দেখা-ইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্ব্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক একদিন সন্ধ্যা-বেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। আকাশে হিমের ভাব একেবারে দূর হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া

শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখীরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে। বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নব যৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্মগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছু দিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কি হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছু কাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল। কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল "প্রভু, আমাকে কি ডাকিতে পাঠাইয়াছেন!" "হাঁ বৎসে; তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? আজ কাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন!" কুসুম চুপ করিয়া রহিল। "বৎসে আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বল।" কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল—"প্রভু, আমি পাপীয়সী সেই জন্যই এ অবহেলা!" সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।" কুসুম একটু যেন চমকিয়া উঠিল—সে হয়ত মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন! তা হার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আ সিল—সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মু আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসী কিছু দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "বৎসে, তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বল, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।" কুসুম অটল ভক্তি স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিয় মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন ত অবশ্য বলিব। ত আমি ভাল করিয়া বলিতে পারিব না, কি আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানি তেছেন। প্রভু, আমি এক জনকে, আমা গুরুজনকে, দেবতার মত ভক্তি করিতাম আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আন আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কি এক দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন তি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন এক বকুল বনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমা দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমে কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছু অসম্ভব কিছুই আশ্চর্য্য মনে হইল না স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গি না। তাহার পরদিন যখন তাঁহাকে দেখি লাম, আর পূর্ব্বের মত দেখিলাম না। পা মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লা গিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম—কিন্তু ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই বধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর

—আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে!" ন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথা লি বলিতেছিল, তখন আমি অনুভব রিতেছিলাম সন্ন্যাসীর সর্ব্ব শরীর যেন াঁপিতেছিল, সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ দতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়াছিলেন। সুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী কহিলেন, াহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ, সে কে বলিতে ইবে!" কুসুম যোড়হাতে কহিল, "তাহা লিতে পারিব না।" সন্ন্যাসী কহিলেন তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বল!" কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটী পীড়ন করিয়া হাত যোড় করিয়া বলিল, 'সে কি না বলিলেই য়! সে কি নিতান্ত বলিতেই হইবে।" ন্যাসী কহিলেন "হাঁ বলিতেই হইবে!" কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সে তুমি!" যেমনি তাহার নিজের কথা তাহার নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল, অমনি সে মূর্চ্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন—"বৎসে, তুমি আমার সকল কথাই লন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বল, এই সাধনা করিবে।" কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল "প্রভু তাহাই হইবে!" সন্ন্যাসী কহিলেন—"তবে আমি চলিলাম।" কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কুসুম কহিল "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল। এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে শ্রান্তির সময়ে এ জল যদি তাহাকে হাত বাড়াইয়া কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে! চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকারে বাতাস হূহু করিতে লাগিল; পাছে কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়! আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল জানিতে পারিলাম না।

কেঁচো।

১। মুখবন্ধ।

কেঁচো সংস্কৃত 'কিঙ্কিলিক' বা 'কিঞ্চ- ক' কথার অপভ্রংশ; যে কিং অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চলে। ইহার অপর নাম 'মহীলতা'। এই তিনটীর কোন একটী নাম

দিলে অনেকের কাছে কেঁচো সম্ভবতঃ মান সম্ভ্রম পাইত, অন্ততঃ তত হেয় বলিয়া বোধ হইত না। 'কিঞ্চিলিক,' 'কিঞ্চুলুক,' বা 'মহীলতা' অনেকের কাণে শুনিতেও ভাল লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার কানে চির পরিচিত কেঁচো নামটীই ভাল শুনায়; অন্য কোন নামে ইহাকে ডাকিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে, লিখিতে কলম সরে না। পাঠক বলিতে পারেন, আমার রুচির দোষ। বলেন, বলুন। বাল্যকালাবধি যে নামটী শুনিয়া আসিয়াছি, ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার বড় প্রিয়, ছাড়িতে মায়া হয়। কেঁচোকে যে একটী বড় নাম দিয়া ডাকিলেই তাহার গৌরব বাস্তবিক বাড়িবে, আমার এরূপ বিশ্বাসও নয়। তাহার কার্য্য মহত্বই তাহার গৌরব। নামে কি করে?

আমরা মাছ ধরিবার জন্য কত কেঁচো খুঁড়িয়া তুলি, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বঁড়শীতে বিঁধি। কেঁচো মাছের উৎকৃষ্ট টোপ। গর্ব্বিত মানুষ মনে করে, "পরমেশ্বর আমাদের আহারের জন্য জলে মাছ সৃষ্ট করিয়াছেন; তাহাকে ধরিবার জন্য ভূমিতে কেঁচো দিয়াছেন; আহা কি অপূর্ব্ব কৌশল।" মাছ ধরা ব্যতীত প্রকৃতির রাজ্যে কেঁচোর অন্য কোন কাজ আছে কি না, ক জন তাহার অনুসন্ধান করে? তাহার প্রাণ আছে সে টুক বুঝিতে পারি, কারণ তাহাকে তুলিবার সময়, নখ দিয়া কাটিবার সময়, হিল্‌বিল্ করিয়া নড়ে। কিন্তু কেঁচো নিকৃষ্ট প্রাণী; অনেকে তাহাকে ছুঁইতে ঘৃণাবোধ করেন; সে কি বড় কাজ করিতে পারে? তাহার বিষয় আমরা কি লিখিব তাহার ইতিহাসে আমরা কি শিখিব?

কেঁচো প্রকৃতির কৃষক—যখন মনুষ্য জন্মে নাই, তখন জমি চসিয়া দিত; আ এখনও বন জঙ্গলে, যেখানে মানুষের লা ঙ্গল চলে না, সেখানকার জমি চসিয়া দেয় কেবল তা নয়; এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কীট জমি একজন প্রধান সৃষ্টি কারক, এবং উর্ব্বরত সাধক। আবার আমাদের যে অমিশ্র উপ কার করে তা নয়, অনেক হানিও করিয় থাকে। তাহার উৎপাতে বাড়ীর রক বসিয় যাইতে দেখা যায়; অনভীর ভিত্তি কম জোর হইয়া কালে নিম্নগামী হয়; প্রাচীন পতিত গৃহের মেজে তাহার পরিত্যক্ত মৃত্তি কাবৃত হয়। কেঁচোর এসব কাজ কিরূপে সাধিত হয় বুঝিবার আগে, তাহার শরীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করা যাউক। তার জন্য যতটুকু সময় ও মনোযোগ দরকার, পাঠক তুমি তাহা দিতে কি কুণ্ঠিত? নিকৃষ্ট জীবের পর্য্যালোচনায় আমরা কত মহৎ সত্য শিখি! মানুষাদি উচ্চ জীবকে বুঝিবার একমাত্র উপায় কীটাদি নীচ জীবের আলোচনা করা। সংসারে ছোট বড় যত প্রাণী আছে সকলেই আমাদের আলোচ্য, বিজ্ঞানের চোখে সকলেই সমান। জীবের ক্রমোন্নতি প্রাণীবিদ্যার একটী দৃঢ় মূলীভূত সত্য। ইহা কি চমৎকার!

২। বাসস্থান।

কেঁচো ভিজে স্যাঁৎসেতে জায়গায় থাকিতে ভাল বাসে। বর্ষাকালে ইহাকে জমির অল্পনীচেই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার

বর কখনও কখনও ২।৩ হাত গভীর হইয়া থাকে। বাসস্থান খুঁড়িবার সময় কেঁচো কতক মাটি ঠেলিয়া ফেলে, কতক উদরস্থ করে, এবং ইহার পায়ু দ্বারা মৃত্তিকা নির্গত হইতে থাকে। আমি একটি টবে মাটি পুরিয়া গুটীকত কেঁচো ছাড়িয়া দিলাম, ৩।৪ মিনিটের মধ্যেই তাহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। কিন্তু ঐ মাটি খুব চাপিয়া, শক্ত করিয়া একটীকে রাখিলাম; সে তাহা খুঁড়িতে একেবারেই যেন অক্ষম, মনে হইল, এদিক ওদিক নরম মাটি খুজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আর একটীকে তাহার সাহায্যার্থে দিলাম তখন দুইজনে গায় গায় জড়াইয়া একত্রে, একস্থানে মুখ বাড়াইয়া খুদিতে লাগিল—একজন একটু, আর একজন আর একটু, এইরূপ একটু একটু করিয়া পন ঘণ্টার মধ্যে তাহারা অন্ত-

কেঁচোর বিবর সোজা নয়,

-খনও কখনও তাহার মুখ

পাট্‌কেলের টুকরা ইত্যাদি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে শত্রু না আসিতে পারে। তাহার বল্মীক পায়ু পরিত্যক্ত মল মাত্র। একজাতীয় কেঁচোর (যাহাকে ঘাসাচ্ছাদিত মাঠ ময়দানে সচরাচর পাওয়া যায়) বল্মীক, স্তম্ভের ন্যায়। এই স্তম্ভ এক ইঞ্চ দুই ইঞ্চ, বা ততোধিক উচ্চ হইতে পারে। আর একজাতীয় কেঁচো আছে তাহার টিবি ছোট ছোট, পৃথক পৃথক, মটীর রাশিমাত্র। জলের মধ্যে কেঁচো অধিকক্ষণ বাঁচিতে পারে না, আমি কতক-গুলিকে বিকালে একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া, তার পরদিন সকালে দেখিলাম তাহারা মৃতবৎ; পরে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া গেল। তজ্জন্যই বোধ হয় বর্ষার পর অনেক মরা কেঁচো দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। খাদ্য, পাক-প্রণালী।

কেঁচো রাত্রিকালে আহারান্বেষণে বাহির হয়। দিনের বেলা অনেক শত্রু পাখী, পিঁপড়া ইত্যাদি। অতএব তখন প্রায়ই লুকাইয়া থাকে। কেবল নিষেক (fertilisation) কার্য্যের সময় মধ্যে মধ্যে ইচ্ছামত বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। কেঁচোর প্রধান খাদ্য মৃত্তিকা এবং পাতা, কিন্তু অন্যান্য বহুতর জিনিস খাইয়া থাকে, এমন কি চর্ব্বি, মাংস পর্য্যন্তও ছাড়ে না। খাইবার সময় মুখ এবং তাহার নিম্নস্থিত স্ফীত গলদেশ [১] (pharynx) বাহির করে। কেঁচোর দাঁত

---

১ ইহা দেখিবার জন্য একটী মোটা-গোছের কেঁচো লইয়া তাহাকে ক্লোরাভর্ম দ্বারা বা মদের ভিতর ডুবাইয়া মারিয়া ফেল। পরে তাহার পৃষ্টভাগে (যে ভাগ অপেক্ষাকৃত কাল) মাঝামাঝি মুখ হইতে গাত্রের চর্ম্ম খুব ছোট ধারাল কাঁচির দ্বারা সতর্কতার সহিত ব্যবচ্ছেদ কর। পরে pie dish এর ন্যায় পাত্রে জলের নীচে কর্কে বা কোন নরম কাষ্ঠ খণ্ডে ব্যবছিন্ন চর্ম্ম দুই পাশে আলপিন্ দ্বারা বিদ্ধ কর। উপরে পাক প্রণালী, এবং তাহার নীচে শাদা সূতার ন্যায় স্নায়ু প্রণালী দেখিতে পাইবে। কর্ককে জলে ডুবাইবার জন্য তাহার নিম্নভাগে সিসা কি অন্য কোন ভারি পদার্থের পতর মারিতে কিম্বা কর্কের নিম্নভাগ ও পার্শ্বচতুষ্টয় রাং দ্বারা মোড়াইতে হয়।

নাই ; তাহার খাওয়া চিবান নয় এক রকম চোষা। আমি উপরে যে টবের কথা বলিয়াছি, তাহাতে কতকগুলি শুষ্ক পেয়ারার পাতা রাখিয়াছিলাম ; তাহার শিরগুলি ছাড়িয়া ছাল চুসিয়া লইয়াছে, এবং পাতা কয়টি জালের আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পরিত্যক্ত মাটি কিম্বা তাহার অন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার ভিতর অনেক অতি ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড দৃষ্ট হইবে। এ সব নিশ্চয়ই সে খাইয়াছিল। কি কিন্তু জন্য ? মাটি বা পাতাতে শরীর পুষ্টিকারক জীবন পদার্থ (organic substance) বেশ আছে, কিন্তু ইটে নাই। তবে ইচ্ছা করিয়া এত ইটের টুকরা খাইয়া থাকে কেন ?

এস্থলে কেঁচোর পাকযন্ত্র সম্বন্ধে দু চার কথা বলা আবশ্যক। ইহার গঠন কৌশল অতি চমৎকার।

'গল' শব্দ গল্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'গল্' ভোজন করা। যে রাস্তা দিয়া ভুক্তবস্তু মুখ হইতে জঠরে যায়, তাহার মুখের দিকের অংশকে গলদেশ বলা হইল। গল দেশের নিম্নে গলনালী। প্রচলিত ভাষায় 'গলা' দ্বারা আমরা যাহা বুঝি 'গল' তাহা এবং কণ্ঠ হইতে ভিন্ন বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ মুখ, মুখের পর পূর্ব্বোল্লেখিত অত্যন্ত স্ফীত গলদেশ তার নীচে লম্বা গলনালী। গল নালীর নিম্নভাগ স্ফীত। এই স্ফীতাংশের আবরণ অত্যল্প স্থূল ও কঠিন, ইহাকে ইংরাজীতে ক্রপ বলে। ইহার নীচে জঠর, পরে অত্যন্ত লম্বা অন্ত্রাণি। ক্রপের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় সাতিশয় বলবান্ মাংশপেশী আছে। আহারের সময় এই সকল মাংশপেশী সজোরে চালিত হয়, এবং ক্রপের ভিতর ইষ্টক খণ্ড সমূহের সাহায্যে পত্রাদি খাদ্য চূর্ণীকৃত হয়। কেঁচোর দাঁত নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইটের টুকরা দাঁতের কায করে।

৩। স্নায়ুপ্রণালী, ইন্দ্রিয়, মানসিক বৃত্তি ইত্যাদি।

কেঁচোর স্নায়ুপ্রণালী সূত্রের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে স্থূলাংশ, আমাদের মত পাকপ্রণালীর উপরিভাগে নয়—নিম্নভাগে। কিন্তু ইহার সহিত সংযুক্ত, গলদেশের উপর, একটী বিশেষ স্থূলাংশ (ganglion) দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচোর চোখ নাই। গাত্র দ্বারা আলোক প্রবিষ্ট হইয়া এই স্থূলাংশতে লাগে, তাহাতেই সে আলোক অন্ধকার বুঝিতে পারে, রাত্রি দিন চিনিতে পারে, দিনের বেলায় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। যদি তাহার অগ্রভাগ ঢাকিয়া, কেবল পশ্চাদ্ভাগ আলোকিত করা যায়,তাহা হইলে আলোক-রশ্মি গলার উপরস্থিত স্নায়বাংশে প্রবেশ করিতে পারে না, কাজে কাজেই সকল অবস্থায় কেঁচোরও আলোক বোধ জন্মে না। তাহার কাণ নাই। ঢাক ঢোল বাজাও শুনিতে পাইবে না, নির্ভয়ে চরিবে। কিন্তু যে পাত্রে সে থাকে তাহা যদি কোন মতে স্বল্প পরিমাণেও চালিত হয়, তাহা হইলে

র পায়, এবং দ্রুতগতি বিবরে প্রবেশ রে। এস্থলেও শব্দ হিল্লোল, সম্ভবতঃ যে ায়ুর কথা এই মাত্র বলা হইল তাহা দ্বারা াজ করে। কেঁচোর স্পর্শ শক্তি খুব প্রল। বিবর হইতে বাহির হইবার সময় খ বাড়াইয়া স্পর্শ করিয়া চারিদিকের খবর য়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে আমার টবস্থিত একটী কেঁচো বিবর খুঁড়িবার সময় শরীরের গ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিয়া কিরূপে নরম াটি খুঁজিতে লাগিল। কেঁচোর আস্বানেন্দ্রিয় বেশ আছে, খাদ্য দ্রব্যের ভাল ন্দের তারতম্য বোধ বিলক্ষণ প্রদর্শন রে। প্রাণীতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা দেখিাছেন, সে কোন কোন গাছের পাতা খুব াল বাসে, কোন কোন গাছের পাতা াদৌ স্পর্শ করে না। তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ত প্রবল নয় ; চোনা, হুকার জল প্রভৃতি র্গন্ধময় পদার্থ তাহার বাসস্থানের উপর ালিয়া দিলে শুনিয়াছি সে বাহির হয় ; কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের গন্ধের দরুণ কি ন্মিশ্রিত হানিজনক পদার্থের দরুণ এরূপ ব্যবহার করে তাহার মীমাংসা আবশ্যক। কিঞ্চিলিকের বংশ বর্দ্ধন স্পৃহা এত বলবতী য়ে দিনের বেলাও যখন ভয়ে বিবরের বাহির য় না—দুই জনে সংযুক্ত হইয়া কখনও কখনও বাহিরে পড়িয়া থাকে।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে কিরূপে দুইটী কেঁচো গায় গায় জড়াজড়ি করিয়া একত্রে কঠিন মাটি খুঁড়িয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। এই কাজে কি তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না ? পাঠক, তুমি হয়ত বলিবে, "কেঁচো আবার জন্তু তার আবার বুদ্ধি !" বাসস্থান নির্ম্মাণ করা, রাত্রিতে চরা, দিনে লুকাইয়া থাকা, এ সব অভ্যস্ত কাজ, ছোট বড় সব কেঁচোই করিয়া থাকে, তাহাতে বুদ্ধির দরকার নাই। কিন্তু আমি যে স্থান হইতে উপরোক্ত কেঁচোদ্বয়কে লইয়াছিলাম, সেখানকার জমি খুব নরম, দুই জনে মিলিয়া যে শক্ত মাটি অপেক্ষাকৃত সহজে খনন করিতে পারিবে, তাহা তাহাদের অভ্যাস হইবার কোন সুবিধা ছিল না, তবু যে তাহারা একত্রে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা কতকটা বুদ্ধির পরিচয় নয় ত আর কি বলিব ? প্রাণীতত্ত্ববিৎ মহা পণ্ডিত মৃত ডারউইন কেঁচো কেমন বুদ্ধি খাটাইয়া, যে পাতার যে দিক ধরিয়া লইয়া গেলে তাহার বিবরের মুখ উৎকৃষ্টরূপে বদ্ধ হইবে, ঠিক সেই দিক ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমরা যখন বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া কোন বিষয় ভাবি, তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হই। কেঁচোরও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে ; সে যখন চরে বা অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত থাকে তখন আলোক-রশ্মি বা শব্দহিল্লোল তাহাকে তত উত্তেজিত করিতে পারে না। মন না থাকিলে মনোনিবেশ করা হয় না ; অতএব কেঁচোরও মন আছে এরূপ সাব্যস্ত করা যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

কেঁচোর শরীর বহু সংখ্যক ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত

সুচারুরূপে দেখা যায় না, কিন্তু আঙ্গুল চালাইলে তাহাতে বাধে, খর্‌খর্ করে। চলিবার সময় কেঁচোর পৃষ্ঠভাগে রক্তবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ, সঙ্কোচশীল একটী লম্বা নল দেখা যায়। ইহার গঠন ও কার্য্য অত্যন্ত জটিল এখানে তাহার বর্ণনা করিব না। এই মাত্র বলিয়া রাখি, উহাতে রক্তের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয়,কিন্তু কেঁচোকে কাটিলে যাহা নির্গত হয়,তাহা রক্ত নয়। যে জলীয় পদার্থ কেঁচোর বাস্তবিক রক্তের কাজ করে তাহা শাদা, রক্তের মত আদৌ দেখিতে নয়। কেঁচোর নিকট সম্বন্ধীয় জলবাসী অনেক কীটের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কানকা (Gills) আছে; তাহার নিজের সেরূপ কোন যন্ত্র নাই। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ছিদ্রবহুল গাত্র দ্বারা সমাধা হয়।

কেঁচোর পুরুষ—এবং নারী অঙ্গ দুই একত্রে প্রত্যেকে বিদ্যমান। কিন্তু তাহাদের পরস্পর সংযোগে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক কেঁচোর দেহাভ্যন্তরস্থিত পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায়; তাহাদের বিবাহ, ভিন্ন কেঁচোর নারী ও পুরুষের সহিত হইয়া থাকে। এই জন্য দুইটী কেঁচো পরস্পর সম্মিলিত না হইলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না।

৫। কৃষি কার্য্য।

কেঁচো আপন বাসস্থানের জন্য বিবর খুঁড়িয়া, মাটি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দিয়া বৃষ্টি ধারার প্রবেশের ও চালনার সুবিধা করিয়া দেয়। যেখানে তাহারা অনেক থাকে সেখানে এইরূপ শত শত বিবর দেখিতে পা রে। একটী টবে একজন কেঁচোতত্ত্বজ্ঞ-ওয়া যায়। এই সকল বিবরের দরুণ জ ায়ী পণ্ডিত বালি পূরিয়া তাহাতে পাতা নিঃসন্দেহ অনেকটা সিক্ত থাকে, এবং বৃ কতকগুলি কেঁচো রাখিয়াছিলেন, দিনকার্য্যের সুবিধা হয়। কেঁচো ইট পাট্‌কে কের মধ্যেই ঐ বালি উত্তম সারজমি লের ন্যায় বহুতর বীজ ভক্ষণ করিয়া থাকে য়া দাঁড়াইল।

ঐ বীজ পরিত্যক্ত মলের সহিত বহির্গ হয়; তাহার উৎপাদিকা শক্তি কখন কখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশ বজ থাকে, কালে উহা অঙ্কুরিত হয়।

কেঁচো জমি প্রস্তুত করিতে, এবং জ হাকে সারবান্ করিতে বড় পটু। কো স্থলে ইটপাট্‌কেল কাকরাদি ছড়াই রাখিলে, সে নিম্নস্থ মাটি উঠাইয়া ক্রম উহাকে আবৃত করে। এই উত্তোলি মৃত্তিকা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়; কা ইহা দ্বারা উর্ব্বর শষ্যোৎপাদক জমি তৈয় হইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কেঁ কিরূপে এবং কি জন্য জমির সহিত মিশ্রি ছোট ছোট ইষ্টক খণ্ডাদি উদরস্থ করে গাছপালার শিকড়ের নিকট হইতে সকল হানিজনক জিনিস এক একটী করি বাহিরে সরাইয়া সে নিশ্চয়ই তাহাদে বৃদ্ধির বিশেষ আনুকূল্য করে। বিবরে মুখ বুজাইবার জন্য যে সকল পাতা জ নীচে লইয়া যায় তাহা কালে পচিয়া উহ সহিত মিশ্রিত হয়। আবার, পাতা কে চোর একটী প্রধান খাদ্য। উদরস্থ পাত টুকরা সকল হইতে শরীরের পোষণো যোগী পদার্থ গৃহীত হইলে, অবশিষ্ট মলের সহিত নির্গত হয়, ক্রমে মাটির সহি মিশিয়া যায়, এবং তাহার উর্ব্বরতার বৃ ধাতব।

৬। রক্ষাকার্য্য।

ইটপাটকেলাদির ন্যায় অন্যান্য অনেক নিস কেঁচোর মাটিতে আবৃত হইতে রে। এইরূপে বহুতর প্রাচীন পদার্থ া এককালে জমির উপর পড়িয়াছিল, চোর দৌলতে জমির নীচে সুচারুরূপে ত হইয়াছে। প্রাচীন অট্টালিকা মন্দির তির ভগ্নাবশিষ্ট অংশাদি তাহাদের নীচে তে মাটি তোলার জন্য দমিয়া যায়, ং ঐ স্তূপীকৃত কীটোত্তোলিত মৃত্তিকা া আবৃত হইয়া সংরক্ষিত হয়। এজন্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের কাছে কেঁচো ণ্যই ধন্যবাদার্হ।

৭। ক্ষয়কার্য্য।

পৃথিবীর উপরিভাগ (ভূপৃষ্ঠ) বাতাস, বৃষ্টি, বরষা তাপ প্রভৃতির কার্য্যে বৎসরের পর বৎসর একটু একটু করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। কেঁচো এই ক্ষয়কার্য্যের সহায়তা করে। তাহার বিবর দ্বারা বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়া কেবল যে জমির উপকার করে তাহা নয়, অপকারও করিয়া থাকে—জমি কমজোর হইয়া ধসিতে পারে, ধসিলে তাহাকে ধুইয়া লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। কেঁচোর ভক্ষিত মাটি, ইটপাটকেল, কঙ্করাদি অনেকটা তাহার বিবরের মুখে জমির উপর পরিত্যক্ত হয়। উহা, বিশেষতঃ, বেলে জমির কীটের গুটির ন্যায় মল। বর্ষাকালে সহজে ধৌত হইয়া যায়, বৃষ্টির জল মিশ্রিত বালির বৃদ্ধি সাধন করে। পাঠকের বোধ হয় জানা আছে, যে ঐ বালি নালা, খাল দ্বারা নদীতে গৃহীত হয়, এবং নদী দ্বারা সমুদ্রে বাহিত হয়।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

ভক্ষ্যদ্রব্য কয় প্রকার।

আমাদের দেশে আহারীয় দ্রব্য সমূহ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। বায়ু, ও কফ নাশক বা বর্দ্ধক। অধুনাতন ানবিৎ পণ্ডিতেরা চারি শ্রেণীতে সমস্ত দ্যদ্রব্যকে বিভক্ত করিয়া থাকেন যথা সত্বকারী (Proteids)। ২। তৈল বা র্জাতীয়। ৩। শ্বেতসার। (amyloids)।

১। সত্বকারী অর্থাৎ প্রাণকারী পদার্থে সচরাচর চারিটি মৌলিক বা ভৌতিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—ক্ষারজান, অম্লজান, জলজান ও অঙ্গারজান। কখন কখন গন্ধক ও ফস্‌ফোরস্‌ও পাওয়া যায়। ময়দার, ডিম্বের, মাংসের ও দুগ্ধের সারাংশ এই জাতীয় পদার্থ।

২। চর্ব্বি। ইহাতে তিনটি ভৌতিক

পদার্থ পাওয়া যায় যথা;—অঙ্গারজান জলজান ও অম্লজান। সকল প্রকার চর্ব্বি-ও তৈল এই জাতীয় পদার্থ।

৩। শ্বেতসার (starch) ইহাতেও তিনটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় যথা; অঙ্গার-জান, জলজান ও অম্লজান; কিন্তু চর্ব্বি-জাতীয় পদার্থে জলজানের ভাগ অধিক। গঁদ, শর্করা, আরারুট ইত্যাদি এই জাতীয় পদার্থ। আমাদিগের প্রায় সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতসার অধিক পরি-মাণে পাওয়া যায়। তণ্ডুল, ময়দা, আলু ইত্যাদিতে অত্যধিক পরিমাণে শ্বেতসার আছে।

৪। ধাতব পদার্থ ও জল। এই দুই পদার্থ সকল ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যেই নূন্যাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপরি উক্ত চারি বিভাগের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য অধিক কাল পর্য্যন্ত আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারা যায় না। প্রকৃত জীবন ধারণোপযোগী আহারে এই চারি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কোন সত্বকারী পদার্থ যদি সহজে জীর্ণ হয় তাহা হইলে অন্য জাতীয় পদার্থের সাহায্য ব্যতীত ইহা জীবন ধারণোপযোগী হইতে পারে। মনুষ্য দেহে সত্বকারী পদার্থ অত্যধিক পরি-মাণে পাওয়া যায়, এই জন্য এই জাতীয় পদার্থ ব্যতীত কখনই প্রাণ ধারণ হইতে পারে না, সত্বকারী পদার্থের সহিত ধাতব-পদার্থও নিত্যন্ত আবশ্যকীয়। কিন্তু শ্বেতসার ও চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ প্রাণ ধারণ জন্য

নিতান্ত আবশ্যক নহে। সত্বকারী পদা
যে আমাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় তাহা
একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রতি মুহূর্ত্তে
আমাদিগের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এ
ঐ ক্ষতি পূরণের জন্য নুতন মাল মশলা
প্রয়োজন হইতেছে। প্রস্রাব, ঘর্ম্ম ও অ
ন্যান্য নিস্রবণ দ্বারা অহর্নিশি এক প্রকা
ক্ষারজাতীয় (urea) পদাথ নির্গত হইতেছে
আহার কর আর না কর ইহা (urea) নির্গ
মনের বিরাম নাই। এই নিস্রবণ শরীরাভ্য
ন্তরিক সত্বকারী পদার্থের রূপান্তর মাত্র
এই কারণে সত্বকারী পদার্থ প্রধান ভক্ষ্য
দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

সত্বকারী পদার্থে চারিটি মৌলিক পদা
দেখা যায়। ঐ চারিটি মৌলিক পদা
দ্বারা মনুষ্য দেহও গঠিত হইয়াছে—(এ
ব্যতীত ধাতব পদার্থ ও জল পাওয়া যায়
সত্বকারী পদার্থ রাসায়নিক বিচ্ছেদ দ্বা
দেখা গিয়াছে যে জলজান, অম্লজান, ক্ষা
জান ও অঙ্গারজান এই চারিটি মৌলি
পদার্থে গঠিত। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হ
তেছে যে মনুষ্যদেহ ও সত্বকারী পদা
র্থের রাসয়নিক ঘটন একই। এই কারণে
সত্বকারী ও ধাতব পদার্থ জীবন ধারণো
যোগী হইয়া থাকে। অঙ্গারাম্ল carbon
acid ওজল যাহা সর্ব্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত শরী
জাত দ্রব্য মধ্যে পাওয়া যায় তাহাও স
কারী পদার্থের অম্লজান ও অঙ্গারজান হই
উদ্ভূত হইতে পারে।

যদিও সত্বকারী পদার্থ চারি শ্রেণী ভ
দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং কোন কো

হায় অন্য শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত প্রাণ-
রণোপযোগী হইতে পারে কিন্তু ইহা
সুবিধা জনক ও অপরিমিত খাদ্য। আমি
একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা
রিব। ডিম্বসার (albumen) এক প্রকার
ধান সত্বকারী পদার্থ। ইহার শতভাগের
ধ্যে ৫৩ ভাগ অঙ্গারজন ও ১৫ ভাগ
রজান পাওয়া যায়। যদি কোন
ক্তিকে কেবল ডিম্বের শ্বেতভাগ আহার
দেওয়া যায় তাহা হইলে মোটামুটী ধরিতে
গেলে সে ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষারজান ভাগের
হিত সার্দ্ধ তিন ভাগ অঙ্গারজান আহার
করিবে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে
জন সুস্থকায় পুষ্ট মনুষ্য যে নিজ ভার
স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষণের উপযুক্ত ও
ধ্যাবিৎ রকম ব্যায়াম করিয়া থাকে, তাহার
দেহ হইতে চারি সহস্র গ্রেন অঙ্গার ও তিন
শত গ্রেন ক্ষারজান নির্গত হয় অর্থাৎ ক্ষার-
জানের তেরগুণ অঙ্গার নির্গত হয়। অতএব
যদি কোন ডিম্বসার হইতে তাহাকে ৪০০০
সহস্র গ্রেন অঙ্গার লইতে হয় তাহা হইলে
ই পদার্থ ৭৫৪৭ গ্রেন আহার করিতে হয়।
কিন্তু ৭৫৪৭ গ্রেন ডিম্বসারে ১১৩২ গ্রেন
ক্ষারজান আছে অর্থাৎ যত ক্ষারজানের
আবশ্যক তাহার প্রায় চারিগুণ অনর্থক আ-
হার করিতে হয়। যে ৩০০ গ্রেন ক্ষারজন
আমাদিগের শরীর রক্ষার্থ আবশ্যক তাহা
আমরা অর্দ্ধসের মাংস হইতে পাইতে পারি,
কিন্তু যদি কেবল সত্বকারী পদার্থই আহার
করা যায় তাহা হইলে ৪০০০ গ্রেন অঙ্গার
জান জন্য ২ সের চর্ব্বিবিশিষ্ট মাংস আহার

করা আবশ্যক। অতএব যদি কেবল সত্ব-কারী পদার্থই আহার করা যায় তাহা হইলে শরীর রক্ষার্থে ইহা অনর্থক অধিক পরিমাণে আহার করিতে হয়।

স্বাস্থ্য রক্ষার একটিপ্রধান নিয়ম এই যে আহার বলবর্দ্ধক ও শরীর রক্ষার্থ উপযোগী হইবে অথচ পরিমাণে অধিক হইবে না। কিন্তু সত্বকারী পদার্থ দ্বারা যদি জীবন সাধন করিতে হয় তাহা হইলে এই নিয়ম রক্ষা হয় না এবং তজ্জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই বিশেষ কারণে মিশ্র আহার অর্থাৎ সত্বকারী ও তৈল বা শ্বেতসার জা-তীয় পদার্থ মিশ্রিত আহার মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। প্রথম তিন শ্রেণীর খাদ্য অর্থাৎ সত্বকারী, চর্ব্বি ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ প্রধান,অর্থাৎ প্রাণ-ধারক খাদ্যমধ্যে পরিগণিত। উক্ত তিন প্রকার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেই জল ও ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়। শরীরের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক তাহা কেবল মিশ্র আহারেই পাওয়া যায়।

শরীর তত্ববিদেরা খাদ্যদ্রব্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন যথা; ১। উত্তাপ উৎপাদক খাদ্য,(fuel food) এবং ২। গ্রন্থি উৎপাদক বা শরীর নির্ম্মাণক খাদ্য (tissue-food)।

১। উত্তাপ উৎপাদক খাদ্য। শ্বেতসার ও তৈল জাতীয় খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যদিও চর্ব্বি ব্যতীত এই দুই জাতীয় খাদ্য অন্য কোন পদার্থের গঠনের সাহায্য করে

না, কিন্তু উত্তাপ উৎপাদন করিয়া শরীরাভ্যন্তরিক চর্ব্বিকে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে দেয় না। এই কারণে উত্তাপ উৎপাদক খাদ্যও প্রাণধারক খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত। যেমন কলের গাড়ির এঞ্জিন্ চালিত হইবার জন্য পাথুরিয়া কয়লা বা জ্বালানি কাষ্ঠের আবশ্যক সেইরূপ উত্তাপ উৎপাদক খাদ্যও আমাদের দেহের উত্তাপ কার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

২। গ্রন্থি উৎপাদক বা শরীর নির্ম্মাণক খাদ্য। এই শ্রেণীর খাদ্য দুই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অহর্নিশি প্রতি মুহূর্ত্তেই শরীরের ক্ষয় হইতেছে এবং এই ক্ষতিপূরণের জন্য এই শ্রেণীর খাদ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই কার্য্য ব্যতীত নূতন গ্রন্থি নির্ম্মাণের জন্যও এই শ্রেণীর খাদ্য নিতান্ত আবশ্যকীয়। অতএব শরীর গঠন ও ক্ষতিপূরণ এই উভয় কার্য্যের জন্যই এই খাদ্যের প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই খাদ্য উত্তাপও উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যদি উত্তাপ উৎপাদন ও শরীর নির্ম্মাণ উভয় কার্য্যের জন্য এ খাদ্য আহার করিতে হয় তাহা হইলে অন্যথা অধিক পরিমাণে আহার আবশ্যক। স্বভাবের রীতি এই যে যখন মনুষ্যদেহে কোন শ্রেণীর আহার অধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট করান যায়, তখন যতটুকু আবশ্যক ততটুকু ব্যবহৃত হইয়া বাকিটুকু শরীর নির্গমের পথ দ্বারা নির্গত হইয়া যাইবে। এই স্বাভাবিক নিয়ম জন্য অধিক জল পান করিলে প্রস্রাব হইয়া নির্গত হয় ও অন্যান্য খাদ্যও প্রস্রাব ও মলদ্বারা নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু অধিককাল পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে স্বভাব আপন রীত্যনুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, সুতরাং অনাবশ্যকীয় দ্রব্য শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া দেহকে পীড়িত ও দূষিত করিয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন করিয়া দেয়। এই কারণে মিশ্র আহারই কেবল যথা নিয়মে পুষ্টিসাধন ও উত্তাপ রক্ষণ করিয়া শরীরকে সুস্থ ও বর্দ্ধন করিতে পারে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শঙ্কর মণ্ডন।

মণ্ডন। তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য নাই বা হইল—কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাদৃশ্য প্রতিপাদক হউক।

শঙ্কর। যদি সাদৃশ্য বোধক হয় তবে কি কেবল চৈতন্য সম্বন্ধে সাদৃশ্য বলা হইল অথবা সার্ব্বজ্ঞ্য, সার্ব্বাত্ম,সর্ব্ব শক্তিত্ব প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে? চৈতন্য সাম্য সকলেরই বিদিত তাহার উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি সার্ব্বজ্ঞ্যাদি সাম্য হয় তবে তোমার নিজের সিদ্ধান্তেরই বিরুদ্ধ হয়, কারণ অভেদ ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতে পারে না।

মণ্ডন। পরমাত্মার ন্যায় জীবও নিত্য চিদানন্দময়, কিন্তু অবিদ্যাবৃত। "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্য নিত্য চিদানন্দ স্বরূপের সাম্যবোধক হইলেইত পূর্ব্বোক্ত কোন দোষ ঘটিবে না।

শঙ্কর। হে বিদ্বন্ যদি জীবকে অবিদ্যাবৃত নিত্য চিদানন্দ স্বরূপই বলিতে হইল তবে তত্ত্বমস্যাদিবাক্য জীবব্রহ্মের ঐক্য বোধক হইতে কোন আপত্তি দেখা যায় না, যেহেতু অজ্ঞান দশায় নিত্য চিদানন্দ স্বরূপের ন্যায় জীবব্রহ্মের ঐক্যেরও প্রকাশ না হইতে পারে।

মণ্ডন। হে যতিবর জীবব্রহ্মের চৈতন্য বিষয়ে সাম্যই বলা যাউক, যেহেতু জগৎ চিৎস্বরূপ হইতে উৎপন্ন। তদ্দ্বারা চার্ব্বাকের পরমাণুবাদ এবং সাংখ্যমতের প্রধানবাদ নিরস্ত করা হইয়াছে।

শঙ্কর। হে মণ্ডন, তাহা হইলে "তৎসদৃশ মস্তি" 'তাহা তোমারই ন্যায়' এই রূপ প্রয়োগ হইত, "তত্ত্বমসি" 'তুমিই তাহা' এইরূপ হইত না। আর "তদৈক্ষত" তিনি দেখিলেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জড়বাদ পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে, পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন নাই।

মণ্ডন। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য যদিও সাদৃশ্য বোধক না হউক তথাপি তাহাদের প্রতিপাদ্য অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষরূপ জ্যেষ্ঠ প্রমাণের বিরোধী, অতএব অসঙ্গত। তবে 'সাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে' এই বিধি অবলম্বন করিয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্য ও জপ করিতে হয় মাত্র।

শঙ্কর। অক্ষি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যদি ভেদ জ্ঞান লাভ হইত তবে শ্রুত্যুক্ত অভেদ বাক্যের বাধা হইত। কিন্তু ভেদ জ্ঞান অভাবাত্মক, অক্ষির সহিত তাহার সন্নিকর্ষ অসম্ভব। *

---

* কাগজ হইতে কলম ভিন্ন, কারণ কাগজের মধ্যে কলমের অভাব এবং কলমের মধ্যে কাগজের অভাব। কিন্তু এস্থলে যে কাগজ ও কলমের অন্যোন্যাভাব পদার্থই প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বিষয় তাহা নয়। এই মাত্র বলা যায় যে কাগজ যাহা কলমও যে তাহা এই ভাব পদার্থই প্রত্যক্ষ হইতেছে না। কাগজের মধ্যে যেমন তাহার শুক্ল বর্ণ আছে যদি তাহার মধ্যে কলম ও থাকিত তবে প্রত্যক্ষ হইত। ইহা হইতে অনুমান করা হয় কাগজ কলম হইতে ভিন্ন। কিন্তু অনেক বিষয় সত্য হইতে পারে অথচ অতি দূরাৎসামীপ্যাদিন্দ্রিয় ইত্যাদি কারণে প্রত্যক্ষ না হইতে পারে। তোমার হয়ত দৃষ্টি তীক্ষ্ণ দূরে একটি বৃক্ষ আছে তুমি দেখিতে পাও কিন্তু আমি পাই না, তাহা বলিয়া আমার অপ্রত্যক্ষ হওয়াতে ইহা প্রমাণ হইল না যে বৃক্ষ নাই, ঠিক এইরূপ অভেদ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ইহা প্রমাণ হয় না যে অভেদ নাই, ইহা বলা ঠিক্ হয় না যে প্রত্যক্ষ দ্বারা ভেদ জানা যায়। জীব ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধেও এই মাত্র বলা যায় অজ্ঞান দশায় প্রত্যক্ষদ্বারা অভেদ জানা যায় না। কিন্তু এরূপ বলিলে জ্ঞান দশার প্রত্যক্ষ শ্রুত্যুক্ত অভেদ বাদের সহিত বিরোধ হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অদ্বৈতবাদের বিরোধী এইরূপ ভ্রমে অনেকেই পড়িয়া থাকেন; কিন্তু অভাব অথবা নিষেধ বাক্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসম্ভব। প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত, অতএব ভাব পদার্থ সম্বন্ধেই তাহা সম্ভব। যেখানে প্রত্যক্ষ দ্রব্য নাই বলা

মণ্ডন। আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যখন জীবাত্মার এই ভেদ বোধক বিশেষণত্ব আছে তখন ভেদের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হইলেও সেই বিশেষণত্বের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ আছে।

শঙ্কর। গুণী ভিন্ন গুণ থাকিতে পারে না, অতএব কেবল বিশেষণত্বের ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ অনুমান করা যাইতে পারে না। অবশ্য সেই বিশেষণত্বের আশ্রয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় বলিতে হইবে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় আত্মা সেই আশ্রয়, যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্টত্ব নাই।

মণ্ডন। সেই বিশেষণত্বের আশ্রয় আত্মার সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ নাই বলিয়াছ, তাহা ভাল বলা হয় নাই, কারণ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না থাকিলেও চিত্তরূপ মানসেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আছে, যেহেতু চিত্ত এবং আত্মা উভয়ই দ্রব্য, পদার্থ।

শঙ্কর। আত্মা হয় বিভু (সর্ব্বগত) না হয় অণু, উভয়থা সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, যেহেতু সাবয়বের সহিতই সাবয়বের সন্নিকর্ষ দৃষ্ট হয়। আবার পূর্ব্বে যখন ভেদ ইন্দ্রিয়ের অবিষয় বলা হইয়াছে, তখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই চিত্তকেও ধরা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে চিত্ত কোন পৃথকইন্দ্রিয় নয়, প্রদীপের ন্যায় লোচনাদি ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যকারী মাত্র।

মণ্ডন। ইন্দ্রিয় লব্ধজ্ঞান যদিও ভেদের প্রমাণ না হউক তথাপি ভেদের সাক্ষি স্বরূপ হউক, কেহই নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করে না। সেই সাক্ষ্যের সহিত যখন বিরোধ হয় তখন তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য জীবেশ্বরের একত্ব বুঝাইতে পারে না।

শঙ্কর। অবিদ্যা মায়াযোগে জীব এবং ঈশ্বরের অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা স্বীকার করিয়াই কিন্তু শ্রুতি বলিতেছে কৈবল্যাবস্থায় তাহাদের অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষ হয়। শ্রুতির কথা এক অবস্থার, ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য আর এক অবস্থায়, প্রকৃতপক্ষে চক্ষুই অবস্থাভেদে ভিন্ন; অতএব বিরোধ হইতে পারে না। অথবা প্রত্যক্ষের সহিত বি রোধ হইলই বা, যেহেতু প্রত্যক্ষ জাত ভে জ্ঞান পূর্ব্ব প্রবৃত্ত অতএব দুর্ব্বল, তাহা চর প্রবৃত্ত শ্রুতি প্রতিপন্ন কৈবল্যাবস্থায় প্রত্যক্ষ অভেদ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবে।"

("পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্ব দৌর্ব্বল্যং" পূর্ব এবং পরজ্ঞানের যদি বিরোধ হয় তবে পূর্ব্বজ্ঞানই দুর্ব্বল। ইহার কারণ এই পূর্ব্ব জ্ঞান পরজ্ঞানের পরে জন্মে নাই অতএ ইহা পরজ্ঞানকে বাধিত করিয়া জন্মে নাই কিন্তু পরজ্ঞান পূর্ব্বজ্ঞানের পরে জন্মিয়াছে অতএব পূর্ব্বজ্ঞানকে বাধিত করিয়া জন্মিয়াছে। যেমন শুক্তিতে যখন রজত জ্ঞান

হয় সেখানে সেই দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই মাত্র সত্তা অস্বীকার করা হয়; কিন্তু অনেক স্থানে দ্রব্য থাকিয়াও প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। এমন কি কেহ যদি বলে যে সে এই গৃহে একটি ভূত দেখিতেছে, আমি তখন সেই গৃহের ভূত দেখিতেছি না বলিয়া তাহার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হইল না।

তখন প্রথমে শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, তার পরে শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞান হইলে পর রজত জ্ঞান ভ্রম বলিয়া জানা যায়। শুক্তি ক্ষণ, শুক্তি বলিয়া প্রত্যক্ষ না হয় তত-ক্ষণই রজত বলিয়াই বলা যায়, কিন্তু যখন শুক্তি বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় কে আর তখন তাহাকে রজত বলিয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞানের অবস্থাতেই জীব ব্রহ্মের ভেদ, জ্ঞান লাভ হইলে সে ভেদ থাকে না।)

মণ্ডন। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা অভেদ শ্রুতির বাধা না হইলেও অনুমানদ্বারা অভেদ শ্রুতির বাধা হয়, যেহেতু জীব অসর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, অচিৎ ঘটাদি যেমন চিন্ময়, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীবও সেইরূপ।

শঙ্কর। এই যে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভিন্নত্ব অনুমান করিতেছ তাহা কি বস্তুগত না কাল্পনিক। যদি বস্তুগত হয় তবে দৃষ্টান্ত হানি হইল, কারণ ঘটাদির অভিন্নত্ব সম্বন্ধে যখন কোন প্রতিযোগী প্রমাণ নাই, এবং জীবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে আছে তখন ঘটাদির দৃষ্টান্ত এস্থলে সঙ্গত হয় না। আর যদি ভেদ কাল্পনিক হয় আমরাও তাহা স্বীকার করি অতএব সাধনা নিষ্প্রয়োজন।

মণ্ডন। "স্বজ্ঞানাবাধ্য ভেদবত্ত্ব" অর্থাৎ স্বজ্ঞানদ্বারা ভেদ জ্ঞান বাধিত হয় না এই আমার সাধ্য—ঘটাদি স্থলে স্বজ্ঞানদ্বারা ঘট হইতে আমি পৃথক এই জ্ঞান বাধিত হয় না। তুমি বল স্বজ্ঞান দ্বারা ভেদজ্ঞান বাধিত হয়। অতএব দৃষ্টান্তহানিও হয় নাই, সাধনাও নিষ্প্রয়োজন নয়।

শঙ্কর। স্ব শব্দদ্বারা কি তুমি সুখ দুঃখাদিমান্ অথবা তদ্ভিন্ন আত্মা বলিতে চাও। যদি প্রথমার্থ হয়, আমরাও তাহা স্বীকার করি, তাহা সাধ্য বিষয় নয়। যদি শেষোক্ত অর্থ হয় তবে আবার তোমার দৃষ্টান্ত হানি হইল। কারণ যে অবস্থায় স্বজ্ঞান দ্বারা ভেদ জ্ঞান বাধিত হয় না আর যে অবস্থায় স্বজ্ঞান দ্বারা ভেদ জ্ঞান বাধিত হয় এই দুই সম্পূর্ণ পৃথক।

ক্রমশঃ।

যোগিয়া।

বহু দিন পরে আজি মেঘ গেছে চ'লে,
রবির কিরণ সুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে
আলোক ঝলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন
প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে।

জুঁই সরোবর তীরে
নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তার;
বরষার বৃষ্টি ধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
আজিকে আপন প্রাণে
না জানি বা কোন্ খানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কেরে!

ধীরে ধীরে সুর তার
মিলাইছে চারি ধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছ পালা চারি ভিতে
সঙ্গীতের মাধুরীতে
মগ্ন হ'য়ে ধরে স্বপ্ন ছবি।
এ প্রভাত মনে হয়
আরেক প্রভাত ময়,
রবি যেন আর কোন রবি।
ভাবিতেছি মনে মনে
কোথা কোন উপবনে
কি ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা,
একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি!
তার কি পায়ের কাছে
বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলো ছায়া পড়েছে কপোলে!
মলিন মালাটি তুলি
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে!
বিষাদ কাহিনী তার
সাধ হয় শুনিবার,
কোন্ খানে তাহার ভবন।
তাহার আঁখির কাছে
যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।
একিরে আকুল ভাষা!
প্রাণের নিরাশ আশা,
পল্লবের মর্ম্মরে মিশালো!

না-জানি কাহারে চায়
তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কতনা প্রাতে
চাহিয়া আকাশ পাতে
কত লোক ফেলেছে নিঃশ্বাস,
সে সব প্রভাত গেছে
তা'রা তার সাথে গেছে
লয়ে গেছে হৃদয়-হুতাশ।
এমন কত না আশা
কত ম্লান ভালবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
তাদের হৃদয় ব্যথা
তাদের মরণ গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া।
পরস্পর পরস্পরে
ডাকিতেছে নাম ধরে
কেহ তাহা শুনিতে না পায়!
কাছে আসে বসে পাশে,
তবুও কথা না ভাষে
অশ্রু জলে ফিরে ফিরে যায়।
চায় তবু নাহি পায়
অবশেষে নাহি চায়,
অবশেষে নাহি গায় গান,
ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া
বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজতরঙ্গিণী।*

ভূষাভোগী ফণারত্নরোচিঃ সিচয়চারবে।
নমঃ প্রলীনমুক্তায় হরকল্পমহীরুহে ॥ ১
ভালং বহ্নিশিখাঙ্কিতং দধদধি শ্রোত্রং বহন্
সম্ভৃত—
ক্রীড়ৎকুণ্ডলজৃম্ভিতং জলধিজচ্ছায়াচ্ছকণ্ঠ-
চ্ছবিঃ।
বক্ষো বিভ্রদহীনকঞ্চুকচিতং বদ্ধাঙ্গনার্দ্ধস্য বো
ভাগঃ পুঙ্গবলক্ষ্মণোঽস্তু যশসে বামোঽথবা
দক্ষিণঃ ॥২

পণ্ডিত প্রবর কহ্লন যাঁহার মঙ্গলাচরণ করিয়া কাশ্মীরের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অদ্য আমরা সেই দেবাধিদেব কৈলাসনাথের স্তুতিগান প্রবন্ধের শীর্ষ মুকুট স্বরূপ সংযুক্ত করিয়া সেই ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর্য্যগণের অমৃত প্রসবিনী লেখনী প্রসূত যে কয়েকখানি প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিনী" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গুর্জ্জরের "রাসমালা" ত্রিপুরার "রাজমালা" উৎকল দেশের "মাদলাপাঞ্জী" ও রাজস্থানের চারণদিগের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি ভারতীয় ইতিহাস সমস্তই রাজতরঙ্গিনী অপেক্ষা আধুনিক। রাজতরঙ্গিনী ভারতের একটী ক্ষুদ্র অংশের ইতিহাস হইলেও ইহাতে ভারতীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্ম কিম্বা সমাজ বিপ্লবের সুন্দর ছায়া লক্ষিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের সাহায্যে আমরা সেই লোম হর্ষণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং তাহার নায়ক যুধিষ্ঠিরাদির সময় নির্ণয় করিতে সক্ষম হই। এই গ্রন্থে ৬৫৩ কলিগতাব্দ হইতে খ্যাত নামা মোগল সম্রাট জালালোদ্দিন আকবর কর্ত্তৃক কাশ্মীরবিজয় অর্থাৎ ১৪৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

রাজতরঙ্গিনী চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ভাগের রচয়িতার নাম কহ্লণ পণ্ডিত। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম রাজাবলী, জোনরাজ ইহার লেখক। শ্রীবর পণ্ডিত তৃতীয় ও প্রাজ্যভট্ট চতুর্থ ভাগের রচনা করিয়া "রাজতরঙ্গিনী" সমাপ্ত করিয়াছেন।

কহ্লণ পণ্ডিত কাশ্মীর দেশীয় মহামাত্য চম্পক প্রভুরপুত্র। তিনি ১১৪৮ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থ ৮ তরঙ্গে বিভক্ত। ইহাতে ৭৮৫০ শ্লোক আছে। ২৫২৬ পূর্ব্বশকাব্দ হইতে ১০৭০ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫৯৬ বৎসরের ইতিহাস কহ্লন লিখিয়া গিয়াছেন।

জোনরাজার রাজাবলীতে দুইটী তরঙ্গ আছে। তাহার শ্লোকসংখ্যা ৯৮০। জোনরাজ ১৩৭৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

* রাজতরঙ্গিনী। শ্রী লোকনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জোনরাজের পরবর্ত্তী শ্রীবর পণ্ডিত রাজতরঙ্গিনীর তৃতীয় ভাগ "জৈন রাজতরঙ্গিনী" প্রণেতা। ইহাতে চারিটী তরঙ্গ ও ২২২৫ কবিতা আছে। শ্রীবর পণ্ডিত ১৩৯৯ শকাব্দ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন।

প্রাজ্য বা প্রাজ্জভট্টকৃত চতুর্থ ভাগ রাজতরঙ্গিনীতে কোন তরঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৩৫ কবিতা আছে। ইহার নাম "রাজাবলী পতাকা"

সমগ্র রাজতরঙ্গিনীতে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশটী তরঙ্গ ও ১২০২০ কবিতা আছে।

এই অমূল্য ইতিহাসগ্রন্থ গুণগ্রাহী আকবরের হস্তগত হইলে তিনি ইহা অনুবাদ করিতে অনুমতি দেন। তাহার অনুমত্যানুসারে খ্যাত নামা আবুল ফাজেল পারস্য ভাষায় রাজতরঙ্গিনীর অনুবাদ করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গিরের আদেশানুসারে মহম্মদ আলি ও অন্য এক ব্যক্তি এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ফরাসী ভ্রমণকারী ডাক্তর বর্ণিয়ার, সম্রাট ঔরংজীবের সহিত কাশ্মীরে গমন করিয়া কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের দ্বিতীয় খণ্ডেই এই দেশের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিয়ার ভারতের প্রায় সকল প্রদেশই দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাশ্মীর ও আমাদের জন্মভূমি বাঙ্গালারই সমধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে "মোগলেরা যে কাশ্মীরকে ভূসর্গ বলিয়া উল্লেখ করেন ইহা আমার নিকট কোন মতেই অসঙ্গত বোধ হইল না। তিনি ভুবনমোহিনী কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।† তাহার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

তৎপর আরও ২।৩ জন মুসলমান রাজতরঙ্গিণী অবলম্বন করিয়া কাশ্মীর দেশের ইতিহাস পারস্য ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ১১৪০ হিঃ অব্দে নারায়ণকুল নামক জনৈক কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "তওয়ারিখে কাশ্মীর" প্রণয়ন করেন।

এসিয়াটীক সোসাইটীর স্থাপন কর্ত্তা মাননীয় উইলিয়ম জোন্স এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। ১৮০৫খৃঃ অব্দে খ্যাতনামা কোলব্রুক সাহেব কলিকাতা নগরীতে জনৈক মৃত ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকারী হইতে এক খণ্ড রাজতরঙ্গিনী ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে স্পিক সাহেব লক্ষ্ণৌনগরে আরও একখণ্ড হস্ত লিখিত রাজতরঙ্গিণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে পণ্ডিত প্রবর হোরেস হেমন উইলসন সাহেব কলিকাতায় আরও একখণ্ড রাজতরঙ্গিণী ক্রয় করিতে সক্ষম হন।

পণ্ডিত প্রবর উইলসন এই তিন খণ্ড হস্ত লিখিত রাজতরঙ্গিণী ও কতকগুলি অনুবাদ অবলম্বন করিয়া "কাশ্মীরের হিন্দু

† Berniers Travels in the Mogul Empire. Vol 11 p 131.

ইতিহাস" শীর্ষক একটী সুদীর্ঘ ও উপাদেয় সন্দর্ভ লিখিয়া গিয়াছেন। *

এসিয়াটীক সোসাইটীর যত্নে রাজতরঙ্গিণী দেবনাগর অক্ষরে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। সোসাইটী সাধারণের সুবিধার জন্য সমগ্র গ্রন্থ তিন ও চারি টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তক সোসাইটীতে আর সুপ্রাপ্য নহে। যাহা হউক আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে "দেশীয় রাজা ও জমিদারদিগের ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ ঘোষ রাজতরঙ্গিণীর মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা লোকনাথ বাবুর সাধু সঙ্কল্পের জন্য তাহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ঈশ্বর লোকনাথ বাবুর অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। রাজতরঙ্গিণীর এক এক খণ্ড বঙ্গবাসীদিগের গৃহে গৃহে রক্ষিত হউক ইহাই আমাদের অভিলাষ। কিন্তু আমাদের এই অভিলাস পূর্ণ হইবে কি? যে দেশে "লণ্ডন রহস্যের" সহস্র সহস্র গ্রাহক, সেই দেশে রাজতরঙ্গিনীর আদর হইবে কি? বঙ্গবাসী অধঃপাতে যাইও না। একবার তোমরা মূল্য হীন কাচ পরিত্যাগ করিয়া মরকত মণির আদর কর। একবার তোমরা বিলাতি তামা মিশান সোনা পরিত্যাগ করিয়া দেশী স্বর্ণকারের খাটী সোনা গ্রহণ কর।

এক্ষণে আমরা কহ্লণকৃত রাজতরঙ্গিণী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কহ্লণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক বৃন্দ ও স্বীয় গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

* * * *
* * * *

পণ্ডিত প্রবর কহ্লণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সমূহ দেশপ্রচলিত প্রবাদ হইতে সংগ্রহ করেন নাই। তাহার পূর্ব্বেও কাশ্মীরে কয়েক জন ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কহ্লণ সেই সকল ঐতিহাসিকদিগের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-গ্রন্থ ও প্রাচীন শাসন পত্রাদি অবলম্বন করিয়া কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।

কাশ্মীরের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে "কাশ্মীর উপত্যকা রূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে একটী হ্রদ ছিল। তাহার নাম সতী সরোবর। বর্ত্তমান কল্পারম্ভে মরীচি পুত্র, প্রজাস্রষ্টা মহর্ষি কশ্যপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের "সাহায্যে ঐ সতী সরের অভ্যন্তরস্থিত জলোদ্ভব প্রদেশ আঘাত করিয়া ঐ হ্রদ হইতে প্রথমে কাশ্মীর প্রদেশ সৃজন করেন।"

মহাভারতে হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী জলোদ্ভব প্রদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। খ্যাত নামা ভৌগোলিক পণ্ডিত মেজর রেনেল সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন।

So far am I from doubting the tradition respecting the existence of the Lake that covered Cashmere; that appearances alone would serve to convince me, without either the tradition or the history." †

ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত কাশ্মীরের ন্যায় ভারতের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে ও পর্ব্বত মধ্যস্থিত হ্রদ হইতে এইরূপ একটী মনোহর উপত্যকা প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। সেই সরোবরের নাম "লগতাক" ও তদুদ্ভূত প্রদেশ "মিতাইলেইপাক"; মানচিত্রে এই

* A. R. Vol. XV.

† Memior of a map of Hindoostan or the mogal Empire, by Rennell. page 107.

উপত্যকা "মণিপুর" আখ্যা দ্বারা চিত্রিত। কিন্তু আমরা ইহাকে "জাল মণিপুর" বলিয়া থাকি।

মহর্ষি কশ্যপ কাশ্মীরের প্রথম নিবাসী। পৌরাণিক মতে কশ্যপ হইতে দেব, দানব, মানব ও পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুর উৎপত্তি। এমতাবস্থায় কাশ্মীরকে আর্য্যজাতির সূতিকা গৃহ বলিতে পারা যায় কি?

নাগরাজ নীল কাশ্মীরের প্রথম শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর রাজশ্রেণীর শীর্ষদেশে আমরা গোনার্দ্দের নাম দেখিতে পাই। ‡ ইনি শ্রীকৃষ্ণের শত্রু জরাসন্ধের প্রিয় সুহৃদ ছিলেন। জরাসন্ধ যৎকালে মথুরা অবরোধ করেন, সেই সময় গোনার্দ্দ সসৈন্যে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে কৃষ্ণের হস্তে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বলা বাহুল্য যে এই সময়ে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্তের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই সময় সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে সপ্তর্ষি মণ্ডল এক হইতে অন্য নক্ষত্রে গমন করিতে এক শতাব্দী অতীত হয়। সুতরাং তদনুসারে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ২৫২৬ পূর্ব্ব শকাব্দে বা বর্ত্তমান সময় হইতে (২৫২৬+১৮০৫=) ৪৩৩১ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ৬৫৩ কলি গতাব্দে যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সমসাময়িক গোনর্দ্দ জীবিত ছিলেন।

গোনার্দ্দর পর তাঁহার পুত্র দামোদর সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্য শাসন কালে একটী স্বয়ম্বর উপলক্ষে যদুবংশীয়গণ গান্ধার রাজ্যে গমন করিতেছিলেন। দামোদর পিতৃ শত্রুকে নিকটে পাইয়া আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না। সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমেই স্বয়ম্বর প্রার্থী কন্যার প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের চক্র দামোদরের রুধির পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। দামোদরের মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্ঞী যশোবতী অন্তঃসত্বা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজপত্নীকে কাশ্মীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার গর্ভে দ্বিতীয় গোনার্দ্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজার শৈশবাবস্থায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হইয়াছিল। কহ্লণ বলেন শিশু বলিয়া কোন পক্ষই এই বিষমসমরে কাশ্মীর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই।

দ্বিতীয় গোনার্দ্দের পর ৩৫ জন রাজার নাম বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। কোন হিন্দু ঐতিহাসিক তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই। †

তৎপর লব, তৎপর তাঁহার পুত্র কুশেশয়, তাহার পর তৎপুত্র খগেন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করেন। খগেন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতি সর্ব্ব প্রথম কাশ্মীরে প্রতিভাসিত হইয়াছিল।

মহারাজ সুরেন্দ্র, শাক্যসিংহের বহুকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শাসনকালে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, পণ্ডিত প্রবর উইলসন এই অংশটী গোপন করিয়াছেন। কিন্তু কহ্লণ স্পষ্টাক্ষরে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা গোপন করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। রামায়ণে বৌদ্ধদিগের উল্লেখ আছে। শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ জন বুদ্ধের নাম বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমতাবস্থায় শাক্যকুমার সিদ্ধার্থকে কোন মতেই আদি বুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার অসম্ভব বলিয়া অনুমান করা কোন মতেই সঙ্গত নহে।

শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ।

‡ গোনার্দ্দের পূর্ব্বে ৫২ জন নরপতি কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের নাম সুপ্রাপ্য নহে।

† মুসলমান ইতিহাস এস্থলে ২৫ জন রাজার নাম প্রকাশ করিয়াছে।

দূরে ঘড়ির শব্দ শ্রবণে।

১

যেমন বাজে—তেমনি বেজে যায়,
যেমন আসে—তেমনি চলে যায়,
আধ,প্রাণেতে ভাসে,আধ প্রাণেতে মিলায়!

২

বাতাসে মৃদু রণরণি, আকাশে মৃদু ঝনঝনি
শূন্যে শূন্যে এসে—শূন্যে শূন্যে গেল
কে কোথায়—কে কোথায়!

৩

শিশু হাসিল মধুহাসি, পাখী গাহিল মধুগান;
ধীরে,ফুটিল ফুলবালা,ধীরে বিকশি উঠে প্রাণ!

৪

সবাই হাসে খেলে, সবাই গান গায়,
সবাই আসে হেথা, সবাই চ'লে যায়!
কতকি আছে মনে, কতকি গেছি ভুলে,
কতকি রবে মনে কতকি যাব ভুলে!

৫

যেমন বাজে—তেমনি বেজে যায়,
যেমন আসে—তেমনি চ'লে যায়!
আধ,প্রাণেতে ভাসে,আধ প্রাণেতে মিলায়!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সৎসঙ্গ—(বেলেডাঙ্গা হইতে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত) এই মাসিক পত্রিকাখানি বৈশাখ মাস হইতে বাহির হইতেছে, আমরা ইহার তিন খণ্ড পাইয়াছি। সম্পাদক মহাশয়ের ভূমিকা পাঠে আমাদের যে রূপ উৎসাহ হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় রচনা সমূহে আমরা তাদৃশী প্রীতি লাভ করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে ভাল লেখা দেখিবার আশায় রহিলাম।

কি পাগল হইয়াছ"—স্ত্রীটা বলিল "চুপ কর—কথা কস্‌নে, আমি তাকে লাথি মেরে ফেলে দেব—আর তোকেও দূর করিব"—স্বামী বলিল—আচ্ছা আমি চুপ করিতেছি—কিন্তু তুমি আর অমন পাগলামী কথা কহিও না—একবার লক্ষ্মীর মত ইহার পানে দেখ দেখি—কে?" কিন্তু ইহাতে কোনই ফল হইল না, ক্রমশঃই উত্তরোত্তর যুদ্ধটা জাঁকিয়া আসিতে লাগিল, শেষে যখন মুখোমুখি হইতে হইতে হাতাহাতির জোগাড় হয় হয়—তখন বাহির রাস্তা হইতে একজন বৃদ্ধ পুরোহিত তাহাদের চীৎকার শুনিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাহাদের এই হাতাহাতি অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"বৎসগণ—তোমাদের কি হইয়াছে, ঝগড়া করিয়া কি সময় নষ্ট করা উচিত? স্ত্রীটা তখন গলবস্ত্র হইয়া বলিল—"হে গুরু, আমার স্বামীর আর কাজকর্ম্মে মন নাই, টাকা আনিতে পারে না, শীঘ্রই আমরা শুকাইয়া মরিব, আর একজন হতভাগা মেয়ের জন্য এই সব ঘটিতেছে," স্বামী বলিল—"উহার কথা শুনিবেন না—ও পাগল হইয়াছে—উহার মাথার ঠিক নাই, আমি এই জিনিসটি রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছি, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার পিতা যখন আমাকে কোলে লইয়া বসিতেন,—পিতার তখনকার চেহারা আমি ইহার ভিতর দেখিতে পাই।

এই বলিয়া সে পুরোহিতের হাতে আয়না খানি দিল। স্ত্রী বলিল "হাঁ হাঁ উহার মধ্যে চাহিয়া দেখ একজন ডাইনিকে দেখিতে পাইবে, আর ও যে কি পাগলামী বকিতেছে বুঝিতে পারিবে। ডাইনিটা ওকে দেখিতেছি পাগল করিয়াছে।

বৃদ্ধ পুরোহিত আয়নাখানি লইয়া দেখিলেন, অমনি তাঁহারো হৃদয় আশ্চর্য্যে পূর্ণ হইল, তিনি বলিলেন "বৎসগণ তোমরা উভয়েই এক মহা ভ্রমে পড়িয়াছ—আমার বোধ হইতেছে নরকের কোন প্রেতাত্মা তোমাদের লইয়া এইরূপে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, তোমাদের চোখ অন্ধ করিয়া দিয়াছে, সেই জন্যই তোমরা দুজনে ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু এই পবিত্র ধাতুর মধ্যে তোমার পিতাও নাই, আর কোন স্ত্রীলোকও নাই। এক বৃদ্ধ পুরোহিতের পবিত্র ছবি ইহার মধ্যে বিরাজমান। আর তোমরা ঝগড়া করিও না, তোমারদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক—এই পবিত্র জিনিসটি আমি লইয়া যাই, কেন না ইহা যার-তার হাতের যোগ্য নহে, ইহা দেবতাদের গৃহেই রাখা উচিত" বলিয়া তিনি তাহা লইয়া গেলেন।

জগতের যে দিকে চাহিয়া দেখি এই গল্পটি আমার মনে পড়িতে থাকে। এক জন এক মনে করিয়া কথা কহিতেছে—লোকে সে কথাগুলি লইয়া দশ রকম ভাবে বুঝিতেছে। একজন বাস্তবিক পক্ষে এক রকম লোক—কিন্তু ভিন্ন লোকে তাহাকে ভিন্ন রকমে দেখিতেছে, এমন কি, নিজেই সে নিজেকে আর এক রকম হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ভাবিতেছে। নৈয়ায়িকেরা একটা কথার মার পাঁ

করিয়া বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় বাধাইতেছেন—বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের কীট-চক্ষু দিয়া জগতের যতটুক দেখিতে পাইতেছেন, ততটুকই তাহার সীমা ভাবিয়া, মহা গণ্ডগোল করিতেছেন, যদি সেই গণ্ডির এক তিল এদিকে কি এক তিল ওদিকে কেহ পা বাড়াইতে যায়—ত অমনি তাহা কুসংস্কার বলিয়া তাঁহারা হাসিয়া উঠেন। যে বিশ্বটা তাঁহাদের করতলে অন্যে তাহা ছাড়াইয়া আর কোন চুলায় উঠিবে; !!!

এই সকল যতই দেখি—আমার যেন হাসি পায়, এই সত্য জগতের সত্যতা সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস জন্মে। শক্ত মাটি বলিয়া যাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছি, চোরাবালির মত কখন ভুস করিয়া আমাকে শুদ্ধ লইয়া তাহা পায়ের নীচে হইতে খসিয়া পড়িবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা যন মিথ্যাকে সত্য ভাবিয়া, ছায়াকে বস্তু ভাবিয়া তাহা ধরিতে ছুটিয়া চলিয়াছি আর সে ছায়া ক্রমাগত দূর হইতে দূরান্তরে সরিয়া পড়িতেছে—কোন জন্মে তাহাদের ধরিবার ত আমি আশা দেখিতেছি না। বাহির অর্থাৎ ছায়া ছাড়িয়া সেই ছায়ার কারণ মনকে যদি একেবারেই ধরিতে পারি—তাহা হইলেই এক মাত্র সত্য ধরিতে পারি,—মন দিয়া যদি মহামনকে ধরিতে পারি—আত্মা দিয়া যদি পরমাত্মাকে ধরিতে পারি—তাহা হইলেই মাত্র সত্য ধরিতে পারি।—

বাহিরের এ ছায়ার সহিত সত্যের আর কতটুক যোগ, যতটুকু মন ইহাতে মিশান ততটুকই ইহার সত্যের সহিত যোগ। সেই জন্য বরং লোকে যাহাকে স্বপ্ন বলে, কল্পনা বলে, তাহাও তাহাদের সত্য অপেক্ষা আমার সত্য মনে হয়, কেন না কল্পনার সঙ্গে স্বপ্নের সঙ্গে মনের ভাব অধিক মেশান—সেই জন্য যে ইহাতেই সত্যের অধিক আভাষ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া যদি কিছু থাকেত স্বপ্নই আছে—সবাই স্বপ্ন দেখিতেছি, স্বপ্ন বলিলে একটা কিছু দেখিতে পাই, সত্য বলিলে সে হিসাবে কিছুই দেখিতে পাই না। যাহা, কিছু না, এক হিসাবে এ জগতে তাহাই সত্য। কল্পনা, স্বপ্ন একটা সত্যের ছায়া ধরিয়া আছে বোধ হয়,—এ সত্য জগৎ যেন সেই ছায়ার আবার ছায়া, সুতরাং ইহার যদি সত্য কিছু থাকে সে এত সামান্য যে অনায়াসে তাহাকে, কিছুই না, বলা যায়। আর এই কিছুনাটাকে লইয়া সকলে একটা মহা কিছু প্রস্তুত করিয়া সাবানের ফেনার ন্যায় ক্রমশঃই ফুলাইয়া তুলিতেছে যখনি দেখি, তখনি মনের ভিতর ঘোর সমস্যা আসিয়া পড়ে? এ মায়ার আবশ্যক কি কিছুই বুঝিতে পারি না। অবশ্য কিছু আছে, নহিলে এ মায়ার সৃষ্টিই বা কেন? আমার কাছে ত এইরূপ মনে হয়—কিন্তু লোকে অন্য রকম বলে। লোকে বলে আমরা জাগিয়া ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা দেখি, যতটুক দেখি, ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার যতটুক যোগ, তাহাই সত্য, আর ঘুমাইয়া যাহা দেখি—কিম্বা ইন্দ্রিয় ছাড়া কল্পনা দিয়া যাহা দেখি সে সব মিথ্যা। কিন্তু এ কথা সত্য কি

না তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? আমি ফুলটি দেখিলাম—তাহার পাপড়িগুলি পর্য্যন্ত লোকে সত্য বলিল আর তার যে হাসি দেখিলাম তাহার নীরব কথাগুলি আমার কানে গেল—লোকে বলিল—তাহা কল্পনা অতএব মিথ্যা। আমি আজ জাগিয়া যখন নলিনীকে দেখিলাম তাহাকে দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিলাম লোকে বলিল তাহা সত্য,—কিন্তু স্বপ্নেও তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়া সুখী হইলাম—কেবল তাহাই নহে, সে দেখায় এতটা বেসী দেখিলাম—এতটা অধিক সুখ লাভ করিলাম—যাহা জাগিয়া পাই নাই। দেখার মধ্যে এমন একটা যে দেখার অতীত জিনিস আছে, সে কেবল এই স্বপ্ন হইতে আমি বুঝিতে পারিলাম, সুখের যে একটা এমন অসীম দৌড় আছে, স্বপ্নেই মাত্র তাহা অনুভব করিলাম, তাই বলিতেছি, স্বপ্নে আমি এমন জিনিস পাইলাম—যাহা জাগিয়া কখনও পাই না—পাইবার নয়, অথচ লোকে বলিল ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু ইহা যে মিথ্যা তাহা আমাকে কে বুঝায়? আমার ত তাহা মনে হয় না—আমার মনে হয় আমরা জাগিয়া যাহা দেখি তাহাই স্বপ্ন, আর যাহাকে আমরা স্বপ্ন বলি তাহাই যেন সত্যের আভাষ। সত্যের আভাষ এই জন্য বলিতেছি, একেবারে মনোরাজ্যে মনোময় হইয়া যাইতে না পারিলে আমরা এই মিথ্যা জগতে থাকিয়া খাঁটি সত্য কি করিয়া ধরিতে পারিব, তবে এখানে যতটুকু সত্য পাইতে পারি তাহা সত্যের ছায়া মাত্র। আমরা এখন যাহা সত্য বলিয়া মনে করি তাহা এই ছায়ার ছায়া।

স্বপ্ন, সত্যের ছায়া আর যাহাকে অনেক সত্য বল তাহা, সেই ছায়ার ছায়া, আমার এ কথায় অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন, তাঁহারা বলিবেন "তাহা কি করিয়া হইবে? আমরা আজ যাহা জাগিয়া দেখিতেছি কালও তাহাই দেখিব, রোজ রোজই আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদের স্মৃতি সেই কথার সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু স্বপ্ন দেখিলাম, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার আর কি কিছু রহিল? তাহা সত্য বলিয়া মনে করিতে পারি এমন চিহ্ন কি কিছু পাইলাম"—এ যুক্তি আমি মানি না। রোজ জাগিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতে অতীতের জাগ্রত অবস্থার সহিত মিল পাইতেছি এই জন্যই ইহা সত্য? এই ত যুক্তি? কিন্তু ঘুমান অবস্থায় আমরা যাহা দেখি যাহাকে স্বপ্ন বলে—তাহা যে একটির সহিত একটি সম্বন্ধবিহীন তাহা কে বলিল? স্বপ্নের কথা একটানা রূপে আমাদের মনেই থাকে না; সেজন্য খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কে জানে যদি সব স্বপ্ন সমান মনে থাকিত ত জাগ্রত অবস্থার মত তাহার মধ্যেই মিল দেখিতে পাইতাম না! মনে করিয়া দেখ যদি জাগ্রত অবস্থার স্মৃতি ঘুমন্ত সময়ের মত উলটা পালটা হইয়া যায় ত এখনকার ঘটনার মধ্যে আমরা কতটা মিল পাইয়া উঠি। যদি মনে কর কাল যাহাকে দেখিয়াছি আজ তাহাকে চিনিতে না পারিলাম—কাল যাহা করিয়াছি আজ তাহা ভুলিয়া গেলাম এইরূপ

হয়—তাহা হইলে ইহাও ত খাপছাড়া হইয়া পড়ে। তুমি বলিবে—কিন্তু তাহা যখন হয় না—তখন সব সত্য, সত্য বলিয়াই এরূপ হয় না।

আমি তাহা বলি না,—সেজন্য ইহাকে সত্য বলা যায় না, আমরা একটানা একটি অতি সুদীর্ঘ—স্বপ্ন দেখিয়া চলিয়াছি এই মাত্র বলিতে পারি, কিন্তু এ স্বপ্ন একবারত ভাঙ্গিয়া যাইবেই, আর যখন ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন যে জাগিয়া উঠিয়া এখনকার স্বপ্নের সহিত (যাহা সত্য ভাবিতেছি) তাহার মিল পাইব তাহা কে বলিল? এখন যাহাকে সত্য বলিতেছ ইহা স্বপ্ন নয় ত আর কি? ইহার যখন অবসান আছে তখন ইহাকে সত্য বল কি করিয়া? আমরা রাত্রে যে স্বপ্ন দেখি তাহার শেষ আছে, একরাত্রের স্বপ্নের সহিত অন্য রাত্রের স্বপ্নের যোগ নাই এই জন্যই ত তাহাকে তোমরা স্বপ্ন বল—তবে জীবনের এই সুদীর্ঘ জাগন্ত স্বপ্নের যখন শেষ রহিয়াছে তখন ইহাকেই বা সত্য বলিব কেন? বরং এক হিসাবে ঘুমকে জাগা বলিলে জাগাকে ঘুম বলিলেই কতকটা ঠিক হয়। কেন না একেবারে আমরা যে শেষ ঘুম ঘুমাইব সেই ঘুমেতেই আমরা যে সত্য জগতে পৌঁছিব, আমাদের এখনকার ঘুমের সহিত সেই শেষ ঘুমেরই বরং সাদৃশ্য আছে, জাগা অবস্থার সহিত তাহা নাই, সেই জন্যই এখনকার ঘুমটাতে জাগা অবস্থার অপেক্ষা সত্যের ছায়া অধিক, আর সেই জন্যই, ঘুমকে যদি জাগা বলা হয় আর জাগাকে ঘুম বলা হয়ত ঠিক হয়। এখনকার ঘুমকে যেমন শেষ ঘুমের ছায়া মনে হয় তেমনি এখন যাহাকে স্বপ্ন বলা যায় কে জানে তাহাই বা তেমনি ভবিষ্যতের সত্য-রাজ্যের ছায়া নয়? অর্থাৎ শেষ ঘুমাইয়া আমরা যাহা দেখিব, এখন ঘুমাইয়া আমরা যাহা দেখি তাহা তাহার আভাষ নহে? আমার কেমন মনে হয় এখনকার ঘুমন্ত জগৎ তখনকার ঘুমন্ত জগতের ছায়া।

ফুলের সৌন্দর্য্যে, পাখির গানে, শৈশবের খেলায়, যৌবনের প্রেমে, বার্দ্ধক্যের স্নেহে আমি ইন্দ্রিয়াতীত যে ভাব টুকু দেখিতে পাই—তাহাই আমার সত্যের কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। যখন রজনী আসে, জগতের গোলমাল নিভিয়া গিয়া একটি শান্তিময় ভাবে পৃথিবী ডুবিয়া যায়, যখন চারিদিকের বস্তু আবছায়া আবছায়া স্বপ্নের মতন আমার চোখে ভাসিতে থাকে, তখনই আমার যেন মনে হয় এই মিথ্যা জগৎ ছাড়াইয়া সত্য জগতের কিছু কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছি। যতটুক কল্পনাময়, যতটুক স্বপ্নময়,—যতটুক ইন্দ্রিয় দিয়া কম ছুইতে পারা যায়, তাহাই আমার কতকটা সত্য সত্য বলিয়া মনে হয়,—সেই জন্যই পদার্থ-জগৎ অপেক্ষা ভাবজগৎ আমার ভাল লাগে—বিজ্ঞান হইতে কবিতা আমার ভাল লাগে, বুদ্ধি হইতে হৃদয় বেশী ভাল লাগে।

ইহাদের ভাল লাগে বলিয়া আমার সত্য মনে হয় না, সত্য মনে হয় বলিয়া ভাল লাগে। সচরাচর ও সাধারণতঃ ধরিতে

গেলে, স্বপ্নে আমরা যতটা ইন্দ্রিয়াতীত হই এমন আর কোন অবস্থায় নহে, কোন কোন সময় ও বিশেষ স্থল ছাড়া জাগ্রত কল্পনাতে আমরা যতই কেন ইন্দ্রিয় ছাড়াইয়া যাই না তবু জাগিয়া থাকি বলিয়া ইন্দ্রিয়ের কার্য্য তখন এত পূর্ণ মাত্রায় চলিতে থাকে, যে তখন স্বপ্নের মত অতটা ইন্দ্রিয়াতীত হইতে আমাদের দেয় না। না দেখিয়া না শুনিয়া স্বপ্নে আমরা যতটা সেই সকল ভাব অনুভব করি—সাধারণ কল্পনা তাহা দিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, স্বপ্নের সুখ দুঃখ অনুভূতি যেমন প্রখর যেমন অমিশ্র জাগ্রত অবস্থায় তাহা হয় না। স্বপ্নে যথার্থই নন্দন কাননের সুখ ও নরকের যন্ত্রণা অনুভব করা যায়। সেই জন্যই ত মনে হয় স্বপ্নে পরের সত্য জীবনের ইন্দ্রিয়াতীত অনুভাবের আমরা আভাষ পাই। এখনকার স্বপ্নের সুখ দুঃখ ভাঙ্গা পড়িতেছে, কেননা আমরা প্রকৃতরূপে ঘুমাইতেছি না, প্রকৃত স্বপ্নও দেখিতেছি না। এখনকার স্বপ্নে সুখ দুঃখের প্রখরতা যতই অধিক হউক না কেন, তা অল্পক্ষণের জন্য আমরা অনুভব করি— হয়ত অনুভব করিতে না করিতে তা ফুরাইয়া যায়—কিন্তু যখন ভাল করিয়া ঘুমাইব, প্রকৃত স্বপ্ন দেখিব—তখন কি আ এমন হইবে? এমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা সু দুঃখ ভোগ করিব? যে অবস্থার ছায়ামাত্র এখনকার স্বপ্নে প্রতিভাত হইতেছে আমার মনে হয়—যখন সত্যই সেই স্বপ্ন দেখিতে হইবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শূন্য হইয়া কেবল মনোময় অবস্থাতে কাটাইতে হইবে, তখনকার সেই স্বপ্নের সুখ দুঃখের তীব্রতা কত গভীর, সে স্বপ্নের স্থায়ীত্ব কালের যে সীমা কোথায়, তাহা কি এখন আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি? তবে ইহা মনে হয় যদি পাপীদের নরকযন্ত্রণা থাকে তবে সেই একটানা দুঃখ-স্বপ্নই তাহাদের নরক, আর দূর দূরান্তরব্যাপী সুদীর্ঘকাল-পরিমিত কল্পনাতীত অতি গভীর পুণ্যময় সুখস্বপ্নই পুণ্যাত্মাদের স্বর্গভোগ।

সরোজিনী প্রয়াণ।

কোথায় সেই অবিশ্রাম জলকল্লোল, শত লক্ষ তরঙ্গের অহোরাত্র উৎসব, কোথায় সেই অবিরল বনশ্রেণী, আকাশের সেই অবারিত নীলিমা, ধরণীর নবযৌবনে পরিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই অনন্তের দিকে চির-উচ্ছ্বসিত বিচিত্র তরুতরঙ্গ, কোথায় সেই প্রকৃতির শ্যামল স্নেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শিশু লোকালয় গুলি—ঊর্দ্ধে সেই চিরস্থির আকাশ নিম্নে সেই চির চঞ্চল স্রোতস্বিনী— এই চিরস্তব্ধের সহিত চিরকোলাহলময়ের

সমানের সহিত চিরবিচিত্রের, নির্ব্বি রের সহিত চিরপরিবর্ত্তনশীলের অবি দ প্রেমের মিলন কোথায়! এখানে কিতে ইঁটেতে, ধুলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠ-যোগ চলিতেছে। খানে চারিদিকে দেয়ালের সহিত দেয়ালের, দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার, চাপকানের সহিত বোতামের আঁটাআঁটি মিলন দেখা যাইতেছে। খানে রোজ সকালে ভিজে ভিজে খবরের কাগজ আসে; কার ঘরে কে সিঁদ কাটিয়াছে, কার কুমড়ায় কে তরকারী রাঁধিয়াছে, সে সমস্ত খবর পাওয়া যায়; লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর শেয়ালদহে বুটক্ষেপ করিলে কয়টা তোপ পড়িয়াছিল ও কয়টা বড় লোক মাথায় পাগ্‌ড়ি পরিয়া হাজ্‌রি দিতে গিয়াছিল তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা একেবারে দূর হইয়া যায়—কোথায় কোন্ প্রবল প্রতাপান্বিত বাঙ্গালী ম্যাট্‌সিনি বালকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবল তেজে গরম হইয়া উঠিয়া সাহেব-সুবার প্রতি খ্যাঁক্‌খ্যাঁক্ করিয়া গিয়াছিল, অবশেষে চাবুক খাইয়া কেঁই কেঁই করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছে প্রাতঃকালে উঠিয়াই জলগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই সেই সকল আমোদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমি যদি বা খবরের কাগজ না পড়ি অন্য পাঁচ জন আমার কানের কাছে চেঁচাইয়া পড়িতে থাকে। আমার সরোজিনী-প্রয়াণ পড়িয়া কোন্ কাগজ না বুঝিয়া প্রশংসা করিয়াছে, কোন্ কাগজ ভালরূপ বুঝিয়া গালাগালি দিয়াছে তাহার প্রত্যেক অক্ষর চোখে পড়ে—যদি বা আমার নজর এড়াইয়া যায়, আমার হিতৈষী পাঁচজন সেইখানে পেন্সিলের দাগ দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দেয়।

পাঠকেরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এত দিন সরেজমিনে লেখা চলিতেছিল—সরে-জমিনে না হউক্ সরে-জলে বটে—এখন আমরা ডাঙ্গার ধন ডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন সেখানকার কথা এখানে, পূর্ব্বেকার কথা পরে লিখিতে হইতেছে—সুতরাং এখন যাহা লিখিব তাহার ভুলচুকের জন্য দায়ী হইতে পারিব না।

এখন মধ্যাহ্ন। আমার সমুখে একটা ডেস্ক, আমার বেতের চৌকিতে ছারপোকা এবং আমি, (নানা উপায়ে আমি তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিলাম না, এখন তাহারা আমাকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টায় আছে)—পাপোষে একটা কালো মোটা কুকুর ঘুমাইতেছে—বারান্দায় শিকলি-বাঁধা একটা বাঁদর লেজের উকুন বাছিতেছে, তিনটে কাক আলিসার উপরে বসিয়া অকারণ চেঁচাইতেছে এবং এক-একবার থপ্ করিয়া বাঁদরের ভুক্তাবশিষ্ট ভাত এক-চঞ্চু লইয়া ছাতের উপরে উড়িয়া বসিতেছে। ঘরের কোণে একটা প্রাচীন হর্ম্মোনিয়ম বাদ্যের মধ্যে গোটাকতক ইঁদুর খট্ খট্ করিতেছে। কলিকাতা সহরের ইমারতের একটি শুষ্ক কঠিন কামরা, ইহারই মধ্যে আমি গঙ্গার আবাহন করিতেছি—তপঃক্ষীণ জহ্নু মুনির শুষ্ক পাকস্থলীর অপেক্ষা এখানে ঢের বেশী স্থান আছে। আর, স্থান-সঙ্কীর্ণতা প্রকৃ-

তির মধ্যে নাই। সে আমাদের মনে। দেখ—বীজের মধ্যে অরণ্য, একটি জীবের মধ্যে তাহার অনন্ত বংশ-পরম্পরা। আমি যে ঐ ষ্টীফেন সাহেবের একবোতল ব্লুব্ল্যাক্ কালী কিনিয়া আনিয়াছি, উহারই প্রত্যেক ফোঁটার মধ্যে কত পাঠকের সুগভীর সুষুপ্তি মাদার-টিংচর আকারে বিরাজ করিতেছে। ঐ কালীর বোতল দৈবক্রমে যদি এক জন সুকবির হাতে পড়িত—তবে ওটাকে দেখিলে ভাবিতাম, উহার মধ্যে না জানি কাহারা আছে! সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ধকারের মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অমর জগৎ যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল, তেমনি ঐ এক বোতল অন্ধকারের মধ্যে কত আলোকময় নূতন সৃষ্টি প্রচ্ছন্ন আছে। একটা বোতল দেখিয়াই এত কথা মনে উঠে, যেখানে ষ্টীফেন্ সাহেবের কালীর কারখানা সেখানে দাঁড়াইয়া একবার ভাবিলে বোধ করি মাথা ঠিক রাখিতে পারি না। কত পুঁথি কত চটি কত যশ কত কলঙ্ক, কত জ্ঞান কত পাগলামী কত ফাঁসির হুকুম যুদ্ধের ঘোষণা প্রেমের লিপি কালো কালো হইয়া স্রোত বাহিয়া বাহির হইতেছে! ঐ স্রোত যখন সমস্ত জগতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে--তখন——দূর হউক্, কালী যে ক্রমেই গড়াইতে চলিল, ষ্টীফেন সাহেবের সমস্ত কারখানাটাই দৈবাৎ যেন উল্টাইয়া পড়িয়াছে;—এবারে ব্লটিং কাগজের কথা মনে পড়িতেছে।—স্রোত ফিরান' যাক্। এস, এবার গঙ্গার স্রোত এস।

সত্য ঘটনা লিখিবার ভার লওয়া বিষম দায়। ইংরাজিতে একটা কথা চলিত আছে যে Truth is stranger than fiction তাই যদি সত্য হইবে তবে উপন্যাসের এত প্রাদুর্ভাব কেন? সত্যের এত অনাদর কেন? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—জগতে যে সত্য ঘটনা ঘটে, সে সকল গল্প লিখিবার উদ্দেশে ঘটে না, প্রকৃতির আর পাঁচরকম উদ্দেশ্য আছে। উপন্যাসে নায়ক যেমনি বলিলেন "প্রিয়ে" নায়িকা অমনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন 'হৃদয়বল্লভ''—গল্প অত্যন্ত জমিয়া গেল। আর সত্য-ঘটনায় রামকান্ত যখনি বলিলেন "ওরে আবাগী!" থাকমণি অমনি উত্তর দিলেন "কিরে পোড়ারমুখো," গল্পের কোনই সুযোগ হইয়া উঠিল না। উপন্যাসে নায়ক যখনই সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লতাবিতানের বাহিরে এক পা মাত্র বাড়াইয়াছেন, তখনই নায়িকা আছাড় খাইয়া পড়িয়া "হা হতোস্মি" ঠিক সময়মত বলিয়াছেন, সুতরাং করুণরসের প্রভাবে উপন্যাস এবং পাঠকের কোঁচাগ্র আর্দ্র হইয়া উঠে। কিন্তু রামকান্ত উক্ত নায়কের অনুসরণে যদি শ্রীমতী থাকমণির অনভিপ্রায়ে চৌকাটের বাহিরে পদার্পণ করেন তবে থাকমণি কোকিল-কাকলীর অবিকল অনুকরণ না করিয়া বলেন—"চুলোয় যাও, আর ফিরো না, আমার হাড় যুড়োক্।" করুণরসের যোগাড় হইয়া উঠে না। পোড়া সত্যঘটনার এমনি অসুবিধা যে মানুষ উপযুক্ত সময়ে মরেও না—যে সময়ে গালে হাত

দিয়া আকাশে-চাহিয়া থাকিবার কথা সেই সময়েই হয়ত বড় ক্ষুধা পাইল, সুমধুর প্রেম-সম্ভাষণ শেষ হইতে না হইতেই দৈবগতিকে উপর্য্যুপরি চারটে বিপর্য্যয় হাঁচি হাঁচিয়া ফেলে, নায়ক নায়িকার যখন প্রথম সম্মিলন তখন হয়ত নায়িকা পান্তভাতে তিন্তিড়ি মাখিয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আহার করিতেছেন ও ক্ষান্ত দিদি তাঁহার মাথা হইতে উকুন বাছিয়া দিতেছেন। অত কথায় কাজ কি, উপন্যাসে চার চোখে বিস্তর হাঙ্গাম হয়, আর সত্য ঘটনার শুষ্ক জমাখরচের মহলে চার চোখে ষোল গণ্ডার বেশী হয় না।

সত্যঘটনায় ও উপন্যাসে প্রভেদ আছে, তাহার সাক্ষ্য দেখ, আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল তবু ডুবিল না—পরম বীরত্ব সহকারে কাহাকেও উদ্ধার করিতে হইল না—প্রথম পরিচ্ছেদে জলে ডুবিয়া মরিয়া ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে কেহ ডাঙ্গায় বাঁচিয়া উঠিল না। না ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না। পাঠকেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিরাশ হইবেন, কিন্তু আমি যে ডুবি নাই সে আমার দোষ নয়, নিতান্তই অদৃষ্টের কারখানা। অতএব আমার প্রতি কেহ না রুষ্ট হন এই আমার প্রার্থনা।

মরিলাম না বটে কিন্তু যমরাজের মহিষের কাছ হইতে একটা রীতিমত ঢুঁ খাইয়া ফিরিলাম। সুতরাং সেই ঝাঁকানীর কথা বিলক্ষণ স্মরণ রহিয়া গেল। খানিকক্ষণ নির্বাক্ ভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করা গেল—সকলেরই মুখে এক ভাব, সকলেই বাক্যব্যয় করা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করিলেন। বৌঠাকরুণ বৃহৎ একটা চৌকির মধ্যে কেমন-একরকম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দুইটি ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক আমার দুই পার্শ্ব জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাদা কিয়ৎক্ষণ ঘন ঘন গোঁফে তা' দিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। কর্ত্তাবাবু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সমস্তই মাঝির দোষ," মাঝি কহিল, তাহার অধীনে যে ব্যক্তি হাল ধরিয়াছিল তাহার দোষ। সে কহিল—হালের দোষ। হাল কিছু না কহিয়া অধোবদনে সটান হইয়া জলে ডুবিয়া রহিল--গঙ্গা দ্বিধা হইয়া তাহার লজ্জা রক্ষা করিলেন।

এই খানেই নোঙর ফেলা হইল। যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস হইয়া গেল—সকাল বেলায় যেমনতর মুখের ভাব, কল্পনার এঞ্জিন-গঞ্জিনগতি ও আওয়াজের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল, বিকালে ঠিক তেমনটি দেখা গেল না। আমাদের উৎসাহ নোঙরের সঙ্গে সঙ্গে সাত হাত জলের নীচে নামিয়া পড়িল। একমাত্র আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমাদিগকেও অতদূর নামিতে হয় নাই। কিন্তু সহসা তাহারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে চৈতন্য জন্মিল। এ সম্বন্ধে আমরা যতই তলাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমাদের তলাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা মনে মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সময়ে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। বরিশালে যাইবার পথ অপেক্ষা বরিশালে না-

যাইবার পথ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে দাদা জাহাজের ছাতের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটা মোটা কাছির কুণ্ডলীর উপর বসিয়া এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে হাস্যকৌতুকের আলো জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কিন্তু বর্ষাকালে দেশালাই কাঠির মত সেগুলা ভাল করিয়া জ্বলিল না। অনেক ঘর্ষণে থাকিয়া থাকিয়া অম্‌নি একটু একটু চমক মারিতে লাগিল। যখন সরোজিনী জাহাজ তাঁহার যাত্রী সমেত গঙ্গাগর্ভের পঙ্কিল বিশ্রাম শয্যায় চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছেন তখন খবরের কাগজে কিরূপে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। আমরা কিছু-না-হইবত পঞ্চাশটি প্রাণী খবরের কাগজের Sad accident এর কোটায় একটি মাত্র প্যারাগ্রাফে চারিটি মাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিব সেই বিষয়ে নানাবিধ অনুমান করিতে লাগিলাম। এই সংবাদটি এক চামচ গরম চায়ের সহিত অতি ক্ষুদ্র একটি বটিকার মত কেমন অবাধে পাঠকদের গলা দিয়া নামিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করা গেল। বন্ধুরা বর্ত্তমান লেখক সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা কত বড় মহদাশয় লোকটাই গেছেন—এমন আর হইবে না!" এবং লেখকের পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা, দোষেগুণে জড়িত মানুষটা ছিল—যেমন তেমন হোক্ তবুত ঘরটা জুড়ে ছিল!" ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁতার মধ্য হইতে যেমন বিমল শুভ্র ময়দা পিষিয়া বাহির হইতে থাকে, তেমনি বৌঠাকুরাণীর চাপা ঠোঁটজোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে লাগিল।

আকাশে তারা উঠিল—দক্ষিণে বাতাস বহিতে লাগিল। খালাষীদের নেমাজ পড়া শেষ হইয়া গেছে। একজন ক্ষ্যাপা খালাষী তাহার তারের যন্ত্র বাজাইয়া এক-মাথা কোঁকড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল নাড়াইয়া পরম উৎসাহে গান গাইতেছে। ছাতের উপরে বিছানায় যে যেখানে পাইলাম শুইয়া পড়িলাম—মাঝে মাঝে এক একটি অপরিস্ফুট হাই ও সুপরিস্ফুট নাসাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বাক্যালাপ বন্ধ। মনে হইল যেন একটা বৃহৎ দুঃস্বপ্ন পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তব্ধভাবে চাপিয়া আমাদের কয়জনকে কয়টা ডিমের মত তা' দিতেছে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল মধুরেণ সমাপয়েৎ। যদি এমনিই হয়—কোন সুযোগে একেবারে কুষ্ঠির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়িয়াছি, যদি এ জাহাজ ঠিক বৈতরণীর পরপারের ঘাটে গিয়াই থামে—তবে বাজনা বাজাইয়া দাও—চিত্রগুপ্তের মজ্‌লিসে হাঁড়িমুখ লইয়া যেন বেরসিকের মত দেখিতে না হই। আর, যদি সে জায়গাটা অন্ধকারই হয় তবে এখান হইতে অন্ধকার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই কেন? তবে বাজাও! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটি সেতার বাজাইতে লাগিল! ঝিনি ঝিনি ঝিন্ ঝিন্ ইমন কল্যাণ বাজিতে লাগিল।

তাহার পরদিন অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল, জাহাজের এটা ওটা সেটা অনেক জিনিষেরই অভাব। সেগুলি না থাকিলেও জাহাজ চলে বটে কিন্তু যাত্রীদের আবশ্যক বুঝিয়া চলে না, নিজের খেয়ালেই চলে। কলিকাতা হইতে জাহাজের সরঞ্জাম আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে হইল। এখন কিছু দিন এইখানেই স্থিতি। গঙ্গার মাঝে মাঝে এক-একবার না দাঁড়াইলে গঙ্গার মাধুরী তেমন উপভোগ করা যায় না। কারণ, নদীর একটি প্রধান সৌন্দর্য্য গতির সৌন্দর্য্য। চারিদিকে মৃদু চঞ্চলতা, জোয়ার ভাঁটার আনাগোনা, তরঙ্গের উত্থান পতন, জলের উপর ছায়ালোকের উৎসব—গঙ্গার মাঝখানে একবার স্থির হইয়া না দাঁড়াইলে এ সব ভাল করিয়া দেখা যায় না। আর, জাহাজের হাঁস্‌ফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাষীদের গোলমাল, মায়াবদ্ধ দানবের মত দীপ্তনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, দুই পাশে অবিশ্রাম-আবর্ত্তিত দুই সহস্রবাহু চাকার সরোষ ফেন উদ্গার—এ সকল, গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গার সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্য্যতৎপর অতিসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায় কিন্তু রসজ্ঞের ইহা সহ্য হয় না। এ যেন আপিষে যাইবার সময় নাকে মুখে ভাত গোঁজা। অন্নের অপমান। পড়িবার সময় নাই বলিয়া সাতঙ্ক অভিজ্ঞান শকুন্তলকে আড়াই অঙ্কের মধ্যে ঠাসিয়া দিলে সে যেমন—ষ্টীমারে চড়িয়া ছুটিয়া চলা গঙ্গার তেম্‌নি একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গড়িয়া তোলা। এ যেন মহাভারতের সূচিপত্র গলাধঃকরণ করা। এ যেন একজামিনের পড়া মুখস্থ করা, যতটুকু না হইলে নয় ততটুকু পিণ্ড পাকাইয়া মগজের মধ্যে গুঁজিয়া রাখা।

আমাদের জাহাজ লৌহ শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতস্বিনী খর-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখন তরঙ্গসঙ্কুল, কখন শান্ত, কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙ্গন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক-এক জায়গায় কিনারা দেখা যায় না। আমাদের সম্মুখে পরপার মেঘের রেখার মত দেখা যাইতেছে। চারিদিকে জেলেডিঙ্গি ও পালতোলা নৌকা। বড় বড় জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীসৃপ-জল জন্তুর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে। তাহাদের কালো কোলো মুখগুলি জলের উপরে কৃষ্ণকমলের বন করিয়া রাখিয়াছে—চোকের তারাগুলিকে ভ্রমর বলা যাইতে পারে—কেবল অবাক্ ভাবে জাহাজের দিকে চাহিয়া থাকাতে কারো কারো শাদা দাঁত, এবং কারো কারো দাঁতের অভাব বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সে গুলার শাস্ত্রসম্মত তুলনা ঠিক খুঁজিয়া পাইতেছি না। রোদ্ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশবন খেজুরবন আমবাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক-একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙ্গার একটা বাছুর

আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গীতে আস্ফালন-পূর্ব্বক একটি বড় ষ্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানব-সন্তান ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন। যে কালো কাপড়খানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বেশী পোষাক পরা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ক্র... অন্ধকার হইয়া আসিল। তীরের কুটী... আলো জ্বলিল। সমস্ত দিনের জাগ্র... আলস্য সমাপ্ত করিয়া রাত্রের নিদ্রার অ... লস্যে মন দিলাম।

——:০:——

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কুসুম-মালা। শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত, মূল্য একটাকা। এ বই খা... ছোট ছোট অনেক গুলি কবিতা... তন্মধ্যে "মানস বাসিনী," "হাসি" কেরূপে বংশীধ্বনি," "আলোকে অন্ধকার," "কোন পরিচিতের মৃত্যু ঘটনাতে," "ঐ," "সুখচর," "কালবৃক্ষ," প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা পড়িয়া আমরা বড়ই তৃপ্ত হইলাম। এ বই খানির পরিস্ফুট সরল ভাষা ছাড়িয়া—ইহার স্থানে স্থানে ভাবের যে একটি গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে লেখকের হৃদয় হইতে এই কবিতা গুলি স্বতঃ উৎসারিত। টানা বোনা জোড়া তাড়া দেওয়া নহে।

কেহ কেহ বই খানি পড়িয়া বলিতে পারেন যে সেই সিন্ধু তট, সেই পাখী, সেই বন, সেই নদী, সেই কানে কানে কথা কওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি, ইহাত আমরা চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি, একদফা এ সব কথা ইংরাজিতে রাশি রাশি পড়িয়া আশ মিটিয়াছে, আর ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ এক কথা ভাল লাগে না, এখন কিছু নতুন রকম শোনাও ত শুনি' তাহা সত্য, এবং ইহাও সত্য যে সমালোচকগণ ঐ এক বাঁধাগত আওড়াইয়া কবিদিগকে মাটি করিতে চেষ্টা করেন, ফলতঃ তাঁহাদের সে চেষ্টা বৃথা, কারণ যতদিন চ... ...র্য্য, নীলআকাশ আমাদিগের হৃদ... পবিত্র আনন্দ প্রদান করিবে, যতদিন স্নেহ প্রে... স্ফকরুণা থাকিবে, ততদিন পৃথিবী হই... এরূপ কবিতা লেখা কদাচই উঠিয়া যাই... না। কাহারও পড়িতে ইচ্ছা হয় পড়িবে... কাহারও কৃপা করিয়া ভাল বলিতে ই... হয় বলিবেন, তাহাতে উদার-হৃদয় ক... দিগের কিছু মাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ... জগতে যাহা উত্তম যাহাই উপকারী তাহা... থাকিবে, ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়ম, তু... সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহার অন্যথা করি... পারিবে না। দেশে ভাল কবিতার আ... দানি হইলেই আপনা হইতে কষ্ট ক... দিগের কবিতার উচ্ছ্বাস থামিয়া যাইবে... ইহাই স্বতঃ সিদ্ধ।

এই পুস্তক খানি হইতে আমরা কি... কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"হাসি"।

———

সে হাসি যখন আসি উজলিল নয়নে
চমকিল আচম্বিত
এ মোর চকোর চিত
জাগাইয়া যত মোর শৈশবের স্বপনে
জ্ঞান হোল তাবে আঁখি যেন কোথা হেরে...
যেন তারে জন্মান্তরে
দেখিছি স্বপন ঘোরে
...র মাধুরী আজো তাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা রয়েছে

* * * *

...র হাসি দিয়ে আমি তারে এবে জেনেছি
ওই বটে সেই জন
সেই মোর স্বপ্ন ধন
...ন্ম জন্ম যারে আমি প্রাণে ভাল বেসেছি

———

"কোন পরিচিতের মৃত্যু ঘটনাতে"

———

...জানি আমি এ জীবন অনিত্য, হরিষ!—
...নিয়াও জানিত না এ পোড়া হৃদয়;
...রাশা যন্ত্রণানলে জ্বলিয়া আবার
...সিতাম কুতূহলে সুখসিন্ধু নীরে;
...খিতাম কত ফুল—কত পত্রদল—
...বিরত ধীরে ধীরে ঝরিত কাননে,
...বিতাম পুনরায় ফুটিবে কুসুম—
...রায় নবপত্র সাজাবে তরুরে;
...ন্তু না হইত মনে ভ্রমেও কখন—
...কবার যে কুসুম—যেই পত্রদল—
...তলে ঝরিয়া পড়ে, সে নাহি আবার
...ভে তরুপরে, কোথা যে শুকায়ে যায়
...ড়িয়া ভূতলে, হায়, কে বলিতে পারে?"
ইত্যাদি।

"সুখচর"।

———

মধুর বসন্ত-নিশি—প্রভাত মধুর—
...ধুর ঘুমের ঘোরে পশিত শ্রবণে
...স্ফুট বিহঙ্গ-কুল-কাকলি লহরী
...তায়ন সন্নিহিত শাখাদল হ'তে,
...ঝে মাঝে সকরুণ "বউ কথা কও"!—
বউ কথা কও" রবে ব্যথিত হৃদয়;
ভাবিতাম এতকিরে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা—
...ত যদি বাজে প্রাণে, তবে কি কারণ—
...া দোষে মিছা ভ্রমে মানেতে মজিয়ে,
...র জনে প্রিয়জন দেয় এ যাতনা!
শুনিতাম সুখে শুয়ে এ সকল রব

নীরব সময়ে সেই;—প্রভাত সমীর—
গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গ নির্জ্জন পুলিনে—
অনিবার সেই ধ্বনি স্বপনের মত—
ধীরে ধীরে প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে॥"

———

ঐ

———

"কাননের পাখী ও যে থাকিত কাননে—
কাননে যাহার বাস,
কাননে যাহার আশ,—
কানন-সুষমা যার সতত নয়নে
ভাসিতেছে নানা বর্ণে—
ফুলে ফুলে শ্যাম পর্ণে—
কানন-সঙ্গীত যার সতত শ্রবণে।
এ হেন বনের পাখী
পিঞ্জরে বাঁধিয়ে রাখি,
কেন এ যাতনা তারে দিবে অকারণে;—
দাও পাখী ছেড়ে দাও যাক্‌সে কাননে।
সাধের কাননে গিয়া
নিরখিবে প্রাণ প্রিয়া—
নিরখিবে আর যত বিহঙ্গ সুন্দর;—
চিত পুলকিত হ'লে,
সঙ্গীত বর্ষিবে সবে,
সবে মিলি বনমাঝে গা'বে নিরন্তর;
ছেড়ে দাও বিহঙ্গেরে—বড় সে কাতর!"

———

কালবৃক্ষ।

"থাকিয়া থাকিয়া ঝরিতেছে পাতা,
শ্বসিয়া শ্বসিয়া বহিছে বায়ু;
কাল হ'তে পল পড়িছে খসিয়া,
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

২

সকলি যেতেছে—সকলি যাইবে—
এ জগত মাঝে রবেনা কেহ,
আশার আনন্দ—নিরাশা বেদনা—
ধূলাতে লুটাবে সোণার দেহ।

৩

এই যে তখন দেখিনু প্রভাতে,
রঞ্জিয়া গগন অপূর্ব্ব রাগে,

উঠিল তপন—সোণার বরণ,—
সে-চিত্র এখনো হৃদয়ে জাগে।

৫

কোথা সে উষার সুষমা এখন,
কোথা সে ললিত লোহিত আভা,
দেখনা ভুবন ভরিছে আঁধারে—
নিশিতে বিলীন হ'তেছে দিবা।

৫

এই যে সে দিন হৃদয় মাঝারে
রোপিলে যতনে আশার তরু,
না ফলিতে ফল শুকাল পাদপ,
সে হৃদি এখন হইল মরু।

৬

এই যে সে দিন খোদিলে কাননে
সুন্দর সরসী সলিলে ভরা,
নিদাঘ আইল—শুকাল সলিল—
নীরস হইল সরস ধরা।

৭

ভালবেসে তারে প্রাণেরো অধিক
সুখ আশে আমি সঁপিনু প্রাণ,
নিদয় হইয়ে গেল সে চলিয়ে—
এ হৃদি করিয়ে চির শ্মশান।''

জনসমাজে গোপাল বাবুর পুস্তক খানির সমুচিত আদর হইলে সুখী হইব।

ভগ্ন-আশা, শ্রীভশাহু দোল হোসেন প্রণীত। এখানি পদ্য। গ্রন্থকর্ত্তার নাম দেখিলেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে ইনি মুসলমান কি হিন্দু। মুসলমান হইয়া বঙ্গ ভাষার প্রতি এত অনুরাগ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। সমস্ত গ্রন্থখানি পাঠে কোন স্থল বিশেষ বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয় না, ও স্থানে স্থানে কবিতার আভাস পাওয়া যায়। নিম্নে একস্থল উদ্ধৃত করিলাম।

"পরিবর্ত্তনীয় প্রিয়ে এই ভূমণ্ডল
ভেবেছিনু, তুমি আমি নহিগো কেবল;
এখন দেখিতে পাই, মম সে-সিদ্ধান্ত না...
নিত্য নবরূপী তব হৃদয় আগার,
নহে স্থির ক্ষণস্থায়ী প্রণয় তোমার।
মনে কি পড়েলো প্রিয়ে সেই একদিন!
সেই সরোবর আর সেই যে পুলিন!
বসি সেই তরুতলে, সাজিয়ে কুসুমদলে
উল্লাসে দেখিতে ছিলে প্রফুল্লিত মনে,
বিমল সে মুখ-চাঁদ সলিল-দর্পনে!

ইত্যাদি।

কবিতাপাঠ,—প্রথমভাগ, মূল্য ... আনা মাত্র, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত ও সংগৃহিত। এ পুস্তকখানি বা... লিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে... ইহাতে 'করিমউদ্দিন, ডুগ্‌ডুগে খেলা' ভা... তেশ্বরী, প্রভৃতি গুটি কতক ছন্দে গ্রথি... পুঁক্তি আছে। এরূপ কবিতা বালক-বা... লিকাদিগের উপযোগী কি না তাহা শি... বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণই বিচার করিতে পা... রেন—ইহা আমাদের অসাধ্য।

বঙ্গ গৃহ। শ্রীসীতানাথ নন্দী প্র... নীত। এই উপন্যাস খানি সত্যই বা... আধুনিক বঙ্গ গৃহের ছবি হয় তবে বঙ্গে... আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল! বঙ্গ রসাতলে... ডুবিয়াছে! সুখের বিষয় এই ইহা সাধা... রণ বঙ্গ গৃহের ছবি নহে, বঙ্গের একটি অ... সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়কে লইয়া এই পুস্তক খা... রচিত।

যাহাই হউক, বাঙ্গালার একটি সম্প্রদা... য়ের একটি ঘরেও এরূপ অস্বাভাবি... ঘোর কলঙ্কময় বিদেশী ভাবের বিদে... প্রাণের কারবার দেখিলে আমাদের আ... ভরসা লোপ পায়।

সেন রাজগণ।

(বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী অধ্যায়।)

সেন রাজগণ কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া বাঙ্গালার রাজদণ্ড ধারণ করেন, তাহা স্থিররূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। বরেন্দ্র প্রদেশে প্রাপ্ত প্রস্তর লিপির মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই রাজবংশটী পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে বাস করিতেন। তথা হইতে আসিয়া বিজয়সেন সর্ব্বপ্রথম গৌড় জয় করেন।

উক্ত প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—মহাদেবের সুবর্ণসদৃশ জটামণ্ডল যাঁহার সিংহাসন, গঙ্গাজলকণা দ্বারা যাঁহার চামর ব্যজন ...া সম্পাদিত হয়, শিবশিরোভূষণ ফণীরাজের ফণা যাঁহার শ্বেতছত্র, যিনি সুধাকর, যাঁহার সন্দর্শনে সমুদ্র ও চকোর আনন্দে ...লিত হয়, যিনি কামদেবের যশের পুনঃপ্রকাশকারী, সেই চন্দ্রই সেন রাজবংশের আদি পিতা।

সুন্দরবন ও তর্পণদীঘির তাম্রফলকে ...ই চন্দ্রের গুণানুবাদ এবং "ওষধিনাথ" চন্দ্র হইতেই সেন বংশের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, ...পৃথিবীকে স্ফটিক পর্ব্বতে ব্যাপ্ত করিয়া, ...কে মুক্তাবলী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া, ...স্থলকে স্বর্গীয় নদীর জলে প্লাবিত করিয়া, দিক্‌কামিনীদিগকে চিরপরিচিতার ন্যায় ঈষৎ হাস্যযুক্ত করিয়া কামদেবের যশের পুনঃপ্রকাশকারী চন্দ্র প্রকাশিত হউন।''

এই চন্দ্র হইতে যে সকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পৃথিবীর ভারগ্রহণ করিয়া বাসুকীকে বিশ্রাম-সুখ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। তাঁহারা অদ্বিতীয়পরাক্রমশালী ছিলেন। এই বংশ হইতেই সেনবংশের উৎপত্তি।

প্রায় তিন শত বৎসর গত হইল তিব্বত দেশীয় গ্রন্থকার তারানাথ সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশজ লিখিয়া গিয়াছেন। ১ পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারগ্রন্থে সেনরাজগণকে "সোম বংশভব'' লেখা হইয়াছে। ২

রাজসাহির প্রস্তরফলকে লিখিত হইয়াছে, সেই চন্দ্রবংশে দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রযুক্ত মধুশ্রাবী ইতিহাস জগজ্জনের শ্রবণ রঞ্জন মানসে পরাশরপুত্র ব্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ৩

---

১ Taranath's Vassilief's work on Buddhism. Translated by Miss Lyall.

২ Indo-Aryans, Vol. 11. P. 266.

৩ বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণী দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।

এই বীরসেন যে কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। বলিলে তাঁহাকে ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তীও বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরাসনের সহিত গৌড়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।

সেই সেনবংশে (যে বংশে বীরসেন প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশে) শতশতবীরহন্তা ব্রহ্মপরায়ণ রাজা সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়," দিগের কুলের "শিরোদাম" স্বরূপ ছিলেন। ইনি কর্ণাট-শ্রী-লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় শব্দটী লইয়া একটী কোলাহল উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ "মহৎ বা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়" ৪ অনুমোদন করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদে "ব্রহ্মক্ষত্রং" পদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। টীকাকার ইহার অর্থ "ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ" লিখিয়াছেন।

১২৩৪ সম্বতের (১১৭৭ খৃঃ অঃ) পৌষ শুক্ল চতুর্থী দিবসে কনোজরাজ জয়চন্দ্র, রাও রাষ্ট্রধর নামক জনৈক ক্ষত্রিয়কে কয়েক খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন পত্রে রাও রাষ্ট্রধরকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" বলা হইয়াছে। ৫

প্রস্তর ফলকে ও সামন্ত সেনকে "ব্রহ্মবাদী" বলা হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে সামন্তসেনকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করাই প্রস্তর ফলক লেখকের অভিপ্রায় ছিল। ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কিছুই আমরা কোন গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হইতেছি না। টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ও করা যাইতে পারে।

এই সামন্তসেনের এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম হেমন্তসেন। হেমন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সামন্তসেন দেব গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেমন্তসেন দেব একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। তাঁহার রাজ্ঞী পতির রত্নস্বরূপ একান্ত প্রিয়তমা, সতী, ব্রতপরায়ণা, যশস্বিনী, ত্রিভুবনমোহিনী ও সুকৃতিশালিনী ছিলেন। তাঁহার নাম যশোদেবী। রাজা হেমন্তসেনদেব শৈব ছিলেন।

মহাদেব ও দেবী হইতে উৎপন্ন কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়, যশোদেবীর গর্ভে হেমন্তসেনের এক পুত্র জন্মে। ইনিই বিজয় সেন। প্রস্তর ফলকে বিজয়সেনকে কপিসৈন্যেশ রামচন্দ্র ও পাণ্ডবসেনাপতি ধনঞ্জয় হইতে শ্রেষ্ঠ বীর বলা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বিজয়সেনের, সংগ্রামক্ষেত্রে অসিচর্য্যা দর্শনে জনগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইত; তাঁহার খড়্গ নীলকমলসদৃশ হইয়া

শত্রুগণের মর্ম্ম দলন করিত; নবজলধরের ন্যায় হইয়া অরাতিদিগের অন্তঃকরণ যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিত; ভ্রমরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও ভয় বিস্তার করিত। কজ্জলবৎ হইয়াও শত্রুদিগের যন্ত্রণা উৎপাদন করিত। তিনি সেই উজ্জ্বল খড়্গ দ্বারা শত্রু নরপালদিগকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তেজ সূর্য্যসদৃশ ও ভুজদ্বয় প্রকাণ্ড সর্পের ন্যায় ছিল।

প্রস্তর ফলকের বিংশতি শ্লোকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে বিজয়সেন গৌড় ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন।৬

প্রস্তর লিপির দ্বাবিংশতি শ্লোকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে অনুগাঙ্গ প্রদেশ জয় করিবার জন্য বিজয়সেন এক বহর রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানা রণতরী গঙ্গার উৎপত্তিস্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রার ফল কিরূপ হইয়াছিল, কোন্ কোন্ দেশের রাজা বিজয়ের বাহুবলে পরাজিত হইয়াছিলেন, কবিবর উমাপতি তাহার উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে বিজয়সেনের রণতরী গঙ্গাবক্ষ বিলোড়ন করিয়া হিমালয়ের পদমূল পর্য্যন্ত গিয়াছিল কি না ইহাই সন্দেহ স্থল। কবি উমাপতি একজন খ্যাত নামা অত্যুক্তিপ্রিয়। তাঁহার সকল কথা আমাদের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

বিজয়সেন যে গৌড় বিজয় করিয়াছিলেন ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। মিত্র মহোদয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয় ও তাঁহার পিতৃপিতামহকে গৌড় রাজা অবধারণ করিয়াছিলেন।৭ সুতরাং গৌড়ের রাজা কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়বাক্য তাঁহার নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ১৮৭৮খৃষ্টাব্দে মিত্র মহাশয় আত্মভ্রম কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন যে বিজয় ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গের রাজা ছিলেন। বিজয়সেন পালরাজকে জয় করিয়া গৌড় অধিকার করেন।৮ কিন্তু বিজয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ যে বঙ্গের রাজা ছিলেন তাহার কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। মিত্র মহোদয় কেবল অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যখন প্রস্তর লিপি হইতে দেখাইয়াছি যে বীরসেন প্রভৃতি রাজগণকে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" ও বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেনকে কর্ণাটলুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তদিগের দমনকর্ত্তা বলা হইয়াছে, তখন অন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমরা ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, বিজয় ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথনিবাসী ছিলেন।

যচ্চরিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ।

প্রস্তর লিপির চতুর্থ শ্লোক।

৪ Noblest Kshetriyas.

৫ Asiatic Researches. Vol. XV. page 450.

৬ দ্রঃ নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বাহন্যথা মননরূঢ় নিগূঢ় রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপঃ কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥

৭ Journal Asiatic Society of Bengal. Vol. XXX. part 1. page. 130.

৮ J. A. S. B. Vol. XLVII. pt. 1. page. 400.

দক্ষিণাপথনিবাসী চোলরাজগণ এক সময়ে অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের ভুজবলে এক সময় সমস্ত ভারত আলোড়িত হইয়াছিল। চোলরাজকুলতিলক কুলতুঙ্গার শাসন পত্রে লিখিত আছে, এই রাজা বাঙ্গালা ও তদ্দেশাধিপতি মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন। ৯

মেকেঞ্জিসংগ্রহের ভূমিকায় বিজ্ঞবর উইলসন চোলারাজের বাঙ্গালা বিজয় বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ কথিত আছে যে চোলারাজ অর্ণবপোতারোহণে যাত্রা করিয়া কলিঙ্গ ও গৌড় জয় করিয়াছিলেন। ১০ কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কয়েকখানা হস্তলিখিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, অদ্য ভূগর্ভ হইতে এক খণ্ড তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হইয়া তাহার সত্যতা পোষণ করিতেছে।

চোলা রাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল উৎপাটন করেন। চোলা রাজগণের বিজয় বৈজয়ন্তী যে অনুগাঙ্গ প্রদেশে উড্ডীন হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন লেখক বলেন যে বৈদ্যনাথের শিবমন্দির চোলারাজগণের নির্ম্মিত। ১১ মন্দির গিরির সানুদেশে জনৈক চোলা নরপতি যে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া চোলারাজগণের বাঙ্গালায় আগমনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ডাক্তার বকনন বলেন যে চোলারাজ আদিত্যসেন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন। চোলা রাজদিগের যে কয়েকখানি বংশাবলী আমরা দর্শন করিয়াছি ১২ তাহার একখানাতেও আদিত্যসেন নামটী দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু মেকঞ্জি সাহেব "আদিত্য চোলা" নামে এক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন অতএব বোধ হয় বকনন তাঁহাকেই এই নামে পরিচিত করিয়াছেন। মহীসুরের ইতিহাসে ডাক্তর বকনন কুলতুঙ্গাকে "ত্রিভুবনচক্রবর্ত্তী" লিখিয়াছেন। যাহা হউক কোন কোন চোলানরপতি যে গঙ্গাসৈকতে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। চোলারাজদিগের মধ্যে কুলতুঙ্গা দুর্ব্বল ছিলেন এমত নহে। ডাক্তর বারনেল তাঁহাকে চোলা রাজবংশের

৯ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1876. page. 108.

১০ Mackenjee Collection. Vol. 1 page. LXXXV111.

কিন্তু উইলসন সাহেব ভ্রমক্রমে কুলতুঙ্গার পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোলাকে বাঙ্গালা আক্রমণকারী লিখিয়াছেন। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে জনৈক ভিন্ন দেশীয় রাজা কর্ত্তৃক জলপথে বাঙ্গালা আক্রমণের কথা কর্ণেল উইলফোর্ড ও লিখিয়া গিয়াছেন। (A. R. Vol IX. page 39.) দক্ষিণ দেশীয় কোন নরপতি দ্বারা যে একবার বাঙ্গালা বিজিত হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

১১ Eastern India. Vol. 11. p. 22.

১২ Journal Royal Asiatic Society Vol. V111. page 22, 23.

সর্ব্বপ্রধান নরপতি লিখিয়াছেন। ১৩ তিনি আরও বলেন যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পালরাজগণের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্য শৈব নরপতি বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোলা রাজগণ ভারতের ভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়া তাহাদের আত্মীয় ও অনুচরবর্গকে সেই সেই প্রদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করার কথা ডাক্তার বকনন লিখিয়া গিয়াছেন। ১৪

রাজসাহির প্রস্তরলিপি ও কুলতুঙ্গার শাসন পত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে বিজয়সেন চোলা রাজবংশের সেনাপতি বা আত্মীয় রাজপুত্র। তিনি কুলতুঙ্গা দ্বারা গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

চোলা রাজগণ শৈব ছিলেন। বিজয়সেন শিবোপাসক। সুতরাং শৈব নরপতি বৌদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া জনৈক শৈব ব্যক্তিকে গৌড়ের রাজাসনে স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন বলিয়া সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে।

এই সময় যে সকল ব্রাহ্মণ দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গালায় উপনীত হন, তাঁহারাই বোধ হয় বৈদিক নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নচেৎ দক্ষিণাপথনিবাসী ব্রাহ্মণদিগের বাঙ্গালায় আসিবার আর কোন সূত্র ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় "দাক্ষিণাত্য বৈদিক" গণ দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়াছিলেন, একথা তাঁহারা অদ্যাপি বলিয়া থাকেন।

১৩ P. A. S. B. 1876. page 108.

১৪ Eastern India. Vol. 1I. p. 23.

আমরা বারম্বার যে প্রস্তর লিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রস্তর ফলক রাজসাহির অন্তঃপাতি গোদাগাড়ি থানার অধীন দেওপাড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী "বরিন্দা" নামক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে বেগবতী স্রোতস্বতী পদ্মা এই পরিত্যক্ত পল্লীর প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। এক্ষণে পদ্মার প্রবল স্রোত এই স্থান হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরবর্ত্তী। একটী পুষ্করিণীর উপতটে প্রোক্ত প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই জলাশয়ের মধ্যে পূর্ব্বে আরও ২।১ খানা প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহা জলমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যেস্থানে এই প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার অনতিদূরে সার্দ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন প্রস্তরনির্ম্মিত এক মসজিদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রস্তর ফলকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, মহারাজ বিজয়সেন দেব একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অত্যুক্তিপ্রিয় কবি উমাপতি এই মন্দিরের বর্ণনা করিতে যাইয়া সমুদ্র, গগন, মেরু-পর্ব্বত, সূর্য্য, অগস্ত্য ও বিন্ধ্য পর্ব্বতকে লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। মন্দিরের পরিধি সমুদ্রবেষ্টিত, তাহার মধ্য গগনতলসদৃশ পরিসর ও চতুর্দ্দিক বিস্তৃত। মন্দিরের চূড়া উদয় ও অস্তাচলের মধ্যবর্ত্তী মেরু-পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তৎপরে কবি সূর্য্যকে বলিতেছেন, তুমি অগস্ত্যকে নিরর্থক দক্ষিণদেশবাসী করিয়াছ। বিন্ধ্যপর্ব্বত যত শক্তি উচ্চ হউক

না কেন, এই মন্দিরের ন্যায় উচ্চ হইতে পারিবে না। এই মন্দিরের উচ্চ চূড়াই সূর্য্যরথের হরিতাশ্বের গতিরোধ করিল। বিধাতা সুমেরুতুল্য মৃত্তিকা দ্বারা পৃথিবীতুল্য চক্রে এক ঘট প্রস্তুত করিলেও মন্দির শীর্ষস্থিত সুবর্ণকলসের তুল্য হইবে না। অত্যুক্তিপ্রিয় কবিদিগের মধ্যে উমাপতির নাম শ্রীহর্ষের পরেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যাহা হউক বিজয়সেন এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কে বলিতে পারে যে,এই মন্দিরের প্রস্তর লইয়া হিন্দুকীর্ত্তিদ্রোহী মুসলমানেরা উল্লেখিত মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া যান নাই।

যে সময়ে বিজয়সেন গৌড়ের রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন সেই সময়ে বোধ হয় আদিশূরবংশীয় কোন নরপতি বঙ্গ (বা সমতট) প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বিজয় সমতটের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বোধ হয় এই কন্যার গর্ভেই বল্লাল জন্মগ্রহণ করেন। কুলাচার্য্যদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বল্লালকে আদিশূরের কন্যাকুলসম্ভূত লিখিয়াছেন। সেন রাজগণের যে কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমস্তেই লিখিত আছে যে অদ্বিতীয়কীর্ত্তিশালী, অধর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ, বেদমার্গাবলম্বী বল্লালসেন বিজয়সেন হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গর্ব্বিত শত্রুদিগকে নিধন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে রুধিরনদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ বল্লালসেন দেব স্বীয় কার্য্যকলাপ দ্বারা বঙ্গবাসীদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রজারঞ্জন দ্বারা যশস্বী হইয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্গবাসীগণ বিবিধ অলৌকিক ও বিস্ময়জনক ঘটনাবলী রচনা করিয়া তাঁহার নামের সহিত গ্রথিত করিয়াছেন।

কোন কোন ব্যক্তি বল্লালকে আদিশূরেব পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কেহ বা তাঁহাকে আদিশূরের দৌহিত্র ও শ্রীধরের পুত্র, অন্য কেহ তাঁহাকে "বিষ্মকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র" ও আবুল ফাজেল তাঁহাকে সুকসেনের পুত্র লিখিয়াছেন।

দুই চারিখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে বল্লালের পিতার দুই স্ত্রী ছিল। বল্লালপিতা কনিষ্ঠা পত্নীর প্রতি সর্বাধিক অনুরক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া জনৈক উদাসীন দ্বারা এক যজ্ঞ করাইলেন। উদাসীন যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া তাহার চরু রাণীকে প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি এই চরু আপনি রাজাকে খাওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনার চির আজ্ঞাকারী হইবেন। কনিষ্ঠা রাণী এই সংবাদ অবগত হইয়া জনৈক দাসী দ্বারা চরু অপহরণ করিয়া তাহা ব্রহ্মপুত্র নদে বিসর্জ্জন করিলেন। চরুর আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে নদরাজ নরবেশে রাণীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সহবাস প্রার্থনা করিলেন। রাণী কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মপুত্র দৈবশক্তি দ্বারা রাণীকে মোহিত করিয়া বলিলেন ভদ্রে! আমার সহবাসে তুমি অপবিত্র হইবে না, তোমার সতী অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমা হইতে তুমি

পুত্ররত্ন লাভ করিবে, তিনি অসাধারণশক্তিসম্পন্ন নরপতি হইবেন। নদরাজের সংসর্গে রাণী গর্ভধারণ করিলেন। রাজা রাণীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া আধুনিক ঢাকার নিকটবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

সেই নির্ব্বাসিতা রাণীর গর্ভে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন। বনে জন্ম বলিয়া তিনি বল্লাল আখ্যা প্রাপ্ত হন। দেব পিতার অনুগ্রহে তাঁহার শৈশব জীবন নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়াছিল। জনপদের কোলাহলে তাঁহার জীবনের শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। দুষ্ক্রিয়াসক্ত সমাজের আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। তাঁহার জন্মদাতা নদরাজ লৌহিত্য তাঁহাকে বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে সুশিক্ষিত করিয়ছিলেন। রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যায় শৈশবেই তাঁহাকে সুপণ্ডিত করা হইয়াছিল। তিনি শৈশবকালে রাজা ও সেনাপতিগণ দ্বারা পরিচালিত একদল সুশিক্ষিত সৈন্যকে জয় করিয়াছিলেন।

কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমরা এই সকল বিবরণ পরিত্যাগ করিতে পারি। যাহা হউক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বল্লাল একজন বীর্য্যবান্, বুদ্ধিমান্ বিদ্যান ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মর্ম্মালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে, তাঁহার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ছিল। তিনি বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত দানসাগর গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে।

"ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌশ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ। পদাম্ভোজনিষণ্ণবিশ্ববসুধাসাম্রাজ্যলক্ষ্মীযুতঃ। শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিজয়তে সৎদ্বৃত্তচিন্তামণিঃ * * ইতি পরমমাহেশ্বর মহারাজাধিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্করঃ শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেব বিরচিতঃ শ্রীদানসাগর সমাপ্তঃ।

বল্লাল একজন শিবভক্ত ছিলেন এজন্যই আমরা তাঁহার নামের সহিত "পরম মাহেশ্বর" ও "নিঃশঙ্ক শঙ্কর"এই দুইটী পদ সংযুক্ত দেখিতে পাই।

আদিশূরের সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণের মধ্যে বল্লাল যাহাদিগকে নবগুণ ১৫ সম্পন্ন দর্শন করিলেন তাহাদিগকে সেই সেই কুল মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা কুলীন আখ্যাদ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন।

দক্ষের উত্তর পুরুষ—চট্টবংশীয় বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচজন।—

ছান্দড়ের উত্তর পুরুষ—পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধন, ঘোষাল বংশের শির, কাঞ্জীলাল বংশের কানু ও কুতূহল এই চারিজন।—

বেদগর্ভের উত্তর পুরুষ—গাঙ্গুলি বংশের

---

১৫ আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

শিশু, কুন্দগ্রামী বংশের রোষাকর, এই দুইজন।—

ভট্টনারায়ণের উত্তর পুরুষ বন্দ্যোবংশের মহেশ্বর, জাহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয়জন।—

শ্রীহর্ষের উত্তর পুরুষ—মুখটী বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুইজন।

সর্ব্বশুদ্ধ উনিশজন রাঢ়ী ব্রাহ্মণকে বল্লাল কুলীন আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে গণনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, দক্ষের অষ্টম উত্তর পুরুষ বহুরূপ; ছান্দড়ের নবম উত্তরপুরুষ গোবর্দ্ধন; বেদগর্ভের অষ্টম উত্তরপুরুষ শিশু গাঙ্গুলি; ভট্টনারায়ণের দশম উত্তরপুরুষ মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; ও শ্রীহর্ষের ত্রয়োদশ উত্তর পুরুষ উৎসাহ মুখটী বল্লালের সমসাময়িক। সুতরাং এই সকল ব্রাহ্মণের বংশাবলী অনুসারে আদিশূরের সহিত বল্লালের ৮, ৯, ১০ ও ১৩ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। যদি আমরা এই দুই নরপতির মধ্যে গড়ে নয় পুরুষ ব্যবধান ধরিয়া, মিত্র মহোদয়ের অবলম্বিত, তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আদিশূরের অন্যূন তিন শত বৎসর পরে বল্লাল ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্ব্বে আমরা আদিশূরের যে সময়াবধারণ করিয়াছি, তাহা ইহার সহিত ঐক্য হইতেছে। আদিশূর, শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (বা খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে) জীবিত ছিলেন। সুতরাং বল্লালসেন শকাব্দের দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া লেখা যাইতে পারে। দানসাগর গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে "সময় প্রকাশ" প্রণেতা লিখিয়াছেন, যে, এই গ্রন্থ "নিখিল নৃপচক্র তিলক শ্রীবল্লালসেন দেব ১০১৯ শকাব্দে" (১০৯৭ খৃঃ অঃ) রচনা করেন।"১৬ দানসাগর গ্রন্থ বল্লালের প্রথম বয়সের রচনা নহে এজন্যই এই গ্রন্থ রচনার ৩১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯৮৮ শকাব্দে (১০৬৬ খৃঃ অঃ) মিত্র মহোদয় বল্লালের অভিষেক কাল অবধারণ করিয়াছেন এবং আমরা ও ইহা অনুমোদন করিতেছি।

কয়েকখানা কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে যে সেনরাজগণ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। এবং যখন যে ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গৌড়ের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিতেন। বল্লাল যখন দিল্লীতে রাজত্ব করে, তৎকালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বৈদ্যকুলজিকারগণ বলেন যে, এই সময় বল্লাল এক নীচজাতীয়া রমণীর প্রণয়ে আসক্ত হন। এজন্য লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার বিরোধ হইয়াছিল। তৎকালে লক্ষ্মণসেনের অনুগত বৈদ্যগণ, বল্লালের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ মানসে উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রভাব ধারণ করে। এই ঘৃণি

১৬ নিখিলনৃপচক্রতিলকশ্রীবল্লালসেন দেবেন
পূর্ণেনবশশিদশমিতে শকাব্দে দা
সাগরোরচিত

মিথ্যা বাক্য পোষণোপযোগী কতকগুলি অশ্লীল কবিতা বঙ্গদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। যে কলুষিত রুচি হইতে কবিচূড়ামণি কালিদাস সম্বন্ধীয় অশ্লীল গল্প প্রচারিত হইয়াছে। যে জুগুপ্সিত রুচি বিদ্যাপতির আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহের প্রিয়তমা পত্নী "লছমী" দেবীর নির্ম্মল চরিত্রের কলঙ্ক কালিমা প্রসব করিয়াছে। বল্লাল সেনদেবের বিমল চরিত্রের কলঙ্ক যে কেবল সেই ঘৃণিত রুচির প্রসবিত্রী এমত নহে, ইহাতে একটী সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থও জড়িত রহিয়াছে। বৈদ্যজাতির উপবীত হীনতার অমূলক কারণ প্রচার করিবার জন্য সত্যের শীর্ষে পদাঘাত করিয়া বল্লালকে দিল্লীর রাজাসনে স্থাপন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ মিথ্যা বাক্য দেশ মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে। রাজনগর নিবাসী রাজবল্লভ সেন এই সমস্ত চক্রান্তের মূল কারণ। ১৭

সেন রাজগণের দিল্লীতে রাজত্ব করার উক্তি আমাদের বিবেচনায় বাতুলের প্রলাপ মাত্র। যে সময়ে আমরা সেন রাজগণকে গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখিতে পাই ঠিক সেই সময়ে রাঠোর বংশীয়েরা কনোজে ও তুঅর, তৎপর চৌহান বংশধরেরা দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত অনঙ্গ পালের অধিকারের পূর্ব্বে কনোজ ও দিল্লী এক রাজছত্রের অধীন ছিল। তৎপরে আর্য্যবর্ত্তে একটী বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লব দ্বারা আহূত হইয়া রাঠোর বংশীয় চন্দ্রদেব কনোজে ও তুঅরবংশীয় বিলনদেব দিল্লীতে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। যেস্থানে একসময় যুধিষ্ঠির ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক বিলনদেব (দ্বিতীয়) অনঙ্গপাল আখ্যা ধারণ করত ৯৭৪ শকাব্দে (১০৫২ খৃঃ অঃ) দিল্লীর রাজাসন উজ্জ্বল করেন। সেই মহাশ্মশান ক্ষেত্রে যে রাশি রাশি ভগ্নাট্টালিকা "কুতুবদুর্গ" নামে পরিচিত রহিয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে (দ্বিতীয়) অনঙ্গপাল দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ নরপতি (দ্বিতীয়) অনঙ্গপালকে "মহারাজাধিরাজ" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই অনঙ্গপাল হইতে ছহড়দেব বা তৃতীয় অনঙ্গপাল পর্য্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী কাল তুঅর বংশীয়েরা প্রবল পরাক্রমের সহিত দিল্লী শাসন করিয়াছিলেন। তৃতীয় অনঙ্গপালের পর তাহার দৌহিত্র (চৌহান বংশীয় সোমেশ্বরের পুত্র) সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরচূড়ামণি পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৮ এই সকল বিখ্যাত নরপতিগণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বৈদ্য কুলজি

১৭ পূর্ব্বে সেন রাজগণ আমাদের দেশে কায়স্থ বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। এজন্যই আবুল ফাজেল ও জোসপ্ টিফিন তল্লার তাঁহাদিগকে কায়স্থ লিখিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লালবংশীয় রাজবল্লভসেন ১০ দশ লক্ষ মুদ্রা দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ঘটকদিগকে বাধ্য করিয়া সেন রাজগণকে বৈদ্য ও রাজবল্লভকে তদ্বংশধর অবধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ উপবীত ধারণ পূর্ব্বক অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। Western India, Vol. II p. 615. History and statistics of Dacca Division; page 4. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলী ১১০ পৃষ্ঠা; রাজা রাজবল্লভসেনের জীবন চরিত। (বান্ধব, সপ্তম খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা) সম্বন্ধ নির্ণয়, সমালোচনা (বান্ধব, অষ্টমখণ্ড ২৫৩—২৬০ পৃষ্ঠা) দেখ।)

১৮ কবি চাঁদ বর্দ্দাই তাঁহার "পৃথ্বীরাজ চৌহান রাসৌ" গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব্বের ২৮ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, যে, চৌহান পৃথ্বী-

লেখকগণ সেনরাজগকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাজ বল্লালসেনের সময়েই বঙ্গের রাজধানী "সমতট" বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই বিক্রমপুর নগরী অধুনা 'বল্লাল বাড়ী' বা রামপাল' নামে পরিচিত রহিয়াছে। ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে যে বৃহৎ পরিখা ছিল তাহা ক্রমে ভরাট হইয়া শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। সুপ্রশস্ত রাজপথগুলির চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। যে স্থানে রাজবাটী ছিল বলিয়া কথিত হয় তাহার দক্ষিণাংশে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার দৈর্ঘ্য অনুমান ৩৫০০ হস্ত ও পরিসর এক সহস্র হস্ত হইতেও অধিক। বর্ত্তমান সময়ে এই দীঘির অনেক স্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বল্লালের সময়ে এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য ও পরিসর কত দূর ছিল তাহা স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। উক্ত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী সমূহ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এ স্থানে মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ অতি অল্পই প্রত্যক্ষ হয়। অধিকাংশই ভূগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। রামপাল ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ভূমি খনন করিলে প্রায়ই রাশি রাশি ইষ্টক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে এইরূপ ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একবার ৮০ হাজার টাকা মূল্যের এক খণ্ড প্রস্তর এইস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ১৯ যাহা হউক মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানীর কেবল চিহ্ন মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে: আর সকলই কালের অনন্ত কবলে কবলিত হইয়াছে। সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের উত্তরপুরুষ শ্রীআদিদেব বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

শ্রীআদিদেব—

যো বঙ্গরাজরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যসন্ধিবিগ্রহী॥

বল্লালসেন দেব স্বীয় অধিকৃত দেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, যথা বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ়, বরেন্দ্র ও মিথিলা। আমরা এই সকল বিভাগের সীমা ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বল্লালের সময়ে মিথিলার কিয়দংশ বাঙ্গালার রাজদণ্ডের অধীন ছিল।

বল্লালসেন দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব বাঙ্গলার রাজদণ্ড ধারণ করেন। লক্ষ্মণসেন ১০২৮ শকাব্দে (১১০৬ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলন করেন তাহা দীর্ঘকাল এদেশে প্রচলিত ছিল। অধুনা ঐ অব্দ কেবল মিথিলা প্রদেশে সামান্য রূপে প্রচলিত রহিয়ছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহার দুই খণ্ড তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রথম এক খণ্ড তাম্রশাসন সুন্দরবনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দের দশই মাঘে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসন পত্র দ্বারা "পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেন দেব" খাড়ী মণ্ডলিকার অন্তর্গত তিন দ্রোণ ভূমি, ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভূমির বার্ষিক রাজস্ব পঞ্চাশৎ পুরাণ অর্থাৎ ৫০ কাহণ কড়ি ধার্য্য হইয়াছে। ২০

লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় তাম্রশাসন দিনাজপুরের অন্তর্গত তর্পণ দীঘির নিকটে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ সাত লক্ষ্মণাব্দের ৩রা ভাদ্র। এই শাসনপত্র দ্বারা মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ভরদ্বাজ গোত্র, "সামবেদ কৌথুম শাখা চরণানুষ্ঠায়িনে" শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে বিল্বহিট্টী গ্রামের কিয়দংশ ভূমি দান করেন। ইহারও বার্ষিক রাজস্ব ৫০ কাহণ কড়ি ধার্য্য হইয়াছিল। ২১

প্রোক্ত দুই খণ্ড শাসনপত্রের দ্বারা যে দুই জন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হইয়াছিল আমাদের বিবেচনায় তাহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

উভয় শাসনপত্রে লক্ষ্মণসেন তাহাদের রাজ্যের "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন" আখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দান বিষয়ের ঘোষণাপত্র "শ্রীবিক্রমপুর" হইতে প্রচারিত হইয়াছিল ইহা তাম্রশাসনেই লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের নিবাসভূমি বিক্রমপুরে ছিল, ইহাও শাসনপত্র দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

লক্ষ্মণসেন দেব বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাম্রশাসনের শীর্ষ দেশে ভগবতী দাক্ষায়ণীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। বোধ হয় ইহা সেন রাজগণের কৌলিক দেবতার প্রতিকৃতি। নারায়ণ দত্ত নামক এক ব্যক্তি লক্ষ্মণসেনের "সন্ধিবিগ্রহিক" ছিলেন। শাসনপত্রাদিতে তাহার উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপ যে সকল পণ্ডিতরত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, কবিবর জয়দেব তাহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২২ উমাপতি, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব ও ধোয়ী-কবিরাজের নাম লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারস্থ প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত রহিয়াছে। ২৩ ডাক্তর ভুলার কাশ্মীরে একখণ্ড হস্তলিখিত গীতগোবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের শেষভাগে জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সম-সাময়িক লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মিত্র মহোদয় কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা গ্রন্থ হইতে একটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। ২৪

এই পঞ্চ পণ্ডিত রত্নের মধ্যে জয়দেব ও গোবর্দ্ধন ২৫ রাঢ়ীয় ও উমাপতি, শরণ ও ধোয়ী কবিরাজ বৈদিক কি বারেন্দ্র ছিলেন তাহা স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না।

রাজকে দিল্লী প্রদান করিয়া তুঅর অনঙ্গপাল বদরিকাশ্রমে গমন করেন।

"দিয় দিলী চহুআংন কোং
তুঅর বদ্রী জাই।"

ইত্যাদি।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের খোদিত লিপিতে তাঁহার মাতুল কিরণ দেবের নাম উল্লেখ আছে। (A. R. XV. 444.) বোধ হয় কিরণদেব তাঁহার পিতার বর্ত্তমানেই পরলোক গমন করেন।

১৯ রামপালের বিবরণ, Taylor's Topography of Dacca, and Taylor's Periplus of the Erythrean sea. দেখ।

২০ ভারতী, চতুর্থ খণ্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

২১ J. A. S. B. Vol XLIV. part 1. page 11.

২২ বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যোদুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥
গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ, চতুর্থ শ্লোক।

২৩ গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ॥

২৪ Indo—Aryans. Vol II. page 240.

২৫ ইনি পূতিতুণ্ডবংশের গোবর্দ্ধন নহেন। পশ্চাৎ দেখ।

সেন রাজদিগের মধ্যে লক্ষ্মণসেন সর্ব্ব প্রধান নরপতি ছিলেন। বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত শাসনপত্রে লিখিত আছে এই রাজার "বাহু করিশুণ্ড" ও বক্ষস্থল প্রস্তর সদৃশ কঠিন ছিল। তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত মূষলধারী ও গদাপাণির (বলরাম ও জগন্নাথ) মন্দিরের সন্নিকটে (পুরীতে), ও অশী-বরুণার-গঙ্গাসঙ্গমে অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরক্ষেত্র বারাণসীতে এবং ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী, ত্রিবেণীর তটে (প্রয়াগে) যজ্ঞ যূপ সমূহের সহিত সমর বিজয় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এতদ্বারা বোধ হইতেছে যে লক্ষ্মণসেনদেব একদিকে প্রয়াগ ও অন্যদিকে পুরী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জপতিদিগের শাসন পত্র আলোচনা দ্বারা অনুমিত হইতেছে, যে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে প্রয়াগ ও বারাণসী কনোজ রাজদণ্ডের অধীন ছিল। লক্ষ্মণসেনের বাঙ্গালা শাসনকালে মদনপাল ও তৎপরে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র কান্যকুব্জ শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেহই সেন রাজগণ হইতে দুর্ব্বল ছিলেন না। বিশেষতঃ গোবিন্দচন্দ্রের ১১৬৬ সম্বতের (১০৩২ শক) শাসন পত্রে লিখিত আছে যে, হম্মীর গৌড়ের দুর্ব্বার ভীষণ দ্বিরদ সমূহের মস্তক চূর্ণ করিয়া বীরগণের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়াছিলেন, তিনি (গোবিন্দচন্দ্র) সেই হম্মীরকে জয় করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ২৬

গৌড়েশ্বর যে দুর্ব্বল ছিলেন ইহা দ্বারা এরূপ বোধ হয় না, বরং গৌড়েশ্বরকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বলিয়াই আর্য্য বীর সমাজে হম্মীরের খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই হম্মীরকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং আস্ফালন করিয়াছেন। হম্মীর একজন অসাধারণ বীর ছিলেন। তাহার শত্রুগণই ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। ২৭ হম্মীর কোন্ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয় কান্যকুব্জ ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী কোন দেশের রাজা ছিলেন। ২৮

যাহা হউক কেশবসেনের শাসনপত্রে লক্ষ্মণসেন দেবের বিক্রম বর্ণনা করিতে যাইয়া যে সকল কথা সন্নিবেশিত হইয়াছিল লক্ষ্মণসেনের শাসনপত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং বোধ হইতেছে এই সকল জয়স্তম্ভ প্রয়াগ, কাশী ও পুরীর পরিবর্ত্তে, কবির কল্পনা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া কেশবসেনের তাম্রশাসনেই স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক লক্ষ্মণসেন যে একজন দুর্ব্বল নরপতি ছিলেন এমত বোধ হয় না। দুর্ব্বল রাজণ্যবর্গ দ্বারা স্থাপিত অব্দ এরূপ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারে না।

বল্লালপ্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথা লক্ষ্মণসেন দেব দ্বারা আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে।

---

২৬ Proceedings. As. So. Bengal, for 1876. page 131.

২৭ বীর চূড়ামণি পৃথ্বী রাজার খোদিত লিপিতে যতবার হম্মীরের নাম উল্লেখ হইয়াছে, প্রত্যেক বারেই নামের পূর্ব্বে "বীর" শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। Asiatic Researches. Vol XV page 444.

২৮ আমরা বৌদ্ধ গয়ার ৩নং প্রস্তর লিপিতে এই রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাই। J. A. S. P. Vol. V. p. 658.

রন্থাম্বর পতি বীরচূড়ামণি হম্মীরের জীবন চরিত "হম্মীররাসৌ" গ্রন্থে তাহার যে জন্মাব্দ লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে গণনা করিলে তাহাকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে হম্মীরকে আলাউদ্দিনের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। (See Hamir Raso. Translated by Braja Nath Banarjee) সুতরাং আমরা রন্থাম্বরপতিকে সেই হম্মীর বলিতে পারি না।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিলপুর পরগনার জনৈক কৃষক ভূগর্ভ হইতে এক খণ্ড তাম্র ফলক আবিষ্কার করিয়াছিল। ঐ পরগণার তদানীন্তন জমিদার ৺ বাবু কানাইলাল ঠাকুর তাহা প্রাপ্ত হইয়া এসিয়াটীক সোসাইটীতে প্রদান করেন। ঐশাসন পত্রের মর্ম্মালোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহা কেশবসেনের দান পত্র। কিন্তু শাসন পত্রের যে স্থানে কেশব সেনের নাম লেখা আছে, সেই স্থানটীই কাটা, ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে পূর্ব্বে যাঁহার নাম লিখিত হইয়াছিল, তিনি এই দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী সেই শাসন পত্রে আপন নাম সংযুক্ত করিয়া তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। শাসন পত্রের মর্ম্মালোচনা কালে বিজ্ঞবর প্রিন্সপ সাহেব এই সকল দর্শন করতঃ বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে প্রিন্সেপ সাহেব যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা অনুমোদন করিতেছি। ২৯

আইন আকবরী প্রণেতা আবুলফাজেল লক্ষ্মণ ও কেশবসেনের মধ্যবর্ত্তী একজন রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই মাধব সেন। রাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভে লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ মাধব কনিষ্ঠ কেশব। মাধবসেনকে বঙ্গ দেশীয় কুলজি লেখকগণ কেশবের পরবর্ত্তী অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কুলজি গ্রন্থগুলিকে আমরা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, লক্ষ্মণসেন দেবের প্রধান মহিষীর নাম বসুদেবী, তিনি সতীকুলের অগ্রগণ্যা, তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া বিধাতার হস্ত পবিত্র হইয়াছিল, যেরূপ মহাদেব ও গিরিজা হইতে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন, সেইরূপ "অশ্বপতি," "নরপতি" ও "গজপতি" রাজগণের অধিপতি, সেন কুলকমলের ভাস্কর স্বরূপ, সোম বংশের প্রদীপ, দানে কর্ণসদৃশ, গাঙ্গেয় সদৃশ সত্যব্রত, শরণাগতপ্রতিপালক পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ কেশবসেন দেব জন্মগ্রহণ করেন।

কবি কেশবসেনের নামের সহিত অনেকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনটীই আমাদের উল্লেখ যোগ্য। প্রথম কেশবসেনকে "সোমবংশপ্রদীপ" অর্থাৎ চন্দ্র বংশের উজ্জ্বলকারী বলা হইয়াছে। এই শাসনপত্রে বিজয়, বল্লাল, লক্ষ্মণ ও কেশবসেনের নামের সহিত "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" পদ সংযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আর কোনও শাসনপত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রিন্সেপ ও মিত্র মহোদয় শঙ্কর-গৌড়েশ্বর অর্থ "ভাল" কিম্বা "শ্রেষ্ঠ" গৌড়েশ্বর করিয়াছেন। ৩০

---

২৯ It is curious that wherever the name of Kesava Sena occurs on the plate, there makes of an erasure; as if the grant had been prepared during the reign of Madhava Sena, and, on his dying before it was completed (for such a plate must have taken a long time to engrave), the name of his successor Kasava, fortunately happening to be of the same prosodial quantity, was ingeniously substituted, and *mututo nomine*, the endowment was completed and promulgated. Journal As. So. Bengal. Vol. VII. page 42,

৩০ *Mittra*—The excellent Lord of Gour. *Prinsep*—The auspicious Lord of the city of Gour. কিন্তু প্রিনসেপ সাহেব বলেন "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" পদটী যদি দন্ত্য "স" দ্বারা (সঙ্কর গৌড়েশ্বর) লেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ইহাকে

কাশ্মীর দেশে "শঙ্করগৌরীশ" নামে এক শিব মন্দির আছে। ৩১ সেন গৌড়েশ্বরদিগের মধ্যে কোন নরপতি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া মিত্র মহোদয় অনুমান করেন। কিন্তু আমরা রাজতরঙ্গিনীর সাহায্যে ইহা দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি যে, কাশ্মীর-রাজ শঙ্কর বর্ম্মা "গৌরীশ্বর" মহাদেবের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৩২

শাসনপত্রে কেশবসেনকে "পরমসৌর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সূর্য্যোপাসক বলা হইয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব সৌরকে "শৌর" করিয়া তাহার অর্থ "শ্রেষ্ঠবীর" করিয়াছেন। কিন্তু শাসনপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একাদশ পংক্তির মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গেলেই "সৌর" শব্দ দন্ত্য "স" দ্বারা লিখিত থাকা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের শাসন-পত্রে সূর্য্যোপাসক রাজাদিগের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

বাখরগঞ্জের শাসনপত্র দ্বারা কেশবসেনদেব বঙ্গদেশস্থ বিক্রমপুরের অন্তঃপাতি বাগুলী প্রভৃতি গ্রামমধ্যে ৩০০ (দ্রোণ) ভূমি শ্রুতিপাঠক শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে দান করিয়াছিলেন।

কেশবসেনের পর কোন মহাত্মা বাঙ্গালার সিংহাসন আরোহণ করেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আবুলফাজেল তাঁহার আইন আকবরীতে কেশবসেনের পর সদাসেন ও নৌয়াজে নামক দুইজন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েকখানি কুলজি গ্রন্থে ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলীতে কেশবসেনের পর নয়জন রাজার নাম লিখিত আছে। ইহার অধিকাংশই কাল্পনিক। যাহা হউক এই নয় জন রাজার মধ্যে আমরা "হরিসেন" নরপতির উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি।

সাবর্ণ গোত্রীয় "ভবদেবভট্ট বালবল্লভী-ভুজঙ্গ" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাঢ় প্রদেশে একমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নারায়ণ অনন্ত ও নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরলিপি সংযুক্ত হইয়াছিল। ভবদেব ভট্টের বন্ধু শ্রীবাচস্পতি শর্ম্মা প্রস্তরাঙ্কিত কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, সাবর্ণ গোত্রে ভট্ট ভবদেব জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি গৌড়েশ্বর হইতে রাঢ় দেশস্থ একশত খানি গ্রাম দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রথাঙ্গ তাঁহার এক পুত্র। রথাঙ্গের পুত্র অত্যাঙ্গ, তৎপুত্র বুধ তাহার পুত্র শ্রীআদিদেব ইনি বঙ্গরাজার মন্ত্রীছিলেন। (আমরা ইহাকে বল্লালের মন্ত্রী লিখিয়াছি।) তাহার পুত্র গোবর্দ্ধন। ইনি কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। (আমরা এই গোবর্দ্ধনকেই লক্ষ্মণসেনের সভায় দেখিতে পাইতেছি।) গোবর্দ্ধন বন্দ্যোবংশীয় সঙ্গোকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাঙ্গোকার গর্ভে গোবর্দ্ধনের এক পুত্র জন্মে, ইনি ভট্ট শ্রীভবদেব বাল-

সেন গৌড়েশ্বরদিগের মিশ্র বা নীচ জাতির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করিব। কিন্তু "সোমবংশ প্রদীপ" পদটী স্থাপন করিয়া তাহার পশ্চাৎ ভাগে এইরূপ অর্থ যুক্ত পদ প্রয়োগ কোন মতেই সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। শাসন পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অষ্টম পংক্তির আরম্ভ ও শেষ ভাগে দুইবার, নবম পংক্তির মধ্যভাগে এক বার ও দ্বাদশ পংক্তির প্রারম্ভে একবার, সর্ব্বশুদ্ধ চারিবার "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" পদের উল্লেখ আছে। সেই সেই স্থানে তালব্য "শ" খোদিত রহিয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব তাঁহার ভ্রম মূলক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া এইরূপ কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩১ Journal As. So. Bengal. Vol. XVII Part II. p. 283.

৩২ A. R. XV. 65.

বল্লভী ভুজঙ্গ। ইহার মন্ত্রণাশক্তি প্রভাবে ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেব দীর্ঘকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। ৩৩ এই প্রস্তরলিপির সম্বৎকে আমরা অবশ্যই লক্ষ্মণাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; কারণ তৎকালে আমাদের দেশে লক্ষ্মণাব্দই প্রচলিত ছিল।

লক্ষ্মণসেন দেবের চৌত্রিশ বৎসর অন্তে যে হরিবর্ম্মদেব রাঢ়ে বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার নাম অবশ্যই কেশবসেনের পর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নরপতির নামে "সেন" শব্দ সংযুক্ত না থাকায় একটী সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই সন্দেহ কোন কার্য্যের নহে। গুপ্ত বংশীয় দ্বিতীয় নরপতি ঘটোৎকচের নামে "গুপ্ত" শব্দ সংযুক্ত নাই। গুপ্ত রাজগণের যে সুদীর্ঘ বংশাবলী "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, কয়েকজন রাজার নামের সহিত গুপ্ত শব্দ সংযুক্ত নাই। উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় রাজা জনমেজয় ও তাহার পুত্র যযাতি ও অন্যান্য কয়েকজন রাজার নামের সহিত "কেশরী" শব্দ সংযুক্ত নাই। ৩৪ সুবিখ্যাত মিত্রবংশীয় দ্বিতীয় রাজা ভদ্রঘোষের নামের সহিত মিত্র শব্দ সংযুক্ত নাই। ৩৫ কান্যকুব্জ পতি দ্বিতীয় ভোজদেবের নামের সহিত পাল শব্দ সংযুক্ত নাই অথচ তাহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী চারি জন রাজার নামের অন্তে পালপদ সংযুক্ত রহিয়াছে। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে, যে অশোককে, মিত্রমহোদয় সেন বংশের শেষ নরপতি লিখিয়াছেন তাঁহার নামে "সেন" শব্দ সংযুক্ত নাই। এমত অবস্থায় হরিবর্ম্মদেবের নামে "সেন" পদ সংযুক্ত না থাকায়, তিনি সেন বংশীয় নহেন, বলিয়া কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। সেন শব্দ জাতি বাচক উপনাম নহে। "গুপ্ত," "পাল" "বিষ্ণু," "সেন", "আদিত্য", "রুদ্র", "বর্দ্ধন" "সাহ" "সাহি" "নাগ," "মিত্র" প্রভৃতি শব্দগুলি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের নামের সহিত পুরুষানুক্রমে সংযুক্ত থাকার রাশি রাশি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ৩৬ প্রোক্ত প্রস্তর

৩৩ J. As. So. Bengal. Vol. VI. p. 90.

৩৪ J. A. S. Bengal Vol. V11. p. 58, and, Vol. XLVI. part 1. pp. 150, 173.

৩৫ J. A. S. Bengal Vol. XLIX. part 1. p. 23.

৩৬ কেবল যে বাঙ্গালার রাজাদিগের নামের অন্ত "সেন" শব্দ সংযুক্ত ছিল, এমত নহে। বিন্ধ্যপর্ব্বত পার্শ্বে একটী রাজ বংশ রাজত্ব করিতেন। ইহাঁরা সাধারণতঃ "বাকটকপতি" বলিয়া খ্যাতছিলেন এই বংশীয় প্রবরসেনের শাসনপত্রে ৫ জন সেন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা

মহারাজ প্রবরসেন।
" রুদ্রসেন।
" পৃথিবীসেন।
" রুদ্রসেন।
" প্রবরসেন।

J. A. S. B. V. 128.

আর একটী সেন বংশ বল্লভীদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সূর্য্য বংশীয়। (উদয়পুরের জগদ্বিখ্যাত রাণাকুল এই বংশ হইতে সমুৎপন্ন)। শাসন পত্র হইতে তাহাদের নাম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। সেনপতি ভট্টায়ক (কণকসেন)।
২। " ধরসেন।
৩। মহারাজ দ্রোণসেন।
৪। " ধ্রুবসেন।
৫। " ধরভট্ট।
৬। " গৃহসেন।
৭। " শ্রীধরসেন।
৮। " শীলাদিত্য।
৯। " ঈশ্বরগুহ।
১০। " শ্রীধরসেন।

লিপিতে খোদিত হরিবর্ম্মদেবই কুলজিকারগণ দ্বারা হরিসেন নামে পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপ ভ্রম যে কেবল বঙ্গদেশে হইয়াছে এমত নহে। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস লেথকগণ "কেশরী" বংশীয় সমস্ত রাজার নামের অন্তে "কেশরী" শব্দ সংযুক্ত করিয়াছেন। ৩৭ খৃষ্টধর্ম্ম যাজক টিফিনতল্লার গোয়ালিয়র রাজ বংশের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধারাবাহিক ৮৫ জন রাজার নামের অন্তে "পাল" শব্দ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অথচ প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে গোয়ালিয়ার রাজাগণের নামের অন্তে "সেন," "সিংহ", "মল্ল", "সাহি", "পাল" প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত ছিল।

হরিবর্ম্মদেবের পর আমরা অশোক চন্দ্রদেবের নাম উল্লেথ করিতে পারি। মিত্র মহোদয় ইহাকে মুসলমানদিগের লিখিত লাক্ষ্মণেয় (লথমণিয়া) অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে সকল কারণে মিত্র মহোদয়ের মত অনুমোদন করিতে পারিতেছি না, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

বুদ্ধ গয়ার একটী বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তরলিপিতে রাজাধিরাজ শ্রীমদশোকচন্দ্র দেবের নাম খোদিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরলিপির অক্ষর শিশু বাঙ্গালা বা গৌড়ীয়। প্রিনসেপ সাহেব ইহার যে প্রতিলিপি দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে সন্দেহ শূন্য ও বিশুদ্ধ তাহা তিনিও স্বীকার করেন নাই এবং আমরাও স্বীকার করিতে পারি না। নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে আমরা প্রস্তরলিপি হইতে মহারাজ অশোকচন্দ্র দেব ও তাহার ভ্রাতা কুমার দশরথের নাম গ্রহণ করিতে পারি। কুমার দশরথের কোষাধ্যক্ষ, মহামহাত্মক ঋষিব্রহ্মের পৌত্র, মহাত্মক চাটব্রহ্মের পুত্র শ্রীসহস্রপাদ ভট্টাচার্য্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে খোদিত প্রস্তর লিপি সংস্থিত করিয়াছিলেন। প্রস্থরলিপির শেষ ভাগে লিথিত আছে 'ইতি শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব পদোনমতীত রাজ্যে সং ৫৩ বৈশাখবদি ১২ গুরৌ"। ৩৮

১১। ,, ধ্রুবসেন।
১২। ,, শ্রীধরসেন।
১৩। ,, সিলাদিত্য।
J. A. S. B. IV. 486 and V11. 966.
৩৭ Asiaitic Reserches. Vol. XV p. 264.

৩৮ মিত্র মহোদয় উদ্ধৃত অংশের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেনঃ—On Thursday, the 12th wane, in the month of Vaisakha, Sam. or year 74 after the expiration of the reign of the auspicious Lakshmana Sen Deva,

প্রিন্সেপ দেবনাগর অক্ষরে প্রস্তরলিপির যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন মিত্র মহোদয় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তরলিপির অব্দ সম্বন্ধে প্রিন্সেপ সাহেবের বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি প্রথমতঃ বলেন It contains a date sambat 73 or 74, আবার কয়েক পংক্তি নীচে তিনি লিখি[য়াছেন], The figures, however, are unfortunately doubtful,

আমরা লক্ষ্মণসেনপ্রদত্ত তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের খোদিত অঙ্কের সহিত বৌদ্ধ গয়ার প্রস্তরলিপির খোদিত অঙ্ক তুলনা করিয়া দেখিয়াছি যে, উক্ত প্রস্তরলিপির দ্বিতীয় অঙ্ক চারি না হইয়া তিন হইবে। প্রথম অঙ্ক লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন খোদিত ৭ অঙ্কের সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহাকে একটী অর্দ্ধভগ্ন ৫ অঙ্কের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অতএব আমরা প্রিন্সেপ সাহেবের প্রকাশিত ৭৩ কিম্বা ৭৪ [...] "৫৩" লিখিতে বাধ্য হইলাম।

See J. A. S. B. Vol. V. p 659 plate XXXI

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির উৎপত্তি ও উহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল; এক্ষণে দেখা যাউক কি কি প্রকারে উক্ত বৃত্তি উন্নত ও প্রবল হইতে পারে, আর কি কি প্রকারে উহা অধোপ্রাপ্ত ও নিস্তেজ হইতে পারে। মোট কথা এই, যে যে উপায়ে কোন জাতির জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও সুনীতি বিস্তৃত হইতে পারে সেই সেই উপায়ে সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির তেজোবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে পারে; জনসাধারণকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া জ্ঞান ও সুনীতি বিস্তারের একটী প্রধান উপায়, এই নিমিত্ত আজি কালি ইংলণ্ড জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে [...]তর শ্রেণীদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের এত দৃষ্টি পড়িয়াছে। * কিন্তু সকল দেশেই ও সকল অবস্থাতেই আর কিছু সাধারণকে বাধ্য করিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, সুতরাং অন্যান্য উপায়ে সাধারণ ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। চিত্রশালা, মিউজিয়ম্, সুরুচি উদ্দীপক নাট্যশালা, উপদেশ-বক্তৃতার ঘর ইত্যাদি প্রকার স্থানে সাধারণের জ্ঞানলাভ ও সুনীতি শিক্ষার বহুল সম্ভাবনা আছে, সুতরাং স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যত্নশীল হইয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ অনেক পরিমাণে পরিষ্কার করিয়া রাখিতে পারেন। এই সকল উপায়ে লোকের মধ্যে জ্ঞান ও সুনীতির জ্যোতি

* কিন্তু আমাদের দেশের চাষাভুষাদের মধ্যে পড়িতে জানে না,—রামায়ণ মহাভারত খানা পড়িতে পারে না—এমন লোক অল্পই আছে। যাহারা বা পড়িতে জানে না, শুনিয়া শুনিয়া রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি তাহাদের এমন কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে [...] তাহাতে পড়ার সমানই কাজ হয়। [...]ইরূপে, ও আমাদের যাত্রা গান, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতিতে সাধারণের মনে যেরূপ সুনীতি ও ধর্ম্ম ভাব অঙ্কিত করে, উপদেশে, বক্তৃতায় তাহার শত ভাগের এক ভাগ হয় কি না সন্দেহ। সেই জন্যই আমাদের এই দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, দীন হীন-অবনতির অবস্থাতেও, আমরা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, ভারতবর্ষীয়দিগের মত নীতিপরায়ণ জাতি আর পৃথিবীতে নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশের অসভ্য চাষাভূষাদের তুলনায় ইয়োরপের সভ্য চাষাভূষারা আকাশ হইতে পাতালের মত তফাৎ।

পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত সকল প্রথায় অনাদর হইয়া দেশের নীতি শিক্ষার মূলে যে দারুণ কুঠারাঘাত করিতেছে এই বড় দুঃখ। ভাং সং।

বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, আর তাহাতে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির তেজোবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন হয়, কিন্তু আর কতকগুলি উপায় আছে, তাহাতে উক্ত বৃত্তির উন্নতি সাধন হউক আর নাই হউক অব্যবহিত ভাবে উহার তেজোবৃদ্ধি হইতে পারে। যে সকল ক্রিয়ায় সাধারণে যোগ দিতে পারে, যে সকল ক্রিয়ায় কি ভদ্র কি অভদ্র, কি ধনী কি দরিদ্র, জাতির অন্তর্গত সকলেই জাতির মঙ্গলের নিমিত্ত, সাধারণের হিতের নিমিত্ত, একমনে কার্য্য করিতে পারে, সে সকল ক্রিয়া দ্বারা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির তেজোবৃদ্ধি হওয়ার ভূয়সী সম্ভাবনা; যেমন, সমুদয় জাতির প্রধান প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত যে ব্যবস্থাপক সভা থাকে, কিম্বা পথঘাট পরিষ্কার রাখা, সাধারণ গম্যস্থলে আলোক দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত প্রত্যেক সহরে যে সভা থাকে, এই দুইপ্রকার সভার সভ্য নির্ব্বাচন ক্রিয়ায় সাধারণে যোগ দিতে পারিলে, এই সকল সভার সভ্যগণ সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতে পারিলে, আর এই নির্ব্বাচনক্রিয়া সুরুচি ও সুনীতির সহিত সম্পাদিত হইলে সাধারণের মনে এই জ্ঞান জন্মিতে পারে যে তাহারা সকলেই একজাতির অন্তর্গত, সুতরাং কতকগুলি ঘটনায় সেই জাতির অন্তর্গত সকলেরই দুরবস্থা হইতে পারে আর কতকগুলি ঘটনায় সকলেরই সুখ সমৃদ্ধি লাভ হইতে পারে। যে সকল অনুষ্ঠানে জাতির মধ্যে এইরূপ শিক্ষা হইতে পারে সে সকল অনুষ্ঠান জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল করিতে স্বজাতি হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্‌যোগী হওয়া উচিত। ভাষা, ধর্ম্ম, ও আচার ব্যবহার এই ভিন্ন বিষয়ে একতা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তিকে অলক্ষিত ভাবে পরিপুষ্ট করে। ভাষাগত একতায় লোকের মধ্যে কতদূর নৈকট্যভাব সংস্থাপিত হয় তাহা আমরা স্বদেশে থাকিয়া বুঝিতে পারি না; যখন বিদেশে থাকা যায়, বিদেশীয় ভাষায় সদাসর্ব্বদা কথা কহিতে হয়, তখন নিজের ভাষায় কথা কহিবার একজন লোকও যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে মনে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ উপস্থিত হয় আর সে লোকটিকে যে কতদূর আপনার বলিয়া মনে হয় তাহা যে সেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে সেই বুঝিয়াছে। ধর্ম্মগত ও আচার ব্যবহার গত একতায় লোকের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। যাহা কিছু দুই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নতার পরিমাণ হ্রাস করে, যাহা কিছু দুই ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহাই তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতির কারণ হয়। ধর্ম্মের বশে লোকে জীবনের অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, লোকে যে ধর্ম্ম অনুসারে চলে সেধর্ম্মের চিহ্ন তাহাদিগের জীবনের প্রতি কার্য্যে লক্ষিত হয়; সুতরাং ধর্ম্ম এক হইলে জীবনের গতি অনেক বিষয়ে এক হইতে পারে আর তাহাতে সদ্‌ভাব সংস্থাপিত হয় সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কি কি প্রকারে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে তাহা অবগত হওয়াও যেরূপ প্রয়োজন, কি কি প্রকারে উক্ত বৃত্তির অধোগতি ও তেজোহ্রাস হইতে পারে তাহা অবগত হওয়াও সেইরূপ প্রয়োজনীয়, কারণ দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানদ্বারা আমরা আগে থাকিতে সাবধান হইয়া চলিতে পারি। স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির অধোপ্রাপ্তির দুইটী প্রধান কারণ এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে (১) স্বার্থপরতা ও (২) অপর শ্রেণী কিম্বা অপর জাতির প্রতি অনাস্থা। যে জাতির লোকে কেবল নিজের নিজের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত, নিজের নিজের হিতের চিন্তাতেই মগ্ন, অন্যের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি করে না—সেজাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তি অতি নির্জ্জীব অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। স্বার্থপরতা একটী নিন্দনীয় বৃত্তি ইহা সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক সময়ে অনেকের মনে এই বৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে—অতএব আমাদিগের সকলেরই এই বৃত্তির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; যাহাতে আমরা অন্যের হিতাহিতের প্রতি আস্থাহীন হইয়া না পড়ি, যাহাতে আমাদিগের নিজের হিতসাধন করিতে যাইয়া আমরা অন্যের হিতের প্রতি অন্ধ না হই, সে বিষয়ে আমাদিগের সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। আবার যে জাতির মধ্যে এক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর উপর আস্থা করে না, যে জাতির ব্যক্তিগণ স্ব স্ব শ্রেণী লইয়াই ব্যাপৃত, অন্যান্য শ্রেণী সুখেই থাকুক আর দুঃখেই থাকুক, অন্যান্য শ্রেণী থাকুকই আর নাই বা থাকুক সে বিষয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করে না, সেজাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ প্রবল হইতে পারে না, সে জাতির মধ্যে শ্রেণীগত অনুরাগ প্রবল থাকিতে পারে কিন্তু জাতিগত অনুরাগ যে ক্ষীণপ্রভ হইবে সে বিষয়ে মতান্তর হইতে পারে না। আবার যে জাতি অন্যান্য জাতির প্রতি অনাস্থা করে, যে জাতির লোকে অন্যান্য জাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, উন্নতি অবনতি প্রভৃতির প্রতি নিতান্ত উদাসীন, যে জাতির ব্যক্তিগণ কেবল তাহাদিগের নিজের প্রকৃতি, নিজের কার্য্যপদ্ধতি, নিজের আচার ব্যবহারই ভাল মনে করে আর বিদেশীয়দিগের প্রকৃতি, কার্য্যপদ্ধতি, আচার ব্যবহার মন্দ বলিয়া মনে করে, সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ প্রবল থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে অনুরাগ ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিবে, সে অনুরাগ ঊর্দ্ধপথে উঠিয়া বিস্তৃতপ্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রকৃত স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না। আমাদিগের মধ্যে আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলাফল আলোচনা হইতে দেখা যায়, আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমনও মনে করিতে পারেন, যে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমাদিগের কোন বিশেষ উপকার নাই। * কিন্তু এরূপ মত অবলম্বন

* পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কোন উপকার

করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সুব্যবহার করিয়াছি কি অপব্যবহার করিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যে যে অংশ আমাদিগের সমাজের উপযোগী সেই সেই অংশই আমাদিগের গ্রহণ করা উচিত, আমাদিগের সমাজ এক প্রকার ঘটনায় গঠিত এক প্রকার ঘটনায় বর্দ্ধিত আর ইয়োরোপীয় সমাজ অন্য প্রকার ঘটনায় গঠিত, অন্য প্রকার ঘটনায় বর্দ্ধিত—সুতরাং সমগ্র ইয়োরোপীয় সভ্যতা আমাদিগের সমাজের উপযোগী হইতে পারে না। † মানুষের মনের শক্তি সীমাবদ্ধ। এই সংসারের ঘটনাবলীর প্রত দৃষ্টি রাখিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করা এক ব্যক্তি বা এক জাতির সাধ্যাতীত, সমুদায় মানব জাতিরও সাধ্যাতীত। সুতরাং আমরা যদি সভ্যতার বাজিতে অন্যান্য জাতির নিকট পরাস্ত হইতে না চাই তবে অন্যান্য দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য রাজকার্য্য, ব্যক্তিগত ও সমাজগত নীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে সে সকলের সহিত আমাদের পরিচিত থাকা আবশ্যক ও সে সকল পন্থা ও পদ্ধতি আমাদিগের দেশের উপযোগী করিয়া লওয়া আবশ্যক। কি কি প্রকারে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে আর কি কি প্রকারে অপকর্ষ ঘটিতে পারে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; এখন বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক কিরূপ কার্য্য, কিরূপ ব্যবহার স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সহিত প্রকৃত পক্ষে সঙ্গত। অনেক সময়ে লোকে স্বজাতির প্রতি অনুরাগের আশ্রয় লইয়া অনেক কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে প্রবর্ত্তিত করে; সুতরাং এখন যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে তাহার সুমীমাংসা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ যদি কেহ স্বজাতির প্রতি অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া ফলাফল বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তবে পরে সে কার্য্যে ভাল না হইয়া মন্দ হইলেও হইতে পারে। যে কার্য্যে কোন জাতির অন্তর্গত সমুদয় লোকের সুখ বৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা সে কার্য্য স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যাহাতে স্থায়ী রূপে দেশের সুখবৃদ্ধি ও দুঃখনিবারণ হয়, সেই দিকেই দেশানুরাগের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। কোন কার্য্যে আপাততঃ লোকের সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস হইয়া ভবিষ্যতে তাহার বিষময় ফল দেখা দিতে পারে, যেমন নিজে যুদ্ধ না করিয়া যুদ্ধকার্য্যের নিমিত্ত বিদেশীয়দিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলে লোকে আপাততঃ আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাইতে পারে, কিন্তু এইরূপে পরে তাহারা এরূপ ক্ষীণপ্রাণী হইয়া পড়িবে যে তাহারা নিজের ধন, মান, প্রাণ নিজে রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহাদের বিদেশীয়দিগের পদানত হইতে হইবে। সুতরাং এরূপ কার্য্য স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগের অনুমোদিত হইতে পারে না। আবার কোন কার্য্যে কোন সমগ্র জাতি অথবা সে জাতির কোন কোন লোকে আপাততঃ কষ্টলাভ করিয়া পরে উহার ফলস্বরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী সুখ লাভ করিতে পারে, যেমন, কোন জাতির মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকের অতুল ঐশ্বর্য্য আছে আর তাহা ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় লোক দরিদ্র, তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহা দ্বারা একরূপে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় কিন্তু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না; এখন উক্ত ধনীব্যক্তিরা যদি আপনাদিগের কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করে আর দরিদ্র ব্যক্তিরাও কিছু কষ্ট সহ্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে শীঘ্র ঐ জাতির শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা; আপাততঃ ধনীদিগের অর্থ ব্যয় হইল বটে, আপাততঃ দরিদ্রদিগের কষ্ট হইল বটে, কিন্তু পরে জাতির অবস্থা উন্নত হইলে ধনীব্যক্তিরা তাঁহাদিগের অর্থ দশগুণে ফিরিয়া পাইবেন, দরিদ্রেরাও পূর্ব্বে যেরূপ সুখের কল্পনাও করে নাই সেরূপ সুখ ভোগ করিবে। সুতরাং এস্থলে ধনীদিগের অর্থব্যয় আর দরিদ্রদিগের কষ্টভোগ উভয় কার্য্যই স্বজাতির প্রতি অনুরাগের অনুমোদিত হইবে। জাতির মধ্যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমগ্র জাতির পরিণামে সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা সে কার্য্য স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সহিত সঙ্গত। কিন্তু কোন্ কার্য্যে জাতির সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস হইবে, কোন্ কার্য্যে তাহার বিপরীত হইবে, তাহা আমরা সকল সময় স্থির করিয়া উঠিতে পারি না, এরূপ পক্ষে কোন কার্য্য স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগের সহিত সঙ্গত তাহা আমরা কিরূপে স্থির করিব? যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে জাতির মধ্যে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পায়; সেরূপ কার্য্য স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সহিত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেহ বলিতে পারেন জাতির মধ্যে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়া আর জাতির মধ্যে প্রকৃত সুখবৃদ্ধি বা দুঃখহ্রাস হওয়া এ দুইটী কথার শেষ অর্থ একই। যাহাতে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে তাহাতেই পরিণামে সুখবৃদ্ধি বা দুঃখহ্রাস হইবে আর যাহা পরিণামে সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস করিবে তাহাই সুনীতি আনিবে সত্য বটে, কিন্তু কোন কার্য্যে জাতির মধ্যে প্রকৃত রূপে সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ

নাই তাহা বোধ কেহ মনে করেন না, তবে কি, এই শিক্ষার ফলে যে দেশীয় ভাব, দেশীয় সভ্যতা, দেশীয় রীতি নীতি, সাহিত্য শাস্ত্রাদির প্রতি কতক পরিমাণে বীতরাগ জন্মিতে দেখা যাইতেছে, এই বীতরাগ যে আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতিবন্ধক তাহা বোধ হয় লেখক অস্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না হইত তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার পূর্ণ উপকারীত্বের সম্বন্ধে বোধ করি কাহারো দ্বিবাক্য থাকিত না। ভাং সং।

† যদি ইয়োরপীয় সভ্যতানুরাগী ব্যক্তিগণ এইটি মনে রাখিয়া কাজ করেন ত দেশের যথার্থ মঙ্গল হয়। ভাং সং।

হ্রাস হইবে ইহা অনেক সময় বলিয়া উঠা কঠিন, অথচ সে কার্য্যে যে সকল ব্যবহার সুনীতি-আত্মক বলিয়া আমরা স্বীকার করি সে সকল ব্যবহারের সুপরিণাম হইবে ইহা আমরা বলিতে পারি। এই নিমিত্তই কোন কার্য্য স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সহিত সঙ্গত কি না ইহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশে উক্ত দুইটি লক্ষণ, (অর্থাৎ যে কার্য্যে পরিণামে জাতির মধ্যে সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাস করে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

লোকের মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কতদূর প্রবল ইহা কিরূপে নির্ণয় করিতে হইবে? স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কোন জাতির মধ্যে যদি বাস্তবিকই প্রবল থাকে, তবে সে জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সমুদয় জাতির হিতের জন্য তাহাদিগের স্বার্থ-বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবে আর যে পরিমাণে তাহারা এইরূপ প্রস্তুত থাকিবে তাহাদিগের স্বজাতির প্রতি অনুরাগের শক্তিও সেই পরিমাণের হইবে। যে জাতির দরিদ্রদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র কষ্ট, সহস্র সহস্র অপমান, সহস্র সহস্র পরপদাঘাত যন্ত্রণা দেখিয়াও ধনীদিগের হৃদয়ে দয়া ও দুঃখের সঞ্চার হয় না, হইলেও তাহা কার্য্যকর হয় না, যে জাতির মধ্যে লোকে বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখ লইয়া ব্যস্ত, ভবিষ্যতে যে পর্ব্বতাকার দুঃখ আসিতে পারে, যে দুঃখের ছায়া বর্ত্তমানেও অস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হইতেছে, সে দুঃখের বিষয় চিন্তা করে না, সে দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত আগে থাকিতে সচেষ্ট হয় না, সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগের শক্তি অতি অল্পই ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার যে জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে স্বজাতির উপকার করিবার চেষ্টা করিতেছে, যে জাতির নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সাধারণের মঙ্গল সাধন করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সভা আছে, যে জাতির মধ্যে কোন স্থলে একটু মাত্রও উপদ্রব দেখিলে, একটুমাত্রও অত্যাচার দেখিলে, একটুমাত্রও অরাজকতার চিহ্ন দেখিলে সে স্থলে সমুদয় জাতির দৃষ্টি পড়ে, সে উপদ্রব সে অত্যাচার, সে অরাজকতা দূর করিবার নিমিত্ত সমুদয় জাতি একমনে একপ্রাণে উদ্‌যোগ করিতে থাকে সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই অনুরাগ একবার উত্তেজিত হইলে লোকে কিরূপ প্রাণপণে কার্য্য করিয়া থাকে, ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা তাহার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ প্রাপ্ত হই। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্ অনেক প্রকারে প্রজাদিগের নিকট অবিশ্বাস ও অভক্তির পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পিটিসন্ অব্ রাইট্ নামক আইন বিধিবদ্ধ করিতে সম্মতি দিলেন, এই আইনে এই কথা রহিল যে রাজা আর কখনও পার্লেমেণ্টের বিনানুমতিতে রাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন না, আর তিনি বিচারালয়ে যথোচিত বিচার না করিয়া কাহাকে কারারুদ্ধ করিবেন না, আর তিনি প্রজাদিগের ঘরে সৈন্য রাখিবেন না, আর তিনি প্রজাদিগকে যুদ্ধের আইনে দণ্ড দিবেন না। এইরূপ আইনে সম্মতি দেওয়ার পর হাউস্ অব্ কমন্স্ তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল; অর্থ সংগৃহীত হইল বটে, কিন্তু রাজা তাঁহার আইনানুসারে কার্য্য করিলেন না, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বেচ্ছাচারীই রহিলেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষেরা হাউস্ অব্ কমন্সে এই প্রস্তাব করিলেন যে রাজা তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত রাজকার্য্যে যে সকল দোষ করিয়াছেন সে সকল লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরিত হউক, আর ইহাও বলা হউক যে তাঁহার কার্য্য-প্রণালীর প্রতি প্রজারা এখন পর্য্যন্তও অবিশ্বাস করিতেছে। ১৫৯ জন মেম্বর এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন আর ১৪৮ জন ইহাতে অসম্মত হইলেন। রাজা ঐ লিপি প্রাপ্তে ক্রোধ দমন করিয়া হাউস্ অব্ কমন্সের সহিত একমত হইয়া কার্য্য করিবেন এইরূপ কথা প্রচার করিলেন, আর সেই উদ্দেশ্যে হাউস্ অব্ কমন্সের বিশ্বাসভাজন কয়েকজন লোককে মন্ত্রী করিলেন। প্রজারা তাঁহাকে এখন বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল, লোকের মত তাঁহার স্বপক্ষ হইতে আরম্ভ হইল—কিন্তু চার্লসের স্বেচ্ছাচারী ভাব যাইবার নয়—তিনি মন্ত্রীদিগকে না বলিয়া এক গুরুতর কার্য্য করিলেন, হাউস্ অব্ কমন্স্ হইতে বিপক্ষ দলের পাঁচজন নেতা ধৃত করিবার উদ্দেশে তিনি স্বয়ং সৈন্য সহ তথায় গমন করিলেন, সৌভাগ্য ক্রমে সে পাঁচজন সভ্য তাহার কিছু পূর্ব্বে হাউস্ অব্ কমন্স্ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। চার্লস্ তাঁহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু এখন পার্লেমেণ্টে তাঁহার বিরুদ্ধে লোকে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল, রাজ্যের মধ্যে লোকে তাঁহার স্বেচ্ছাচার দেখিয়া দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না। এখন ইংলণ্ডের লোকে বিধি অনুযায়ী শাসন-তন্ত্র পাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে সচেষ্ট হইল, এরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া আর তাহারা কতদিন থাকিবে, তাহাদিগের স্বজাতির প্রতি অনুরাগবৃত্তি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, আর তাহাদিগকে কে বাধা দিবে। চার্লস্ উক্ত আইন-বিরুদ্ধ গুরুতর কার্য্য করার পর রাত্রে সমুদয় লণ্ডন সহর অস্ত্রময় হইল, চারিদিক হইতে লণ্ডনে লোক আসিতে লাগিল, রাজার রাজধানীতে থাকা ভার হইয়া উঠিল, রাজা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, অধিকাংশ প্রজারা এখন বিধি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র পাইবার নিমিত্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আর শান্ত হইল না।

শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কৈফিয়ৎ।

আমি গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে "পুরাতন কথা" নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত মাসের প্রচারে "আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, বঙ্কিম বাবুর কতকগুলি কথা আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অতিশয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু পাছে কেহ আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন এই জন্য, কেন যে ভুল বুঝিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার কারণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিম বাবু আনুষঙ্গিক যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব। আপাততঃ প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক্।

বঙ্কিম বাবু বলেন "রবীন্দ্র বাবু 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' এই দুইটি শব্দ ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত 'সত্য' 'মিথ্যা' বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য Truth মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই * * * 'সত্য' 'মিথ্যা' প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আর কিছু। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য।"

বঙ্কিম বাবু যে অর্থ মনে করিয়া সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এখন বুঝিলাম। কিন্তু প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দু ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয়।

তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি। "যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রথমে দেখিতে হইবে সংস্কৃতে সত্য মিথ্যার অর্থ কি। একটা প্রয়োগ না দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে না। মনুতে আছে—

সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ, এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

অর্থাৎ—সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।—এখানে সত্য বলিতে কেবলমাত্র সত্য কথাই বুঝাইতেছে, তৎসঙ্গে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝাইতেছে না। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝাইত তবে প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দের সার্থকতা থাকিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে মনু সত্য শব্দে Truth ছাড়া "আরো কিছু"-কে ধরেন নাই, এই অসম্পূর্ণতাবশতঃ সংহিতাকার মনুকে যদি কেহ অনুবাদপরায়ণ বা খ্রীষ্টান বলিয়া গণ্য করেন, তবে আমি সেই পুরাতন মনুর দলে ভিড়িয়া খৃষ্টীয়ান হইব—আমার নূতন হিন্দুয়ানীতে আবশ্যক? সত্য শব্দের মূল ধাতু ধরিয়াই দেখি আর ব্যবহার ধরিয়াই দেখি—দেখা যায়, সত্য অর্থে সাধারণতঃ Truth বুঝায় ও কেবল স্থল-বিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ—"সত্য" বলিতে প্রতিজ্ঞা "রক্ষা" বুঝায় না। সত্য পালন বা সত্য রক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝায়। কেবলমাত্র সত্য শব্দে বুঝায় না।

তৃতীয়তঃ—বঙ্কিম বাবু "সত্য" শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি "মিথ্যা" শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সত্য শব্দে সংস্কৃতে স্থল বিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায় বটে—কিন্তু মিথ্যা শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ সংস্কৃত ভাষায় বোধ করি প্রচলিত নাই—আমার এইরূপ বিশ্বাস।

ভ্রম হইবার আরেকটি গুরুতর কারণ আছে। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "যদি মিথ্যা কথা কহেন"—সত্য রক্ষা না করাকে "মিথ্যা কথা কওয়া" কোন পাঠকের মনে হইতে পারে না। তিনি হিন্দুই হউন্ খ্রীষ্টিয়ানই হউন্ স্বাধীনচিন্তাশীলই হউন্ আর অনুবাদ-পরায়ণই হউন্ "মিথ্যা কথা কহা" শুনিলেই তাহার প্রত্যহপ্রচলিত সহজ অর্থই মনে হইবে। অর্জ্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন, তখন তিনি মিথ্যা কথা কহেন নাই। কারণ, অর্জ্জুন এখানে কোন সত্য গোপন করিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ের যাহা বিশ্বাস বাক্যে তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন না, তৎকালে সত্য সত্যই যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোন প্রকার সত্যের ভাণও করেন নাই। আমি যদি বলি যে, "আমি কাল তোমার বাড়ি যাইব" ও ইতিমধ্যে আজই মরিয়া যাই তবে আমাকে কোন্ নৈয়ায়িক মিথ্যাবাদী বলিবে? এখানে হৃদয়ের বিশ্বাস ধরিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়—আমি যখন বলিয়াছিলাম তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তোমার বাড়ি যাইতে পারিব। মানুষ যখন অতীত বা বর্ত্তমান-সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার জ্ঞান লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়, সে যদি বলে কাল তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম অথচ না গিয়া থাকে তবে সে মনের মধ্যে জানিল এক মুখে বলিল আর, অতএব সে মিথ্যাবাদী। আর যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার বিশ্বাস লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়। যে বলে কাল তোমার বাড়ি যাইব, তাহার মনে যদি

বিশ্বাস থাকে যাইব না, তবেই সে মিথ্যাবাদী। অর্জ্জুন যে তাঁহার সত্য পালন করিলেন না সে যে তাঁহার ক্ষমতাসত্ত্বেও কেবল মাত্র খেয়াল-অনুসারে করিলেন না তাহা নহে, সহৃদয় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রমণীয় গুরুতর বাধাপ্রযুক্ত করিতে পা রলেন না—মনুষ্য-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশতঃ এ বাধার সম্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যদি বা উদয় হইয়া থাকে তবে মনুষ্য বুদ্ধির অসম্পূর্ণতাবশতঃ বিশ্বাস হইয়াছিল যে তথাপি সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলেন তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (শারীরিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি না)। অতএব সত্যপালনে অক্ষম হওয়াকে "মিথ্যা কথা কহা" বলা যায় না। যদি কেহ বলেন তবে তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধিকে নিতান্ত পীড়ন করিয়া বলেন। যদি বা আবশ্যকের অনুরোধে নিতান্তই বলিতে হয় তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্কিম বাবু এইরূপ বলেন, যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি তখন অগ্রে সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিম বাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন, আমার এবং অনেক পাঠকের সর্ব্বজনখ্যাত দ্রোণপর্ব্বস্থ কৃষ্ণের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। বিশেষতঃ যখন তাঁহার লেখা পড়িয়া সত্য কথনের কথাই মনে হয় সত্য পালনের কথা মনে হয় না তখন মহাভারতের যে কৃষ্ণোক্তি তাহারই সমর্থনের স্বরূপ সঙ্গত হয় অগত্যা তাহাই আমাদের মনে আসে। মনে না আসাই আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ সেইটাই অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। "হত ইতি গজে"র কথা সকলেই জানে, কিন্তু গাণ্ডীবের কথা এত লোক জানে না।

যখন অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় তখনই লোকে নানা উপায়ে বুঝিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোন অর্থ সহজেই মনে প্রতিভাত হয় ও সাধারণের মনে কেবলমাত্র সেইরূপ অর্থই প্রতিভাত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় তখন চেষ্টা করিবার কথা মনেই আসে না। আমি সেই জন্যই বঙ্কিম বাবুর উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এইটুকু, এখন অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক।

বঙ্কিম বাবু এক স্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যা কথা কহিয়াছি। যদিও বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যে তাহা বিশ্বাস করেন তাহা আমার কোন মতেই বোধ হয় না। কৌতুক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র কথাকে কিঞ্চিৎ বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, এই মাত্র। আমি বলিয়াছিলাম "লেখক মহাশয় একটি হিন্দু

আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন" ইত্যাদি। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "প্রথম, 'কল্পনা' শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু 'কল্পনা' করিয়াছি একথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষগুণ বর্ণনা করিয়াছি।"

উল্লিখিত প্রচারের প্রবন্ধে দুই জন হিন্দুর কথা আছে, একজন ধর্ম্মভ্রষ্ট আরেকজন আচারভ্রষ্ট। ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি বলিয়াছেন বটে 'আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি, তিনি' ইত্যাদি—কিন্তু আমাকর্ত্তৃক আলোচিত আচারভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখ স্থলে তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন—"আর একটি হিন্দুর কথা বলি।" কাল্পনিক আদর্শের উল্লেখ কালেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমে একটি সত্য উদাহরণ দিয়া তাহার পরেই সর্ব্বতোভাবে তাহার একটি বিরুদ্ধ-পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশে একটি কাল্পনিক উদাহরণ গঠিত করা অনেক স্থলেই দেখা যায়। প্রচারের লেখা হইতে এরূপ অনুমান করা যে কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। যদি স্বল্পবুদ্ধিবশতঃ আমি এরূপ অনুমান করিয়া থাকি তবে তাহা তরুণবয়সসুলভ ভ্রম মনে করাই বঙ্কিম বাবুর ন্যায় উদার হৃদয় মহদাশয়ের উচিত, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা উক্তি মনে করিলে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইব। বিশেষতঃ তিনি যখন প্রকাশ্যে আমাকে তাঁহার সুহৃৎশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন তখন সেই আমার গর্ব্বের সম্পর্ক ধরিয়া আমি কিঞ্চিৎ অভিমান প্রকাশ করিতে পারি, সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখে বলিয়াছেন—"তার পর 'আদর্শ' কথাটি সত্য নহে। 'আদর্শ' শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরাপান করে সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?"

প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম "তিনি একটী 'হিন্দুর আদর্শ' কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন" ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে—তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। "একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা" ও একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা" উভয়ে অর্থের কত প্রভেদ হয় পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দ্বিতীয় কথা—ভাবেও কি বুঝায় না? আদর্শ বলিতে আমি সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুর আদর্শস্থল মনে করি নাই, বঙ্কিম বাবুর আদর্শস্থল মনে করিয়াছিলাম। মনে করার কারণ যে কিছুই নাই তাহা নহে। প্রবন্ধ পড়িয়া এমন সংস্কার হয় যে বঙ্কিম বাবুর মতে, কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে দূষ্য হইয়া গেল তাহা

নহে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিলেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য তিনি এমন একটি চিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বিরুদ্ধাচার সমর্থন করিয়াও সাধারণের চক্ষে অপেক্ষাকৃত মনোহর আকারে বিরাজ করে। দুইটি চিত্রের মধ্যে কোন্ চিত্রে লেখক মহাশয়ের হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে, কোন্ চিত্রের প্রতি তিনি, (জ্ঞাতসারেই হউক্ আর অজ্ঞাতসারেই হউক্) পাঠকদের হৃদয়াকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। দুইটি চিত্রই যে তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে চিত্রের উপর তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটিকেই সম্পূর্ণ না হউক্ অপেক্ষাকৃত আদর্শস্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিম বাবু একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষে গুণে জড়িত একটি আদর্শও হইতে পারে। যে-কোন-একটা চিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।

তৃতীয় কথা,—কেহ বলিতে পারেন যে, আলোচ্য হিন্দুটিকে বঙ্কিম বাবু যদি মহত্তম আদর্শস্থল বলিয়া খাড়া করিয়া না থাকেন তবে তাহার চরিত্রগত কোন-একটা গুণ অথবা দোষ লইয়া এত আলোচনা করিবার আবশ্যক কি ছিল? কিন্তু আদর্শ হিন্দুর দোষ গুণ লইয়া আমি সমালোচনা করি নাই। বঙ্কিম বাবু নিজের মুখে যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে বলিয়াছেন—"যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়"—সেখানে তিনি নিজেরই মত ব্যক্ত করিয়াছেন—এ ত আদর্শ হিন্দুর কথা নহে।

বঙ্কিম বাবু যে দুইটি অসত্যের অপবাদ আমাকে দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আমি বলিলাম। কিন্তু যেখানে তিনি বলিয়াছেন "প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে" সেখানে আমার বক্তব্যের পথ রাখেন নাই। প্রয়োজন আছে কি না জানি না; যদি থাকিত তবে উদাহরণ দিলেই ভাল ছিল আর যদি না থাকিত তবে গোপনে এই বিষবাণক্ষেপণেরও প্রয়োজন ছিল না।

বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "লোকহিত" শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই এই জন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাঁহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

লেখকের নিজের সম্বন্ধে আর-একটি কথা আছে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন ভারতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি বড় বাড়াবাড়ি আছে। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিম বাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি কিন্তু বঙ্কিম বাবুকে

কোথাও গালি দিই নাই। তাঁহাকে গালি দিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজন তুল্য, তিনি আমা অপেক্ষা কিসে না বড়! আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে! তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমা-অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। আমার যে এতদূর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে তাঁহাকে অমান্য করিয়াছি কেবল মাত্র অমান্য নহে তাঁহাকে গালি দিয়াছি তাহা সম্ভব নহে। ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালি-গালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছো-হাটার ত কথাই নাই আঁষ্‌টে গন্ধটুকু পর্য্যন্ত নাই। যে স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে তাহা আক্ষেপ-উক্তি। "মেছোহাটা"ই বল আর "প্রার্থনা মন্দির"ই বল আমি কোথা হইতেও ফরমাস দিয়া কথা আমদানি করি নাই—আমি বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধার ধারি না—হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না, যিনি বিশ্বাস করেন করুন, না করেন নাই করুন্।

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—প্রথম সংখ্যক প্রচার বাহির হওয়ার পর রবীন্দ্রবাবুর সহিত আমার চার পাঁচ বার দেখা হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি কেন আমাকে প্রচারের উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই? করি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! মূল কথাটার সহিত তাহার কি যোগ? না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। সে সব ঘরের কথা। পাঠকদের বলিবার নহে। বর্ত্তমান লেখকের নানা দোষ থাকিতে পারে। দুর্ব্বল-স্বভাববশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বঙ্কিম বাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে। প্রথম যখন পড়িয়াছিলাম তখন স্বাভাবিক অনবধানতা বা মন্দবুদ্ধিবশতঃ উক্ত কয়েক ছত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারি। কিছুদিন পরে অন্য কোন ব্যক্তির মুখে এসম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া আমার মনে আঘাত লাগিতেও পারে। উক্ত প্রবন্ধ, দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় আমার মনে নূতন ভাব উদয় হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ এই যে, বাড়িতে প্রচার আসিবামাত্র কে কোন্ দিক হইতে লইয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্য ভাল করিয়া পড়িতে প্রায় বিলম্ব হইয়া যায়। আমার মনে আছে প্রথম খণ্ড প্রচার একটি পুস্তকালয়ে গিয়া চোখ বুলাইয়া দেখিয়া আসি। সকল লেখা পড়িতে পাই নাই। পরে এক-দিন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে হিন্দু ধর্ম্ম নামক প্রবন্ধের মর্ম্মটা শুনি কিন্তু তিনি সত্য মিথ্যা বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে সুবিধা অথবা অবসর অনুসারে বহু বিলম্বে উক্ত প্রবন্ধ প্রচারে পড়িতে পাই। কিন্তু এ সকল কথা কেন? আমার প্রবন্ধে আমি যদি কোন অন্যায় কথা না বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার আর কোন দুঃখ নাই।

আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এখন আর দুই-একটি কথা আছে। বঙ্কিম বাবুর লেখার ভাব এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তি-বিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখামুখী উত্তরপ্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে, বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম বাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই; তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আদি-ব্রাহ্মসমাজকে দুই এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই, যে, আদি ব্রহ্মসমাজের লেখকেরা উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিম বাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণমাত্রই যে অন্যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল। যদি উক্ত সমাজবর্ত্তী কেহ সত্যসত্যই অথবা ভ্রমক্রমেই এমন মনে করেন যে অন্য কোন মত তাঁহাদের মত-প্রচারের ব্যাঘাত করিতেছে, এবং দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সে মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না এবং তাহাতে কোন পক্ষেরই ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ভাল, এইরূপ না হওয়াই মন্দ। তবে, গালিগালাজ করা কোন হিসাবেই ভাল নহে সন্দেহ নাই। এবং সে কাজ আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিম বাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ নব্যহিন্দু সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিম বাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের বা "যোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের" কোন যোগই থাকিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে আরও অনেক মহারথীকে আরও গুরুতর রূপে আক্রমণ করিতে পারেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা ঠাকুর মহাশয়দের তাঁহাকে নিবারণ করিবার কোন অধিকারই নাই। আমি যদি বলি বঙ্কিমবাবু নবজীবনে অথবা প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহার এজলাসের সহিত অথবা ডেপ্যুটিম্যাজিষ্ট্রেটসমাজের সহিত তাহাদের সবিশেষ যোগ আছে তবে

সে কেমন শুনায়? আমার লেখাতেও কোন গালিগালাজ নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই। *

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্য্যক্ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদিব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদিব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিম বাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিম বাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদিব্রাহ্মসমাজ নানাদিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনই তাঁহার ধৈর্য্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিম বাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও যে বঙ্গসাহিত্যের পরম গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজ বিদেশী-দ্বেষী তরুণ বঙ্গসমাজে য়ুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং পাশ্চাত্যালোকে অন্ধ স্বদেশদ্বেষী বঙ্গযুবকদিগের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজপ্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছেন কিন্তু তৎসঙ্গেসঙ্গে হিন্দুহৃদয় বিসর্জ্জন দেন নাই—এই জন্য চারিদিক হইতে ঝঞ্ঝা আসিয়া তাঁহার শিখর আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু কখনও তাঁহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় নাই। আজি সেই পুরাতন আদিব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষপাত হইতে আদিব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবি-

* সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল তাহার সহিত বঙ্কিমবাবুর কি যোগ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলেন বঙ্কিম বাবু নবজীবনের লেখক তবে সে বিষয়ে আমিও তাঁহার সহযোগী বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি। অতএব সঞ্জীবনীর উক্ত লেখা আমার প্রতি আক্রমণই বা নহে কেন? যদি বলেন যে বঙ্কিম বাবু যে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন উক্ত প্রবন্ধে তাহার প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাও ঠিককথা নহে। নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ-প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পরে চন্দ্রনাথ বাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথাকাটাকাটি হইয়াছিল সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিম বাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

নয় নিবেদন এই যে আমি সরল ভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর।

কোথায়।

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে!

আমরাত সাথে রহিব না,
আমরাত কথা কহিব না,
একটি মুহূর্ত্ত পরে আমাদের ভালবাসা
আর নাহি পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

মোরা ব'সে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়!
মহা সে বিজন মাঝে হয় ত বিলাপ-ধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায় কোথা যাবে!

কঠিন অনন্ত এ জগৎ
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ!
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখ চাবে!
হায়, কোথা যাবে!

এই দেখ ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল।
পুরান' সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
অতি স্নেহ-ভাবে।
হায়, কোথা যাবে!

খেলা ধূলা পড়ে না কি মনে!
কত কথা স্নেহের স্মরণে!
সুখে দুখে শত ফেরে সে কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে!
হায়, কোথা যাবে!

চির কাল তরে হবে পর,
এ ঘর রবে না তব ঘর।
যারা তব কোলে যেত তারাও কি পরের মত
তাদেরো আর না ফিরে চাবে!
হায় কোথা যাবে!

হায় কোথা যাবে।
যাবে যদি, যাও, যাও, অশ্রু বারি মুছে যাও,
এই খানে দুঃখ রেখে যাও!
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে তাই যেন সেথা মিলে
মুদি আঁখি আরামে ঘুমাও!
যাবে যদি যাও!

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা।

মনের কথা যে মনে মনে চালিত হইতে পারে, কোন একটা অজ্ঞাতশক্তিপ্রভাবে মানুষে যে মানুষের মন জানিতে পারে, এ-কথা আমাদের দেশের কাছে নূতন কথা নহে। আমাদের দেশের জনশ্রুতি, প্রবাদ ইতিহাস, শাস্ত্র সকলই, মানুষের এই আশ্চর্য্য শক্তির অস্তিত্বগান গাহিতেছে, সুতরাং আমাদের দেশের জনসাধারণের যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকে, ত তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু কেবলি আমাদের দেশে নহে, বিজ্ঞানআলোকপ্রোজ্জ্বলিত, সভ্যতাভিমানী, গর্ব্বিত ইয়োরপেও এ বিশ্বাসের একেবারে অভাব নাই। হইলে কি হয়, যতক্ষণ এই বিশ্বাস একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইতেছে, ততক্ষণ ইহার মূল্য বড় অল্প, ততক্ষণ ইহাকে কুসংস্কার বলা যাইতে পারে। সেই জন্য বাস্তবপক্ষে এ বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সম্প্রতি ইংলণ্ডে মানসিকশক্তি-অনুসন্ধান-সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। মনের কথা মনে মনে চালিত হয় কি না এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া এ সভার সভ্যগণ যে ফল পাইয়াছেন আজ তাহারই কিছু কিছু সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে এই সভা প্রথম ইংলণ্ডে স্থাপিত হয়। মনের কথা মনে মনে চালিত হইতে পারে কিনা কেবল এই বিষয়টীর অনুসন্ধানই এ সভার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, মনের কথা পাঠ, দিব্য দর্শন, ইচ্ছাশক্তি সঞ্চালন এবং এই শ্রেণীর আরো কয়েকটি বিষয়, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে রীতিমত পরীক্ষা করাই এ সভার উদ্দেশ্য।

ডাবলিন কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপক ব্যারেট, ম্যানচেষ্টারের বিজ্ঞান-অধ্যাপক ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট, ব্রিষ্টলের রাজকলেজের অধ্যাপক সেলাশ, পদার্থের চতুর্থ অবস্থা আবিষ্কর্ত্তা ক্রুকস্, অধ্যাপক হেনরি সিজউইক, হাউস অব কমন্‌সের মেম্বর আর্থার ব্যালফোর ও জন হল্যাণ্ড, প্রভৃতি ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ ও সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এ সভার সভ্যরূপে মানসিক শক্তি অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়া ইহার গুরুত্ব বিশিষ্ট রূপে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অধ্যাপক হেনরি সিজউইকই এ সভার সভাপতি। আমাদের অজ্ঞাত কোন মানসিকশক্তি ইন্দ্রিয়ের অতীত রূপে কার্য্য করিতে পারে, কিনা, এ বিষয়ে আগে হইতে পক্ষ বিপক্ষ কোন মতই তাঁহারা প্রবর্ত্তনা করিতে চাহেন না, পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্য মিথ্যা ঠিক করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। তবে আজ কালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ মানসিক শক্তিসম্বন্ধে একটি যে বদ্ধমূল অবিশ্বাস দেখা

যায়, তাহা তাঁহাদের মতে প্রশংসনীয় কিম্বা বিজ্ঞান-সঙ্গত নহে। এই সভার প্রথম অধিবেশন কালে সভাপতি সিজউইক তাঁহার একটি বক্তৃতার মধ্যে এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন যে—"যদি বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষীদিগের কথার দশ ভাগের একভাগও সত্য বলিয়া দেখান যায়—তবে এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনার (যে সকল ঘটনার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে) সত্যতা সম্বন্ধে এই যে অমূলক অবিশ্বাস তাহা নিতান্তই নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। আমি বলি, অত যোগ্য সাক্ষীগণের এই সব ঘটনায় বিশ্বাস সত্ত্বেও তবু যে এখনো ইহার সত্যতায় সন্দেহ চলিয়াছে এবং এই সকল প্রশ্ন মীমাংসার জন্য এত লোকের দারুণ ঔৎসুক্য সত্ত্বেও—শিক্ষিত সমাজ যে এই অমূলক অবিশ্বাস লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ইহা একটি ঘোর কলঙ্কের কথা। *

তাঁহারা চান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণের উপর প্রমাণ ঢালিয়া যদি পারেন এ অবিশ্বাস ধুইয়া ফেলেন। সিজউইক বলিতেছেন, "এত দিন হইতে এই অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে এবং ইহার শিকড় এত বহুদিকে প্রসারিত হইয়াছে, যে ইহাকে মারা বড় সহজ নহে। তবে যদি কোন মতে ইহাকে মারিতে পারি ত সে কেবল প্রমাণের রাশির নীচে ইহাকে জীবন্তে শুকাইয়া শুকাইয়া। আমরা কেবল প্রমাণের উপর প্রমাণ সংগ্রহ করিব; পরীক্ষার উপর পরীক্ষা করিব, এবং সেই পরীক্ষার সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দিগ্ধমনা বাহিরের লোকের মুখাপেক্ষা করিব না, সেই প্রমাণের আধিক্যের উপর আপনাদের বিশ্বাস গঠিত করিব।" +

তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার পক্ষে ইহাই একমাত্র ও প্রকৃত উপায় সন্দেহ নাই। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে তবেই মানসিক শক্তির অস্তিত্ব তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তবেই ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া বিজ্ঞানের একটি নূতন যুগ আনিতে পারেন, জ্ঞানের একটি সম্যক নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীকে একটি নূতন পথে চালাইতে পারেন।

কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাঁহারা এ সম্বন্ধে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের দেখিতে হইবে।

মনের কথা চালনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়—এ সম্বন্ধে তাঁহারা কিরূপ প্রমাণ পাইলেন এইখানে তাহাই শুধু দেখিব।

মনের কথা সচরাচর আমরা কি উপায়ে জানিতে পারি? প্রধানতঃ কোন ব্যক্তির কথা শুনিয়া, তাহা ছাড়া ইঙ্গিতে, কখনো কখনো বা কোন ব্যক্তির কেবল মাত্র মুখের ভাবেও তাহার মনের কথা জানা যায়। এই রূপে যে কোন প্রকারেই হউক কাহারো মনের কথা জানিতে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য অবশ্য আবশ্যক বলিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের জ্ঞাত কোন ইন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যে, কেবল মন দিয়া মনের কথা জানিতে পারা যায় কি না, চিন্তার ছাঁচ তুলিয়া লওয়া যায় কি না, তাহাই মাত্র এই সভার সভ্যগণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। মনের কথা চালনার যে রকম দৃষ্টান্তে ইন্দ্রিয়ের কিছু মাত্র সাহায্য আছে বলিয়া বুঝা যায়, সে রকম দৃষ্টান্ত ইঁহারা বাস্তবিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন না—এমন কি, যদি দুইটি বিশেষ ব্যক্তির ভিতর কেবল মনের কথা চালিত হইতে দেখা যায়, তাহাও তাঁহারা প্রমাণের মধ্যে ধরেন না।

তাঁহারা শুনিতে পান, ডারবিসারে ক্রিয়ারি নামে একজন সম্ভ্রান্ত পাদরির কয়টি বালিকা কন্যা আশ্চর্য্য রূপ মনের কথা বলিতে পারে, ইহা শুনিয়া তাঁহারা এই বালিকাগণকে লইয়াই সর্ব্ব প্রথমে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ইহারা ৫টি ভগিনী, সকলেই সুস্থ বলিষ্ঠ ও নীরোগ, বয়স সর্ব্ব জ্যেষ্ঠার আঠার—ও সর্ব্ব কনিষ্ঠার ১১ বৎসর মাত্র।

ইহাদের মধ্যে ছোটটি ছাড়া আর সকলেই মনের কথা বলিতে পারিত। নিম্নলিখিত প্রণালীতে এই বালিকাদিগকে পরীক্ষা করা হইত। যে বালিকা মনের কথা বলিবে—তাহাকে অন্য স্থানে পাঠাইয়া তাহার অসাক্ষাতে একটি ঘরে কোন একটি কথা কিম্বা কোন জিনিস কেহ মনে করিতেন, তাহার পর বালিকা সে ঘরে আসিয়া, কাহারো পানে না চাহিয়া, একটি কথা না কহিয়া, নত মুখে নিস্তব্ধে দ্বারের কাছে দাঁড়াইত। এমন কি, কখনো কখনো পরীক্ষার-ঘরের মধ্যে সে একেবারে না আসিয়া অন্য লাগাও রুদ্ধ ঘরে থাকিয়া দ্বারের ভিতর হইতে মনের কথা বলিত। তাস ও সংখ্যা লইয়াই বেশীর ভাগ এরূপ পরীক্ষা হইয়াছে। এই পরীক্ষার মোট ফল সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

তাসের পরীক্ষায় প্রত্যেক ৬১০ বার জিজ্ঞাসার মধ্যে ১১৮টি উত্তর, তাহারা একবারেই ঠিক বলিয়াছে, আর ৭৬ উত্তর একবার ভুল বলিবার পর দ্বিতীয় বারে ঠিক বলিয়াছে। এখন ৬১০ এর মধ্যে ১১৮টি ঠিক হইলে গড়ে ৫·১৭ মধ্যে এক এই হিসাবে অর্থাৎ কিছু অধিক প্রতি ৫ বারের ভিতর

* "That the dispute as to the reality to these marvellous phenomena, —of which it is quite impossible to exaggeratc the Scientific importance, if only a tenth part of what has been alleged by generally credible witnesses could be shewn to be true—I say it is a scandal that the dispute as to the reality of these phenomena should still be going on, that so many competent witnesses should have declared their belief in them, that so many others should be profoundly interested in having the question determined, and yet that the educated world as a body, should still be simply in the attitude of incredulity."

Proceedings of the society for Psychical Research.

+ Proceedings of the society for Psychical Research. Vol I. Page 12. Para 1.

একবার করিয়া ঠিক বলা হইল। কেবল দৈবক্রমে যদি বালিকাগণের উত্তর ঠিক হইয়া যাইত, তাহা হইলে এরূপ হইত না, দৈবাৎসিদ্ধি অর্থাৎ যাহাকে চান্স বলা যায়, তাহার গণনার নিয়ম স্বতন্ত্র, সে নিয়ম অনুসারে ৫২ বারের মধ্যে ১ বার ঠিক হইবার কথা।

কেবল এই পর্য্যন্তই সীমা নহে, ইহা হইতে আরো অধিক মাত্রায় একবার বালিকাগণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। একবার উপরি উপরি ২৬০ প্রশ্নের মধ্যে প্রথমবারেই ৬৮টি ঠিক হইয়াছিল, এবং ৩৫টি একবারের পর দ্বিতীয়বারে ঠিক হইয়াছিল, তাহা হইলে এখানে ৩৮২ মধ্যে এক, অর্থাৎ কিছু অধিক তিনবারের মধ্যে এক বার করিয়া ঠিক হইতেছে, চান্স ধরিলে যাহা কখনই হইতে পারে না।

ইহা ছাড়া নামের পরীক্ষাতেও বালিকাগণ তাহাদের ক্ষমতার কি রূপ আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা দেখিয়া বুঝা যাইবে।

মনে করা হইয়াছে	উত্তর
উইলিয়ম ষ্টব্‌স্	"উইলিয়ম ষ্টবস,"
সোফিয়া শ	"সোফিয়া শ,"
টিমথি টেলর	(প্রথম বারে) "টমটেলর"—(দ্বিতীয় বারে) "টিমথিটেলর,"
আইজ্যাক হারডিং	"আইজ্যাক হারডিং"
অ্যালবার্ট স্নেলগ্রেব,	(প্র) "অ্যালবার্ট সিনগ্রোর"—(দ্বি) "অ্যালবার্টগ্রোবার,"
টম থম,	"টম থম,"
সিনড্রেলা,	"সিনড্রেলা,"
চেষ্টার,	(প্র) "ম্যানচেষ্টার"——(দ্বি) "চেষ্টার"
পাইপ,	(প্র) "প্লেট"——(দ্বি) "পেপার,"——(তৃ) "পাইপ,"
কর্ক,	"ফর্ক"
কর্কস্ক্রু	"কর্কস্ক্রু"
টংশ্	(প্র) "ফায়ার আয়রণস্"——(দ্বি) "পোকার" *

* টংশ্, ফায়ার-আয়রণ ও পোকার এই কয়টী কিরূপ কাছাকাছি ধরণের জিনিষ পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন।

এই তালিকায়, যে যে স্থলে উত্তরগুলি পূর্ণ ঠিক হয় নাই, সেখানেও তাহা আসলের কত কাছাকাছি হইয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, প্রকটার বলিতেছেন,

"It appears to me that the failures in these and other cases yet to be cited are as important a part of the evidence in favour of mind reading and mind ruling, as the successes."

মর্ম্ম এই, "আমার মনে হয় যে যে স্থলে উত্তর ঠিক হইয়াছে সেখানেও যেমন, যেখানে ঠিক হয় নাই সেখানেও তেমনি মনের কথা পাঠের পক্ষ সমর্থন হইতেছে।

কি রূপ করিয়া তাহারা মনের কথা ধরিতে পারে—জিজ্ঞাসার উত্তরে বালিকারা বলিয়াছিল, প্রথমেই কাছাকাছি এক রকমের দুই তিনটা কথা, কিম্বা জিনিস তাহাদের মনে আসে, তাহার মধ্যে আবার যেটা তাহারা মনের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট দেখিতে পায়, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেইটা বাছিয়া লইয়া তাহারা বলে।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন ঋষিগণ বেদ উপবেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং যেরূপে বেদ বিভাগ এবং তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে চরণ ব্যূহে যাহা উক্ত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

চরণ ব্যূহমতে "ঋগ্বেদস্য উপবেদঃ আয়ুর্ব্বেদঃ," অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণ্যুবেদঃ।" (১) অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ এবং অস্ত্রশাস্ত্র অথর্ব্ববেদের উপবেদ।

(১) শব্দকল্পদ্রুম, আয়ুর্ব্বেদ শব্দে দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীতে যত প্রাচীন গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তপাঠে অবগত হওয়া যায় সে সময়ে নৃপতিগণ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির নিমিত্ত যত্ন করিতেন। (২) জল যে বহুরোগনাশক ঔষধ এবং জলে যে বিবিধ ঔষধ উৎপন্ন হয় তাহাও সে সময়ে ভারতবাসীগণ জানিতেন। (৩) সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত না

(২) শতন্তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু * * (ঋগ্বেদে ইত্যাদি অনেক আভাস পাওয়া যায়।

(৩) "অপ্ স্বস্তর মৃতমপ্সু ভেষজমপামুত

হইলেও ঋগ্বেদের পূর্ব্ব সময় হইতেই যে ভারতে আয়ুর্ব্বেদের সূত্রপাত হইয়া ছিল. এতদ্দ্বারা তাহার সম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে ব'লিয়াছেন :

ইহখল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব

প্রজ্ঞাঃ, শ্লোক শত সহস্র মধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ।

ততোহল্পায়ুষ্টমল্প মেধস্তঞ্চাবলোকানরাণাং ভূয়োহষ্টধা প্রণীতবান''

(সুশ্রুত ১ম অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গরূপে,সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন। অনন্তর মানবগণের অল্পায়ু ও অল্পমেধা দেখিয়া আটভাগে বিভক্ত করিয়া পুনরায় সংক্ষেপে আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন।

চরক সংহিতায়ও আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলা হইয়াছে :— * * *

পরবর্ত্তী ভাবমিশ্র প্রভৃতিও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন :— * * *

বাহুল্য ভয়ে আমরা সংস্কৃত শ্লোকগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

সৌনক মুনি কৃত "চরণ ব্যূহ" গ্রন্থানুসারে আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ আবার সুশ্রুত চরক প্রভৃতির মতে উহা অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ সুতরাং এ উভয় মতের কোনটী সত্য ? আমাদের মতে এ উভয় মতেই সত্য নিহিত আছে। কারণ ঋক্ যজু সাম এই তিন বেদের কোন কোন অংশ সংগ্রহ করিয়া অথর্ব্ব নামক ঋষি অথর্ব্ববেদ প্রণয়ণ করেন। আয়ুর্ব্বেদ প্রথমতঃ ঋগ্বেদেরই অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। অনন্তর অথর্ব্ব ঋষি বেদত্রয় হইতে অন্যান্য অংশ সংগ্রহ করিয়া ঋগ্বেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদকে ঋগ্বেদ বা অথর্ব্ববেদ ইহার যে কোন গ্রন্থের বেদের অন্তর্গত বা উপবেদ বলিলে দোষ হয় না। ঋগ্বেদে বা অথর্ব্ববেদে যে মূল আয়ুর্ব্বেদ ছিল তাহা বহুশতাব্দী যাবৎ লোপ পাইয়াছে। সে মূল আয়ুর্ব্বেদ, চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিগণও দেখিয়াছেন কি না, সন্দেহ। আত্রেয় ধন্বন্তরি অগ্নিবেশ হারীত কণাদ প্রভৃতি ঋষিগণ সেই মূল গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাতে স্বীয় স্বীয় অভিমত গুরূপদেশ প্রভৃতি সংযুক্ত করিয়া যে যে সংহিতা প্রণয়ণ করেন তাহাই বর্ত্তমান সময়ে মূল গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় কণাদ সংহিতা প্রণেতা মহর্ষি কণাদের মতে আয়ুর্ব্বেদ কোনও বেদের উপবেদ নহে। আয়ুর্ব্বেদই এক স্বতন্ত্র বেদ তিনি আয়ুর্ব্বেদকে পঞ্চমবেদ বলিয়াছেন ; যথা :—

যদ্বক্তেভ্যঃ পঞ্চ সংখ্যা গতেভ্যো,

বেদ জাতা ঋক যজুঃ সাম ভেদাঃ।

আয়ুর্ব্বেদোহথর্ব্ববেদশ্চ তস্মিন্নাস্তাং শম্ভৌ"

আয়ুর্ব্বেদঃ পঞ্চমো বৈদ্যকাখ্যো বেত্তা কশ্চিত্তস্য নাস্তে মহেশাৎ।

তস্মাদ্ধাতাধৈ্যত তস্মাৎ তুরাষাট, তস্মাজ্ জ্ঞাত্বা বক্তুমর্হামিশাস্ত্রং।

(কণাদ সংহিতা)

অর্থাৎ যাঁহার পাঁচ মুখ হইতে ঋক্, যজু এবং সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে সেই শিবেই আয়ুর্ব্বেদ এবং অথর্ব্ববেদ বর্ত্তমান ছিল। বৈদ্যকাখ্য আয়ুর্ব্বেদই পঞ্চমবেদ ; মহেশ ভিন্ন তাহা আর কেহই জানিতেন না। শিবের নিকট ব্রহ্মা, এবং ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র ইহা অধ্যয়ন করেন। সেই ইন্দ্রের নিকট অবগত হইয়াই আমি এই আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ণ করিতে সক্ষম হইতেছি।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণেও আয়ুর্ব্বেদকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে ; যথাঃ—

"ঋগ্ যজুঃ সমাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।

বিচিন্ত্য তেষামর্থং চৈবায়ুর্ব্বেদং চকারসঃ।

কৃত্বাতু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌবিভুঃ॥

(ব্রহ্ম বৈঃ পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ১৬শ অধ্যায়)

প্রস্থান ভেদ প্রণেতা দণ্ডী মধুসূদন সরস্বতী বলেন :—

"আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্ববেদোহর্থ শাস্ত্রঞ্চেতি চত্বার উপবেদাঃ।"

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমস্কন্দের উপসংহার স্থলের টীকায় তট্টীকাকার রত্নগর্ভ ভট্টাচার্য্য ও বলিয়াছেন 'উপবেদা আয়ুর্ব্বেদাদয়ঃ"

"আয়ুর্ব্বেদ উপবেদ না স্বতন্ত্রবেদ," এ বিষয়ে যেমন নানা মুনির নানা মত সেই রূপ আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক প্রভৃতি লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়।

(ক) মহর্ষি কনাদের মতে ; শিবই আয়ুর্ব্বেদের আদি গুরু ; শিবের নিকট ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের নিকট কণাদ ইহা শিক্ষা করেন।

(খ) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে, ব্রহ্মাই আদি গুরু তাঁহার নিকট সূর্য্য এবং সূর্য্যের নিকট ধন্বন্তরি, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, চাবণ, জনক, বুধ, প্রভৃতি ষোল জন শিষ্য আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন।

(গ) ধন্বন্তরির মতে ব্রহ্মার নিকট দক্ষপ্রজাপতি তাঁহার নিকট অশ্বিনী কুমারদ্বয়, তাঁহাদিগের নিকট ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের নিকট ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। তথাহিঃ—

ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতিরধিজগে, তস্মাদশ্বিনাবশ্বিভ্যামিন্দ্র, ইন্দ্রাদহং ময়াত্বিহ প্রদেয় মর্থিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ।

(সুশ্রুত, ১ম অধ্যায়)

(ঘ) হরিবংশ মতে—ধন্বন্তরি, ভরদ্বাজ মুনির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

"কাশীরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগ প্রণাশনঃ।

আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্য ———"

(ঙ) চরকের মতে—ব্রহ্মা হইতে দক্ষপ্রজাপতি, দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার দ্বয়, তাঁহাদিগ হইতে ইন্দ্র, ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ হইতে আত্রেয়াদি মুনিগণ, এবং আত্রেয়ের নিকট অগ্নিবেশ হারীত প্রভৃতি ছয়জন মুনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

'ব্রহ্মণাহি যথা প্রোক্তং আয়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ।

জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌতু পুনস্ততঃ॥

প্রশস্তয়ে।" এবং "অপমুমে সোমোহব্রবীদন্ত র্বিশ্বানি ভেষজাঃ। অগ্নিঞ্চ বিশ্বসম্ভুব মাপশ্চ বিশ্বভেষজাঃ। (ঋঃ বেঃ) সোমরসও তখন ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত, যথা "গয়স্কানো অমিহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ ১৪ অ, ৯১ সূঃ।

অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদেহি কেবলং

ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজ স্তস্মাচ্ছক্র মুপাগমৎ।

... ...

তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।

... .

ঋষয়শ্চ ভরদ্বাজাজ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতং।

... ...

অথ মৈত্রী পরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্ব্বসুঃ।
শিষ্যেভ্যোদদতবান্ষড়ভ্যঃসর্ব্বভূতানুকম্পয়া
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতূকর্ণঃ পরাশরঃ
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্ব্বচঃ।

চরক, সূঃস্থান ১ম অধ্যায়ঃ।

(আত্রেয় মুনির অপর নামই পুনর্ব্বসু)

(চ) হারীত সংহিতার প্রতি সংস্কার কর্ত্তা বলিয়াছেন—

আদৌযদ্ ব্রহ্মণা প্রোক্তং ইন্দ্রেণ তদনন্তরং।
ধন্বন্তরিস্তদাপ্রোক্তং অশ্বিনৌ যমবাক্সনা।(?)

(হারীত, শারীরস্থানের উপসংহার)

(ছ) বাগ্‌ভটের মতে, ব্রহ্মার নিকট দক্ষ, দক্ষের নিকট অশ্বিনীকুমার দ্বয়, তাহাদের নিকট ইন্দ্র, তাঁহার নিকট আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট অগ্নিবেশ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ণ করেন—যথাঃ—

"ব্রহ্মা স্মৃত্বায়ুষো বেদং প্রজাপতি মজিগ্রহৎ।
সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রি পুত্রাদিকান্মুনীন॥
তেঽগ্নিবেশাদিকাংস্তেতু পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে।

(বাভট)

বাহুল্য ভয়ে আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না। এক্ষণ দেখা যাইতেছে, উদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের একটীর সহিত অন্যটীর কিছু না কিছু অনৈক্য আছেই, এবং কোনটীর সহিত বিষম মতভেদও রহিয়াছে। তবে ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র পর্য্যন্ত চরক ও সুশ্রুতে বেশ ঐক্য আছে। বাগ্‌ভটে ইন্দ্রের শিষ্য লইয়া ও হরিবংশে ধন্বন্তরির গুরু লইয়া কিছু গোল যোগ দেখা যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সুশ্রুত ও চরকের মতই অধিক প্রামাণ্য॥

মহর্ষি কণাদের মতে, আয়ুর্ব্বেদ প্রথমতঃ এক মাত্র রুদ্রেই বর্ত্তমান ছিল তাঁহার নিকট উহা ব্রহ্মা অধ্যয়ন করেন। একথাটী আপাততঃ নূতন বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক নূতন নহে। কেননা স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি মতে রুদ্রই শ্রুতি তন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের একমাত্র আধার, (৪) তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মা ঐ সমস্ত প্রচার করেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে, স্বাস্থ্য ও বলবীর্য্যাদি লাভের জন্য গৃৎসমদ প্রভৃতি বেদ ঋষিগণ রুদ্রকে প্রার্থনা করিয়াছেন; তাঁহারা রুদ্রকেই ভিষগ্‌দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন। রুদ্র প্রদত্ত ঔষধাদিই অধিক স্বাস্থ্যকর ও বলপ্রদ বলিয়া যে ঋষিদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঋগ্বেদে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ও সর্ব্বরোগ নাশক পারদের অপর নাম

(৪) মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব ২৮৫ অধ্যায়, অনুশাসন পর্ব্ব ১৭শ এবং ১৮শ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

"রুদ্রতেজ" বা "রুদ্র"। কথিত আছে রস-(পারদ) সংযুক্ত ঔষধ গুলির অধিকাংশই রুদ্র কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। রুদ্রভাষিত তন্ত্র সমূহ হইতেই এই সমস্ত ঔষধ সংগৃহীত হইয়াছে। এই নিমিত্তই "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" প্রভৃতি রস গ্রন্থের প্রণেতাগণ রুদ্রকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। রুদ্রই বৈদ্যসার নামে চিরকাল সকলের নিকট পরিচিত। বহুবিধ তৈল ঘৃতও রুদ্রভাষিত বা বৈদ্যনাথ-ভাষিত বলিয়া প্রশংসিত। (৫)

এখন দেবলোকের বিষয় যাউক, নরলোকে কোন কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার আরম্ভ হয় তৎ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত।

হুগলির ইমাম বাড়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছবি।

দেড় শত বৎসরেরও পূর্ব্বেকার কথা হইতেছে; এই সময় একদিন দ্বিপ্রহরের পর নৌকা হইতে হুগলি সহরের দিকে চাহিয়া দেখ—সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে। এখন শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর ন্যায় শ্বেত প্রাসাদগুলি, একটির পর একটি সারি বাঁধিয়া গঙ্গা উপকূলে শোভা পাইতেছেনা, প্রাসাদের আশে পাশে, ছোট বড় গাছ গুলি, যেখানে যেটি শোভা পায় সেখানে সেটি সাজান নাই। কোথায় বা খানিকটা জায়গা জুড়িয়া বড় ছোট গাছের রাশি জঙ্গল বাঁধিয়াছে, গায়ে গায়ে ঘেসাঘেসি করিয়া আপনাদের গাঢ় আলিঙ্গনে অবনত হইয়া লতায় জটাজুট লইয়া নদীতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই জঙ্গলের পরেই হয়ত খানিক দূর লইয়া একটি আর গাছ দেখা যায় না, সেখানে সারি সারি, চক্রের মত, আঁকা বাঁকা, নানা গড়নে সাজিয়া ছোট ছোট পাতার কুটির গুলি উইঢিবির মত প্রকাশ পাইতেছে। কোথায় বা এক একটি বড় বড় বট অশ্বত্থের রাশি রাশি পাতার ফাঁক দিয়া এক একটি পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী অতি দীন হীন ভাবে উঁকি মারিতেছে, আবার কোথায় বা উপকুল যোড়া এক বিচিত্র উদ্যান যুক্ত বিচিত্র বৃহৎ অট্টালিকা, চারিদিকের ছোট কুটীরদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, আশে পাশের বড় বড় গাছ গুলির প্রতি উপেক্ষা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। আর

(৫) মহাভারতের অনেক স্থানেও রুদ্রকে "বৈদ্য শ্রেষ্ঠ" ও ধন্বন্তরি বলা হইয়াছে।

এইরূপ একটি প্রাসাদের বাতায়নে একটি ছোট সুন্দর মুখ ফুটিয়া তাহার মধুররূপে উপকূলের কবিতাময় ভাবটি আরো ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যুবতী বাতায়নে বসিয়া কি সুঁচের কাজ করিতেছিলেন, কাজ করিতে করিতে কচি কচি আঙ্গুলগুলি বুঝি ক্লান্ত হইল, আনত মৃণাল কণ্ঠ, বুঝি ব্যথিত হইল, একবার কাজ ছাড়িয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশে মেঘের স্তরের উপর স্তর, পাছে একটি হইতে একটি সরিয়া পড়ে, একটি হইতে একটির বিচ্ছেদ হয়—তাহারা কত না ভয়ে ভয়ে কতনা প্রাণপণে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আলিঙ্গন করিয়া আছে—কিন্তু হায় দেখিতে দেখিতে তবু ঐ স্তরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, একটি হইতে একটি সরিয়া পড়িতেছে,—ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে। যুবতীর হৃদয়েও সহস্র চিন্তা আসিয়া সেই মেঘ পুঞ্জের মত স্তূপ বাঁধিতে লাগিল। এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার চোক টিপিয়া ধরিল। মুন্না চমকিয়া উঠিল, একবার সহসা কি যেন কি আশায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া যুবতী হাসিয়া বলিল, 'বুঝিয়াছি করীম, চোখ ছাড়' করীমও হাসিয়া চোখ ছাড়িয়া মুন্নার চোখের উপরে একখানি ছবি ধরিয়া বলিল,"কেমন বল দেখি"। নামেতেই সকলে বুঝিয়াছেন ইঁহারা হিন্দু নহেন। করীম ও মুন্না দুজনে ভ্রাতা ভগিনী। তবে ঠিক আপনার ভাই বোন নহে। মুন্নার মাতার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহের সন্তান করীম। তাহার পর তিনি বিধবা হইয়া ঐ সন্তানটিকে লইয়া আবার বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয় বিবাহে মুন্নার জন্ম। করীম ও মুন্না বরাবর এক বাড়ীতেই থাকিত, উহারা দুইজনে প্রায় সমবয়স্ক বলিলেই হয়, দু-এক বছরের মাত্র ছোট বড়, সেই জন্য উহাদের মধ্যে মানোর ব্যবধান নাই, সমকক্ষ ভাবেই উহারা পরস্পরকে ভাল বাসে। করীম দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক, উন্নত ললাট পূর্ণায়তন নয়ন উদার ভাব জ্যোতি পূর্ণ; নবীন শ্মশ্রু শোভিত গৌর বর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী, অথচ সে তেজ, অনুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত প্রশস্ত বক্ষ শালী সুগঠন বলিষ্ঠ দেহ, যেন শত শত দুর্ব্বলের আশ্রয় নিকেতন। তাহার সেই স্নেহানুরাগের সবল আশ্রয়ের ছায়ায় দুর্ব্বল মুন্নাকে সে যেন অতি যত্নে রক্ষা করিতে চায়।

করীমের হাত হইতে ছবিটি স্বহস্তে লইয়া মুন্না করীমের দিকে ফিরিয়া বসিল তাহার পর হাসিয়া অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে বলিল এমন ভাল ছবি কোথায় পেলে? কে দিলে?" করিম বলিল, "কেন দেবে আবার কে? অমনি কি কিছু পাওয়া যায় না?"

মুন্না। "এমন ভাল জিনিস অমনি পাওয়া যায় তাত জানতুম না"

করিম। "কেন ভাল জিনিষের কি আর দর আছে? এ পর্য্যন্ত তাতো দেখলুম না"

মুন্না। "তবে বুঝি এখনো জহরী কেউ জন্মায়নি, তাই জহরের এত অনাদর,

করীম। "তুই ভাই আদরটা একবা

দেখিয়ে দে, আমি বেচতে এসেছি, একটা মোটা দর বল,"

মুন্না হাসিয়া বলিল, "তোমার বেলায় ভাল জিনিষের দর নেই, তুমি পাও কুড়িয়ে, আর অন্যের বেলা মোটা দর চাও, বেশত মজা।

করিম। "বুঝিলিনে, এই হচ্ছে সেয়ানা লোকের কাজ," মুন্না ছোট মাথাটি নাড়িয়া, অলক গুচ্ছগুলি দুলাইয়া একটু মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল—"তুমিই এক সেয়ানা আর জগৎ শুদ্ধ নির্ব্বোধ বুঝি,"

করিম। "নিদেন জগতের অর্দ্ধেক লোক মেয়ে জাত। তাইত তোর কাছে আগে বিক্রির জন্য এসেছি। কত দিবি বল।" বলিতে বলিতে করিম একটু হাসিল, সে হাসিতে তাহার শুভ্র ললাটে ঈষৎ বিদ্রুপময় ভাবের যেন রেখা পড়িল, মুন্না বলিল, "মরে যাই আর কি, উনি যা পেলেন কুড়িয়ে, তাই আমি পয়সা দিয়া কিনিব। এক কানাকড়িও না।" করীম ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তুমি কানাকড়িও দিলে না, কিন্তু এর মধ্যে এর হাজার টাকা দাম উঠিয়াছে।" মুন্না হাসিয়া বলিল, "এমন নির্ব্বোধ কেসে?"

করিম। "সে নির্ব্বোধ আর কেউ না, আমার সুযোগ্য ভগিনীপতি মহম্মদ সলীম।"

স্বামীর নাম শুনিয়া মুন্নার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, হাসির রেখাটি অধর হইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল। এ কথা শুনিলেই মুন্নার কষ্ট হইবে, তাহা করিম জানিত, কিন্তু সেই সম্ভাবিত কষ্টটাকে উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে প্রথম হইতে ওরূপ তামাসার ভাবে করিম কথা পাড়িয়াছিল। মুন্নাকে বিষণ্ণ দেখিয়া করিম তামাসা রাখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমি ঠাট্টা করিতেছি না, সত্যই হাজার টাকার বিনিময়ে মসীম এই ছবিখানি পাইয়াছেন, এরূপ করিয়া আর কদিন চলিবে, অমন অতুল ঐশ্বর্য্য সবত যায় যায়, তুমি কি একটি কথা কহিবে না"।

চোখের জল চোখে রুদ্ধ করিয়া মুন্না বলিলেন, "ভাই যাহার ধন তিনি এরূপ করিলে আমার কি হাত? আমি কে"। সে কথায় সে স্বরে করীমের সুন্দর মুখ কাল হইয়া পড়িল, ভাসন্ত চোখে যাতনা ফুটিয়া বাহির হইল—একটু পরে একটুখানি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া করীম বলিল "ধন কার? তোমারি কি সব ধন নহে? তোমার মুখে ঐ কথা শুনিলে একজন বালকেও হাসিবে। সকল স্ত্রীলোকে যদি তোমার মত হইত তবেত দেখিতেছি জগতের ধারা উলটাইয়া যাইত"।

মুন্নার পিতার ঐশ্বর্য্যেই মুন্নার স্বামী ধনী সত্য, কিন্তু মুন্না কখনো ও ভাবে তাহা দেখে নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে হইত না, যে উহা তাহার স্বামীর নহে মুন্নার নিজের ধন। ভ্রাতার কথায় মুন্না আশ্চর্য্য হইল, মুন্না ক্রুদ্ধ হইল, মুন্না বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। করীম তাহা বুঝিতে পারিল—কথাটা শামলাইয়া লইবার ইচ্ছায় বলিল "কিন্তু যার ধন সে যদি পাগল হইয়া

যাহা ইচ্ছা করে, তবে সে পাগলকে কি কেহ নিরস্ত করিবে না"—

তাত সত্য, কিন্তু মুন্না কেমন করিয়া স্বামীকে বলিবে? মুন্না যে তাঁহাকে কতবার কাঁদিয়া, কত মিনতি করিয়া, কত করিয়া বলিয়াছে, তাহাতে কি কোন ফল হইয়াছে? তিনি কি তাহাতে একবার ভ্রুক্ষেপ করিয়াছেন? তবে আবার মুন্না কি করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে যাইবে? অভিমান করিয়া যে মুন্না নীরব থাকিতে চাহে তাহা নহে, মুন্নার অভিমান নাই। যে হৃদয় একবার প্রেম প্রতিদান পাইবার পর সে প্রেমে সন্দেহ করিয়াছে, যে সন্দেহে যে অবিশ্বাসে বিশ্বাস লুকাইয়া রহিয়াছে, যে নিরাশায় এখনো আশা, ভরসা দিতেছে, সে হৃদয়ে অভিমান আছে।—কিন্তু মুন্না অভিমান করিবে কেন? মুন্নার মনে স্বামীর ভালবাসার আশা বিন্দু মাত্র নাই, সে সন্দেহে বিশ্বাসের রেখা মাত্র নাই, স্থির-নিরাশায় মুন্নার হৃদয় গঠিত, মুন্না অভিমান করিবে কি? মুন্না যে স্বামীকে কিছু বলিতে চাহে না—সে তাহা হইতেও অধিক দুঃখে, অধিক কষ্টে। মুন্না তাহার সমুখে যাতনায় অশ্রু নদী বহাইয়াছে, তিনি একবার ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, প্রাণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস টুটিয়া যদি আপনা হইতে কোন কথা বাহির হইয়াছে তিনি না শুনিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যদি কখনো আত্মহারা হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির আশার ন্যায় স্বামীর চরণ ধরিয়াছে তিনি সেই নির্ভরকারী লতাকে নির্দয়ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্নেহের চক্ষে অনুগ্রহ চক্ষে একবার চাহিয়া দেখেন নাই। সেই অবধি যাতনার তীব্র অনলে হৃদয় ভস্মীভূত করিলে হৃদয়ের অগ্নি নিশ্বাস গভীর নিশীথের বায়ু তরঙ্গে মুন্না মিশাইতে থাকে, উন্মত্ত দুঃখের অশ্রু লহরী বরফের মত হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়া শুকাইয়া ফেলে, তবু কখনো স্বামীর কাছে তাহা প্রকাশ করে না।

কিন্তু আজ মুন্নার প্রাণের ভিতর স্বামীকে যে কথা কহিবার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে সে মুন্নার নিজের কোন কথা নহে, তবে ইহাতে সঙ্কোচ কিসের? মুন্না ভীরু নিস্তেজ হৃদয় পাষাণ বলে বাঁধিয়া স্বামীকে একবার এ কথা বলিয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিল। নিজের জন্য হইলে সহস্র কষ্টেও মুন্না বলিত না—কিন্তু স্বামী আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিতে বসিয়াছেন, মুন্না একবার সাবধান করিবে না? স্বামী তাহার কথা শুনিবেন না সে তাহা জানে—তবু সে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া একবার তাহাকে বুঝাইবার সঙ্কল্প করিল, তার পর আস্তে আস্তে করীমকে বলিল "তিনি কি আমার কথা শুনিবেন? আচ্ছা আমি একবার বলিয়া দেখিব"—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার।

ক্রমে বেলা হইল, মুন্না হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখিয়া সাংসারিক কর্ম্মে উঠিয়া গেল, করীম বাহিরে চলিয়া গেল। রোজ যেরূপ কাজ কর্ম্ম করে মুন্না সে দিনও সেইরূপ করিল—সন্ধ্যা হইলে রোজ যেরূপ পিতাকে বসিয়া খাওয়ায় তেমনি হাসি মুখে তাহার কাছে বসিয়া, তাঁহার সহিত গল্প করিয়া, আদর করিয়া খাওয়াইল, হাসির মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য কেবল মুন্না অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল, গল্পের মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল, একটি মাত্র ছোট খাট নিশ্বাস কে জানে কেমন সহসা বাহির হইয়া পড়িতেছিল মাত্র। মুন্নার পিতা সেই হাসির ছটার মধ্যে গল্পের উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুক্কায়িত অশ্রু জল দেখিতে পাইলেন—

তিনিও অব্যক্ত ভাবে হৃদয়ে একটি যাতনা লইয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন। মুন্না নির্ব্বোধ সরলা বালা ভাবিল—তাহার পিতাকে সে আজ ফাঁকি দিয়াছে তিনি তাহার অসুখ ধরিতে পারেন নাই,—এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা নিশ্চিন্ত রহিল। পিতাকে খাওয়াইয়া আবার মুন্না তাহার শয়ন কক্ষের বাতায়নে আসিয়া বসিল। বিকালেই চাঁদ উঠিয়াছিল—আবার তাহা ডুবিয়া গেছে, পরপারে গাছের রাশির মধ্যে অন্ধকার ভীষণ ভাবে মূর্ত্তিমান হইয়াছে, রাশি রাশি খদ্যোতিকা মালা সেই আঁধার কায়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গঙ্গা স্বপ্ন মোহে মহান আকাশ, অগণ্য নক্ষত্র রাশি, আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিয়া, আহ্লাদের হাসি হাসিয়া, সে হাসি, সে স্বপ্ন বাহিরের স্বপ্ন জগতে সত্য বলিয়া ছড়াইয়া ঘুম ঘোরে বহিয়া যাইতেছে। বালিকা মুন্না সেই নিশীথের ঘুমন্ত আঁধারময় প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তখনও মুন্না শয়ন করিতে গেল না। তৃতীয় প্রহরও যায় যায়, তখন বাহিরের নৃত্য গীত চীৎকার থামিয়া পড়িল, মসীমের বন্ধু বান্ধবেরা একে একে গৃহে গমন করিল, তাহার বিলাস মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সেই ঘরেই নীচে মসলন্দের উপর বিশ্রাম শয়ন করিলেন। এই সময় মুন্না অতি ধীরে ধীরে সভয়ে সঙ্কোচে পা ফেলিয়া একখানি ক্ষীণ ছায়ার মত সেই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। মহম্মদ মসীম অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে তাহা দেখিলেন বলিলেন "কে এ ও—" মুন্নার মুখে কথা ফুটিল না, সেই যে দুপর বেলা হইতে মুন্না সমস্তক্ষণ ধরিয়া কিরূপে, কেমন করিয়া, স্বামীকে কি কথা বলিবে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, এখন তাহা সমস্ত ব্যর্থ হইল, একেবারে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল—প্রাণটা যেন কেমন কাঁপিতে লাগিল, চোখে কেমন জল আসিতে লাগিল, মুন্না কেন যে এখানে আসিয়াছে, আসিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না,—ভাবিল ফিরিয়া যাই,—তাহাতেও যেন পা সরে না,—ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া মুন্না পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। মসীম এদিকে নেশার ঘোরে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছেন, তাঁহার মনে হইল স্বর্গের একটি হুরি বুঝি তাহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছে,—কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে উঠিতে গেলেন—পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন, চক্ষু বুজিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বুঝি বা ভয় হইল চোখ খুলিলে আর দেখিতে পাইবেন না। চক্ষু বন্ধ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কথায় যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই "অয়ি স্বর্গের আলোক, এস আমার হৃদয় আলোকর।"

মুন্না বুঝিল স্বামী ভুল বুঝিয়াছেন মুন্নার তখন কথা ফুটিল—ধীরে ধীরে বলিল, "আমি মুন্না"—মসীমের স্বর্গ হইতে রসাতলে যেন দারুণ পতন হইল,—অর্দ্ধচোখ খুলিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "মুন্ননা—তুম্মি—ক্যা—আ ন" মুন্না কেন এখন কি বলিবে, সে যে নিজেই তাহা ভুলিয়া গেছে। এই সময় করীম গৃহের বারান্দায় মুন্নার চোখের সমুখে একবার দাঁড়াইয়া নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেল, কিন্তু মসীম তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। করীমকে দেখিয়া মুন্নার নিস্তেজ প্রাণে যেন বলের সঞ্চার হইল, যে কথা স্বামীকে বলিতে আসিয়াছে তাহা বলিবেই বলিয়া স্থির করিল—প্রাণপণে হৃদয়ে বল আনিয়া মুন্না বলিল, "একটি কথা আছে," মসীম আগেকার ভাষায় বলিলেন, "কথা ঢের শুনিয়াছি, আবার সকালে শুনিব, এখন কেন"

সকালে মসীম যতকথা শুনিবেন তা মুন্নাই জানে, প্রায় সমস্ত রাত মজলিসে কাটাইয়া সমস্ত দিন তাঁহার ঘুমাইয়া কাটে, তাহারপর অপরাহ্নে উঠিয়া বেশবিন্যাস করিয়া আবার আসরে নামেন—কথা কহার অবকাশ ত পড়িয়া আছে। মুন্না ইহা হইতে কোমল উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, তারপর মসীমের নিকট আসিয়া একখান ছবি তাহার কাছে রাখিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না, আবার মুখ বাধিয়া গেল, এতসঙ্কল্প সকল টুটিয়া পড়িল। মসীম কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি উঠাইয়া লইলেন, ঢুলুঢুলু নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অমনি জগতের যত রাগ তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল, তিনি নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া আগেকার অপেক্ষা স্পষ্ট কথায় বলিলেন,"কোথায় পাইলে ?" মুন্না ধীরে ধীরে বলিল,"করিম দু এক টাকায় কিনিয়া আনিয়াছেন।" মসীম আরো জ্বলিয়া গেলেন, তাঁহার হাজার টাকার ছবির মত ছবি যে করীম দু এক টাকায় কিনিবে ইহা কক্ষনোই হইতে পারে না, তাঁহার দেয়ালের ছবি যে কেউ চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র তাঁহার সংশয় রহিল না, স্খলিত সুশ্রাব্য নানারূপ ভাষায় সকালবেলায় সেই চোরের ঘাড় ভাঙ্গিবার বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। মুন্না সাহস করিয়া অনেক বার বলিল যে "না তাঁহার ঘরের ছবি কেউ লয় নাই, সে যেখানকার সেই খানেই আছে, চাহিয়া দেখিলেই সে ছবি দেখিতে পাইবেন"। কিন্তু মুন্নার কথা কে শোনে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না, শেষে একবার চোখ খুলিয়া দেয়ালে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই সে ছবি সেই খানেই আছে। কিন্তু রাগটা তখন অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে সহজে নিভিবার নয়, বাঁকা চোরা কর্ক্কশ স্বরে বলিলেন তুমি কে ? এ এ ছবি দেখাও, যা—আও,—চাই না, দেখতে চাই না, ।"

এতক্ষণ ভাল করিয়া মুন্নার কথা ফোটে নাই, একটি কথা বলিতে গিয়া দশবার মুন্না থামিয়া পড়িতেছিল, স্বামীর নির্দ্দয় বাক্যে হৃদয় ভেদ করিয়া রুদ্ধউৎস ফুটিয়া বাহির হইল, মুন্নার মুখ ফুটিল, মুন্নার সাহস বাড়িল, মুন্না ধীরে ধীরে বলিল "আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী বলিয়া তোমাকে কোন কথা বলিতে আসি নাই। আমি দাসী, প্রভুকে আজ মিনতি করিয়া, চরণ করিয়া যে কথা বলিতে আসিয়াছি তাহা না বলিয়া যাইব না। একবার সংসার পানে চাহিয়া দেখ। দেখ ইচ্ছা করিয়া দিন দিন আপনার সর্ব্বনাশ কিরূপে টানিয়া আনিতেছ, আমি তাহা বই আর কিছু চাহি না। নিজের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। সংসারের ধনরত্নে আমি সুখী হইব না। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্য ইহাতে এক বিন্দুও ভাবি না। কিন্তু ধন না থাকিলে তোমার কি হইবে।" এক নিঃশেষে কথা গুলি বলিয়া যেন মুন্না শ্রান্ত হইয়া পড়িল, সমস্ত বল যেন তাহার নিঃশেষিত হইয়া গেল, নিস্তব্ধে ব্যগ্র ভাবে কেবল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। এই মাতাল অবস্থায় ও সকল কথা স্বামীর মাথায় প্রবেশ করিতে পারে কিনা তাহা মুন্না ভাবিল না, হয়ত বা মুন্না জীবনে স্বামীর সজ্ঞান অবস্থা দেখে নাই, সুতরাং সজ্ঞান ও অজ্ঞান অবস্থায় যে বিবেচনা শক্তির কিরূপ প্রভেদ হয় তাহাই বা সে স্পষ্ট বুঝিত না, সেইজন্যই বা এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না। কিন্তু মসীমের মাথায় অতগুলা কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি কেবল শুনিলেন—"ধন আর রত্ন ধন আর রত্ন" কিছু পরে ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, জাহান্নব! ধন রত্ন যদি খোয়াইলাম অতরত্ন তোমার গায়ে কেন ? তোমার ঐ অলঙ্কার আগে যাইবে, তবে আমার ধন ফুরাইবে।"

অবসন্ন ম্রিয়মান বালিকা দারুণ আঘাতে সবল হইয়া, অশ্রুহীন নেত্রে অটলপদক্ষেপে আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া সুস্পষ্ট গভীর স্বরে বলিল "স্বামিন্ এঅলঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি ? আমার মত দুখিনীর আবার সাজ সজ্জা কি ? হৃদয় শুকাইয়া যাইতেছে, বাহির সাজাইয়া কি হইবে ? আমি নিজের সুখের জন্য অলঙ্কার পরিনা,—যদি ইহা দেখিতেও তোমার কষ্ট হয়, সে কষ্টটুকুও আমি তোমাকে দিতে চাহি না—নাথ। তোমার কষ্ট ঘুচাইতে আমি হৃদয় পাতিয়া রাখিয়াছি, তবে কি এ সামান্য অলঙ্কার খুলিতে আমার দুঃখ হইবে ? ইহা তোমার পরে যে কাজে লাগিবে, এখনও সেই কাজে লাগুক, আমার গায়ে ইহা বৃথা পড়িয়া আছে,"

মুন্না বলিতে বলিতে অলঙ্কার গুলি স্বামীর সম্মুখে খুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। মসীমের নেশা যেন অনেকটা ছুটিয়া গেল, তিনি অবাক হইয়া সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তি পানে চাহিয়া রহিলেন, মুন্না যখন চলিয়া গেল, তাহার মনে একটি অশান্তির ভাব, আসিয়া পড়িল। কিন্তু পারস্য রাজবংশীয় মহম্মদ মসীমের সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ ভাব হওয়া বিষম দুর্ব্বলতা, তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া আর দুএক বোতল মদ আনিতে বলিলেন।

ক্রমশঃ।

তারা।

আমাদের বেশ একখানি বাড়ি ছিল, বাড়িটির চারধারে কেমন বেশ বাগানে ঘেরা একটি সরু ঝিল, ঝির্ ঝির্ কোরে ব'য়ে যেত. আমরা সন্ধেবেলা তার ধারে ধারে যুঁই ফুল তুল্‌তে যেতুম, আমাদের বেশ একখানি বাড়ি ছিল।

একদিন যুঁই তুল্‌তে তুল্‌তে বরু বোল্লে "দাদা, কবে বাবা আস্‌বেন ?" আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে প্রজাপতি ধরবার তরে ছুটে গেল, আমার আর উত্তর দেওয়া হ'ল না, কেন না বরুর কাছে বাবার কথা তুলতে আমার ইচ্ছা ছিল না, বরু ছোট মেয়ে, বয়েস সবে সাত বৎসর, আমাদের প্রাণে সকলি সয়, কচি প্রাণে আঘাত দিতে বড় ব্যথা লাগে, তাতে সে কিছুই বুঝ্‌ত না, আপনার মনে ফুল তুল্‌তো, আপনার মনে কতকি গান গাইত, আর কখনো কখনো আকাশের পানে এমনি ভাবে চেয়ে থাকৃত, যেন সেথা তার কত সাধের বাড়ি ঘরদোর ফেলে এসেছে। চাঁদ দেখ্‌তে যেমন সকল মেয়ে ভালবাসে, সে তেমন বাস্‌ত না, সে কেবল তারাদের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকৃত তারাদের ভিতর যেন তার কতকি লুকান আছে। যে দিন পূর্ণিমা, আকাশে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় আকাশ ডুবে গেছে, আর্ ঝুর ঝুর কোরে মধুর বাতাস বইছে, বরু সে দিন চুপ্ কোরে একেলা জানালাটির ধারে বোসে থাকৃত, কারো সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইত না, কেবল যখন 'মা' তাকে আদর কোরে চুমো খেতে চাইতেন, তখন সে দুটি হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধোরে এম্‌নি ভাবে চুমো খেত, যেন তার আর্ চুমো খাওয়া ফুরোবে না, সে যেন আর্ মায়ের কোল থেকে উঠ্‌তে চায় না, সে যেন মায়ের বুকের উপর মাথা রেখে চিরকাল স্বপ্ন দেখ্‌তে চায়। মা যখন তাকে

জিজ্ঞাসা কোর্‌তেন, 'বরু, তুই বুঝি আগে তারা ছিলি, তাই তোর চোখ দুটিতে এখনো তারার আলো ভাস্‌ছে?' সে তখনই ছোট মাথাটি দুলিয়ে, কচিমুখখানিতে হাস্‌তে হাস্‌তে বলত "হাঁা মা আমি তারা ছিলুম"। সেই দিন হইতে বরুকে আমরা তারা বলিয়া ডাকি।

শ্রীঃ—

—*—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মিশর যাত্রী-বাঙ্গালী। শ্রীশ্যামলাল মিত্র প্রণীত। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ধরণের পুস্তক এই নূতন। লেখক মিসর যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছেন তাহাই অতি হৃদয়গ্রাহীরূপে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্বেতপুরুষদিগের যুদ্ধ চাতুর্য্য, মিশরবাসীদিগের রীতি নীতি, আতিথেয়তা প্রভৃতি সকলি এরূপ সুন্দর রূপে লেখা, সে যিনি ইহা পড়িবেন, তিনি যেন তাহা নিজেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষ লেখকের প্রতি এবং অন্যান্য ভারতবাসীর প্রতি একজন কাপ্তেনের সেই নিদারুণ অত্যাচার পড়িতে পড়িতে শরীরে কাঁটা দিয়া উঠে, গায়ের রক্ত যেন জল হইয়া আসে। আমাদের অনুরোধ প্রত্যেক বাঙ্গালীই এ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিয়া দেখুন, তাহা ছাড়া ইয়োরপীয়গণও যাহাতে ইহা পড়িতে পারেন সেই জন্য ইংরাজিতেও এখানির অনুবাদ বিশেষ প্রার্থনীয়। শ্বেতপুরুষগণ তাঁহাদের সাধুতা তাঁহাদের সদ্ব্যহার একবার প্রত্যক্ষ করুন। আন্‌কল্ টমশ্ ক্যাবিন পড়িয়া ইয়োরপে যেমন হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, ক্রীত দাসদিগের কষ্ট যেমন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এই বইখানির অনুবাদ পড়িয়া ততদূর না হউক, ভারতবাসীদিগের দুর্দ্দশা যদি তাঁহারা কতকটাও অনুভব করেন তবে একটি মহা ফললাভ হইবে।

বিবিধ সন্দর্ভ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নগেন্দ্র বাবু সময়ে সময়ে বঙ্গদর্শন আর্য্যদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এ পুস্তকে তাহাই একত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু একজন সুলেখক, ইনি বঙ্গ সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, ইহার পর আবার তাঁহার এই প্রবন্ধ গুলি পূর্ব্ব হইতেই সাধারণে সমাদৃত হইয়াছে, এখন নূতন করিয়া ইহার প্রশংসা গান করা বাহুল্য মাত্র।

—

গৃহ মুকুর। প্রথম ভাগ শ্রীযুক্ত রামদয়াল সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

এই পুস্তকখানি পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে যে সমস্ত সদুপদেশ আছে, তাহা পালন করিলে প্রত্যেক ঘরেই উপকার হইতে পারে। "সন্তান পালন" ও "সূতিকা গৃহ" সম্বন্ধে ইনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সারগর্ভ॥

চারুনীতি-পাঠ। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। এ পুস্তকখানি রচনার প্রথা অতি সুন্দর। ইহা কেবল মাত্র নীরস উপদেশ বাক্যে পূর্ণ নহে। গ্রন্থকর্ত্তা উত্তম উত্তম গল্পদ্বারা বেশ নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে কেবল মাত্র বালকের কেন অনেক বৃদ্ধেরও উপকার হইতে পারে।

—o—

সেন রাজগণ।

বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের ৫৩ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ১০৮১ শকাব্দে (১১৫৯ খৃষ্টাব্দে) আমরা অশোকচন্দ্র দেবকে গৌড়ের রাজাসনে দেখিতে পাই। মিত্র মহোদয় যে কেন অশোকচন্দ্রকে "অশোকসেন" লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে অরোহণ করেন। শেষ গৌড়েশ্বরের নাম যে প্রকৃত পক্ষে "লক্ষ্মণ" ছিল তাহা তাঁহার সমসাময়িক "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব"ও "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পশ্চিমদেশে লক্ষ্মণকে সাধারণতঃ "লছমণ" বা "লক্‌ষমণ" বলা হইয়া থাকে। মুসলমান ইতিহাসলেখক মিনহাজ তদনুসারে তাঁহাকে "লক্‌স্‌মণিয়া" লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ নামবৈচিত্র বা গণ্ডগোল দৃষ্ট হয় না।

মিনহাজই সিরাজ তাঁহার তবকত-ই-নেসারি গ্রন্থে রাজা "লক্ষ্মণিয়ার" জন্ম সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রাজা যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার মাতার উদরোপরি রাজমুকুট স্থাপন করা হইয়াছিল। রাজমাতার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নিতান্ত দুর্ভাগা হইবে এবং এই শিশু কখন রাজমুকুট লাভ করিবে না। আর যদি দুই ঘণ্টা পরে এই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি অশীতি বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজদণ্ডধারণ করিবেন।" এই সংবাদ রাজমাতার কর্ণগোচর হইলে, তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ শুভলগ্ন উপস্থিত না হয়, সেই অবধি আমার পাদদ্বয় উপর দিকে বন্ধন করিয়া ঝুলাইয়া রাখ।" তদনুসারে কার্য্য হইল। দুই ঘণ্টা অন্তর রাজমাতার বন্ধনমোচন করা হইলে লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার মাতা সেই মুহূর্ত্তে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অমাত্যগণ লক্ষ্মণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন॥ ৩৯

মিনহাজের লিখিত গল্প হইতে এইমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, লক্ষ্মণ তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর ভূমিষ্ঠ হন। জন্মের পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি শৈশবাবধি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

মিনহাজের লিখিত বাক্য লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধ পোষণ করিতেছেন। তিনি "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ধাৎস গোত্রে (অর্থাৎ ছান্দড়ের বংশে ৪০)

৩৯ Raverty's Tabakat-i-Nasiri. page 554.

৪০ হলায়ুধ। (ভারতী, সপ্তমভাগ ৩৩২ পৃষ্ঠা।) দেখ।

ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উজ্জ্বলা নাম্নী রমণী তাঁহার গৃহিণী ছিলেন। সেই গৃহিণী হইতে ধনঞ্জয়ের ঈশান, হলায়ুধ ও পশুপতি নামে তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশান ব্রাহ্মণদিগের "আহ্নিক পদ্ধতি," হলায়ুধ, "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" ও পশুপতি "পশুপতি পদ্ধতি" নামক শ্রাদ্ধাদিকৃত্য প্রস্তুত করেন। শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্য রাজপণ্ডিত-যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ৪১

মিনহাজ বলেন যে "লক্ষ্মণিয়া" ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই কথা সম্পূর্ণ সত্য কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এই রাজা যে ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল গৌড়ের রাজাসনে অভিষিক্ত ছিলেন, তৎপক্ষে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কারণ যদি আমরা বিবেচনা করি যে, হলায়ুধ ২০ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজপণ্ডিত ও ২৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত মন্ত্রী ও তাহার পর হইতে ধর্ম্মাধিকারে অভিষিক্ত ছিলেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, হলায়ুধের আশ্রয়দাতা লক্ষ্মণসেন দেব ৪০ বৎসরেরও অধিককাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গয়ার প্রস্তরলিপির খোদিত অব্দের পর বৎসর অর্থাৎ ১০৮২ শকাব্দে (১১৬০ খৃষ্টাব্দে) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ইহা স্বীকার করিয়া, এক্ষণে আমাদের দেখা উচিত, তিনি কতকাল জীবিত ছিলেন।

মুসলমানগণ বলেন লক্ষ্মণসেন দে নদীয়ায় বাস করিতেন। ইহার পূর্ব্বে আ কোন গ্রন্থে কিম্বা শাসনপত্রাদিতে নদীয়া বা নবদ্বীপের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অত এবই বোধ হয় এই রাজা লক্ষ্মণিয়াই নব দ্বীপে রাজপাঠ স্থাপন করিয়াছিলেন যাহা হউক মুসলমান সেনাপতি খিল্‌জি দেশোদ্ভব বখতিয়ার পুত্র মহম্মদ প্রকা "মহম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জি" বিহারজয় দুই বৎসর অন্তে নদীয়া নগরী অধিকা করেন।

মিনহাজ লিখিয়াছেন, মহম্মদ বখতি য়ার কর্ত্তৃক বিহার অধিকৃত হইলে তাঁহা যশঃসৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ক্রমে তাহা লক্ষ্মণসেন দেবেরও কর্ণগোচ হইল। বহুসংখ্যক জ্যোতির্ব্বিদ, জ্ঞানী ও অমাত্য রাজসমক্ষে উপস্থিত হই বলিলেন 'আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে লিখি আছে যে, এই দেশ তুরকীদিগের হস্তগ হইবে, এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হওয়া সময় উপস্থিত। তুরকীয়েরা বিহার অ কার করিয়াছে, পর বৎসর তাহারা অবশ্য এ দেশে উপস্থিত হইবে। অতএব আম

৪১ বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বলচ্ছত্রোৎসিক্তমহামহস্তনুপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপাল- নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥
ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, (১। ১২)।

দের বিবেচনায় মহারাজ এ প্রদেশবাসী সকলকে লইয়া অন্যত্র গমন করিয়া তুরকীয়দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষার উপায় করুন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ব্যক্তি এই দেশ অধিকার করিবেন, সেই গ্রন্থে তাহার কোন বর্ণনা আছে কি না। তাঁহারা বলিলেন, আছে, তিনি আজানুলম্বিতবাহু ৪২। রাজা বলিলেন, তবে ইহার তথ্যানুসন্ধান জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করা হউক। মহম্মদ বখতিয়ারকে দর্শন করিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। সেই দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের প্রকাশিত বাক্যের সত্যতা পোষণ করিল।

মিনহাজের গ্রন্থ হইতে যে গল্পটী সংকলিত হইয়াছে, তাহার অভ্যন্তরে যে কি সত্য লুক্কায়িত আছে আমরা তাহার উদ্ধার করিতে পারিলাম না। পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সর্ব্বনাশ জন্য কতপ্রকার জম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। লক্ষ্মণের কয়েক জন সভাসদকে স মহম্মদ বখতিয়ার হস্তগত না করিয়াছিলেন ইহাই বা কি রূপে বলা যাইতে পারে। নচেৎ তুরক কর্ত্তৃক গৌড়াধিকার ও কদাকারের আদর্শস্থল মহম্মদ বখতিয়ারের রূপ বর্ণনা কেন হিন্দু শাস্ত্রে সন্নিবেশিত থাকা প্রকাশিত হইবে। যদি এ বৃত্তান্তটী যথার্থই গল্প না হয় তাহা হইলে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন। সিরাজ্‌দৌলার পতনের ইতিহাস কি আমাদিগকে এরূপ অনুমান করিতে প্রণোদিত করে না?

এই ঘটনার পর নদীয়ার অধিকাংশ অধিবাসী সমতট-বঙ্গ ও কামরূপ প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রায় লক্ষ্মণসেন দেব অটলভাবে স্বীয় রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিহার বিজয়ের দুই বৎসর পর মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি বৃহৎ একদল সৈন্য সহ আসিয়া নদীয়া অধিকার করিলেন। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার যখন নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করেন, তখন কেবল অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে ছিল। নগরবাসীদিগের নিকট তাঁহারা অশ্ববিক্রেতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই ছদ্মবেশী ঊনবিংশ অশ্ববিক্রেতা রাজনিকেতন মধ্যে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ দ্বাররক্ষককে আক্রমণ করিল। এই আকস্মিক ঘটনা দ্বারা একটী ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এদিকে মহম্মদ বখতিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, অপ্রস্তুত নদীয়াবাসীদিগের প্রতি আক্রমণ করিল। রাজা লক্ষ্মণ অন্তঃপুরে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া কোনরূপ সদুপায় অবলম্বন করিতে পারিলেন না, অগত্যা সপরিবার খিড়কি দ্বারে বাহির হইয়া "সমতট বঙ্গে" প্রস্থান করিলেন।"

৪২ Raverty's Tabakat-i—Nasiri. Page. 556.

আমরা মিনহাজের গ্রন্থ হইতে এই বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিলাম। মিনহাজ লিখিয়াছেন যে, মহম্মদ বখতিয়ার এইরূপ দ্রুত-গমন করিয়াছিলেন ৪৩ যে, কেবল অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী মাত্র তাঁহার সহিত গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ দ্রুত গমনে অক্ষম হইয়া পশ্চাৎ আসিতেছিল। তাঁহার অন্যান্য সৈন্যগণ যে নগর আক্রমণকালে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, ইহা জাতীয়-পক্ষপাতান্ধ মিনহাজও স্বীকার করিয়াছেন। ৪৪ মহম্মদ বখতিয়ারের নদীয়া অধিকারের প্রায় ৪০ বৎসর অন্তে মিনহাজ গৌড়ে আসিয়া দুই একজন বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট যে সকল গল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন ২০ বৎসর অন্তে তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ ও স্বীয় গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা গল্পনবিস বৃদ্ধদিগের দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়া মিনহাজের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এই অতিরঞ্জিত ঘটনায় তিনি আবার কবিত্বশক্তি ফলাইয়া স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। মার্সমান-প্রমুখ ইংরাজ লেখকগণ রঙ্গের উপর রং চড়াইয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে মহম্মদ বখতিয়ার বাঙ্গালা বিজয় করিয়াছেন। ৪৫ মার্সমানের ন্যায় একজন সদাশয় ধর্ম্মপ্রচারক যে কিরূপে এই মিথ্যাবাক্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যে জাতীয় ইতিহাসলেখক হিন্দুকুলভূষণদিগের পরলোকগমনকে "নরকে গমন" বলিয়া লিখিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই মিনহাজ সেই জাতীয় লেখক। তিনি যে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহার শ্রুত গল্পের উপর আরও কিছু রং চড়াইতে ত্রুটি করেন নাই, ইহা বোধ হয় কোন সদাশয় পাঠকই অস্বীকার করিবেন না। মিনহাজের লেখা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয়" ইহা নবনির্ম্মিত মিথ্যা বাক্য।

তাঁহার বৃহৎ সেনাদল নগরপ্রান্তে এক বন মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বয়ং সপ্তদশ অশ্বারোহীর সহিত নগরে প্রবেশ করেন। তিনি দূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং নদীয়াবাসীগণ তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই। পরে তিনি যখন রাজবাটীর মধ্যে (আহারের সময়ে) প্রবেশ করিয়া দ্বাররক্ষককে আক্রমণ করিলেন অমনি তাহার সৈন্যগণও বন মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া নগর আক্রমণ করিল। (Stewart's History of Bengal. page. 44.) ষ্টুয়ার্ট কোন্ গ্রন্থ হইতে এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক মহম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপ অধিকার নিশ্চয়ই একটী চক্রান্তমূলক কার্য্য। বাঙ্গালার অদৃষ্ট চিরকাল চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

৪৩ Raverty's Tabakat-i-Nasiri, page. 557.

৪৪ ঐ গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠা দেখ।

৪৫ মেজর ষ্টুয়ার্ট তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন "মহম্মদ বখতিয়ার

তৎপরে মিনহাজ বলেন রায় লক্ষ্মণিয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "সমতট বঙ্গে" গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল রাজ্য শাসন করিয়া তিনি কালকবলিত হন। তাঁহার উত্তর পুরুষ অদ্যাপি (৬৫৮ হিঃ অঃ ১২৬০ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। ✓প্রাচীনকালে বঙ্গের রাজধানী সমতট নামে পরিচিত ছিল। ইহা আমরা পাঁচবৎসর পূর্ব্বে বিশেষ রূপে দর্শাইয়াছি। ৪৬ মিনহাজের গ্রন্থে সমতট নামটী বিকৃতভাবে লিখিত আছে। হস্তলিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে কোনটীতে "সনকট, কোনটীতে সকনট" অন্য কোনটীতে "সনকনট" দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মিনহাজের কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তী নকলনবিসদিগের ভ্রম। যেস্থলে মিনহাজ বারংবার "সনকট" শব্দের সহিত "বঙ্গ" যোগ করিয়াছেন, সেস্থলে তিনি যে সমতট বঙ্গকে লক্ষ্য করিয়াছেন তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তবকত-ই-নাছরি গ্রন্থের অনুবাদক মেজর রেবার্টী সাহেবও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ৪৭

পরবর্ত্তী মুসলমান ইতিহাস "তবকত-আকবরি" ও "তঙ্গকরত উল মূলুকে" লিখিত আছে যে, রাজা লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগন্নাথতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। ৪৮ বৃদ্ধ মিনহাজের বাক্য এস্থলে সমধিক প্রামাণ্য। মিনহাজ ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ জয় করিয়া রাঢ় দেশের উত্তরভাগ ও বরেন্দ্রের পশ্চিম ভাগ মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। "বঙ্গদেশ লক্ষ্মণের অধিকারে ছিল, তাহার উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি সেই দেশ শাসন করিতেছেন।"

এক্ষণে দেখা যাউক লক্ষ্মণসেন দেব কোন্ বৎসর নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেজর রেবার্টী সাহেবের মতে ১১১৬ শকাব্দে (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হইয়াছিল। ৪৯ ব্লকমান সাহেবের মতে ১১২৫ শকাব্দে (১২৩ খৃষ্টাব্দে) মুসলমানেরা নবদ্বীপ অধিকার করেন। ৫০ টোমাস সাহেবের মতে ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খৃঃ অঃ ৬০০ হিঃ অব্দে) লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করেন। ৫১ কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১১২৯ শকাব্দে (১২০৭ খৃষ্টাব্দে) মহম্মদ

৪৬ ভারতী চতুর্থ ভাগ। ১২১—১২৫পৃষ্ঠা

৪৭ The part meant by our author more probably refers to a province of Eastern Bang. Raverty's Tabakat-i Nasiri p. 557.

৪৮ মেজর ষ্টুয়ার্ট এই মত অবলম্বন করেন। তদনুসারে পরবর্ত্তী ইংরাজ ও বাঙ্গালি লেখকগণ ষ্টুয়াটের প্রদর্শিত ভ্রমমার্গে বিচরণ করিতেছেন।

৪৯ Tabakat-i Nasire, and J. A. S. B. XLIV. part 1 page 277.

৫০ J. A. S. B. XLII part 1. pp. 206, 211.

৫১ Joarnal. Royal As. Society (1873) Vol. V1. p. 340. and J. A. S. B. XL11 part 1. p. 343.

বখ্‌তিয়ার নদীয়া অধিকার করিয়াছিলেন। ৫২ আমরা ব্লকমান কিম্বা রেবার্টি সাহেবের মতানুমোদন করিতে পারি না। কারণ ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে ৯৯ লক্ষ্মণাব্দে) সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।৫৩ এই সময়ে লক্ষ্মণসেন দেব নদীয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক গ্রন্থকারের লেখা অবশ্য পরবর্ত্তী লেখকদিগের লিখিত বাক্য অপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে এই গ্রন্থ রচনার পর লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আমরা বিজ্ঞবর টোমাস সাহেবের মতে অনুমোদন করিয়া বলিতেছি যে ১১২৭ শকাব্দের (১২০৫ খৃঃ অঃ) শেষভাগে মহম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জীবিতকালে ঐ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১১৮২ শকাব্দে (১২৬৭ খৃঃ অঃ) যখন মিনহাজ স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখনও তিনি লিখিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেনের উত্তরপুরুষগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। তৎপরে "তওয়ারিখে ফিরোজ সাহি" লেখক জইয়ে বারণি লিখিয়াছেন ১২০২ শকাব্দে (১২৮০ খৃঃ অঃ) সুলতান বলবন যখন বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘসুদ্দিন তুগ্রলের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় বঙ্গেশ্বর ধনুজ রায় সম্রাটকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন, সুতরাং দেখা যাইতেছে লক্ষ্মণসেন দেবের নদীয়া হইতে পলায়নের ৭৫ বৎসর পরে ও বঙ্গদেশ তাহার উত্তর পুরুষের হস্তে ছিল।

সামসুদ্দিন আবুল মোজফর ফিরোজ সাহের শাসনকালে ১২৯—১২৪৯ শকাব্দের (৭০২—৭২২ হিজরী অব্দ, ১৩০৭ হইতে ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোন এক সময়ে বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের হস্তে আইসে। কারণ টোমাস সাহেবের প্রাচীন মুদ্রা বিষয়ক প্রস্তাবে দৃষ্ট হইতেছে যে ফিরোজ সাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা সুবর্ণগ্রামের টাকসালে মুদ্রিত হইয়াছিল। ৫৪ অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রায় এক শত বৎসর কাল লক্ষ্মণ সেন দেবের উত্তর পুরুষগণ প্রকৃত বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের ধারাবাহিক নাম আমরা কোন স্থানেই প্রাপ্ত হইতেছি না। মিত্র মহোদয় অনুমানের সাহায্যে তিন জন রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

বল্লালসেন (দ্বিতীয়)
সুসেন—
সুরসেন ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমরা কেবল অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

তাম্র ও প্রস্তরলিপি অবলম্বন করিয়া আমরা সেনরাজগণের নিম্ন-লিখিত বংশাবলী প্রস্তুত করিলাম। সমস্ত খোদিত লিপিতে এই রাজবংশকে চন্দ্রবংশজ বলা হইয়াছে। উহাঁরা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষত মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে এই রাজবংশ শ্রেষ্ঠ কুল হইতে উদ্ভূত। ভারতের রাজন্যবর্গ ইহাঁদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। কোন বর্ণসঙ্কর জাতি হইতে এই রাজবংশের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে তাঁহারা কখনই এইরূপ সম্মান লাভ করিতে পারিতেন না ও খোদিত লিপিতেও "চন্দ্রবংশ" "ওষধিনাথবংশ" ও "সোমবংশ" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত না। কারণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যের এরূপ পরিচয়ের অধিকার নাই। মিত্র মহোদয় পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসার গ্রন্থ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রাজা সুসেনকে সোমবংশীয় লেখা হইয়াছে। ৫৫

প্রাচীনকালে ভারতে অম্বষ্ঠ নামে এক দেশ ছিল। বিষ্ণুপুরাণের, দ্বিতীয়াংশ, তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতের সংক্ষিপ্ত ভূগোল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে "অম্বষ্ঠা" শব্দ দ্বারা সেই নামখ্যাত দেশবাসীদিগকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৫৬ মহাভারত, সভাপর্ব্বে নকুলের দিগ্বিজয় উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি "দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চ কর্পট, মধ্যমক, বাটধান" কে পরাজয় করিয়াছিলেন। ৫৭ বরাহমিহির "মেকলাম্বষ্ঠা" এই দুইটী দেশের একত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ও অন্যান্য গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বোধ হয়, বিন্ধ্য পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে, নর্ম্মদাসান্নিধ্যে অম্বষ্ঠ দেশ অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ সেনরাজগণ পূর্ব্বে সেই দেশে বাস করিতেন। এ জন্যই তাঁহারা লোকসমাজে অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। পরে যখন কেবল কায়স্থ জাতিই সমস্ত ভারতে অম্বষ্ঠ আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইলেন, তখন সেনরাজগণও কায়স্থ জাতীয় বলিয়া খ্যাত হন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যজাতীয় রাজবল্লভ উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ অভিন্ন অবধারণ করিয়া আপনাকে বল্লাল বংশজ পরিচয় দিতে লাগিলেন সেই সময় হইতে সেন রাজগণ আমাদের দেশে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মিত্র মহোদয় সর্ব্বপ্রথম খোদিত লিপি অবলম্বন করিয়া সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় অবধারণ করেন। তমসাচ্ছন্ন গুহায় নিপতিত সত্য উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। এই

---

৫২ Asiatic Researches. Vol. 1X. page. 203.

৫৩ শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত
দশশতে শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্যহি রসরসচাব্দে॥

মিত্র মহোদয় তাহার Notice of Sanskrit MSS-এর তৃতীয় খণ্ডে এই কবিতাটী বিকৃত অবস্থায় উদ্ধৃত করিয়াছেন (pp. 134. 149.) তাহাতে দুইটী ভয়ানক ভুল আছে। প্রথমতঃ কবিতার উভয় পদের অর্থ পরস্পর বিপরীত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ছন্দো ভঙ্গ দোষ হইয়াছে। কারণ এই কবিতা আর্য্যাছন্দে লিখিত। এই ছন্দের নিয়মানুসারে প্রথমার্দ্ধে ত্রিশ মাত্রা, দ্বিতীয়ার্দ্ধে ২৭ মাত্রা হইবে। মিত্রমহোদয়ের প্রকাশিত কবিতার দ্বিতীয় অর্দ্ধে ২৫ এর অধিক মাত্রা নাই। যাহা হউক ভক্তিভাজন মিত্র মহোদয় ইহার জন্য দায়ী নহেন। তিনি যে হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে এই কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন ঐ গ্রন্থলেখকই তাহার দায়ী।

৫৪ Thomas. Initial coninage of Bengal. (J. A. S. B. Vol. XXXVI. part 1. p. 45.)

৫৫ তস্মিন ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
ভবেদ্রাজা সুসেনাখ্যঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ॥
Indo-Aryan. Vol. 11. p. 266.

৫৬ শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসাক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ২৬ পৃষ্ঠা।

৫৬ সিংহ মহোদয়ের মহাভারত সভা পর্ব্ব ৪৫ পৃষ্ঠা।

প্রস্তাবের কোন কোন স্থানে আমরা মিত্র মহোদয়ের ভ্রম প্রদর্শন ও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহার প্রতি কোন রূপ অসম্মান প্রদর্শন করি নাই। আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি, তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া আমরা ঐতিহাসিক জগতে বিচরণ করিতেছি, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে অনন্ত কাল স্বীকার করিব।

বংশাবলী।

(চন্দ্র)

*

*

বীরসেন। দাক্ষিণাপথনিবাসী।

*

*

সামন্তসেন। ঐ

|

হেমন্তসেন ঐ

|

১। মহারাজ বিজয়সেন দেব। গৌড়ের প্রথম রাজা।

|

২। ,, বল্লালসেন দেব।

|

৩। ,, লক্ষ্মণসেন দেব।

|

| |

৪। ,, মাধবসেন দেব ৫। কেশবসেনদেব

*

৬। ,, হরিব্রহ্মদেব

*

৭। অশোকচন্দ্র দেব।

*

৮। লক্ষ্মণসেন দেব। ১১২৭ শকাব্দে নদীয়া হইতে পলায়ন করেন।

*

সুসেনদেব।

*

দনুজ রায়।

*

বল্লালসেন দেব (দ্বিতীয়।)

দ্বিতীয় বল্লালসেনের সময়ে মুসলমানগণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা অধিকার করেন। ইহা একটী প্রবাদ বাক্য। দীর্ঘকালাবধি এই প্রবাদ বিক্রমপুরে প্রচলিত রহিয়াছে। ইংরেজি, বাঙ্গালা বিবিধ পুস্তকে দেশপ্রচলিত প্রোক্ত প্রবাদ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বংশাবলীর শেষভাগে আমরা যে তিন জন রাজার নাম সংযুক্ত করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে সুসেনের নাম হিন্দু ও মুসলমানের বিবিধ গ্রন্থে লিখিত আছে। দনুজরায়ের নাম বারণির লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় বল্লালসেনের নাম দেশপ্রচলিত প্রবাদ হইতে সংগৃহীত। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে এই নামটী বিশ্বাস করিতে পারেন, না করিলেও আমাদের কোন আসিয়া যায় না। কিন্তু আমরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে দর্শন করিয়াছি যে, বল্লালসেনের সময়ে "বা আদম" নামে জনৈক মুসলমান প্রকৃত বঙ্গ দেশে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান জয়পতাকা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সেনরাজগণের চিহ্ন মাত্র লোপ পাইয়াছে। বঙ্গীয় আর্য্য-গৌরব-ভাস্কর চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। বঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

গৌড় গীত।

উত্তরে নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত গৌড়দেশ বিস্তৃত। হোসঙ্গাবাদ, জব্বলপুর, মাণ্ডলা, রাইপুর প্রভৃতি মধ্য প্রদেশের প্রায় সমুদয় জেলাতেই গৌড়ের বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। নাগপুরের প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচারক হিস্‌লপ গৌড়দের কতকগুলী গীত সংগ্রহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ২৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের প্রধান কমিসনর, রিচার্ড টেম্পল (এক্ষণে সার রিচার্ড টেম্পল) ঐ সকল গীত ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। নিম্নে ইহার (অনেক বাদ সাদ্ দিয়া) বাঙ্গলা অনুবাদ করা গেল; স্থানে স্থানে কেবল ভাবার্থ লওয়া হইয়াছে। গীতগুলি গৌড় সমাজের ক্রমবিকাশ অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে তজ্জন্য বিশেষ মনোযোগের সহিত পঠিত। কিন্তু তা ছাড়া ইহাতে মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্ব লক্ষিত হয়। গীত কয়টীর বর্ত্তমান পরিচ্ছদে হিন্দুদের হাত দেখা যায়—গোঁড়রা মহাদেব পার্ব্বতী প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর ধার ধারে না; তাহাদের উপাস্য দেবতা স্বতন্ত্র কিন্তু গীতগুলির আসল গঠন যে গোঁড়ী তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথম ভাগ।

গোঁড়ের কারাবাস।

জনমিয়া গোঁড় বনে ছড়ায়ে পড়িল,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ কিম্বা নিম্ন উপত্যকা,
গোঁড় নাই হেন ঠাঁই দেখা নাহি যায়।
যা কিছু দেখিতে পায় তাই খাদ্য তার;
হরিণ, শৃগাল, ভেক, মহিষ, শূকর,
ষাঁড়, গরু, আরসোলা, কিম্বা গিরগিটা,
নাহি কোন মানবিচ সব ধরে খায়। *
ছয় মাস ধরে গোঁড় স্নান নাহি করে;
মুখ নাহি ধোয় কভু; গোবরের পর
স্বচ্ছন্দে শুইয়া রহে; † ছিল এইরূপ
গোঁড় সৃষ্টির প্রথমে; পূরিল অনিল
দুর্গন্ধে ধবলাগিরি শিবের আবাস।
ক্রোধান্ধ ধূর্জ্জটী বলে ডাকি নারায়ণে;—
"কলুষিত সব স্থান করিলেক গোঁড়;
ধ্বংশিব তাহার বংশ প্রতিজ্ঞা আমার।
এহেন ধবলাগিরি, বাস স্থান মোর,
পূরিত দুর্গন্ধে এবে; আন হেথা গোঁড়"।
দলে দলে গোঁড় তবে হইল আনীত;
লয়ে তাহাদিগে নিম্নে, উপত্যকা মাঝে,
সারি সারি করি শিব বসায়ে সবারে,
নিরমিয়া এক কাঠবিড়ালি তখন,
জীবিত করিয়া তারে দিলেন ছাড়িয়া।
খাড়া করি লেজ কাটবিড়ালি দৌড়ায়;
দেখি তারে গোঁড় সব উঠিল দাঁড়ায়ে,
ধায় পিছে পিছে তার, কেহ বলে "মার,"

* জঙ্গলের গোঁড়েরা অদ্যাপি এরূপ খাইয়া থাকে।

† নিতান্ত অনভ্য গোঁড়ের পক্ষে এ-চিত্রটী এখনও অযথার্থ নহে।

কেহ বলে "ধর, খেতে বড় মজা হবে।"
আহরিল যষ্টি কেহ, কেহ বা পাথর;
দৌড়ে দ্রুতবেগে সবে; লম্বা লম্বা চুল
উড়িল আকাশে। ছিল কারাগার এক
শিবের, প্রবেশে কাটবিড়ালি তথায়;
প্রবেশি তাহার সনে যত গোঁড় দল,
চারি জন ছাড়া সবে বন্দী হলো তথা।

প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড কারাগার মুখে
স্থাপিলেন শিব; ভস্মাসুর নামে দৈত্য
প্রহরীর কার্য্যে তথা হলো নিয়োজিত।

হেন কালে নিদ্রাহতে উঠিয়া পার্ব্বতী
ভাবিলেন "কতদিন হলো আমি দেখি
নাই গোঁড়, কোথা গেল,হায়, তারা সবে?'
আছিল ধবলা গিরি কোলাহল পূর্ণ,
স্তব্ধ চারিদিক আজ; নাহি সারা শব্দ।"
বলিলেন মহাদেবে, "গোঁড় মোর নাহি
আসে, কোথা গেল তারা? বল শূলপাণি।
"অসহ্য দুর্গন্ধে পূর্ণ হলো মম গিরি,
বন্দী তাই তাহাদিগে করিয়াছি, কিন্তু
পলায়েছে চারিজন; উত্তরিল শিব।
অই চারি গোঁড় ঘুরি জঙ্গলে জঙ্গলে
উত্তরিল "কাচিকোপালাহুগড় স্থানে।
সন্ধান তাদের নাহি পাইয়া পার্ব্বতী,
আরম্ভিল তপ গোঁড় তারিবার তরে।
অন্তর্যামী ভগবান জানিলেন সব,
বলিলেন নারায়ণে "বল পার্ব্বতীরে,
রক্ষিবারে গোঁড় আমি করিব উপায়।

‡ শীকারে গোঁড়দের উৎসাহ এখানে বেশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ।

লিঙ্গোর জন্ম ও মৃত্যু।

* * * *

উদ্ধারিতে গোঁড়ে তবে দেব ভগবান
লিঙ্গোকে দিলেন জন্ম। পঁহুছিল লিঙ্গো
যথায় পলায়েছিল গোঁড় চারিজন।
এনেছিল জন্তু যাহা শীকার করিয়া,
খেতেছিল তারা তাহা কাঁচা কিম্বা সিদ্ধ
নিরখি লিঙ্গোকে তারা বলিতে লাগিল,—
"আছি মোরা চারি ভাই, পাইব পঞ্চম,
ডাকিয়া আনিব মোরা উহাকে হেথায়।"

* * * *

শিখাইল লিঙ্গো চাষ গোঁড় চারিজনে।
কাটি গাছ পালা, মাঠ করি পরিস্কার
বেড়িল তাহায়, রাখি দ্বার একদিকে;
রোপিলেক ধান্য তবে লিঙ্গো সেইখানে
দেখিয়া লিঙ্গোর কীর্ত্তি অবাক তাহারা!
... .

* গোঁড়েরা অন্যান্য জাতির ন্যা
প্রথমাবস্থায় কেবল শীকার করিয়া প্রা
ধারণ করিত, পরে চাষ শিখে; এই সঙ্গী
দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সে চাষ
আমাদের দেশের চাসের ন্যায় নহে
তাহাতে লাঙ্গলের প্রয়োজন নাই, বলদ
মহিষের প্রয়োজন নাই। অল্প ঢালু স্থা
জঙ্গল কাটিয়া মাঠ প্রস্তুত করে; সেখা
কর্ত্তিত বৃক্ষ গুল্মাদি জ্বালাইয়া দেয়, ম
ছাই দ্বারা আবৃত হয়; পরে উহার উচ্চ
স্থানে বর্ষার প্রারম্ভে বীজ বপন করে।
বীজ বৃষ্টির জলে মাঠময় ছড়াইয়া পড়ে
এইরূপে শষ্যোৎপন্ন হয়। এই রকমে
চাসকে "ডাহি" বলে। জঙ্গলের গো

একদা রাত্রিতে তারা বহু চেষ্টা করি
চকমকি হতে নারে আগুণ করিতে।
বলিলেন তবে লিঙ্গো গোঁড় চারিজনে,
"তিন ক্রোশ দূরে থাকে রিকদ রাক্ষস,
আছে অগ্নি মাঠে তার, আন সেথা হতে।
দেখি ধূম দূর হতে চিনিবে সে স্থান।"
এ বলে উহারে "আমি যাবনা সেথায়।
বয়সে সবার ছোট ছিল যেই জন,
সেই তবে অবশেষে চলিল সেথানে।
জ্বলিছে তথায় অগ্নি উচ্চে ধূ ধূ করে;
বড় বড় শাল, আর, মহুয়া আঞ্জন,
মোটা মোটা গুঁড়ি তার জ্বলিছে প্রবল।
পাইয়া তাহার তাপ, হৃদয়ের সুখে
গভীর নিদ্রায় মগ্ন রিকদ রাক্ষস। *
ভয়ে জড়সড় গোঁড় কাঁপে থর থর;
ভাবিতে লাগিল " পড়ি যদি রাক্ষসের
চোখে, নাহিক নিস্তার, নিশ্চয় মরণ।"
চুপি চুপি গিয়া তবে আগুণের কাছে
উঠাইল গুঁড়ী এক—পড়িল স্ফুলিঙ্গ
বৃদ্ধ রাক্ষসের পায়, দহিল সে স্থান।
তাড়াতাড়ি ঝাড়া দিয়া উঠিল রাক্ষস,
বলিলেক "গোঁড় ক্ষুধা লাগিয়াছে মোর,
কচি নরা মত তুই এসেছিস হেথা "
উর্দ্ধশ্বাসে গোঁড় তবে যায় পলাইয়া,
ফেলিয়া পশ্চাতে গুঁড়ি লয়েছিল যাহা;
নাহি থামে, নাহি চায় পিছে একবার;
অবশেষে প্রাণে প্রাণে আসিয়া স্ববাসে,
বলিতে লাগিল সবে হাঁপাতে হাঁপাতে,
"গিয়াছিনু অগ্নিতরে, দেখিনু প্রকাণ্ড
এক রাক্ষস তথায়, পলাইয়া তবে
কোনমতে বেঁচে ফিরে এসেছি হেথায়।" †

এতশুনি লিঙ্গো নিজে চলিল তথায়;
লইয়া কুমড়াখোলা, বংশখণ্ড আর,
ছিঁড়ি কেশ শির হতে, সারঙ্গের ন্যায়
বাদ্য যন্ত্র এক লিঙ্গো করি নিরমাণ,
ধনুক প্রস্তুতি তবে, বাজাইল তায়।
বড় খুসি মনে লিঙ্গো, করে করি তাহা
রাক্ষসের ক্ষেত্রে আসি হলো উপনীত।
লম্বিত রিকদ তথা আগুণের পাশে
প্রকাণ্ড গুঁড়ির ন্যায়, বিকট দশন,
"হাঁ করিয়া নিদ্রা যায়, মুদিত নয়ন।
আছিল অশ্বত্থ এক মাঠের নিকট,
চড়িল তাহাতে লিঙ্গো। হইল প্রভাত।
সারঙ্গ লইয়া লিঙ্গো ঘাদিল তাহায়,
শতরাগ তাহা হতে হইল বাহির,
তাহার সঙ্গীতে স্তব্ধ পাহাড় জঙ্গল।
সে মধুর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশে রক্ষের।
ঝটিতি উঠিয়া বসে রিকদ রাক্ষস,
তুলিল উপরে চোখ, এদিক ওদিক
নিরখিল চারিদিক; আসিছে সঙ্গীত
কোথা হতে, স্থির তাহা না পারে করিতে।
বলিল রাক্ষস "কোন জীব কোথা হতে
আসিয়াছে আজি, ময়নার মত গীত
গাইয়া গাইয়া, মন হরি লয় মোর।"
এদিক ওদিক ধায়, দেখে চারিদিকে,

এবং অন্যান্য অনেক অসভ্য জাতি অদ্যাপি "ডাহি" করিয়া থাকে। তাহাতে খরচ নাই বলিলেও হয়।

* গোঁড় প্রভৃতি জাতিরা এইরূপ আগুণ জ্বালাইয়া তাহার পাশে শুইয়া মাঠ চৌকি দেয়।

† গোঁড়, ভিল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা অত্যন্ত ভীরু।

না পায় দেখিতে কিছু ; কভু বসিতেছে,
দাঁড়াইছে কভু, লম্ফ দিতেছে কভু বা,
গড়াগড়ি যায় কভু আরম্ভিল নৃত্য।
রাক্ষসী † প্রভাতে আসি ঘরের বাহির,
শুনিল মাঠের দিকে মধুর সঙ্গীত।
আসিয়া তথায় তার স্বামীরে ডাকিল ;
ঘন ঘন তুলি পদ প্রসারিয়া বাহু,
নোয়াইয়া ঘাড় নৃত্য-মগন রাক্ষস,
হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ; দেখিয়া তাহারে
উচ্চে ডাকিল রাক্ষসী "ওরে মিনষে মোর,
বড়ই মধুর অই সঙ্গীত, রে বুড়ো'
কেড়ে লয় মন প্রাণ, আমিও নাচিব।"
এতবলি আরম্ভিল নাচিতে রাক্ষসী।‡

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

(বি এস্ সি, লণ্ডন)

† রাক্ষসী মাঠ হইতে কিছু দূরে ঘরে শুইয়াছিল।

‡ অসভ্যের উপরেও সঙ্গীতের ক্ষমত এখানে উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। গোঁ কবির এখানে বাস্তবিক কবিত্ব দেখা যায়।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ক্রিয়ারির কন্যাগণ মনের কথা বলিবার জন্য যে কিছুমাত্র কপটতা, কিছুমাত্র প্রতারণার আশ্রয় লয় নাই, ইহা আমরা কি করিয়া জানিব? কিন্তু যদি সেই উচ্চশ্রেণীর খ্যাতনামা পরীক্ষকগণকে বিশ্বাস করিতে হয়, ত এ সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, তাঁহারা বলিতেছেন যে "ক্রিয়ারি একজন সম্ভ্রান্ত সাধুচেতা ব্যক্তি, কন্যাগুলি অতি শিষ্ট শান্ত সৎস্বভাব, যিনি তাহাদের দেখিয়াছেন তিনিই বলিবেন যে প্রতারণা কপটতা তাহাদের কর্ম্ম নহে।" ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা যেরূপ সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রতারণার উপায় পর্য্যন্ত রাখিতে দেন নাই। সন্দেহের পথ একেবারে বন্ধ করিবার জন্য পরীক্ষকগণ এত সাবধানে কাজ করিতেন যে পরীক্ষাধীন বালিকার সাক্ষাতে কেহ কাহারো কাণে কাণে কথা পর্য্যন্ত কহিতে পাইত না. কি জানি ঠোঁট নাড়ার ধরণে যদি বালিকাগণ কিছু বুঝিতে পারে। কেহ যদি বলেন যে বালিকার পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ যাহারা সে গৃহে থাকিতেন তাঁহারা ত আগে হইতে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সেই সময় ইঙ্গিতে, কথা না কহিয়াও, বালিকাদের কিছু জানাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, পরীক্ষকগণ যে কথা মনে করিতেন, তাহা বালিকাদের আত্মীয়গণকে সব সময় জানিতে দিতেন না। তবে যখন বালিকাদের আত্মীয়গণকে তাহা জানাইতেন তখন এরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাদের উপর নজর রাখিতেন, যে সেদৃষ্টি এড়ান বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তারপর বালিকাগুলি এত শিষ্ট শান্ত, যে পরীক্ষকগণ পরীক্ষার সুবিধার জন্য যখন যে স্থানে যে অবস্থায় দাঁড়াইতে বলিয়াছেন তাহারা তাহাই করিয়াছে, পরীক্ষকগণও কপটতা অবলম্বন করিবার যো না থাকে এইরূপ স্থানে বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের দাঁড় করাইয়াছেন। ইহা ছাড়া আগেই বলা হইয়াছে যে বালিকাগণ অনেক সময় পরীক্ষা গৃহের কাহারো সহিত কোনরূপ সংশ্রবে না আসিয়া অন্য লাগাও রুদ্ধ ঘরের মধ্য হইতে ঠিক উত্তর করিয়াছে।*

* এসম্বন্ধে অধ্যাপক ব্যারেট যাহা বলিতেছেন তাহা বরং এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"The exceptional nature of this inquiry goes far to invalidate arguments founded on character and demeanour ; and, on this head, we will only state our conviction that any candid critic, present during the whole course of the experiment would have carried away a far more vivid impression of their genuineness than the bare printed record can possibly convey. Of more real importance is the hypothesis of exalted sensibility of the ordinary sense organs. We could discover no indication of this in any of its known forms: but by way of precaution, as has been already stated, we commonly avoided even whispering any word, number, or name that we had selected ; and the position of the excluded child, when the door was opened, would in every case have satisfied the most exacting critic. The explanation which might be sought in unconscious indications given by the sitters, and especially in the movement of the lips, has been already adverted to. Coming as we did to this investigation with considerable previous experience of the same kind, we were throughout strictly on our guard against giving such indications ourselves ; the possibility of their being given by the family was, of course, excluded where the family were ignorent of the selected word or thing ; and on the remaining occasions our perpetual vigilant watch never detected a trace of any thing of the kind. The absolute docility of the children—both the guesser and others—in taking any position in the room that we indicated, was naturally an assistance to our precautions. It may be further mentioned that, on a previous visit made by one of us, the child called the required name through the shut door, or from an adjoining room, having thus been completely isolated from the very begining to the very end of the experiment.

মনের কথা পাঠের পক্ষ প্রমাণ ইহা হইতে আর কি অধিক হইতে পারে।

এক কথায়, বালিকাদের এই মনের কথা বলিতে পারার ভিতর যে মিথ্যা জুয়াচুরি কিছুমাত্র ছিল না, সে বিষয়ে পরীক্ষকগণ নিঃসংশয় হইয়াছিলেন।

প্রতারণা ত দূরের কথা, কোন জ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ বিশেষ তীক্ষ্ণ অসাধারণ অনুভব শক্তি দ্বারাও যে বালিকাগণ উক্ত ঘটনা সকল সাধিত করিয়াছিল এমন লক্ষণ পর্য্যন্তও তাঁহারা দেখিতে পান নাই।

প্রফুল্ল ও উৎসাহ পূর্ণ মনের অবস্থাতেই মনে করা হইয়াছে।

এক সোনার ব্রোচ,
একটা ডিম,
একটা কলম দণ্ড (এই দণ্ডের উপর একটা আঙ্গুল দস্তানা (থিমবল) উলটান ছিল।)

একটা ঘোর লাল আপেল

একটা চাবি,

বালিকাগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইত। এমন কি একবার উৎসাহিত হইয়া উপরি উপরি ১৭ টি তাস একেবারে ঠিক বলিয়াছিল, একটিও ভুল করে নাই।

ক্রিয়ারির কন্যাগণই যে একমাত্র মনের কথা বলিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছে এমন নহে, লিবারপুলের দুটি মহিলা উক্ত সভার সভ্যগণের নিকট কিরূপ পরীক্ষা দিয়াছেন তাহা নিম্নের তালিকায় প্রকাশ করা যাইতেছে।

উত্তর।

ইহার রং হলদে, ইহা একটা ব্রোচ।
ঠিক যেন একটা ডিমের মত।

একটা থাম, একটা ঘণ্টার মত গড়নের জিনিস তার উপর উলটান রয়েছে।

এটা গোল, খুব ঘোর লাল রংয়ের, একটা দরজার নবেরমত দেখিতে, এটা একটা আপেল।

একটা ছোট জিনিস, তার একশেষে একটা গোলচাকা, আর একশেষে একটা ছোট নিশানের মত, একটা খেলেনার যেন নিশান মত রয়েছে। (তাহার পর ইহার নাম কি বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া,) এটা একটা চাবির মত।

ইত্যাদি।

স্মিথ নামক একজন যুবকের উপর পরীক্ষা করিয়াআরো আশ্চর্য্যরূপ মানসিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এখানে মিষ্টার ব্ল্যাকবর্ণ স্মিথের পরীক্ষক। ব্ল্যাকবর্ণ অতি সূক্ষ্মদর্শক অতি কড়া পরীক্ষক, তাঁহার কাছে পান হইতে চুনটি খসিবার যো নাই, সেই জন্য অন্যান্য সভ্যগণ কর্ত্তৃক তিনিই পরীক্ষক রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। স্মিথের চোখ বাঁধা, তিনি একটি টেবিলের কাছে উপবিষ্ট, তাঁহার হাতের কাছে টেবিলে আঁকিবার জিনিসপত্র। একজন সভ্য তাহার কাছে বসিয়া পাহারায় নিযুক্ত আছে, আর একজন সভ্য অন্য স্থানে গিয়া কোনরূপ একটি ছবি আঁকিয়া তাহা ব্ল্যাকবর্ণকে ডাকিয়া দেখাইলেন, ব্ল্যাকবর্ণ সেই ছবি কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দেখিবার পর চোখ বুজিয়া আর

একজনের হাত ধরিয়া পরীক্ষা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া স্মিথের পশ্চাতে কিছু দূরে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিলেন হয়ত বা বসিলেন। কিছুক্ষণ ব্ল্যাকবর্ণ স্থির মনে ঐ ছবি ভাবিবার পর, স্মিথ সেই চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ব্ল্যাকবর্ণের মনের ছবি আঁকিয়া দিলেন।

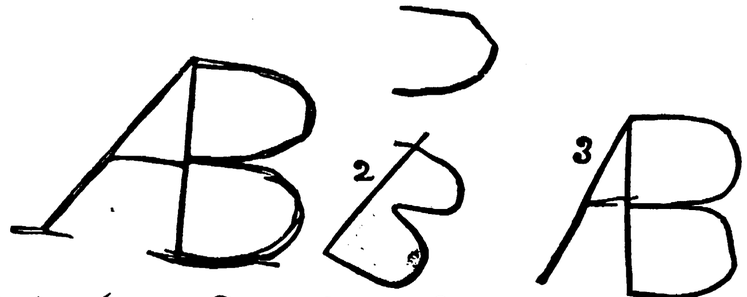

ব্ল্যাকবর্ণ মনে করিলেন, স্মিথ আঁকিলেন, তৃতীয় চেষ্টায়

ব্ল্যাকবর্ণ মনে করিয়াছেন,

স্মিথ আঁকিলেন

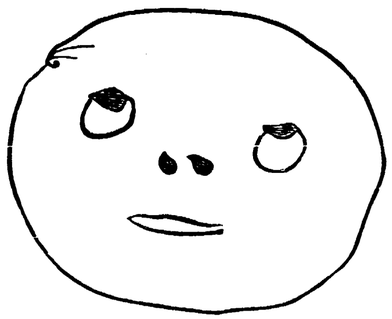

ব্ল্যাকবর্ণ মনে করিয়াছেন,

স্মিথের আঁকা

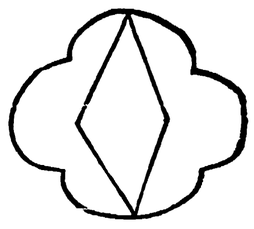

ব্ল্যাকবর্ণ মনে করিয়াছেন,

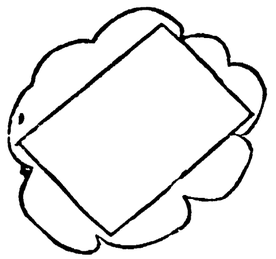

স্মিথ আঁকিলেন

এখানে যেরূপ নমুনা দেখান হইল এইরূপ ছবি, ৬০ পাতা ধরিয়া উক্ত সভার কার্য্যবিবরণ পুস্তকে দেওয়া আছে। এই রূপ পরীক্ষার সময় একবার স্মিথের চোখ বাঁধিয়াই পরীক্ষকগণ ক্ষান্ত হন নাই। তাহার কানে ছিপি দিয়া চোখে কাপড় বাঁধিয়া, তাহার পর আর এক কাপড়ে মাথা হইতে সমস্ত মুখ ঢাকিয়া তাহার উপর আবার আর একখানি কম্বল দিয়া মাথা হইতে তাহার বুক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। কোন প্রকারে যাহাতে তাহার আর বাহিরের কিছু শুনিবার কি বুঝিবার সম্ভাবনা না থাকে। আশ্চর্য্য এই, এই অবস্থায় স্মিথের ছবি আঁকা অন্য সময় হইতে আরো ঠিক হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখিতে পাইতেছি সংযত অবস্থাই চিন্তাপাঠের অনুকূল অবস্থা। ইহাতে আমাদের যোগশাস্ত্রেরি জয় দেখা যাইতেছে, যোগশাস্ত্রমতে বাহির হইতে মনকে যতই সরাইয়া লইবে, ততই মানসিক শক্তির বিকাশ সাধন হইবে।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

এই দেখা যায় যে, প্রথমে ভরদ্বাজ মুনিই ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রচার করেন, তাঁহার এই উদ্যমের ফল, আত্রেয় সংহিতা, অগ্নিবেশ তন্ত্র বা চরক-সংহিতা, হারীত সংহিতা প্রভৃতি অবিনশ্বর কীর্ত্তি সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্যতম প্রচারক ধন্বন্তরির প্রচারের ফল ধন্বন্তরি সংহিতা, সুশ্রুত, ঔরভ্র প্রভৃতি। ভারতবর্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে এত উন্নতি হইয়াছিল ভরদ্বাজ ও ধন্বন্তরিই তাহার আদি কারণ। চ্যবণ কণাদ প্রভৃতি মহর্ষিগণও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ ভারতবর্ষে যেরূপে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন, চরক সংহিতার প্রারম্ভে তাহা এইরূপে বর্ণিত আছে।

যে সময়ে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া শরীরীদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, আয়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ বিঘ্ন জন্মাইতেছিল, তখন প্রাণী সমূহের প্রতি দয়া করাই প্রধান উপলক্ষ করিয়া পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ মঙ্গলময় হিমালয়-পার্শ্বে এক সুমহতী সভা আহ্বান করিলেন। অঙ্গিরা, যমদগ্নি বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, "গৌতম, সাংখ্য" পুলস্ত, নারদ, অসিত, অগস্ত্য, বামদেব, মার্কণ্ডেয় অশ্বলায়ণ, পারিক্ষি, "ভিক্ষু আত্রেয়," ভরদ্বাজ, কপিষ্ঠল, বিশ্বামিত্র, আশ্বরথ্য, ভার্গব চ্যবণ, অভিজিৎ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, বার্ক্ষি, দেবল, গালব, সাঙ্কৃত্য, বৈজবাপি, কুশিক, বাদরায়ণ, বড়িশ, শরলোমা কাপ্য, কাত্যায়ণ, কাঙ্কায়ণ কৈকশেয়, ধৌম্য, মারীচ, কাশ্যপ, শর্করাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, লৌগাক্ষি,

পৈঙ্গি, শৌনক, শাকুনেয়, মৈত্রেয়, (৬) মৈমতায়ণি প্রভৃতি ঋষিগণ বৈখানস এবং বালখিল্য মুনিগণ এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া তপোলব্ধতেজঃ প্রভাবে হূয়মান প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান, দম এবং নিয়মের নিধি স্বরূপ। তাঁহারা তথায় সুখে উপবেশন করিয়া এই পুণ্যজনক কথার প্রস্তাব করিলেন,:— "আরোগ্যই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রধান উপায়। রোগ সমূহই সেই আরোগ্যের মঙ্গলের এবং জীবনের অপহর্ত্তা। ব্যাধি মনুষ্যগণের পক্ষে মহাবিঘ্ন স্বরূপ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই ব্যাধি সমূহের শান্তির উপায়, কে বলিয়া দিবেন ?"

ইহা বলিয়া তাঁহারা ধ্যানস্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধ্যান চক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, এ বিষয়ে ইন্দ্রই একমাত্র শরণ্য। তিনিই যথাযথ রূপে রোগশান্তির উপায় বলিয়া দিবেন। (অনন্তর আবার প্রস্তাব করিলেন, ইন্দ্রকে রোগশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কে ইন্দ্রভবনে গমন করিবেন ? "এখানে এজন্য আমিই নিযুক্ত হইলাম" সর্ব্ব প্রথমে ভরদ্বাজই এ কথা বলিলেন সুতরাং ঋষিগণ কর্ত্তৃক তিনিই নিয়োজিত হইলেন।

ধীমান ভরদ্বাজ ইন্দ্রভবনে উপনীত হইয়া দেখিলেন দেবর্ষিগণের মধ্যে সর্ব্ব-বলহস্তা ইন্দ্র দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ভগবান ভরদ্বাজ নিকটে যাইয়া, জয় উচ্চারণ এবং আশীর্ব্বচন দ্বারা ইন্দ্রকে অভিনন্দন করিয়া, ঋষিগণের অভিলষিত বাক্য জানাইয়া বলিলেন, ব্যাধি-সকল সকলপ্রাণীর আতঙ্ক স্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, হে অমর প্রভো ! আমাকে সেই ব্যাধি সকলের শান্তির উপায় আনুপূর্ব্বিক বলিয়া দিন।

অল্প কথাতেই বিপুল বুদ্ধি দেখিয়া, ভগবান ইন্দ্র, মহর্ষিকে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মভাষিত আয়ুর্ব্বেদ, সুপবিত্র, নিত্য ; রোগের কারণ, রোগের লক্ষণ, এবং ঔষধ জ্ঞান এই ত্রিবিধ সূত্রে পরিপূর্ণ এবং সুস্থ ও রোগী উভয়েরই সমান আশ্রয়স্থল। মহামতি ভরদ্বাজ মুনি তন্মনা হইয়া সেই অনন্ত পার ত্রিস্কন্দে আয়ুর্ব্বেদ অচিরাৎ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঋষিগণ দীর্ঘ আয়ু কামনা করিয়া প্রজাদিগের হিতকর এবং আয়ুর্ব্বর্দ্ধন আয়ুর্ব্বেদ ভরদ্বাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ, আয়ুর্ব্বেদ পাঠে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া তন্ত্রোক্ত বিধি, সামান্য, বিশেষ গুণ, কর্ম্ম, সমবায় প্রভৃতি অবগত হইয়া পরম শান্তি এবং অনশ্বর জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

---

৬ মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র মুনির পুত্রদিগের নামের তালিকায় অশ্বলায়ণ, গার্গ্য, গালব, হিরণ্যাক্ষ জাবালি সুশ্রুত এবং নারদের নাম দৃষ্ট হয়। বৈশ্যার গর্ভে এবং বিশ্বামিত্রের ঔরসে সুশ্রুতের জন্ম হয়। যদি উল্লিখিত সভাস্থ অশ্বালয়ণ প্রভৃতি ঋষিগণ বিশ্বামিত্রের পুত্র হন তবে তাঁহারা সুশ্রুতের ভ্রাতা।

ভরদ্বাজের শিষ্যদিগের মধ্যে লোকহিতে রত পুনর্ব্বসু আত্রেয় ঋষি, সকল প্রাণীর হিতের জন্য অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি, এই ছয়টি শিষ্যকে সুপবিত্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারাও মুনির বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যদিচ মুনি, সকল শিষ্যকেই এ সম্বন্ধে সমান উপদেশ দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য দেখা যায়, কেন না, সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিবেশই তন্ত্র প্রণয়ন করেন। অনন্তর সুমেধা-সম্পন্ন ভেল প্রভৃতি পঞ্চ ঋষিও নিজ নিজ তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া ঋষিগণের সহিত আত্রেয় মুনিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পুণ্যকর্ম্মা ঋষিগণ সূত্রার্থ শ্রবণ করিয়া "সুন্দর রূপে রচিত হইয়াছে" এই বলিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে অনুমোদন করিলেন। সেই সময়ে দেবতাগণও মহা আনন্দ করিয়াছিলেন। * * * । ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেই তন্ত্রগুলি অনুমোদিত হইয়া প্রাণীগণের হিতার্থে পৃথিবীতে পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। (৭)

বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর মূল উদ্ধৃত করিলাম না। কেবল মূলের অনুবাদ করিয়া দিলাম। চরক সংহিতা ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের এরূপ বিস্তৃত প্রাচীন ইতিহাস আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত সভাতে যে যে ঋষি উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই যে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে যত্ন করিয়াছিলেন এখনও তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক ঔষধ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতিতে কাশ্যপ, চ্যবণ, গার্গ্য, অগস্ত্য প্রভৃতির নাম দেখা যায়। যথাস্থলে এই সকল আলোচনা করিব।

আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতাদিগের এবং তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদির বিবরণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এইরূপে লিখিত আছে ;—

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চৈবায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥
কৃত্বাতু পঞ্চমংবেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্বতন্ত্রসংহিতাং তস্মাদ্ ভাস্করশ্চ চকার সঃ॥
ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য আয়ুর্ব্বেদং স্বসংহিতাম্।
প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতা স্ততঃ॥
তেষাং নামানি বিদূষাং তন্ত্রাণি তৎকৃতানিচ
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি সাধ্বি! মত্তোনিশাময়॥
ধন্বন্তরি র্দ্দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽশ্বিনীসুতৌ।
নকুলঃ সহদেবোঽর্কিশ্চ্যবণো জনকো বুধঃ॥
জাবালো জাজলিঃ পৈলঃ করথোঽগস্ত্য এবচ।
এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ষোড়শ ব্যাধিনাশকাঃ
চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোরমং।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান চকার প্রথমে সতি!
চিকিৎসাদর্পণং নাম দিবোদাস শ্চকার সঃ।
চিকিৎসাকৌমুদীং দিব্যাং কাশীরাজ শ্চকার সঃ
চিকিৎসা সারতন্ত্রঞ্চ ভ্রমঘ্নং চাশ্বিনীসুতৌ।
তন্ত্রং বৈদ্যকসর্ব্বস্বং নকুলশ্চ চকার সঃ॥

৭ চরকসংহিতা ১ম অধ্যায় (সূত্রস্থান)।

চকার সহদেবশ্চ ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দনং।
জানার্ণবং মহামন্ত্রং যমরাজ শ্চকার সঃ॥
চ্যবনো জীবদানঞ্চ চকার ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার জনকো যোগী বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনং॥
সর্ব্বসারং চন্দ্রসুতো জাবালস্তন্ত্রসারকং।
বেদাঙ্গসারং তন্ত্রঞ্চ চকার জাজলি র্মুনিঃ॥
পৈলো নিদানং করথ স্তন্ত্রং সর্ব্বধরংপরং।
দ্বৈধনির্ণয় তন্ত্রঞ্চ চকার কুম্ভসম্ভবঃ॥
চিকিৎসা শাস্ত্রবীজানি তন্ত্রাণ্যেতানি ষোড়শঃ॥ (৮)

ইহার মর্ম্ম এই, ব্রহ্মা ঋগযজুঃ সাম এবং অথর্ব্ব এই চারিবেদ, অবলম্বন করিয়া পঞ্চমবেদ আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করত উহা সূর্য্যকে প্রদান করেন। সূর্য্য আবার নিজ নামে ভাস্করসংহিতা প্রণয়ন করিয়া ধন্বন্তরি প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে উহার শিক্ষা দান করেন। এই ভাস্করসংহিতা অবলম্বন করিয়া ষোলজন শিষ্যের মধ্যে (১) ধন্বন্তরি চিকিৎসা তত্ত্ববিজ্ঞান (২) দিবোদাস চিকিৎসাদর্পণ (৩) কাশীরাজ চিকিৎসাকৌমুদী (৪। ৫) অশ্বিণীকুমারদ্বয় চিকিৎসাসারতন্ত্র (৬)নকুল বৈদ্যক সর্ব্বস্ব (৭) সহদেব ব্যাধিসিন্ধু-বিমর্দ্দন (৮) যমরাজ জ্ঞানার্ণব (৯) চ্যবন জীবদান (১০) রাজর্ষি জনক বৈদ্যসন্দেহভঞ্জন (১১) বুধ সর্ব্বসার (১২) জাবাল মুনি তন্ত্রসার (১৩) জাজলি মুনি বেদাঙ্গসার (১৪) পৈলমুনি নিদান (১৫) করথ মুনি সর্ব্বধরতন্ত্র এবং (১৬) অগস্ত্যমুনি দ্বৈধ-নির্ণয় তন্ত্র প্রণয়ন করেন; এই ষোল খান তন্ত্রই চিকিৎসা শাস্ত্রের বীজ স্বরূপ।

৮ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১৬শ অধ্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই সকল কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? ইহাতে যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহাতে প্রকৃততত্ত্ব অপেক্ষা অমূলক বিবরণের ভাগই অধিক। দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই এখন লোপ পাইয়াছে; সুতরাং সত্যাসত্য সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা সহজ নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় টীকাকারগণ অনেক প্রাচীন গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া তাহা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলির কোনখানির নামই প্রায় টীকা প্রভৃতিতে দেখা যায় না।

অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি, সুশ্রুত, কাশীরাজ ধন্বন্তরি বাগ্‌ভট প্রভৃতি ভিন্ন, অধিকাংশ আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা প্রণেতৃগণই ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতি পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণগণই আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী ছিলেন। যাঁহারা এই শাস্ত্রের প্রাণদাতা যাঁহারা এই শাস্ত্র প্রভাবে মানুষের জীবনত্রাণ করিতেন সেই ব্রাহ্মণগণ এই চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করিলে এক্ষণে লোকসমাজে এত ঘৃণাস্পদ হয়েন কেন? আমরা এই সূত্রে পূজ্যতম ব্রাহ্মণদিগের অলৌকিক উদারতা এবং অপার্থিব নিঃস্বার্থতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। পুরাকালের ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের অনেক বিষয়ে স্বার্থপরতার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহারা আবার অনেক স্থলে এরূপ উদারতা মহত্ত্ব ও নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিয়াছেন যে

ত াহা তুলনা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণগণের এরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল যে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। তাঁহারা রাজেশ্বর সম্রাটেরও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া অবাধে নিজেরাই রাজদণ্ড ধারণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহারা কদাচ করিতেন না বরং যিনি এজন্য লালায়িত হইতেন তাঁহাকে পতিত হইতে হইত। অতি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন; ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট উপার্জ্জনও ছিল, কিন্তু যখন তাঁহারা অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির সময় হইতে বৈদ্যদিগকে এ ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন তখন তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যদি ব্রাহ্মণগণ এ ব্যবসায়ের লোভ সংবরণ না করিতে পারেন তবে আর বৈদ্যজাতির উপায়ান্তর নাই, তবে তাহারা কি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে? সুতরাং নিয়ম করা হইল, চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল পাওয়া যাইবে না ৯। যখন এ সামান্য ক্ষতিতে তাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না তখন নিয়ম করা হইল "চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্য; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তাহাদের অন্নভোজন করিলে পতিত হইবেন এবং কুকুরযোনি লাভ করিবেন। ১০ কিন্তু ইহাতেও ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। যখন মহারাজ পরীক্ষিতকে তক্ষক দংশন করিতে যায় তখন কাশ্যপের ন্যায় মহর্ষিও অর্থলোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, পরীক্ষিতের চিকিৎসা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তক্ষক বহু অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহাকে পথেই বিদায় করিয়া দিল। মহর্ষিগণ দেখিলেন, এরূপ চক্রান্ত করিয়াও অর্থলুব্ধ ব্রাহ্মণদিগকে এ ব্যবসায় হইতে বিরত রাখা যাইবে না। অর্থের কাছে এই আত্মমর্য্যাদা টুকুর জন্য অনেকেই এ ব্যবসা ছাড়িবেন না। সুতরাং এ নিয়ম ও বৈদ্যদিগের উপার্জ্জনের পক্ষে অনুকূল হইল না। সুতরাং আবার নিয়ম করিলেন—"ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্টা সচেলং স্নানমাদিশেৎ" এবং "পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং * * * (ব্রাহ্মণ চিকিৎসককে দেখিলে বস্ত্রসহ স্নান করিবে, চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের অন্ন পূয়তুল্য, ইত্যাদি। ধন্য ব্রাহ্মণগণ! তোমরা যথার্থ ভূদেব। দেবতা ভিন্ন সামান্য মনুষ্য কি অন্যের জন্য নিজ স্বার্থ এইরূপ বলিদান করিতে পারে! শুধু বৈদ্যদিগের জন্য নহে, রাজা যুদ্ধব্যবসায়ী রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের জন্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পারত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কাছে অর্থলোভ, রাজ-পদ প্রভৃতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। অন্য ব্যবসায় অবলম্বন

৯ মনুসংহিতা দ্রষ্টব্য।

১০ মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৮৫ অধ্যায়।

করিলে তপোযপ ধর্ম্মকর্ম্ম শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির দিকে মনোনিবেশ হয় না সুতরাং এই সমুদায়ের উপর ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, এবং স্বজাতিদিগকেও ঐ সমুদয় ব্যবসায়ের উপর বিতৃষ্ণ করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে এই সকল নিয়মের প্রবর্ত্তনা করিতেন। তাহা হউক; তথাপি দেবতুল্য লোক ব্যতীত কি সামান্য মনের লোকে এই সকল লোভ সংবরণ করিতে পারে? যাহা হউক, এই সকল নিয়ম করিয়া ঋষিগণ বেশ কৃতকার্য্য হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসায় একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। প্রায় বাগ্‌ভট গুপ্তের সময় হইতে চিকিৎসা, বৈদ্যদিগের একচেটিয়া ব্যবসা হইয়া গেল। সেই সময় হইতে কত শত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকার, টীকাকার প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই, তাহারা সকলেই প্রায় বৈদ্যবংশীয়।

কিন্তু আত্রেয় প্রভৃতি মুনিদিগের সময় হইতে ব্যবস্থা আছে যে ব্রাহ্মণগণ কেবল প্রাণীদিগের উপকারার্থ, ক্ষত্রিয়গণ আত্মরক্ষার্থ এবং বৈশ্যগণ বৃত্তির নিমিত্ত কিম্বা সামান্যতঃ ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম প্রতিগ্রহের নিমিত্ত, সকলেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে। তথাহিঃ—

স (আয়ুর্ব্বেদঃ) চাধ্যেতব্যো ব্রাহ্মণ রাজন্য বৈশ্যৈঃ; তত্রানুগ্রহার্থং প্রজানাং ব্রাহ্মণৈ রাত্মরক্ষার্থং রাজন্যৈ, বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ, সামান্যতো বা ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রতিগ্রহার্থং সর্ব্বৈঃ। ইত্যাদি। (চরক, সূত্রস্থান, ৩০শ অধ্যায়)

এই নিয়মানুসারে চলিয়া চিকিৎসা করিলে ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক চিকিৎসোপজীবীদিগের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইত না। কিন্তু পরোপকারী ঋষিগণ দেখিলেন এ নিয়মানুসারে চলিলেও কোন কোন অর্থলুব্ধ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র না মানিয়া চিকিৎসা দ্বারা অর্থাদি গ্রহণ করিতে পারে; সুতরাং চিকিৎসা ব্যবসায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে একেবারে উঠাইয়া দিয়া "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্টা * * এই বিশেষ বিধিই বজায় রাখিলেন।

যেমন বৈদিক কালে সেইরূপ পৌরাণিক ও আচার্য্য সময়েও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ আন্তরিক যত্ন করিতেন। বিক্রমাদিত্য, ভোজ মদনপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ স্বয়ং প্রজাদিগের চিকিৎসা করিতেন এবং তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত শাসনের প্রয়োজন। সমাজের অন্তর্গত সমুদায় ব্যক্তিগণ যাহাতে সুখে থাকিতে পারে এই উদ্দেশে দেশ কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন

ভিন্ন প্রকার নিয়মাবলী ও কার্য্য পদ্ধতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সকল কার্য্যপদ্ধতি ও নিয়মাবলীর মধ্যে এক প্রধান সাদৃশ্য এই যে তাহাদের সকলেরই এক মুখ্য উদ্দেশ্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে তাহাকে সকল সমাজেরই লোকে ঘৃণা করে ও শাসন করিতে চেষ্টা করে। আর যে ব্যক্তি যৎসামান্য আহার্য্য ও পরিধেয় পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সমাজের উন্নতি সাধনে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে তাহাকে সকল সমাজেরই লোকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে। দুষ্টের দমন দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

প্রথম, সমাজের কতকগুলি কর্ম্মচারী দ্বারা। দ্বিতীয় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা।

যেরূপ কার্য্যে সমাজের আত্যন্তিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সেরূপ কার্য্যের যথোপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব না হইলে তাহার দণ্ড কতকগুলি কর্ম্মচারী দ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকে। নর হত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি, জ্ঞাতসারে প্রকাশ্য ভাবে অন্যের সম্পত্তিনাশ, ইত্যাদি কার্য্য এই শ্রেণীর দুষ্কর্ম্ম। আর যেরূপ কার্য্যে সমাজের অত্যল্প ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কিম্বা আত্যন্তিক ক্ষতি হইলেও প্রমাণ দেওয়া কঠিন সেরূপ কার্য্যের দণ্ড সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রদত্ত হয়। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি কর্ক্কশাচরণ করে, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য করে, আইন দ্বারা সে ব্যক্তির দণ্ড হয় না, কিন্তু তাহার প্রতিবাসীগণ তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ও তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। এইরূপ শাসনকে আমরা সামাজিক শাসন বলি; সামাজিক শাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লোকের দ্বিমত নাই। যেরূপ কার্য্যে সমাজের অমঙ্গল হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা অথচ আইন দ্বারা যাহার দণ্ড বিধান করা বিবেচনা সঙ্গত নহে, সামাজিক শাসন দ্বারা সেরূপ কার্য্যের নিরাকরণ হওয়া আবশ্যক, আবার সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকাও আবশ্যক। যে প্রথা অধিককাল ধরিয়া কোন সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া আইসে, আর কোন ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিলে সে ব্যক্তির প্রতি লোকের বিশেষ দৃষ্টি পড়িতে পারে—সে ব্যক্তি তাহার প্রতিবাসীদিগের, এমন কি সমুদায় সমাজের বিরাগভাজন হইতে পারে। এরূপ হওয়ার কারণ কি? আমরা যাহা কিছুতে অধিক কাল ধরিয়া অভ্যস্ত হই তাহা ক্রমে ক্রমে আমাদিগের নিকট সহজ হইয়া আইসে, তাহা যদি আমাদিগের শুভকর হয়, উত্তম,—যদি অশুভকর হয় তাহা হইলে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিতে শিখি, যদিই পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় না দেখি তথাপি তাহা হইতে আমরা যে কষ্ট পাই কালক্রমে তাহা আমাদিগের পক্ষে সহ্য হইয়া আসিতে পারে। আর যাহা কিছু আমাদিগের পক্ষে নূতন, তাহা আমাদিগের শুভকর কি অশুভকর হইবে তাহা আমরা প্রথমতঃ জানি না সুতরাং তাহার প্রতি আমরা আদর না

দেখাইতে পারি; যদি কোনরূপে তাহা হইতে আমরা বিপদ আশঙ্কা করি তবে তাহার প্রতি আমাদিগের বিরাগ জন্মিতে পারে। সমাজে যে সকল প্রথা অধিক কাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে লোকে সে সকল প্রথায় অভ্যস্ত; প্রথমতঃ যখন সে সকল প্রথার বিপরীতাচরণ দেখা যায়, তখন তাহাতে লোকে বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারে। সমাজ যতই পুরাতন হইতে থাকে তাহার মধ্যে প্রচলিত প্রথা গুলির সংখ্যাও অধিক হইতে থাকে। সাধারণতঃ এই সকল প্রথা লোকে মান্য করিয়া চলে, অনেকের তাহার অন্যথা করিতে ইচ্ছা হয় না; কাহারও কাহারও ইচ্ছা হইলেও সেরূপ করিতে সাহস হয় না। এই রূপে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হ্রাস হইয়া আইসে, সমাজের প্রারম্ভে স্বেচ্ছাচারের প্রাবল্য দেখা যায়, সমাজের বর্দ্ধিতাবস্থায় সামাজিক শাসনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রাজ্য হ্রাসায়তন দেখা যায়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োজন। মনুষ্যের জীবন কি? চতুষ্পার্শস্থ ঘটনাবলীর সহিত মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যীকরণ মাত্র। তাহার চতুষ্পার্শে যে সকল ঘটনা দেখা দিতেছে সেই সকল ঘটনার সহিত স্বীয় শরীর ও মন এই দুয়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিবার উদ্দেশে মনুষ্য যে শক্তি প্রয়োগ করিতেছে সেই শক্তির প্রকাশকে কার্য্য বলে, মনুষ্যের কার্য্য সমূহই তাহার জীবন। যখন আমরা দেখিতে পাই যে মনুষ্যের চতুষ্পার্শস্থ ঘটনাবলী ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ক্রমাগত অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, আলোক, উত্তাপ, তাড়িৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বল সমূহ ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে, ভৌতিক বস্তুগুলি পরস্পরের সহিত এক্ষণে এক প্রকারে সম্বদ্ধ, আবার পরক্ষণে আর এক প্রকারে সম্বদ্ধ, হইতেছে; যখন আমরা দেখিতেছি প্রকাণ্ড নাট্যশালার মধ্যে দৃশ্য ও অভিনয়ের পরিবর্ত্তনের ন্যায় এই বিশাল সংসার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রাকৃতিক বল সমূহের লীলাখেলা ক্রমাগত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, প্রকৃতি ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, তখন মনুষ্যদিগের মধ্যে কে সাহস করিয়া বলিবে যে জীবনে কার্য্যপ্রথার পরিবর্ত্তনে প্রয়োজন নাই? প্রকৃতি যেমন চলিতেছে, মনুষ্যেরও তেমনি চলিতে হইবে। প্রকৃতির আজ্ঞা "গতি ও পরিবর্ত্তন"—এ আজ্ঞা বড় কঠোর আজ্ঞা, যে ব্যক্তি ও যে জাতি বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই আজ্ঞা পালন করিতে পারে সে ব্যক্তি ও সে জাতি উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে থাকে। আর যে ব্যক্তি ও যে জাতি তাহা না করিতে পারে—তাহার? তাহার সর্ব্বনাশ, অধোগতি ও বিলয় তাহার পরিণাম। দূরতীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, অন্যান্য যাত্রীদিগের সহিত সমবলে চল, যদি তাহা না পার তুমি পশ্চাতে পড়িয়া থা-

কিবে, অন্ধকার আসিবে অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া কষ্ট পাইবে। তাই বলিতেছি সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত এক পক্ষে যেমন সামাজিক শাসনের প্রয়োজন, অপর পক্ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও সেইরূপ প্রয়োজন। স্বেচ্ছাচার জাত অমঙ্গল সমূহ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সামাজিক শাসনের যেমন প্রয়োজন, চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তনের সহিত মনুষ্য জীবনের কার্য্য-পদ্ধতিগুলির পরিবর্ত্তনের উদ্দেশে ব্যক্তি-গত স্বাধীনতারও সেইরূপ প্রয়োজন। সকলেই যদি পুরাতন প্রথানুসারে কার্য্য করে তবে প্রকৃতির নূতন মূর্ত্তি দেখা দিলে নূতন প্রথা প্রচলিত করিবে কে? সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত, সমাজের উন্নতির নিমিত্ত, সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এতদুভয়েরই প্রয়োজন ইহা আমরা বু-ঝিতে পারিয়াছি। এক রাজ্যে দুই রাজা হইলে তাহাদিগের মধ্যে দেশ বিভাগের প্রয়োজন হয়। দেশ বিভাগ না হইলে রাজায় রাজায় সংঘর্ষণ হইয়া প্রজাগণের সম্পত্তিনাশ ও জীবননাশ হয়। সমাজ-রাজ্যে সামাজিক শাসনেরই বা কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য করা উচিত আর ব্যক্তি-গত স্বাধীনতারই বা কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য থাকা উচিত আমাদিগের এ-ক্ষণে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইতেছে। কিন্তু এ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে স-মাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারিলে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা অপেক্ষা-কৃত সহজ হইয়া আসিবে। আমরা সদা সর্ব্বদা "আমি" "তুমি" "সে" এই কথা-গুলির ব্যবহার করিয়া থাকি, সুতরাং আমরা মনে করি যে এই কথাগুলির অর্থ আমরা সম্পূর্ণ রূপে বুঝি। কিন্তু আমিই বা কি 'সেই বা কি 'তুমি'ই বা কি এই প্রশ্ন গুলির অর্থ কে সহজ করিয়া বলিয়া দিতে পারে? আমি, তুমি ও সে ইত্যাদির সমষ্টিই সমাজ, এক্ষণে প্রশ্ন এই যে আমি তুমি ও সে লইয়াই সমাজ—না সমাজ হই-তেই আমি, তুমি, সে। আমি, তুমি, সে ইত্যাদি ব্যক্তি সমূহের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের সমষ্টির নামই সমাজ না সমাজের বিশেষ বিশেষ অবতারই আমি, তুমি ও সে? এক কথায় ব্যক্তিত্ব সমূহই সমাজ না সমাজের বিশেষ আকারের অস্তিত্বই ব্যক্তিত্ব। প্রশ্ন বড় জটিল, কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছি, বাহিরে, অন্ধ-কার দেখিয়া আমরা ভীত হইব না, সাব-ধানে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পদবিক্ষেপ করিতে করিতে আমরা অবশেষে একটী পথ দেখিতে পাইব এরূপ আশা করা যাইতে পারে। আমি প্রথমতঃ আমার আমিত্ব সম্বন্ধে কি জানি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক পরে 'তুমি' কি 'সে' কি 'সমাজ' কি তাহা বিবেচনা করা হইবে। আমি দেখিতেছি যে আমি কখনও বা সুখ অনুভব করিতেছি কখনও বা দুঃখ অনুভব করিতেছি ক-খনও বা আহ্লাদ পাইবার আশায় আর কখনও বা কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার আশায় আমি শক্তি প্রয়োগ করিতেছি

আর কখনও বা ইন্দ্রিয়জাত বোধসমূহ ও তাহাদিগের কাল্পনিক প্রতিবিম্বসমূহ হইতে জ্ঞানলাভ করিতেছি। আমার স-ম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহা কেবল এই সকল অনুভূতি, এই সকল উদযমন, আর এই সকল জ্ঞান; আমি এইরূপ অনুমান করি যে এই সকল ঘটনার মূলে একটী অস্তিত্ব আছে, এই অস্তিত্বকে আমি "আমি" এই নাম দিই। আমি দেখি যে আমার মানসিক ঘটনা হইতে আমার কার্য্যের উৎ-পত্তি, আমি জ্ঞাতসারে যে সকল কার্য্য করি তাহা আমার মানসিক ঘটনার ফল মাত্র; আমি কষ্ট পাইতেছি এই কষ্টরূপ মানসিক ঘটনা হইতে উহার নিরাকরণো-পযোগী কার্য্য সংসারে আবির্ভূত হইল। আমার কার্য্য সমূহ আমার মানসিক ঘটনা সমূহের চিহ্ন, আর এই সকল মানসিক ঘটনা হইতেই আমি আমার অস্তিত্ব প্রস্তাব করি। আমি যখন অন্য কোন পাত্রে আমার ন্যায় কার্য্য দেখি আর যখন দেখি যে সে কার্য্য আমার শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে না তখন আমি এই মনে করি যে তাহার অপর পার্শ্বে মানসিক ঘটনা আছে আর ঐ মানসিক ঘটনার মূলে অ-স্তিত্ব আছে। এই অস্তিত্বকে আমি অবস্থা-ভেদে কখন বা "তুমি" কখনও বা "সে" বলি। এইরূপে আমি আমার ন্যায় কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব প্রস্তাব করি, এই সকল অস্তিত্বকে আমি আমার চতু-ষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তি সমূহ বলি; আমি ও আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগুলিকে লইয়া আমার সমাজ গঠিত। অতএব এই পক্ষে দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিত্বসমূহই সমাজ, সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্তি প্রধান বিষয়, কারণ ব্যক্তি হইতেই সমাজ গঠিত। আবার অপর পক্ষে দেখা যাউক ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সামাজিক অস্তিত্বের প্রতি নির্ভর করে কি না। সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বারি-বিন্দু লইয়াই সমুদ্র; আবার সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বারিবিন্দুসমূহ সমুদ্রের এক একটী প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ; সমুদ্রের প্রত্যেক বারি-বিন্দু হইতে সমুদয় সমুদ্রের গুণাগুণ অব-গত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সমুদ্র ও সমুদ্রস্থ প্রত্যেক বারিবিন্দুর মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, সমাজ ও সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেও সেই রূপ সম্বন্ধ। সত্য বটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি লইয়াই সমাজ—আবার ইহাও সত্য যে সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি সমুদয় সমাজের প্রতিকায়া মাত্র। সাধারণ দৃষ্টিতে তুমি 'আমি' 'সে' ইহারা ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহারা সকলেই একই সমা-জের ভিন্ন ভিন্ন অবতার, এক শাখারই ভিন্ন ভিন্ন কুসুম, এক বৃক্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন ফল।

আমাদিগের সমাজ যে সকল বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত, আমাদিগের সমাজ যেদেশ যে জলবায়ু ও ঋতুসমূহের মধ্যে অবস্থিত, যেরূপ আচার ব্যবহার, ও যেরূপ নীতি দ্বারা পরিচালিত, 'তুমি' 'আমি' 'সে' আ-মরা সকলেই সেই সমুদয় বিষয় হইতে উদ্ভূত। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই-তেছি যে সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে

অতি গূঢ় নৈকট্য সম্বন্ধ ; ব্যক্তি সমূহ লইয়াই সমাজ, সমাজের অবতারই ব্যক্তি। এই দুয়ের মধ্যে একের মঙ্গল হইলে অপরের মঙ্গল হয়, একের অমঙ্গল হইলে অপরেরও অমঙ্গল হয় ; একটি সুরে যেন দুইটি তার বাঁধা, একটি বেসুরো হইলে আর একটিকেও যেন বেসুরো হইতে হইবে।

ক্রমশঃ

হুগলীর ইমাম বাড়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।*

সন্ন্যাসী।

দেড়শত বৎসরেরও আগেকার কথা হইতেছে, এই সময় কোথা হইতে কেজানে এক সন্ন্যাসী আসিয়া হুগলী সহরে আবির্ভাব হইয়াছেন, ইঁহার নাকি অলৌকিক ক্ষমতা, ইঁহার কৃপায় নাকি অন্ধে আঁখি পায়, খঞ্জ আরোগ্য হয়, ইহাঁর আশীর্ব্বাদে নাকি দুঃখ ক্লেশ দূরে চলিয়া যায়। লোকেরা ইহা কেমন করিয়া জানিল তাহা বলিতে পারি না, সত্য সত্য কোন কানা খোড়াকে তাহারা আরোগ্য হইতে দেখিয়াছে কিনা কেজানে, কিন্তু চারিদিকে এইরূপ ত এক মহা গুজব উঠিয়াছে ; হিন্দুরা তাহাকে মহাপ্রভু বলিয়া প্রণাম করিতেছে, মুসলমানেরা পীর বলিয়া পূজা দিতে যাইতেছে, ইহাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী সবে দুই চারি দিন আসিয়াছেন, দুই চারি দিন হইতে গঙ্গার ঘাটে, লোকে লোকারণ্য, কানা খোড়া, দীন দুঃখীর ত কথাই নাই, কত ধনী, ক্ষমতাশালী, ভাগ্যবান তাঁহার দর্শন জন্য লালায়িত। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া থাকে, রাজ দর্শনেও বুঝি এত লোকের সমাগম হয় না। আজও প্রত্যুষে নদীতীরের রাস্তায় লোক ধরিতেছে না, পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে লোক জমিয়া সন্ন্যাসী দর্শনে চলিয়াছে। সেই সময় সেই জনতাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া একখানি বস্ত্রাবরিত শিবিকা স্কন্ধে করিয়া সুসজ্জিত বেশভূষাধারী বাহকগণ মহা প্রতাপভরে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে আট জন প্রহরী, তাহারাও মহাদম্ভে হুঙ্কার ছাড়িয়া নিরপেক্ষ ভাবে আশে পাশের ভীরু লোকদিগের উপর আপনাদিগের উদার যষ্টির করুণা বিতরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এতখানি করিবার যে বিশেষ আবশ্যক পড়িয়াছিল তাহা নহে, পাল্‌কিখানি কাছে আসিতে না আসিতে পথের লোকেরা আপনা হইতেই মহা ত্রস্তে ভয়ে ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। তবু সকলের অদৃষ্টে রেহাই ঘটিতেছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার এই সময় এক জন বৃদ্ধা আসিয়া পালকীর সমুখ দিয়া রাস্তা পার হইতে চেষ্টা করিল, সে সন্ন্যাসী দর্শনে যাইবে, ঘুরিয়া গেলে বিলম্ব হইয়া যায়—পালকীর কাছ দিয়াই সে ছুটিয়া যাইতে চাহে। ক্রুদ্ধ প্রহরী ভীমবলে বৃদ্ধার হস্তধারণ করিয়া সেখান হইতে সরাইয়া দিল। বৃদ্ধা আবার সরিয়া আসিয়া অতি কাতরে কাঁদিয়া "বলিল বাবা গো তোরা ছেড়ে দে, আমার ছেলে বাঁচে না, সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলা আনতে যাচ্ছি, বাবা ছেড়ে দে" দুর্ব্বলা বৃদ্ধা প্রাণের দায়ে সেই ভীমবল প্রহরীর হস্তকে তাচ্ছিল্য করিয়া যাইবার জন্য যুঝাযুঝি করিতে লাগিল। বৃদ্ধার সেই অসীম সাহস দেখিয়া অন্য লোকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে সেই একজন অবলা রমণীকে পরাজয় করিতে আট জন প্রহরী তাহার উপর আসিয়া পড়িল, এই সময় কোথা হইতে একজন তরুণ যুবক আসিয়া বুড়িকে আশ্রয় দিয়া সমুখের প্রহরীকে পদাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন" অরে কাপুরুষ, একজন বৃদ্ধা নারীকে মারিয়া তোমাদের বীরত্ব,—এস বাছা এস আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে পহুছিয়া দিয়া আসি।"

যুবকের সেই তেজস্বী বীর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রহরীগণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তাঁহার সেই দৃষ্টিতে যেন তাহাদের মত সহস্র প্রহরী ভস্ম হইয়া যাইবে,তাঁহার বাহুর স্পর্শে যেন সহস্র তরবারী বিফল হইয়া পড়িবে। প্রহরীদের তর্জ্জন গর্জ্জন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, সিংহের নিকট মেষের ন্যায় তাহারা বলহীন হইয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক বুড়ির হাত ধরিয়া অনায়াসে সেইখান দিয়া চলিয়া গেলেন, দর্শকেরা অবাক হইয়া রহিল, দু এক জন বলাবলি করিল "ধন্যি সাহস বলতে হবে—নবাব খাঁ জাহাঁর লোককে হারালে গো"। যুবক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া এক জন খোঁড়া বলিল "বাবা গো আমার লাঠি গাছটি এক দুষ্ট ছেলে কাড়িয়া লইয়া গেল—আমার হাতটি ধর বাবা, একবার প্রভু দর্শনে যাই।" একজন অন্ধ সে কথা শুনিয়া বলিল "কে তুমি গো জয় হোক্, অন্ধ ব্রাহ্মণকে ধর, কত কষ্টে আসিয়াছি বাবা, আর বুঝি পৌছান হয় না।" একটি ছোট ছেলে যে অন্ধের হাত ধরিয়া আনিতেছিল বৃদ্ধার সহিত প্রহরীর গণ্ডগোল আরম্ভ হইতেই সে অন্ধের হাত ছাড়িয়া সেখানে দেখিতে ছুটিয়াছে, এখনো ফিরিয়া আসে নাই, হয়ত

---

* গত পৌষ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হুগলির ইমাম বাড়ীর প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদে, একটি বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। যাঁহার নাম মহম্মদ মসীন হওয়া উচিত—তাঁহার অন্য নাম হইয়া, আর এক জন উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাতে পাঠকদিগের নিকট সাতিশয় লজ্জিত ও অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি। এই ভুল শোধরাইবার জন্য ভারতীতে সেই দুইটি পরিচ্ছেদ পুনঃপ্রকাশ করা যাইতেছে।

এই সুযোগে একটি পরিচ্ছেদ নূতন বাড়াইয়া দিলাম।

ভিড়ে লুকাইয়া পড়িয়াছে। যুবক তাহাদের নিকটে আসিয়া খোঁড়াকে কাঁধ ধরিতে বলিলেন। খোঁড়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার স্কন্ধ ধরিল, তিনি এক পাশে বুড়িকে লইয়া আর এক হাতে অন্ধের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া পৌছিলেন। পৌছিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন, এক স্থির নিশ্চল, দেবোপম কান্তিসম্পন্ন পুরুষ রত্নকে গঙ্গার ঘাটে একটি গাছের তলায় পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। ইহাঁর বেশভূষা সাধারণ সন্ন্যাসীর মত নহে, এবং বেশ দেখিয়া হিন্দু কি মুসলমান তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যুবক তাহাকে স্বজাতি বলিয়াই স্থির করিলেন। সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় ইহাঁর দেহ অনাবরিত নহে, এক ঢিলা অঙ্গাবরণে গলদেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত ইহাঁর আচ্ছাদিত। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা কিম্বা স্ফটীক মালা কিছুই নাই, মুখমণ্ডল ভস্ম কিম্বা চন্দন চর্চ্চিত নহে, পৃষ্ঠ-লম্বিত কেশ জটা, ও আবক্ষ বিস্তৃত শ্মশ্রু রাশি মাত্র তাঁহার শুভ্রশ্বেত অসামান্য জ্যোতি সম্পন্ন প্রশান্ত-গম্ভীর সহাসমুখের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কত শত সহস্র অনাথা, দীন দুঃখী, রোগ শোক, পাপ তাপ, দুঃখ জ্বালা হইতে মুক্ত হইবার কামনায় তাঁহার চরণ তলে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাহাকেও ঔষধ দিতেছেন, কেহ বা তাঁহার পবিত্র হস্তস্পর্শে মাত্র শান্তিলাভ করিতেছে। যাহার রোগ শোক প্রতিকার করা তাঁহার সাধ্যাতীত তাহাকেও এমন স্নেহের বাক্যে ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখাইতেছেন যে সেও শান্তি সুখ অনুভব করিতেছে। এইরূপে কত নিরাশ হৃদয় আশা পূর্ণ হইতেছে—কত রোগী. পাপী, তাপী, দীন, দুঃখীর বিষন্নমুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। যুবক এমন দৃশ্য কখনও দেখেন নাই, শত শত লোকের সুখে তাহার হৃদয় পুরিয়া গেল, তিনি পূর্ণ হৃদয়ে অভিভূত চিত্তে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভক্তি উথলিত হৃদয়ে সন্ন্যাসীর শান্ত গম্ভীর দেবশ্রীপূর্ণ মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে বেলা অধিক হইল, দ্বিপ্রহরের বড় বিলম্ব নাই সন্ন্যাসীর ধ্যানের সময় আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি গৃহে গমন করিবেন। ভীড়ও কিছু কমিতে লাগিল, যাহারা অনেকক্ষণ আসিয়াছে তাহারা চলিয়া গেল, নবাগতেরা কেবল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব জ্যোতিশালী নয়নের দৃষ্টি তখন যুবকের উপর পতিত হইল—যুবক বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"বৎস আমার সঙ্গে আইস" সে স্বর যতদূর গেল যেন শান্তি ঢালিয়া দিল। সন্ন্যাসী অগ্রগামী হইলে যুবক তাহার অনুসরণ করিয়া দুই জনে গঙ্গা তীরে একটি ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যুবকের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, নীহারমণ্ডিত মহান পর্ব্বত শিখরে চন্দ্র কিরণের ন্যায়, ঈষৎ মৃদু হাস্যে আপনার বিমলপ্রশান্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "সেই বীর যে

দুর্ব্বলের রক্ষক, সেই পুরুষ, যে অসহায়ের সহায়, সেই মহাত্মা যে অত্যাচারের নিবারক, আইস আমরা আলিঙ্গন করি, আজ হইতে তুমি আমার শিষ্য হইলে।" সন্ন্যাসী যুবককে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করিলেন। সে স্পর্শ কি পবিত্র, কি সুখজনক, তাহাতে যেন যুবকের মোহ হঠাৎ দূরে গেল, দিব্যচক্ষু খুলিয়া দিল—কি এক দিব্য স্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল, যেন এই মহাপুরুষের পবিত্র মুর্ত্তি তিনি আজীবন দেখিয়া আসিতেছেন, কত নিস্তব্ধ গম্ভীর রজনীতে, দুঃখতাপে জরজর হইয়া যখন চারিদিক শূন্য দেখিয়াছেন, ঐ মহাপুরুষ অমৃতময় বাক্যে যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, কতবার যখন মোহের ছলনে অশান্তির তরঙ্গময় স্রোতে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যেন ঐ দিব্য মূর্ত্তি দেখা দিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়াছেন। জাগন্তে, স্বপ্নে, সুখে দুঃখে, ঐ এক মূর্ত্তি—ঐ এক দিব্য ছবি কতবার কতবার যেন—তাহার চোখের সমুখে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। যুবক পুলকে, বিস্ময়ে নিস্তব্ধে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সন্ন্যাসী তখন তাহাকে নিকটে বসিতে অনুমতি দিয়া আপনি একটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিলেন। যুবক উপবিষ্ট হইলে তেমনি সহাস আননে বলিলেন—"বৎস, আমরা আপনারা শিষ্য বাছিয়া লইয়া থাকি, উপযুক্ত হইলে গুরুর জন্য লালায়িত হইতে হয় না, শিষ্য গৃহীত হইলে গুরুর কার্য্য তাহাকে শিক্ষা দান করা, শিষ্যের কার্য্য শিক্ষার বিষয় মনোনীত করা। কোন শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিতে তোমার অভিলাষ. কোন বিদ্যায় পণ্ডিত হইতে তোমার আকাঙ্ক্ষা বৎস?

যুবক অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত বচনে বলিলেন—দেব, যখন অনুমতি পইয়াছি—তখন আমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিব—শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিতে আমি দারুণ পিপাসিত, কিন্তু আজ আপনার যে বিদ্যা দেখিয়াছি—তাহার নিকট শাস্ত্র জ্ঞান অতি তুচ্ছ, প্রভু সর্ব্ব প্রথমে তাহা শিক্ষা করাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন—"বৎস—ঠিক বলিয়াছ, শিক্ষা দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করায় তোমার আবশ্যক কি? সে জ্ঞান তোমাতে স্বতঃই বর্ত্তমান। যাহার হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, যাহার ধর্ম্মে বিধর্ম্মে দ্বেষ নাই, যাহার প্রাণ আত্মপর সমান করিতে চায়, সে, সকল শাস্ত্রের অতীত, বেদ কোরাণ আর তাহাকে কি শিক্ষা দিতে পারে? আর আমিই বা তবে তাহাকে কি শিখাইতে পারি। তুমি কি তবে জ্ঞান ছাড়িয়া সুখশান্তি লাভের বিদ্যা অধিকার করিতে চাও? সত্য বটে তাহা শাস্ত্রের অতীত, পণ্ডিত হইলেই সকলের সুখ শান্তি মিলে না, সুখ শান্তির অন্যরূপ সাধনা করাচাই।"

সন্ন্যাসীর প্রশংসায় যুবক ম্লান হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন এই পরীক্ষায় তাহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে,—সে কথায় কোন উল্লেখ না করিয়াধীরে ধীরে বলিলেন "না

প্রভু আমি নিজের সুখশান্তি লাভের বিদ্যা চাহিতেছি না, আর অধিক কি বলিব ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"ধর্ম্মই সকল সুখের মূল, পুণ্যই সকল শান্তির আধার, আর ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম্ম ও পুণ্যের উত্তেজক, তোমার এ সকলি আছে, এবিদ্যা তোমার আবশ্যকই বা কি ? তুমি কি তবে বৎস প্রকৃতিকে হস্তগত করিতে চাও ? প্রকৃতি বশে আনিয়া তুমি কি দেবতুল্য অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে চাও" ?

যুবক অধোবদনে বলিলেন, "না গুরু আপনি জানেন তাহা বলিতেছি না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমি জানি বটে সত্যই যাহার ব্রত, দীনেতে যাহার দয়া কাম ক্রোধ যাহার বশীভূত, তাহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে—তাহার পক্ষে প্রকৃতি জয় করা অতি সামান্য কথা। বল বৎস তবে তুমি কি শিখিতেচাও, আমি বুঝিতে পারিলাম না?" যুবক বুঝিলেন পরীক্ষা শেষ হইল, তিনি সাহসী-হৃদয়ে সবলকণ্ঠে বলিলেন—"যে বিদ্যার অদ্ভূত বলে আজ আপনি দীন দুঃখীর অশ্রুজল মুছাইয়া তিন লোক মুগ্ধ করিয়াছেন, পরকে সুখী করিবার সেই বিদ্যা আমাকে কৃপা করিয়া দান করুন। চিরদিন ধরিয়া এই এক ইচ্ছা, এই এক আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া আছে। অন্যের কষ্ট দেখিলে যখন আকুল হৃদয়ে তাহা উপশম করিতে ব্যগ্র হই কেন প্রভু তাহাতে সফল হইতে পারি না? আমি আর কিছু চাহি না, এই বিদ্যা আমাকে দান করুন" রোমাঞ্চিত শরীরে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রাণ ভরিয়া যুবাকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে যত দূর উচ্চ, ভাবিয়াছিলাম, তুমি তাহা হইতেও উচ্চ। এ পর্য্যন্ত এরূপ বিদ্যা আমার কাছে কেহ শিখিতে চাহে নাই। হউক, তাহাই হউক, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তোমার প্রেমের অনন্ত ধারে পাপী তাপী সুশীতল হইবে। কিন্তু একেবারেই কোন কর্ম্মে সুসিদ্ধ হওয়া যায় না। আত্ম পর না মানিয়া ভাল বাসিতে আরম্ভ কর, ক্রমেই এই ভালবাসার পরিমাণ বাড়াইতে থাক, ক্রমে যখন অভ্যাসে অভ্যাসে বিনা চেষ্টায় এই ভালবাসা অবারিত বেগে অহর্নিশি স্বতঃ উৎসারিত হইবে, যখন এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অনন্ত প্রেমকে ধরিতে পারিবে—যখন সেই ভালবাসায় স্বার্থের বিন্দুমাত্র থাকিবে না, তখনই সুসিদ্ধ হইবে এখন নহে। যাও বৎস গৃহে গিয়া ইহার সাধনা কর,"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে, যুবার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, তিনি এত আনন্দ বুঝি কখনও পূর্ব্বে অনুভব করেন নাই—যুবক কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "আবার কবে আসিব" সন্ন্যাসী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আর আসিতে হইবে না,যদি প্রয়োজন হয় আমাকে দেখিতে পাইবে"—বলিয়া অতি স্নিগ্ধ স্থির কটাক্ষে যুবকের প্রতি চাহিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, যুবার দেহ সবল হইল, প্রাণ তেজস্বী হইল, হৃদয় জুড়াইয়া গেল, ভক্তিভরে অভিবাদন পূর্ব্বক সেখান হইতে যুবা চলিয়া গেলেন।

পরদিন আর সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিতে পাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছবি।

যেদিনের কথা হইতেছে, সেই দিন দ্বিপ্রহরের পর নৌকা হইতে হুগলি সহরের দিকে চাহিয়া দেখ—সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে। এখন শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর ন্যায় শ্বেত প্রাসাদগুলি, একটির পর একটি সারি বাঁধিয়া গঙ্গা উপকূলে শোভা পাইতেছেনা, প্রাসাদের আশে পাশে, ছোট বড় গাছ গুলি, যেখানে যেটি শোভা পায় সেখানে সেটি সাজান নাই। কোথায় বা খানিকটা জায়গা জুড়িয়া বড় ছোট গাছের রাশি জঙ্গল বাঁধিয়াছে, গায়ে গায়ে ঘেসাঘেসি করিয়া আপনাদের গাঢ় আলিঙ্গনে অবনত হইয়া লতায় জটাজুট লইয়া নদীতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই জঙ্গলের পরেই হয়ত খানিক দূর লইয়া একটি আর গাছ দেখা যায় না, সেখানে সারি সারি, চক্রের মত, আঁকা বাঁকা, নানা গড়নে সাজিয়া ছোট ছোট পাতার কুটির গুলি উইঢিবির মত প্রকাশ পাইতেছে। কোথায় বা এক একটি বড় বড় বট অশ্বত্থের রাশি রাশি পাতারফাঁক দিয়া এক একটি পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী অতি দীন হীন ভাবে উঁকি মারিতেছে, আবার কোথায় বা উপকূল যোড়া এক বিচিত্র উদ্যান যুক্ত বিচিত্র বৃহৎ অট্টালিকা, চারিদিকের ছোট কুটীরদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, আশে পাশের বড় বড় গাছ গুলির প্রতি উপেক্ষা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। আর-এইরূপ একটি প্রাসাদের বাতায়নে একটি ছোট সুন্দর মুখ ফুটিয়া তাহার মধুররূপে উপকূলের কবিতাময় ভাবটি আরো ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যুবতী বাতায়নে বসিয়া কি সুঁচের কাজ করিতেছিলেন, কাজ করিতে করিতে কচি কচি আঙ্গুলগুলি বুঝি ক্লান্ত হইল, আনত মৃণাল কণ্ঠ, বুঝি ব্যথিত হইল, একবার কাজ ছাড়িয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশে মেঘের স্তরের উপর স্তর, পাছে একটি হইতে একটি সরিয়া পড়ে, একটি হইতে একটির বিচ্ছেদ হয়—তাহারা কত না ভয়ে ভয়ে কতনা প্রাণপণে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আলিঙ্গন করিয়া আছে—কিন্তু হায় দেখিতে দেখিতে তবু ঐ স্তরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, একটি হইতে একটি সরিয়া পড়িতেছে,—ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে। যুবতীর হৃদয়েও সহস্র চিন্তা আসিয়া সেই মেঘ পুঞ্জের মত স্তূপ বাঁধিতে লাগিল। এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার চোক টিপিয়া ধরিল। মুন্না চমকিয়া উঠিল, একবার সহসা কি যেন কি আশায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মূহূর্ত্তের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া যুবতী হাসিয়া বলিল, 'বুঝিয়াছি মসীন, চোখ ছাড়" মসীনও হাসিয়া চোখ চাড়িয়া মুন্নার চোখের উপরে একখানি

ছবি ধরিয়া বলিলেন, "কেমন বল দেখি' এইখানে ছবির কথা একটু বলিয়া লই। মহম্মদ মসীন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসেন, পথে একজন ছবি-বিক্রিওয়ালা তাঁহাকে মহা ধরিয়া পড়িল, তাঁহার ছবি কিনিবার কোনই ইচ্ছা কিম্বা আবশ্যক ছিল না, কিন্তু যখন ছবিবিক্রি-ওয়ালা একখানি ছবির দুই টাকা দাম চাহিয়া, শুষ্ক মুখে মিনতি করিয়া বলিল "মহাশয় গো সমস্ত বেলার আজ একখানা ছবি বিক্রি করতে পারিনি, এখন যদি কিছু পাই তবেই ছেলে গুলো খেতে পাবে" তখন মসীম আর একটি কথা না কহিয়া দুই টাকার স্থলে দশটি টাকা দিয়া ছবিখানি তুলিয়া লইলেন। ছবিওয়ালা অবাক হইয়া রহিল।

ভ্রাতার হাত হইতে ছবিটি স্বহস্তে লইয়া মুন্না তাঁহার দিকে ফিরিয়া বসিল। নামেতেই সকলে বুঝিয়াছেন ইহারা হিন্দু নহেন। মহম্মদ মসীন ও মুন্না দুজনে ভ্রাতা ভগিনী। তবে ঠিক আপনার ভাই বোন নহেন। মুন্নার মাতার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহের সন্তান মসীন। তাহার পর তিনি বিধবা হইয়া ঐ-সন্তানটিকে লইয়া আবার বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয় বিবাহে মুন্নার জন্ম। মসীন ও মুন্না বরাবর এক বাড়ীতেই থাকিতেন, উহাঁরা দুইজনে প্রায় সমবয়স্ক বলিলেই হয়, দু-এক বছরের মাত্র ছোট বড়, সেই জন্য উহাঁদের মধ্যে মান্যের ব্যবধান নাই, সমকক্ষ ভাবেই উহাঁরা পরস্পরকে ভাল বাসেন। মসীন দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক, উন্নত ললাট পূর্ণায়তন নয়ন উদার ভাবজ্যোতি পূর্ণ; নবীন শ্মশ্রু-শোভিত গৌর বর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী, অথচ সে তেজ, অনুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত, প্রশস্ত বক্ষ শালী সুগঠন বলিষ্ঠ দেহ, যেন শত শত দুর্ব্বলের আশ্রয় নিকেতন। তাঁহার সেই স্নেহানুরাগের সবল আশ্রয়ের ছায়ায় দুর্ব্বল মুন্নাকে তিনি যেন অতি যত্নে রক্ষা করিতে চান।

মুন্না ছবিখানি দেখা হইলে একটুখানি হাসিয়া অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে বলিল "এমন ভাল ছবি কোথায় পেলে? কে দিলে?" মসীন বলিলেন, "কেন দেবে আবার কে? অমনি কি কিছু পাওয়া-যায় না?"

মুন্না। "এমন ভাল জিনিস অমনি পাওয়া যায় তাত জানতুম না।"

মসীন। "কেন ভাল জিনিষের কি আর দর আছে? এ পর্য্যন্ত তাতো দেখলুম না।"

মুন্না। "তবে বুঝি এখনো জহরী কেউ জন্মায়নি, তাই জহরের এত অনাদর।"

মসীন। "তুই ভাই আদরটা একবার দেখিয়ে দে, আমি বেচতে এসেছি, একটা মোটা দর বল,"

মুন্না হাসিয়া বলিল, "তোমার বেলায় ভাল জিনিষের দর নেই, তুমি পাও কুড়িয়ে, আর অন্যের বেলা মোটা দর চাও, বেশত মজা।

মসীন। "বুঝিলি নে, এই হচ্ছে সেয়ানা লোকের কাজ," মুন্না ছোট মাথাটি নাড়িয়া, অলক গুচ্ছগুলি দুলাইয়া একটু মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল—"তুমিই এক সেয়ানা আর জগৎ শুদ্ধ নির্ব্বোধ বুঝি,"

মসীন। "নিদেন জগতের অর্দ্ধেক লোক য়ে জাত। তাইত তোর কাছে আগে বি-ক্রির জন্য এসেছি। কত দিবি বল।" বলিতে লিতে মসীন একটু হাসিলেন, সে হাসিতে াহার শুভ্র ললাটে ঈষৎ সরস বিদ্রূপময় ভাবের যেন রেখা পড়িল, মুন্না বলিল, "মরে যাই আর কি, উনি যা পেলেন কুড়িয়ে, তাই আমি পয়সা দিয়া কিনিব। এক কানা-কড়িও না।" মসীন ঘাড়নাড়িয়া বলিলেন—তুমি কানাকড়িও দিলে না, কিন্তু এর মধ্যে এর যে হাজার টাকা দাম উঠিয়াছে।" মুন্না হাসিয়া বলিল, "এমন নির্ব্বোধ কেসে?"

মসীম। "সে নির্ব্বোধ আর কেউ না, আমার সুযোগ্য ভগিনীপতি সালা উদ্দীন।"

স্বামীর নাম শুনিয়া মুন্নার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, হাসির রেখাটি অধর হইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল। এ কথা শুনিলেই মুন্নার কষ্ট হইবে, তাহা মসিন জানিতেন, সেই সম্ভাবিত কষ্টটা উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়েই প্রথম হইতে ওরূপ তামাসার ভাবে তিনি কথা পাড়িয়াছিলেন। মুন্নাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মসীন তামাসা রাগিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমি ঠাট্টা করিতেছি না, সত্যই হাজার টাকার বিনিময়ে সালাউদ্দীন এইরূপ একখানিছবি পাইয়াছেন, এরূপ করিয়া আর কদিন চলিবে, এমন অতুল ঐশ্বর্য্য সবত যায় যায়, তুমি কি একটি কথা কহিবে না।"

চোখের জল চোখে রুদ্ধ করিয়া মুন্না বলিলেন, "ভাই যাহার ধন তিনি এরূপ করিলে আমার কি হাত? আমি কে"। সে কথায় সে স্বরে মসীনের সুন্দর মুখ কাল হইয়া পড়িল, ভাসন্ত চোখে যাতনা ফুটিয়া বাহির হইল—একটু পরে একটুখানি কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া মসীন বলিলেন "ধন কার? তোমারি কি সব ধন নহে? তোমার মুখে ঐ কথা শুনিলে একজন বালকেও হাসিবে। সকল স্ত্রীলোকে যদি তোমার মত হইত তবেত দেখিতেছি জগতের ধারা উলটাইয়া যাইত'।

মুন্নার পিতার ঐশ্বর্য্যেই মুন্নার স্বামী ধনী সত্য, কিন্তু মুন্না কখনো ও ভাবে তাহা দেখে নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে হইত না, যে উহা তাহার স্বামীর নহে মুন্নার নিজের ধন। ভ্রাতার কথায় মুন্না আ-শ্চর্য্য হইল, মুন্না ক্রুদ্ধ হইল, মুন্না বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। মসীন তাহা বুঝিতে পারিলেন—কথাটা শামলাইয়া লইবার ইচ্ছায় বলিলেন "কিন্তু যারধন সে যদি পাগল হইয়া যাহা ইচ্ছা করে, তবে সে পাগলকে কি কেহ নিরস্ত করিবে না"—

তাত সত্য, কিন্তু মুন্না কেমন করিয়া স্বামীকে বলিবে? মুন্না যে তাঁহাকে কতবার কাঁদিয়া, কত মিনতি করিয়া, কত করিয়া বলিয়াছে, তাহাতে কি কোন ফল হইয়াছে? তিনি কি তাহাতে একবার ভ্রুক্ষেপ করিয়াছেন? তবে আবার মুন্না কি করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে যাইবে? অভিমান করিয়া যে মুন্না নীরব থাকিতে চাহে তাহা নহে, মুন্নার অভিমান নাই। যে হৃদয় একবার প্রেম প্রতিদান পাইবার পর সে প্রেমে সন্দেহ করিয়াছে, যে সন্দেহে,

যে অবিশ্বাসে বিশ্বাস লুকাইয়া রহিয়াছে, যে নিরাশায় এখনো আশা, ভরসা দিতেছে, যে হৃদয়ে অভিমান আছে।—কিন্তু মুন্না অভিমান করিবে কেন? মুন্নার মনে স্বামীর ভালবাসার আশা বিন্দু মাত্র নাই, সে সন্দেহে বিশ্বাসের রেখা মাত্র নাই, স্থির-নিরাশায় মুন্নার হৃদয় গঠিত, মুন্না অভিমান করিবে কি? মুন্না যে স্বামীকে কিছু বলিতে চাহে না—সে তাহা হইতেও অধিক দুঃখে, অধিক কষ্টে। মুন্না তাহার সমুখে যাতনার অশ্রু নদী বহাইয়াছে, তিনি একবার ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, প্রাণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস টুটিয়া যদি আপনা হইতে কোন কথা বাহির হইয়াছে তিনি না শুনিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যদি কখনো আত্মাহারা হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির আশার ন্যায় স্বামীর চরণ ধরিয়াছে তিনি সেই নির্ভরকারী লতাকে নির্দয়ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্নেহের চক্ষে অনুগ্রহ চক্ষে একবার চাহিয়া দেখেন নাই। সেই অবধি যাতনার তীব্র অনলে হৃদয় ভস্মীভূত করিলে, হৃদয়ের অগ্নি নিশ্বাস গভীর নিশীথের বায়ু-তরঙ্গে মুন্না মিশাইতে থাকে, উন্মত্ত দুঃখের অশ্রু লহরী বরফের মত হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়া শুকাইয়া ফেলে, তবু কখনো স্বামীর কাছে তাহা প্রকাশ করে না।

কিন্তু আজ মুন্নার প্রাণের ভিতর স্বামীকে যে কথা কহিবার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে সে মুন্নার নিজের কোন কথা নহে, তবে ইহাতে সঙ্কোচ কিসের? মুন্না ভীরু নিস্তেজ হৃদয় পাষাণ বলে বাঁধিয়া স্বামীকে একবার এ কথা বলিয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিল। নিজের জন্য হইলে সহস্র কষ্টেও মুন্না বলিত না—কিন্তু স্বামী আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিতে বসিয়াছেন, মুন্না একবার সাবধান করিবে না? স্বামী তাহার কথা শুনিবেন না সে তাহা জানে—তবু সে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া একবার তাহাকে বুঝাইবার সঙ্কল্প করিল, তার পর আস্তে আস্তে মসীনকে বলিল "তিনি কি আমার কথা শুনিবেন? আচ্ছা আমি একবার বলিয়া দেখিব"—

—॰—

রামমোহন রায়।

—॰—

সাধারণতঃ আমরা প্রতিদিন গুটিক তক ছোট ছোট কাজ লইয়াই থাকি, মাকড়সার মত নিজের ভিতর হইতে টানিয়া টানিয়া আমাদের চারিদিকে স্বার্থের জাল নির্ম্মাণ করি ও স্ফীত হইয়া তাহারই মাঝখানটিতে ঝুলিতে থাকি, সমস্ত জীবন দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যে সমাহিত হইয়া অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণতার গর্ভে স্বচ্ছন্দসুখ অনুভব করি। আমাদের প্রতিদিন পূর্ব্বদিনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন একটি ধারাবাহী উন্নতির কাহিনী নহে। সেই প্রতি দিবসের উদরপূর্ত্তি প্রতিরাত্রের নিদ্রা—বৎসরের মধ্যে এই ঘটনা ও ইহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিরই তিন শ পঁয়ষট্টিবার করিয়া পুনরাবর্ত্তন এই ত আমাদের জীবন—ইহাতে আমাদের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হয় না; অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের অভাব নাই বটে কিন্তু আপনাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নাই। একপ্রকার নিকৃষ্টজাতীয় জীবাণু আছে সে কেবল গতিবিশেষ অবলম্বন করিয়া ঘুরিতেই জানে, সে সমস্ত জীবন একই ঘুরন ঘুরিতেছে, তাহার সহিত আমাদের বেশী প্রভেদ দেখিতে পাই না। আমাদের আহ্নিক-গতি আছে বার্ষিক গতি নাই—আমরা নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছি নিজের নাভিকুণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছি কিন্তু অনন্ত জীবনের কক্ষপথে এক পা অগ্রসর হইতেছি না। এই পরম কৌতুকাবহ আত্ম-প্রদক্ষিণ-দৃশ্য চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে—সকলে মাটির উপরে বিন্দুমাত্র চিহ্ন রচনা করিয়া লাটিমের ন্যায় সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমির মধ্যেই জীবনের দীর্ঘ ভ্রমণ নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। প্রতিদিন চারিদিকে ইহাই দেখিয়া মনুষ্যত্বের উপরে আমাদের বিশ্বাস হ্রাস হইয়া আসে—সুতরাং মনুষ্যত্বের গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিবার বল চলিয়া যায়। এই জন্য মহাত্মাদের প্রতি মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। মহাত্মাদের জীবন আলোচনা করিলে মনুষ্যত্ব যে কি তাহা বুঝিতে পারি, "আমরা মানুষ" বলিলে যে কতখানি বলা হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারি, জানিতে পারি যে আমরা কেবল অস্থিচর্ম্মনির্ম্মিত একটা আহার করিবার যন্ত্র মাত্র নই, আমাদের সুমহৎ কুল-মর্য্যাদার খবর পাইয়া থাকি। আমরা যে আমাদের চেয়ে ঢের বড়, অর্থাৎ মনুষ্য, সাধারণ-মানুষদের চেয়ে যে অনেক পরিমানে শ্রেষ্ঠ ইহাই মনের মধ্যে অনুভব করিলে তবে আমাদের মাথা তুলিতে ইচ্ছা করে মৃত্তিকার আকর্ষণ হ্রাস হইয়া যায়।

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহঙ্কারের স্থল বুঝায় তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য্য সকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না—তাঁহাদের যতই "আমার" মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয় ততই তাঁহাদের কথা তাঁহাদের কার্য্য তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদের লইয়া আমরা গৌরব করি তাঁহাদের শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি তাহা নহে, তাঁহাদের "আমার" বলিয়া মনে করি। এই জন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন

সহস্র বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্ পৃথিবীর আর সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতর স্বরে মিল্টনকেই ডাকিলেন, কহিলেন "মিল্টন, আহা তুমি যদি আজি বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে ইংলণ্ডের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।" যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই, সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে, তাহার কি দুর্দ্দশা! কিন্তু যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তথাপিও যে জাতি কল্পনার জড়তা হৃদয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ তাহার মহত্ব কোনমতে অনুভব করিতে পারে না তাহার কি দুর্ভাগ্য!

আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা প্রত্যেকেই নিজে নিজেকে মস্তলোক মনে করিয়া নিজের পায়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেছি, বাষ্পের প্রভাবে স্ফীত হইয়া লঘু হৃদয়কে লঘুতর করিয়া তুলিতেছি। প্রতিদিনকার ছোট-ছোট মস্তলোকদিগকে, বঙ্গসমাজের বড় বড় যশ-বুদ্বুদদিগকে বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মত পুষ্পচন্দন দিয়া মহত্ব পূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ব-পূজার একটা ভান ও আড়ম্বর করিতেছি! এজ্‌লাষ হইতে জোন্স্ সাহেব চলিয়া গেলে হাটে তাহার ছবি টাঙ্গাইয়া রাখি, জেম্‌স্ সাহেব আসিলে তাহার পায়ে পুষ্পমালা দিই। অর্থের বিনয়ের উদারতার অভাব দেখিতে পাই না; কেবল আমাদের যথার্থ স্বদেশীয় মহাপুরুষকেই হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া, তাঁহাকে সম্মান করিবার ভার বিদেশীদের উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বসিয়া রহিয়াছি ও প্রতিদিন তিন-বেলা তিনটে করিয়া নূতন নূতন মৃৎপ্রতিমা নির্ম্মাণে নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া আছি।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহনরায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার নির্ম্মিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য যে কত করিয়াছেন কত করিতে পারিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে। আমাদিগকে যদি কেহ বাঙ্গালী বলিয়া অবহেলা করে আমরা বলিব রামমোহন রায় বাঙ্গালী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার আর একটি গুরুতর আবশ্যক আছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মত আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি "রামমোহন রায়, আহা তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বড়

দেশের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে! আমরা বাক্‌পটু লোক—আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও! আমরা আত্মম্ভরী—আমাদিগকে আত্ম বিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি—বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও!"

রামমোহনরায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্‌ভা রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আরেকটা কথা দেখিতে হইবে। একেকটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায় কাজের হাট বসিয়া যায়, অনেকে মিলিয়া হোহা করিয়া একটা কাজের কারখানা বসাইয়া দেন, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভান করিতে একটা আমোদ আছে। তখন সেই কার্য্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষতঃ একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজেতে মত্ততাসুখ ছিল না, অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইবার হাঁসফাঁস করিবার আনন্দ ছিল না, একাকী অপ্রমত্ত থাকিয়া ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গীহীন সুগভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়া উঠে, তাঁহার সঙ্কল্প তেমনি অবিশ্রাম নীরবে সুধীরে তাঁহার গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য্য আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। ব্যস্তসমস্ত চটুল স্রোতস্বনাতে যেমন দেখিতে দেখিতে আজ চড়া পড়ে কাল ভাঙ্গিয়া যায়, —সেরূপ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া কাজ যত না হউক খেলা অতি চমৎকার হয়,—তাঁহাদের সে কালে সেরূপ ছিল না। মহত্বের প্রভাবে হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে কাজ করিবার আর কোন প্রবর্ত্তনাই তখন বর্ত্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। রামমোহনরায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন কোন কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্বে তাঁহার কি অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কি স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল! তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই; তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্ম্ম-স্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদে-

শীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল,' বঙ্গভাষা বল' বঙ্গসাহিত্য বল,' সমাজ বল,' ধর্ম্ম বল' কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? কোন্ কাজটাই বা তিনি ফাঁকি দিয়াছিলেন? বঙ্গসমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখা-প্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না?

তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিজের অথবা আর কাহারও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন চেষ্টা করিলে একাদশ অবতারের পদ সহজে অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম বানাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া তিনি প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখনত দেখা যায় না। বড় বড় সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামসুধা পান করতঃ এক প্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়,—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি তাহাও বিদেশী আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষক পণ্য দ্রব্য হইয়া উঠে, ও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুচ্ছ নামটা বিলাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করিবার সরঞ্জম করি। স্তুতি কোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম একমন্ত্রোচ্চারণ শব্দে বিব্রত থাকিয়া স্থিরভাবে কোন বিষয়ের যথার্থ ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্ত্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি বিদ্যুৎবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারিনা তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্য মাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্ব্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্ব্বদা ভাবিতে হয় আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারী রকমের বড় লোক, তাঁহারা নিজের শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড় বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সঙ্কল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে, তখন সঙ্কল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সঙ্কল্প অনেক সময়ে হীনবল লক্ষাভ্রষ্ট হয়। সে ইতস্ততঃ করিতে থাকে। কথায় কথায় তাহার পরিবর্ত্তন হয়। কিছু কিছু ভাল কাজ সে করিতে পারে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য্য স্থাপন করে সে স্থায়ীভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গল সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করে সেও যখন চলিয়া যায় তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্যও তার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়, যদি বা বিশৃঙ্খল ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা জীবন্ত ভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমাজের চারিদিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়-পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লঘু আত্মাই প্রবাহে ভাসিয়া উঠে ভাসিয়া যায়। যাঁহার আত্মার গৌরব আছে তিনিই প্রবাহে আত্মসম্বরণ করিতে পারেন। রামমোহন রায়ের এই আত্ম-ধারণাশক্তি কি রূপ অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে বাহিরে কি সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহা নিশীথিনীকে মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকার অঙ্গারের খনিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে তবে সে কি কাণ্ডই উপস্থিত হয়. ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহসা জ্ঞানের নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন ব্যক্তি সহজে ধারণ করিতে পারে? কোন বালক ত পারেই না। কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত

মহৎ ছিলেন এই জন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল, এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্য্য রক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরাত ধৈর্য্য কাহাকে বলে জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কি অসামান্য ধৈর্য্যই ছিল। তিনি আর সমস্ত ফেলিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি, ফুঁ দিয়া দিয়া তাহাকেই প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাই কাঠি জ্বালাইয়া যাদুগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে সে আর নিভিবে না। এত বল এত ধৈর্য্য নহিলে তিনি রাজা কিসের? দিল্লির সম্রাট তাঁহাকে রাজোপাধি দিয়াছেন কিন্তু দিল্লির সম্রাটের সম্রাট তাঁহাকে রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষে বঙ্গসমাজের মধ্যে তিনি তাঁহার রাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে আমরা কি তাঁহাকে সম্মান করিব না?

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দ্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই. কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও এক-প্রকার অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাহাদের বল। অতিবড় ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুষ্ক পত্রের শব্দ একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দ্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায় যেমন অসহায় এমন আর কোথায়! রামমোহনরায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল তাহার জীবন নাই অস্তিত্ব নাই কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে মাভৈঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়ত ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্প বধ করিতে অগ্রসর হয় তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তসর্প মারিতে যায় তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলের

আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে। তেমনি রামমোহনরায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধ্যমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহনরায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল. এই জন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্ত্তনাদ করিয়া রামমোহনরায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেই সকল মৃতসর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্ব্বিষ ঢোঁড়া সাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবলপ্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙ্গচুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেষা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে প্রলয়ের তেমনি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণ বাবুর "একাল ও সেকাল" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রেরা যখন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশান দৃশ্য তাঁহারা আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভাল কিছুই পবিত্র ছিল না। হিন্দুসমাজের যে সকল কঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ভালরূপ সৎকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণ মনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙ্গিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস সর্ব্ব প্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন—সেই রামমোহনরায়—তাঁহারত এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি ত স্থিরচিত্তে ভালমন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি তখনকার অন্ধকার হিন্দুসমাজে আলোক জ্বালাইয়া দিলেন কিন্তু চিতালোক ত জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহনরায়ের প্রধান মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে

জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড়পাষাণ স্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভার সেই জড়স্তূপে রামমোহনরায় প্রচণ্ডবলে আঘাত করিলেন, তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্ম্মের বিপুলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্ম্মের দেব-প্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠলোষ্ট্র ধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোটবড় নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহা নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্ততঃ প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গুল্ম সকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে ছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্ব্বত প্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্ন মন্দির ভাঙ্গিলেন সকলে বলিল তিনি হিন্দুধর্ম্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্ম্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এই জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কি সঙ্কটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতাসাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিল; রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্বে মাঝ খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন খ্রীষ্টিয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎলোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয়ত দুয়েকটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি এত ভাষা জানিতেন, এত ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সকল ধর্ম্মের সত্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল—তিনি ত বিদেশ হইতে অনায়াসে ধর্ম্মাগ্নি আহরণ করিতে পারিতেন; তবে কেন তিনি সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন করিয়া অন্য সকল ধর্ম্ম ফেলিয়া ভারতবর্ষেরই ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞান দর্শনের ন্যায় ধর্ম্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার লাভ করিবার সঞ্চয় করিবার বিষয় না হইত, ধর্ম্ম যদি গৃহের অলঙ্কারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে ঝুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্রকাজের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক না হইত তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত। তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলঙ্কারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু ধর্ম্ম না কি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এই জন্যই স্বদেশের ধর্ম্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোন দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ ভাবে বুঝি, ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনই তাঁহাকে ঠিক সেরূপ ভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে, যে ইচ্ছা পাইতে পারে না যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন, সমস্ত সংসার বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর কোন জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এই জন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে

সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব? এই জন্যই বলি, ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারিও না চাহিও না কিন্তু অবস্থা ও সাধনা বিশেষের গুণে ইহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষেরই নিকটে ঋণী। আমি যদি উদারতাপূর্ব্বক বলি, খৃষ্টধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, মুসলমান ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, তবে উদারতা নামক পরম শ্রুতিমধুর শব্দটার গুণে তাহা কানে খুব ভাল শুনাইতে পারে কিন্তু কথাটা মিথ্যা কথা হয়। সুতরাং সত্যের অনুরোধে মিথ্যা উদারতাকে ত্যাগ করিতে হয়। এই জন্য রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম ঋষিদেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম, সমস্ত জগতে ইহাকে প্রচার করিতে হইবে এই জন্য সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে ইহাকে বিশেষরূপে রোপন করিতে হইবে। ভারতবর্ষেরত দারিদ্র্যের অভাব নাই, জীবন্ত ঈশ্বরকে হারাইয়া ভারতবর্ষ ক্রমাগত হীনতার অন্ধকূপে নিমগ্ন হইতেছে, আমাদের পৈতৃক সম্পদ যে ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্ন আছে রামমোহন রায় সেই ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, আমরা কি গৌরবের সহিত মনের সাধে আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে পারিব! আমাদের দীনহীন জাতিকে এই একমাত্র গৌরব হইতে কোন্ নিষ্ঠুর বঞ্চিত করিতে চাহে? আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মকে পাইয়া কি আমাদের হৃদয়ের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না?

আমাদের ব্রহ্ম কি কেবলমাত্র নীরস দর্শন-শাস্ত্রের ব্রহ্ম? তাহা যদি হইত তবে কি ঋষিরা তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই ব্রহ্মেতে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ এই ব্রহ্মে গিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইত? প্রেমের ঈশ্বর কি বিদেশী ধর্ম্মে আছে, আমাদের ধর্ম্মে নাই? না, তাহা নয়। আমাদের ব্রহ্ম—রসোবৈ সঃ। তিনি রস স্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দ-য়াতি। এই আনন্দ সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের বাঁচিয়া আনন্দ। এই জন্য পুষ্পে আনন্দ সমীরণে আনন্দ। এই জন্য পুত্রের মুখ দেখিয়া আনন্দ, বন্ধুর মিলনে আনন্দ, নরনারীর প্রেমে আনন্দ এই জন্যই আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—এই আনন্দকে পাইলে ভয় থাকে না, আনন্দের অবসান থাকে না। এত পাই-য়াও কি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকে? এমন অসীম আনন্দের আকর ঋষিরা আবিষ্কার করিয়াছেন ও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তবে কিসের জন্য অন্যত্র যাইব? ঋষিদের উপার্জ্জিত, ভারত-বর্ষীয়দের উপার্জ্জিত আমাদের উপার্জ্জিত এই আনন্দ আমরা পৃথিবীময় বিতরণ করিব। এই জন্য রামমোহন রায় আমা-দিগকে আমাদেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট হইতে নিকটতর আত্মা হইতেও আত্মীয়তর এমন আর কোন দেশের ঈশ্বর নহেন, রামমোহন রায় ঋষি-প্রদর্শিত পথে সেই আমাদের পরমাত্মীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি স্পর্দ্ধিত হইয়া নূতন পথ অবলম্বন করিতেন তবে আমাদিগকে কতদূরেই ভ্রমণ করিতে হইত—তবে আমাদের হৃদয়ের এমন অসীম পরি-তৃপ্তি হইত না, তবে সমস্ত ভারতবাসী বি-শ্বাস করিয়া তাঁহার সেই নূতন পথের দিকে চাহিয়াও দেখিত না। তিনি যে ক্ষুদ্র অভিমানে অথবা উদারতা প্রভৃতি দুই একটা কথার প্রলোভনে পুরাতনকে পরি-ত্যাগ করেন নাই, এই তাঁহার প্রধান মহত্ব।

বাস্তবিক, একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় জ্ঞানের কথায় আর ভাবের কথায় একই নিয়ম খাটে না। জ্ঞানের কথাকে ভাষান্তরিত করিলে তাহার তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ভাবের কথাকে ভাষা-বিশেষ হ-ইতে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে ভাষান্তরে রোপন করিলে, তাহার স্ফূর্ত্তি থাকে না, তাহার ফুল হয় না ফল হয় না, সে ক্রমে মরিয়া যায়। আমি ভারতবাসী যখন ঈশ্ব-রকে দয়াময় বলিয়া ডাকি তখন সেই দয়া-ময় শব্দ সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান ভারত-বাসীর বি াট হৃদয় হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত ভা রবের আকাঙ্ক্ষা কুড়াইয়া লইয়া কি সুগম্ভীর ধ্বনিতে ঈশ্বরের নিকটে গিয়া উত্থিত হয়। আর অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে যদি Merciful বলিয়া ডাকি তবে Webs-ter's Dictionary-র গোটাকতক শুষ্কপত্রের মধ্যে সে শব্দ মর্ম্মর করিয়া উঠে মাত্র। অতএব ভাবের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদারতা

খাটে না। আজকালকার অনেক ধর্ম্ম প্র-বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে ইংরাজি "Faith" শব্দকে অনুবাদ করিয়া "বিশ্বাস" নামক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় যে হৃদয়ের অভাব-বশতঃ স্বদেশীয় ভাষার অমূল্য ভাবের ভাণ্ডার তাঁহাদের নিকটে রুদ্ধ রহিয়াছে। বিশ্বাস শব্দের বিশেষ স্থলে বিশেষ প্র-য়োগ আছে, কিন্তু ভক্তি শব্দের স্থলে বি-শ্বাস শব্দের প্রয়োগ অসহ্য। অলীক উদা-রতার প্রভাবে স্বদেশীয় ভাবের প্রতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি জন্মিলে এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে যদি সস্তা কাপড় সহজে কিনিতে পাওয়া যায় তবে তাহার উপরে মাসুল বসাইয়া সেই জিনিষটাই আর এক আকারে বিলাত হইতে আম-দানি করাইলে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করা হয়! সর্ব্ব সাধারণে কি সে কাপড় সহজে পরিতে পায়? এক হিসাবে বিলাতের পক্ষে উদারতা করা হয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাকে প্রকৃত উদারতা বলে না! আমি নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি বলিয়া কি সকলে বলিবে আমি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ পরের সহিত স্বতন্ত্র হইতেছি? স্বগৃহ না থাকিলে আমি পরকে আশ্রয় দিব কি করিয়া? রামমোহন রায় সেই স্বগৃহ দৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। অথচ স্পষ্ট দেখা গিয়াছে পরের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহাকে অনুদার বলিতে চাওত বল! উদ্ভিজ্জ ও পশু মাংসের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি তাহার কারণ আমা-দের নিজের জীবন আছে বলিয়া। আমা-দের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জ্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমা-দিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিঁকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন আমাদের জীবন নাই তবে পারসীক মৃত দেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃত ভবনে ফে-লিয়া রাখিতে দিতেন খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি অ-ন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দি-তেন। কিন্তু, তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখি-লেন জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেষ্টা হউক্ আমা-দের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপ-নার করিতে পারিব। তাও যে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সম্পূর্ণ করিতে পারিব এমন ভরসা নাই। আমাদের জঠরানলেরও যেমন এমন সার্ব্বভৌমিক উদারতা নাই যে সমস্ত খাদ্যকে সমান পরিপাক করিতে পারে আমাদের হৃদয়েরও সেই দশা, কি করা যায় উপায় নাই। এই জন্যই বলি প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আগে আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই তাহার পরে

সার্ব্বভৌমিকতার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্ম ভারতবর্ষের গৃহদেবতা তিনি ভারতবর্ষের পিতা। তিনি ভারতের হৃদয়ের যত নিকটবর্ত্তী তিনি ভারতের অভাব যত বুঝিবেন এমন আর কেহ নহে। ব্রহ্মই ভারতবর্ষের জাগ্রত দেবতা, জিহোবা গড অথবা আল্লা আমাদের ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতাবশতঃ ইহা বুঝিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হইলে ভারতের এ মর্ম্মান্তিক অভাব হয় ত তাঁহার চক্ষে পড়িত না। পিতামহ ঋষিরা যে ব্রহ্মকে বহু সাধনা দ্বারা আবাহন করিয়া আমাদের ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমাদের হীনতা অন্ধকারে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তি এতদিন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্মকে আমাদের হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমরা যদি তাঁহার সেই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করি, তবেই তাঁহার চিরস্থায়ী স্মরণ স্তম্ভ পৃথিবীতে স্থাপন করিতে পারিব। আমরা অগ্রে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব, অবশেষে এমন হইবে যে পৃথিবীর চারিদিক হইতে ধর্ম্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে ব্রহ্ম দর্শন লালসায় দলে দলে আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজা রামমোহন রায়ের জয়। তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া ভারত ভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন সেই রামমোহন রায়ের জয়ে ঋষিদের জয়ে সত্যের জয়ে ব্রহ্মের জয়ে আমাদের ভারতবর্ষেরই জয়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্রাবলী।

"A thing of beauty is a joy for ever" Keats.

১

কদম কাননে কে মরি! সজনি,
বাঁশরী বাজায় রাতে।
সুরেতে সুরেতে ছবি এক খানি
এঁকে দেয় হৃদি-পাতে!
বাশরী বাজায়ে রাতে।

২

কি সুরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে
চঞ্চল যমুনা-জল!
ঢেউয়েতে ঢেউয়েতে ভাঙা ভাঙা চাঁদ,
মুখে আধ' কল কল!
কুলে কুলে ঢল ঢল!

৩

কুলেতে দাঁড়ায়ে কদম তরুটি,
একটু প'ড়েছে হেলে,
ছায়াটি, জলেতে ধরিতে চাঁদেরে,
আকুলি ব্যাকুলি খেলে!

৪

পুট পুট্‌ক'রে একটি আধটি
খসিছে পল্লব কুল।
থেকে থেকে থেকে শিহরে সমীর,
হইয়া সৌরভাকুল!

৫

কি সুরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে—
পূর্ণিমা শরত-চাঁদ!
মুখেতে হাসিটি পড়িছে লুটিয়া,
চ'খে আধ' ঘুম-ছাঁদ!

৬

পাতলা মেঘ-গুলি, হেলি দুলি দুলি,
ভাসিয়া ভাসিয়া যায়!
ব'সে ব'সে ব'সে ছোট তারা-গুলি
আধ' ঘুম-ঘোরে চায়!

৭

কি সুরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে—
কে যমুনা-তীরে আসি,
কদম-তলায় মোহন মূরতি
দাঁড়ায়ে, বাজায় বাঁশি!

৮

মধুর অধরে মদির হাসিটি,
উছলি উছলি ঝরে!
তরল নয়নে চমক-চাহনি,
চমকে গো কার তরে!

৯

ঘেরি চারিদিকে অবাক নয়নে
দাঁড়ায়ে গোপিনী-কুল।
কারো হাতে মালা, কারো বা চন্দন,
কারো বা হাতেতে ফুল!

১০

পায়ের কাছেতে প'ড়েছে শুইয়া
বিবশা হরিণী-কুল;
দূরেতে কোকিল ডাকিছে ভুলিয়া,
খসিছে কদম-ফুল।

১১

অধরের কাছে গুঞ্জরে ভ্রমর;
সমীর বহিছে ধীরে;
নাচিছে শিখিনী ছড়ায়ে পেখম;
যমুনা উছলি উঠিছে তীরে।

১২

তরুলতা পাতা নাচিছে মৃদুল;
জ্যোছনা প'ড়েছে শুয়ে।
প্রেমের তড়িৎ বেড়ায় খেলিয়া,
অলখিতে হৃদি ছুঁয়ে!
যেচে যেচে প্রাণ ছুঁয়ে!

শ্রী অক্ষয় কুমার বড়াল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

গৃহলক্ষ্মী। (যথা প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইতে যে সকল গুণ শিক্ষার আবশ্যক স্ত্রীর সহিত কথোপকথনচ্ছলে স্বামীর তদ্বিষয়ক উপদেশ) শ্রী গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত।

পুস্তক খানির প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ গিরিজা বাবুর লেখা নহে, ইঁহার কোন বন্ধুর লেখা। এই তিনটি পরিচ্ছেদ বাদ দিলেই ভাল হইত. ইহাতে শিক্ষার মত কিছুই দেখিতে পাই না. কুশিক্ষাই প্রায় সব। ভরসা করি পুনঃ মুদ্রাঙ্কনের সময় লেখক একবারে এই তিনটি পরিচ্ছেদ উঠাইয়া দিবেন।

উক্ত তিনটি পরিচ্ছেদ ছাড়া বইখানি সুন্দর হইয়াছে, ইহার উপদেশ গুলিই যে কেবল সারগর্ভ এমন নহে, নাটকাংশেও বইখানি প্রশংসনীয়। স্ত্রী যে কখনো একটু অভিমান করিয়া, কখনো একটু লজ্জার ভাবে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি ঢালিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিতেছেন সে কথায় রমণী-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য' যেমন ফুটিয়াছে তাহাতে তাহার বাঙ্গালিত্বও তেমনি বজায় আছে, তাহার কথা বার্ত্তা পড়িলে-বাঙ্গালি-ঘরের মেয়ের একটি পরিস্ফুট ছবি আমাদের চোখে পড়ে। লেখকের সহিত একটি বিষয়ে আমাদের মতের অনৈক্য হইতেছে, তিনি স্ত্রীলোকদের সঙ্গীত শিক্ষা করিতে বলেন। আমাদের দেশের মেয়েরা যে গান গাহিতে জানেন না এমন নহে, আড়াল হইতে শুনিয়া শুনিয়া, কিম্বা স্বামী ভাই প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনের কাছে শুনিয়া শুনিয়া, তাঁহারা আপনা হইতেই গান গাহিতে শিখেন। পাঁচ জন মেয়ে একত্র হইলে গানটা তাঁহাদের না গাহিলে একবারে চলে না, আর স্ত্রী গাহিতে জানিলে স্বামীর কাছে যে না গাহেন তাহাও বোধ হয় না। ইহার পর নূতন করিয়া শিক্ষার কথা বলিলে গায়কের কাছে শিক্ষা করা বুঝায়, কিন্তু সমাজের পক্ষে তাহা কতদূর উপযোগী বলিতে পারি না। বিশেষ শ্বশুর শ্বাশুড়ি গুরুজন এরূপ শিক্ষা কতদূর পসন্দ করিবেন সন্দেহ, সুতরাং এ রূপ স্থলে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে অবাধ্যতা শিক্ষা করিতে হয়।

গৌড়গীত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

নীরবিল বীণা, গীত থামিল লিঙ্গোর ;
সম্ভাষিল উচ্চে লিঙ্গো রিকদ রাক্ষসে।
বলিল রিকদ, "ভাল প্রতারিত তুমি
করেছ মোদিগে, এস, দেও আলিঙ্গন।"
আলিঙ্গিয়া বৃদ্ধে লিঙ্গো সাদরে বলিল,
"নমি আমি খুড়া তোমা।" হাত ধরাধরি
বসিল উভয়ে তবে আগুনের পাশে।
জিজ্ঞাসিল রক্ষ "কোথা হতে বাপু তুমি,
আসিয়াছ হেথা ?" "এসেছিল ভাই মোর
অগ্নির উদ্দেশে হেথা, গ্রাসিতে তাহারে
তুমি করেছিলে তাড়া ; যদ্যপি গ্রাসিতে,
কোথা পাইতাম তারে এজনমে পুনঃ ?"
উত্তরিল খুড়া "হয়ে গেছে যা হবার,
করেছিনু ভুল, আছে কন্যা সাত মোর,
লয়ে যাও তাহাদিগে দিনু অনুমতি।"
সম্ভাষি রিকদে লিঙ্গো হইয়া বিদায়,
চলিল যথায় ছিল কন্যা সাত তার ;
বাহিরিয়া গৃহ হতে আসি লিঙ্গো-পাশে
প্রশ্নিল সকলে তারে, "কে তুমি যুবক ?
আসিয়াছ কোথা হতে, বলতা মোদিগে।"
"পিতা তোমাদের খুড়া সম্বন্ধে আমার,
নাম মোর লিঙ্গো, ভৃত্য ঈশ্বরের আমি।
অগ্নির উদ্দেশে আমি এসেছিনু হেথা ;
ক্ষুধায় পীড়িত ভাই চারি জন মোর,
রহিয়াছে বসি দূরে মোর প্রত্যাশায়।"
"ভাই তুমি আমাদের ? উত্তম সম্বন্ধ !
কেমনে ছাড়িয়া চলি যাবে ভগ্নীদিগে ?
লবে না মোদিগে সঙ্গে ? মোরাও যাইব।"
"আসিবে যদ্যপি তবে এস শীঘ্র ক'রে।"
চলিল ভগিনী সাত লিঙ্গোর পশ্চাৎ।
লিঙ্গোর প্রতীক্ষা করি গোঁড় চারি ভাই
আছিল বসিয়া পথ নিরীক্ষণ করি ;
দেখি দূর হতে তাকে, বলিল সানন্দে,—
"ভাই লিঙ্গো, আসিতেছে ;" উঠিল সকলে,
চাহিল লিঙ্গোর দিকে, চমকি উঠিল ;
"কে ওরা লিঙ্গোর সাথে ? সুন্দর উহারা!
কার কন্যাগণ সনে আসিতেছে লিঙ্গো ?
দেয় যদি উহাদিগে, করিব বিবাহ।"
সম্বোধি সকলে লিঙ্গো বলিলেন তবে,—
"তনয়া ইহারা শুন খুড়ার আমার ;
রাঁধিয়া যতনে সেবা কর ইহাদের।"
জ্বালাইয়া অগ্নি তবে গোঁড় চারি ভাই,
করি মাংস পাক, সুখে খাইল সকলে।
ভোজনান্তে বলিলেক লিঙ্গো ভগ্নীগণে,
"এবে ফিরি নিজ গৃহে যাও ত্বরা করি।"
উত্তরিল ভগ্নী সাত, "যাইবে যথায়,
যাইব তথায় মোরা, না ফিরিব ঘরে।"
এত শুনি বলিলেক গোঁড় চারি ভাই,—
"ভালত বলিছে এরা, স্বীকারিলে তুমি,
ভাই, লিঙ্গো, মোরা সবে বিবাহ করিব।
লও বাছি সকলের সুন্দরী যে হয় ;
রবে বাকি যারা, মোরা করিব বিবাহ

তাহাদিগে।" বলিলেন লিঙ্গো "শুন ভাই,
নাহিক বাসনা মোর বিবাহ করিতে ;
ভ্রাতা মোর তোমা সবে, ভগিনী উহারা,
দেখিব মাতার ন্যায় আমি উহাদিগে !
বয়সে তোমরা বড়, সর্ব্বছোট আমি ;
যতন আমারে ওরা করিবে নিশ্চয় ;
আনি দিবে জল, খাদ্য, করিবে প্রস্তুত
শয্যা, করাইবে স্নান, বস্ত্রাদি ধুইবে।"
"কেমনে বিবাহ লিঙ্গো করিব আমরা ?
ভাই মোরা চার, কিন্তু ভগ্নী সাত জন।"
"জ্যেষ্ঠ তিন কর বিয়ে প্রত্যেক দুজনে,
করিবে কনিষ্ঠ এক কন্যাকে বিবাহ।"
চলিল সকলে তবে কাচিকোপাগ্রাসে ;
না ছিল পুরুষ তথা, না ছিল রমণী।
হরিদ্রাদি বাটি লিঙ্গো মাখাল সকলে ;
নির্ম্মিল মণ্ডপ এক, সাজাইল তায়
গাঁথি বহু পর্ণ মালা। এরূপে সমাপ্ত
তবে হইলে বিবাহ, বলে জ্যেষ্ঠ ভাই,—
"কত উপকার লিঙ্গো করেছে মোদের ;
বিবাহের তরে আনি দিয়াছে তনয়া ;
পিতৃবৎ সম্মানিব তাহাকে আমরা ;
আহরিয়া ফলফুল আনি দিব তারে ;
শীকার আনিব ঘোর অরণ্য হইতে ;
দোলানায় শুয়ে সুখে থাক্ লিঙ্গো ঘরে।"
বাহিরিল চারিভাই তীরধনু হাতে,
শীকার উদ্দেশে, ঘন আঁধার জঙ্গলে ;
দোলনায় শুয়ে লিঙ্গো সুখে নিদ্রা যায় ;
গোঁড়পত্নী সাত জন দোলায় তাহারে।
এইরূপে কয়দিন হইল অতীত।

একদা গিয়াছে বনে গোঁড় চারিজন ;
নিদ্রাযায় দোলনায়, লিঙ্গো গুরুতর ;
ভাবিল ভগিনী সাত—নাহি হাসে লিঙ্গো।
নাহি কভু কহে কথা আমাদের সনে !
না চায় মোদের পানে ! কহাইব কথা
তাকে আমাদের সনে ; হাসাইব তাকে ;
আমোদ প্রমোদ মিলি করিব সকলে।
কেহ হস্ত কেহ পদ ধরিল লিঙ্গোর ;
কেহবা দিইল টান ধরি তার গাত্র।
তথাপি না দেখে লিঙ্গো মেলিয়া নয়ন।
অবশেষে বলে লিঙ্গো ভগ্নী সাত জনে,
"হেন ব্যবহার কেন কর মোর সনে ?
ভগিনী তোমরা মোর নাহি কি স্মরণ ?
দাস আমি ঈশ্বরের,—যায় যাক্ প্রাণ,
হাসিব না তবু আমি তোমাদের সনে ;
চাহিব না তবু আমি তোমাদের পানে।
এত শুনি জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বলিল সকলে,—
"চাহিবে না লিঙ্গো তবে আমাদের পানে?"
এত বলি আক্রমিতে অগ্রসর তারা।
কুপিত হইল লিঙ্গো, আপাদ মস্তক
ক্রোধে হইল পূরিত ; উত্তরিল লিঙ্গো
দ্রুত দোলনা হইতে। সম্মুখে মুদ্গর
ছিল পড়ি, লয়ে তাহা প্রহারিল সবে।
প্রহারিত ভগ্নী সাত যায় পলাইয়া।
দোলনায় ফিরি লিঙ্গো পুনঃনিদ্রা যায় ;
নিজ নিজ গৃহে ফিরি গেল ভগ্নী সাত।

মধ্যাহ্ন সময়ে আসে গোঁড় চারি ভাই ;
মেরেছে হরিণ কেহ কেহ খরগোস,
ময়ুর কেহ বা, ফুল আনিয়াছে কেহ ;
আপন আপন বোঝা তারা নামাইয়া,
বলিল সকলে "চল, লিঙ্গোকে মোদের
ভেটিব আমরা, দিব উপহার ফুল।
দোলনায় নিদ্রাযায় দেখিয়া লিঙ্গোকে,

আপন আপন ঘরে ফিরিল সকলে।
করিয়া নিদ্রার ভাণ আছিল শুইয়া
ভগ্নী সাতজন, যেন জড়সড় ভয়ে।
জিজ্ঞাসিল সবে "কেন নিদ্রিত তোমরা ?
কেন না দোলাও সবে লিঙ্গোর দোলনা ?"
উত্তরিল তারা,—"শুন, বলি তবে শুন,
সে পোড়া লজ্জার কথা—লিঙ্গোর আচার
হায় কি লজ্জার কথা। কতদিন আর
লুকায়ে রাখিব মোরা ? ছিনু এত দিন
চুপ করি—কত দিন স'ব অপমান ?
এক স্ত্রীর দুই স্বামী সম্ভবে কি কভু ?
এইদণ্ডে পিতৃগৃহে ফিরি যাব মোরা।"
এত শুনি জ্বলি ক্রোধে বলে যত গোঁড় ;
"বলেছিনু মোরা 'লিঙ্গো' করহ বিবাহ
সপ্ত ভগিনীর মধ্যে যারে সাধ যায় ;
বলিল তখন ভণ্ড, পাষণ্ড, পামর,
'দেখিব ওদিকে আমি মাতার সমান ;'
শঠ লিঙ্গো প্রতারিত করেছে মোদিগে।
বন মধ্যে ছলে ধূর্ত্তে যাইব লইয়া ;
নাশি তথা তাকে, চক্ষু লইব কাটিয়া।
মারিয়াছি এত দিন হরিণ খরগোস ;
নূতন শীকার মোরা করিব আজিকে।
মারিয়া তাহারে, ছিঁড়ি নিব চক্ষু দুটী ;
খেলিব সে চক্ষু লয়ে আমোদে আমরা।
এ প্রতিজ্ঞা যতক্ষণ নাহিক পূরিবে,
জলস্পর্শ ততক্ষণ কেহনা করিবে।"
চলিল সকলে তবে লিঙ্গোর সদন ;
"উঠ লিঙ্গো উঠ ভাই" বলিল সকলে।
উত্তরিল লিঙ্গো তবে, "কি হয়েছে ভাই ?
কোথা ফুল? কোথা জন্তু? খালি হাতে কেন?"
বলিল তাহারা, "এক দেখিয়াছি জন্তু
প্রকাণ্ড-শরীর, বহু মারিলাম তারে,
পড়িল না তবু, কিন্তু না যায় পলায়ে।
ক্লান্ত হয়ে শেষে মোরা এলাম চলিয়ে।
উঠিয়া বসিল লিঙ্গো, ভাইদের পানে
বলিল চাহিয়া—'আমি মারিব সে জন্তু।'

লিঙ্গো সনে চারি গোঁড় অরণ্যে চলিল ;
অন্বেষিল চারিদিকে, মিলিল না জন্তু ;
সম্বোধি তাদিগে তবে বলিলেন লিঙ্গো,
"গিয়াছে চলিয়া যদি, ক্ষতি নাহি তায়।"
বৃক্ষ মূলে বসে লিঙ্গো বিশ্রাম আশয়ে।
বলিল তাহারা, "বস, ভাই, হেথা ;
আনি দিব জল তোমা," চলি কিছু দূর,
ছুড়িল চারিটী তীর আড়াল হইতে
গোঁড় চারি জন তবে লিঙ্গো লক্ষ্য করি।
সে আঘাতে বাহিরিল লিঙ্গোর পরাণ।

ছিঁড়িলয়ে চক্ষু দ্বয় শবদেহ হতে,
সন্ধ্যাকালে গোঁড় চারি ফিরিল আবাসে।
বলিল সম্বোধি পত্নী তবে এক জন,
"জ্বাল অগ্নি শীঘ্র করে, জ্বালহ প্রদীপ ;
খেলিব আমরা সবে মিলি কুতূহলে।'
হরিষে সকলে তবে হাঁটু গাড়ি বসি,
আরম্ভিল খেলিবারে চক্ষু দুটী লয়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।
(বিএস্ সি লণ্ডন)

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

মাঘ মাসের ভারতীর ৪৪০ পৃষ্ঠার পর।

ব্রহ্মা (হরিবংশ মতে ধন্বন্তরি) অয়ুর্ব্বেদকে অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করেন—তদ্‌যথা, শল্য, শালাক্য কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্য অগদতন্ত্র রসায়ণতন্ত্র এবং বাজীকরণ তন্ত্র।

১। শল্যশাস্ত্র (বা অস্ত্র চিকিৎসা)। বিবিধ প্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধূলি, লৌহ লোষ্ট্র, অস্থি, নখ, পূয় প্রভৃতি দেহের মধ্যস্থ হইলে তাহাদিগকে শল্য কহে। যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার অগ্নি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া দেহস্থ শল্য বাহির করিবার উপায় এবং ব্রণ নির্ণয়ের নিয়ম এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

২। শালাক্য—উর্দ্ধজত্রুগত রোগ, অর্থাৎ চক্ষুরোগ কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ এবং নাসিকাসংস্থতরোগ প্রভৃতির শান্তির নিমিত্ত এই অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

৩। কায়চিকিৎসা—সর্ব্বাঙ্গসংস্থত রোগ সমূহের অর্থাৎ জ্বর, অতিশয়, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতির শান্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। ভূতবিদ্যা—দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস পিতৃগণ, পিশাচ, নাগ, এবং গ্রহ প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপসৃষ্ট মনুষ্যদিগের নিমিত্ত শান্তিকর্ম্ম, বলিহরণাদি গ্রহশান্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৫। কৌমারভৃত্য (ধাত্রী-বিদ্যা)। পশু পালন, ধাত্রীর স্তন্য দুগ্ধের দোষশোধন এবং দুষ্ট গ্রহ সমুত্থিত ব্যাধি সমূহের শান্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৬। অগদ তন্ত্র (বা বিষ চিকিৎসা)। সর্প, কীট, মাকড়শা, বৃশ্চিক, ইন্দুর প্রভৃতির বিষ নিরূপণ, বিবিধ বিষসংযোগজ্ঞান এবং সর্পাদি দষ্ট ও বিবিধ বিষোৎপন্ন রোগ সকলের শান্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৭। রসায়ন তন্ত্র—বয়স্থাপণ, আয়ু মেধা ও বল বর্দ্ধণ এবং রোগ হরণ প্রভৃতির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৮। বাজীকরণ—অল্প, দুষ্ট অশুদ্ধ ও ক্ষীণ শুক্রের আপ্যায়ণ উপচয় প্রভৃতির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

প্রচলিত সুশ্রুত, চরক, হারীত, বাভট, ভাবপ্রকাশ চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে আয়ুর্ব্বেদে শারীরবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক জ্ঞান, শরীরের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধনির্ণয় শুক্রশোণিত-সম্বন্ধ নির্ণয়, শুক্র পরীক্ষা, আর্ত্তব (ঋতু শোণিত) পরীক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, নেত্রপরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্রপরীক্ষা, মলপরীক্ষা, গর্ভরক্ষা, শিশুপালন, স্তন্যদুগ্ধ-পরীক্ষা প্রভৃতি ধাত্রীবিদ্যা, দিনচর্য্যা ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি যাবতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগনির্ণয়, রোগোৎপত্তির কারণ, রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়, ধাতু ও বলাবল পরীক্ষা, ধাতুর ক্রিয়া, দেশ

কাল পাত্র ভেদে খাদ্য ও ঔষধাদির নির্ণয়, জল বায়ু প্রভৃতির গুণাগুণ নির্ণয়। উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ণবিদ্যা, দ্রব্য নিরূপণ, দ্রব্যগুণ ও ক্রিয়া, মিশ্রদ্রব্যের গুণ, সংযোগ প্রয়োগ বিজ্ঞান, বিষ নিরূপণ, দ্রব্য গ্রহণ ও ঔষধ প্রস্তুতের নিয়ম, শরীরের সহিত ঔষধের এবং ঔষধের সহিত ব্যাধির সম্বন্ধ নির্ণয়, বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হইবার উপায়, শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া, শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া মৃত দেহের পরীক্ষা, অস্ত্র চিকিৎসা, বিবিধ প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্রের ব্যবহার প্রণালী, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা, রোগানুসারে ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী, বন্ধন বিরেচন, পিচকারি প্রয়োগ প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্ম, স্বেদবিধি, অগ্নিপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ, জলৌকাবিধি, শৃঙ্গ প্রভৃতি নানা যন্ত্রযোগে রক্তমোক্ষণ প্রণালী, রাসায়নিক ক্রিয়ার নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্র নির্ণয়, ধাতু প্রভৃতির জারণ মারণের নিয়ম, সূপ-শাস্ত্র প্রভৃতি চিকিৎসোপযোগী অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে॥

এই আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিভিন্ন মতের চিকিৎসা প্রণালী প্রবিষ্ট হইয়াছে—

১। বৈদিক চিকিৎসা।—ব্রহ্মসংহিতা, আত্রেয় সংহিতা, সুশ্রুত, চরক, হারীত সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এবং পাচন, তৈল, ঘৃত, অবলেহ প্রলেপ প্রভৃতি প্রাচীনতম ঔষধাদি বৈদিক চিকিৎসা সম্মত।

২। তান্ত্রিক চিকিৎসা—শিবোক্ত তন্ত্রাদিতে যে সমস্ত চিকিৎসা প্রণালী, বটিকা রস সংযুক্ত ঔষধ প্রভৃতি বর্ণিত আছে তাহাই তান্ত্রিক চিকিৎসা সম্মত। অতিপূর্ব্বে (বৈদিক সময়ে) কেবল তৈল ঘৃত পাচন প্রভৃতি দ্বারাই চিকিৎসা করা হইত। সুশ্রুত, চরক, হারীত প্রভৃতি গ্রন্থ, কেবল ঔষধাদিতেই পূর্ণ। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে তন্ত্র সম্মত বটিকা ও রস সংযুক্ত ঔষধাদি ব্যবহৃত হয়।—

৩। অবধূত চিকিৎসা।—ঘেরণ্ড সংহিতা যোগতরঙ্গিণী গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ, গহ্লনাথ প্রভৃতি অবধূতবরদিগের ঔষধাদি, অঙ্গুরীয় ধারণ, মাদুলী ধারণ প্রভৃতি এবং সন্যাসী প্রদত্ত ঔষধাদির অধিকাংশ অবধূত চিকিৎসা সম্মত।

৪। পশ্বাদি চিকিৎসা—অশ্বায়ুর্ব্বেদ গজায়ুর্ব্বেদ গবায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ ও তদুক্ত ঔষধাদি পশু চিকিৎসা সম্মত।

৫। Simila Semilicus Curantur সমঃ সমং শময়তি অথবা বিষস্যবিষমৌষধং প্রভৃতি মতকে যদি হোমিওপ্যাথিক মত বলা যায়, তবে আয়ুর্ব্বেদমতেও অনেক রোগেই প্রায় হোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসা বিদ্যমান আছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিদান স্থানের উপশয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হোমিওপ্যাথিক মতের লক্ষণাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অস্ত্রচিকিৎসা, মন্ত্রাদিচিকিৎসা প্রভৃতি বৈদিক চিকিৎসার অন্তর্গত সুতরাং এই সমস্ত চিকিৎসাকে আর স্বতন্ত্র মতের চিকিৎসা বলা যায় না।

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ সম্পর্কে কোনরূপ অনুসন্ধান রাখেন না তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান সময়ে, পাশ্চাত্য

চিকিৎসা শাস্ত্রের যতদূর উন্নতি হইয়াছে সে তুলনায় আয়ুর্ব্বেদ অনেক অসম্পূর্ণ। তাঁহাদের মতে শারীর বিদ্যা (Anatomy) এবং অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কিছুই নয়। কিন্তু তাঁহাদের এ সংস্কার যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন সংহিতাগুলি দেখিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

আয়ুর্ব্বেদে যে সকল বিষয় আছে আমরা উপরে তাহার একটী অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াছি। তদ্দ্বারাই জানা যায় চিকিৎসোপযোগী সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই আয়ুর্ব্বেদে নিবেশিত আছে। ধন্বন্তরি প্রভৃতি অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত ঔরদ্র প্রভৃতি কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে জানা যায় যে আর্য্যগণ অস্ত্রচিকিৎসা ও শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের নিকট তাহা কোনমতেই হীন নহে।

সুশ্রুতমতে আর্য্যচিকিৎসকগণ শবচ্ছেদ করিয়া শিষ্যদিগকে শারীরস্থানের উপদেশ দিতেন। যাহারা শবচ্ছেদ না করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন তাঁহারা কৃতান্ত স্বরূপ। ডাক্তার ওয়াইজ তৎকৃত "Hindu System of Medicine" নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরস্থান যথানিয়মে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া লিখিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই অস্ত্রচিকিৎসকগণ যুদ্ধকালে, নৃপতিদিগের সঙ্গে রণক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং অস্ত্রবিদ্ধ সৈন্যদের অঙ্গে পটি বান্ধিয়া রক্তস্রাব নিবারণ, অস্ত্রাদি বাহির করণ প্রভৃতি চিকিৎসা করিতেন।—বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন চিকিৎসা বিদ্যা ও রসায়ণ বিদ্যা এই উভয় বিদ্যাতেই হিন্দুগণ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল ও নানারূপ ঔষধি প্রস্তুত করিতে জানিত। ধাতুসেবন করিয়া পীড়া আরোগ্য করা তাহারাই প্রথমে আবিষ্কার করে। হিন্দুদিগের অতি পূর্ব্বকালেই ১২৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ছিল ও তাহারা নারীর গর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিতেও পারিত। বসন্ত রোগ নিবারণার্থ টীকা দেওয়া ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে।"(১১) অতি পূর্ব্বকালেই তাঁহারা অস্ত্রচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যার নিমিত্ত যে সমুদয় অস্ত্র ও যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এত উন্নতির পর সংখ্যাতে অধিক হইলেও একেবারে নূতন রকমের যন্ত্রাদি বড় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই।—আর্য্যগণ অতি পূর্ব্বকালেই রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে জানিতেন। এই বিদ্যাবলে তাঁহারা পারদকে এত নির্দ্দোষ করিয়া (রসসিন্দুর কজ্জলী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া) প্রায় সমস্ত রোগেই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন যে সেরূপ কোন দুষ্কর কৌশল আজ পর্য্যন্তও কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এদেশীয় চিকিৎসকগণ পারদ

১১ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৫১ পৃষ্ঠা।

ব্যবহার করিলে কোনও ভয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু ডাক্তারদের ব্যবহৃত পারদে অনেক প্রকার বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। অতিপূর্ব্বকালেই হিন্দুগণ গন্ধকদ্রাবক প্রভৃতি বহু প্রকার দ্রাবক প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে নানা প্রকার ধাতু জারণ ও নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন।

তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে আধুনিক চিকিৎসা পুস্তকে প্রত্যেক বিষয়ই যেরূপ বিস্তরিত রূপে বর্ণিত, এক্ষণকার প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে অনেক বিষয়েই সেরূপ বাহুল্য বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু টীকাকার প্রভৃতির মন্তব্য পাঠ করিলে সে ত্রুটীও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। আধুনিক আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থাদি অল্প বুদ্ধি চিকিৎসকদিগের নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়গণও অল্পের মধ্যে চিকিৎসক হইতে পারিয়া বহু বিস্তীর্ণ সংহিতা প্রভৃতির অধ্যয়ণ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই জন্যই এক্ষণে প্রাচীন সংহিতা গ্রন্থগুলি প্রায় লোপ পাইবার মধ্যে গিয়াছে। প্রচলিত গ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়াও আমরা বলিতে পারি, ভারতীয় আর্য্যগণ আয়ুর্ব্বেদরূপ যে সুপ্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার এক একটি শাখা হইতে এক একটী কলম লইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এক একটী বৃক্ষ গড়াইয়াছেন মাত্র। অথবা আয়ুর্ব্বেদের এক একটী ফটোগ্রাফির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা এক একখানি বড় চিত্রপট চিত্রিত করিয়াছেন। শাখায় যে উপাদান, কলমে তদপেক্ষা অধিক কিছুই থাকে না। ফটোগ্রাফে যাহা থাকে তদবলম্বন করিয়া যে চিত্রপট আঁকা যায় তাহাতেও তাহাই থাকে। চিত্রপটের সমুদয় অবয়বই ফটোগ্রাফে পাওয়া যায়, তবে সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে সকলে ফটোগ্রাফির সমুদয় অংশ দেখিতে পায় না। কিন্তু যাঁহার ক্ষমতা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে তিনি ফটোগ্রোফ দেখিয়াই একখানি বড় চিত্রপট আঁকিতে পারেন। যাঁহার ক্ষমতা আছে তিনি আয়ুর্ব্বেদের এক একখানি ফটোগ্রাফ অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে একটী কথাতে দশ রকম দৃষ্টান্ত দিয়া, একখানি শুভ্র বসনে শতটী ফুল আঁকিয়া বিস্তৃতরূপে চিত্রিত করিলে, অন্য উপাদান ব্যতীত, কেবল তদ্দ্বারাই এক একখানা প্রকাণ্ড চিত্রপট অঙ্কিত করিতে পারিবেন। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্পর্কে একেবারে নিরক্ষর নহেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে বিশদ ও বিস্তারিত রূপ বর্ণনা করিলে অনেক স্থলে আয়ুর্ব্বেদের একটী শ্লোক অবলম্বনেই শত পৃষ্ঠা পরমিত একখানি পুস্তক লেখা যাইতে পারে। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ের জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণালী অনুসারেই নানা দৃষ্টান্ত ও নানা মত সংগ্রহ করিয়া বিস্তারিতরূপে লেখা কর্ত্তব্য। নচেৎ মুনিদিগের সেই সারকথা গুলি আর এক্ষণে দুই এক কথায় আধুনিক লোকদিগের মস্তকে ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত।

বাল্যবিবাহ।

মুখে যে যাহাই বলুন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদের দেশে আজকাল ধর্ম্ম, সমাজ, ও রাজনীতি বিষয়ে যে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে তদ্বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। ধর্ম্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় আন্দোলনের বাহুল্যই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বহু লোককে কোন বিষয়ে আন্দোলন করিতে দেখিলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে তাহারা সেই বিষয়টি বেশ বুঝিয়াছে অথবা সম্যক রূপে বুঝিতে এবং অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে—অন্ততঃ সে বিষয়ে তাহাদের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের ইহা একটী ধ্রুব সত্য যে কোন বিষয়ে সাধারণের মন আকৃষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে উন্নতি কেবল সময়-সাপেক্ষ—উপযুক্ত সময়ে হইবেই হইবে। প্রোটেষ্টাণ্ড ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন, ফরাশী বিপ্লবের পূর্ব্বের সমাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি শত শত উদাহরণ দ্বারা এই ঐতিহাসিক সত্যটী প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে আজকাল যে ধর্ম্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে বহুবিধ আন্দোলন হইতেছে ইহা অবশ্যই দেশের পক্ষে একটী কল্যাণকর চিহ্ন। স্বল্পদর্শী লোকে এখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ম্যাট্‌সিনী বালকের চীৎকার, সমাজিক আন্দোলনকে বাতুলের প্রলাপ, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনকে বুড় উপন্যাস লেখকের নূতন খেয়াল ইত্যাদি যাহাই বলুন না কেন এগুলি যে দেশের পক্ষে শুভ চিহ্ন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

শিশু দৌড়াইতে পারে না বলিয়া তাহার প্রথম হাঁটিবার চেষ্টাকে বিদ্রূপ করা, তাহার শত শত পদস্খলন দেখিয়া ব্যঙ্গ করা, যুক্তি সিদ্ধ নহে। হাঁটিতে না শিখিয়া কেহ দৌড়াইতে পারে নাই—পদস্খলিত না হইয়া কেহ হাঁটিতে শিখে নাই। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "Nine falls make a rider" নয়বার না পড়িলে কেহ ঘোঁড়সোয়ার হইতে পারে না—এ কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কিন্তু যে কোন আন্দোলনই করা যাউক না কেন উহাতে সম্পূর্ণ এক-দেশ-দর্শিতার ভাব থাকিলে তদ্বিষয়ে সম্যক উন্নতি অসম্ভব। কোন প্রশ্নের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দিকের তর্ক উত্থাপিত হইলেই তাহার দোষ গুণ সম্যকরূপে বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা যায়। আরও, কোন অনুষ্ঠানের প্রতিরোধ না থাকিলে তদ্বিষয়ে অনুষ্ঠান কর্ত্তাদেরও সম্পূর্ণ উৎসাহ আকৃষ্ট হয় না। এই জন্যই উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলির কৃতকার্য্যতা কতক পরিমাণে রক্ষণশীল

সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের সুচারু কার্য্যকারিতার বিশেষ কারণ এই যে তথায় রক্ষণশীল (Conservative) সম্প্রদায় ও উন্নতিশীল (Liberal) সম্প্রদায় সর্ব্বদাই প্রায় সমপ্রভাব। ফ্রান্সের রক্ষণশীল সম্প্রদায় অতি হীন বীর্য্য; উন্নতিশীল সম্প্রদায় সর্ব্ব বিষয়ে চিরকালই একেশ্বর। তাহার বিষময় ফল হইতেই ফ্রান্সে মধ্যে মধ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ গতিমাত্রেরই নিয়ামক regulator থাকা ভাল—না থাকিলে অনেক সময় নিজের গতিতে নিজেই হুচট খাইতে হয়। রোমের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি বলিয়াছিলেন 'রোমের এখন দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল কারণ রোমের বীরত্বে বাধা জন্মায় এরূপ জাতি আর রহিল না'। তিনি বাস্তবিকই একজন পাকা রাজনীতিজ্ঞ।

আমার এতগুলি বৃথা কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে আমাদের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রায় এইরূপ যে তাঁহাদের মতের ভিন্ন মত কেহ প্রকাশ করিলে তাহাকে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ মূর্খ, old class, fool ইত্যাদি ঠাওরাইয়া রাখেন। এমন কি, তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন না। বাস্তবিক এইরূপ ব্যবহার 'সাম্প্রদায়িক গোড়ামি' মাত্র। কোন প্রশ্নের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে যাহাই বলুক উপযুক্ত তর্ক থাকিলে তাহাকে বিদ্রূপ না করিয়া তাহার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করা ও তাহার প্রত্যুত্তর থাকিলে তাহা দেওয়ার চেষ্টা করাই প্রকৃত নীতিজ্ঞের কার্য্য।

আমি সে দিন কোন এক সুহৃদ্‌সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। সমিতির সভ্যগণ সকলেই শিক্ষিত। সমিতির উদ্দেশ্য দেশের কুরীতি ও কুসংস্কার দুরীকরণ। দেশের কুরীতি ও কুসংস্কার বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার অবিবাহ, মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি আসিয়া পড়ে, এবং এই গুলির উচ্ছেদই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতিতে ইহার প্রত্যেকগুলির অবৈধতা প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হইল। কিন্তু কেহই ইহার কোনটীর পক্ষে একটী কথাও বলিলেন না। তন্মধ্যে দুই একজন প্রচলিত দুই একটী রীতির স্বপক্ষে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয়ে তাহারাও নির্ব্বাক্ রহিলেন। বোধ হয় অধিকাংশ সমাজসংস্কারক সভাতেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে; নচেৎ মালবারির পত্রোত্তরে রাজেন্দ্রলাল বাবু যা দুই এক কথা বলিয়াছিলেন তজ্জন্য খবরের কাগজ ওয়ালারা তাঁহার উপর এরূপ খড়্গহস্ত হইবেন কেন?

অদ্য আমরা বাল্যবিবাহ প্রথার দোষ ও গুণ উভয়ই দেখাইতে চেষ্টা করিব। ভরসা করি পাঠকগণ বাল্যবিবাহের কোন গুণ আছে ইহা শুনিয়াই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া এই খানেই পড়া বন্ধ করিবেন না। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে—'বাল্যবিবাহ' বলিলে আমরা দেশে

এখন সচরাচর যে বয়েসে বিবাহ হয় তাহাই বুঝি, অর্থাৎ মেয়েদের ১০ হইতে ১৪ ও ছেলেদের ১৬ হইতে ২২ বৎসরের মধ্যে বিবাহ।

বাল্যবিবাহের দোষ কীর্ত্তন কারীগণ বাল্য-বিবাহের প্রধানতঃ যে সমুদায় দোষ উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

তাঁহারা বলেন বাল্য-বিবাহ দ্বারা বালক দম্পতী সম্বন্ধে এই কয়েকটী অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

১। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে পতি বা পত্নী বাছিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং অনেক সময় মনোমত পতি বা পত্নী না হওয়ায় রাসায়নিক অসম্মিলনের ন্যায় দম্পতীর মধ্যে কোন দিনই একতা জন্মিতে পারে না।

২। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে পতি বা পত্নীর কর্ত্তব্য বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং পতি পত্নীর প্রতি এবং পত্নী পতির প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না। তজ্জন্য পরিশেষে অনেক সময় পতি পত্নীমধ্যে অপ্রণয়ের কারণ হইয়া উঠে। ক্রমে পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মে এবং কালে দম্পতীর সুখ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

৩। বাল্যকালে বিবাহ হইলে বালক পতি ও বালিকা পত্নী উভয়েরই শরীর, সঙ্গে সঙ্গে মনও শীঘ্র রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি সম্যক বিকাশ পায় না; তাহাদের শরীর ও মনের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়; এবং তাহারা শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য-জীবন ত্যাগ করিয়া ভবলীলা সম্বরণ করে।

৪। বাল্য বিবাহের দরুণ দম্পতী শীঘ্রই সংসারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। এবং বাল্যকাল হইতেই সংসারের সুখে দুঃখে লিপ্ত হওয়ায় তাহাদের জ্ঞানোপার্জ্জন ও জীবনের কর্ত্তব্যাদি শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে।

উপরের লিখিত অনিষ্টগুলি স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্বন্ধেই ঘটিয়া—থাকে। এতদ্ব্যতীত স্বামীর পক্ষে আরও দুইটী অনিষ্ট ঘটে :—

৫। বালক স্বামী আশৈশব এক গলগ্রহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে কখনই সম্যক উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না। ধনসঞ্চয় তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে; কিন্তু আমাদের স্বীয় যত্নদ্বারা স্বীয় উন্নতি সাধন পক্ষে ধন-সঞ্চয় একটী প্রধান সহায়।

৬। অনেক বালক স্বামী অভিভাবকের মৃত্যুর পর সংসারে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ যোগাইতে অক্ষম হইয়া চিরকাল দুঃখে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় হয়ত আত্মহত্যাও করিয়া ফেলে। এরূপ ব্যক্তি বাল্যকালে বিবাহিত না হইলে সম্ভবতঃ বিবাহ নামক উচ্চ অঙ্গের বাবুগিরিটীর প্রতি একবার লক্ষ্যও করিত না এবং কোন রকমে সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত।

স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর পক্ষেও—আর দুইটী প্রধান অনিষ্ট লক্ষিত হয় :—

৭। আশৈশব একজনের অধীন থাকিয়া তাহার মন যোগাইয়া কায করিতে করিতে স্ত্রীগণের মনের স্বাধীন ক্রিয়া একেবারে লোপ পায়। তাহারা একটী যন্ত্র বিশেষ হইয়া পড়ে। "যেমনি করাও তেমনি করে, যেমনি চালাও তেমনি চলে।"

৮। আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই সুতরাং বিবাহিতা শিশু-বালিকারা অনেক সময় বিধবা হইয়া—ইহ জীবনে সমস্ত সুখ হারায়। বালদম্পতীর সন্তান সন্ততি সম্বন্ধেও একটী ঘোরতর অনিষ্ট লক্ষিত হয়। এ অনিষ্টটীর গুরুত্ব অতি অধিক, কারণ ইহার উপর সম্পূর্ণ-রূপে জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।

৯। বালদম্পতীর সন্তানগণ সাধারণতঃ দুর্ব্বল, ক্ষীণকায় ও ক্ষীণমনা হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়। এই সন্তানগুলি অনেক সময়ই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বাঁচিয়া থাকিলেও অনেক সময় কেবল অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতে থাকে। ফলতঃ কোন জাতি মধ্যে অধিক দিন বাল্য বিবাহের রীতি প্রচলিত থাকিলে সে জাতি শেষে শারীরিক ও মানসিক লিলিপট্ (Lilliput) ময় হইয়া উঠে।

১০। বাঙ্গালার লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; এখন অযথা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। বাল্য বিবাহে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। তাহাতে আবার লোকগুলি সবল ও সুস্থকায় হয় না। সুতরাং খাইবার জন্য মুখ বাড়ে, কিন্তু কাজ করিবার জন্য হাত বাড়ে না। ইহাতে জাতীয় দরিদ্রতা ও দুর্দশা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

এ গুলি ছাড়া বাল্যবিবাহের আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক দোষের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে গুলির গুরুত্ব অতি অল্প বলিয়া বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বাল্য বিবাহ বিরোধীগণের এই সমুদায় তর্কের যুক্তি কত দূর তাহা সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, উপরে লিখিত অনিষ্ট গুলি নিবারণের জন্য তাঁহারা যে যে উপায় অবলম্বন করিতে বলেন তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ অনিষ্ট গুলি নিবারিত হয় কি না, এবং সে গুলি নিবারিত হইলেও উহা দ্বারা নূতন কোন প্রকার অনিষ্টের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব কি না। বাল্যবিবাহ বিরোধীগণ অনেকে বলেন রাজকীয় কোন আইন বা সামাজিক কোন বিধি দ্বারা যাহাতে বাল্য-বিবাহ রহিত হয় তাহা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ কোন উপায় দ্বারা বাল্য-বিবাহ নিবর্ত্তিত করিলে তাহাতে বাল্যবিবাহের অনিষ্ট নিবারিত হয় কি না এবং নূতন কোন অনিষ্ট আবির্ভাব হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার কারণ কি তাহা অগ্রে দেখাউচিত। অসভ্য সমাজে প্রায়ই বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই। আমাদের অসভ্য পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যেও বোধ হয় বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। আদিম আর্য্যদিগের মধ্যে যে বাল্য বিবাহের রীতি ছিল না তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তবে আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ কোথা,

হইতে আসিল ? অববোধ প্রথালী সম্বন্ধে আমরা অনেকটা মুসলমানদের দৌরাত্ম্য, মুসলমানদের অনুকরণ, ইত্যাদির দোহাই দিয়া রেহাই পাইতে পারি, কিন্তু এ বিষয়ে সেই "দুরাচার ম্লেচ্ছ" দিগের স্কন্ধে অণুমাত্রও দোষ চাপাইবার উপায় নাই। বরং মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব্বে বাল্য-বিবাহের রীতি ছিল না—আমাদের দেখাদেখিই শেষ তাহারা কতকটা শিখিয়াছে। তবে এ কুপ্রথাটী কোথা হইতে আমাদের দেশে প্রবেশ করিল ? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে রাজকীয় আইন বল আর সামাজিক বিধিই বল আপনা আপনি দেশে কখনই প্রচলিত হয় না। দেশে কোন অভাব বর্ত্তমান থাকিলে তন্নিবারণার্থেই এগুলি সৃষ্ট হয়। দেশে ডাকাইত না থাকিলে ডাকাইতদিগকে শাস্তি দিবার আইন হইবে কেন ? গোমাংস ভক্ষণে ভয়ানক অনিষ্ট না দেখিলে তৎ বিরুদ্ধে সামাজিক কোন বিধি প্রচলিত হয় না। বস্তুতঃ সমাজ আপনিই আপনার রোগের চিকিৎসা করে। সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা হইল কি কোন অভাব হইল, তখন দুই একটী করিয়া লোকের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়, ক্রমে সমাজের অধিকাংশ লোকে যখন তজ্জন্য ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে—তখন সকলেই তন্নিবারণার্থ উপায় অবলম্বন করে। যদি সমাজের অধিকাংশ লোকে একরূপই উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে ক্রমে সে উপায়টী সামাজিক রীতি হইয়া দাঁড়ায়, ও সময়ে তৎসম্বন্ধে নিয়মাদিও বিধিবদ্ধ হয়। এইরূপেই সমুদায় সামাজিক রীতির ও সামাজিক বিধির সৃষ্টি। বাল্য বিবাহের অনেক অনিষ্ট দেখিতেছি বলিয়াই আজ আমরা ইহার বিরুদ্ধে এইরূপ চেঁচাচেচি করিতে বসিয়াছি। যখন বাল্য বিবাহ দ্বারা সমাজ উৎশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে তখন বাল্য-বিবাহ উঠিয়া যাইবেই যাইবে ; কোন শাস্ত্রীয় বিধিরই ক্ষমতা থাকিবে না যে বাল্য বিবাহ বজায় রাখে। উপরের যুক্তিটী যদি সত্য হয় তবে অবশ্য সমাজের কোন অভাব দূরীকরণার্থেই দেশে প্রথম বাল্য বিবাহের বিধি প্রচলিত হয়। বোধ হয় মনু-আদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত। মনু মেয়েদের বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে বড় কড়াকড় নিয়ম করিয়াছেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে অনেক বাল্য বিবাহ বিরোধীগণ মনুর বাক্যটী যে কেবল 'পুস্তকের কথা' প্রকৃত দেশের প্রচলিত রীতির কথা নহে ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ইত্যাদি পুরাণ হইতে সেকালে অনেক বয়েসে যে সকল মেয়েদের বিবাহ হইয়াছিল তাহাদের এক তালিকা দেখাইয়া থাকেন। কুমারসম্ভব পাঠের কালে পণ্ডিত মহাশয় ছেলেদিগকে "স্তনৌ তথা প্রবৃদ্ধৌ" ইত্যাদি শ্লোকটী মুখস্থ করিতে বলিয়া থাকেন কারণ পরীক্ষার প্রশ্ন থাকিতে পারে যে 'কালিদাসের সময় যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল না তদীয় গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ দাও'। কিন্তু এইরূপ তর্কের দৌড় আমি ততটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সেকালে দুই

একটী মেয়ের যুবতী অবস্থায় বিবাহ হইত, অথবা সেরূপ বিবাহ হইলে কেহ দোষ মনে করিত না—ইহা দ্বারা তখন দেশে বাল্য বিবাহ দিবার রীতি ছিল না একথা কিপ্রকারে প্রতিপন্ন হইল ? বরং পুরাণাদি পাঠে ইহাই জানা যায় যে আদৌ বাল্যাবস্থায় বিবাহের রীতি ছিল না, পরে দুই একটী বাল্য বিবাহ হইত কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যুবতী বিবাহ, আর পরে যুবতী বিবাহের সংখ্যা অল্প, বাল্য বিবাহই অধিক, এবং সর্ব্বশেষে হিন্দু রাজত্বের শেষকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বাল্য বিবাহ, যুবতী বিবাহ আদবে নাই, অথবা নিতান্ত দোষনীয়। এইরূপে দেখা যায় যে সমাজ ক্রমশই বাল্য বিবাহের দিকে অগ্রসর হইয়াছে ও এই রীতিটী প্রচলিত করিয়া লইয়াছে। বাল্যবিবাহের কোন না কোন প্রকার আবশ্যকতা থাকাতেই উক্ত রীতিটী এই প্রকারে সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বোধ হয় আর্য্যগণ শীতপ্রধান দেশ হইতে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসিবার পর তাহাদের বালক বালিকাগণের তরুণ বয়সেই বিবাহের আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে সমাজে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ হয়। সমাজও ক্রমে ক্রমে বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়া সামাজিক সামঞ্জস্য স্থির রাখিতে যত্নবান হয়। কাজে কাজেই এখন দেশে বাল্যবিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত। এখন যদি সমাজের স্বতঃচেষ্টা ব্যতীত কোন প্রকার আইন অথবা তদ্রূপ কোন বিধি দ্বারা কোন প্রকার হাতগড়া উপায়ে (artificial means) বাল্যবিবাহ প্রথা রহিত করা যায় তবে পূর্ব্বোক্ত অহিতাচরণ গুলি পুনর্ব্বার দেশে আবির্ভূত হইবে কি না তদ্‌বিষয়ে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলন-কারীগণের বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। বাল্য-বিবাহ জোর করিয়া উঠাইয়া দিলে দেশে গুপ্ত প্রণয়, আর্থিক সম্বন্ধ, পরিত্যক্ত সন্তানাদি এবং আরো অনেক প্রকার অনিষ্টের সংখ্যা বাড়িবে কি না এটা কি বিশেষ ভাবনার কথা নহে।

আর একটী বিষয়ে বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনকারীগণের বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। কোন একটী হাতগড়া উপায়ে বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিয়া সমাজের এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করা উচিত কি না। স্বাধীনতা কথাটা ব্যবহার করিয়া আমি বড় মুস্কিলে পড়িলাম। আজকাল অনেকেই স্বাধীনতা স্বাধীনতা করেন—কিন্তু কথার অর্থটার প্রতি বড় দৃষ্টি রাখেন না। দেশের রাজা স্বজাতি হইলে দেশবাসী স্বাধীন ; বিজাতি হইলে তাহারা 'অধীন' এ বিশ্বাস অনেকেরই আছে এবং সেই জন্য হয়ত কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাল্য বিবাহের সঙ্গে স্বাধীনতা অধীনতার সম্পর্ক কি ? 'স্বাধীনতা, অধীনতায় ঠিক দুইটী ভিন্নার্থবোধক বিপরীত অবস্থাকে বুঝায় না। 'স্বাধীনতা' 'অধীনতার' ন্যূনাতিরেক আছে। কোন দেশ অল্প স্বাধীন কোন দেশ অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীন, কোন দেশ আরও অধিক স্বাধীন ইত্যাদি। ইচ্ছা-

স্বরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে রাজকীয় বাধা যে দেশে যতকম সেই দেশ তত স্বাধীন। স্বজাতি রাজা হইয়াও দেশসুদ্ধ লোককে হাতে পায় বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, আর বিদেশীয় রাজাও অনেক বিষয়ে প্রজাকে স্বাধীনতা দিতে পারেন। এমত অবস্থায় প্রথম দেশকে স্বাধীন বলা ও দ্বিতীয় দেশকে অধীন বলা, কথা বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা মাত্র। সমাজের শৃঙ্খলা,- শান্তি, ও উন্নতির জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে সর্ব্ব-বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে দেওয়া যায় না। কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া আবশ্যক। এই বাধা গুলিই দেশের 'আইন,' বিধি ইত্যাদি। সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা দ্বারা যে সমাজ (স্বীয় উন্নতি ও শান্তির পথ রোধ না করিয়াও) যত অধিক বিষয়ে সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে দিতে পারে—সে সমাজ তত অধিক স্বাধীন। অর্থাৎ সে সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা Individual liberty যত অধিক সে সমাজ তত স্বাধীন। প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত রাজার জাতির কোন সম্পর্ক নাই। এই জন্যই নেপালিয়েরা স্বদেশী রাজার অধীনে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষা পরাধীন এবং ইটালীর রাজা ভিন্ন দেশীয় লোক হইলেও ইটালী স্বাধীন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যখন বলি নেপাল বা তুরস্ক স্বাধীন তখন বুঝিতে হইবে আমরা তথাকার রাজার কথা বলিতেছি, প্রজার কথা বলিতেছি না। এখন বোধ হয় অনেকে বুঝিয়াছেন যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমষ্টি (অবশ্য সংখ্যা ও গুরুত্ব) উভয়ই বিবেচনা করিয়া সমাজের বা দেশের স্বাধীনতার পরিমাণ। এখন আমাদের দেশে সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বাল্য-বিবাহ করা না করা এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আইন দ্বারা বাল্য বিবাহ রহিত করিয়া এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু হরণ করা উচিত কি না তদবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি বলেন যে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকায় সমাজের এতই অনিষ্ঠ হইতেছে যে এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্যই আবশ্যক, কিন্তু বাস্তবিক কি বাল্যবিবাহ জনিত অনিষ্টের গুরুত্ব এতই অধিক? এমন অনেক বিষয় আছে যাহা বাল্য বিবাহের ন্যায় অনিষ্টকর কিন্তু কেহই সে সমুদায় বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করেন না। আমি একটী উদাহরণ দিতেছি। কে না জানে আমাদের দেশের জমিদারগণ শারীরিক পরিশ্রমে নিতান্ত বিমুখ। তন্নিবন্ধন তাহাদের শরীর ও মন নিতান্ত ব্যাধিগ্রস্থ থাকে; তাহাদের সন্তানসন্ততি ক্ষীণমনঃকায় হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজের উচ্চতম অংশের এই অহিতাচরণ দ্বারা সমাজের কতই অনিষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য এরূপ জমিদারগণ প্রত্যহ এত ঘণ্টা করিয়া সরকারী কারখানায় কাজ করিবেন এরূপ আইন করা বোধ হয় কেহই যুক্তি সঙ্গত মনে করিবেন না। অবশ্য

আমি বাল্য-বিবাহ ও জমিদারদের শ্রমপরাঙ্মুখতা একই শ্রেণীতে স্থাপিত করিতে চাই না তবে এই মাত্র বুঝাইতে চাই যে বাল্যবিবাহের অনিষ্টের গুরুত্ব বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া আইন দ্বারা তদ্‌বিষয়ক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা উচিত নহে। আজ কাল স্বাধীন বাণিজ্য, স্বাধীন মুদ্রা যন্ত্র, স্বাধীন শিক্ষা ইত্যাদি স্বাধীনতার দিন পড়িয়াছে এখন ব্যক্তিগত এই স্বাধীনতা লোপ করিবার পূর্ব্বে মেয়েদের অধিক বয়েসে বিবাহ দিবার যে সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে তাহা রহিত করিয়া স্বাধীন বিবাহ প্রবর্ত্তিত করার চেষ্টা করা উচিত। বিবাহ সম্বন্ধে বয়সের কোন বাধা না থাকিলে যার ইচ্ছা সে নিজ সুবিধামত অল্প বা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে পারে। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন অধিক বয়সে বিবাহিত হইবার বাধা রহিত করা ও বাল্য-বিবাহের প্রথা রহিত করা একই কথা নহে।

এখন আমরা বাল্য-বিবাহ-বিরোধীগণের তর্কগুলির সমালোচনা করিব। এবং সেই সঙ্গে বাল্য-বিবাহ রহিত হইলে বর্ত্তমান কতকগুলি ইষ্টের যে ব্যাঘাত হইবে তাহাও দেখাইব অর্থাৎ বাল্য-বিবাহের গুণগুলিও বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১ম তর্ক। বাল্যবিবাহে পতি পত্নীর এবং পত্নী পতির মনোমত হয় না ইত্যাদি।

আপাততঃ বোধ হয় বটে যে যুবক যুবতী মনোমত সহচর বাছিয়া লইতে পারে, বালক বালিকা তাহা পারে না; এবং তজ্জন্য যৌবনবিবাহ বাল্যবিবাহাপেক্ষা দম্পতীর পক্ষে অধিক সুখকর, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঘটে না। উপযুক্ত সহচর পসন্দ করিয়া লইবার ক্ষমতা যৌবন কালে জন্মায় না। মনুষ্যের বৃদ্ধ বয়সেই প্রকৃত প্রস্তাবে সেই জ্ঞান জন্মে। যাহারা নিজে ভোগিয়াছে এবং অপরকে ভোগিতে দেখিয়াছে তাহারই কেবল বলিতে পারে যে কোন রূপ বিবাহের চরম ফল কি দাঁড়ান সম্ভব। যুবক প্রথম সংসারে প্রবেশ কালে সংসারের সর্ব্ব বিষয়েই অনভিজ্ঞ। এবং কিরূপ সহচরী গ্রহণ করিলে চিরকাল সুখে কাটাইতে পরিবে সে বিষয়েও তাহার জ্ঞান অন্যান্য সাংসারিক জ্ঞানের ন্যায় স্বল্প। অনেক সময় অভিরঞ্জিত নাটক নভেল হইতে যুবক এ সম্বন্ধে জ্ঞান অথবা অজ্ঞানতা লাভ করে। যদিবা এ বিষয়ে কিছু মাত্র জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেও স্বাভাবিক প্রেমেচ্ছা প্রথম উন্মুক্ত হইবার কালে তাহার বেগে তাহাদিগকে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলে যে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়। যুবক এবং যুবতী সাধারণতঃ প্রথম যে সুন্দর বা সুন্দরীকে দর্শন করে তাহাকেই মন প্রাণ সমর্পণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় পিতা মাতা সন্তানের স্বেচ্ছানুরূপ বিবাহ বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব্বকথিত অনুপযুক্ততার জন্য দম্পতী শীঘ্রই কষ্ট ভোগ করেন। আর পিতা মাতা বিবাহ বন্ধ করিতে পারিলেও সন্তান অতৃপ্তপ্রেমের জ্বালায় চিরকাল জ্বলিয়া মরেন। যৌবনবিবাহে যে প্রায়ই এইরূপ প্রথমে পিতা

মাতা আত্মীয়ের সহিত বিচ্ছেদ, পরে দম্পতীর নিজের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের চম্পট বিবাহের (Elopement Marriage) প্রাবল্য, প্রত্যাখ্যান, ব্যভিচার, ইত্যাদির মকর্দ্দমার আধিক্য দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ যুবক যুবতীর মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গঠিত হওয়ায় বিবাহের পর পূর্ব্বের গঠন ভাঙ্গিয়া উভয়ের মানসিক গঠনের একতা সম্পাদিত হওয়া প্রায়ই দুষ্কর। এবং তজ্জন্যই বিবাহের কিছুকাল পরে অর্থাৎ রূপতৃষ্ণা ও যৌবনমদ কথঞ্চিৎ শমিত হইলে অনেক স্থলে স্ত্রী পুরুষে অনৈক্য হইয়া উঠে। ক্রমে এই অনৈক্য ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়।

কিন্তু বাল্যবিবাহে বালক স্বামী ও বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে একত্রে একপ্রকার শিক্ষা পাইতে পাইতে তাহাদের উভয়ের মন এক ভাবেই গঠিত হইতে থাকে। তজ্জন্য যৌবনে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। উভয়ের মধ্যে একজনের কোন দোষ থাকিলে, অন্যজনে ছেলে বেলা হইতে উহা দেখিতে দেখিতে উহাতে একরূপ অভ্যাস হইয়া যায় এবং শেষে আর এইরূপ দোষের তীব্রতা অনুভব করিতে পারে না। লোকে বলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুঁতানকেও সুন্দর দেখায়, বাস্তবিকই সে কথা সত্য এবং সেই জন্যই বাল্য বিবাহের দম্পতীর আত্ম কলহ, যৌবনে বিবাহিত দম্পতীর আত্মকলহের ন্যায় বিষময় হয় না।

এদিকে বাল্য-বিবাহ প্রবীন পরিপক্ক-বুদ্ধি-পিতা মাতা কর্ত্তৃক সংঘটিত হওয়াতে প্রায়ই দম্পতীর মধ্যে কোন প্রকার অনুপযুক্ততা থাকে না এবং তজ্জন্য যৌবনে দম্পতি মধ্যে কলহ হইবার বিশেষ কোন কারণও বর্ত্তমান থাকে না।

স্থূল কথা দম্পতীর সুখ ধরিতে গেলে বাল্য-বিবাহ যৌবনবিবাহ-পেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের জন্য বাল্য বিবাহের আরও একটী গুণ দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে একান্নভুক্ত পরিবারের প্রথা প্রচলিত। এ প্রথা শীঘ্র যে উঠিয়া যাইবে এরূপ বোধ হয় না কারণ অনেকে এখনও ইহার বিলক্ষণ পক্ষপাতী। যৌবনে বিবাহিতা স্ত্রী আসিয়াই কখনও স্বামীর পিতা মাতা ভাই বন্ধুকে স্বীয় পিতা মাতা ইত্যাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া উঠিতে পারে না। তাহার আচরণে তাহার মনের ভাব অবশ্যই কিছু না কিছু প্রকাশ হয়। সুতরাং স্বামীর আত্মীয়বর্গ নূতন বধূর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যান। স্ত্রীও সেই কারণে স্বামীর আত্মীয়বর্গের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে। এইরূপে পরিবার মধ্যে ভয়ানক আত্মকলহের সূত্রপাত হয়। বাল্য-বিবাহিত স্ত্রী শ্বশুরালয়ে আসিলে সে ছেলে মানুষ বলিয়া স্বামীর আত্মীয়গণ তাহার কোন প্রকার আচরণেই প্রায় অসন্তুষ্ট হন না অন্ততঃ অনেকটা মাপ করিয়া লন। এবং তাহার প্রতি যত্ন ও ভালবাসা দেখাইতেও ত্রুটী করেন না। সেও তাঁহাদিগকে পিতা মাতা ভ্রাতা ইত্যাদির স্থানীয় করিয়া লয়। এইরূপে পরস্পর

মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও প্রণয় স্থাপিত হয়। বাস্তবিক যৌবনবিবাহ ও একান্নভুক্ত পরিবার কখনই এক সমাজে একত্র প্রচলিত থাকিতে পারে না।

২য় তর্ক। বাল্যবিবাহে স্বামী স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে অসম্মিলনের কারণ হইয়া উঠে—ইত্যাদি—

এই তর্ক প্রথম তর্কের একটী শাখা মাত্র। এবং তাহার যে উত্তর দেওয়া গিয়াছে এ সম্বন্ধেও প্রায় সেই উত্তর দিলেই চলে। ছেলেবেলা হইতে একত্র থাকায় স্বামী স্ত্রীর চরিত্র এবং স্ত্রী স্বামীর চরিত্র শিক্ষা করিতে বেশ সময় পায়। সুতরাং যৌবন কালে তাহারা পরস্পরের মন যোগাইয়া কাজ বেশ করিতে সক্ষম হয়। এ বিষয়েও বাল্য-বিবাহ যৌবন বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৩য় তর্ক। বাল্য বিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন রুগ্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

অনেক সময় বাল্য-বিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন রুগ্ন দৃষ্ট হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে দোষটা বাল্য-বিবাহের না বাল-দম্পতীর অভিভাবকগণের তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

শাস্ত্র সম্মত বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিলে সম্ভবতঃ 'নৈমিত্তিক' বাল্য-বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। কিম্বা আরো নানা রূপ মন্দ ফল জন্মাইবে এবং তজ্জন্য বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকা অবস্থায় বালক বালিকার মন ও শরীর রুগ্ন হওয়ার যেরূপ কথা ছিল তখনও প্রায় সেইরূপ হইতে থাকিবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান বোর্ডিং স্কুল ও কালেজের ছেলেদের যেরূপ চরিত্রের কথা শুনিতে পাই তাহা হইতে আমাদের দেশের বাল্যকালে বিবাহিত ছেলেদের স্বভাব সহস্রগুণে ভাল। যদি বল অভিভাবকগণ যত্ন লইলেই এ সকল নিবারিত হইতে পারে, আমি বলি অভিভাবকগণ যত্ন লইলে বাল্য-বিবাহেও কোন হানি হইতে পারে না?

৪র্থ তর্ক। বাল্য বিবাহে দম্পতী উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না ইত্যাদি।

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশের বিবাহিত ছাত্রেরা—কি ইংলণ্ডের অবিবাহিত ছাত্রদের অপেক্ষা শিক্ষা বিষয়ে কম পটুতা ও যত্ন দেখাইয়া থাকে? বরং দেখা যায় অনেক ছেলে যাহারা নিজে পাঠব্যয় কুলাইতে অনক্ষম তাহারা শ্বশুরের সাহায্যে মানুষ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এরূপ মাঝে মাঝে দেখা যায় যে ছেলেটা বিবাহে মাটি হইয়া যায়। 'বৌ' ধরেই 'বই' ছাড়ে। "এদিকে মা লক্ষ্মীও ঘরে এলেন ওদিকে মা সরস্বতীও বিদায় হইলেন"। অন্য পক্ষে বৌএর মুখ ছোট হইবে, বৌকে গঞ্জনা দিবে এইরূপ ভয়ে ছেলেরা বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়া বেশ উন্নতি দেখাইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কি পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক নহে? বাঙ্গালার ছাত্র জীবন যদি কেহ বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন তিনি

অবশ্য আমার সহিত একমত হইবেন। আর প্রকৃত পক্ষে বিবাহ করিয়া ছেলে মাটি হওয়া অনেকটা অভিভাবকগণের গুণে ঘটিয়া থাকে।

বালিকাগণের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় অনেক সময় তাহাদের শিক্ষার ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহার প্রকৃত কারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অনাস্থা, বাল্য বিবাহ নহে।

৫ম ও ৬ষ্ঠ তর্ক। বাল্য-বিবাহে ধনসঞ্চয়ের ব্যাঘাত হয়। বাল্যকালে বিবাহিত স্বামী অনেক সময় স্ত্রী পুত্রকে ভরণপোষণ করিতে সক্ষম হয় না ইত্যাদি।

এ অনিষ্টগুলিও কতক পরিমাণে অভিভাবকগণের ত্রুটীতে ঘটিয়া থাকে। যে অভিভাবক পুত্রকে এরূপ বিত্ত দিতে না পারেন যে তদ্দ্বারা সে সম্মানে পরিবার প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে, সে অভিভাবকের পক্ষে পুত্রকে বাল্য বিবাহ দেওয়া অপরিণামদর্শীর কার্য্য। কিন্তু অজ্ঞ লোকে নির্ব্বুদ্ধিতায় যে অনিষ্ট ঘটায় তাহা নিবারণ জন্য একেবারে বাল্যবিবাহ রহিত করিয়া ধনী ও বিবেচক পিতা হইতে পুত্রের বিবাহের এই স্বাধীনতা হরণ করা কি যুক্তি-সঙ্গত ?

আবার এইরূপ ঘটনাই অধিক সময় দেখা যায় যে অবিবাহিত পুরুষ নিতান্ত অমিতব্যয়ী, ধন সঞ্চয় করিতে আদবেই সক্ষম নহে। বিবাহ করিয়াই যেন তাহাদের মতি ফেরে, সর্ব্ব বিষয়ে বেশ মনোযোগী হয়, ও ধনসঞ্চয়ে যত্নবান হয়। ইংরাজদিগের অবিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত পুরুষদের চরিত্র যাহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এবিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। যত দিন বিবাহ না করিবে তত দিন যেন ইংরাজ পুরুষের কেন্দ্র স্থির হয় না। মতিগতি নিতান্ত যেন ছড়ান থাকে। বাল্য-বিবাহিত স্বামীকে প্রায়ই এরূপ দোষে দোষী দেখা যায় না। সুতরাং অনেক সময় ধনসঞ্চয়ের পক্ষে বাল্য-বিবাহ প্রতিকূল না হইয়া বরং অনুকূলই হইয়া থাকে।

৭ম তর্ক। বাল্যবিবাহে স্ত্রীদিগের মনের স্বাধীন ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি। আমাদের সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে এটা মঙ্গল কি অমঙ্গল ঠিক বলা যায় না। সমাজে রীতিমত এরূপ কোন উপায় নাই যাহা দ্বারা স্ত্রীলোক এখন স্বাধীন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করে। তাহাদিগকে কাহার না কাহার গলগ্রহ হইতে হইবেই হইবে। এরূপঅবস্থায় স্বামীর (অথবা অভিভাবকের) সহিত সর্ব্ব বিষয়ে এক মত থাকাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়। স্ত্রীলোকের মনের স্বাধীন ভাব আছে এরূপ কথা শুনিতে বড় মধুর বটে কিন্তু সমাজের বর্ত্তমানাবস্থায় বড় শুভ নহে। যখন Fox এবং Burke এর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও বিদেশীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় ভিন্নমত হওয়ায় চিরকালের বন্ধুত্ব ভুলিয়া ফেলেন তখন অতি নিকট সম্বন্ধ ঘরাও কথায় আমাদের 'বাবু' ও 'ঠাক্‌রুণ' পুনঃ পুনঃ ভিন্ন মত হইলে যে তাহাদের মধ্যে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি হইবে ইহা বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ যে স্ত্রী মতি গতি

মন প্রাণ স্বামীতে অর্পণ করিয়াছে (কথা গুলা একটু তলাইয়া বুঝিবেন—অর্থাৎ যে স্ত্রী সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর অধীন হইতে ও নিজের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ করিতে শিখিয়াছে) সেই স্ত্রীই আমাদের আদর্শ সতী। সেই আমাদের 'গৃহ লক্ষ্মী'। দ্রৌপদীর কতকটা স্বাধীন মত ছিল—সেই জন্যই 'অহল্যা দ্রৌপদী' ইত্যাদি শ্লোক থাকিলেও আমরা তাঁহাকে সতীত্বের জন্য বড় মন খুলিয়া ভক্তি করিতে প্রস্তুত নহি। আর সীতার কি না স্বাধীনতা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল, তাই তাঁহার নাম শুনিবা মাত্রই আমাদের অন্তরাত্মা যেন গলিয়া আইসে।

৮ম তর্কে উত্থাপিত অনিষ্ট নিবারণার্থ বাল্যবিবাহ রহিত করার ফল কিছু মাত্র নাই। বরং তজ্জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা কর।

৯ম তর্ক। বাল-স্ত্রী প্রসূত সন্তান রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হয় ইত্যাদি।

আমাদের দেশের পশু পক্ষী গুলির সন্তান, বৃক্ষ লতাদির ফলও অতি অল্পবয়সে হইতে দেখা যায়। এবং সে গুলিও প্রায়ই কৃশকায় ও অপূর্ণ। কেনা দেখিয়াছে তিন বছরের নারিকেলের গাছে বেশ গুটী ধরে, কিন্তু ফলে পরিণত না হইতে হইতেই শুকাইয়া যায়। এরূপ হওয়ার কারণ কি? আমাদের পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদির মধ্যেও কি বাল্যবিবাহ প্রবেশ করিয়াছে? বস্তুতঃ আমাদের দেশে অল্প বয়সে সন্তান হওয়া ও সন্তান ক্ষীণকায় হওয়ার বাল্য বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য কারণও থাকা সম্ভব। * আর বাল্যবিবাহের এ সম্বন্ধে কোন দোষ থাকিলেও দোষের গুরুত্ব এত অধিক নহে যে তজ্জন্য বাল্যবিবাহ একেবারে রহিত করা উচিত। †

আমাদের দেশের লোককে সবল ও পূর্ণকায় করিতে ইচ্ছা হইলে বিবাহের ক্ষেত্রের আয়তন বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা কর। যাহাতে অন্তর্জাতিক বিবাহ (inter marriage) প্রচলিত হয় তজ্জন্য যত্নবান হও। আর বিবাহের ক্ষেত্রের আয়তন বর্দ্ধিত হইলে এখন অনেক সময় দায়ে ঠেকিয়া যে সমুদায় নিন্দনীয় বাল্য বিবাহ ঘটিয়া থাকে তাহার সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। বাল্য বিবাহ রহিত করিয়া বিবাহের সম্বন্ধে নূতন একটী অধীনতা সৃষ্টি করা অপেক্ষা বিবাহের স্বাধীনতা আর একটু বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা কর। অধীনতা শৃঙ্খল পরা অপেক্ষা স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হও। তাহা হইলেই লোকে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিজের ইষ্ট খুঁজিয়া লইতে যত্নবান হইবে এবং ক্ষেত্র বিস্তৃত থাকায় অনেক পরিমাণে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবে।

১০ম তর্ক। বাল্যবিবাহে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

---

* সম্ভব থাকিলেও বাল্যবিবাহ না হইলে বাল্যকালে সন্তান জন্মিবার আর আশঙ্কা থাকে না।

† ইহা হইতে বাল্যবিবাহের দোষের আর কি অধিক গুরুত্ব হইতে পারে বুঝিতে পারি না। ভাং সং

এ তর্কটী বস্তুতঃ বড় ঠিক নহে। এ বিষয়ে স্বভাব একটী সুন্দর উপায় দ্বারা নিজের প্রভাব বজায় রাখেন। দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে যে স্ত্রীর অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় তাহার কোন দুই সন্তানের বয়সের ব্যবধান, যে স্ত্রীর দীর্ঘ বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় তাহার কোন দুই সন্তানের বয়সের ব্যবধান অপেক্ষা দীর্ঘ। আবার যে স্ত্রীর অধিক বয়সে সন্তান হয় সে যত বয়স পর্য্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষম, যে স্ত্রীর অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় সে তত বয়স পর্য্যন্ত সন্তানোৎপাদনে সক্ষম নহে। এইরূপে বাল্যবিবাহিতা স্ত্রী ও যৌবনে বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান সংখ্যা প্রায় গড়ে সমান। এই জন্যই আমাদের দেশের মহিলাগণের প্রসূত সন্তানের সংখ্যা গড়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশীয় মহিলাগণের প্রসূত সন্তানের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক নহে। আমাদের দেশে অল্প বয়স্ক সন্তানের মৃত্যু সংখ্যা কিছু অধিক দৃষ্ট হয়। তাহাতেও লোক সংখ্যার বৃদ্ধি সংযত হয়। অনেকে বলেন এরূপ মৃত্যুর আধিক্যের কারণ বাল্য বিবাহ। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বাল-স্ত্রীর অল্প বয়সে প্রসূত সন্তানদ্বয়ের বয়সের ব্যবধান হইতে যুবতী স্ত্রীর প্রসূত সন্তানদ্বয়ের বয়সের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর হওয়ায় উভয়ের সন্তানই, প্রায় একরূপ সবল ও সুস্থকায় দৃষ্ট হয়। এজন্য বোধ হয় আমাদের দেশে শৈশব মৃত্যুর আধিক্যের বাল্য-বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য কারণ আছে। যাহা হউক এ বিষয়ে বাল্য বিবাহের কোন বিশেষ দোষ থাকিলেও যাহাতে অল্পবয়সে সন্তান না হয় তদ্রূপ চেষ্টা করিলেই সে দোষ নিরাকৃত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকার দুইখণ্ডে প্রকাশ করিলে বিষয়টী সম্যক্‌রূপে আলোচনা হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য সমুদায় বিষয়ই আমাকে সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে আইন দ্বারা বাল্য-বিবাহ রহিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট না করিয়া যাহাতে যৌবন বয়সে রমণীগণের বিবাহে কোন সামাজিক দোষ না থাকে, ও যাহাতে অসমবর্ণ ও অসমজাতি বিবাহ দেশে প্রচলিত হইতে পারে তৎবিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আর বাল্য-বিবাহের দোষগুলি যাহাতে সাধারণে বেশ বুঝিতে পারে তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে অবস্থানুসারে যে যেরূপ সুবিধা বিবেচনা করিবে সে তদনুসারে বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে। অনেকে হয়ত বাল্য-বিবাহের দোষটুকু ত্যাগ করিয়া তাহার গুণটুকু গ্রহণ করিয়াও বাল্য বিবাহ করিতে সক্ষম হইতে পারে।

ইদানীং আমাদের দেশে ইউরোপীয়দের দেখাদেখি এক সম্প্রদায় লোক আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাহাদের সংখ্যাও বিরল নহে তাঁহারা স্বাধীন বিবাহেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা স্বাধীন প্রণয় Free love প্রচলিত করিতে যত্নবান। তাঁহারা বলেন সভ্য সমাজে স্বাধান প্রণয়ই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর। তাঁহাদের পক্ষ হইয়া বলিতে গেলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিয়া যৌবন বিবাহ প্রচলিত

করাই শ্রেয়। কারণ একটু অনুধাবণ করিলেই বুঝা যাইবে যৌবন বিবাহ প্রচলিত হইলে স্বাধীন প্রণয় শীঘ্রই প্রচলিত হওয়ার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীরসিকলাল সেন।

সমস্যা।

আজকাল প্রায় এমন দেখা যায় অনেক বিষয়ে অনেক রকম মত উঠিয়াছে, কিন্তু কাজের সঙ্গে তাহার মিল হয় না। এমনও দেখা যায় অল্প বয়সে যাঁহারা পরমোৎসাহে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সমাজের পরিবর্ত্তন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে তাঁহারাই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া শান্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অনেকে ইহার কারণ এমন বলেন যে বাঙ্গালীদের কোন মতের বা কাজের উপরে যথার্থ অকৃত্রিম সুগভীর অনুরাগ নাই—মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হৃদয়ের যতটা বলের আবশ্যক তাহা নাই। একথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা নহে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ জুটিয়াছে।

সমাজ যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় তখন মানুষ সবলে কাজ করিতে পারে না, যখন ডান পা একটি গর্ত্তের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া বাঁ পা কোথায় রাখিব ভাবিয়া পাওয়া যায় না তখন দ্রুতবেগে চলা অসম্ভব। কিম্বা যখন মাথা টলমল করিতেছে কিন্তু পা শক্ত আছে, অথবা মাথার ঠিক আছে কিন্তু পায়ের ঠিকানা নাই—তখন যদি চলিবার বিশেষ ব্যাঘাত হয় তবে জমির দোষ দেওয়া যায় না। আমরা বঙ্গসমাজ নামক যে মাকড়সার জালে মাছির ন্যায় বাস করিতেছি, এখানে আমাদের আস্‌মানগামী মতের ডানা দুটো খোলসা আছে বটে কিন্তু ছটা পা জড়াইয়া গেছে। ডানা-আস্ফালন যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু উড়িবার কোন সুবিধা হইতেছে না। এখানে ডানা দুটো কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়াছে।

যেটা ভাল বলিয়া জানিলাম সেটা ভাল রকম হইয়া উঠে না—জ্ঞানের উপর বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে যে কাজ আরম্ভ করিলাম পদে পদে তাহার উল্টা উৎপত্তি হইতে লাগিল সে কাজে আর গা লাগে না।

আমাদের সমাজ যে উত্তরোত্তর জটিল সমস্যা হইয়া উঠিতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কেহ বলিতেছে বিধবাবিবাহ

ভাল কেহ বলিতেছে মন্দ, কেহ বলিতেছে বাল্য-বিবাহ উচিত কেহ বলিতেছে অনুচিত, কেহ বলে পরিবারের একান্নবর্ত্তিতা উঠিয়া গেলে দেশের মঙ্গল কেহ বলে অমঙ্গল, আসল কথা, ভাল কি মন্দ কোনটাই বলা যায় না—কোথাও বা ভাল কোথাও বা মন্দ।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ যে এতটা ঘোলাইয়া গিয়াছে তাহার গুরুতর কারণ আছে। প্রাচীনকালে স্ত্রী পুরুষ বা সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ন্যূনাধিক্য ছিল বটে কিন্তু শিক্ষার সাম্য ছিল। সকলেরই বিশ্বাস, লক্ষ্য, আকাঙ্খা, রুচি, ভাব এক প্রকারের ছিল। সমাজ-সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের উঁচু-নীচু অবশ্যই ছিল কিন্তু তেলে জলের মত একটা পদার্থ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে যে বিভিন্নতা ছিল তাহার ভিতরেও জাতীয়ভাবের একটি ঐক্য ছিল, সুতরাং এরূপ সমাজে জটিলতার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে সমাজ সবল ছিল কি দুর্ব্বল ছিল, কর্ম্মঠ ছিল কি অলস ছিল, সে কথা হইতেছে না, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য ছিল অর্থাৎ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল; কিন্তু এখন সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গেছে। সেই জন্য বাঁ কাণ এক শোনে ডান কাণ আর শোনে, তুমি মাথা নাড়িতে চাহিলে, তোমার দুই পায়ের দুই বুড় আঙ্গুল নড়িয়া উঠিল, এক করিতে আর হয়।

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিজাতীয় প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে, উচ্চ নীচের মধ্যে, প্রাচীন নবীনের মধ্যে অর্থাৎ বাপে বেটায় এক প্রকার জাতি ভেদ হইয়াছে! যেখানে জাতিভেদ আছে অথচ নাই, সেখানে কোন কিছুর হিসাব ঠিক থাকে না। দুই বৃক্ষ দুই দিকে যদি মুখ করিয়া থাকে তাহাতে উদ্ভিদরাজ্যের কোন ক্ষতি হয় না—কিন্তু যেখানে ডালের সঙ্গে গুঁড়ির, আগার সঙ্গে গোড়ার মিল হয় না সেখানে ফুলের প্রত্যাশা করিতে গেলে আকাশ-কুসুম পাওয়া যায় এবং ফলের প্রত্যাশা করিতে গেলে কদলীও মিলে না।

আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না, তাহা হইলে আঁঠিতে খোসাতে এত মনান্তর, মতান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না। কিন্তু হিন্দুসমাজের শাখা হইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজকে বল পূর্ব্বক পাকান হইতেছে। ইহার একটা আশু উপকার এই দেখা যায় অতি শীঘ্রই পাক ধরে, গাছে পাঁচ দিনে যাহা হয় এই উপায়ে একদিনেই তাহা হয়। বঙ্গসমাজেও তাহাই হইতেছে। বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরাজী সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশটুকুর সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না। এরূপ ফলের মধ্যে সহজ নিয়ম আর খাটে না।

পুরুষদের মধ্যে ইংরাজিশিক্ষা ব্যাপ্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হয় নাই। শিক্ষার প্রভাবে পুরুষেরা স্থির করিয়াছেন বাল্য-বিবাহ দেশের পক্ষে অমঙ্গল জনক—ইহাতে সন্তান দুর্ব্বল হয়, অল্প বয়সে বহু-

পরিবারের ভারে সংসার সাগরের অশ্রুপূর্ণ লোনাজলে হাবুডুবু খাইতে হয় ইত্যাদি। এই শিক্ষার গুণে তাঁহারা আত্মসংযম পূর্ব্বক নিজের ও দেশের দূর মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিবার পক্ষে উপযোগী হন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এরূপ শিক্ষা পান নাই এবং অধিক বয়সে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুতও হন নাই। তাঁহারা অন্তঃপুরের পুরাতন প্রথার মধ্যে, ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের চিরন্তন উপহাস বিদ্রূপের মধ্যে, বিবাহ প্রভৃতি গৃহ কর্ম্মের নানা বিধ আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আশৈশব লালিত পালিত হইয়াছেন। আপিষের অন্নের ন্যায় প্রত্যুষেই তাঁহাদিগকে খরতাপে চড়ান' হইয়াছে, এবং ক্রমাগত গরম মসলা পড়িতেছে--চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ,বড় জোর সাড়ে দশের আগেই রীতিমত 'ক'নে' আকারে তাঁহাদিগকে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের বাল্যবিবাহ আবশ্যক। কিন্তু পুরুষেরা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে মেয়েদের বর শীঘ্র জুটিবে না—তাঁহাদিগকে দায়ে পড়িয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অধিক বয়স্ক পুরুষেরা নিতান্ত অল্প বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মতও হইবেন না। অথচ বহু দিন অপেক্ষা করিবার মত অবস্থা ও শিক্ষা নহে—বিশেষতঃ প্রাচীনারা কন্যার বিবাহে বিলম্ব দেখিয়া বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে রীতিমত আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে বলিবেন স্ত্রীশিক্ষাও ত প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সে কি আর শিক্ষা? গোটা দুই ইংরাজি প্রাইমার গিলিয়া, এমন কি এণ্ট্রেন্সের পড়া পড়িয়াও কি কঠোর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের শক্তি জন্মে? শত শত বৎসরের পুরুষানুক্রমবাহী সংস্কারের উপরে মাথা তুলিয়া উঠা অল্প শিক্ষা ও অল্প বলের কাজ নহে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া ও অন্তঃপুরের চিরন্তন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন-হওয়া এখন অনেক দিনের কথা। অথচ বাল্য বিবাহের প্রতি বিদ্বেষ আজই জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন কি করা যায়?

একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছি অথচ বাল্য বিবাহ উঠাইতে চাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অধিক বয়স্ক নূতন লোক প্রবেশ করিতে পারে না। চরিত্র গঠনের পূর্ব্বেই উক্ত পরিবারের সহিত লিপ্ত হওয়া চাই, নতুবা সেই নূতন লোক অচর্ব্বিত কঠিন খাদ্যের ন্যায় পরিবারের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে।

এই যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া গেল তেমনি আরেক শ্রেণীর আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ইংরাজি শিক্ষা-সত্ত্বেও কেহ কেহ এমন বিবেচনা করেন যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। বিধবাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকার অপেক্ষা মহত্ব আর কি হইতে পারে? ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটি পবিত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যখন আজন্মকালের শিক্ষা ও উদাহরণের প্রভাবে বঙ্গনারী স্বামীকে দেবতা

জ্ঞান করিত—স্বামীকেই স্ত্রীলোকের চরম-গতি, পরম-মুক্তির কারণ বলিয়া জানিত, তখন বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা স্বাভাবিক ছিল, এবং না করা দুষ্য ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা, সে উদাহরণ, সে ভাব চলিয়া যাইতেছে, তবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কিসের বলে দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া কেবল একটা বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করার কোন ফল নাই, তাহার আভ্যন্তরিক ভাবেই তাহার মহত্ব। এককালে আমাদের সমাজ ভক্তি ও স্নেহের সূত্রেই গাঁথা ছিল। তখন পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, সমস্ত স্নেহাস্পদেরা সমস্ত গুরুজনদের অসীম ভক্তি করিত। সমাজের সে অবস্থায় স্ত্রীও স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত। সমাজের সমস্ত সুর এক হইয়া মিলিত। এখন স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ একাকার হইয়া আসিতেছে। এখন বড় ভাইকে ছোট ভাই, গুরুজনদিগকে স্নেহাস্পদেরা, এমন কি, পিতাকে পুত্র তেমন ভাবে দেখে না, তেমন করিয়া মানে না—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সংক্রামক ভাব যদি সমাজের সর্ব্বত্রই আক্রমণ করিয়া থাকে তবে কি কেবল পতি-পত্নীর সম্পর্কই ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে? তাহাদের মধ্যেও কি সাম্যভাব প্রবেশ করে নাই অথবা দ্রুতবেগে করিতেছে না? চারিদিকের উদাহরণে এই ভক্তির অভাব কি মন হইতে শিথিল হইয়া যায় নাই। আগেকার বউরা শ্বাশুড়িকে যেরূপ মান্য করিত এখনকার বউরা কি তেমন মান্য করে? শ্বাশুড়ির প্রতি যে কারণে ভক্তির লাঘব হইয়াছে সেই কারণেই কি স্বামীর প্রতিও ভক্তির লাঘব হয় নাই? তবে কিরূপে আশা করা যায় পূর্ব্বে যেরূপ অচলা নিষ্ঠার সহিত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন এখনও তাঁহারা সেইরূপ পারিবেন? এখন বলপূর্ব্বক সেই বাহ্য অনুষ্ঠান অলবম্বন করাইলে কি সমাজে উত্তরোত্তর গুরুতর অধর্ম্মাচরণ প্রবেশ করিয়া দারুণ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিবে না?

বিধবা-বিবাহের সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। আমাদের সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূল শিথিল হইয়া আসিতেছে। গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি ও আত্মমত বিসর্জ্জনই একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠাস্থল। এখন সাম্যনীতি সমাজে বন্যার মত আসিয়াছে, কোঠা বাড়ি হইতে কঞ্চির বেড়া পর্য্যন্ত উঁচু জিনিষ যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষাও যত বাড়িতেছে মতভেদও তত বাড়িতেছে। দুই সহোদর ভ্রাতার জীবন যাত্রার প্রণালীও মতে মিলে না, তবে আর বেশী দিন একত্র থাকা সম্ভবে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া গেলে স্বামীর মৃত্যুর পর একাকিনী বিধবা কাহাকে আশ্রয় করিবে? বিশেষতঃ তাহার যদি ছোট ছোট দুই একটি ছেলে থাকে তবে তাহাদের পড়ান শুনান রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে? আজ কাল যেরূপ অবস্থা ও সমাজ যে দিকে যাইতেছে তাহারই উপযোগী পরিবর্ত্তন ও শিক্ষা হওয়া কি উচিত নয়।

কিন্তু যতদিন একান্নবর্ত্তিত্ব একেবারে না ভাঙ্গিয়া যায় তত দিনই বা বিধবাবিবাহ সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে কি করিয়া? স্বামী ব্যতীত শ্বশুরালয়ের আর কাহারও সহিত যাহার তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না সে রমণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ের সহিত একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে তাহাতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারে শ্বশুরালয়ে স্বামী ছাড়াও কত শত বন্ধন! অতএব স্বামীর মৃত্যুতেই শ্বশুরালয় হইতে ধর্ম্মতঃ মুক্তি লাভ করা যায় না। এত দিন যাহাদের সহিত রোগে শোকে বিপদে উৎসবে অনুষ্ঠানে সুখ দুঃখের আদান প্রদান চলিয়া আসিয়াছে, যাহাদের গৌরব ও কলঙ্ক তোমার নিকট কিছুই গোপন নাই, যেখানকার শিশুরা তোমার স্নেহের উপরে নির্ভর করে, সমবয়স্কেরা তোমার মমতা ও সান্ত্বনার উপর নির্ভর করে, গুরুজনেরা তোমার সেবার উপর নির্ভর করে, সেখান হইতে তুমি কোন ক্রমে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। তাহা হইলে ধর্ম্ম থাকে না, পরিবারে সুখশান্তি থাকে না। সমাজের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ বিধবার যদি সন্তান থাকে, তাহাদিগকে এক বংশ হইতে আর এক বংশে লইয়া গেলে পরিবারে অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়, যদি না লইয়া যাওয়া হয় তবে সন্তানেরা মাতৃহীন হইয়া থাকে।

ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকের এমন মত আছে, যে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরের বাহির করা উচিত হয় না, তাহাতে তাঁহাদের অন্তঃপুরসুলভ কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ কথায় সত্যমিথ্যা গুণাগুণ লইয়া আমি বিচার করিতে বসি নাই। পূর্ব্বেই এক প্রকার বলিয়াছি সমাজের বর্ত্তমান বিপ্লবের অবস্থায় কোন্ কাজটা সমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী কোন্‌টা নয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

বঙ্গনারীদের মুখপদ্ম যদি দুর্ভাগা সূর্য্যের তৃষিত নেত্রপথের অন্তরাল করাই অভিপ্রেত হয়, তবে, বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে তাহার কতকগুলি বাধা পড়িয়াছে, আমি তাহাই দেখাইতে চাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে। প্রাচীন কালে দেশ বিদেশে যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না—ব্যয় অধিক এবং পথে বিপদও অনেক ছিল। এই জন্য তখনকার রীতি ছিল "পথে নারী বিবর্জ্জিতা।" এই জন্য পুরাকালের পথিকগণের বধূজন বিলাপে কাব্য প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেলের প্রসাদে পথ সুগম হইয়াছে, পথে বিপদও নাই। দেশে বিদেশে বাঙ্গালীদের কাজ কর্ম্ম হইতেছে। যখন পথ সুগম, ব্যয় অল্প, কোন বিপদ নাই, তখন স্ত্রী পুত্রের বিরহ কাহারও সহ্য হয় না। কিন্তু রেলের এক-একটি গাড়ি একলা অধিকার করিতে পারেন এমন সঙ্গতিও অল্প লোকের আছে। এই জন্য আজ কাল প্রায় দেখা যায় পরপুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের পরিবার রেলগাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উত্তরোত্তর

এরূপ উদাহরণ আরও বাড়িতে থাকিবে। ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। নিয়মের গ্রন্থি দুই চারিবার খুলিয়া ফেলিলেই তাহা শিথিল হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনভ্যাসের সঙ্কোচ যত গুরুতর, নিয়মের আঁটাআঁটি তত গুরুতর নহে। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার অনভ্যাস যদি অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া যায় তাহা হইলে সমাজ নিয়মের বাধা আর বড় কাজে লাগে না। আর একটা দেখিতে হয়—পূর্ব্বে অবরোধপ্রথা সর্ব্ববাদীসম্মত ছিল সুতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন কেহ বা বাহিরে যান কেহ বা যান না। যাঁহারা না যান তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে নানা গল্প শুনিতে পান, নানা উদাহরণ দেখিতে পান। সুতরাং স্বভাবতই বাহিরে যাওয়া মাত্রই তাঁহাদের তেমন বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয় না, এমন কি বাহিরে যাইতে অনেক কারণে তাঁহাদের কৌতূহলও জন্মে। কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবারকার একৃজিবিশনে যত পুরনারী সমাগম হইয়াছিল, বিশবৎসর পূর্ব্বে ইহার শিকি হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সমাজের পরিবর্ত্তনের প্রবলপ্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভান করা বৃথা। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েরা সেই বাহির হইবেই—তবে অপ্রস্তুত ভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। অনেক ভদ্র পুরনারী রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রকাশ্যস্থানে যাত্রা করেন অথচ তাঁহাদের বেশভূষা অতিশয় লজ্জাজনক। অন্তঃপুরের প্রাচীর যখন আবরণের কাজ করে তখন যাহা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ্য রক্ষা কর আর না কর সে তোমার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাজের মুখ চাহিয়া লজ্জারক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—রীতিমত ভদ্রবেশ পরিতে হইবে। পুরুষদের ভদ্র বেশ পরিতে হইবে অথচ মেয়েদের পরিতে হইবে না ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখে? ভদ্র পুরুষরা যখন জামা না পরিয়া বাহির হইতে বা ভদ্রসমাজে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, তখন ভদ্র স্ত্রীরা কি করিয়া শুদ্ধমাত্র একখানি বহু যত্নে সম্বরণীয় সাড়ি পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইবেন! আজকাল এরূপ রীতিগর্হিত ব্যাপার যে ঘটিতেছে তাহার কারণ অভিভাবকদের এ বিষয়ে মতের স্থৈর্য্য নাই, একটা হিজিবিজি কাণ্ড হইতেছে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনা তাঁহাদের মতও নয় অথচ আনিতেও হইবে—এই জন্য অত্যন্ত অশোভন ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ ভাবে বাহির করিলে তাঁহাদের অপমান করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া পুরস্ত্রীদিগকে যদি ভদ্রবেশ পরান' অভ্যাস করাও, তবে তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিতে পার—নতুবা উচকা মত বা উপস্থিত সুবিধার খাতিরে এরূপ ভদ্রজননিন্দনীয় ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিলে সমস্ত ভদ্র বঙ্গ-সমাজকে বিষম লজ্জায় ফেলা হয়।

এক দল লোক আছেন তাঁহারা আধা-আধি রকম সমাজ সংস্কার করিতে চান। ভারতীর পঞ্চম খণ্ডে "একচোখো সংস্কার" নামক প্রবন্ধে তাঁহাদের সংস্কার কার্য্যের বিষয়ে বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধে লিখিত একটি উদাহরণের পুনরুল্লেখ করা যাক। অনেকে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী নহেন, অথবা সমাজশাসন লঙ্ঘন করিয়া বিধবা বিবাহ দিতে অপারক, কিন্তু বৈধব্য ব্রতাচরণে যে সকল কঠোর নিয়ম আছে সে সকল তাঁহারা দূর করিতে চান। স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনরায় বিবাহ করিলে পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এবিষয়ে তাঁহাদের সংশয় নাই কিন্তু পৃথিবীর সুখ হইতে বিধবাদিগকে বঞ্চিত করা তাঁহারা নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করেন। তাঁহারা নিজের পরিবারেও হয়ত এই মত কিয়দংশে প্রচলিত করেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় বিধবাদিগকে পৃথিবীর সুখে মগ্ন করিয়া রাখাই প্রকৃত নিষ্ঠুরতা। যদি বিধবাদিগকে বিধবা রাখাই শ্রেয় জ্ঞান কর তবে তাহার কঠোর উপায়গুলিও অবলম্বন কর। বিধবাদিগকে অকারণে পীড়ন করিয়া কেবল মাত্র দানব সুখ লাভ করিবার জন্য সমাজ নিষ্ঠুর খেয়াল অনুসারে এই সকল কঠোর নিয়মের সৃষ্টি করে নাই। বৈধব্য-ব্রত রক্ষার পক্ষে উপযোগী বলিয়াই অগত্যা এই সকল কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়াছে। অতএব একটাকে ছাড়িয়া আর একটা রাখিতে গেলে ঘাড়কে ছাঁটিয়া মাথা রাখিতে গেলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। একটি উদাহরণ দিলাম,কিন্তু এমন অনেক বিষয়েই প্রাচীন সমাজনিয়মের সহিত রফা করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিতে গিয়া সমাজের নানাদিকে জটিলতা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে।

এমন জটিল সমস্যার মধ্যে বাস করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামির কার্য্য। যদি কোন সম্প্রদায় এমন আইন জারি করেন, তাঁহাদের দলের সমুদয় লোককেই অবস্থা নির্ব্বিচারে বাল্যবিবাহ পরিহার করিতেই হইবে, বিধবা বিবাহ দিতেই হইবে, অবরোধপ্রথা ভাঙ্গিতেই হইবে, তবে তাহাতে সমাজের অপকার হইতে পারে। মূল ধর্ম্মনীতি সমূহের ন্যায় সমাজ-নীতি সকল অবস্থায় সকল লোকের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে। পরিবার বিশেষে বাল্য-বিবাহ উঠিয়া গেলেও হানি নাই, কিন্তু সকল পরিবারেই একথা খাটে না। পরিবার বিশেষে বিধবাবিবাহ হইবার সুবিধা আছে কিন্তু সকল পরিবারে নাই। স্ত্রীবিশেষ স্বাধীনতার উপযোগী কিন্তু সকল স্ত্রী নহে। যাঁহারা বলপূর্ব্বক সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিতে চান, তাঁহারা যতই স্ফীত হউন না কেন তাঁহাদিগকে সমাজের গাত্রে একটি সুমহৎ ক্ষত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সকল অবস্থাতেই আইন পূর্ব্বক বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। অবস্থা নির্ব্বিচারে বিবাহ-র্থিনী

বিধবা মাত্রেরই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্যজনক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয়-সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়। অতএব এই সকল সমস্যার প্রতি মনোযোগ করিয়া এক প্রকার গোঁয়ারতমি গোঁড়ামি পরিত্যাগ কর। শান্ত সংযতভাবে সমাজ সংস্কারের প্রতি মন দাও। বাঁধন ছিঁড়িবার উপলক্ষে তুচ্ছতর সাম্প্রদায়িক বাঁধনে সমাজের পঙ্গু-দেহ জড়াইয়োনা।

সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

এক্ষণে আমরা পূর্ব্বের প্রশ্নে ফিরিয়া আসি—সমাজে সামাজিক শাসনেরই বা কোন কোন বিষয়ে আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই বা কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য থাকা উচিত?

কেহ যদি রাস্তার মধ্যে কোন একজন মাননীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অপমান করিয়া কথা বলে অথবা কোন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রহার করে, তাহা হইলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকে তাহাকে কি বলিবে? সে সকল লোকের যদি একটুও মনুষ্যত্ব থাকে তবে তাহারা উক্ত ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করিবে অথবা অন্য প্রকারে দণ্ড দিবে। কোন প্রধান কর্ম্মচারী যদি তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি গর্ব্বিত ব্যবহার করেন কিম্বা অনুচিত কর্কশতা দেখান তবে সমাজের লোকে তাঁহাকে কি বলিবে? তাঁহার নিন্দা করিবে, তাঁহাকে মর্য্যাদানুযায়ী আদর করিবে না। কোন ব্যক্তি যদি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে লোকে তাহাকে কি করিবে? তাহাকে বিশ্বাস করিবে না তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইবে। কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীলোকের প্রতি যথোচিত সম্মান না দেখায় কিম্বা কোন স্ত্রীলোক যদি তাহার স্বাভাবিক মর্য্যাদা রাখিয়া না চলে তবে সমাজে সে ব্যক্তিকে বা সে স্ত্রীলোককে কি করিবে? সভ্য সমাজে সুশিক্ষিত সমাজে সে ব্যক্তি কিম্বা সে স্ত্রীলোক নিন্দার পাত্র হইবে। এই সকল উদাহরণ হইতে একটী এই সাধারণ নিয়ম স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যেরূপ কার্য্যে সমাজের অমঙ্গল হইতে পারে আর যেরূপ কার্য্যে সমাজের আপাতত অমঙ্গল না হইলেও সমাজে সুনীতির শাসন শিথিল হইতে পারে ও তন্নিমিত্ত ভবিষ্যতে অমঙ্গল সম্ভাবনা, সামাজিক শাসন দ্বারাই সেরূপ কার্য্যের দণ্ড বিধান হয়। আমরা যদি সকল পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলেও সামাজিক শাসনের প্রয়োগ সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম ভিন্ন আর কোন নিয়ম যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। যে কার্য্যদ্বারা সমাজের অমঙ্গল হইতে পারে অথবা সমাজের মধ্যে

সুনীতির বন্ধন শিথিল হইতে পারে, আইন দ্বারা সে কার্য্যের নিরাকরণ করা কঠিন হইলে কিম্বা পরামর্শ যোগ্য না হইলে সামাজিক শাসন দ্বারা তাহার নিরাকরণ হওয়া আবশ্যক। এইত দেখিলাম সামাজিক শাসনের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিয়ম, এখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন নিয়ম আছে কি না? আমি যদি রাত্রে আমার সমুদয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া দিনমানের অধিকাংশ সময় নিদ্রা যাই তবে লোকে আমায় কি বলিবে? লোকে যদি আমায় সচ্চরিত্র বলিয়া জানে, তবে আমাকে বিশেষ কিছুই বলিবে না। আমি দেখি যে অন্য লোকের মস্তকের কেশ দীর্ঘ হইলে তাহার কতক অংশ কাটিয়া ফেলে, কিন্তু আমি যদি তাহা না করি আমি দীর্ঘ কেশ ধারণ করি, লোকে তাহা হইলে কি আমার নিন্দা করিবে? বোধ হয় না, আমাকে একটু অসাধারণ বলিয়া মনে করিবে মাত্র। আমি যদি আমার ভৃত্যকে আমার অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিতে দিই, আমি যদি আমার পালিত কুকুরকে উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, উৎকৃষ্ট বসন, উৎকৃষ্ট শয্যা দিই সমাজ কি তাহা হইলে আমায় সেরূপ কার্য্যে বাধা দিবে? কখনই না। তুমি যদি তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর আর অপর অর্দ্ধ দ্বারা সাধারণের কোন উপকার কর, সাধারণের ব্যবহারে আসিতে পারে এমন একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেও, সমাজে তাহা হইলে তুমি প্রশংসার পাত্র হইবে না নিন্দার পাত্র হইবে? অবশ্য প্রশংসার পাত্র। এই সকল উদাহরণ হইতে আমরা এই নিয়ম বাহির করিতে পারি;—যেরূপ কার্য্যের ফলাফল * কেবল তাহার কর্ত্তারই ভোগ করিতে হইবে যেরূপ কার্য্যে সমাজের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, সে রূপ কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা উচিত। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্বন্ধেও এই নিয়মে আসিয়া উপস্থিত হই। সামাজিক শাসনের উদ্দেশ্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সুখ সাধন করা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় সুখ সাধন করা। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের যদি সুখ সাধন হয় তবে তাহা হইলে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সে সুখের কিছু অংশ পাওয়ার সম্ভাবনা—আবার সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি অন্যের ক্ষতি না করিয়া স্বস্ব সুখ অন্বেষণ করে, তবে সমাজস্থ সমুদয় ব্যক্তির সুখী হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যখনি সমাজ এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে আসে—যখনি এই অনধিকার চর্চ্চায় প্রবেশ করে—তখনি আপনার অমঙ্গল কুড়াইয়া আনে, তবে সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে যখন অতি গূঢ় নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে তখন সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ

* এস্থলে 'কেবল' কথাটী স্থূলঅর্থে বুঝিতে হইবে। সূক্ষ্ম বিবেচনায় মনুষ্য এমন কোন কার্য্য করিতে পারে না যাহার তরঙ্গ সমাজের অন্য কোন ব্যক্তিকে যাইয়া লাগিবে না।

ভাব উপস্থিত হইলে মঙ্গল সম্ভাবনা নাই, অতএব এই দুয়ের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ঐক্য রাখিয়া আমাদের চলা আবশ্যক আর সে নিমিত্ত যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আধিপত্য কিছু সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে তাহাও ভাল। যেমন যদি এরূপ দেখা যায় যে সমাজের কোন একটী বিশেষ শুভ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘ কেশ ধারণ করা আবশ্যক তাহা হইলে যাহাদিগের দীর্ঘ কেশ ধারণ করিতে অনিচ্ছা হয়, তাহাদিগেরও সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত সে অনিচ্ছা দমন করা উচিত। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সামাজিক শাসন ন্যায্যপথে চলিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া চলিবে। গৃহস্বামী যতক্ষণ তাঁহার মর্য্যাদা রাখিয়া চলেন ততক্ষণ গৃহস্থিত পরিজন বর্গ তাঁহার সম্মান করে, রাজা যতক্ষণ প্রজার হিতকামনায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, প্রজারা ততক্ষণ তাঁহাকে ভক্তি করে, সূর্য্য যতক্ষণ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে ততক্ষণই পৃথিবী তাহার চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিবে, যে মুহূর্ত্তে সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতে নিরস্ত হইবে সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবী সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত আকাশে অনন্তপথে ধাবমান হইবে। সেইরূপ যতক্ষণ সামাজিকশাসন তাহার ন্যায্য পথে চলিবে, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্খায় কার্য্য করিবে, ততক্ষণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার সহিত মিত্রতা রাখিবে—আর যে দণ্ডে যেক্ষণে সামাজিক শাসন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিবে সে দণ্ডে সেক্ষণে উহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে। যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ সম্প্রদায় তাহার স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে সামাজিক শাসনের সাহায্যে সমাজে কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করে, তখন সমাজস্থ প্রত্যেক মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মনুষ্যই সে নিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন।

অন্যায় সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন—যখন কোন স্বার্থপর ব্যক্তি কিম্বা সম্প্রদায় সামাজিক শাসনকে কুপথে চালায় তখনই যে কেবল সামাজিক শাসন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অশ্রদ্ধার পাত্র হয়, এমত নহে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে সমাজের পূর্ব্বের কোন অবস্থায় কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল তখন সে নিয়মগুলি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকরই ছিল—এখন অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন সে সব নিয়মে সমাজের অপকার ভিন্ন উপকার হয় না, অথচ দীর্ঘ অভ্যাসের এমনই প্রভাব যে সে সকল নিয়ম এখনও সমাজের মনোরঞ্জন করিতেছে। এখনও সামাজিক শাসন সে সকল নিয়মের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। এরূপ স্থানেও সামাজিক শাসন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে। কিন্তু যে স্থলে সামাজিক শাসন সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অপ্রিয় পাত্র হইয়া পড়িয়াছে, সে স্থলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

সংগ্রাম করা সহজ—আর যেস্থলে সামাজিক শাসন সমাজের অপকারী হইয়াও তাহার হৃদয়মনে আধিপত্য করিতেছে সেস্থলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। এরূপ সত্বেও মনুষ্যত্বের অনুরোধে অপকারী সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ পাওয়া অতিশয় আবশ্যক। কুসংস্কারাপন্ন সমাজে পুরাতন অনুপযোগী পন্থার পরিবর্ত্তে নূতন উপযোগী পন্থা প্রবর্ত্তিত করা সহজ নহে, কিন্তু তাহা হইলেও অন্ততঃ কেবল একটী আদর্শ দণ্ডায়মান করিবার উদ্দেশে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রাজ্য বিস্তার করিতেই হইবে,—নহিলে সে দেশের কখন উন্নতি হইতে পারে না।

প্রবন্ধটির আয়তন বড় বাড়িয়া পড়িয়াছে, যাহা হউক প্রবন্ধটি শেষ করিবার আগে, সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই দুয়ের মধ্যে পরিণামে কি সম্বন্ধ দাঁড়াইতে পারে এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হার্বর্ট স্পেন্সরের মতটি বলিয়া লই। তিনি বলেন যে কালক্রমে সমাজের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে যে তাহার নিজের কার্য্যক্ষেত্র অতিক্রমনা করিয়া যে সকল বাসনা সফল করা যাইতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই সকল ভিন্ন অন্য কোন বাসনা থাকিবে না, আর কার্য্যের যে সকল প্রতিবন্ধক প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মান্য করিয়া চলিবে সে সকল ভিন্ন সমাজে অন্য কোন প্রতিবন্ধক নিয়ম থাকিবে না। অর্থাৎ সামাজিক শাসন ও ব্যক্তি গত স্বাধীনতা এই দুয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাহা কি প্রকারে হইবে। উত্তরে আমরা তাঁহাকে বলিব যে মনুষ্য পরিবর্ত্তনশীল, মনুষ্যের শরীর ও মন এই দুয়ে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন চলিতেছে আর এই পরিবর্ত্তন দ্বারা মনুষ্য তাহার নিজের অবস্থা চতুস্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর সহিত ঐক্য করিয়া লইতেছে। দিন যায় রাত্র আইসে, মনুষ্য কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিশ্রামার্থ নিদ্রা যায়, গ্রীষ্ম যায় শীত আইসে, মনুষ্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্থূল বস্ত্র পরিধান করে, মিত্র যাইয়া শত্রু আসিল, প্রসারিত ভ্রু যুগলের পরিবর্ত্তে মনুষ্য কুঞ্চিত ভ্রু ধারণ করিল, শীত প্রধানদেশের লোকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসিল অথবা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকে শীত প্রধান দেশে আসিল, উভয়ের অভ্যাস, কার্য্যপদ্ধতি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিবর্ত্তন দেখা গেল; ধর্ম্ম গোঁড়া পিওরিটানদের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডে আমোদপ্রিয় দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব আসিল, ইংরেজরা ভণ্ডামি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার প্রিয় হইল। মুসলমান রাজত্বের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইল, বঙ্গবাসীগণ পারস্যভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। এই সকল উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মনুষ্য তাহার নিজের অভ্যাসসমূহকে চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর সহিত ঐক্য করিয়া লয়। যতদিন পর্য্যন্ত কোন

বিষয়ে বাহিরের অবস্থা এক থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের ভিতরের অবস্থাও, সে বিষয়ে মনুষ্যের মনের গতিও এক থাকে, বাহিরের অবস্থা পরিবর্ত্তন হউক, মনুষ্যের মনের গতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তবে কেন সময় সময় এরূপ দেখা যায় যে বাহিরের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে অথচ মনুষ্যের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে কেবল সময়ের অল্পতা বা মূর্খতা বা গোঁড়ামি বা ভণ্ডামির জন্য। কিন্তু প্রকৃতি বড় কঠিন জননী, তাহার যে সন্তান চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর সহিত স্বীয় জীবন ঐক্য করিয়া লইতে পারে সেই সন্তানই টিকিয়া থাকে আর যে সন্তান তাহা পারে না সে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সে অকালে কালকবলে পতিত হয়। মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান প্রশ্ন এই যে কি প্রকারে আমরা প্রত্যেকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সংঘর্ষণে না আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, কি প্রকারে চলিলে আমিও সুখী হইতে পারি আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণও সুখী হইতে পারে, আমরা সকলেই জ্ঞাতসারেই হউক অজ্ঞাতসারেই হউক এই প্রশ্নের মীমাংসার ব্যাপৃত রহিয়াছি, দিবারাত্র এই প্রশ্নের অনুশীলন করিতেছি। দিবারাত্র সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপনের উৎযোগ হইতেছে। সমাজ ক্রমাগত ব্যক্তির উপর আধিপত্য করিতেছে ব্যক্তিও সমাজের উপর লক্ষ্যভাবেই হউক আর অলক্ষ্য ভাবেই হউক প্রভুত্ব করিতেছে, সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। আমি তোমাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেছি, তোমরাও আবার কোন কোন বিষয়ে আমার কথা শুনিয়া চলিতেছ, আমার ইঙ্গিত অনুসারে কার্য্য করিতেছ। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অবশেষে যে সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে তাহা কেবল দর্শন শাস্ত্রের স্বপ্নমাত্র নহে।

শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
বি, এস্, সি, লণ্ডন।

উপকথা।

—*—

মেঘের আড়ালে বেলা কখন্ যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখীগুলি
গীতগান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা।

বসিয়া আঁধার ঘরে
বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা!
কভু মনে লয় হেন
এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।

উড়ন্ত মেঘের মত
ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।
রাজ পুত্র অবহেলে
কোন্ দেশে যেত চলে
কত নদী কত সিন্ধু পার!
সরোবর ঘাট আলা
মণি হাতে নাগ বালা
বসিয়া বাঁধিত কেশ ভার।
সিন্ধুতীরে কত দূরে
কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা
কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে
চাঁপা হয়ে ফুটিত রে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব
একত্রে আছিল সব
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।

বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা
না ছিল কঠিন বাধা
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসি কান্না লঘুকায়া
শরতের আলো ছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ।
আজি ফুরায়েছে বেলা,
জগতের ছেলেখেলা,
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর ত নাইরে ছুটি
মেঘ রাজ্য গেছে টুটি
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে
বাহিরে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হয়ে প্রাণপণ
করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙ্গে যায়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু-কাহিনী।

ভাই—,

তুমি আমাকে আমার বোম্বাই প্রবাসের বিবরণ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছ কিন্তু কি লিখি কোথায় আরম্ভ করি তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। প্রথমে কোন এক নূতন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে অনেক নূতন ছবি চ'খে পড়ে—নূতন ভাব মনে উদয় হয়। লোকদের চালচলন রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে এদেশের নূতনত্ব নাই—আমি এখানকার একজন প্রাচীন বাসেন্দার মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বিশ বৎসর ধরিয়া আমি এ প্রসিডেন্সিতে কাজ করিতেছি, ইহার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করিয়াছি। জন্মভূমিই যে আপনার দেশ তাহা নহে, যে প্রদেশে জীবনের অধি-

কাংশ ও সারভাগ কাটাইয়াছি, যে লোকদের মধ্যে এত কাল বাস করিয়াছি ও যাহাদের কার্য্যে আমার শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি ব্যয় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের প্রান্ত ভাগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি--সেই দেশ ও লোকদিগকে আপনার বলিয়া বরণ করাই স্বাভাবিক। আমি ত বোম্বাইকেই নিজের দেশ মনে করি—এ দেশ আমার হাড়ে মাসে জড়িত—তাই মনে হয় যেন নূতন কিছুই লিখিবার নাই, সকলি পুরাণো কথা। তবে এখানে দেখিয়া শুনিয়া আমার যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহা আগড়ম বাগড়ম বকিয়া যাইতে পারি--তা যদি তোমার ভাল লাগে।

ভাষা অনুসারে এ প্রেসিডেন্সি সামান্যতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র কর্ণাটক ও সিন্ধু দেশ। শেষ থেকে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুদেশের কথা পাড়া যাক্। সিন্ধুদেশ ব্রিটিষ রাজপরিবারের নবোঢ়া বধূ—ইহা ব্রিটিষ রাজ্যভুক্ত হইবার পর এখনো অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হয় নাই। ম্যাপে দেখিলে এ প্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মনে হয় না—পঞ্জাবের অঙ্গ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মধ্যে মধ্যে সিন্ধুদেশকে পঞ্জাবের সহিত যোগ করিবার প্রস্তাবও শুনা যায়, কিন্তু বোধ করি সিন্ধিদের তাহা ইচ্ছা নহে—তাহারা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে সুখে আছে। এ দেশের ভাষা সিন্ধি। মারাটী গুজরাতীর সঙ্গে তাহার সৌসাদৃশ্য দেখা যায়—সংস্কৃতই এ সকল ভাষার আদ্য-জননী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহার লিখন পদ্ধতি উর্দ্দু—সংস্কৃত মূলক নহে। অক্ষর অনায়াসে দেবনাগরী হইতে পারিত—সিন্ধি ভাষায় যতশব্দ আছে নাগরীতে তাহা সহজে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।—কতকগুলি অতিকঠোর শব্দ আছে তাহার মধ্যে কোন রূপ রেখা কিম্বা বিন্দুর প্রয়োজন। আমরা যেমন ড ও ড় র মধ্যে বিন্দু দিয়া প্রভেদ নির্দ্দেশ করি, কতকগুলি সিন্ধি-অক্ষর সম্বন্ধে সেইরূপ কোন সঙ্কেত ব্যবহার করিলেই হইল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, দেবনাগরীর পরিবর্ত্তে উর্দ্দু অক্ষর কেন চলিত হইল? ইহার উত্তর, সরকারের হুকুম। যখন ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করে তখন সেখানে লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল না। বণিকদের হিসাবপত্রে এক প্রকার নাগরীর অপভ্রংশ ব্যবহৃত হইত কিন্তু তা ছাড়া বর্ণাক্ষরের প্রচার ছিল না। যখন ব্রিটিস আদালত সকল স্থাপিত হইল তখন কোর্টের একটা ভাষা ঠিক করা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক হইল। এই সময়ে কোন্ এক মহাপুরুষের মনে হইল যে উর্দ্দুই উপযুক্ত অক্ষর—ক্রমে তাহাই প্রচলিত হইল। আমি যখন সিন্ধি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি তখন ভাষা শিখিতে যত না কষ্ট হউক্ তাহার লেখা অক্ষর লইয়া তাহার সহস্রগুণ গোলযোগ উপস্থিত হইত। উর্দ্দু হাতের লেখা পড়িয়া উঠা সহজ নয়—দেবনাগরী হইলে কেমন সহজে লিখিতে পড়িতে শিখিতাম। সিন্ধি শিখিবার সময় এই অক্ষর

প্রণেতার উপর কতবার আমার মনের ঝাল ঝাড়িয়াছি তাহার ঠিক নেই—মনে করিয়াছি—আঃ এই আনাড়ীর হাতে না গিয়া যদি শর্ম্মার হাতে সিন্ধি অক্ষর চালাইবার ভার থাকিত!

এখানে যত দেশ দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সিন্ধু দেশ আমার চক্ষে বিশেষ নতুন ঠেকিয়াছিল। অন্যান্য স্থান হইতে উহার ভাব গতিক অনেক ভিন্ন। প্রথমতঃ বর্ষার অভাব। নদী, নালা, খালের জল হইতেই প্রায় সমস্ত কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইন্দ্র বর্ষণ করেন না—পৃথিবীই স্বীয় নীর দিয়া তাহার অভাব পূরণ করেন। বৃষ্টি হয় না বলিয়া পাকা ঘর বাড়ি নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যক হয় না, যেমন তেমন খড় মাটীর ঘর বাসযোগ্য করিয়া নিতে পারিলেই হইল। কালে ভদ্রে যদি কখন ইন্দ্রদেবের প্রসাদে বর্ষার আধিক্য হয় অমনি শুনা যায় সহরের অর্দ্ধেকবাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। সিন্ধুদেশের আবহাওয়ায়, বিশেষতঃ উত্তর অঞ্চলে, শীতোষ্ণের আতিশয্য যেমন ঠাণ্ডা তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে ছাতের উপর কিম্বা বাহিরে খোলা জায়গায় শয়ন করিলেও পাখার আবশ্যক হয় ও জলসিঞ্চন করিয়া বিছানায় প্রবেশ করিতে হয়। শীতকালে তেমনি বিপরীত ঠাণ্ডা, ঘরের ভিতরেও অগ্নিসেবন ব্যতীত চলেনা। সিন্ধুদেশে প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্য বিরল। ভাগ্যি সিন্ধুনদী আছে তাই রক্ষা, নতুবা ওদেশ মানুষের বাস-যোগ্য হইত কিনা সন্দেহ। আমরা যখন হাইদ্রাবাদে ছিলাম তখন সিন্ধুনদী আমাদের একমাত্র বেড়াইবার স্থান ছিল। সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে গিয়া বায়ুসেবন করা আমাদের নিত্য নিয়মিত কার্য্য ছিল। মরুভূমির মধ্যে যেন সেই একমাত্র আরামের স্থান বোধ হইত আর মধ্যে মধ্যে নদীর উপর নৌকা করিয়া বেড়ান যাইত। সিন্ধু নদীর ভাব অনেকটা গঙ্গার মত—গঙ্গানদীর ন্যায় প্রশস্ত। ইহা দেখিলে আমার দেশ মনে পড়িত, মনে হইত যেন গঙ্গার বুকের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছি। সিন্ধু নদীতে পল্লা বলিয়া একরকম মাছ পাওয়া যায়, তাহা আমাদের ইলিস। জেলেরা কলসী ভাসাইয়া মজার রকমে এই মাছ ধরে। এ মৎস্য অতীব সুখাদ্য বলিয়া প্রখ্যাত। আমার একজন সিন্ধি চাকর ছিল তাহার কাছে এক গৎ শুনতাম মনে আছে—

পল্লা মচ্ছী খানা
সিন্দ মুলুক ছোড়কে নহি যানা।

নদী ও খালের তট প্রদেশে ভিন্ন অন্যত্রে গাছ পালা প্রায় দেখা যায় না! চতুর্দ্দিকে বালুময় ক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। এই সকল স্থানে উটের উপর দিয়াই গতিবিধি ও এদেশে উট অনেক কাজে লাগে। জলের কল—তেলের ঘানি উট দিয়াই চালিত হয়। উটই মরুসাগরের জাহাজ। সমুদ্রের উপর যেমন জাহাজের দোলা খাইয়া আনাড়ী নাবিকযাত্রীর ওষ্ঠাগত প্রাণ হয় তেমনি যাহার অনভ্যাস উষ্ট্র-বাহকের ঝাঁকানিতে তাহার রক্ত-দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। শিক্ষিত উট, ভাল মাহুৎ, অভ্যস্ত

আরোহী এই তিন একত্র হইলে উটে চড়ায় আরাম আছে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। এক বিষয়ে মরুভূমির উপযোগিতা তোমার সহজে মনে হইবে না। তাহা বলি শুন। বালির উপর সহজে পায়ের দাগ বসে—ইহা চোর ধরিবার এক উৎকৃষ্ট উপায়। আমি যখন শীকারপুরে কাজ করিতাম তখন গরুচুরি মকদ্দমা রাশি রাশি আমার কাছে আসিত। পশু হরণ সিন্ধিদের এক রোগ। এমন দিন নাই যে ঘোড়া, গরু, উট, মেষ, মহিষ প্রভৃতি লুঠের মকদ্দমা উপস্থিত না হইত। কিন্তু তাও বলি 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।' গ্রামে গ্রামে যে সব চৌকীদার আছে তাহাদের নাম 'পগী'। পদচিহ্ন দেখিয়া চোরামাল গ্রেপ্তার করা তাহাদের কাজ। মনে কর কোন এক গ্রাম হইতে একটা উট চুরী গিয়াছে। অমনি সেই গ্রামের পগী অপহৃত-উটের পদচিহ্ন ধরিয়া চোরের সন্ধানে বাহির হইল। সেই পদ-চিহ্ন যদি সে তাহার সমীপবর্ত্তী গ্রামে দেখাইয়া দিতে পারে তাহা হইলেই তাহার দায়িত্ব হইতে সে খালাস। তারপর শেষোক্ত গ্রামের উপর জবাবদিহি পড়িল। এই গ্রামের লোকেরা পগী সঙ্গে করিয়া সেই চিহ্ন ধরিয়া বাহির হয়—এইরূপে চোরের আড্ডায় গিয়া চোরামাল ধরিতে পারিলে তাহাদের পরিশ্রম সার্থক। আশ্চর্য্য এই যে অনেক স্থলে এই উপায়ে চোরামাল ধরা পড়ে—পগীরা এ কাজে এমনি নিপুণ যে প্রায় তাহারা শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসে না। তাহাদের দক্ষতার প্রমাণ চোরামাল হস্তগত হওয়া—মাল ধরা না পড়িলে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায় না। অনেক সময় পদ চিহ্ন দেখাইয়া তাহারা অন্য গ্রামের লোকদের উপর অপরাধ চাপাইয়া আপনারা দোষমুক্ত হইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু বিজ্ঞ বিচারকের কাছে ওরূপ প্রযত্ন সফল হয় না।

শীকারপুরের নামে মনে পড়িল যে সিন্ধুদেশ শীকারের এক প্রশস্ত স্থান। স্থানে-স্থানে যে বনজঙ্গল আছে সেখানে হরিণ, বরাহ, নেকড়েবাঘ প্রভৃতি বনজন্তু পাওয়া যায়। কোন কোন জলাভূমিতে নানা পক্ষী পাখালীও দৃষ্টিগোচর হয়। আমি মাঝে মাঝে শীকারে বাহির হইতাম কিন্তু বড় বাঘ কখন দেখি নাই—একবার আমার সামনে একটা হায়েনা আসিয়াছিল। সিন্ধিরা সকল রকম বাঘকেই 'সিংহ' বলে। কিন্তু আসল পশুরাজ সিংহ এ সকল বনে দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেশের কেঁদো বাঘ Royal Tiger এখানে আছে কি না সন্দেহ। এই সকল শীকার করিতে গেলে অনেক কুলি সংগ্রহ করিতে হয়। শীকারীগণ বন্দুকহস্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া বসেন, কুলিরা এক চক্র বাঁধিয়া হাঁকাহাকি ডাকাডাকি আরম্ভ করে। সেই চীৎকার ধ্বনিতে যত জীবজন্তু, শস্ত্রধারী শীকারীদের দিকে ধাবিত হয়—এই অবসরে যার যেমন সুবিধা বন্দুক ছুড়িয়া শীকার আদায় করিতে হয়। যে বনে ব্যাঘ্র সঞ্চরণ করে, সেখানে হয় কোন বৃক্ষের উপর কিম্বা উচ্চ মঞ্চের উপর বসিয়া বাঘ মামাকে প্রতীক্ষা

করিতে হয়। সিন্ধীরা অত্যন্ত শীকার-প্রিয়, শীকারপুরে থাকিতে মধ্যেমধ্যে প্রায়ই আমার শীকারের সঙ্গী জুটিত। একবার আমরা দলেবলে মঞ্চর নামে একটা বৃহৎ সরোবরে শীকার করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে বুনো হাঁস প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী পাওয়া যাইত। আমরা এক একবার বোটের উপর হইতে শীকার করিতাম। মঞ্চরে একজন বৃদ্ধ সিন্ধী আমাদের যথোচিত আতিথ্য করিয়াছিল—আমরা বেস্ আমোদে ছিলাম। একবার মনে আছে আমরা একটা জায়গায় চকা-চকির ঝাঁকের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সংস্কৃত কাব্যে চকা চকির কথা পড়িয়া তাহাদের সঙ্গে এমন সখ্যবন্ধন হইয়া গিয়াছে যে গুলি ছুঁড়িতে হাত উঠিল না। সে বেচারীদের মধ্যে গুলি চালাইতে গিয়া 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং' আকাশবাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিল। সে যাহা হউক, আমার ভারি দেখিতে ইচ্ছা করে চখা-চখির বিচ্ছেদ বর্ণনা কতদূর সত্য। তাহা বাস্তবিক ঘটনা অথবা আমাদের সংস্কৃত কবিদের কল্পনা মাত্র। সত্যই কি বিধাতার এমনি কঠোর নির্ব্বন্ধ যে সন্ধ্যা হইলেই চখা-চখী বিযুক্ত হইবে—চখা যদি এ পারে থাকে চখী ও পারে গিয়া বসিবে। চখা বলে—'চখী মই আঁউ' চখী উত্তরদেয় 'নহী নহী চখা।' আবার চখী বলে 'চখা মই আঁউ? চখা উত্তরদেয় 'নহী নহী চখী' এইরূপে কি সমস্ত রাত্রি গত হয়?

আমি কি করিতেছি—শীকার হইতে কবিতায় গিয়া পড়িলাম। আবার পক্ষ সংযত করিয়া নিম্নদেশে অবতরণ করা যাক। ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করিবার পূর্ব্বে তাহা আমীরদের রাজ্যছিল। আমীরেরা বড়ই শীকারভক্ত ছিল। তাহাদের হাতে রাজ্য থাকিলে এতদিনে সিন্ধুর সমস্ত প্রদেশ 'শীকার গাঁ'য়ে পরিণত হইত। কথিত আছে তাহাদের এমন কঠোর শাসন ছিল যে রক্ষিত-বনের কেহ একটা বরাহ বধ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। এখন আর সে কাল নাই। এই আমীরদের রাজ্যের খয়েরপুর এখন অবশিষ্ট আছে—আলিমোরাদ তাহার রাজা। তদ্ব্যতীত আমীরদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এক্ষণে কেহ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে কাজ করিতেছেন কেহ বা পেন্সন ভোগ করিতেছেন। এক জন মীর সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কখন কখন শীকারে যাইতাম। তিনি শীকারে বিলক্ষণ মজবুত—উড়ন্তপক্ষী তাঁহার গুলি খাইয়া পড়িত। এই মীর একজন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একটা খুনী মকদ্দমাতে তিনি একবার এক কারখানা করিয়া বসিয়াছিলেন। মকদ্দমা সেসনে কমিট হইলে যে সকল জিনিশ প্রমাণ স্বরূপ নথির সঙ্গে পাঠাইতে হয়—যাহাদের এদেশের চলিত ভাষায় 'মুদ্দামাল' বলে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান মাজিষ্ট্রেট মৃত ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া সেসন কোর্টে কাটা-মুণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া সেসন-জজ ক্রোধান্ধ হইয়া মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। এই অতি বুদ্ধির কাজ ক-

রিয়া বেচারী মীরসাহেব ভারি বিপদে পড়িয়াছিলেন।

সিন্ধুবাসী অধিকাংশ মুসলমান। এসব দেশে যেমন হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান ওদেশে তেমনি মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু। হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানী ধরণে গঠিত। তাহারা আমিষভক্ষণ ও সুরাপানে পরাঙ্মুখ-নহে। 'আমিল' নামে হিন্দুদের প্রধান জাতি কায়স্থ—তাহাদের বেশভূষা ও শ্মশ্রুল মুখশ্রীতে মুসলমানদের সঙ্গে প্রভেদ বুঝা দুষ্কর। প্রথমে যখন সিন্ধু-হাইদ্রাবাদে আমার কর্ম্ম হয় তখন হিন্দুদের কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। আমরা এক সঙ্গে এক মেজে বসিয়া পানভোজন করি--তাহাতে আমার কিন্তু আশ্চর্য্য বোধ হইল। কেন না হিন্দুদের ওরূপ জাতেজাতে মেলামেশা সচরাচর দেখা যায় না। শেষে উহার কারণ বুঝিতে পারিলাম। হাইদ্রাবাদে এক ব্রাহ্মসমাজ আছে, ন—রায় একজন উৎসাহীব্রাহ্ম ও সমাজের এক প্রধান নেতা। তাঁহার যত্নে কতক জন সাহসী-যুবা দলবদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ হিন্দুসমাজের বিপক্ষে খড়্গ-হস্ত হইয়াছেন—মাঝে মাঝে দুই দলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাঁহারা সাহস করিয়া আমার সঙ্গে একাসনে আহার করিয়াছিলেন তাঁহারা যে সামাজিক শাসন হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন তাহা নহে। শুনিলাম তাহার জন্য তাঁহাদের নাকি শেষে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মুসলমানদের রাজত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানেই অবরোধ প্রথার কড়াকড় নিয়ম দৃষ্ট হয়। সিন্ধুদেশে তাহাই দেখিলাম। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরেই রুদ্ধ—সূর্য্য চন্দ্রও তাহাদের রূপ দেখিতে পায় না। চন্দ্রের কথা ঠিক হইল কি না জানি না কিন্তু ইহা সত্য যে অন্তঃপুরে সূর্য্যদেবের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি কতমাস ওদেশে ছিলাম কোন ভদ্র সিন্ধি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। ন—রায় মহাশয় ঘন ঘন আমাদের কাছে আসিতেন—আমার সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহারাদি করিতেন কিন্তু তাঁহার পরিবারের মধ্যে কখন আমাদিগকে আমন্ত্রণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে হইল। মহাত্মা মিশ কার্পেণ্টার যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন আমরা সিন্ধু দেশেই ছিলাম। তিনি হাইদ্রাবাদে আমাদের বাটীতে কতক দিন বাস করিয়াছিলেন। সিন্ধিরা তাঁহার আতিথ্য সৎকারের জন্য অনেক করিয়াছিল। স্কুলের ছাত্রেরা মিলিয়া এক নাটক অভিনয় করিল, তাহাতে এক কবিতা পঠিত হয়—তার ধুয়া মিশ মেরি কার্পেণ্টার—তাহা যেন এখনো আমার কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে। মিশ কার্পেণ্টারের উপর সিন্ধিদের এমন ভক্তি, এত আদর, এত যত্ন যে ন—রায় মহাশয় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনার স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার সদ্ভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। যে অন্তঃপুর এমন আটে ঘাটে

বদ্ধ যে আমার স্ত্রীও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাহার মধ্যে একজন ইংরাজ মহিলাকে ডাকিয়া অভ্যর্থনা করা সামান্য সাহসের কর্ম্ম নহে। আজ তবে এইখানে শেষ করি—আর এক সময় বোম্বাই সহরের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভালবাসা।

এ জগতে মনুষ্যের ভালবাসা অপেক্ষা মূল্যবান্ আর কি আছে? ইহা দীন দরিদ্র কাঙ্গালের নিকটও যেরূপ মূল্যবান্ ও আদরের সামগ্রী ধনমানশালী সসাগরা ভূখণ্ডের অধিশ্বরের নিকটও সেইরূপ; ধনমানে ইহার বিশেষ তারতম্য হয় না, তবে ব্যক্তিভেদে ও হৃদয়ভেদে কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে মাত্র। ভালবাসার মূল্যাধিক্য হেতুই সাধারণত লোকে ইহাকে অমূল্য বলিয়া থাকে। ইহার মূল্য নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ। এবিষয়ে যিনি যত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন তিনি ততই দুর্গম অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া পড়েন, তখন ভালবাসা স্বার্থপরতায় এমন জড়াইয়া ঢাকা পড়িয়া যায় যে তাঁহার মানব-চক্ষু আর কাচ হইতে হীরক চিনিয়া লইতে পারে না, কাচকেই হীরক বলিয়া ভ্রম করিয়া ফেলে। জল ভাগ করিতে প্রয়াস পাইয়া ছুরিকা নিক্ষেপ করিলে যেরূপ ছুরিকাটিই তরঙ্গে ডুবিয়া যায় জল ভাগ করা হয় না, ভালবাসা ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও সেইরূপ আমাদের মন ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া যায় আমরা তাহাকে আর ধরিতে পারি না, সে আমাদের হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ভালবাসা যেমন তেমনই থাকে তাহার কিছুই ভাগ করা হয় না। তবে যেমন তড়িৎ দ্বারা জলের উপাদান দুইটি প্রকাশ পায় সেইরূপ ভালবাসার তড়িৎ যাঁহাদের নিকট পরিচিত আছে তাঁহাদের মনের মধ্যে ভালবাসার উপাদানগুলিও সেইরূপ বিকাশ পায়। কিন্তু ভালবাসার তড়িৎ আমাদের নিকট পরিচিত নাই বলিয়া কি আমরা তাহার মূল্য কিছু পরিমাণেও বুঝিতে সক্ষম হইব না? এ সংসারে তাহার কার্য্য ও ক্ষমতা দেখিয়া কি কিছুই বুঝিব না? ছার অর্থের মোহে কি চিরকালই নিদ্রিত থাকিব? আমরা সাধারণত কি প্রকারে দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধার করিয়া থাকি? তাহার কার্য্যকারিতা ও উপকারিতা দেখিয়াই আমরা তাহার মূল্য নিরূপণ করি। তবে ভালবাসার বিপুল মহিমা স্থাপন করিতে হইলেও আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। যদিও আমরা ইহার উপকারিতা সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে না পারি তথাপি যে টুক পারি সেই টুক লইয়া দেখিলেও আমরা ইহার অতুল মূল্য ধারণা করিতে সক্ষম হইব। এ সংসারে ভালবাসার ন্যায় প্রভাব কাহার? ইহার ন্যায় উপকারক কে আছে? পৃথিবীতে অর্থের ক্ষমতা বিপুল বটে, অর্থের বিনিময়ে পৃথিবীর সকল

সুখসচ্ছন্দতা উপভোগ করা যায় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ভালবাসার সহিত পার্থিব সুখের প্রতিকৃতি এই অর্থ কি তুলনাতেও আনিতে পারে? মান মর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য যাহা দিতে পারে না ভালবাসা তাহা দিয়া হৃদয় পুরাইতে পারে; সুধু ভালবাসা থাকিলেই মনুষ্যের অন্তরে শান্তি বিরাজ করে, কারণ সুখ ত আর অর্থে নহে সুখ মনে। দেখাগিয়াছে রাজাধিরাজেরা এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর একাধীশ্বর হইয়াও যথার্থ সুখভোগ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। নহুষতনয় যযাতি সহস্র বর্ষকাল বিষয়সুখ ভোগ করিয়াও ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি যে সুখের কল্পনায় বিষয়ভোগে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন সে সুখের কণামাত্রও পান নাই, বরং উপভোগবর্দ্ধিত সুখস্পৃহায় আকুল হইয়া দিন দিন অশান্তির অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। অবশেষে পুত্রগণকে অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখের অসারত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তিনি জরা গ্রহণ করিলেন। রাজা যদি প্রজাদিগের ভালবাসা না পায়েন কিংবা তাহাদিগকে যথার্থ সন্তানের ন্যায় স্নেহ না করেন তাহা হইলে কিছুতেই তিনি সুখী হয়েন না। তাঁহার-সেই-অর্থের মায়া তাঁহাকে অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না; মায়ার ঘোর ভাঙ্গিবার পর তিনি "হা হতো হস্মি" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়া দেন, কিছুতেই আর শান্তি আনন্দ উপভোগ করিতে পায়েন না। সেই নিমিত্তই আমাদের পূর্ব্বকালের প্রাতঃস্মরণীয় প্রজাবৎসল নৃপতিগণ কখনও বিষয় সুখে মুগ্ধ থাকিতেন না। কর্ত্তব্য মনে করিয়াই রাজকার্য্য সমাধান করা ও প্রজাদিগকে যথার্থ সন্তানের ন্যায়, স্নেহের সহিত পালন করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, রাজছত্রটি উপলক্ষ মাত্র। প্রজা-বৎসল রামচন্দ্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রজা সন্তুষ্টির নিমিত্ত বিনা অপরাধে পতিব্রতা প্রিয়তমা জানকীকেও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

এক জন নিতান্ত দরিদ্রকে যদি তুমি ভালবাস আর ভালবাসিয়া একমুষ্টি অন্ন দাও তাহাতে সে যত সন্তুষ্ট হইবে ও মনে শান্তি পাইবে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ দান করিলেও সে তত আপ্যায়িত হইবে না। অর্থপিশাচ, কঠোর মনুষ্যের অশান্তি-পূর্ণ হৃদয়ও ভালবাসার শান্তিবারি সিঞ্চনে স্নিগ্ধতা অনুভব করে। একজন অভিমানী ব্যক্তি অপরের নিকট দয়ার পাত্র হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন কিন্তু ভালবাসা পাইলে তিনি তোমার চরণে লুটাইতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। যে কুপথে গমন করিতেছে সে কাহারও কথায় মন দিবে না; কিন্তু তাহাকে অযথা তিরস্কার না করিয়া তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া, ভাল বাসিয়া কেহ কিছু বলিলে সে তাহা সলজ্জভাবে শুনিবে আর কিছুকাল তাহার সহিত থাকিয়া উপদেশ দিতে পারিলে কুপথ হইতে সুপথে আনিতেও অধিক বিলম্ব হইবে না। ভালবাসা পাইলে লোকে সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়। পৃথিবীর ক্লেশ যতই দুঃসহ হউক না কেন

হৃদয়ের বন্ধু পাইলে তাহা মন হইতে মুছিয়া যায়। ভালবাসা পাইলে মন একবারে আপনাকে ভুলিয়া গিয়া অপরে আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া তাহার দুঃখেই তাহার দুঃখ তাহার সুখের উপরই তাহার সুখ নির্ভর করে।

কেহ যদি ভালবাসা একজন কি কয়েক জনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তবেই তাঁহার প্রিয়জনদিগের নিকট সে ভালবাসা বড় আদরের, কিন্তু প্রশস্তক্ষেত্র বিস্তৃত হইলেও ভালবাসার অনাদর হইবার কারণ দেখি না।

ইহাতেই অর্থের সহিত ভালবাসার আর এক বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অর্থের বিনিময়ে যাহা পাই তাহাই আমাদের থাকে, অর্থ আর আমাদের থাকে না, তাহা চলিয়া যায় আর ফিরে না। কিন্তু ভালবাসার পক্ষে তাহা ঘটে না, ভালবাসা ফুরায় না, তুমি যতই ভালবাস, তোমার ভালবাসা ততই বাড়িয়া উঠে আর তাহার সহিত ভালবাসিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। লোকে বিদ্যার কথায় বলে "ইহা যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"। কিন্তু বিদ্যাপেক্ষা ইহা ভালবাসাতেই অধিক খাটিয়া থাকে। একজন পণ্ডিতকে চিরজীবন যদি বালকদিগকে বর্ণপরিচয় করাইতে হয়, তাহা হইলে কি আর তাহার বিদ্যা বৃদ্ধি পায়, না ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু ভালবাসায় তাহা হয় না। আমাদের মনের মধ্যে ভালবাসার যে অনন্ত নির্ঝর বহিয়াছে কিছুতেই তাহা নিঃশেষ হয় না, তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারিলেই আর আমাদের কিছুই ভাবন থাকে না। আমরা সেই নির্ঝর হইতে ভালবাসার অনন্ত প্রবাহ পাইতে থাকি, তাহা আমাদের জীবন মরুকে প্লাবিত করিয়া বিশ্বজগতে উথলিয়া পড়ে। অনেকেই স্বীকার করিবেন যে যাহার হৃদয়ে সুখ ও শান্তির স্পৃহা অতিশয় বলবতী তাহার নিকট হইতে সুখ ও শান্তি অনেক দূরে পলায়ন করেন; যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন তাঁহারা কিছুকাল বিষয়-সুখভোগের পর বুঝিতে পারিবেন যে ইহা কি মহৎ সত্য। এই মহৎ সত্য এত অধিক লোকে ঠেকিয়া চিনিয়াছেন যে জ্ঞানীরা, শুদ্ধ জ্ঞানীরা কেন অধিকাংশ লোকেই বোধ হয় আর ঠেকিয়া শিক্ষা পাইতে চাহিবেন না। ইহাও আর এক মহৎ সত্য যে যিনি সুখশান্তি পাইবার আশায় কোনও কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়েন না তিনিই যথার্থ শান্তি ও সুখলাভ করেন। মনুষ্য বিনা ঐশ্বর্য্যে বিনা মান-মর্য্যাদায়, বিনা যশে, কেবল মাত্র ভালবাসায় মন পূর্ণ করিয়াই মনের সুখে ও মনের শান্তিতে জীবনাতিপাত করিতে পারেন; কিন্তু ধন মান মর্য্যাদা যশ এসকল পাইয়াও ভালবাসার অনাটন পড়িলে, পরের দুঃখে মন গলাইতে না পারিলে সুখ শান্তি বা আনন্দ তাহার কিছুই থাকে না, আর এ সকলের অভাব পড়িলে মনুষ্যের জীবন মরুভূমির ন্যায় হইয়া উঠে। এই মহৎ সত্যটি কাহারো নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারে কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল সকলেরই নিকট পরিচিত আছে। সকলেই জানেন যে ধনমানে সুখলাভ মনুষ্যের অদৃষ্টে ঘটে না কিন্তু তাহা যথার্থ কি কারণে ঘটেনা তাহা হয়ত সকলে তলাইয়া বুঝেন না। তাঁহারা যখন দেখেন এ সংসারে সুখ পাইলেননা তখন তাঁহারা সুখস্পৃহা ত্যাগে যে যথার্থ সুখ পাইবেন তাহা মনেও ভাবেন না; তাঁহারা মনে করেন যে এ পৃথিবীতে সুখ নাই তবে যত কাল মায়ার ঘোরে থাকেন তত দিনই সুখ, নিদ্রাভঙ্গের পর যে কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করেন সেইটা কেবল পৃথিবীর নিত্য দুঃখ এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা যত দিন পারেন আত্মীয় বন্ধুদিগকে মায়ার পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে ব্যস্ত হয়েন। তাঁহারা

যথার্থ সুখের পথ ছাড়িয়া তুদণ্ড মায়াসুখ পাইবার জন্য লালায়িত হন; আর এই ঘোরের মধ্যে থাকিয়া জীবনের মহত্তুদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। এই অসার পার্থিব সুখে যখন আমাদিগকে যথার্থ সুখী করিতে পারে না,সে সুখ যখন মহাদেবের ন্যায় আরাধনার বশবর্ত্তী নহে বরং আগ্রহ সহকারে ধরিতে যাইয়া হারাইয়া ফেলি, তখন এই মায়াবিনী মরীচিকা ধরিবার জন্য দৌড়িবার প্রয়োজন কি। এই মায়াবিনী রাক্ষসীকে ছাড়িয়া যাহাতে মন যথার্থ সুখ শান্তিলাভ করিতে পারিবে সেই পথে ধাবমান হওয়া কি আমাদের উচিত নহে।

যে কখনও ভালবাসা পায় নাই যে যথার্থ এ সংসারের—সংসারী, সে অপরকে শীঘ্র ভাল বাসিতে অগ্রসর হইবে না; তাহার পাষাণের ন্যায় নিশ্চল সেই স্বার্থপর হৃদয় হইতে সে এক বিন্দুও সুখানুভব করে না, কেবল নিজেকে ভাল বাসিয়া বাসিয়া ফাঁপাইয়া তুলে। কিন্তু ভালবাসার অমোঘ ঔষধে পাষাণও কোমল হয়, অসাড়ও জীবন্ত হয়। তাহাকেও ভালবাস, ভাল বাসিয়া, মহাজনগণের নিঃস্বার্থকীর্ত্তি জ্বলন্তমহিমায় অবিরত তাহার কাছে কীর্ত্তন কর, তাঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি বার বার তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত কর, দেখ তাহাকেও স্বার্থের পথ হইতে ফিরাইতে পার কিনা? যে সংসারে ডুবিয়া রহিয়াছে তাহাকেও পার্থিব সুখের অস্থায়িত্ব বুঝাইতে পারিলে সে অধিক দিন সংসারের ঘোরে থাকিবে না, সে কিছু দিন পরে অপরকে ভাল বাসিতে শিখিবেই শিখিবে। অপরকে ভাল বাসিতে গিয়া এক জনের প্রেমে আবদ্ধ হইলেই যে ভালবাসার উদ্দেশ্য সাধিত হইল, আমি তাহা বলি না, ইহাতে জীবনের মহত্তুদ্দেশ্য সাধন করা হয় না। জীবনের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে একজন অপর একজনের প্রেমের ঘোরে নিদ্রিত থাকে। তোমার বিবেচনা করা উচিত যে তুমি এ বিশ্বজগতের একটি কণা মাত্র, আর সেই কণাকে বিশ্বজগত হইতে অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করা কি অজ্ঞানতা নহে। বিবাহ কর আর নাই কর, জীবনের এই মহত্তুদ্দেশ্য কখনও ভুলিও না, কখনও তোমার মন হইতে অপসৃত হইতে দিও না, তা হইলে আমরা পশু পক্ষীদের হইতে উচ্চ কিসে? জগত মণ্ডলের কর্তৃত্বের উপযুক্ত কি সে? ভালবাসাকে যখন কেবল তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে সীমাবদ্ধ কর তখন সে ভালবাসাকে, ভালবাসা বলা যায় না তাহা তোমার সেই অসার পার্থিব-সুখের সোপান মাত্র। এই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব-সুখ অন্বেষণ করিয়া অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা এই জগৎ-মণ্ডলকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা কি অধিকতর গৌরবজনক নহে। তাই বলিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি ঘৃণা কি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে বলি না। তোমার কর্ত্তব্য তাহাদের ভালবাসা ও সতত তাহাদের সুখসচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখ, কিন্তু নিজপরিবারকে ভাল বাসিতে গিয়া যেন এই বিশ্বপরিবারকে মন হইতে অপসৃত করিয়া দিও না। এইরূপ ভালবাসিতে পারিলে, মনকে স্পৃহাশূন্য করিতে পারিলেই পবিত্র সুখ বিনাঅন্বেষণে তোমার হৃদয়াধীন হইবে, শান্তি—অবিমিশ্র, পূর্ণ, স্বর্গীয়শান্তি তোমার অন্তরে সতত বিরাজ করিতে থাকিবে। এই ভালবাসাই যথার্থ ভাল বাসা; ইহাই এই অনিত্য জগৎ মধ্যে একক স্থায়ী, স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানই ইহার অনন্ত সোপান। এই সোপান দিয়া আরোহণ করিলেই মনুষ্য যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য হয়, যথার্থ পৃথিবীকে জয় করে, যথার্থ ঈশ্বরের গুণগান ও প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া এই অস্থায়ী জগতেও ঈশ্বরের শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া যায়।

শ্রী—শর্ম্মাঃ।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

সম্প্রতি আরবিং বিসপ ও ষ্টুয়ার্ট কামবারল্যাণ্ড নামে দুই ব্যক্তি ইয়োরপে মনের-কথা বলার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। আজ কাল এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে ইয়োরপ এত যত্নশীল যে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডে রাজমন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, কামবরল্যাণ্ডের, এবং জার্ম্মানিতে সম্রাট স্বয়ং সপরিবারে, বিসপের, অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন।

ইহাঁদের দু জনেরি মনের কথা বুঝিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু ইহাঁরা দু জনে মনের কথা বুঝিবার ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিসপ বলেন তিনি বিনা শরীর স্পর্শে, ইন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যে মনের কথা ধরিতে পারেন, মাংসপেশীর অবস্থান্তর (muscular movements) লক্ষ্য করিয়া তিনি মনের কথা বলেন না। কামবরল্যাণ্ড বলেন তিনি মাংশপেশীর সূক্ষ্ম অবস্থা-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়াই মনের কথা বলিতে পারেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি মাংশপেশী-পাঠ করেন, (reads muscle) মনের কথা পড়েন না, আর শরীরের সংস্পর্শে না আসিয়া অন্য উপায়ে মনের কথা বলিতে পারা তাঁহার মতে একেবারে অসম্ভব। (he denies that any one can read thought otherwise than by noting muscular movements.) কিন্তু কামবরল্যাণ্ড যে সকল ঘটনা সাধিত করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা কোন কোন বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ও সকল ঘটনাকে মাংশপেশী-পাঠ বলা যায় না, মনের কথা পড়াই বলিতে হইবে।

তা যাই কেন বলা হউক না, ঘটনাগুলি যে খাঁটি তাঁহার মধ্যে যে প্রতারণা কিছুমাত্র ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তের জন্য একটি ঘটনা আমরা এখানে বিবৃত করিতেছি।

একবার একটি প্রকাশ্য সভায় কামবরল্যাণ্ড মন গুণিতেছিলেন। গ্রাণ্ট অ্যালেন (নলজের পাঠকগণ ইহাঁর সহিত বিশেষ পরিচিত) এইরূপ ক্ষমতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতেন, তিনি পরীক্ষার জন্য একখানি রুটি মনে করিয়া তাহা দূরে একটি বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিতে পাঠাইলেন, এখন অ্যালেনের এই মনের জিনিসটি কামবরল্যাণ্ডকে বাহির করিয়া দিতে হইবে। রুমাল দিয়া তাঁর চোখ বন্ধ হইলে তিনি অ্যালেনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে রাস্তায় একটি বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অ্যালেন তখন ঠিক সেই বাড়ীর কথাই ভাবিতে ছিলেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন ঐ বাড়ীতেই রুটি রাখা হইয়াছে, কিন্তু আসলে সে বাড়ীতে রুটি ছিল না, সে হিসাবে কমবরল্যাণ্ডের গণনা ঠিক হইল না। কিন্তু এই ভুলই কি মন জানার পক্ষে অধিক প্রমাণ দিতেছে না। কামবরল্যাণ্ড যদি কোন উপায়ে আগে হইতে ঠিক বাড়ীটি জানিতেন তাহা হইলে কি আর ঐ ভুলবাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেন, কামবরল্যাণ্ড যে কোন প্রতারণা অবলম্বন করেন নাই—ইহা হইতে তাহাও যেমন বোঝা যাইতেছে, তাঁহার মনের কথা পাঠের ক্ষমতারও তেমনি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল ইহাই নহে, সেই বাড়ীর কাছে থামিবামাত্র অ্যালেনের মনে হইল—'কামবরল্যাণ্ড এখন কি করিবে? ঘণ্টা বাজাইয়া লোক ডাকিবে না দ্বারে আঘাত করিবে?" আশ্চর্য্য এই কামবরল্যাণ্ড যেন অ্যালেনের এই সূক্ষ্ম সন্দেহটি পর্য্যন্ত বু-

ঝিতে পারিলেন, তিনি দুইই করিলেন এক-বার ঘণ্টা বাজাইলেন, একবার দরজায় আঘাত করিলেন। কেবল হাতটি স্পর্শ করিয়া মাংসপেশীর অবস্থা-বৈলক্ষণ্য যদি এতদূর বুঝা যায় যাহাতে এই ক্ষুদ্র সন্দেহটি পর্য্যন্ত অন্যে ধরিতে পারে, তাহা হইলে এই মাংসপেশী-পাঠ কি অল্প বিস্ময়জনক!

প্রকটার বলিতেছেন কেবল হাতের স্পর্শে এইরূপ সূক্ষ্ম সন্দেহ প্রকাশ করিবে ইহা মনে করা যায় না, যদি তাহা হয় ত মন জানা হইতে মাংসপেশীর কার্য্য জানা আরো অধিক আশ্চর্য্যের। তিনি বলেন যখন বিনা সংযোগে লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে পদার্থের উপর পদার্থের কার্য্য চলিতেছে, তখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা চালিত হইলেই বা তাহার অস্বাভাবিকত্ব কোথায়? তবে ইহা আমাদের নিকট রহস্যময় মাত্র, কিন্তু দূরদূরান্তরস্থিত পদার্থের উপর পদার্থের কার্য্য ইহা হইতে সমধিক রহস্যময়।*

প্রকটার বলেন যে বিসপ ও কামবর-ল্যাণ্ড দুজনেরই মনের কথা বুঝিবার ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু তাহারা দুজনে উহার বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তবে আপনাদের পসারের জন্য যিনি যেরূপ বলা সুবিধাজনক ভাবিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। বিসপ বলেন ইন্দ্রিয়ের বিনা-সাহায্যে তিনি মনের কথা বুঝিতে পারেন, কামবর ল্যাণ্ড ভাবিলেন উহা না বলিয়া তিনি যদি বলেন যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তিনি মনের কথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে লোকে তাহার সরলতায় আরো সন্তুষ্ট হইবে, এবং ইহাতেই তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দীকে হারাইতে পারিবেন, ইহা ছাড়া বাস্তবিক যে কামবর-ল্যাণ্ড তাহার ক্ষমতার যথার্থ কারণ জানেন তাহা নহে। †

প্রবন্ধটির কায়া বড় বাড়িয়া পড়িতেছে, নহিলে উপরের মত আরো অনেক দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা নাই পারিলাম, তাহাতেও কিছু আসে যায় না, যে সকল ঘটনা উদ্ধৃত

*Whether thought-reading without contact would be supernatural, I may remark that it would only be mysterious, not supernatural, nor would it be anything like so mysterious as the action of matter on matter without contact, instantaneously over distances of hundreds of millions of miles. No man who admits—as every man of science must—that law of attraction which is the most stupendous mystery known to science yet rejects the idea that this great law of nature is not a natural law, need regard the idea of thought transference as involving aught of the supernatural. The influence of matter on matter without contact is at least as great a mystery as would be the influence of mind on mind at a distance.

† I think neither Mr Bishop nor Mr Cumberland has the slightest idea how they do what they undoubtedly can do. Each possesses a remarkable power of interpreting the thoughts of others. Each knows the power to be fitful and variable. Neither can make sure of success in any given attempt; yet each has met with some successes which cannot reasonably be interpreted as due to mere chance. Each has formed a tolerable idea of the unscientific credulity and of the equally unscientific incredulity of the public. One has thought it well to play on the former quality, the other seems it better to play on the latter. But as to a real idea of the nature of the power each feels he possesses, neither one nor the other has any whatever.

হইয়াছে তাহাই প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট, অধিক প্রমাণের আর আবশ্যকই বা কি? তবে যাঁহারা ইহাতেও মানসিক ক্ষমতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কিছুই পাইবেন না, আর দুই একটি কেন আর শত সহস্রটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলেও তাঁহাদের সংশয় দূর হইবার নহে। এইখানে মিশ ফক্সের একটি গল্প মনে পড়িল—তিনি শুনিয়াছিলেন একবার সার উইলিয়ম হ্যামিলটন, একটি আশ্চর্য্যজনক অঙ্ক-ফল বাহির করিয়া সে কথা সার জর্জ্জ এয়ারিকে বলেন, এয়ারি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "না তাহা হইতে পারে না"—উইলিয়ম বলিলেন, নিশ্চয়ই ইহা এইরূপ, আমি পাঁচ মাস ধরিয়া এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।" এয়ারি বলিলেন "কিন্তু আমি যে পাঁচ মিনিট ধরিয়া এ বিষয়ে ভাবিতেছি তবুত কিছুই দেখিতে পাইলাম না"।

এরূপ গল্প একটি আদটি নয় অনেক আছে। সূর্য্য কলঙ্ক দেখিয়া যখন গ্যালিলিও সে কথা বলেন তখন সিনার বলিয়াছিলেন তাহা গেলিলিওর চক্ষের কলঙ্ক সূর্য্যের কলঙ্ক নহে।

চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত কোন অজ্ঞাত শক্তি আছে, ইহাতে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। মনের কথা চালনা যে এই শক্তির ফল আমরা মোটামোটি ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ শক্তির সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহার বৈজ্ঞানিক বিশেষ কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন কি না এইবার দেখা যাউক।

এ সম্বন্ধে এখনো যে তাঁহারা কোন বিশেষরূপ সিদ্ধান্তে পহুছিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, অনেকে অনেক প্রকার আনুমানিক কারণ মাত্র প্রবর্ত্তন করিতেছেন। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে নাইনটিন্থ্ সেনচুরির স্পাদক মস্তিষ্ক রেণু তরঙ্গাঘাত (ব্রেন ওয়েব থিয়রি) নামক যে মতটি এ সম্বন্ধে প্রবর্ত্তন করেন তাহা এইখানে প্রকাশ করা যাইতেছে।

এ মতে, যেমন বায়ুতরঙ্গে শব্দ উৎপত্তি, ইথারতরঙ্গে আলোক উৎপত্তি, তেমনি মস্তিষ্করেণুর কম্পনতরঙ্গে মনের কথা চালিত হইতে পারে এইরূপ অনুমিত। সিদ্ধান্তটি এইরূপে গঠিত হইয়াছে—

প্রথম, ইহা ধরা কথা, মস্তিষ্কের কোন কার্য্য হইতে গেলেই ইহার মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য ঘটে, অর্থাৎ যা একই কথা, একটি আণবিক কম্পন উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়, ইহা ধরা কথা, কঠিন তরল বাষ্পীয় সকল রূপ পদার্থের মধ্যে ইথার নামক অতি সূক্ষ্ম পদার্থ অবস্থিত থাকিয়া উহাদের পরস্পরকে সংযুক্ত করিতেছে।

এই দুইটি ধরা কথা হইলে, চিন্তার সময় মস্তিষ্কের অণুবিকম্পন দ্বারা ইথার তরঙ্গায়িত হইবে ইহাও ধরা কথা। এবং তাহা হইলেই একটি মাথার চিন্তাতরঙ্গ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সহস্র মস্তকে প্রবেশ করিবে।

প্রত্যেক চিন্তাশালী মস্তিষ্ক এইরূপে একটি চিন্তাতরঙ্গের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া চারিদিকে চিন্তার তরঙ্গ বিক্ষেপ করিতেছে, এখন এই তরঙ্গ যখন এক অতি সূক্ষ্ম, ও বিশেষ রূপ অনুভূতি-শক্তি-বিশিষ্ট মস্তিষ্কে আসিয়া আঘাত করে, তখন তাহাতে সে চিন্তার ছাঁচ উঠিবার আশ্চর্য্য কি?

যেমন সকল কাগজে ফোটোগ্রাফির ছাঁচ পড়ে না, একরূপ বিশেষ অবস্থাতে যখন সে কাগজ আলোকতরঙ্গ ধারণে সক্ষম হয় তখন সেই ধারণশীল অবস্থায় মাত্র সে কাগজে অন্য জিনিসের ছায়া উঠে। শব্দতরঙ্গ কত শত জিনিসের মধ্য দিয়া নিস্তব্ধে চলিয়া গিয়া একটি বিশেষ রূপ গঠনের জিনিসে মাত্র শব্দ উৎপাদন করে, তেমনি কোন একটি ধারণশীল মস্তিষ্কেই মাত্র অন্য মস্তিষ্কের

চিন্তাতরঙ্গের ছাঁচ উঠিতে পারে। ইহাই মস্তিষ্করেণুতরঙ্গমত (brain wave theory)।

ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট তাঁহার অদৃশ্য-জগৎ নামক পুস্তকেও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন" আমরা যখন যাহা কিছু ভাবিনা কেন, ভাবিবার সময় আমাদের মস্তিষ্কের অণুর গতি হয়, এবং এইরূপ কল্পনা করিতে পারি, যে কোন না কোন প্রকারে এই অণুতরঙ্গ জগৎময় ব্যাপ্ত হয়।

ব্যাবেজও এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তিনি বলেন, "যদি প্রত্যেক কম্পনের সূক্ষ্মফল দেখিবার আমাদের ক্ষমতা থাকিত ত প্রত্যেক অণুর ভিতর আমরা কত সংলিপ্ত ঘটনা দেখিতে পাইতাম।"

ইহা কল্পনা করিতে গেলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, সেই ক্ষুদ্রতম আমাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতম চিন্তাটি পর্য্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিতেছে! যদি আমরা পড়িতে জানিতাম প্রতি অণুর পাতায় পাতায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ইতিহাস জ্বলন্ত-অক্ষরে পড়িতে পারিতাম! এ পুস্তকের যিনি লেখক তাঁহার মহিমাকে ধন্য! ! !

অজ্ঞাত-মানসিকশক্তির অস্তিত্বে বৈজ্ঞানিক ক্রুকশের অকাট্য বিশ্বাস। বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তিনি চিন্তাচালনার সত্যাসত্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ইহার সহায়তায় তিনি অজ্ঞাত মানসিক শক্তির প্রমাণ লাভ করেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া বলিতেছেন, যে "মানুষের এমন একটি শক্তি আছে যাহার বলে বিনাস্পর্শে কঠিন বস্তুর ভার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, না ছুঁইয়া কোন জিনিস নড়ান যাইতে পারে, না ধরিয়া ভারী জিনিস শূন্যে ঝুলান যাইতে পারে, এবং প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত শব্দ উৎপাদন করা যাইতে পারে।"

স্পষ্ট আলোকে তিনি এই সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার জন্য অন্ধকার আবশ্যক হয় নাই। এ সম্বন্ধে একবার কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি তাহার এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, "এই সকল ঘটনা যে সত্য সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; এবং ইহা গোপন করিয়া রাখিলে আমার কাপুরুষতা প্রকাশ হয়। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা আমি নিজে দেখিয়াছি, এবং পুনঃপুনঃ পরীক্ষার দ্বারা তাহা আমার কাছে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে।"

ক্রুকশ বলেন—"এই যে ইন্দ্রিয়াতীত-শক্তি আমরা দেখিতে পাই, আত্মার অস্তিত্বই ইহার কারণ, এবং একমাত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হয়।"

ইহাতে জড়বাদের মূলে সজোরে আঘাত পড়িতেছে, আত্মা বলিয়া আমাদের ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র কিছু আছে তাহা পদার্থবাদীরা স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা বলেন—মনই বল, আর আত্মাই বল, যাহা বল সকলি ইন্দ্রিয় সমূদ্রের একটি কার্য্যমাত্র, সুতরাং যাহা কার্য্য তাহা কারণের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই লোপ পাইবে।" এখন ইন্দ্রিয়ের নিয়মাতীত, জড় বিজ্ঞানের আয়ত্ত বহির্ভূত, যদি কোন মানসিক ঘটনা দেখা যায় তাহা হইলে ত একথা ঝড়ের মুখে তৃণের ন্যায় উড়িয়া যায়।

এখন স্রোত ফিরিয়াছে, কেবল আমাদের দেশে নহে, ইয়োরপেও বুঝি নূতন যুগের অভ্যুদয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়াতীত মানসিক শক্তির সম্ভাবনায় পর্য্যন্ত কেহ বিশ্বাস করিলে ইয়োরোপে তিনি হাসির পাত্র হইয়া পড়িতেন, লোকে ভাবিত তিনি তবে বিজ্ঞানের ধার কিছুই ধারেন না! এখন সে কাল নাই অল্প দিনের মধ্যে সমাজে এ সম্বন্ধে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ এখন নিজেই মানসিক শক্তির অস্তিত্ব সপ্রমাণে যত্নশীল হইয়াছেন। এই খানে অধ্যাপক ব্যারেটের বক্তৃতা হইতে একটু স্থূল অনুবাদ করিয়া প্রবন্ধটি আপাততঃ শেষ করি। তিনি বলিতেছেন—৩০বৎসর পূর্ব্বে মেশমেরিজম, টেবিল নড়া, প্রভৃতিতে বিশ্বাস দেখিলে লোকে তাহা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব বলিয়াই স্থির করিত, তার পর যখন বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মধ্যে এক এক জন করিয়া স্বকীয় পরীক্ষার ফললাভ করিয়া হইার পক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে হাস্যকর যুক্তি বাহির হইতে লাগিল। তাঁহারা তখন,হাড়ুড়ে বৈজ্ঞানিক, অর্দ্ধশিক্ষিত, খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করিতে জানেন না, কিম্বা রয়েল সোসাইটির ফেলো নন, যদিইবা ফেলো হইয়া থাকেন ত নেহাত দৈবক্রমে হইয়াছেন, ইত্যাদি রূপে সম্ভাষিত হইতে লাগিলেন। কেবল ইহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ শুদ্ধ ধরিয়া টান পড়িতে লাগিল—যেমন কেবল আমেরিকাতেই এ সকল ব্যাপার হয়,কিম্বা ইহা কেবল আমেরিকা বা ইংলণ্ড কি ফ্রান্স কি ইটালি, কি রুসিয়া, কিম্বা এইরূপ কোন অর্দ্ধশিক্ষিত দেশেই হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের দেশে অর্থাৎ জর্ম্মানিতে এরূপ হয় না।" (জর্ম্মনিতে ভ্রমণকালে একজন জর্ম্মণ আমাকে এইরূপ বলিয়া ছিলেন)।

যাহা হউক সময় পরিবর্ত্তন হইয়াছে এইরূপ যুক্তি যে একেবারে লোপপাইয়াছে, তাহা যদিও মনে হয় না, তবে এখন, এইরূপ যুক্তির ফল হওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।"

—*—

হুগলির ইমাম বাড়ী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার।

ক্রমে বেলা হইল, মুন্না হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখিয়া সাংসারিক কর্ম্মে উঠিয়া গেল, মসীম বাহিরে চলিয়া গেলেন। রোজ যেরূপ কাজ কর্ম্ম করে মুন্না সে দিনও সেইরূপ করিল—সন্ধ্যা হইলে রোজ যেরূপ পিতাকে বসিয়া খাওয়ায় তেমনি হাসি মুখে তাঁহার কাছে বসিয়া, তাঁহার সহিত গল্প করিয়া, আদর করিয়া খাওয়াইল, হাসির মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য কেবল মুন্না অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল, গল্পের মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল, একটি মাত্র ছোট খাট নিশ্বাস কে জানে কেমন সহসা বাহির হইয়া পড়িতেছিল মাত্র। মুন্নার পিতা সেই হাসির ছটার মধ্যে গল্পের উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুকায়িত অশ্রু জল দেখিতে পাইলেন—তিনিও অব্যক্ত ভাবে হৃদয়ে একটি যাতনা লইয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন। মুন্না নির্ব্বোধ সরলাবালা ভাবিল—তাহার পিতাকে সে আজ ফাঁকি দিয়াছে তিনি তাহার অসুখ ধরিতে পারেন নাই,—এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা নিশ্চিন্ত রহিল। পিতাকে খাইয়াইয়া আবার মুন্না তাহার শয়ন কক্ষের বাতায়নে আসিয়া বসিল। বিকালেই চাঁদ উঠিয়াছিল—আবার তাহা ডুবিয়া গেছে, পরপারে গাছের রাশির মধ্যে অন্ধকার ভীষণ ভাবে মূর্ত্তিমান হইয়াছে, রাশি রাশি খদ্যোতিকা মালা সেই আঁধার কায়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গঙ্গা স্বপ্নমোহে মহান আকাশ, অগণ্য নক্ষত্র রাশি, আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিয়া, আহ্লাদের হাসি হাসিয়া, সে হাসি, সে স্বপ্ন বাহি

ের স্বপ্ন জগতে সত্য বলিয়া ছড়াইয়া ঘুম ঘোরে বহিয়া যাইতেছে। বালিকা মুন্না সেই নিশীথের ঘুমন্ত আঁধারময় প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তখনও মুন্না শয়ন করিতে গেল না। তৃতীয় প্রহরও যায় যায়, তখন বাহিরের নৃত্য গীত চীৎকার থামিয়া পড়িল, সলেউদ্দীনের বন্ধু বান্ধবেরা একে একে গৃহে গমন করিল, তাঁহার বিলাস মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সেই ঘরেই নীচে মসলন্দের উপর বিশ্রাম শয়ন করিলেন। এই সময় মুন্না অতি ধীরে ধীরে সভয়ে সঙ্কোচে পা ফেলিয়া একখানি ক্ষাণ ছায়ার মত সেই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। সলেউদ্দীন অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে তাহা দেখিলেন বলিলেন "কে এ ও—"মুন্নার মুখে কথা ফুটল না, সেই যে দুপুর বেলা হইতে মুন্না সমস্তক্ষণ ধরিয়া কিরূপে, কেমন করিয়া, স্বামীকে কি কথা বলিবে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, এখন তাহা সমস্ত ব্যর্থ হইল, একেবারে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল—প্রাণটা যেন কেমন কাঁপিতে লাগিল, চোখে কেমন জল আসিতে লাগিল, মুন্না কেন যে এখানে আসিয়াছে, আসিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না,—ভাবিল ফিরিয়া যাই,—তাহাতেও যেন পা সরে না,—ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া মুন্না পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সলেউদ্দীন এ দিকে নেশার ঘোরে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছেন, তাঁহার মনে হইল স্বর্গের একটি হুরি বুঝি তাহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছে.—কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে উঠিতে গেলেন—পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন, চক্ষু বুজিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বুঝি বা ভয় হইল চোখ খুলিলে আর দেখিতে পাইবেন না। চক্ষু বন্ধ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কথায় যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই "অয়ি স্বর্গের আলোক, এস আমার হৃদয় আলোকর।"

মুন্না বুঝিল স্বামী ভুল বুঝিয়াছেন মুন্নার তখন কথা ফুটিল—ধীরে ধীরে বলিল, "আমি মুন্না"—সলেউদ্দীনের স্বর্গ হইতে রসাতলে যেন দারুণ পতন হইল,—অর্দ্ধচোখ খুলিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "মুন্ননা—তুম্‌মি—ক্যা—আ ন" মুন্না কেন এখন কি বলিবে, সে যে নিজেই তাহা ভুলিয়া গেছে। এই সময় মসীম গৃহের বারান্দায় মুন্নার চোখের সমুখে একবার দাঁড়াইয়া নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সলেউদ্দীন তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। মসীমকে দেখিয়া মুন্নার নিস্তেজ প্রাণে যেন বলের সঞ্চার হইল, যে কথা স্বামীকে বলিতে আসিয়াছে তাহা বলিবেই বলিয়া স্থির করিল—প্রাণপণে হৃদয়ে বল আনিয়া মুন্না বলিল, "একটি কথা আছে,' সলেউদ্দীন আগেকার ভাষায় বলিলেন, "কথা ঢের শুনিয়াছি, আবার সকালে শুনিব, এখন কেন।"

সকালে তিনি যত কথা শুনিবেন তা মুন্নাই জানে, প্রায় সমস্ত রাত মজলিসে কাটাইয়া সমস্ত দিন তাঁহার ঘুমাইয়া কাটে, তাহার পর অপরাহ্নে উঠিয়া বেশ বিন্যাস করিয়া আবার আসরে নামেন—কথা কহার অবকাশ ত পড়িয়া আছে। মুন্না ইহা হইতে কোমল উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, তার পর স্বামীর নিকট আসিয়া একখান ছবি তাহার কাছে রাখিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না, আবার মুখ বাধিয়া গেল, এত সঙ্কল্প সকল টুটিয়া পড়িল। সলেউদ্দীন কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি উঠাইয়া লইলেন, ঢুলুঢুলু নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অমনি জগতের যত রাগ তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল, তিনি নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া আগে-

কার অপেক্ষা স্পষ্ট কথায় বলিলেন, "কোথায় পাইলে?" মুন্না ধীরে ধীরে বলিল, "মসীম কিনিয়া আনিয়াছেন।" তিনি আরো জ্বলিয়া গেলেন, তিনি জানিতেন যে ছবি একখানি মাত্র জগতে ছিল তিনি পাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ ছবি আর যে কোথাও কিনিতে মিলিবে ইহা কক্ষনোই হইতে পারে না, তাঁহার দেয়ালের ছবি যে কেউ চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র তাঁহার সংশয় রহিল না, স্খলিত সুশ্রাব্য নানারূপ ভাষায় সকালবেলায় সেই চোরের ঘাড় ভাঙ্গিবার বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। মুন্না সাহস করিয়া অনেক বার বলিল যে "না তাঁহার ঘরের ছবি কেউ লয় নাই, সে যেখানকার সেই খানেই আছে, চাহিয়া দেখিলেই সে ছবি দেখিতে পাইবেন"। কিন্তু মুন্নার কথা কে শোনে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না, শেষে একবার চোখ খুলিয়া দেয়ালে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই সে ছবি সেই খানেই আছে। কিন্তু রাগটা তখন অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে সহজে নিভিবার নয়, বাঁকাচোরা কর্কশ-স্বরে বলিলেন "তুমি কে? এ এ ছবি দেখাও, যা—আও,—চাই না, দেখতে চাই না।"

এতক্ষণ ভাল করিয়া মুন্নার কথা ফোটে নাই, একটি কথা বলিতে গিয়া দশবার মুন্না থামিয়া পড়িতেছিল, স্বামীর নির্দ্দয় বাক্যে হৃদয় ভেদ করিয়া রুদ্ধউৎস ফুটিয়া বাহির হইল, মুন্নার মুখ ফুটিল, মুন্নার সাহস বাড়িল, মুন্না ধীরে ধীরে বলিল 'আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী বলিয়া তোমাকে কোন কথা বলিতে আসি নাই। আমি দাসী, প্রভুকে আজ মিনতি করিয়া, চরণ ধরিয়া যে কথা বলিতে আসিয়াছি তাহা না বলিয়া যাইব না। একবার সংসার পানে চাহিয়া দেখ। দেখ ইচ্ছা করিয়া দিন দিন আপনার সর্ব্বনাশ, কিরূপে টানিয়া আনিতেছ, আমি তাহা বই আর কিছু চাহি না। নিজের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। সংসারের ধনরত্নে আমি সুখী হইব না। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্য ইহাতে এক বিন্দুও ভাবি না। কিন্তু ধন না থাকিলে তোমার কি হইবে।" এক নিঃশেষে কথা গুলি বলিয়া যেন মুন্না শ্রান্ত হইয়া পড়িল, সমস্ত বল যেন তাহার নিঃশেষিত হইয়া গেল, নিস্তব্ধে ব্যগ্র ভাবে কেবল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। এই মাতালঅবস্থায় ও সকল কথা স্বামীর মাথায় প্রবেশ করিতে পারে কিনা তাহা মুন্না ভাবিল না, হয়ত বা মুন্না জীবনে স্বামীর সজ্ঞান অবস্থা দেখে নাই, সুতরাং সজ্ঞান ও অজ্ঞান অবস্থায় যে বিবেচনা শক্তির কিরূপ প্রভেদ হয় তাহাই বা সে স্পষ্ট বুঝিত না, সেইজন্যই বা এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না। কিন্তু সলেউদ্দীনের মাথায় অতগুলা কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি কেবল শুনিলেন—"ধন আর রত্ন, ধন আর রত্ন" কিছু পরে ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, "জাহান্নব! ধন রত্ন যদি খোয়াইতাম অতরত্ন তোমার গায়ে কেন? তোমার ঐ অলঙ্কার আগে যাইবে, তবে আমার ধন ফুরাইবে।"

অবসন্ন ম্রিয়মান বালিকা দারুণ আঘাতে সবল হইয়া, অশ্রুহীন নেত্রে অটলপদক্ষেপে আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিল "স্বামিন্ এ অলঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি? আমার মত দুখিনীর আবার সাজ সজ্জা কি? হৃদয় শুকাইয়া যাইতেছে, বাহির সাজাইয়া কি হইবে? আমি নিজের সুখের জন্য অলঙ্কার পরিনা,—যদি ইহা দেখিতেও তোমার কষ্ট হয়, সে কষ্টটুকুও আমি তোমাকে দিতে চাহি না—নাথ। তোমার কষ্ট ঘুচাইতে আমি হৃদয় পাতিয়া রাখিয়াছি, তবে কি এ সামান্য অলঙ্কার খুলিতে আমার দুঃখ হইবে? ইহা তোমার পরে যে কাজে লাগিবে, এখনও সেই কাজে লাগুক, আমার গায়ে ইহা বৃথা পড়িয়া আছে।"

মুন্না বলিতে বলিতে অলঙ্কার গুলি স্বামীর সম্মুখে খুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। সলেউদ্দীনের নেশা যেন অনেকটা ছুটিয়া গেল, তিনি অবাক হইয়া সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিলেন,মুন্না যখন চলিয়া গেল, তাহার মনে একটি অশান্তির ভাব, আসিয়া পড়িল। কিন্তু পারস্য রাজবংশীয় সলেউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ ভাব হওয়া বিষম দুর্ব্বলতা, তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া আর দু এক বোতল মদ আনিতে বলিলেন।

ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কেমিকাল অ্যাসিষ্টাণ্ট শ্রীঅমূল্যনারায়ণ ঘোষ প্রণীত। ইহাতে বিবাহ, সন্তান-উৎপাদন ইন্দ্রিয়-সংযমন, স্ত্রীলোকদিগের ব্যাধি প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় পর্য্যালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা একটু অপরিস্ফুট হইলেও গ্রন্থখানি অতি উৎকৃষ্ট,বঙ্গীয় যুবক যুবতী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। গ্রন্থকার অনেক বিষয় যেরূপে বুঝিয়া, যেরূপ ভাবে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়, পুস্তকখানি পড়িলে গ্রন্থকারের প্রতি ভক্তি জন্মে। গ্রন্থকারের পরামর্শ সকলে গ্রহণ করিয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল করুন এই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

শরৎকুমারী, অথবা (আদর্শ বঙ্গ মহিলা।)

শরৎকুমারী লেখকের নিকট আদর্শ-মহিলা হইতে পারেন—কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাঁর আদর্শ-চরিত্র খুজিঁয়া পাইলাম না।

ক্রমোত্থান—পুষ্প।

বর্ত্তমান সংসার যে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঈদৃশ সুসম্বদ্ধ জগদাকারে সমুৎপন্ন হয় নাই—ধীরপদে অগণিতকাল অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানের সমুন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা এক্ষণে একটি অবিনাশী বৈজ্ঞানিক সত্য। স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে ক্রমোত্থান যেরূপ অচল অথচ কঠোর সত্য, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধেও ক্রমোত্থান একটি অমোঘ ও অনতিক্রমণীয় নিয়ম। দৃশ্যমান জগতের কোন একটি পদার্থ লইয়া সাদৃশ্যের শৃঙ্খলা যোজনা করিতে করিতে আদিম কালের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানের পরিস্ফুট, সম্বদ্ধাবয়ব, জটিলবিকাশ-সমন্বিত পদার্থটি ভূতকালের অপরিস্ফুট, অসম্বদ্ধ ও সরলবিকাশ-বিশিষ্ট পদার্থটির সঙ্গে সমসূত্রে বদ্ধ। বর্ত্তমানের এই দৃশ্যতঃ বিভিন্ন আকারের ও ধরণের বস্তুটি আদিমকালীন অযত্ন-প্রসূত, আদিমকালোচিত শোভাশালী স্বতন্ত্র আকারের সেই জাতীয় বস্তুর সঙ্গে একই রক্তমাংসে বিজড়িত। কালের দূরত্ব, অবস্থার শাসন যদিও আকারগত ও স্বভাবগত পার্থক্য আনয়ন করিয়াছে,, তথাপি সূক্ষ্মদর্শীর সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি হইতে মূলগত সাদৃশ্য অপনয়ন করিতে পারে নাই। অক্ষয় কীর্ত্তিবান ডারউইন অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিবার পূর্ব্বেও তদীয় পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকেরা এই সাদৃশ্য শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়াই জীবরাজ্য ও উদ্ভিদ রাজ্যের শ্রেণী-ভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা মহাত্মা ডারউইনের প্রদর্শিত প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন বাদের আলোক প্রাপ্ত হয়েন নাই, তথাপি রহস্যান্ধকারজড়িত প্রকৃতির মধ্যে এই দৃশ্যতঃ সাদৃশ্য-শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়াই অনেক বিষয়ে এতদূর অভ্রান্তভাবে শ্রেণী বিভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য বর্ত্তমানে তাঁহাদের প্রখর ধীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

উদ্ভিদরাজ্যেই হউক বা প্রাণীরাজ্যেই হউক, এই শ্রেণীবিভাগ একটি অতি রমণীয় অধ্যেতব্য বিষয়। এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি ও বংশের উন্নতিমূলক অভ্যুদয়ের পরিবর্ত্তন সম্ভূত সোপান পরম্পরার অনুসন্ধান করা ইহার সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়তম অংশ। সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই উভয় বিষয়েই কতক পরিমাণে অভিজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ক্রমশ জ্ঞানের সীমাকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। এক্ষণে একজন প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ দিব্যচক্ষে দেখিতে পান কি কি পথ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানের প্রাণী-

রাজ্য বা উদ্ভিদরাজ্য সমুদ্ভূত হইল। কেমন একটি অসীম শৃঙ্খলে অতি আদিম কাল হইতে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অদৃশ্য ভাবে উদ্ভিদ ও জীব শ্রেণী বর্ত্তমানের অভ্যন্তর দিয়া অপ্রতিহত গতিতে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির সমুদায় পদার্থই ক্রমোত্থানের অধীন। ইহার অপরিহার্য্য প্রভাব অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা কিম্বা আণুবীক্ষণিক একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত জগতে আসিতে পারে নাই। তবে আমাদের চিত্তবিমোহনকারী কোমল ফুল এ সাধারণ বন্ধনীর বহির্ভূত হইবে কেন? কোন অলৌকিক ক্রিয়াবলে অথবা প্রকৃতির অতীত কোন অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে পুষ্প বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া অনুপম লাবণ্য-ছটায় সুবিমল সুগন্ধের বিস্তারে এবং অতুল্য কোমলতা ও স্নিগ্ধতার আধার হইয়া জন-মন-হরণ করিবার জন্য সাম্যপূর্ণ প্রকৃতির একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যবস্তুরূপে আনীত হয় নাই। যে অনতিক্রমণীয় "বিবর্ত্তন-বিকাশ"-চক্র জীবরাজ্য এবং উদ্ভিদ রাজ্য শাসন করিতেছে সেই ক্রমোন্নয়ের নিয়ম-প্রণালী পুষ্পরাজ্যের মধ্যেও প্রচলিত। সেই বিবর্ত্তন বিকাশ ইহাদেরও ব্যবস্থাপক। পুষ্পস্থ তরুলতার কোন একটি জাতি (genus) অবলম্বন করিয়া তদন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বংশের (species)তরুলতার পুষ্প বিকাশ আলোচনা করিলে আমরা অনেকগুলি প্রাকৃতিক বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। এই বিশেষ নিয়মগুলি পুষ্প রাজ্যের মধ্যেই বদ্ধ। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা সেই নিয়মগুলির আলোচনা করিব।

ক্রম-বিকাশের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে আদৌ অতি সামান্য, সরল, অসম্বদ্ধ আকার হইতে উহা যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, ক্রমে ততই জটিলতাময়-বিকাশে পরিণত হয়। অশক্ত হইতে দৃঢ়; সদৃশ হইতে অসদৃশ; স্বাতন্ত্র্য হইতে সংযোগ; সম হইতে বিষম;—ইহাই ক্রমোত্থানের মূল নিয়ম। আরম্ভকালে, সকল বস্তুর গঠনই সাদাসিদে মোটামুটি ধরণের। যতই সময় যায়, যতই অবস্থার পর অবস্থান্তর আসিয়া পড়ে, ততই অবস্থানুসারে মঙ্গলকর-আকারগত জটিল পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। কুম্ভকার যেমন এককালেই সুরঞ্জিত, সুগঠিত, সুদৃশ্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে পারে না;—প্রথমে প্রতিমাকে 'একমেটে', তাহার পর দুমেটে, তদনন্তর কৌশলপূর্ণ তুলিকা বিন্যাসে সে প্রতিমাকে সুন্দর মোহিনী মূর্ত্তিতে পরিণত করে, প্রকৃতি কুম্ভকার তাহার নিজের অগণিত প্রতিমা গড়িবার সময় ঠিক এই রূপ নিয়ম অবলম্বন করে। ক্রমোত্থানের অমোঘ ধর্ম্মই এই। উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সকল প্রাকৃতিক পদার্থই একমেটে অবস্থায় ছিল। ঈদৃশ একমেটে অর্থাৎ আদিম পদার্থের প্রধান প্রধান অংশগুলি অতি স্পষ্ট ও পৃথকভাবে অবস্থান করে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি অসম্পূর্ণ বা ডৌল বিহীন হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক অংশটি অতি পরিষ্কাররূপে অথচ সহজে সমুদয় হইতে

বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। অংশ-স্বাতন্ত্র্য আদিমতার কারণ, অংশ-সংযোগ অগ্রগামী অবস্থার চিহ্ন। কোন জাতীয় উদ্ভিদ বা জন্তুর অধস্তন স্তর হইতে যতই উপরের দিকে অগ্রসর হই, ততই অংশ-স্বাতন্ত্র্যের অভাব পরিদর্শন করি। একটি অঙ্গ হয়ত অপরটির সহিত মিশিয়া যাইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। হয়ত একটি অঙ্গ বিকাশই পায় নাই। হয়ত একটি এমনি রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাকে চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। ঈদৃশ আকার পরিবর্ত্তনে নানারূপ প্রকারভেদ (Varieties) সমুদ্ভূত হয়। এবং এই সমুদয় কালে আদিম বনিয়াদ হইতে এত স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে যে সহজ দৃষ্টিতে বা সহজ বুদ্ধিতে আদিতম বংশ এবং দূরতম প্রকারভেদে যে কোন মূলগত সাদৃশ্য আছে ইহা বিশ্বাস হয় না। ক্রমোত্থানের এই মূল নিয়ম সম্মুখে রাখিয়া আমরা এক্ষণে পুষ্পরাজ্যের বিশেষ নিয়মগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বীজের অন্তর্গত সাদৃশ্যানুসারে উদ্ভিদবেত্তারা সমুদয় পুষ্পস্থ তরুলতাকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া থাকেন; এক-বীজ-পত্রক ও দ্বি-বীজ পত্রক * এক-বীজ-পত্রক উদ্ভিদ শ্রেণীর পুষ্পের প্রত্যেক অঙ্গ তিন সংখ্যা বাচক, অর্থাৎ প্রত্যেক পুষ্পের তিনটি বৃতি, (ফুলের রঙ্গিন দলগুলির নীচে পাতার ন্যায় সবুজ কতকগুলি যে দল থাকে তাহাকেই বৃতি বলা হইল) তিনটি দল, তিন বা তিনের গুণনীয়ক কোন সংখ্যার পুংকেসর ও স্ত্রীকেসর ক্রমান্বয়ে আবর্ত্তাকারে অবস্থান করে। দ্বি-বীজ পত্রক পুষ্প পঞ্চম সংখ্যাবাচক, অর্থাৎ ইহার পাঁচটি বৃতি, পাঁচটি দল, পাঁচটি পুংকেসর পাঁচটি স্ত্রীকেসর। উভয় শ্রেণীর পুষ্পসম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম, অন্ততঃ প্রত্যেক শ্রেণীর আদিমতম ধরণের পুষ্পে ইহাই পরিলক্ষিত হয়। কোন একটি জাতির অন্তর্ভূত অগণ্য বংশ এবং প্রকারের মধ্যে কোনটি আদিম ইহা মোটামুটি জানিতে হইলে উপরিউক্ত সংখ্যার পরীক্ষা প্রয়োগ করিতে হয়। অর্থাৎ যে বংশের ফুলে আবর্ত্তগুলির সংখ্যা-সাদৃশ্য পরস্পরের সহিত মিলিয়া যায়, যাহার কোন অংশ লুপ্ত বা সংযুক্ত হয় নাই, তাহাই অনেকটা আদিম। একটি দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাক।

মনে কর দ্বিবীজপত্রক দুটি ফুলের মধ্যে একটির সমায়তনের পাঁচটি হরিৎ বৃতি, উজ্জ্বল বর্ণের পাঁচটি পাবড়ি, পাঁচটি করিয়া দুই কি তিন বা ততোধিক থাক পুংকেসর এবং উহাদের মধ্যে থাকে থাকে অনেকগুলি (ঠিক পাঁচের গুণনীয়ক কোন

* যে সকল বীজের উপরস্থ কঠিন আবরণের অর্থাৎ খোসার অভ্যন্তরের শাঁসটুকু খোসা ছাড়ান গমের মত অবিভক্ত থাকে তাহারাই এক বীজ-পত্রক। যে গুলির শাঁসটুকু ছোলা কলাইয়ের মত দুই অংশে বিভক্ত তাহারাই দ্বি-বীজ পত্রক। প্রথম অঙ্কুরণ কালে এই শাঁসই পত্ররূপে পরিণত হয়, এই জন্য ইহাকে বীজ-পত্র স্বরূপ বিবেচনা করা হয়। গম এবং তৎসদৃশ সমুদয় বীজ এক-বীজ-পত্রক; আর ছোলার ন্যায় বিভক্ত শাঁস যুক্ত বীজ মাত্রই দ্বিবীজ-পত্রক।

সংখ্যার না হইতেও পারে) স্ত্রী-কেসর বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল আবর্ত্তের সকল অংশগুলিই পৃথক রূপে ও অতি স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কোন বিভাগের কোন অংশের অসম্পূর্ণ বিকাশ বা অবিকাশ, লোপ বা সম্মিলন হয় নাই। আর অপরটির হয়ত পাঁচটি হরিৎ পাবড়ি অসমান, কিম্বা হয়ত পাঁচটির স্থলে চারটি হইয়াছে, হয়ত বৃতি ও পাবড়ির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, দুই একপ্রকারের হইয়া গিয়াছে। কিম্বা হয়ত পুংকেসর ও স্ত্রীকেসর সম্বন্ধে অপর কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এরূপ স্থলে শেষোক্ত পুষ্পটি প্রথমোক্তটি অপেক্ষা অনেকটা যে অগ্রগামী অবস্থার তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। কেননা অংশ-স্বাতন্ত্র্য আদিমত্বের একটি প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু কোন একটি ফুলের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিভাগ গুলি পৃথক, কিম্বা সমায়তনের হইলেই যে সে ফুলটি আদিমতম বলিয়া ঠিক করিয়া লইব, তাহা হইতে পারে না। পুষ্পের আরো অনেকগুলি বিষয় দেখিবার আছে। একটি যেমন—বর্ণ। নানা বর্ণের ফুল আমাদের নয়ন মনকে সৌন্দর্য্যের মোহনে মোহিত করে। আর আমরা জানি পুষ্পের বর্ণ বিন্যাস আমাদের জন্য নয়। পুষ্পের নিজের বিশেষ উপকারের জন্য। সে উপকার কি তাহাও আমরা জানি। শ্যামল ও হরিৎ উদ্ভিদ্‌রাজির বংশরক্ষা। পাঠক, ফুলের উদ্দেশ্য বড় সামান্য নয়। পক্ক, পরিপুষ্ট বীজোৎপাদন করিয়া প্রকৃতির একার্দ্ধকে সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। আমরা ইহাও জানি পুষ্প কেমন সুন্দর উপায়ে সেই মহৎব্রত সাধন করিয়া যাইতেছে। যদি তোমার হাতের গোলাপটি অমন গোলাপি বর্ণের কোমলতা ও স্নিগ্ধতাময় মনমোহনকারী গোলাপ না হইত; তুমি কি অত আদর করিয়া গোলাপকে বুকের উপর রাখিতে ইচ্ছা করিতে। কৈ তুমি ত একটি যেমন তেমন ফুলকে ওরূপ আদর কর না। যখন তোমার আমার বংশের পৃথিবীতে সূত্রপাত হয় নাই, তাহার হয়ত অনেক অগণিত কাল পূর্ব্বে ফুল বর্ণ সুগন্ধ ও কোমলতা বিস্তার করিতে শিখিয়াছে। যে সকল অতিথিরা সেই প্রাচীন কালে পুষ্পদের দ্বারে আসিত এবং যাহারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাইবার সময় অজ্ঞাতসারে একের রেণু লইয়া যাইয়া অপরকে দিয়া আসিত,* সেই উপকারী অতিথিদিগকে অধিকতর রূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য পুষ্প অতুলনীয় নানাবিধ বর্ণের বিকাশ আরম্ভ করিয়াছে। তুমি হয়ত লাল রং ভালবাস; আমি সাদা রং ভালবাসি; তৃতীয় ব্যক্তি হয়ত ঈষৎ পীত বর্ণ পসন্দ করেন। এইরূপ হয়ত আমাদের প্রত্যেকেরই চক্ষের রুচি স্বতন্ত্র। সেইরূপ, যে সমুদয়

* পুংকেশরের রেণু স্ত্রীকেশরে পড়িলে ফুলের ভ্রূণ জন্মে। কীট পতঙ্গগণ ফুলে ফুলে কেশরে কেশরে উড়িয়া উড়িয়া পুংকেশরের রেণু স্ত্রীকেশরে আনিয়া কিরূপে পুষ্পের বংশবর্দ্ধন করে তাহা কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতীর গোলাপ নামক প্রবন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতিথি পতঙ্গ পুষ্পরাজ্যে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় তাহাদেরও সকলের রুচি সমান নয়। কেহ কেহ খুব গাঢ় লোহিত রংয়ের পক্ষপাতী, কেহবা পাটল রং খুব পসন্দ করে, কেহ বা ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ ভালবাসে, কেহ বা ধবধপে সাদা রংয়ের ফুল ভিন্ন অপর কোন বর্ণের দিকে ফিরিয়া চাহে না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই পুষ্পকে নানা রকমের বর্ণ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। নতুবা বংশ রক্ষা হয় না। গুরুব্রত সাধন করা হয় না। কীট পতঙ্গের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্যই পুষ্পরাজি বিচিত্র নানাবর্ণের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আছে। যে জাতীয় কীটপতঙ্গ দ্বারা যে বংশের ফুল নিষেকিত হয়, সেই কীট পতঙ্গের রুচি অনুসারে ফুল আপনাকে সাজাইয়া রাখিয়াছে। যদি ফুল অভ্যাগত উপকারী পতঙ্গের রুচি অনুসারে আপনার বেশ ভূষা সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই জাতীয় তরুলতা অচিরে লুপ্ত-চিহ্ন হইবে। ভয়ানক সর্ব্বনাশের বিষয়! তাই ফুলেরা প্রাণপণ যত্নে কীট পতঙ্গের রুচি অনুসারে নানাবিধ বর্ণে আপনাদিগকে সুসজ্জিত করে। কেবল বর্ণ-বিন্যাস নয়, বংশ বর্দ্ধনের সহায়তাকারীদিগের জন্য অনেক ফুল অনেক প্রকারের আকারগত পরিবর্ত্তনও সহ্য করিয়াছে। প্রকৃতির অভ্যন্তরে এমনি জীবন ধারণার্থ মহা সংগ্রাম অবিরাম চলিতেছে।

আমরা এক্ষণে দেখিতেছি সময়ে পুষ্পের গঠন-গত বা আকারগত পরিবর্ত্তন যেমন সংঘটিত হয়, তেমনি পুষ্পের বর্ণ বৈচিত্র্যও ঘটিয়া থাকে। পুষ্পের ক্রমোত্থান আলোচনা করিতে গেলে পুষ্পের বর্ণবিন্যাসও একটি বিচার্য্য বিষয়। সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিতগণের সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি কোন প্রকারের বর্ণ আদিমত্ব-পরিজ্ঞাপক। সে বর্ণ সোণালি পীত রং। এককালে সমুদয় পুষ্পস্থ তরু, লতার সতেজ শাখায় সোণালি পীতবর্ণের ফুলই শোভা পাইত। এখন কোন উদ্যানে প্রবেশ করিলেই কত বিবিধ বর্ণের পুষ্প নয়ন-পথে পতিত হয়। কিন্তু তৎকালে এক পীত বর্ণ ভিন্ন অপর কোন বর্ণ নয়নকে ভুলাইবার ছিল না। পীতই যে কেন আদিমতম রং হইল, প্রকৃতির তুলি কেন যে তখন অপর কোন রং ফলাইতে পারে নাই সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। প্রকৃতির অনেক খেলাই রহস্যময়!

সোণালি-পীত যেমন আদিমতম রং, প্রগাঢ়-নীল অতি অগ্রগামী অবস্থার রং। যদি কোন একটি জাতির গোড়ার বংশ অবলম্বন করিয়া তাহার অধুনাতন কোন বংশের বা প্রকারের ফুল পরীক্ষা করিয়া দেখি, এমন অধুনাতন বংশ বা প্রকার যাহার ফুল নীল বর্ণ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে আদিম কালের সেই সোণালি পীত রং নিষেকসহায়ক কীট পতঙ্গদের অনুরোধে যথাক্রমে শুভ্র, পাটল, ও বেগুণে রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে নীলবর্ণে

পরিণত হইয়াছে। উজ্জ্বলপীত উদ্ভিদরাজ্যে ক্রমোত্থানের প্রথমাবস্থার লক্ষণ; উজ্জ্বল-নীল ক্রমোত্থানের সমুন্নতাবস্থার লক্ষণ। কিন্তু এস্থলে আমাদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে পুষ্পের বর্ণ-বৈচিত্র্য সমধিক পরিমাণে নিষেকসহায়ক কীট পতঙ্গদের রুচির উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেক বংশের অভাব নাই যাহারা হয়ত বর্ণ সম্বন্ধে সেই আদিমতম সোণালি পীত বর্ণই বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু হয়ত অপরাপর বিষয়ে ক্রমোত্থানের সর্ব্বোচ্চ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুত সুনীল পুষ্প অপেক্ষাকৃত বিরল। অতি অল্পতম পুষ্পই ঈদৃশ উচ্চতম অবস্থা পরিজ্ঞাপক নীলবর্ণ উদ্ভাবন করিয়া থাকে।

পুষ্পের বর্ণের মতন লিঙ্গভেদও আর একটি বিষয়। পুষ্প-ক্রমবিকাশে ইহাও একটি বিবেচ্য স্থল। কেন না আমরা দেখিতে পাই সকল ফুল এক লিঙ্গের নহে। কোনটি পুং কোনটি স্ত্রী কোনটি বা পুং স্ত্রী-উভয় লিঙ্গ পরিজ্ঞাপক। যদি কোন একটি ফুলের সকল অঙ্গ অথবা অঙ্গের সকল বিভাগ অযুক্ত, স্বতন্ত্র, সমাকার ও সম-সংখ্যক হয় এবং যদি পুষ্পটি সোণালি পীত বর্ণেরও হয়, তাহা হইলেই সে ফুলটিকে আদিমতম বংশীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। ভিন্ন অঙ্গের অংশ নিচয়ের স্বাতন্ত্র্য যেমন আদিমত্বের একটি চিহ্ন, তেমনি লিঙ্গের স্বাতন্ত্র্য ক্রমোত্থানের উচ্চতম অবস্থার লক্ষণ। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতন সাদৃশ্যই একমাত্র পথ চিহ্ন, যাহা অবলম্বন করিয়া তত্ত্বান্বেষীরা অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন তত্ত্বের আকর আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। জীবরাজ্যে আমরা দেখি স্বতন্ত্র লিঙ্গ স্বতন্ত্র আধারে। উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত প্রাণী-রাজ্যে লিঙ্গ-স্বাতন্ত্র্য প্রবলতম ও প্রধানতম অবস্থা। অনুন্নত জীবে উভয় লিঙ্গের একত্র সংঘটন একটি প্রধান লক্ষণ। আবার যাহারা আরো অনুন্নত তাহাদের মধ্যে লিঙ্গাদির ন্যায় জটিলতর ইন্দ্রিয়ের কোন চিহ্নই নাই। ঈদৃশ নিম্নতম শ্রেণীর জীবরাজ্যভুক্ত কীটাণুরা, পুনরুৎপাদনের সময় হইলে আপনারা দ্বিধা হইয়া একটির স্থলে দুইটি জীবাণু উদ্ভাবন করিয়া স্ব স্ব জীবন-লীলা সম্বরণ করে। ইহাদের বংশ বৃদ্ধি এইরূপেই হয়; জনন-ইন্দ্রিয়ের সহায়তার আবশ্যক করে না। কিন্তু জীবরাজ্যের ঈদৃশ † নিম্নতম শ্রেণীর জীবের ন্যায় উদ্ভিদ আমরা দেখিতে পাই না। অন্ততঃ পুষ্পস্থ তরু, লতা, গুল্মের মধ্যে এমন কোন জাতি বা বংশ বা এমন কোন দূরতম একক প্রকার ভেদও নাই যাহাকে কোন প্রকারের জননেন্দ্রিয় বিহীন উল্লিখিত কীটাণুদের সদৃশ উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তবে অপুষ্পস্থ উদ্ভিদের পুনরুৎপাদন আলোচনা করিলে যদি উহার সদৃশ কোন প্রকারের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

† এরূপ উদ্ভিদ অনেক আছে ইহারা কীটাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র আকৃতির। যেমন, তাড়ির মধ্যে যে উদ্ভিদ থাকে।

জীবরাজ্যের ন্যায় উদ্ভিদরাজ্যেও একাধারে উভয় লিঙ্গের একত্র সংঘটন নিম্নতর অবস্থা পরিজ্ঞাপক। আদৌ সমুদয় ফুলই উভয়লিঙ্গ ছিল। মূল বংশ হইতে যতই শাখাবংশের উদ্ভাবন হইতে লাগিল, ততই ক্রমে ক্রমে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় আরম্ভ হইল। উভয়-লিঙ্গ হইতে প্রথম পরিবর্ত্তিত অবস্থা—একশিষফুলের কতকগুলি পুং কতকগুলি স্ত্রীং এবং কতকগুলি বা উভয়লিঙ্গ। তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় এক-শাখাতেই কোথাও বা একসঙ্গে কতক-গুলি পুং ফুল স্বতন্ত্রভাবে প্রস্ফুটিত হয়, কোথাও বা দু-চারটি স্ত্রী ফুল আলাদা ফোটে কোথাও বা কতকগুলি উভয়লিঙ্গ ফুল ফুটিয়া থাকে। ক্রমে যখন আরো উন্নতঅবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন একই গাছের বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ পরিজ্ঞাপক ফুল পুষ্পিত হয়। ইহাদের উভয়-লিঙ্গ-ফুল অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়ে। ক্রমশ পার্থক্যের দিকে গতি এত প্রবল হয় যে স্বতন্ত্র গাছে স্বতন্ত্র লিঙ্গের পুষ্প উৎপন্ন হয়। ঈদৃশ বৃক্ষ, লতা উদ্ভিদরাজ্যের অধিকতম উন্নত ও অগ্রগামী অবস্থাপরিচায়ক। আমাদের তাল, খেজুর এই শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ বৃক্ষ-লতার মধ্যে সমধিক উচ্চ শ্রেণীর; উদ্ভিদ রাজ্যে ইহারা এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে যে ইহাদের একই বৃক্ষে আর দুইলিঙ্গের ফুল মুকুলিত হয় না। কতকগুলি তালগাছে কেবল পুংফুলই উৎপন্ন হয়; আর কতকগুলিতে কেবল স্ত্রী ফুলই ফুটে। বোধ হয় আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের অনেকে অবগত নহেন যে, সচরাচর যাহাদিগকে চলিত কথায় বাঁঝা তালগাছ বলে সেইগুলি কেবল পুংফুল উৎপন্ন করে। আর যেগুলি ফলবান্ বৃক্ষ সেগুলিতেই স্ত্রী ফুল হয়। বাঁঝা গাছগুলিতে স্ত্রীফুল বা উভয়লিঙ্গ ফুল জন্মায় নাই বলিয়াই উহাদের ফল দেখা যায় না। এবং তজ্জন্যই উহারা বন্ধ্যা। উদ্ভিদরাজ্যের অতি অল্পাংশই তাল বা খেজুরের সমান উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি কোন জাতীয় পুষ্প আদিমতম ইহা স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখা চাই যে ইহার অঙ্গগুলির মধ্যে কোন একটি বিশেষ অঙ্গ বা অঙ্গের কোন বিশেষ বিভাগ অপ্রকাশিত রহিয়াছে কি না; অথবা কোন অঙ্গ বা অঙ্গের কোন অংশ অপর কোন অঙ্গ বা কোন অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে কি না। যদি কোন অঙ্গের বা অঙ্গের কোন অংশের বিকাশ রুদ্ধ না হইয়া থাকে, যদি কোন অঙ্গ বা তাহার কোন অংশ অপর অঙ্গের সহিত অথবা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত না হয়, তাহা হইলেই আমরা স্থির করিব সেই ফুলটি অনেকটা আদিম বংশের। তারপর যদি দেখি সেই ফুলটি উজ্জ্বল পীতবর্ণের অথবা অপর কোন রঙ্গের হইলেও যদি পাবড়ির কোন স্থানে এখনও পর্য্যন্ত পীতের আভা বিদ্যমান থাকে এবং ফুলটি উভয়লিঙ্গ পরিজ্ঞাপক কেসর সমন্বিত হয়; তাহা হইলে বুঝিব আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত অনেকটা ঠিক। কিন্তু এই সকল প্রমাণ হইতেই আমরা একবারে বলিতে

পারি না যে ইহাই আদিমতম বংশের ফুল। আরো একটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে।—পুষ্পের গর্ভাধারের (Carpels) সংখ্যা। প্রথমাবস্থায় সকল ফুলেই অনেকগুলি পুং-কেসরের মতন অনেকগুলি স্ত্রীকেসর স্ব স্ব গর্ভ-কোষোপরি সমুন্নত হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে পুং কেসরাবর্ত্ত মধ্যে বিরাজ করে। প্রত্যেক গর্ভকোষ এক একটি বীজের আধারস্থান হয়; একের অধিক বীজ কোন গর্ভকোষেই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী অবস্থাপন্ন পুষ্পে আমরা দেখি যে এই স্বতন্ত্র, বহুল, গর্ভকোষগুলি একে একে মিলিয়া একটি যুক্ত গর্ভাধার হইয়াছে। এবং এই যুক্ত গর্ভাধারে অনেকগুলি বীজ একত্রে পরিপুষ্ট হয়। আদিমকালে একক-বীজ-বিশিষ্ট বহুল অসংযুক্ত গর্ভাধার, আর অগ্রগামী অবস্থায় বহু-বীজ সমন্বিত একটি যুক্ত গর্ভকোষ। উভয় প্রকারের গর্ভকোষ একই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালের একক-বীজ বিশিষ্ট গর্ভকোষের সংখ্যার আধিক্য জন্য একটি ফুলেই অনেকগুলি বিচি জন্মাইত। আর অগ্রগামী অবস্থাপন্ন ফুলের যুক্ত গর্ভাধারে এককালে অনেকগুলি বীজই পরিপক্ক হয়। সুতরাং ঈদৃশ পরিবর্ত্তনে পুষ্প মূল উদ্দেশ্য হইতে দূরে যাইয়া পড়ে নাই। তবে এরূপ পরিবর্ত্তন আনিবার পুষ্পের কি আবশ্যক ছিল জিজ্ঞাসা হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমরা প্রথমে মনে করিয়া লইতে পারি নিশ্চয়ই ঈদৃশ পরিবর্ত্তন পুষ্পের পক্ষে মঙ্গলকর। নতুবা কখনই এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত না। বিবর্ত্তন-বিকাশের নিয়মের আদি ও পরিণাম মঙ্গল উদ্দেশ্য-পূর্ণ। এক্ষণে দেখা যাক্ এই পরিবর্ত্তনে পুষ্পের কি হিত সাধিত হইয়াছে। পাঠক, যদি একটি যুক্ত গর্ভকোষ বিশিষ্ট ফুল লইয়া দেখ, দেখিবে একদিকে যেমন উহার স্বতন্ত্র গর্ভকোষগুলি পরস্পর মিলিয়া যাইয়া একটি যুক্ত-গর্ভ-কোষ উৎপন্ন হইয়াছে তেমনি বহুল স্ত্রী কেশরের স্থানে যুক্ত গর্ভ-কোষোপরি একটি মাত্র স্ত্রীকেসর বিদ্যমান। এইরূপ পরিবর্ত্তন যে বিশেষ সদ্বিবেচনা মূলক তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন গর্ভকোষগুলি স্বতন্ত্র ও অসংলগ্ন ভাবে স্ব স্ব কেসর উন্নত করিয়া অন্তর-আবর্ত্ত-পূর্ণ করিয়া থাকিত, তখন অনেক সময়ে সমুদয় কোষগুলি বীজোৎপাদক হইতে পারিত না। পুষ্প-রেণু বিজড়িত পতঙ্গ পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিবার সময় প্রত্যেক ফুলের সমুদয় স্ত্রী-কেসরগুলিকে নিষেকিত করিতে পারিত না। যে ব্যস্ততার সহিত পতঙ্গেরা, মধুমক্ষিকারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ধাবিত হয়, তাহাতে কি কখন সুসাবধানে প্রত্যেক ফুলের অতগুলি স্ত্রীকেসরকে এককালে রেণুস্পৃষ্ট করা সম্ভব? এই জন্য অনেক কোষস্থ বীজ অপূর্ণ অপক্ক থাকিত। প্রয়োজনমত বীজ পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হইত না। কাজে-কাজেই পুষ্প এমন উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল যদ্দ্বারা নিষেক-সহায়ক কীটদিগের সামান্যতম সাহায্যেই বহুল বীজকে পরিপক্ক ও পরিপুষ্ট অবস্থায় আনয়ন কর যায়। একটিমাত্র স্ত্রীকেসররেণু মর্দ্দিত হইলেই যুক্ত-গর্ভ কোষস্থ বহুল বীজের পরিপক্কতা অনায়াসসিদ্ধ ও সম্ভবপর হয়, ইহা অপেক্ষা সহজতর অথচ প্রচুর বিচক্ষণতাপূর্ণ পন্থা আর কি সম্ভব? তবে দেখ এ পরিবর্ত্তন পুষ্পের সম্বন্ধে কতদূর মঙ্গলকর।

আলোচনা করিতে করিতে আমরা পুষ্পরাজ্যের ব্যবস্থাপ্রণালীর প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান অংশ শেষ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন আমরা পুষ্পের ক্রমোত্থানের সমুদয় সোপানগুলিই একে একে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। পুষ্পের ক্রমোত্থানের এখনও অনেক বিষয় জানিবার অবশিষ্ট আছে। হয়ত উত্থান-মার্গের এমন অনেক সোপান রহিয়াছে যাহা এখনও পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত। আমরা উপরে যে চারিটি নিয়মের উল্লেখ করিয়া আসিলাম সেগুলি কেবল সাধারণ নিয়ম। প্রধানতঃ ঐ চারিটি নিয়মই পরিদর্শন পথে পতিত হয়। আমরা যখন আরো গভীরতর মনোযোগের সহিত এবং গভীরতর অনুরাগ ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্রতম পদার্থ এই পুষ্পের—ক্রমোত্থান আলোচনা করিতে পারিব, তখন সম্ভবতঃ আরো অনেক নিয়মের বিকাশ দেখিতে পাইব। প্রাকৃতিক প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুই প্রহেলিকাময়। এবং প্রহেলিকা-রাজি পরিপূরিত বিশ্ব-রঙ্গভূমিতে ক্ষুদ্র, অসহায়, মানব-জ্ঞান প্রকৃতির হস্তে একটি সামান্যতম ক্রীড়াবস্তু-স্বরূপ।

উপসংহার করিবার পূর্ব্বে আমরা একবার প্রশস্ত ক্ষেত্রে আদিমতম ধরণের অসংযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট, অরুদ্ধ ও পূর্ণ বিকাশময়, একক বীজধারী বহুল-গর্ভকোষ-সমন্বিত, উভয় লিঙ্গের উজ্জ্বল পীতবর্ণের ফুলকে প্রথম স্তরে রাখি। আর সর্ব্বোপরি স্তরে লুপ্ত বা রুদ্ধ-অঙ্গ, ও যুক্ত-অংশ সমন্বিত, বহুবীজধারী যুক্ত-গর্ভকোষ বিশিষ্ট, সমুজ্জ্বল নীল বর্ণের, স্বতন্ত্র লিঙ্গের পুষ্পকে স্থাপন করি, এবং মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য স্তর, নানা-বর্ণের বিচিত্র গঠনের বিবিধ অবস্থাপন্ন পুষ্পরাশি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দভাবে কল্পনা করি সেই প্রথম স্তর কত কত আদিম কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কত অসংখ্য অসংখ্য বৎসর, যুগ, শতাব্দী উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই স্তর উপর্য্যুপরি ক্রমোত্থানের অগণ্য সোপান উত্থান করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে! স্থান ও কালভেদে, অবস্থার তারতম্যানুসারে জল বায়ু ও শীতোত্তাপের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা হেতু ক্রম-বিকাশের কঠোর-শাসনে কত বৈলক্ষণ্য, কত পরিবর্ত্তন কত বিপর্য্যয় সহ্য করিয়া উহা অলক্ষিত ভাবে এক সোপান হইতে পরবর্ত্তী সোপানে পৌঁছিতেছে! উহাদের আকারগত গঠনগত গুণ ও ধর্ম্মগত কত প্রকারের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে! আর সেই সমুদয় সোপান-রাজির মধ্যে পরিবর্ত্তনের প্রত্যেক গতিতে, ক্রমবিকাশের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে বিধাতার অপ-

রিমের জ্ঞানের বিচিত্র লীলা প্রতিভাসিত। অবর্ণনীয় শোভাসৌন্দর্য্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য-সম্পন্ন, এবং অসংখ্য নিত্য পরিবর্ত্তন-সম্ভূত প্রকৃতির এই সুবিশাল পুষ্পরাজি বিধাতার অনন্ত বিশ্বভাণ্ডারের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ; অনন্তজ্ঞানের একটি সামান্যতম বিকাশ মাত্র। পাঠক! বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পুষ্পক্রমবিকাশের এই কাল্পনিক রমণীয়-দৃশ্য একবার নিরীক্ষণ কর।

শ্রীপতিচরণ রায়।

হুগলীর ইমামবাড়ী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তীর্থ যাত্রা।

মতাহার আগা হুগলী সহরের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। ইঁহার আর কেহ নাই, একমাত্র কন্যারত্ন মুন্নাই ইঁহার সংসারের বন্ধন, হৃদয়ের সম্বল। অতি শৈশবে কন্যা মাতৃহীনা হইয়াছে সেই অবধি মতাহার আর বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিলে মুন্না পাছে পর হইয়া যায়—মুন্না তাঁহার বড় আদরের রত্ন, যতনের ধন। ক্রমে মুন্না যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার শৈশবের রূপগুণ বয়সের সহিত প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, স্নেহময় পিতার মন ততই স্নেহের গর্ব্বে পূরিয়া উঠিতে লাগিল, আনন্দের উচ্ছ্বাসে উথলিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই আহ্লাদের মধ্যেও এমন রূপগুণসম্পন্ন স্বর্গীয় রত্ন কাহাকে সমর্পণ করিবেন—কাহার কণ্ঠে ইহা শোভা-মানা হইবে, এই এক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। কত পাত্র আসিতে যাইতে লাগিল—কোনটিই আর তাঁহার মনের মত হয় না, হুগলীর নবাব খাঁজাঁহা খাঁ মুন্নার হস্ত প্রার্থনা করিলেন তাঁহাকেও মতাহারের পসন্দ হইল না। মতাহার এক আধারে সকল গুণ চান, তিনি চান তাঁহার জামাতা রূপবান, গুণবান, রাজবংশীয় সকল হইবে, কেবল তাহাই নহে, মতাহারের পুত্র নাই, তাহাকে পুত্র করিয়া সে সাধও মিটাইবেন, তাঁহার জামাতা তাঁহার ঘরে থাকিবে।

খাঁজা খাঁর যদিও ধন মান বংশের অভাব নাই কিন্তু ইঁহার সহিত বিবাহ দিলেত কন্যাকে গৃহে রাখা যায় না, তাহার পর আবার খাঁজা খাঁর অনেকগুলি বিবাহ, নবাব হইলে কি হয়—এরূপ স্থলে কোন্ প্রাণ ধরিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহার ত ধনের অভাব নাই, তিনি তাহা ছাড়া আর যাহা চাহেন, একঠাঁই সমস্ত পাইয়া উঠেন না।

অবশেষে মুন্নার বিবাহ হইল, ধন লোভে

পারস্য রাজবংশীয় এক যুবক তাহার বংশ মতাহারকে দান করিল। মতাহার রাজ বংশের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বস্ব সম্পত্তি জামাতার নামে লিখিয়া দিয়া তবে এই মান তাঁহার হস্তগত করিতে হইল। ইহাতে আর মতাহারের দুঃখ কি, তাঁহার ধন সম্পত্তি সকলি তাঁহার কন্যা জামাতার, কিছু দিন পরে ত উহারাই লইবে, না হয় আগেই উহাদের দিলেন, ইহাতে তাঁহার দুঃখ নাই। মতাহার যেরূপ চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল, তবে ঠিক সেরূপ হইল না। জামাতা রূপবান—রাজবংশীয়, শ্বশুরালয়বাসী সকলি হইল—কেবল যেরূপ গুণবান চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল না। কিন্তু বিবাহের সময় জামাতার এ অভাব বুঝিতে পারেন নাই, তখন সকল বিষয়েই মনোমত হইবে আশা করিয়াছিলেন, জামাতার দোষগুলি ক্রমে ফুটিতে লাগিল।

পিতা এত কষ্ট করিলেন, তবু কন্যা সুখী হইল না, মুন্নাকে মতাহার বেগম করিলেন—কিন্তু সুখী করিতে পারিলেন না। জামাতা কন্যার গৌরব বুঝিল না, হস্তীপদতলে রত্ন দলিত হইতে লাগিল।

নবাব সলেউদ্দীন দিনরাত বিলাস-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন, বিলাস ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না, কিছু চাহেন না। সেই অপরিসীম বিলাস-তৃষ্ণা আর তাঁহার কিছুতেই মেটে না। সে তৃষ্ণা কুবেরের রত্ন সমুদ্রও যেন নিমেষে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে। মতাহার আগার ঐশ্বর্য্য দুই চারি বছরের মধ্যেই ফুরায় ফুরায় হইয়া আসিল। মতাহার দেখিলেন একদিন তাঁহার কন্যার বুঝি বা পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হয়, যে কন্যা রাজ-যত্নে পালিত হইয়াছে, তাহাকে একদিন সত্যই বুঝি বা একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হয়। মতাহারের হৃদয়ে অসীম বেদনা, কন্যার মুখের দিকে তিনি আর চাহিতে পারেন না, দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। এক দণ্ড যে মুখ না দেখিলে মতাহার থাকিতে পারিতেন না, সেই মুখ দেখিলেই তাঁহার নয়ন যেন আপনা হইতেই অন্যদিকে ফিরিতে চায়। মুন্না বড় বুদ্ধিমতী, মুন্না বড় স্নেহময়ী, পিতার কষ্টের ভয়ে সে তাহার হৃদয়-বেদনা লুকাইয়া রাখে, হাসি দিয়া অশ্রুজল ঢাকিতে চায়। পিতাকে বিষণ্ণ দেখিলে হাসিয়া হাসিয়া কাছে যায়, হর্ষভরে কথা কহে, ছেলেবেলায় পিতার সহিত কোন দিন কি কথা হইয়াছিল সেই সকল সুখের কথা ফিরাইয়া ফিরাইয়া আনে, পিতাকে বুঝাইতে চাহে তাহার প্রাণে কোন কষ্ট নাই, কেন তবে তিনি অসুখী হইবেন।

মুন্নার সেই হাসিতে সেই হর্ষের কথায়, মতাহারের প্রাণ আরো কাঁদিয়া উঠে, সেই হাসির আলোকে মুন্নার প্রাণের আঁধার তিনি যেন আরো সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান। মতাহার মনে ভাবেন—"মুন্না ধন আমার, আমি যে তোমার সব হাসি ঘুচাইয়াছি, তবে আবার এ হাসি কেন?" ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ নেত্রে, কন্যার কাছে সরিয়া আসেন, মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে পিঠে হাত রাখিয়া কি ভাবিয়া কে জানে

বলিয়া উঠেন "আমার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারিবি"—মুন্না হাসিয়া হাসিয়া বলে—"পারিব না? পারিব বইকি' মতাহারের চোখে জল পুরিয়া আসে—"মুন্না তুদের বাছা ফুলের মেয়ে কত কষ্ট সহিতেছে—আরো কি ইহা হইতে সহিবার কিছু আছে ভগবান।"

এইরূপে দিন যায়, মতাহারের মনের স্থিরতা নাই, কন্যার দুঃখ দেখিবেন না ভাবিয়া কখনো দূরে পলাইতে চান, আবার কন্যার কাছে আসিয়া তাহার সেই মুখখানি দেখিলেই সে ভাব আর মনে ঠাঁই পায় না, তখন মনে করেন—"মাগো এ মুখখানি কি না দেখিয়া থাকা যায়, ইহাকে একাকী কষ্টে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইব, যা অদৃষ্টে আছে দুজনে ভোগ করিব, ভিক্ষা করিতে হয় দুজনে হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিব।"

কিন্তু এরূপ অবস্থায় দিন কাটিল না, যে রাত্রের ঘটনাটি পূর্ব্বপরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইয়াছে, পরদিন প্রাতঃকালেই তাহা মতাহারের কাণে উঠিল, কেবল তাহা নহে, যাহা হয় নাই—এমন অনেক কথা পর্য্যন্ত তিনি শুনিতে পাইলেন, তিনি শুনিলেন জামাতা মুন্নাকে মারিয়া সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে। তাহারপর স্বচক্ষে যখন তিনি কন্যার সেই দীনহীন অলঙ্কারশূন্য বেশ দেখিতে পাইলেন তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। তিনি যে সলেউদ্দীনের সহিত বিবাহ দিয়া কি জঘন্য কাজ করিয়াছেন, নিজের নিকট, প্রাণের কন্যার নিকট, তাঁহার দেবতার নিকট কি ঘোর পাপ করিয়াছেন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন, এ পাপের শাস্তি কোথায় গিয়া অবসান বুঝিতে পারিলেন না। একদিন হয়ত বা জামাতা মুন্নাকে হত্যা করিবে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আনিয়া হত্যা করিবে, আর তাঁহার ভাহাই একটা রক্তমাংসহীন শবের মত বসিয়া দেখিতে হইবে, এমন বল নাই, সামর্থ্য নাই, উপায় নাই, যে তাহা হইতে কন্যাকে রক্ষা করিতে পারেন। মতাহার শিহরিয়া উঠিলেন—আকুল ভাবে কাঁদিয়া উর্দ্ধ নয়নে বলিলেন জগদীশ্বর আমার পাপের শাস্তিতে অনাথা বালিকাকে আর বধিও না, যত কিছু তোমার দণ্ড আছে—তাহা পাপ তাপের এই বৃদ্ধ মাথায় নিক্ষেপ কর, আমি সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাহা বহন করিব—" হৃদয়ের ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে দারুণবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি তাঁহার প্রাণের সমস্ত বল দিয়া অন্তর-দেবতাকে অতি আকুল ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, সেই দিন তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল যে দেবতার নিকট গিয়া তাঁহার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আর অন্য উপায় নাই, মুন্নার মঙ্গলের আর আশা নাই, দেবতা ভিন্ন মনুষ্যে জামাতার শুভমতি ফিরাইতে পারিবে না। সেই দিন প্রাণের সহিত সবলে যোঝাযুঝি করিয়া, স্নেহের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া দূর তীর্থে পীরের নিকট গিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। কাহাকে মনের কথা বিশেষ কিছু বলিলেন না—কেবল সেদিন সন্ধ্যার

পর আহারান্তে উঠিয়া আসিবার সময় মুন্নাকে বলিলেন—"মুন্না আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—একবার তীর্থ করিয়া আসি। কবে মরিয়া যাইব, শীঘ্র যাইব ভাবিতেছি" মুন্না তখন পান লইয়া পিতাকে দিতে যাইতেছিল, হাতটি কাঁপিয়া হঠাৎ পানটি পড়িয়া গেল, চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে বড় বড় দুই ফোঁটা জল মাটীতে পড়িল, বৃদ্ধ মতাহার সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন, বাহিরে শয়নকক্ষে গিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর প্রাতঃকালে একদিন মুন্নার চোখের জলের কুয়াসার উপর দিয়া একখানি নৌকা ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে কত দূরে চলিয়া গেল, ক্রমে দিগন্তের সীমায় মিশিয়া অদৃশ্য হইল, আর কিছুই দেখা গেল না, মুন্নার যাহা কিছু ছিল সব দিগন্তের পরপারে গিয়া হারাইয়া গেল। সত্যই পিতা মুন্নাকে ফেলিয়া গেলেন। মুন্না তাহার পরেও কিছুক্ষণ সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল, এখনও যেন সেই নৌকাখানি দেখিবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যখন দেখিল, সারারাত-দিন দাঁড়াইয়া থাকিলেও সে নৌকা আর ফিরিবে না,—যখন বুঝিল হয়ত বা এ জনমেই আর তাহা ফিরিবে না—তখন অশ্রুজলের সহিত তাহার হৃদয় যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিল; কি করিবে, কোথা যাইবে—ভাবিয়া না পাইয়া ছুটিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল—যে গৃহে তাহার স্বামী ঘুমাইতেছিল অজ্ঞাতভাবে সেই দ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—তখন যেন তাহার চৈতন্য হইল, আস্তে আস্তে চোখের জল মুছিয়া নিঃশব্দপদনিক্ষেপে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

সমস্ত রাত বাহির বাটীতে সুরাপানে মত্ত থাকিয়া সলেউদ্দীন শেষ রজনীতে নিতান্ত বিভোর হইয়া সেই কক্ষেই শয়ন করেন, অন্তঃপুরে শুইতে আসা আর তাঁহার পোষাইয়া উঠে না। মুন্না প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার নিদ্রিত স্বামীকে দেখিতে আসে, কতক্ষণ দাঁড়াইয়া সাধ মিটিয়া একবার দেখিয়া লয়, স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই আবার চলিয়া যায়। আজও মুন্না সেইরূপ আসিয়া দাঁড়াইল, আজ মুন্নার শূন্য প্রাণের ভিতর দুঃখের উচ্ছ্বাস কি বেগে উথলিয়া উঠিয়াছে—আর সে সামলাইতে পারিল না, ধীরে ধীরে স্বামীর পদতলে আসিয়া বসিল, স্বামীর পা দুইটি বুকের মধ্যে চাপিয়া মাথাটি নীচু করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনে মনে বলিল "মুন্নার আর যে কেহ নাই, একমাত্র স্নেহের পিতা তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। স্বামী, প্রাণ সর্ব্বস্ব—তুমি এখনো কি একবার এই অভাগিনীর মুখের দিকে চাহিবে না?

সলেউদ্দীন ঘুমের ঘোরে পা টানিয়া লইলেন—মুন্নার মাথায় পায়ের আঘাত লাগিল। মুন্না তখন অবনত মাথা উঠাইয়া ধীরে ধীরে সেই পদে চুম্বন করিল, ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত চরণ অঞ্চলে মুছিয়া একবার সমস্ত হৃদয়ভরে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া, একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর মনের ব্যথা মনে চা-

পিয়া, চখের জল চোখে রাখিয়া গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাগন্ত স্বপ্ন।

মহম্মদ মসীনের সকালে সন্ধ্যায় নিয়মিত দুইটি কাজ ছিল, সকালে কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ সঙ্গীত চর্চ্চায় কাটাইতেন। কিন্তু কয়দিন হইতে এসবে তাঁহার যেন ঢিলটান পড়িয়াছে, ব্যায়াম করিতে ত প্রায়ই সুবিধা হইয়া উঠে না, গানের মজলিসটা, নিয়মিত বসে বটে, কিন্তু তাহাও তেমন আর জমাট বাঁধে না। গায়ক ভোলানাথ যে গান করিতে যান মসীন তাহাই অপসন্দ করিয়া বসেন। "ভোলানাথ বাহারে আর তেমন কড়ামিঠে লাগাইতে পারেন না," "তাঁহার বেহাগে কড়িমধ্যম ফুটে না," "ইমনগুলা কড়ি-মধ্যমের জ্বালায় ঘ্যানর ঘ্যানর করে," এইরূপে কোন গানই মসীনের মনের মত হয় না। তাঁহার জ্বালায় ভোলানাথও তিতবিরক্ত হইয়া, ক্রমে সত্যসত্যই গানের বদলে কান্নার সুর ধরিয়া বসেন, রাগ গুলায় বিরাগ করিয়া তুলেন, বেগতিক দেখিয়া বন্ধুরা একে একে উঠিয়া যায়, ভোলানাথও তানপূরাটাকে আছড়াইতে আছড়াইতে রাখিয়া চলিয়া যান, যত রাগ তাঁহার তানপূরার উপর আসিয়া পড়ে।

এরূপ করিয়া ত আর ভোলানাথের প্রাণ বাঁচে না, ভোলানাথের বয়স কাঁচা না হইলেও মনটা বড় কাঁচা, প্রাণটা বড় সখের, গায়কদিগের প্রাণের ধর্ম্মই বুঝি এরূপ। বনের পাখীর মত হাসিয়া গান গাইয়াই এ প্রাণ কাটাইতে চাহে। মহম্মদের বেখোস মেজাজ, তাঁহার বড়ই খারাপ লাগে, মহম্মদ যে বিষন্ন আনমনে বসিয়া বাহারকে বেহাগ বলিয়া খুৎ ধরিয়া বসেন, গান না শুনিয়া গানের সমালোচনা করিতে থাকেন, তাহাতে বৃদ্ধ ভোলানাথ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যতক্ষণ না ইহার প্রতিবিধানের একটা উপায় দেখিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণটা সুস্থ হইতেছে না।

আজ আহারান্তে মসীন সন্ধ্যার পর মজলিসস্থলে আসিবামাত্র ভোলানাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বাতাসটা আজ যেন দক্ষিণদিক থেকে বইতে সুরু করেছে, একটা সময়-মাফিক গান গাইলে হয় না?" মসীনও হাসিয়া বলিলেন—"ওস্তাদজি দক্ষিণে বাতাস কোথায় পেলে? মহা উত্তরে বাতাস, আমরাত মারা গেলেম" ওস্তাদজি মুস্কলে পড়িয়া চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে বলেন কি? এখনো উত্তরে বাতাস? এ বুড় হাড়ে সে বাতাস লাগলে যে আর উঠতে পারব না"—মসীন বলিলেন "তোমার প্রাণের ভিতর যে সারাদিন বসন্ত বাতাস বইছে, উত্তরে বাতাস কি তোমাকে ছুতে সাহস করে ওস্তাদ জি" ভোলানাথ হুঁ হুঁ করিয়া একটু হাসিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—"বাতাস বইছে আর কই, প্রাণের ভিতর আটকা পড়ে গেছে' মসীন বলিলেন—"তা আটকা পড়বার আবশ্যক কি, বহুক না যত পারে বহুক, গান টান কি হবে চলুক"—ভোলানাথের প্রাণের মত কথা হইল, মহা আহ্লাদে একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কিন্তু হুজুর আপনার আকাশ পানে চেয়ে থাকলে চলবে না, এই দখিনে বাতাসটা গায় লাগান চাই—" মসীন বলিলেন "যে আজ্ঞে ওস্তাদজি—তাই হবে"

ক্রমে মহম্মদের বন্ধু বান্ধবগণ একে একে মজলিসে আসিয়া বসিলেন, ভোলানাথ তানপূরা লইয়া বসন্ত বাহারের রাগ ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন, ভোলানাথ আগে হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে কিছুদিন আর গান ধরিবেন না।

সপ্তসুরে ছুঁইয়া ছুঁইয়া, মধ্যম হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে সপ্তমে, সপ্তম হইতে সপ্তমে সে তান উঠিতে পড়িতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে উঠিয়া পড়িয়া, সুরে সুরে মিলিয়া মিলিয়া, মধুর মধুভাবে সে তান চারিদিক ভরিয়া তুলিল। সে তানে মলয়ের হিল্লোল উঠিল, কোকিলের কূজনি ছুটিল, তানে তানে, প্রাণে প্রাণে নব বসন্তের ফুল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

মহম্মদ কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত জগৎ ভুলিয়া গেলেন, সুখের প্রবাহ ঢালিয়া অবিশ্রান্ত অবিরত সেই মধুর তান মাত্র তাহার প্রাণে গিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, ফুলের বাতাসের মত হৃদয়কে মত্ত করিয়া দিয়া

ক্রমে সে তান তাহার প্রাণের দিগন্তে গিয়া মিলাইয়া পড়িল, সে তানের ঝঙ্কারও আর তিনি শুনিতে পাইলেন না। দেখার অতীত শোনার অতীত ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত অস্পৃষ্ট কি এক অপূর্ব্বভাবে শুধু হৃদয় পূরিয়া গেল। সহসা শত শত আলোক ছটায় ফুটিয়া, চারিদিক আলোকে আলোকে ছাইয়া জ্যোতির্ম্ময় রূপে সে ভাব তাঁহার সমুখে বিরাজ করিতে লাগিল, বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মসীন সেই আলোক ছটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই জ্যোতির উচ্ছ্বাস মধ্যে যেন একটি ছায়া ভাসিয়া উঠিল, ক্রমে সে ছায়া একটি অস্পষ্ট ছবির আকার ধারণ করিল, মসীন অনিমেষনেত্রে সেই ছবি দেখিতে লাগিলেন, ছবি অতি অস্ফুট, অতি ভাস ভাস, তাহাকে চেনা যায় না, তাহাকে চোখে ধরা যায় না, দেখিতে দেখিতে তাহা কিছু পরিস্ফুট হইল, সে ছবি একটি রমণী মূর্ত্তি; সে মুখে পাপ তাপের মলিনতা নাই, দুঃখ বিষাদের রেখা মাত্র নাই, স্বর্গীয় শান্তিভাবের সে মূর্ত্তি জীবন্ত প্রতিমা। মহম্মদ তাঁহাকে চিনি চিনি করিয়া আকুল হইলেন, সহসা চারিদিকের আলোকছটা ছবির উপর নিক্ষিপ্ত হইল, সে আলোকে মুন্নার শান্তিময়ী প্রতিমা জ্বলিতে লাগিল। সে প্রতিমার কাছে আর একজনকে মসীন দণ্ডায়মান দেখিলেন, তিনি সেই সন্ন্যাসী।

নিস্তব্ধে স্থির কটাক্ষে মহম্মদ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সঙ্গীত থামিল, মসীনের যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, নিমেষে সেই আলোক

সেই ছবি মিলাইয়া গেল, তিনি বুঝিলেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সেদিনের মত গানের মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল, মসীন মুন্নার কাছে গেলেন।

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস।

শ্রীপুরের ভৌমিক চাঁদরায় ও কেদার রায়।

যে ব্যক্তি পিতৃব্যের প্রাণ বধ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন,—যাঁহার ভুজবলে দক্ষিণাপথে সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান পতাকা সংরোপিত হইয়াছিল সেই খ্যাতনামা দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি আলাউদ্দিন বাদসাহের সময়ে কায়স্থ জাতীয় নিমচাঁদ রায় ও রাজারাম রায় নামে দুই ভাই দিল্লীর রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের বংশীয় পদবী "দেব"। কোনও লেখক ইহাদিগকে কর্ণাটী কায়স্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইঁহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অম্বষ্ঠ কায়স্থ।

আল্লাউদ্দিন বাদসাহের রাজ্যশাসনের চরমাবস্থায় পূর্ব্ব-বঙ্গ মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। বাহাদুর খাঁ সুবর্ণগ্রাম প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা। সম্ভবত তাহার নিয়োগ কালেই দিল্লীশ্বরের অনুমতি ক্রমে নিমচাঁদ ও রাজারাম পূর্ব্ব-বঙ্গে উপস্থিত হন। ভ্রাতৃদ্বয় পারস্য ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই শাসনকর্ত্তার মুনসী খানার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, "পত্রনবিস" তাহাদের কার্য্যের খেতাব-ছিল।

আড়াফুলবাড়িয়া গ্রামে নিমাই রায় প্রথমেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। সে কয়েক খানা পল্লি গ্রাস করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যে গঙ্গা কীর্ত্তিনাশা আখ্যা ধারণ করিয়াছেন, আড়াফুলবাড়িয়া তাহার মধ্যে একখানি।

নিমাই ও রাজারামের বংশধরগণ সকলেই যত্নসহকারে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া "পত্রনবিস" দপ্তরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

নিমাই রায়ের পৌত্র মুকুট রায়ের দুই পুত্র জন্মে, যথা চাঁদরায় ও সূর্য্যরায়। চাঁদরায় শৈশবকালে মৌলবি আমিরবক্সের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। আরব্য পারস্য ভাষায় তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। পিতৃবিয়োগের পর তিনি নবাব সরকারে নিযুক্ত হন। ঘটনা ক্রমে তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি দিল্লীর রাজসভায়ও ঘোষিত হইতে লাগিল। গুণগ্রাহী মোগল সম্রাট হুমায়ুন চাঁদরায়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনমাস দিল্লীতে অবস্থানের পর হুমায়ুন তাহাকে কর্ণাট প্রদেশের দেওয়ানী আহেলকারের (জজ) পদে নিযুক্ত করেন। তৎপর হুমায়ুনের চরমাবস্থায় কিম্বা সের সুরের

সময়ে চাঁদরায় বিক্রমপুরের প্রথম "ভৌমিক" উপাধি লাভ করেন।

আধুনিক জমিদারদিগের ন্যায় কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করা ভৌমিকদিগের কার্য্য ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহে হস্তি, অশ্ব, পদাতি, ও রণতরী দ্বারা রাজার সহায়তা করিতে তাঁহারা বাধ্য ছিলেন। রাজচিহ্নোচিত আসা সোটা, নিশান ডঙ্কা প্রভৃতি তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে যাইত। আধুনিক "রাজা বাবু" বা "মহারাজাধিরাজ"দিগের ন্যায় ভৌমিকগণ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের "বিদ্যাভূষণ" উপাধির ন্যায়, অকর্ম্মণ্য রাজচিহ্ন ধারণ করিতেন না। তাঁহাদিগের সহিত প্রাচীন কালের সামন্ত রাজগণের কোন প্রভেদ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রবল পরাক্রান্ত ভৌমিক চাঁদরায়ের সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

"——— চাঁদ রায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যু বৃত্তি কাম॥
তিনলক্ষ মুদ্রা খায় কর নাহি দেয়।
নবাব আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সঙ্গে যুদ্ধে না পারয়॥
শক্তি মন্ত্রে উপাসক দুর্গোৎসব করি।
প্রজা দণ্ড করি লয় পূজা ছল করি॥
ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো ব্রাহ্মণ আদি বধ করিতে না ডরে॥"

চাঁদরায় গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, সুতরাং ভক্তমাল-প্রণেতা তাহার কার্য্য-কলাপ সদাশয়তার সহিত লিপিবদ্ধ করেন নাই। চাঁদরায়ের ইষ্টদেবতা ব্রহ্মাণ্ডগিরির সম্বন্ধে আমরা শৈশবাবধি নানা প্রকার প্রবাদ শুনিয়া আসিতেছি। প্রবাদ আছে তিনি একদা মৃণ্ময়ী কালীর জানু বিদারণ করিয়া প্রচুর পরিমাণ রুধির বাহির করিয়াছিলেন। এক দিবস অমাবস্যা রাত্রে ভ্রম বশত পূর্ণিমা বলিয়া পূর্ণচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন। আর এক দিন অর্থাভাবে শৌণ্ডিকালয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া সার্দ্ধদ্বিপ্রহর সূর্য্যদেবকে ঠিক গগনমণ্ডলের মধ্য ভাগে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, ইত্যাদি। বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে রামভদ্রপুর নিবাসী গোস্বামীগণ পূর্ব্ব হইতে এই বংশের কুলগুরু ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডগিরি কিছুকালের জন্য তাহার একজন উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু ভক্তমাল-প্রণেতা বলেন ইহাঁরা পূর্ব্বে শাক্ত ছিলেন পরে ঘটনা চক্রে কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করেন।

চাঁদরায়, বসু পরিবারে বিবাহ করেন। বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্র কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * পুত্রের নামানুসারে চাঁদ এক নূতন বাটী

* ডাক্তার ওয়াইজ কেদাররায়কে চাঁদরায়ের ভ্রাতা লিখিয়াছেন। যাঁহারা কেবল ওয়াইজ সাহেবের লেখা অবলম্বন করিয়া ভৌমিকদিগের ইতিহাস লিখিতে যত্ন করিয়াছেন তাহারাও ওয়াইজের ন্যায় ভ্রমমার্গে পাদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। ঘরানা বংশাবলীতে কেদারকে চাঁদের পুত্র লেখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাসেও বারংবার কেদারকে চাঁদের পুত্র বলা হইয়াছে। (ঐ ইতিহাসের ৮৬ ও ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।)

নির্ম্মাণ করত তাহাকে কেদার-বাটী নাম দিয়া সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজারাম রায়ের বংশধরগণ রাজাবাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। রাজারামের নাম অনুসারেই উক্ত স্থানের নামকরণ হইয়াছে। কেদার বাটীর চতুর্দ্দিকে গড় কাটা হইয়াছিল। †

চাঁদরায় তারা-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তারাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন জন্য চাঁদরায় এক সুদৃশ্য ও বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। চাঁদরায় বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাটীতেও এক বৃহৎ "চিলছত্র" নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সোনামণি নাম্নী কন্যা চাঁদ রায়ের শেষ সন্তান। নয় বৎসর বয়ঃক্রমে এই কন্যার বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। বিবাহের ৮ মাস পরে সোনামণি বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শিশু কন্যাকে দর্শন করিয়া চাঁদরায় একপ্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

হায়! হায়! এইরূপ শত শত বঙ্গগৃহে শিশু-বিধবাদিগকে দর্শন করিয়াও বঙ্গবাসীদিগের চৈতন্য হইতেছে না। এইরূপ চিরশান্তিময়-গৃহ বঙ্গদেশে অতি বিরল যেখানে বাল-বিধবার শোকাশ্রু পতিত হয় নাই। এইরূপ শিশুকন্যার বৈধব্য দর্শনে কত পিতা মাতার হৃদয় অবিরাম দগ্ধ হইতেছে। কৈ তাঁহারা ত অগ্রসর হইয়া জঘন্য দেশাচারকে কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইতেছেন না। ধন্য প্রমথভূষণ! প্রমথভূষণের ন্যায় ভূস্বামী কি বঙ্গদেশে নাই? তাঁহারা নিজ গৃহে, প্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গের গৃহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদের হৃদয় কি এমনই পাষাণ নির্ম্মিত, যে বালবিধবাদিগের উত্তপ্ত শোকাশ্রুতেও তাহা গলিত হইবে না। শিশু হতভাগিনীদিগের প্রতি দয়া করিবার জন্য মানব যদি এদেশে না থাকে তবে এই দেশ রসাতলগামী হউক, বাঙ্গালার নাম পৃথিবীর মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হউক, বাঙ্গালা বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শে প্রবিষ্ট হউক।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন যে সুবর্ণগ্রামের ভৌমিক ঈশা খাঁ একবার শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া সেই বাল বিধবা সোণামণিকে অপহরণ পূর্ব্বক লইয়া গিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ‡ বঙ্গবাসি! অদ্যাপি কি বঙ্গদেশে এরূপ কাণ্ড হইতেছে না! বাল বিধবাগণ যে কত স্থানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কুল পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্ককালিমা দ্বারা আত্মীয় বর্গের মুখ ম্লান করিতেছেন। কত প্রকার পাপ কার্য্য দ্বারা বঙ্গদেশ কলুষিত করিতেছেন। এই সকল

† বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক বলেন যে, গড়খাইর মধ্যস্থিত কেদার বাটীতে এক্ষণ ৪৫০ টাকা স্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ কোন একটী পল্লিতে কত পরিমাণ ভূমির রাজস্ব ৪৫০ টাকা হইতে পারে তাহা মফঃস্বল বাসী পাঠকগণ অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন।

‡ J. A. S. Bengal Vol. XLIII part I. page 202.

দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমরা কলির ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি পরাশরের মতানুসরণ করিবে না? ধীশক্তিসম্পন্ন দূরদর্শী মহাত্মা পরাশর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
চতুর্থ অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

বাল বিধবা কন্যার বৈধব্য-শোকে অধীর হইয়া চাঁদরায় বৈষয়িক কার্য্য হইতে হস্তোত্তোলন করিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কেদার রায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ৮৩ বৎসর বয়সে শিশু কন্যার বৈধব্যশোক হৃদয়ে লইয়া চাঁদ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ কার্য্যে দ্বাদশ ভৌমিকের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

বীরচূড়ামণি কেদার রায় মোগল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। যে কয়েক জন ভৌমিকের বাহুবলে দীর্ঘকাল সম্রাট আকবরের বিজয় বৈজয়ন্তী বাঙ্গালায় সংরোপিত হয় নাই, কেদার তাহার মধ্যে একজন। তাঁহার শাসনকালে সুবিখ্যাত ইংরাজ ভ্রমণকারী রলফ ফিছ বাকলা হইতে শ্রীপুরে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন।

From Bacola I went to Seereepore, which standeth upon the river Ganges, the king is called Choudery. They be all here about rebels against their king Zebaldin Echeber: * for here are so many rivers and islands, that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot privail againest them. Great store of cotton cloth is made here.

* জালালদ্দিন আকবর।

পর্ত্তুগিজ লেখক ডু'জারিক "দ্বাদশ ভৌমিক রাজ্যের" বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন "পাঠান রাজ এই সকল ভৌমিকের সাহায্যে মোগলদিগকে বাঙ্গালা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

ডি' আবিটি, জারিকের বাক্য পোষণ করিয়া বলেন, এই দ্বাদশজন নরপতির মধ্যে শ্রীপুর পতি—(কেদার রায়,) চাঁদখাঁর ঈশ্বর (প্রতাপাদিত্য) ও (খিজিরপুরের ঈশাখাঁ) মছনদেআলীই প্রধান। পোরচাস লিখিয়াছেন "১৬০২ খৃষ্টাব্দে সনদ্বীপের অধিকার লইয়া মগ, মোগল, পর্ত্তুগিজ ও হিন্দু এই চারি জাতির মধ্যে একটি তুমুলকাণ্ড হইয়াছিল। এই দ্বীপ তৎকালীন কেদার রায়ের অধিকারে ছিল। আকবরের সেনাপতিগণ ইহা অধিকার করেন। তৎপর পর্ত্তুগিজগণ মোগলদিগকে জয় করিয়া সনদ্বীপের আধিপত্য গ্রহণ করিল। আরকাণরাজ পর্ত্তুগিজদিগের অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে একবহর রণতরী প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধে আরাকানপতি কেদার রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি পর্ত্তুগিজদিগের প্রতিকূলে ১০০ এক শত রণতরী (কোষা) প্রেরণ করেন। পর্ত্তুগিজ লেখক লিখিয়াছেন, যদিও এই যুদ্ধে পর্ত্তুগিজেরাই জয়লাভ ক-

রিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা কেদাররায়ের সহিত সন্ধি করিয়া সনদ্বীপ উপভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া লঙ্কা বিজয় করিতে ধাবিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে জাতির জলরণপাণ্ডিত্যের খ্যাতি উজ্জয়িনা নগরনিবাসী কবিকুল তিলক কালিদাসের কর্ণগোচর হইয়াছিল, ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজকগণ যে জাতির অর্ণব পোত সকল মহাসমুদ্র বক্ষে ভাসমান দর্শন করিয়াছিলেন, ১৬০২ খৃষ্টাব্দে সেই বাঙ্গালি জাতির—সেই গৌরব-সূর্য্য বঙ্গোপসাগরে সনদ্বীপ সমক্ষে অস্তমিত হইল। আর কি তাহার উদয় হইবে না? আর কি বাঙ্গালী সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া দেশদেশান্তরে বিচরণ করিবে না? আর কি বাঙ্গালি জাতির অর্ণব-পোত সমূহের উন্নত পতাকার-প্রতিবিম্ব সৌরমণ্ডল উপকূলে, † সিংহল, যব, বালী দ্বীপে পতিত হইবে না। আর কি বঙ্গীয় নাবিকদিগের সুমধুর ভাটীয়াল-গীত সামুদ্রিক হিল্লোলে নৃত্য করিয়া মহাসমুদ্রগামী ভিন্ন-দেশীয় মানবদিগের কর্ণকুহরে অমৃতধারা সিঞ্চন করিবে না?

কেদার রায় বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজ পতি ছিলেন। বিক্রমপুরের কুলীন কায়স্থগণ "সাড়ে তিন মেলে" বিভক্ত, যথা মাল খাঁ নগরের বসু, পঐল দিয়ার ঘোষ ও শ্রীনগরের গুহ (মস্তফী)। এই তিনমেল ও কাঠালীয়ার দত্তগণ অর্দ্ধ কুলীন। রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ এক মূল হইতে উৎপন্ন, প্রাচীন কালে বঙ্গজ কায়স্থগণ তিন সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের সমাজ, বাকলার (চন্দ্রদ্বীপের) সমাজ, ও যশোর বা প্রতাপাদিত্যের সমাজ।

রল্‌ফ ফিচ্ বলেন শ্রীপুর, সুবর্ণগ্রাম হইতে ছয় লিগ দূরবর্ত্তী। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সুবর্ণগ্রাম হইতে শ্রীপুরের দূরত্ব-গণনায় ফিচের ভ্রম হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীপুর গঙ্গা ও মেঘনাদ নদের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। ব্রোকের মানচিত্রে শ্রীপুর Zerepoer প্রধান নগরী রূপেই চিত্রিত রহিয়াছে। ব্রোক Zerepoer এর নিকট Ceerpoer Fringe নামে একটী নগর অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রফেসার ব্লকমান ভ্রমক্রমে ইহাকেই শ্রীপুর নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে উক্ত Ceerpoer Fringe আধুনিক রিকাবী বাজারের নিকটবর্ত্তী ফেরিঙ্গী বাজার। বৃদ্ধ মার্সমান ও এই ফেরিঙ্গী বাজারের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এক সময়ে শ্রীপুরের যথেষ্ট উন্নতি ছিল;

† "সৌরমণ্ডল" অধুনা করমণ্ডল নামে পরিচিত। সৌরমণ্ডল কিরূপে করমণ্ডল হইল তাহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, 'স' এর উচ্চারণ "ছ"। তদনুসারে ইউরোপীয়গণ ইহাকে ছৌরমণ্ডল শ্রবণ করিয়া "C" অক্ষর নামের অগ্রে সন্নিবেশিত করেন। তৎপরেই আমাদের ও অন্য বিলাতী মানবাদিগের কৃপায় "C" "ক" এ পরিণত হইয়াছে।

এস্থান হইতে কার্পাস বস্ত্র য়ুনানী-মণ্ডলে ও চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইত। পরিব্রাজক ফিচ্ আমাদের এক জন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বৃহৎ তোপ প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীপুরে উপযুক্ত কর্ম্মকার ছিল।

কেদার রায় কার্ত্তিকপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি সেই স্থানটী কেদার বাটী নামে পরিচিত রহিয়াছে। তিনি কেদারপুর নামে আর একটী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য দ্বারা কেদারপুরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ব্রোকের মানচিত্রে Chedderpoer বৃহৎ নগরী রূপে চিত্রিত আছে। অদ্যাপি বিক্রমপুরের মধ্যে একটী স্থান কেদারপুর নামে পরিচিত, কিন্তু তাহার প্রাচীন উন্নতির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্ত্তিসমূহ গ্রাস করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যে গঙ্গা কীর্ত্তিনাশা আখ্যা ধারণ করিয়াছে। সেই করালকালরূপিণী কীর্ত্তিনাশার তীরভূমিতে প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্নসমূহ দর্শনের আশা দুরাশা। বঙ্গ প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে (উড়িষ্যা, চুটীয়ানাগপুর, আসাম ও ত্রিপুরায়) প্রাচীন উন্নতির কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ রাশি রাশি উচ্চ-চূড় মন্দির ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গে তাহার কোন চিহ্ন নাই, এক মাত্র গঙ্গাই ইহার কারণ।

কীর্ত্তিনাশার উত্তর তীরে একটী মঠ ও দীর্ঘিকা অদ্যাপি কেদার রায়ের কীর্ত্তি সমূহের চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মঠ সাধারণত "রাজবাড়ীর মঠ" ও দীঘি "কেশার মার দীঘি" নামে পরিচিত রহিয়াছে।

মোগল সম্রাটের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিয়া কেদার রায় কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। তথাপি তাঁহার অবশিষ্ট যে সম্পত্তি ছিল তাহা তাঁহার বৈদ্য বংশীয় দাস রঘুনন্দন দাস, তাঁহার মৃত্যুর পর অপহরণ করেন। এই রঘুনন্দন দাস নওপাড়ার চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ। ইহাঁরা এক সময়ে বিক্রমপুরের বৈদ্যসমাজপতি ছিলেন। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে দুই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে দুই জন বৈদ্য অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই কায়স্থ জাতির পদসেবা করিয়া আপনাদের উন্নতির সূত্রপাত করেন। একজন কেদার রায়ের ভৃত্য রঘুনন্দন দাস, অন্য ব্যক্তি মালখাঁ নগরের বসুদিগের ভৃত্য খ্যাতনামা রাজা রাজবল্লভ সেন।

শ্রীহট্ট নর্ম্মাল স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আমাদিগকে চাঁদ-কেদারের এক খানা ঘরানা বংশাবলী ও পরিবার মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদাদি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই প্রবন্ধে তাঁহার লিখিত বংশাবলী ও প্রবাদ সমূহ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তাহার লিখিত বংশাবলী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম কিন্তু ইহা আমাদের নিকট অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে, যদি কোন পাঠক এই বংশের এক খণ্ড সম্পূর্ণ বংশাবলী আমাদিগকে প্রদান করেন, তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব। বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আপনাকে কেদার রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তিনি আরও বলেন যে ইহারা "ঘৃতকৌষিক" গোত্রীয় "দে" বংশজ।

বংশাবলী।

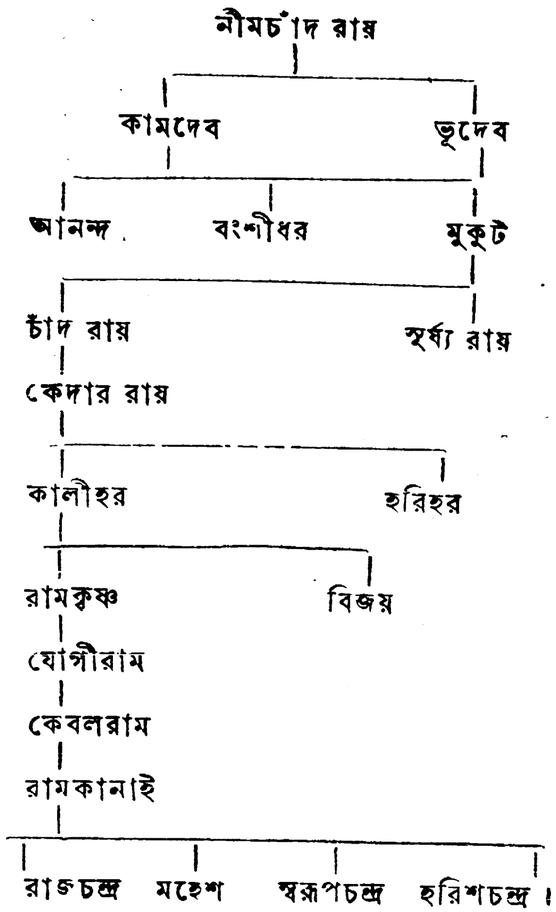

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

বিদায়।

হেথা হতে যাও, পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে!
আবার বাজিছে বাঁশি,
আবার উঠেছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
সুনীল আকাশ পরে
শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে—
পাখীরা ঝাড়িছে পাখা,
কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে
আলো ঝিকিমিকি করে—
ছায়া কাঁপিতেছে থর থর,—
জলের পানেতে চেয়ে
ঘাটে বসে আছে মেয়ে—
শুনিছে পাতার মরমর।

কি জানি কত-কি আশে
চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে!
সবাই ত ভুলে আছে—
কেহ হাসে কেহ নাচে,
—তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে!
বাতাস যেতেছে বহি
তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস!
সুদূরে বাজিছে বাঁশি,
তুমি কেন ঢাল' আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস!
উঠেছে প্রভাত রবি,
আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া!
বারেক যে চলে যায়,
তারে ত কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া!
তবু কেন সন্ধ্যাকালে
জলদের অন্তরালে
লুকায়ে, ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে
পুরাণো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়!
কি দেখিতে আসিয়াছ!
যাহা কিছু ফেলে গেছ
তাদের কে করিবে যতন!
স্মরণের চিহ্ন যত
ছিল পড়ে দিন-কত
ঝ'রে-পড়া পাতার মতন!
আজি বসন্তের বায়
একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতি দিন;
ধূলিতে মাটিতে রহি
হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাক তবে ঢাক মুখ
নিয়ে যাও সুখ দুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে।
হেথায় আলয় নাহি;
অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাল্যবিবাহ।

প্রতিবাদ।

ফাল্গুন মাসের "ভারতীতে" বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমি ঐ প্রবন্ধটি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। বাল্যবিবাহ দ্বারা যে আমাদের সমাজের অনেক উপকার হইতেছে তাহা দেখাইবার জন্য প্রবন্ধলেখক বাল্যবিবা-

হের বিরুদ্ধ-আপত্তি সকল যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু আমার সেই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিবার আছে।

১ম তর্ক। বাল্যবিবাহে পতি পত্নীর এবং পত্নী পতির মনোমত হয় না ইত্যাদি।

লেখক বলেন যুবক যুবতীগণ আপন আপন স্ত্রী ও স্বামী প্রকৃতরূপে পসন্দ করিয়া লইতে পারে না। সেই জন্য লেখকের মতে পিতা মাতা,পুত্র কন্যার স্ত্রী ও স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া দিলে পুত্র কন্যার মঙ্গল হয় ও দাম্পত্য প্রেমের বন্ধন চিরজীবনের জন্য স্থায়ী হয়। এই যুক্তি দ্বারা লেখক যৌবন-বিবাহ অপেক্ষা বাল্যবিবাহের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমি লেখককে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। বিবাহটা কি স্বাভাবিক না কেবল একটা সর্ব্ববাদী সম্মত সামাজিক ব্যাপার? লেখক বার বার দুইটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন "বাল্যবিবাহ" ও "যৌবন বিবাহ।" আমি ত বাল্যবিবাহের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারি না। "বাল্যবিবাহ" কথাটা যেন ঠিক "সোনার পাথর বাটির" মত। প্রকৃত বিবাহ যাহা তাহা কি কখন বাল্যকালে সম্ভবে? বিবাহ ত যৌবনের ধর্ম্ম। যুবক যুবতী ভিন্ন কি কখন প্রকৃত বিবাহ হইতে পারে? প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বভাবের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অগ্রে বুদ্ধিমান মানুষ বিবাহ কার্য্যটা সমাধা করিয়া কি কখন সুখী হইতে পারে? যুবক যুবতী অনেক সময় শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যায়, তাহাদের পরস্পরের গুণের ও রুচির প্রতি তত লক্ষ্য থাকে না. এই জন্য রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়া অনেক যুবক ও যুবতী শেষে অনুতাপ করিয়াছেন। লেখকের মতে সেই জন্য যৌবন বিবাহ দোষাবহ।' বৃদ্ধ পিতা মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকের উপর বর ও কন্যা নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে এরূপ হয় না। কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিক সত্য? আমি বলি কখনই নয়। যুবক, যুবতীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন বৃদ্ধ পিতা মাতা হন না লেখককে তাহা কে বলিল? আজকাল হিন্দু সমাজে বিবাহের সময় কন্যার রূপ ছাড়া যে আর কিছু দ্রষ্টব্য আছে তাহা কেহই মনে করেন না। "মেয়েটি ভাল" মানে কি "মেয়েটি দেখিতে ভাল" নয়? সুন্দর জামাই করিব ও সুন্দর বউ করিব অনেক পিতা মাতার কি কেবল এই উদ্দেশ্য নহে। লেখক যে যুক্তি দ্বারা যৌবন বিবাহের দোষ দেখাইয়াছেন আমি ঠিক সেই যুক্তি দ্বারাই বাল্যবিবাহের দোষ দেখাইতেছি। পিতা মাতা অর্থলোভী হইয়া পুত্র কন্যার রূপ, গুণ ও রুচির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগের বিবাহ দেন এই জন্য পরে স্ত্রী ও স্বামীর সহিত মনের মিল হয় না, দিবারাত্র কলহ হইয়া থাকে। লেখক হয়ত ইহার উত্তরে বলিবেন পিতা মাতা শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে এ আশঙ্কা থাকে না। আমিও বলিব যুবক যুবতীগণ শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে লেখক যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা থাকে না। বাস্তবিক যৌবন

কালে স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিলে যদি কিছু অমঙ্গল হয়, যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ যুবক যুবতী কেবল পরস্পরের শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়া ফেলেন ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ হইলে আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা না থাকে তাহা হইলে সে দোষ যৌবন কালে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া হয় নাই, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা করেন নাই বলিয়া হইয়াছে। লেখক বলিবেন পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার ভার পিতা মাতার। আমি বলি পুত্র কন্যাকে বিবাহ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া পিতা মাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তবে পুত্র কন্যা বিবাহ করিবার সময় পিতা মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকের মত ও পরামর্শ লইতে পারেন। শুদ্ধ পারেন কেন পিতা মাতার মত গ্রহণ করা তাঁহাদিগের উচিত। আজ কাল হিন্দু সমাজে যে প্রকার বিবাহ প্রথা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে শিক্ষিত যুবক শিক্ষিতা যুবতীর বিশেষ সাবধান হইয়া চলা একান্ত আবশ্যক। পিতা পুত্রের বিবাহ দিবেন, কারণ পুত্র এণ্ট্রেন্স পাস দিয়াছেন। ঘটক উপস্থিত। পিতা ঘটককে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন "পাওনা গণ্ডা কেমন, কয় হাজার টাকা দেবে?" ঘটক যদি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে অনেক স্থলে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জিজ্ঞাসা আবশ্যক হয় না। কিন্তু দিয়া মেয়ের মুখ দেখা একটা রীতি আছে তাই পিতা মহাশয় একবার মেয়ে দেখ্‌তে যান। কিন্তু সে দেখার উপর বিবাহ দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করে না। বিবাহের এরূপ কুপ্রথা প্রচলিত থাকিতেও কি লেখক মহাশয় শিক্ষিত যুবকদিগকে পিতা মাতার উপর বিবাহের সম্পূর্ণ ভার দিতে বলেন? যদি বলেন, তাহা হইলে আমার মতে কোন শিক্ষিত যুবকের লেখকের কথা শুনা উচিত নহে। আর একটা কথা আছে, আমাদের হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে পিতা মাতা কখন বিবাহ সম্বন্ধে পুত্র কন্যার মনোগত ভাব ও রুচি জানিতে পারেন না। কি প্রকারে জানিবেন? পুত্র বন্ধু বান্ধবের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেছেন এমন সময় পিতা আসিয়া পড়িলেন, অমনি সকলে নিস্তব্ধ। পুত্র গুন্ গুন্ করিয়া একটি জাতীয় সঙ্গীত অথবা ব্রহ্ম সঙ্গীত করিতেছেন, এমন সময়ে পিতা আসিয়া পড়িলেন, অমনি পুত্র জড় শড় হইয়া চুপ করিল! যে সমাজে পিতা পুত্রে প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন না সে সমাজে পিতা কি করিয়া পুত্র কন্যার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন। লেখক বলিতেছেন বাল্যকাল হইতে স্বামী ও স্ত্রী একত্রে বাস করিলে তাহাদের দাম্পত্য প্রেম দৃঢ় হয়। একথা কি সত্য? দুই এক স্থলে হইলেও হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে হয় না। বালক বালিকাদের পরস্পরের প্রতি যে ভালাবাসা থাকে তাহা কি দাম্পত্য প্রেম না তাহা হইতে দাম্পত্য প্রেম সঞ্চারিত হয়? একটি বালক একটি বালিকাকে ও একটি বালককে বড় ভাল বাসিত। কিন্তু ঐ বালকটি যখন একজন

যুবক হইল তখন সে আর পূর্ব্বোক্ত বালক ও বালিকাটিকে ঠিক এক প্রকারে ভাল বাসিতে ও এক চক্ষে দেখিতে পারিল না।

বালিকা যুবতী হইলে, তখন সে তাহার বাল্যসখার মন আকর্ষণ করিতেও পারে নাও করিতে পারে। বাল্যকালের ভালবাসার উপর সর্ব্বস্থলে যৌবনের ভালবাসা নির্ভর করে না। দাম্পত্যপ্রেম যৌবনকালেই সঞ্চারিত হয় বাল্যকালের ভালবাসা ইহা জন্মাইয়া দেয় না। সেই জন্য বলি আগে হৃদয়ে দাম্পত্যপ্রেমের সঞ্চার হউক তবে তাহাকে দৃঢ় করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা যাইবে। লেখক একটা বড় পাকা কথা বলিয়াছেন "কিন্তু বাল্যবিবাহে বালক স্বামী ও বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে একত্রে একপ্রকার শিক্ষা পাইতে পাইতে তাহাদের উভয়ের মন এক ভাবেই গঠিত হইতে থাকে। ... ... উভয়ের মধ্যে এক-জনের কোন দোষ থাকিলে অন্য জনে ছেলেবেলা হইতে উহা দেখিতে দেখিতে উহাতে একরূপ অভ্যাস হইয়া যায় এবং শেষে আর এইরূপ দোষের তীব্রতা অনুভব করিতে পারে না। ইত্যাদি।" মোট কথা এই, বালিকাগণকে বাল্যকাল হইতে এরূপ প্রকার শিক্ষা প্রদান কর যাহাতে ভবিষ্যতে স্বামীর পাপকে পাপ বলিয়া গণ্য না করে। কি ভয়ানক কথা! স্বামী যদি মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হয় তাহা হইলে ছেলেবেলা হইতে স্ত্রীকে স্বামীর কাছে রাখ তাহাতে স্ত্রী মদ্যপান ও পরস্ত্রীহরণকে দোষ বলিয়া মনে না করিতে পারে। যদি এই প্রকারে স্ত্রীকে স্বামীর মতের সহিত এক হইতে না শিখাও, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রীর মতভেদ ও রুচিভেদ উপস্থিত হইয়া পরিবারে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হইবে। লেখক বড় শান্তিপ্রিয়। কিন্তু এপ্রকার শান্তিপ্রিয়তা প্রশংসিত হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যেক শিক্ষিত ধার্ম্মিক লোকের নিকট অতিশয় নিন্দিত তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বার্থপর পুরুষ! তোমার সুখের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তুমি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্ম বুদ্ধিকে মলিন করিতে চাহ, তুমি স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতে চাহ না, পাছে সে শিক্ষিতা হইয়া আপনার স্বাধীন মত দ্বারা পরিচালিতা হয়, পাছে সে তোমার মতে মত না দেয়। আজ যদি আমাদের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইত তাহা হইলে অনেক স্বামীকে স্ত্রীর সহিত সাবধানে কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার করিতে হইত যথেচ্ছাচারী হইয়া স্ত্রীকে পদ দ্বারা দলন করা বড়কঠিন হইয়া পড়িত। হায়! আজ কত শত বঙ্গনারী পাষণ্ড পাপিষ্ঠ স্বামীর অত্যাচারে কাতর হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া চক্ষের জলে আপনাদের বক্ষস্থলকে প্লাবিত করিতেছেন। কয়জন পুরুষ তাঁহাদিগের চক্ষের জল দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন?

২য় তর্ক। বাল্য-বিবাহে স্বামী স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহাদিগের মধ্যে অসম্মিলনের কারণ হইয়া উঠে—ইত্যাদি।

স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা জানা আর পরস্পরের মন যোগাইয়া কাজ করা কি এক? স্বামী ও স্ত্রী দুর্নীতিপরায়ণ হইলে উভয়ে পরস্পরের মন যোগাইয়া অনেক দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন। তাই বলি স্বামী ও স্ত্রী বাল্য-কাল হইতে এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাহাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না, উভয়ের এক প্রকার রুচি হইতে পারে। স্বামী ও স্ত্রীর কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবার জন্য নীতি শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন কখন কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। ৯। ১০ বৎসরের বালিকা ও ১৬।১৭ বৎসরের বালকের কি কখন স্ত্রী ও স্বামীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধ হওয়া সম্ভব?

৩য় তর্ক। বাল্য-বিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন রুগ্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

লেখক বলিতেছেন অভিভাবকগণের দোষেই বাল্য-বিবাহ দ্বারা বালক বালিকাগণের শরীর ও মন রুগ্ন হইয়া পড়ে। লেখক যে প্রকার তর্ক অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাহাতে ত আমি অভিভাবকগণের কিছু দোষ দেখিতে পাই না। কারণ লেখক পূর্ব্বেই বলিয়াছেন বালক স্বামী ও বালিকা স্ত্রীর ছেলেবেলা হইতে একত্রে থাকা আবশ্যক। অভিভাবক বালক-স্বামী ও বালিকা-স্ত্রীকে একত্র কথাবার্ত্তা কহিতে ও থাকিতে দেন তাহাতে তাঁহাদিগের দোষ কি? একত্রে না থাকিলে ও কথাবার্ত্তা না কহিলে কি করিয়া তাহারা পরস্পরের মনের ভাব জানিতে পারিবে? লেখক মহাশয় যদি বলেন অভিভাবকগণ তাহাদিগকে রাত্রিতে একত্রে শয়ন করিতে দিবেন না ও সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উপর চক্ষু রাখিবেন তাহা হইলে আর কোন অনিষ্ট হইবে না। আমি বলি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে তাহা হওয়া অসম্ভব। হিন্দুসমাজে নবদম্পতীর কথা কহিবার অধিকার নাই। ৮।৯ বৎসরের বউ বালক স্বামীকে দিবা ভাগে কাহার সাক্ষাতে দেখিলে দুই হাত ঘোমটা দিয়া বসেন। সেই জন্য দিবাভাগে তাঁহাদিগের কথা কহিবার সুবিধা না থাকায় অভিভাবকগণ রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অধিকারের কি বিষময় ফল সমাজে প্রতিদিন ফলিতেছে লেখক কি তাহা অবগত আছেন? আমাদিগের দেশে বালিকাদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার যে কি মহানিষ্ট হইতেছে তাহা এখানে লিখিয়া উঠা অসম্ভব। স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের উপযুক্ত সময় স্বয়ং পরমেশ্বর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তবে কেন হিন্দুসমাজস্থ বিজ্ঞ মহাশয়েরা সে সময়ের পূর্ব্বে বিবাহ ও রাত্রিতে স্বামীর সহিত একত্রে শয়ন করিবার অধিকার দিয়া বালক বালিকাগণের শরীর ও মন চিরদিনের জন্য নষ্ট করেন বুঝিতে পারি না। লেখক বলেন বাল্যবিবাহ প্রথা সমাজ হইতে দূর করিয়া দিলে স্কুল কালেজের ছেলেদের চরিত্র কলুষিত হইয়া যা-

ইবে। আমি বলি চরিত্র ভাল হওয়া না হওয়া সঙ্গ ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে বাল্যবিবাহের উপর নির্ভর করে না। কারণ অনেক বয়সে বিবাহ করিয়াও অনেক ছেলে মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়াছে আর অল্প বয়সে বিবাহ না করিয়াও অনেক ছেলে ভাল আছে। তবে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগকে ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা ও পুরুষদিগকে ২৫।২৬ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিলে অনেক স্থলে চরিত্র কলুষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

৪র্থ তর্ক। বাল্যবিবাহে দম্পতী উপযুক্ত রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না ইত্যাদি।

দরিদ্র বাঙ্গালিদিগের অল্প বয়সে বিবাহ করিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই যে শিক্ষার ব্যাঘাত হয় তাহা যিনি না মানিবেন তিনি একজন সুতার্কিক হইলেও আমাদিগের সমাজের অবস্থা জানিতে তাঁহার এখনও অনেক বাকি আছে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। আমাদিগের দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল লোকেরই যে প্রকার অর্থাভাব হইয়াছে যে প্রকার ভয়ানক জীবন সংগ্রাম উপস্থিত, তাহাতে বিবাহ করিয়া শিক্ষা করিবার অবসর পাওয়া দূরে থাকুক, সামান্য অন্ন বস্ত্রের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা ভাবিতে হইতেছে। সাধারণ লোকের যখন এই প্রকার অবস্থা তখন অল্প বয়সে বিবাহ করিলে শিক্ষার কি প্রকার সুবিধা হয় তাহা একটু চিন্তা করিলেই লেখক মহাশয় বুঝিতে পারিতেন। যাঁহাদিগের অর্থসঙ্গতি নাই তাঁহারা অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াও সংসারের ভার লইয়া অর্থ চিন্তায় বিব্রত হইয়া লেখা পড়া শিখিতে পারেন না আর যাঁহাদিগের অর্থের জন্য ভাবিতে হয় না সেই সকল ধনীসন্তান অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া বিলাসপরায়ণ হইয়া পড়েন ও লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়া অসার আমোদ প্রমোদে ও নানা প্রকার পাপ কার্য্যে সময় অতিবাহিত করেন। কেহ কেহ অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের সাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতে পারেন বটে কিন্তু কয়জন লোকের এ সুবিধাটা ঘটিয়া উঠে? আর এরূপ হইলে অনেক স্থলে জামাতা স্ত্রী পুত্র লইয়া শ্বশুরের গলগ্রহ হইয়া পড়েন জামাতা স্বয়ং অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া বাটীতে অলস ও আমোদপ্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন। লেখক মহাশয় কি এটা ভাল মনে করেন?

৫ম ও ৬ষ্ঠ তর্ক। বাল্যবিবাহে ধন সঞ্চয়ের ব্যাঘাত হয়। বাল্যকালে বিবাহিত স্বামী অনেক সময় স্ত্রী পুত্রকে ভরণপোষণ করিতে সক্ষম হয় না ইত্যাদি। যাঁহাদিগের ধন সঞ্চিত নাই তাঁহাদিগেরই ধন সঞ্চয় করিতে হয় সুতরাং লেখক মহাশয়ের জানা উচিত যে এ তর্কটি ধনী লোকদিগের বিরুদ্ধে খাটে না। মধ্যবিৎ গৃহস্থলোকের সন্তানেরা অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া ও বৎসর বৎসর এক একটি সন্তানরত্ন লাভ করিয়া কি করিয়া বর্ত্তমান সময়ে ধন সঞ্চয় করিতে পারেন তাহা লেখক মহাশয়ই জানেন। আমিত ইহাতে ধন সঞ্চয়ের কিছু মাত্র সুবিধা দেখি না।

৭ম তর্ক। বাল্যবিবাহে স্ত্রীদিগের মনের স্বাধীন ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি। সকল দেশেই সবল স্বার্থপর পুরুষ অবলা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার ও তাহাদিগের ঈশ্বর প্রদত্ত অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে ও অনেক হতভাগ্য পুরুষ রমণীকে একটি ভোগ্য বস্তু বলিয়া মনে করিতেন ও এখনও করেন। অনেক মুসলমান স্ত্রীলোকের আত্মা নাই বলিতেও ভীত ও কুণ্ঠিত হন না। যে স্বামী আপনার স্বাধীনতার মূল্য বুঝিয়াছেন তিনি কখন আপনার স্ত্রীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া সুখী হন না। আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকমাত্রেরই স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা নাই লেখক মহাশয়কে তাহা কে বলিল? আমাদের সমাজের হাড়ি ডোম প্রভৃতি গরিব লোকদিগের স্ত্রীগণ স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। অনেক ভদ্র মহিলাও আজ কাল শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী প্রভৃতি কার্য্যেনিযুক্ত হইয়াছেন। তবে সাধারণভাবে বলিতে গেলে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা নাই বটে। কিন্তু তাই বলিয়াই কি গৃহকর্ম্মে, ধর্ম্ম-সাধনে স্বামীর অন্যায় কার্য্য প্রদর্শনে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে?

স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিলে যদি একটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অশান্তি উপস্থিত হয় তাহা হইলে প্রজাদিগকে স্ব স্ব স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা ও সেই সেই মতানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুমতি দিলে কি একটি প্রকাণ্ড রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত হইবে না। তবে আমরা উপযুক্ত হইলেও কোন কোন অধিকার হইতে রাজারা আমাদিগকে বঞ্চিত করেন বলিয়া আমরা এত দুঃখিত হই কেন? যে পরিবারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও শান্তি আছে তাহাই বাস্তবিক আদর্শ পরিবার। আর যে পরিবারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিয়া একটা লোক দেখানগোছ শান্তি থাকে সে পরিবারে এক স্ত্রী কি পুরুষ কেহই সুখী হয় না। পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বাধীনতা হরণ করিলে কখনই প্রকৃত শান্তি থাকিতে পারে না। বাহিরে ভয়ে লোকে চুপ করিয়া থাকে কিন্তু মনে মনে সকলেই অসন্তুষ্ট হয়। আমার স্ত্রী যদি আমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সহায় না হন যদি তিনি আমার হস্ত-পরিচালিত একটি যন্ত্রমাত্র হন তাহা হইলে বিবাহ করিয়া সুখ কোথায়? যে স্ত্রীর সহিত আমার এত নিকট সম্বন্ধ সেই স্ত্রী যদি আমার দরিদ্রতার সময় কিছু সাহায্য করিতে না পারেন যদি আমার পাপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইলে আপনার স্বাধীন মত ও ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা আমাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারেন, যদি আমি কোন ভ্রমে পড়িলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতে না পারেন, যদি অন্যায় কার্য্য করিলে আমাকে ভর্ৎসনা না করেন তাহা

হইলে বিবাহ করিয়া লাভ কি? বিবাহ কি কেবল ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থতার জন্য? স্ত্রী যে প্রকার স্বামীর উপর নির্ভর করিবেন স্বামীও সেই প্রকার স্ত্রীর উপর নির্ভর করিবেন। স্ত্রীলোকদিগকে আমরা শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিই নাই বলিয়াই আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু পাই না। স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে গৃহে অশান্তি আসা দূরে থাক প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে। যেখানে প্রকৃত প্রেম সেখানে স্বাধীন ইচ্ছার বিসর্জ্জন স্বীকার করি। যে কার্য্য করিলে আমার প্রিয় কোন বন্ধুর মনে কষ্ট হয় আমরা ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় সে কার্য্য করি না বটে, কিন্তু বিবেকের আদেশ হইলে সর্ব্বস্থলে পিতা, মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কাহারও নিকট আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করা উচিত নয় তখন কাহারও ভালবাসার খাতির রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমে যাহার বিশ্বাস আছে সেকি কখন সংসারের ক্ষুদ্র, ভ্রান্ত, অজ্ঞান মানবের প্রেমে ভুলিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারে। যদি সম্পূর্ণ রূপে আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে চাহ তবে ঈশ্বরের কাছে কর আর কাহারও কাছে করিও না। লেখক মহাশয়ের আদর্শ-স্ত্রীকে আমি আদর্শ-স্ত্রী করিতে পারি না।

৮ম তর্ক। এখন সমাজে বাল্যবিবাহ রহিত করা সহজ না বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা সহজ? আমার বোধ হয় বাল্যবিবাহ রহিত করা সহজ। লেখক মহাশয় সমাজে রোগের জন্ম দিবার বিধান করিয়াছেন ও সেই সঙ্গে রোগের ঔষধও বিধান করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লেখক মহাশয়ের রোগ জন্মাইবার বিধানটা নিশ্চিত, আর রোগ শান্তির উপায়টা অনিশ্চিত। তাই বলি যতদিন না সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতেছে অন্ততঃ তত দিন কি বাল্যবিবাহ বন্ধ রাখা উচিত নয়?

৯ম তর্ক। বাল-স্ত্রী প্রসূত সন্তান রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হয় ইত্যাদি।

১২। ১৩ বৎসরের বালিকারা সন্তান প্রসব করিয়া দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য ও নানা রোগগ্রস্ত হইতেছে ও সন্তানগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় প্রাণধারণ করিতেছে তথাপি লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে "দোষের গুরুত্ব এত অধিক নয় যে তজ্জন্য বাল্যবিবাহ একেবারে রহিত করা উচিত।" লেখক মহাশয়ের কি প্রকার গুরুত্ব জ্ঞান বলিতে পারি না কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ইহাপেক্ষা আর অধিক গুরুত্ব বুঝিতে পারে না।

১০ম তর্ক। বাল্যবিবাহে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। লেখক এই তর্কের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অন্যায় যুক্তি দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন যদি কিছু দোষ থাকে তাহা হইলে যাহাতে অল্প বয়সে সন্তান না হয় এরূপ চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হইলে কি অধিকাংশ স্থলে সন্তান উৎপত্তির ব্যবধান অধিক হয়? আমরা একথার প্রমাণ ত সমাজে দেখিতে পাই না। কি আশ্চর্য্য! অল্প বয়সে সন্তানগুলি উৎপন্ন হইয়া শৈশব কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া জন সংখ্যার হ্রাস করিলেও লেখক মহাশয়ের তাহাতে আপত্তি নাই। লেখক মহাশয় এ প্রকার নৃশংস কথা কি করিয়া বলিলেন বুঝিতে পারি না। লেখক মহাশয় কি নিতান্তই তর্কের জন্য তর্ক করিতেছেন? সাধারণ লোকের মতে মত দিলে কি অপমান বোধ হয়—না একটা সৃষ্টিছাড়া মত বলিয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে বাহাদুরি প্রকাশ পায়?

আপনার একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরকালী সেন।

প্রবাস পত্র।

সিন্ধুদেশ আর বাঙ্গলাদেশ কি তফাৎ! বাঙ্গলার হাস্যময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে বাস করা যাহাদের অভ্যাস তাহাদের কাছে সিন্ধু কি নীরস কি শুষ্ক—যে দিকে চাও বালুময় ক্ষেত্র, চক্ষের আরাম আদবে নাই। কিন্তু মরুভূমির মধ্যেও সুভদ্র হরিতক্ষেত্র নেত্রগোচর হয়। সিন্ধুদেশেও স্থানে স্থানে ভূমি উর্ব্বরা ও শস্য-শালিনী। শীকারপুরের জমি সারাল মন্দ নয়। এই মরুভূমিতে যে এত বড় বড় গাছ—ফলের গাছ, ছায়া তরু জন্মিতে পারে তা সহজে বিশ্বাস হয় না। এ সকল বৃক্ষের বয়স অধিক নয়, কুড়ি বৎসরের মধ্যে কর্ত্তৃপুরুষদের যত্নে এই ষ্টেসন গাছে গাছে ভরিয়া গিয়াছে। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম তার কমপৌণ্ডের বাগানে আম খেজুর ও অন্যান্য ফল ফুলের গাছ ছিল। আঙ্গুর পর্য্যন্ত জন্মিত। দ্রাক্ষালতার জন্য চাল বাঁধিয়া দিতে হয়, আমরা তাহার নীচে চলিয়া বেড়াইতাম। দুঃখের বিষয় যে তাহার ফল ভক্ষণ করিতে পারিলাম না, আঙ্গুর পাকিবার আগেই আমার অন্যত্রে বদলি হইল। অনেক সময় এইরূপ হয়, এক জায়গায় জিনিস পত্র কিনিয়া ঘরকন্না গুছাইয়া বসিয়া নিয়াছি এমন সময় বদলির হুকুম; অমনি তল্পিতল্পা বাঁধিয়া দূরে যাইতে হইল। সর্ব্বিসের প্রারম্ভে এইরূপ অস্থির পঞ্চমে অনেক ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কলেক্টর কি জিলাজজ কি এরূপ একজন swell হইয়া দাঁড়াইলে আর কোন ভয় নাই, তখন একস্থানে স্থির হইয়া বসা যায়। কোন কোন জজ কিম্বা কলেক্টর এই রকম একটা জায়গা দখল করিয়া ঘরবাড়ী ফাঁদিয়া বসেন আর সেখান হইতে নড়িতে চান না। তাই বলিয়া সিন্ধুদেশ ছাড়িতে আমার যে বড় কষ্ট হইয়াছিল তা নয়। ঐ সৃষ্টি ছাড়া বিজন গহনে বাস করা নির্ব্বাসন বলিলেই হইল, সিন্ধু হইতে গুজরাটে গিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমরা যখন প্রথমে

সিন্ধুদেশে যাই তখন বোম্বাই হইতে সমুদ্র পথে ব্রিটিস-ইণ্ডিয়া ষ্টীমারে করিয়া করাচী-বন্দরে উপস্থিত হই, সিন্ধু ছাড়িয়া যাইবার সময় রেলগাড়ি করিয়া উত্তরপূর্ব্ব মুখে চলিলাম। মুলতান লাহোর হইয়া আম্বালা ষ্টেসন পর্য্যন্ত গেলাম, তথা হইতে কতক ডাকের গাড়ী কতক ঝাঁপানে করিয়া সিমলার পাহাড়ে চড়া গেল। সিমলা কি চমৎকার জায়গা, তার আবহাওয়া কি চমৎকার! কিন্তু যাহা দেখিবার আশা ছিল তাহা হইল না। কাল্পনিক সিমলা ও বাস্তবিক সিমলায় অনেক তফাৎ। সিমলা হইতে হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্টি গোচর হয় না। সেই দেবতাত্মা হিমালয়—

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ

কল্পনায় যাহা মুদ্রিত আছে তাহার অনুরূপ ঠিক দেখিলাম না। বাড়ী ঘর দুয়ার—, মানুষের কারিগিরিতে তাহার দেবত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। সিমলায় ৩।৪ দিনের অধিক থাকিতে পারি নাই—আর বেশী সময় ছিল না। মনে কর আমি সেখানে সপরিবারে গিয়াছি—পরিবার রাখিয়া নিজস্থানে একাকী গমন করিতে হইবে। হাতে ঐ সময়—উহার মধ্যে বাড়ী ঠিক করা—দুইটি স্কুল ঠিক করা—একটা ছেলেদের স্কুল একটা বালিকাবিদ্যালয়—সব গুছাইয়া দিয়া যাইতে হইবে—ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ পাহাড়ের শোভা দর্শন করিবার আমার কত অল্প অবসর ছিল। তাড়াতাড়ি করিয়া দিল্লী চলিয়া আইলাম। দিল্লীতে দুই এক দিন থাকিয়া মোগল সম্রাটদের কীর্ত্তিকলাপ যত পারিলাম দেখিয়া লইলাম, পরে রাজপুতানা লাইন দিয়া আমার গম্যস্থানে উপনীত হইলাম।

সিন্ধী কুলকামিনীদের কথায় মনে করিও না যে বোম্বায়ের সর্ব্বত্রই এই দুর্ব্বিবহ অবরোধ প্রথা প্রচলিত। যে ভাগে মুসলমান আধিপত্য প্রবল অথবা মুসলমান আদর্শে সমাজ গঠিত সেই সকল প্রদেশে এই প্রথা বদ্ধমূল। যেখানে হিন্দুরা আপনার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিয়াছে সেখানে অপেক্ষাকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা প্রত্যক্ষ হয়। সে স্বাধীনতার দৌড় যে বড় বেশী তা নয়। ইংরাজ-সমাজে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যেরূপ মেশামিশি তাহা তত দূর যায় না, আবার আগন্তুক দেখিয়া কুলস্ত্রী ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইবে,—তেমন সঙ্কোচ ভাবও দৃষ্ট হয় না। পর পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের কথা কওয়া দূষ্য নহে। নির্মন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলেও গৃহিণী অন্ন পরিবেশন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পারসী স্ত্রীদের স্বাধীনতা ইহা অপেক্ষাও এক মাত্রা অধিক—তাহার কারণ তাহারা ইউরোপীয় সমাজের আদর্শ গ্রহণ করিতে সমধিক তৎপর। বিজাতীয় রীতি নীতি গ্রহণ করিতে তাহাদের বিশেষ কোন বাধা নাই। প্রথমত ভারতবাসীদের নিকট তাহারা নিজেই বিদেশী। তাহারা কয়েক শত বৎসর মাত্র এ দেশে আসিয়া বাস করিতেছে। এখানকার কোন জাতির সঙ্গে তাহারা বিবাহ সূত্রে মিলিত হয় নাই। এদেশের

উপর তাহাদের ততটা মমতা প্রত্যাশা করা যায় না। অতীতের বল তাহাদের উপর তত আক্রোশ করে নাই, দেশাচারের অভেদ্য-শৃঙ্খল বন্ধন তাহাদের উপর নাই। আর এক কথা তাহাদের মধ্যে জাতি ভেদ প্রথা নাই সুতরাং ভিন্ন জাতিদের সঙ্গে মেলা মেশা তাহাদের পক্ষে সহজ। সাগর পার হইয়া ইংলণ্ড যাইতে হইলে জাতি যাইবার ভয়রূপ কোন দৈত্য আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ায় না। আশ্চর্য্য এই, পারসীদের এই ক্ষুদ্র দল, ভারতবাসীদের মধ্যে এক বিন্দু বলিলেই হয়, আর জাতিভেদের নিয়ম বহির্ভূত হইয়াও তাহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে, বিবাহ বন্ধনে অন্য কোন জাতির সঙ্গে মিশাইয়া যায় নাই। সে যাহা হউক, হিন্দু সমাজের তুলনায় তাহাদের সমাজ পরিবর্ত্তন ও উন্নতিশীল বলিতে হইবে। আচার ব্যবহার বিষয়ে ইংরাজ অনুকরণে পারসীরা বিলক্ষণ মজবুত। পারসীরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে আসে তখন তাহারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মনোরক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। তাহাদের চালচলন দেশীয় অনুকরণে ক্রমে অনেক পরিবর্ত্ত হইল। হিন্দুদের অনুরোধে গোমাংস বর্জন করিতে হইল। মুসলমানদের যাহা 'হারাম' তাহাও তাহাদের বর্জনীয়। তাহাদের পরিচ্ছদেও তেমনি বদল—পুরুষদের পাগড়ী, স্ত্রীদের সাড়ী অনেকটা গুজরাটী ধরণের অনুকরণ। পারসীদের কথা (Motto) এই, যখন যেমন তখন তেমন। ইংরাজ-রাজ্য হইয়া অবধি তাহাদের সামাজিক নিয়ম ক্রমে ইউরোপীয় ধরণে গঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে তাহাদের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে। প্রথমে বোম্বাই আসিয়া আমার চক্ষে যাহা নূতন ঠেকে তাহা স্ত্রী-স্বাধীনতা। এই বিষয়ে কলিকাতা ও বোম্বাই মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ। কলিকাতায় ভদ্র স্ত্রীগণ সকলেই অন্তঃপুরে রুদ্ধ, বাহিরে কোথাও একটী কুলস্ত্রীর মুখ দেখিবার যো নাই। বোম্বায়ে পথে ঘাটে যেখানে যাও ভদ্র মহিলা চ'খের সামনে পড়ে। গবর্ণমেণ্ট-হৌসের অভ্যাগতের মধ্যে—বিদ্যালয়ের ছাত্র পারিতোষিক বিতরণ-উপলক্ষে সমবেত-জনতা-সমূহে দেশীয় স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত দেখিবে। বাগান, বন্দর, ব্যাণ্ড বাজিবার স্থান প্রভৃতি নগরের প্রকাশ্য-স্থানে সন্ধ্যা-বায়ু সেবনের জন্য দেশী ও ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ একত্রিত হয়, হিন্দু ও পারসী মহিলারা চিত্র বিচিত্র সাড়ীতে সজ্জিত হইয়া সেই সকল স্থানের শোভা সম্পাদন করে।

বলিতে কি, অন্তঃপুরপ্রথা আমার নিতান্ত অনিষ্টকারী-কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়, তাহাতে অবলাদের নিজের সুখ-স্বাস্থ্যের হানি, সামাজিক হানি। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ অবরুদ্ধ ও বিকল হইলে অপরার্দ্ধ কিরূপে সুশিক্ষিত, সুস্থ, সবল হইবে বল? সে দিন পুনার বালিকা বিদ্যালয়ের ইট-পত্তন কালে বম্বের গভর্ণর স্যার জেম্‌স—তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এ সম্বন্ধে বেশ দু এক কথা বলিয়াছিলেন—অনুবাদ না করিয়া নীচে তাহা তুলিয়া দিলাম*। যদি আমাদের দেশের স্ত্রী লোকের অবস্থা উন্নতি করিতে চাও তবে আপাতত বোম্বায়ের আদর্শ

* But the custom of secluding your women is not sanctioned by antiquity and it is a custom which not only degrades them, but reduces them to abject slavery. You cannot degrade your wives and the mothers of your children from their rightful position in this life without degrading your race to a slavery, that is sure to act injuriously on yourselves.

গ্রহণ করিতে পার। আমাদের অনেকের ভয় হয় স্ত্রীলোকেরা বাহিরে গেলে তাহাদের কোন বিপদ ঘটিতে পারে, আমাদের দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথা হয়। তিনি বলেন আমাদের পুরুষেরাই আপনারা আপনাদের রক্ষা করিতে অপারক, ঘরের মেয়েকে কি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবে, যদি কেহ তাহাকে অপমান করে কিরূপে রক্ষা করিবে।" তাহার উত্তর—এ ভয় কেবল কল্পনা মাত্র, ফলে ওরূপ ঘটনা অতি বিরল। এ মুসলমান রাজ্য নয় যে অত্যাচার-ভয়ে কুলকামিনীদিগকে গৃহ রুদ্ধ রাখা আবশ্যক,ইহা ইংরাজরাজ্য, স্ত্রীলোকের সম্মাননা যাহার প্রধান ধর্ম্ম। ওরূপ আশঙ্কা যে অমূলক তাহা আমার নিজের দৃষ্টান্ত হইতেই দেখিতেছি। প্রথমে যখন আমি বোম্বায়ে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আনি তখন আমাকে কত লোকে কতপ্রকার বিভীষিকা দেখাইয়াছিল, কিন্তু কাজে দেখিতেছি সে সকল কিছুই নয়। আমরা স্বামী স্ত্রীতে প্রকাশ্য ভাবে এতদিন বিদেশে ঘুরিলাম, কই আমাদের ভাগ্যে ত কখন কোন বিপদ ঘটে নাই। কেবল আমার উপদেশ এই যে, বাহিরে যাইতে হইলে রীতিমত ভদ্রবেশ পরিয়া যাওয়া আবশ্যক। 'জনানা' পক্ষপাতীর প্রতি আমার আর একটী কথা বলিবার আছে। যদি বল আমরা আত্মরক্ষায় অক্ষম তবে নিদান-পক্ষে আমাদের কি তাহা শিক্ষা করা উচিত নহে। ইহা কি দেখিতেছ না যে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসাদে আমাদের সে শিক্ষা লাভ হইতে পারে? এ জাতীয় কলঙ্ক দূর হইতে পারে? ভারতমহিলা বল, বিদ্যা ও স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিলে তাহার আভা পুরুষ-সমাজে প্রতিফলিত হইবে ইহা ত ধরা কথা—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এ দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। শুদ্ধ তাহা নহে। আর এক দিক দিয়া দেখ, স্ত্রীরক্ষণের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমাদের বল ও সাহস দায়ে পড়িয়া বৃদ্ধি হইবে কি না? আমরা নিজে অনেক সময় অকাতরে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাই—কেহ একগালে চড় মারিলে আর একগাল তাহাকে ফিরাইয়া দিই, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অপমান সহ্য করে এমন কাপুরুষ অতি অল্প। স্ত্রীকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে দুর্ব্বল সেও সবল হয়—ভীরুও অভয় হয়। অবলাকে অন্তঃপুর-রুদ্ধ নিতান্ত 'অবলা' করিয়া রাখিলে কখনই আমাদের জাতীয়-ভীরুতা দূর হইবে না।

এদেশের হিন্দুদের আচার ব্যবহার বর্ণনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ করিতে হয়। আমি যত দূর দেখিতে পাই এখানে জাতিভেদের নিয়ম কিছু কড়াকড়। এই হেতু এদেশে হিন্দুদের মধ্যে ইউরোপ যাত্রীর দল অতি অল্প, কেহ সাহস করিয়া সাগর-পার হইলে শেষে জাত লইয়া তাহাকে মহা বিব্রত হইতে হয়। আমাদের দেশে হিন্দু-সমাজের ওদিকে অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাই—ইংলণ্ডফেরতা বাঙ্গালী তাহার জাতির মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কোন গুজরাটি কি মহারাট্টা-হিন্দু বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে জাতে উঠিবার জন্য মহা হাঙ্গাম বাধিয়া যায়—একটা প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয়। সেদিন এইরূপ একটা ঘটনা হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মার নাম অবশ্য শুনিয়াছ। তিনি প্রোফেসর মনিয়র উইলিয়মের সহিত বিলাত যাত্রা করিয়া অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কালেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃতে একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু যখন এদেশ হইতে যান তখন লাতিন গ্রীকের ক অক্ষর জানিতেন না। অথচ অল্পকাল মধ্যে ঐ দুই কঠিন ভাষার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যে

ইংলণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে Oriental congress বসিয়াছিল তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি আইন শিক্ষা করেন ও বারিষ্টর হইয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেশে আসিয়াই তিনি রতলমের দেওয়ানের পদ পাইয়াছেন—ইহাতে তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলেই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাহার জন্য পণ্ডিতবরের কথা পাড়িলাম তাহা এই, তিনি একটী ভীরুতার কার্য্য করিয়া অনেককে নিরুৎসাহ করিয়াছেন। তাঁহার জাতির লোকের অনুরোধে তিনি নাসিকে গিয়া শিরোমুণ্ডণ ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। পবিত্র গোদাবরীতে স্নান করিয়া ইউরোপ প্রবাসের পাপ প্রক্ষালন করিয়াছেন। ইহাতে নানাদিক্ হইতে নানান্ কথা উঠিয়াছে। তিনি যে এতদূর অবনতি স্বীকার করিবেন তাহা আমাদের মনে হয় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভারত প্রত্যাগত হইয়া আপনার সহধর্ম্মিণীকে বিলাতে সঙ্গে লইয়া যান তাহাতে বে ধ হইল জাতিভয়ে তিনি বিচলিত হইবার পাত্র নন। এক্ষণে দেখা গেল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতভায়াদের কঠোর শাসনে নতশির হন না এমন সাহসী হিন্দু-যুবা এদেশে কেহ আছে কি না সন্দেহ। প্রথমে যখন একজন গুজরাতী ব্রাহ্মণ এদেশ হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জাতিবর্গের মধ্যে মহা হুলস্থূল বাধিয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও শেষে তিনি পার পাইলেন না। তাঁর জাতি দুই দলে বিভক্ত হইল, এক দল তাঁহার পক্ষ এক দল বিপক্ষ। কিন্তু এ অনেক দিনের কথা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, ২০, ২৫ বৎসরের মধ্যে কি এ সম্বন্ধে কিছুই উন্নতি হয় নাই? এখনো কি জাতির এমন কঠোর শাসন যে তাহার ভয়ে আপনার মত ও বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিতে হইবে? কোন হিন্দুর কি এতটুকু সাহস নাই যে আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানেন, যাহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, তাহা অকুতোভয়ে অবলম্বন করিতে পারেন—আপনার আন্তরিক বিশ্বাস অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারেন? বহুরূপীর মত একবার ইউরোপীয় সভ্যতার সং সাজিয়া নৃত্য করা আবার তাহা পাপ বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া এই কি সত্য-নিষ্ঠ সাহসী-পুরুষের কার্য্য।

জাতিভেদের ন্যায় বাল্যবিবাহ আর চির-বৈধব্য-প্রথা হিন্দু সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু চির-বৈধব্য-প্রথা যে এখানকার সমস্ত হিন্দু-জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহা নহে। এমন অনেক জাতি আছে যাহার মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্তে যাহার চলন সেই সকল জাতির মধ্যেই এই প্রথা দৃষ্ট হয়। এই প্রথার আনুষঙ্গিক এক ভয়ানক কুৎসিত নিয়ম আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে—সে কি না বিধবার মস্তক মুণ্ডণ। আমাদের বিধবাদের অনেকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়—উপবাস, একসন্ধ্যা আহার, অলঙ্কার-পরিহার, কিন্তু ভাগ্যক্রমে শিরোমুণ্ডণ-প্রথা তাহার উপর নাই। এদেশায় বিধবাদিগের যে সব ত আছেই তাহার উপর এ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। ভবিষ্যতে বিধবা-স্ত্রীর যে-সকল জ্বালা যন্ত্রণা অদৃষ্টে আছে পতি বিয়োগের পরক্ষণেই নাপিতের হাতে কেশ-চ্ছেদন তাহার পূর্ব্বাভাস। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা তাহা আমরা সহজে কল্পনা করিতে পারি না। আমার বিবেচনায় এ অপেক্ষা সহমরণ অনেক গুণে ভাল ছিল,মুহূর্ত্তের মধ্যে সতীর সকল কষ্টের অবসান হইত। শিরোমুণ্ডণ কিম্বা মুণ্ডচ্ছেদন যদি কোন রমণীর এ

তুয়ের একটী বাছিয়া লইতে হয় তাহা হইলে বোধ করি সে বেচারী শেষোক্ত দণ্ডই ঘাড় পাতিয়া লয়। স্ত্রীলোকের যা অমূল্য আভরণ—যে 'রূপের নিগড় কি অমরে কিবা নরে না বাঁধে কাহারে' ?—সেইটী হরণ করিতে পারিলেই নির্ভীক হওয়া গেল—আর তাহার রূপলাবন্যের কোন গৌরব রহিল না—তাহার সতীত্বের প্রতি আঘাতের কোন শঙ্কা রহিল না. এই উদ্দেশ্যেই এই নিষ্ঠুর নিয়ম সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য্য এই যে, যে সকল জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিয়া আসিতেছে তাহারাও ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি ঐ কঠোর রীতি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। কুদৃষ্টান্তের এমনি বল! সে দিন দেখিলাম আমার এক কায়স্থ বন্ধু, রায় বাহাদুর, আপনার পরিবারস্থ এক তরুণবয়স্কা বিধবা কন্যার শিরোমুণ্ডণে স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিলেন। 'স্বচ্ছন্দে' বলাটা ঠিক হইল না—জাতির অনুরোধে বলা উচিত, কিন্তু তিনি এক জন শিক্ষিত নব্যদলের লোক হইয়া এরূপ স্থলে এ অনুরোধ এড়াইতে না পারিলেন ত আর কি হইল? সমাজসংস্কার-আশা আর কোথায় রহিল!

বাল্য বিবাহ আর এক বিষম রীতি। শুধু বঙ্গদেশে নয় ভারতের সর্ব্বত্রই ইহার গরলময় ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতা মাতা গৃহ হইতে বিদায় করিয়া যে কি স্বর্গ সুখ লাভ করেন তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা তাহার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া—এ সকল গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার বিবাহ দিতেই গুরুজনেরা ব্যস্ত। এদেশে বালক বালিকার বিবাহ পুতুলে পুতুলে বিয়ের মতন। একজন গাইকওয়াড় ছিলেন তিনি পায়রার বিয়ে দিতে বড় ভাল বাসিতেন—তাঁহার সভাসজ্জন নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ধুমধামে কপোত কপোতীর বিবাহোৎসব অনুষ্ঠান করিতেন—এইসব বালক বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ। এ দেশে দশ বার বৎসরের বালক ও সাত আট বৎসরের বালিকা সচরাচর উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে দেখা যায়। এইরূপ বাল্যবিবাহ হইতে হিন্দুসমাজের যে কত অনর্থোৎপত্তি হইতেছে বলা যায় না। আমি বলিতেছি না যে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের উপযোগিতা আদপে নাই—কিন্তু দেখিতে গেলে অনর্থের ভাগই অধিক তাহার কোন সন্দেহ নাই। বালিকা প্রসূতি,—স্কুলের ছাত্রের উপর বৃহৎ পরিবার পোষণের ভার,—নিবীর্য্য রুগ্ন সন্তান সন্ততি, শিক্ষার ব্যাঘাত, দারিদ্র্য, অকাল জন্ম, অকাল মরণ, অকাল পক্কতা, অকাল জীর্ণ দশা, এই সকল অনিষ্ট কাহার'চ'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার আবশ্যক করে না, তাহা আমাদের সমাজে জাজ্বল্যমান প্রকাশিত রহিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের শরীর মনের শক্তিসকল অকালে পরিপক্ক হয় এই জন্য তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়াই আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার ত একটা সীমা প্রকৃতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকারা কখন বিবাহের উপযুক্ত হইতে পারে না। চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতেছি যে অমুক বয়সের পূর্ব্বে আমাদের শরীরের পূর্ণতা লাভ হয় না সেই পূর্ণ বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টকারী—সে বিবাহের ফল অমঙ্গল একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

এক্ষণে কথা হইতেছে এ রোগের ঔষধ কি? এ সকল অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? মালাবারি নামক প্রসিদ্ধ পারসী লেখক বালবিবাহ ও বলাৎকার-বৈধব্য বিষয়ে এক প্যাম্‌ফ্লেট লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। এখন

প্রশ্ন এই যে বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য কোন আইন করা বিধেয় কি না? অনেকে ইহার বিপক্ষে মত দিবেন সন্দেহ নাই, তাঁহারা বলিবেন দেশাচার সংশোধনের জন্য গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হওয়া অন্যায়। কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহার পক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। সমাজের সুখশান্তি-রক্ষণ—অনিষ্ঠ নিবারণ এই উদ্দেশেই আইন প্রবর্ত্তিত হয়—তাহাতে কখন যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্বতা হয় তাহার উপায়ান্তর নাই। এই স্বাধীনতা টুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্যই অনেক সময় আবশ্যক হয়। আমাদের দেশের অনেক সামাজিক কুরীতির উপর আইনের হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে নহিলে তাহার উচ্ছেদসাধন কঠিন হইত। ভ্রূণহত্যা—নরবলি—সহমরণ প্রভৃতি এদেশের চিরন্তন প্রথা-সকল আইন দ্বারা নিবারিত হইয়াছে, তবে এটা হয় না কেন? যে সকল বিষয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের হিতাহিত নির্ভর করে অনেক সময় আইন তাহার উপর হস্তপ্রসারণ করেন। যে রীতি অনুসারে বালক বালিকা চিরকালের জন্য অকাট্য বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, যাহার উপর তাহাদের চিরজীবনের সুখদুঃখ নির্ভর, তাহাতে রাজার নিয়ম হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না এমন কখনই হইতে পারে না। আইন দ্বারা বিবাহের একটা বয়স নির্দ্দিষ্ট হওয়া কি ভাল নয়? পুরুষের ধর ১৮ বৎসর মেয়েদের ১৫ বৎসরের নীচে বিবাহ নিষেধ এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া কি নিতান্ত অন্যায়? কেহ বলিতে পারেন এরূপ করিতে গেলে ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আমাদের কোন্ শাস্ত্রে বাল্যবিবাহ অনুমোদন করে? পুরাতন আর্য্যদিগের যে চতুরাশ্রমের নিয়ম ছিল—ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য—তাহা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অধ্যয়নের বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া কখন সংসারের ভার গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ দিবার যে সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে পুরুষদের সম্বন্ধে তাহা কিছুই নাই। অতএব নিদান পুরুষের বিবাহের একটা বয়স সহজে ঠিক করা যাইতে পারে—মেয়েদের বয়স পরে আপনা হইতেই নিয়মিত হইবে। মালাবারি মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইউনিবর্সিটি হইতে অবিবাহিত ছাত্রদের অনুকূলে কোন বিশেষ নিয়ম প্রচারিত হউক। তিনি আরো বলেন, যাঁহাদের হাতে চাকরি বিতরণের ক্ষমতা আছে তাঁহারা বিবাহিত পুরুষদের ছাড়িয়া অবিবাহিত কর্ম্মপ্রার্থীদিগকে বাছিয়া লইতে উদ্যত হউন তাহা হইলে ক্রমে বিবাহ করিবার নেশা ছুটিয়া যাইবে। এ সকল প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। বিদ্যার চাবি, ধনের চাবি অবিবাহিতের হাতে—লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রসাদ আইবড়র প্রতিই মুক্তহস্তে বিতরিত হইবে আর বিদ্যার দ্বার বিবাহিত পুরুষের প্রতি রুদ্ধ হইবে, স্ত্রী পুত্র কন্যা-ভারাক্রান্ত-পুরুষ কর্ম্মের অভাবে শুকাইয়া মরিবে এ নিয়ম নিতান্ত অন্যায়। সে যাহা হউক আমাদের সমাজ সংস্কারকেরা চেষ্টা করিলে এ কুরীতি উৎপাটনে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা মিলিয়া যদি এক সমাজ বন্ধন করিয়া অমুক বয়সের আগে বিবাহ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে আপনা হইতেই ক্রমে বিবাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। এবিষয়ে তোমার কি বক্তব্য জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মেহেদি।

(পৃথিবী ধ্বংশ, সম্বন্ধে মুসলমানদের ভবিষ্যদ্বাণী)

হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, খৃষ্টান, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই পৃথিবীর ধ্বংশ অথবা প্রলয়ের কথা বিশ্বাস করে, সকলেই বলিয়া থাকে যখন পৃথিবী পাপে ডুবু ডুবু হইবে, ধর্ম্ম পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, সত্য ও ন্যায় ধরাধাম হইতে বিদূরিত হইবে, ধর্ম্মের নামে শত শত অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, মনুষ্যের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা কেবল সাংসারিক উন্নতির দিকে ছুটিবে, যখন অন্যায়,অত্যাচার জন-সমাজের নিত্যকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে, বিবাদ, বিসম্বাদ অরাজকতা উপস্থিত হইয়া সমাজযন্ত্রের মূলদেশ বিকম্পিত হইবে,তখন ভগবান এই পাপময়, স্বার্থপরতাময়, বিবাদ বিসম্বাদময় পৃথিবী ধ্বংশ করিয়া ধর্ম্ম ও নীতি,সত্য ও ন্যায়,সুখ ও শান্তির রাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই বিশ্বাস হইতেই হিন্দুদের কল্কী অবতার, মুসলমানদের মেহেদি, ইহুদিদের মেসোয়ার আগমন, খৃষ্টানদের খৃষ্টের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবার কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এই জন্যই এই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রলয়ের দিন গণনা করিয়া থাকে, প্রলয়ের নামে মাতিয়া উঠে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে একবার ইয়ুরোপখণ্ড এইরূপ প্রলয়ের ভয়ে আলোড়িত হইয়াছিল, নাইট ও বেরণগণ বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত হইল, পাপাসক্ত পাপ ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দান দক্ষিণা আরম্ভ করিল, সংসারী সংসার ছাড়িয়া উদাসীন সাজিল, উদাসীন গভীর ভাবে ধ্যানে মগ্ন হইল, চারিদিগে চিন্তা, চারিদিগে ব্যস্ততা, কৃষক আর হল চষে না, ধীবর আর মাছ ধরে না, ব্যবসায়ী আর দ্রব্য বেচেনা, সকলের মুখেই এক কথা, সকলের মনেই এক প্রার্থনা; চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, প্রলয়,পৃথিবী ধ্বংশ, এই কথা বলিয়া সকলেই শেষের সে দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, প্রেমিক প্রেমের চিন্তা ভুলিল, ভাবুক ভাবুকতা ছাড়িল, কবি তাহার বীণা দূরে ফেলিয়া ভগবানের নাম জপিতে লাগিল। সেণ্ট বার্ণার্ড প্রত্যেকের হৃদয়ে চিন্তার তরঙ্গ-লীলা দেখিয়া তৃতীয় ক্রুসেড্ ঘোষণা করিলেন, রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, উচ্চ, নীচ নির্ব্বিশেষে সকলকেই সেরাসিনদের হস্ত হইতে জেরুজেলেম নগর উদ্ধার করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কেবল খৃষ্টান সম্প্রদায়ই এই আন্দোলনবন্যার স্রোতে ভাসিয়াছিল, এমত নহে। মুসলমানগণও মেহেদির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারাও তরবারির সাহায্যে অবিশ্বাসীদিগকে বিনাশ করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসীর রাজ্য সংস্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সময় অনন্ত স্রোতে মিশিল, পৃথিবী ধ্বংশ হইল না, তাহাদের হৃদয়ের ভয় বিভীষিকা হৃদয়েই মিলাইল। প্রায় দশ শত বৎসর কাল নীরবে নিস্তব্ধ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, এই দশ শত বৎসরের শেষ ভাগে আবার মুসলমানগণ ধুয়াঁ ধরিয়াছে, তবে এইবার তাহারা কল্পনার ছায়া দেখিয়া ভুলে নাই, মিশর দেশে মেহেদির আগমন প্রত্যক্ষ করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রথমতঃ মনুষ্যের হস্ত পরিমিত একখণ্ড মেঘ মিশর গগণে দেখা দিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; মিশর-ভূমে তুমুল

ও তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে; ইতিহাস পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় অতীব ক্ষমতাশালী এই দুই সম্প্রদায়ের বিষাদময়ী কাহিনীতে ভারত ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ। সুন্নি তুরস্ক সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহারা মহম্মদের জামাতা আলির পূর্ব্ববর্ত্তী আবুবেকার, ওমার, ও উথামকে মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণনা করেন, কিন্তু সিয়ারা মহম্মদ ও আলির মধ্যবর্ত্তি তিন জন খলিফাকে পঞ্চম খলিফা মোয়াইয়া এবং তদ্‌পুত্র জোজিদের সিংহাসনের অবৈধ অধিকারী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আলি এবং তাঁহার স্ত্রী, মহম্মদের কন্যা ফতেমা হইতেই ইমাম পদের প্রকৃত অধিকারী ধরা যাইতে পারে। আরব, বোগদাদ পারস্য দেশে বিবিধ খলিফা বংশের অভ্যুদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে সিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত পারস্যবাসীগণের সহিতই আলির নিকট সম্পর্ক। সিয়া-সম্প্রদায়-ভুক্ত ষষ্ঠ ইমাম জাফের অতীব পবিত্রাত্মা, জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিলেন, তাহার গভীর জ্ঞানের জন্য লোকে তাঁহাকে সলমনের সহিত তুলনা করিত। তাঁহার রচিত "অদৃষ্ট গ্রন্থ" নামে একখানা গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে; তাহার সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে, যে ইহুদিদিগের ইলেজার মত—তিনি মরেন নাই, কিন্তু পুনরাগমন করিবেন; তাহার জীবদ্দশাতেই, তাহার পুত্র ইস্মাইল তাহার উত্তরাধিকারী পদে বরিত হয়, কিন্তু তাহার পিতার পূর্ব্বেই তিনি কয়েকটী মাত্র শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন, সুতরাং তাহার বৈমাত্র ভ্রাতা মোষা কাজেম ইমাম-পদে অভিষিক্ত হয়। মোষার পুত্র আলি অষ্টম ইমাম, মহম্মদ বেন আলি নবম, মহম্মদের পুত্র আলি দশম, হাসন্, একাদশ, তাহার পুত্র মহম্মদ। মহম্মদ তাহার পিতার মৃত্যুকালে কেবল শিশু ছিল; দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে কোথায় চলিয়া যায় কেহই বলিতে পারে না, জনশ্রুতি এইরূপ যে বাগদাদের নিকটস্থ সারমেনির একটী গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখানে আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন,সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় ধার্ম্মিক সিয়াদিগের উপর অধিকার স্থাপন করিবেন। তিনি যে গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবলমাত্র উপরিভাগে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত একটী পৌরাণিক গল্প আছে, তিনি হিজায়া সকের ২৫৫ অব্দে সার মেনরি নগরে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার জন্মের সময় তাহার পিতামহের ভগিনী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে একটী কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তিনি বলেন যে তাহার জন্মের পূর্ব্বে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইষার মাতার ন্যায় তাহার মাতারও পূর্ব্বে কোন গর্ভলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, জন্মের পরক্ষণেই গৃহ স্বর্গীয় আলোকে জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তিনি ভূনতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিলেন, প্রার্থনায় তাহার

বাক্‌শক্তি ফুটিল, তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন "দয়াময়, করুণাময় ঈশ্বরের নামে যাহারা আপনার দুর্ব্বলতা স্বীকার করে তাহাদিগকে বল ও উত্তরাধিকারীত্ব প্রদান করিতে ইচ্ছা করি," শ্যামল পক্ষীর আকারে দেবদূতগণ আসিয়া গৃহ পূর্ণ করিল, তাহার পিতা তাহাদের একজনকে বলিল "আপনারা ইহাকে লইয়া প্রতিপালন করুন, ভগবানের আদেশ হইলে সে এখানে আসিবে, ভগবানের অনুগ্রহে তাহার আগমনের বাধা হইবে না।" তাহার দক্ষিণ বাহুতে এই কথাগুলি অঙ্কিত ছিল "সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা তাড়িত হইয়াছে, কারণ মিথ্যা অসার"। পাঁচবর্ষ বয়সের সময়ই তিনি পিতৃ-অঙ্কচ্যুত হন; কিন্তু ভগবান শৈশব কালেই তাহাকে জন দি বেপ্টিজের মত অসাধারণ জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সময়েই তিনি ইমাম পদে বরিত হন। হিজিরা শকের ২৬৫ অথবা ২৬৬ অব্দে তিনি যে সারমেনরির গহ্বরে প্রবেশ করিলেন আর বাহির হইলেন না, তাহার মাতা তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দিনের পর দিন গণিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি আর দেখা দিলেন না। অনেক সৌভাগ্যশালী মুসলমান্ সেই নিভৃত স্থানে তাহার দেখা পাইয়াছে, একজন তাহার দেখার কথা এইরূপ বলিয়াছে, "আমি দুইজন সঙ্গিকে লইয়া একদিন সারমেনরির রাজপ্রাসাদে গমন করিয়াছিলাম, সেখানে যাইয়া একস্থানে একটি মসারি ঝুলান দেখিতে পাইলাম, মশারি তুলিয়াই গহ্বরের প্রবেশদ্বার দৃষ্ট হইল, আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়া একটী সমুদ্র দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম সমুদ্র বক্ষ আবৃত করিয়া একখানা কার্পেট বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার উপর একটী সুন্দর পুরুষ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না, আমার সঙ্গীদ্বয় ইমামের দর্শন লাভের জন্য একে একে সমুদ্রে গমন করিল, কিন্তু তাহারা ডুবিয়া গেল, আমি বহুকষ্টে তাহাদিগকে উঠাইলাম; অনুমতি না লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম; কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ ও করিলেন না, আমরা নীরবে ফিরিয়া আসিলাম।" ইমামের নির্জ্জনবাস দুই ভাগে বিভক্ত। হিজারা শকের ৩৬০ অব্দে প্রথম ভাগ শেষ হইয়াছে, সেই সময় তিনি অনেক অমানুষিক ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি মর্ত্ত্যভূমিতে আগমন করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সহিত আলাপ করিতেন, তাহাদিগের শেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে আর মর্ত্ত্য-ভূমির সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই, তখন হইতেই শেষ ভাগ আরম্ভ হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যখন তিনি আসিবেন তখনই এই ভাগ শেষ হইবে। প্রলয়ের সময় যে মেহেদি আসিবে সেই মেহেদি এই নির্জ্জন গহ্বর হইতেই উঠিয়া আসিবে। যখন মেহেদি আসিবে তখন যিযু আবার ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। মোষা কাজিম খলিফাপদ প্রাপ্ত হইলে তাহাদের গৃহ বিবাদ জ্বলিয়া উঠিল, সেই অন্তর্বহ্নিতে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা একবারে জনসমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তখন কুরেস-পরিবার প্রভূত ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া উঠে; তাহাদের অদ্ভুত কাহিনী লিখিবার ইহা সময় নহে, এখন বর্ত্তমান মেহেদি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। মেহেদি সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা শুনা যায়, কেহ কেহ বলে তিনি একজন সূত্রধর, কেহ কেহ বলে তিনি বন্য-পশু-ব্যবসায়ী, এবং তজ্জন্যই তাহার চরিত্রে অনেকটা পশু প্রকৃতি দৃষ্ট হয়; তিনি বন্য পশুদের ন্যায় দিনে নিদ্রা যান, রাত্রিতে কার্য্য করেন, এই প্রকার অনেক মত প্রচারিত আছে, রেভারেনট পিটারসন বলেন যে তিনি একজন ডোঙ্গোলাবাসী, তাহার নাম মহম্মদ আসমত, আসমত বাল্যকালে তাহার পিতৃব্যের নিকট শিক্ষানবিশি কার্য্যে নিযুক্ত হন, এক দিন তাহার পিতৃব্য তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করেন, সেই জন্য তিনি পলাইয়া খার্টুমে চলিয়া যান, কিছু দিন পরে খার্টুমের নিকটস্থ হগহালি নামক গ্রামের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখানে তিনি তাঁহার ধর্ম্মের অনেক সূক্ষ্ম কথা শিক্ষা করেন, তারপর বারবরে গিয়া আর একটী বিদ্যালয়ে ছয়মাস কাল অধ্যয়ন করেন। ১৮৭০ খৃঅব্দে তিনি ফাকি সেক নরেদ্দাইমের সহিত মিলিত হন, এবং তাহার দ্বারাই তিনি ফাকি অর্থাৎ দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রধান পদ লাভ করেন; তারপর তিনি হুয়াইট নীল নদীর তীরবর্ত্তী আব্‌বাস

দ্বীপে গমন করেন, সেখানে ভূগর্ভে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া অনেক দিন নির্জ্জনবাস, উপবাস, ব্রত ও ধ্যান করেন, এই সংবাদ জন সমাজে প্রচারিত হইল, তাহার পবিত্রতার সৌরভ লোকের মন আকর্ষণ করিল। দলে দলে লোক আসিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, অজস্র ধন তাহার মস্তকোপরি বর্ষিত হইতে লাগিল, দেশের প্রধান প্রধান লোক তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইল। মহম্মদ চারিজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্বের স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিবার উপায় অবলম্বন করিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রীতিমত মেহেদি উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাকে কোরাণবর্ণিত মহাপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং বলেন যে, তিনি জন-সমাজে, সাম্য, নীতি, ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে আগমন করিয়াছেন, যাহারা তাঁহার কথায় সন্দেহ অথবা অবিশ্বাস করিবে তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা তাঁহার জীবনের ব্রত। এই মহত্তর ব্রত সাধনে যাহারা প্রাণ-ত্যাগ করিবে অমনি তাহারা স্বর্গে গমন করিবে। মেহেদি বলেন তাহার কার্য্য শেষ করিতে চল্লিশ বৎসর লাগিবে, চল্লিশ বৎসরে তিনি কি করিবেন না করিবেন আমরা বলিতে পারি না, তবে তাঁহাকে পরাজয় করা যে ইংরাজদের পক্ষে সহজ হইবে না তাহা বুঝা যাইতেছে। বস্তুত এই সংসারে মানুষের মন ধর্ম্মের নামে যেমন মাতিয়া উঠে এমন আর কিছুতেই নয়; মৃত্যুনদীর পরপারের সেই অন্ধকারময় প্রদেশের কথা

যে বলিবে তাহার দিকে মানুষ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় ছুটিতে যায় সেই জন্যই সামান্য আসমত আজ পরাক্রান্ত, আজ মুসলমান সমাজের নেতা। আর জগত মুসলমানদিগকে আজ উন্মত্ত বলুক, নির্ব্বোধ বলুক আর যাহাই বলুক, তাহারা সুদূর ভবিষ্যৎ হইতে আশার মোহন ধ্বনি শুনিয়াছে, তাই নাচিতেছে, সংসারের সুখ-বাসনা ছাড়িয়া ধর্ম্মের জন্য সমর-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে।

শ্রীরজনীনাথ নন্দী।

সুখ দুঃখ।

মনুষ্য স্বভাবত বাল্যকাল হইতেই সুখভোগের অভিলাষ করে এবং সংসারে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত সুখের বিচিত্র কল্পনায় ভোর হইয়া থাকে। কিন্তু একবার এই নিবিড় সংসারারণ্যে প্রবেশ করিয়া—যখন চারিদিক হইতে অরণ্যকণ্টকের বিষময় আঘাত সহিতে হয় তখনি তাহার সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়—সে তখন চৈতন্য পাইয়া সংসারের কণ্টক হইতে নিজ চরণ নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। কিন্তু মানব-চক্ষুর ক্ষীণজ্যোতি দ্বারা সকল আশঙ্কা বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর দেখিয়া, মানুষ নিরাশায় কাঁদিতে কাঁদিতে নানা পথে আসিয়া পড়ে, তবে সে যে পথেই গমন করুক না কেন, সুখ তৃষ্ণাই তাহার নিয়ন্তা। সকলেই চুম্বকের কাঁটার ন্যায় সুখের দিকেই মুখ ফিরাইয়া আছে। কেহ বিষয় সুখে, কেহ বা জ্ঞানরাজ্যে, কেহ রণক্ষেত্রের কোলাহল ও অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার মধ্যে, কেহ বা মান মর্য্যাদা যশ ও আধিপত্যের সমারোহের মধ্যে, সুখের প্রাসাদ কল্পনা করিয়া একই উদ্দেশে অথচ ভিন্ন ভিন্ন দিকে সকলে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সুখকে ধরিতে গিয়া সকলেই দুঃখের জালে জড়াইয়া পড়েন—এই নাগ পাশ ছেদন করা বড় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যিনি যাহাই বলুন এসংসারে সকলেরই দুঃখ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া সুখশান্তি লাভ করিবার বাসনা মনোমধ্যে নিহিত রহিয়াছে, সুখলাভ করাই সকলের মনের গূঢ় অভিপ্রায় ও জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। লোকে যে পৃথিবীর সকল সুখ তাচ্ছিল্য করিয়া আত্মঘাতী হয়, তাহাও সুখপরবশ হইয়া। সুখ এ জগতের অধিপতি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজদর্শনের বাসনা মনে আসিলেই দুঃখের রাজত্বে ক্লেশভোগ করিতে আসিয়া পড়িতে হয়, জ্ঞান বা বিজ্ঞানও আমাদিগকে ইহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না—এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর "আধুনিক" য়ুরোপীয় বিজ্ঞানও এবিষয়ে আলোক দান করিয়া সুখকে আমাদের আয়ত্বাধীনে আনিয়া দিতে পারিতেছে না। যাহা হউক সুখ যখন সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীর নিয়ন্তা, সকলেরই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ইহার বিষয় বুঝিবার প্রয়াস পাওয়া কোন ক্রমেই অযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এবিষয়ে তলাইয়া বুঝিতে হইলে উহা কি সর্ব্ব প্রথম তাহা জানাই কর্ত্তব্য। অবিচ্ছিন্ন স্থায়ী আনন্দের ভাবই সুখ; আর কে না জানেন যে বাসনা-পরিতৃপ্তি করাই আনন্দ পাইবার সাধারণ উপায়। সুখ পাওয়াই যখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সেই সুখ যখন বাসনা পূর্ণ হইলে লাভ করিতে পারিব এরূপ মনেকরি,

তখন আমাদের সমস্ত বাসনাগুলি পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইতে হয়। কিন্তু এদিকে আবার বাসনা নীতি-বিরুদ্ধ * হইলে তাহা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বড় অধিক থাকে না। কারণ একজন কি কয়েক জন ক্ষুদ্র মানব কি কখনও প্রকৃতির গতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া স্বরাজ্য স্থাপনা করিতে পারে? প্রকৃতি অসীম বলের আধার, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান্ হইলে, আমরাই মহান্ বলের সংস্পর্শে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে পেষিত হইয়া যাই। আমরা আপাতত হয়ত একটি মিথ্যা কথা কহিয়া নিজের স্বার্থবর্দ্ধন বা অপরের হিতসাধন করিতে পারি কিন্তু তন্নিমিত্ত আমাদিগকে এক সময়ে না এক সময়ে সহ্য করিতে হইবেই—কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না।

যদি কোন ব্যক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলের অবরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে কৃতকার্য্য হয়, তাহাতে যে সে সুখী হয় এরূপও ত কখন দেখা যায় না। মনে করুন এক ব্যক্তি অর্থের লোভে পিতৃহত্যা করিল, তাহাতে তাহার বাসনা তৃপ্তি জনিত কিছু সুখ পাইল বটে—কিন্তু সে সুখ, সে আনন্দ কতক্ষণের নিমিত্ত? সেই অস্বাভাবিক শোণিত ও অর্থ তৃষ্ণা কিঞ্চিৎ উপশম হইবার পরই, আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখ ও অনুতাপ আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবে, এবং সুখও তাহার নিকট হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিবে। অতএব সুখের বাসনা থাকিলে আমাদিগের সদাই এক মনে জ্ঞান ও নীতির পথে বিচরণ করা আবশ্যক, এমন কি মনের উপর এরূপ সতর্কতার সহিত কর্ত্তৃত্ব করিতে হইবে, যেন কোন রূপ অন্যায় অযোগ্যভাব বা বাসনা আমাদের মনের মধ্যে একেবারে আসিতে না পারে।

মনুষ্যের ক্ষমতা এত অল্প যে পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নীতিসঙ্গত বাসনা সুসিদ্ধ করাও সকল সময় সহজ নহে। কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি অতি সহজেই যে বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন, একজন দরিদ্র কৃষিজীবীর সে বাসনা হয়ত কোন কালেই সিদ্ধ হইবে না। কেহ হয়ত বলিবেন ইচ্ছা থাকিলেই কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে তাহার আবার কথা কি? ইংরাজীতে একটা ত কথাই রহিয়াছে যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই সিদ্ধিরপথ (where there is a will there is a way)। ধর যেন কথাটি সত্য, কিন্তু ইচ্ছা বা ইচ্ছাসিদ্ধির পথটি যে সকল সময়ে অপকৃষ্ট না হইয়া উৎকৃষ্ট হইবে তাহা কে বলিল? আর পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, বাসনা বা উপায় গর্হিত অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইলেও সুখলাভ অদৃষ্টে ঘটে না। কিন্তু বাসনা উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা যে সকল সময় সফল হয় তাহাও ত নহে। মানবচক্ষু এরূপ দূরদর্শী নহে যে ফল লাভের বাসনায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সকল সময়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। তবে যে যেরূপ লোক তাহার বাসনা গুলি সেই অনুযায়ী হইলেই তাহা পূরিবার সম্যক সম্ভাবনা থাকে। একজন দরিদ্র কৃষিজীবি অবশ্য তাহার ধান্যাদির বিনিময়ে লুন তেল প্রভৃতি সামান্য দ্রব্য সকল সহজেই পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা দিয়া আর সে কিছু অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যা লাভ করিতে পারে না। তবে কোন বাসনাটি পূর্ণকরা কাহার

---

* "নীতি" অর্থে এখানে কোন ধর্ম্ম পুস্তক গ্রথিত নীতি নহে। প্রকৃতি যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাই নীতির পথ, প্রকৃতির যাহা নিয়ম নীতিরও তাহাই নিয়ম,। আমরা এখানে সেই নীতির কথাই বলিতেছি। তবে আমরা স্পৃহাবান্ থাকায় সকল সময় সদসৎ ও ন্যায়ান্যায় বুঝিতে পারি না।

ক্ষমতাধীন আর কোনটি বা নহে, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যের পক্ষে বড়ই সুকঠিন। নেপোলিয়ান ফ্রান্সের অধিপতি হইয়া সমস্ত পৃথিবীর একাধিশ্বর হইবার বাসনা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন? আর তাঁহার স্থাপিত সেই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যই বা কত কাল স্থায়ী হইল? তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই তাঁহার সাম্রাজ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। সত্যের ভিত্তির উপর যাহা নির্ম্মাণ কর তাহাই স্থায়ী ও দৃঢ় হইবে, অসত্যের উপর গ্রথিত প্রাসাদ যতই দৃঢ় মনে হউক না কেন, অল্প বাতাসেই তাহা ভূমিশায়ী হইবে। জগতের সকলই বিনাশ পাইয়া যাইবে কেবল সত্যই অনন্তকাল বিরাজ করিতে থাকিবে। সুতরাং সত্যের সহিত আমাদের বাসনার কতটুকু যোগ তাহা দেখিয়াই তাহাকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইতে হইবে। আর একটী কথা, বাসনা একবার মনের মধ্যে স্থান পাইলেই সেখানে তাহার সাম্রাজ্য স্থাপনে ও দৃঢ়ীকরণে বিশেষ যত্নশীল হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই মনের মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলে। একবার তুমি একটি বাসনাকে মনোমধ্যে আশ্রয় দাও, সেটিকে হয়ত তুমি পূর্ণ করিতে পারিলে, কিন্তু তাহার পশ্চাৎ সহস্র সহস্র উচ্চতর বাসনা আসিয়া তোমার হৃদয়াধিকার করিল—সেগুলি হয়ত সফল হইল না, এইরূপে বাসনার তৃষ্ণা ক্রমশই তোমার বাড়িতে লাগিল, তৃষ্ণা আর কখন নিবৃত্তি হইল না। তাহাতে তুমি সুখ না পাইয়া অনবরত দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলে। মনে কর একটি বালক এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশটাকা জলপানি পাওয়ার চেষ্টা করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হইল। কৃত কার্য্য হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর তাহার বিশেষ বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল—সে ভাবিতে লাগিল, তাহার চেষ্টাতীত আর কিছুই নাই—তাহার যাহা ইচ্ছা সে সকলই করিতে পারে। এল, এ, পরীক্ষার সময় হয়ত প্রথম হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু হঠাৎ এমন কোন প্রতিবন্ধক ঘটিল—হয়ত তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া ইচ্ছামত প্রস্তুত হইতে পারিল না—কিম্বা কোন একটা বিশেষ কারণ ঘটিয়া, সে এবারকার পরীক্ষায় হয়ত প্রথম না হইয়া বিশেষ নীচে নামিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ইত এরূপ ঘটিতে দেখা গিয়া থাকে। কেহ বলিতে পারেন যে তাহার পর বি, এ, পরীক্ষায় উচ্চ হইবার বাসনা তাহাকে কিছুকাল বল দিয়া সতেজ রাখিবে। আচ্ছা মনে কর বি,এ, পরীক্ষাতে সে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইয়া সকলের নিকট আদৃত হইয়া আপনার গৌরবে মত্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এইত গেল একটি দৃশ্য, অপর দৃশ্যটি দেখা যাউক। বি, এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া হয়ত যুবকটি মনে মনে নানা প্রকার উচ্চ আশা করিয়াছে। কিন্তু সংসারে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না—তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে মূর্খ লোকেও এসংসারে তাহার অপেক্ষা উচ্চ আসন পাইতে লাগিল; সে পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সকল বিষয়ে বিফল হইতে লাগিল। কেমন বিধির নির্ব্বন্ধ, কৃতকার্য্য হইবার সম্যক আশা ও সম্ভাবনা সত্ত্বেও সে পদে পদে হুচট খাইতে লাগিল। এরূপ হুচট খাইয়া খাইয়া অকূল সংসারসমুদ্রে বাত্যাহত ভগ্নতরীর ন্যায় কত নিরাশ হৃদয় অনুকূল তরঙ্গের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

ইরাজীতে একটি উক্তি আছে, There is may a slip betwixt the cup and the slip (হাতের গ্রাস মুখে যাইবার আগে অনেক ব্যাঘাত ঘটিতে পারে)—ইহা যে কিরূপ সত্য, তাহা বোধ হয় সকলেই ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের বাসনা পূর্ণ করিয়া

বিচ্ছিন্ন নিশ্চিত সুখলাভ করা সকলের গ্যে ঘটিয়া উঠে না। তবে বাসনা যাহার অল্প এবং সঙ্কীর্ণ তাহাকেই আমরা তত খী বলিয়া পরিচয় দিই। এইরূপে বর্ত্তমানে খ না পাইয়া আমরা ভবিষ্যতের ক্রোড়ে ান হইয়া আপনাদিগকে মায়ার জালে ড়াইতে থাকি; এবং এই উপায়ে একটির র অপর একটি দুঃখ আসিয়া ক্রমশঃ আমাগকে চিরজীবনের জন্য অভিভূত করিয়া লে। পাঁচ লক্ষ লোক এইরূপে ভগ্ন-হৃদয় য়া মরিতেছে আর পাঁচটি হয়ত এসংসারে তকার্য্য হইয়া বুক ফুলাইয়া চলিতেছে। হা ছাড়া যোগ্যাই জীবিত থাকিবে (Fitst will survive) ফলবাদীদিগের এই যে —ইহাও যে দৈবনির্ব্বন্ধের (chapter of cidents)এর অন্তর্ভূত নহে তাহা কে বলিন? আমরা চেষ্টাও যত্নদ্বারাই যে কৃতকার্য্য তাহা কি প্রকারে বলিতে পারি—? হা যে বিশ্বের কোন অজ্ঞাত নিয়মের ন্তর্ভূত নহে তাহা কে বলিবেন? আমরা মন হঠাৎ বলিয়া উঠি কপালে সবই হয়, দৃষ্টের দোহাই দিয়া লোকের দুঃখের মাংসা করি, সে মীমাংসা অভাগাদের ষয়েই খাটাইব, আর সৌভাগ্যশালীদের ষয়ে কপাল বা অদৃষ্টের কথা না বলিয়া াহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলের গৌরব করিব—কোন বিজ্ঞানের কথা? তাহাই যেন হইল জারের মধ্যে আমিই যেন সৌভাগ্যবান য়া জীবিতই রহিলাম কিন্তু সুখ পাইম একথা কে বলিবেন? এরূপত দেখা য়াছে, উচ্চ উচ্চ পদলাভ করিয়াও, এমন কি রাজ্যপদ লাভ করিয়াও মনুষ্যে সুখী হয় নাই। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতার দ্বারা বাসনা পূর্ণ করিয়া সুখ লাভ করা অসম্ভব; কারণ বাসনা অনন্ত কিন্তু মনুষ্যের ক্ষমতা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। যযাতি সহস্র বর্ষকাল বিষয় সুখ ভোগ করিয়া পুত্রদিগকে এই কথা বলিলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত শস্য, সুবর্ণ, পশুপক্ষী, ও রমণী এক ব্যক্তিরও তুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম নহে।

অনেকে হোসেন খাঁ প্রভৃতি লোকের অদ্ভূত কার্য্য দেখিয়া, অমনি মনে করিয়া বসেন, যে সেইরূপ ক্ষমতা পাইলেই, তাঁহারা সকল বাসনা তৃপ্তি করিয়া সুখে থাকিতে পারিতেন। আমাদের দেশে এই প্রকারের অনেক প্রাচীন প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত* থাকাতে আমাদিগকে আরও সেইদিকে আকৃষ্ট করে। বিপুল ক্ষমতা পাইলেও আমাদিগকে প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে নচেৎ মনোকষ্ট ও অনুতাপ আসিবেই আসিবে। মানুষ ত মানুষ বটে। ন্যায় অন্যায় বিবেচনার জ্ঞান যখন আমাদের মনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তখন বিপুল ক্ষমতা থাকিলেও, রিপুদমন না

---

* যাঁহারা কর্ম্মফল স্বীকার করেন তাঁহাদের নিকট Chapter of accidents লিয়া কোন সহস্রবাহু দানব নাই, আর হাদের অনিশ্চিতের উপরও নির্ভর করিতে না।

* প্রবাদ আছে, পূর্ব্ব কালের আর্য্য ঋষিরা অনেকে অসাধারণক্ষমতাবান্ ছিলেন; এবং একালেও সেইরূপ মহাপুরুষ আছেন, এরূপও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। এরূপ অসামান্য ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা যে কোনরূপ অন্যায় করিতে পারেন এরূপত কোন ক্রমেই মনে হয় না। প্রকৃতির গতি যে নীতি বিরুদ্ধ তাহা নহে—তাঁহারা যে উপায়েই ক্ষমতা পাইয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিশ্বজগতের বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন, এরূপত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

করিলে ও ক্ষমাবান্ না হইলে আমাদের আনন্দলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ক্ষমতাও আমাদের মনোমধ্যে এরূপ প্রবল হওয়া আবশ্যক যে কোনরূপ অন্যায় অসৎ বাসনা আসিয়া কোন উপায়ে আমাদিগকে অসুখী করিতে পারে না। মনুষ্য যত ক্ষমতা বান্ হইবে, ততই এই ক্ষমতা পরিচালনার পরিসর ক্ষেত্র খুঁজিবে; এবং তাহা হইলেই পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিবার পরিবর্ত্তে তাহাকেই পৃথিবীর কৃতদাস হইয়া পড়িতে হইবে, সুতরাং ইহাতেও নিজের সুখ নাই। বরং প্রথম প্রথম পাশব প্রবৃত্তিগুলির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়, ও মনকে বিশেষ প্রকারে নিজের অধীনে আনিতে হয়, নচেৎ বাসনা আসিয়া সুখদুর্গকে একেবারে চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহাতেই বুঝা যায় যে পৃথিবীতে বাসনা থাকিলে আর কিছুতেই সুখ পাওয়ার উপায় নাই পদে পদে আমাদিগকে দুঃখই পাইতে হয়। তবে সুখভোগের বাসনা করিয়া মনুষ্যের অধিক দুঃখ পাইবার প্রয়োজন কি আছে? তবে এই মায়াবী আলেয়ার পশ্চাৎগামী হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য ও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হই কেন? সুখ দুঃখ আমাদের নিকট একই হউক না কেন? কষ্ট বা দুঃখ যখন আমাদিগকে ধরিবেই ধরিবে, তখন অনর্থক উহাদের হইতে পলায়ন করা কিসের জন্য, আমরা প্রসন্ন চিত্তে উভয়কেই আলিঙ্গন করি না কেন? সুখেতেও বিমুগ্ধ থাকিব না দুঃখেতেও নিরাশ বা কাতর হইব না—তাহা হইলেই আমরা উহাদের হইতে উচ্চে উঠিতে পারিব। আমরা যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হই না কেন, কিছুতেই ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একাগ্রচিত্তে কর্ত্তব্য সা নেই যত্নশীল হইব। যখন চেষ্টা ও যত্ন কি লেই ফললাভ হয় না, তখন প্রাণ পণে হি সাধনের চেষ্টা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব, ফ লাভ হইল কি না হইল কিছুতেই টলিব ন অটল অচলের ন্যায় কর্ত্তব্যের দিকে দৃ রাখিয়া উহাকেই আমাদের জীবনের ধ্রু নক্ষত্র করিয়া উহার পদতলে সকল আ বাসনা, অভিলাষ, গর্ব্ব, অহঙ্কার-সমস্তই বি র্জ্জন দিব। বাসনা ও অহঙ্কার পরিত্যা করিতে পারিলে আর কিছুতেই দুঃখ দি পারিবে না। পৃথিবীর যাহাকে নিত্য দুঃ বল তাহা হইতে বিমুক্ত থাকিবে এবং বা সনা সুখ দুঃখ এসকল কিছুই নাই বলি তোমার মন একপ্রকার আনন্দে পূর্ণ থাকিবে তাহাকে তুমি দুঃখ-মুক্ত (negative) সুখমা বল, তাহাতে ক্ষতি নাই। উহা দুঃখে অভাবই হউক বা স্পষ্ট সুখই হউক আমাদে জীবনের উপর উহার পূর্ণ প্রভাব, মনুষ্য হৃদয়ে আনন্দ দিবার ক্ষমতা উহার অসীম বাসনা বিনাশ করিতে পারিলে তুমি মায়া ময় এই পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর ন এই পাপপূর্ণ সংসারে থাকিয়াও সংসারী নহ; তখন তুমি নিজের হৃৎসংসারের প্রভু জগতের প্রভু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রভু। তখন তুমি বাসনাধীনদিগের অপেক্ষাও যত্নে সহিত, হৃদয়ের সহিত তোমার সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে। ইহজগতে জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া, ভবিষ্যতের সহস্র সহস্র বি মর্ম্ম বিশুষ্ক হৃদয়ে আশাবারি সিঞ্চন করিয়া কর্ত্তব্যের পথ দিয়া তুমি চলিয়া যাইবে কাল তোমার পঞ্চভূতাত্মক এই ছার দেহকে অধিকার করিবে সত্য, কিন্তু তোমার অক্ষ কীর্ত্তি ও জলন্তমহিমা তোমাকে চিরকালে জন্যই এ পৃথিবীতে জীবন্ত রাখিবে।

শ্রী——শর্ম্ম